কিংবদন্তির ঢাকা

নাজির হোসেন

কিংবদন্তির ঢাকা

নাজির হোসেন

প্রকাশনায় ঃ থ্রিষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ,
(আজাদ মুসলিম ওয়েল ফেয়ার কমপ্লেক্স-বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত)
৮৮/১ জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা-১২১১

মুদ্রণে ঃ প্যারাডাইস প্রিন্টার্স
৪৪/সি-১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ ফারুক আহমেদ ও সমর রঞ্জন মিত্র

তৃতীয় সংস্করণ ঃ এপ্রিল ১৯৯৫
আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর ৫০তম বার্ষিকীতে

প্রচ্ছদ ঃ আবদুল রউফ সরকার

দাম ঃ দুই শত পঞ্চাশ টাকা

পরিবেশক ঃ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বিক্রয় বিভাগ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

নওরোজ কিতাবিস্তান / নওরোজ সাহিত্য সম্ভার
বাংলাবাজার ও গভঃনিউমার্কেট, ঢাকা
স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রভিন্সিয়াল বুক সাপ্লাই, বাংলাবাজার, ঢাকা
আজাদ মুসলিম পাবলিক লাইব্রেরী
১৮৬, জগন্নাথ সাহা রোড, লালবাগ, ঢাকা
থ্রি ষ্টার বহুমুখী সমবায় সমিতি
৮৮/১ জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা
বাংলাদেশ বুক ক্লাব প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র
আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
এবং
সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরী সমূহে

উৎসর্গ

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহকালে লালবাগ দুর্গের সিপাহীদের সাহায্য করতে গিয়ে আমলীগোলা ও লালবাগ অঞ্চলের যে সকল মহল্লাবাসী আণ্টাঘর ময়দানের বৃক্ষ সারিতে সিপাহীদের সঙ্গে ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন এবং যারা নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়েছিলেন তাদের স্মরণে।

"ইতিহাস-ঐতিহ্য-প্রাচীনত্ব ও গৌরবময় শহর ঢাকা"

শতাব্দী প্রাচীন এই জনপদ যুগে যুগে কালের বিবর্তনের ধারাকে বুকে ধরে ইতিহাসের নিরব সাক্ষী হয়ে আছে।

ঢাকা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী। আজকের এই গৌরবময় মনজিলে পৌঁছতে এই জনপদকে বহুবার পরিণত হতে হয়েছে রনাংগনে। বীর নগরবাসীর আত্মত্যাগ ও বীরত্বের যশোগাথায় সমুজ্জ্বল আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বুড়িগংগার পানি অনেক গড়িয়েছে মহাকালের স্রোত ধারায়। ঢাকা এখন এই ভূখণ্ডের কোটি মানুষের আশা আকাংখা ও প্রাপ্তির প্রতীক। কেবলমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ঢাকা এখন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। জাতিসংঘ এই ঢাকা নগরীকে শান্তির শহর বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে।

যুগের ও সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে আমরা দলমত নির্বিশেষ ঢাকাকে সত্যিকারভাবে একটি আধুনিক, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, দুষণমুক্ত পরিবেশ এবং সত্যিকারের শান্তির নগরীতে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছি।

আমাদের এই কর্মপ্রয়াসে অতীতকে অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে। অতীত ইতিহাসের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে ঢাকাবাসীকে এগিয়ে যেতে হবে।

আমাদের হারিয়ে যাওয়া অতীতের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের যে মহৎ প্রচেষ্টা জনাব নাজির হোসেনের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তা তাঁর বহু শ্রম ও নিষ্ঠালব্ধের ফসল এই কিংবদন্তির ঢাকা। বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া অতীতের অনেক কিছু আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে জীবন্ত করে রাখার এই মহতী প্রচেষ্টাকে আমি স্বাগত জানাই।

ঢাকা একটি সু-প্রাচীন নগরী। এই ঢাকা, ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল-বিশেষকরে ঢাকার রাস্তাঘাট ও গলিপথের নামকরণের পিছনে কি ইতিহাস রয়েছে সে সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে লেখক অতীতকে জীবন্ত করে তুলেছেন। পাঠক-পাঠিকাকে পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি মুখরিত পথ-ঘাট সফরের আনন্দে ধন্য করেছেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো কারো দ্বিমত থাকতে পারে। আমারও থাকতে পারে এটা স্বাভাবিক। তবু কালের পরিক্রমায় ঢাকার রাস্তা-ঘাটের নাম বিকাশের ইতিহাস সত্যই চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

আর এ ক্ষেত্রে "কিংবদন্তির ঢাকা" গ্রন্থখানির যে কি মূল্যবান অবদান থাকবে তা কেবল ভবিষ্যতই নির্ধারণ করবে।

ইতিহাস ও কিংবদন্তির সংমিশ্রণের রচিত এই সুচিন্তিত মূল্যবান বইখানির আমি বহুল প্রচার কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

(মোহাম্মদ হানিফ)
মেয়র
ঢাকা সিটি করপোরেশন



লেখক পরিচিতি

জনাব নাজির হোসেন ঢাকা নগরীর আমলীগোলা মহল্লায় (জগন্নাথ সাহা রোড) ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম রহিম বখস্ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। বাল্যকালেই তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। তজ্জন্য তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভে সক্ষম হননি। পিতার ইন্তেকালের পরই লেখাপড়া ছেড়ে সংসার নির্ব্যাহের জন্য তাকে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে হয়।

দেশ বিভাগের পূর্বে পরাধীন মুসলিম সমাজের দুঃখ দুর্দশা দেখে বাল্যকাল থেকেই তার মনে সমাজ সংগঠনের অনুপ্রেরণা জাগে। অবহেলিত অনুন্নত এলাকাবাসীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে আমলীগোলায় কতিপয় উৎসাহী তরুণের সহযোগিতায় "আজাদ মুসলিম ক্লাব" নামে একটি জাতি গঠনমূলক ও বহুমুখী কল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হন তিনি। তারপর থেকে বহু সামাজিক, শিক্ষা, সমবায়, স্বাস্থ্য, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এক সময় তিনি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেও ঢাকাবাসীর কাছে সুপরিচিত ছিলেন। উল্লেখ থাকে যে তৎকালীন "আজাদ মুসলিম ক্লাব" আজ "আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-বাংলাদেশ" নামে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। আসন পেয়েছে জাতিসংঘে– পাবলিক রিলেশন ও এনজিও শাখায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে।

জনাব নাজির হোসেন পাকিস্তান আমলে মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনে দু'বারই লালবাগ ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ঢাকা পৌর সভার সদস্য হয়েছেন এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা পৌর সভার দুটি নির্বাচনেই বিপুল ভোটাধিক্যে কমিশনার নির্বাচিত হয়ে ঢাকা পৌর করপোরেশনের– পরবর্তীতে ঢাকা সিটি করপোরেশনের কমিশনার পদে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। তা ছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অদ্যাবধি সরকার যে কয়বার ঢাকা পৌর সভা ও পৌর করপোরেশনের কমিশনার পদে মনোনয়ন দিয়েছেন ততবারই তিনি মনোনীত

কমিশনার পদে বরিত হয়েছেন। সাবেক জিয়া সরকার পুরাতন ঢাকা উন্নয়ন কল্পে "পুরাতন ঢাকা উন্নয়ন কমিটি" গঠন করলে তারও সদস্য পদে আসীন হন। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭১ ও ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ঢাকা পৌর সভা ও পৌর করপোরেশনে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য/কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, সেই সঙ্গে ১৯৪৫ সাল হতে পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন সামাজিক, আর্থ-সামাজিক, সমবায়, শিক্ষা, ধর্মীয়, স্বাস্থ্য, সেবা, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা পদে বহাল থেকে বহু স্কুল, নাইট স্কুল, মাদ্রাসা, লাইব্রেরী ও পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃসদন ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, শিশু পুষ্টি কেন্দ্র, ব্যায়ামাগার, রাইফেল ক্লাব, সমবায়ের মাধ্যমে কাঁচা বাজারসহ সপিং কমপ্লেক্স, হস্তশিল্প শিক্ষা কেন্দ্র, মহিলাদের জন্য সেলাই, বুনন, এমব্রয়ডারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বয়স্কা নারী শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু সেনাদল, বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলাসহ খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেণ্টার, পার্ক, শিশু পার্কসহ বহু সামাজিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়া এলাকার পূর্ত উন্নয়নে বিজলী ও পানি উন্নয়নে, রাস্তাঘাট গলি ঘুচি, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ ও সম্প্রসারণে যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখেন।

জনাব নাজির হোসেন শুধু পৌর কমিশনারই নয়-মুসলিম পারিবারিক সালিশী পরিষদের (আদালত) চেয়ারম্যান, লালবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২, আমলীগোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাজী রাহেলা সরকারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, এ, এম, সি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঊষা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং লালবাগ সরকারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা সিটি আনসার প্লাটুন কমান্ডার এসোসিয়েশন, লালবাগ নবাবগঞ্জ ইউসিডি প্রজেক্ট, সমাজ সেবা প্রকল্প-৬, ইসলামপুর বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি, বাংলাদেশ সম্মিলিত বস্ত্রশিল্প সংগ্রাম পরিষদ, লালবাগ তথ্য মজলিশ, ঐতিহাসিক লালবাগ দূর্গ মসজিদ ও ইসলামপুর জাব্বুখানম মসজিদের সভাপতি, ওয়েষ্ট এন্ড হাইস্কুল, রহমত উল্লাহ গালর্স হাই স্কুল, ঢাকা জেলা সমাজ কল্যাণ পরিষদ, ঢাকা জেলা সমবায় ইউনিয়ন, ঢাকা মহানগরী রেডক্রেস সোসাইটি, লালবাগ জামেয়া কোরআনীয়া আরাবিয়া, ধুমপান ও মাদক দ্রব্য নিবারণ কারী সংস্থা (সিসফা) ও বাংলাদেশ জাতীয় যুব সংগঠন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি। স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার কোষাধ্যক্ষ, সিভিল ডিফেন্সের হেড ওয়ার্ডেন, আনসার প্লাটুন কমান্ডার, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি ও ঢাকা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের পরিচালক। ঢাকা জেলা ত্রাণ কমিটি, ঢাকা জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি, ঢাকা জেলা চোরাচালান নিরোধ কমিটি, ঢাকা ডাউন টাউন রোটারী ক্লাব, মহানগরী রেশন দোকান নির্বাচন কমিটি, বস্ত্র মন্ত্রণালয় গঠিত বস্ত্র সম্পর্কিত কনসালটেটিভ কমিটির সদস্য, তেজগাঁও ও মীরপুর সরকারী শিশু সদন উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। লালবাগ নেবার হুড কাউন্সিল, লালবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-১, গিয়াস উদ্দিন সরকারী বালিকা বিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠাতা), জগৎ

মোহন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিউ ইসলামিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নবাব বাগিচা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রহমত উল্লাহ মডেল হাই স্কুল, ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী হাই স্কুল সহ আরো অন্যান্য প্রাথমিক ও হাই স্কুলের সদস্য এবং ঢাকা নগর যাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শক পদে দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বর্তমানে তিনি সরকারী ও বেসরকারী ভাবে প্রতিষ্ঠিত নিম্ন বর্ণিত সংস্থা যথা আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ (তৎপরিচালিত ফিরোজাবারী পঙ্গু শিশু হাসপাতাল), থ্রী ষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মালিক সমবায় সমিতি, আজাদ মুসলিম পাবলিক লাইব্রেরী, আজাদ সেনা, শিশুদের মুক্তবায়ু সেবন শিবির সংস্থা-বাংলাদেশ, বাংলাদেশী শাড়ী ব্যবসায়ী সমিতি, শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৫, শহীদ নগর আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল, জামিলা খাতুন কিন্ডার গার্টেন স্কুল ও কয়েকটি মাদ্রাসার সভাপতি।

জামিলা খাতুন লালবাগ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাদেশ এ্যারাবিক এন্ড উর্দু ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ বুক ক্লাবের সহ-সভাপতি, আজাদ মুসলিম রাইফেল ক্লাবের সেক্রেটারী, তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা জেলা সমাজ কল্যাণ পরিষদ, ঢাকা মহানগরী রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম, ঢাকা মহানগরী সমিতি, ঢাকা কো-অপারেটিভ বিষাণ শিল্প সমিতি, হযরত বাগ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, আমলীগোলা শাহী মসজিদ কমিটি, মিটফোর্ড হাসপাতাল ও মেডিক্যাল হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতির নির্বাহী সদস্য, সমাজ সেবা অধিদপ্তরাধীন শারিরীক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য। বি, টি, এম, সি, আওতাভুক্ত ওরিয়েন্ট টেক্সটাইল মিল এণ্টারপ্রাইজ বোর্ডের সদস্য। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমাজ কল্যাণ কমিটির সদস্য এবং ল-এণ্ড-অর্ডার কমিটির আহ্বায়ক শিশু অধিকার ফোরামের পাবলিক পলেসি কমিটি, ঢাকা সিটি করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ গঠিত দুর্দশাগ্রস্থ শিশুদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন জেলা সমন্বয় কমিটির সদস্য।

জাতিসংঘের এনজিও/ডিপিআই কমিটির স্থায়ী প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন জাতীয় ও এলাকা ভিত্তিক সংস্থা যথা জাতীয় যুব সংগঠন ফেডারেশন, সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, দিগন্ত বাংলাদেশ, ঢাকা বাণী পত্রিকা প্রমুখ এর উপদেষ্টা পদে থেকে জনহিতকর কাজ করে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ ডায়েবেটিস এসোসিয়েশন, পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, গ্রন্থ বিতান, মৈত্রী সমাজ কল্যাণ সংঘ সহ আরো কতক জাতীয় সংস্থার আজীবন সদস্য। তাঁর সমাজসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ পাকিস্তান সরকার ১৯৬৬ সালে তাঁকে তমঘা-ই-খেদমত উপাধিতে ভূষিত

করেন। বাংলাদেশ সরকারের সমবায় মন্ত্রণালয় জাতীয় পর্যায়ে ১৯৯১ সালের শ্রেষ্ঠ সমবায়ী (বিপনন) হিসেবে এবং ১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সালে ঢাকা জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে পদক ও পুরস্কার দান করেন।

বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ ১৯৮৮ সালে শ্রেষ্ঠ সমাজ সেবী হিসেবে পদক দান করেন। তাছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক শ্রেষ্ঠ সমাজ কর্মী ও কিংবদন্তির ঢাকার লেখক হিসেবে পুরস্কৃত হন।

তিনি জাতিসংঘে এনজিও সম্মেলন সহ দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশিবিরে অংশ গ্রহণ ও শিক্ষা সফরে গমনপূর্বক ঐতিহাসিক নিদর্শনসহ বহু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা পরিদর্শনকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর, থাইল্যান্ড, ইংল্যান্ড, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম ভ্রমণ করেন। তিনি হজব্রত পালনকল্পে দু'বার সৌদি আরব গমন করেছেন। এসবের উপর "দেশ-দেশান্তরে" নামে একটি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত তার আরো দশটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, কিংবদন্তির ঢাকা তন্মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য নিবন্ধ ও লেখা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে এবং রেডিও বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত হয়েছে।



ওসমানী মিলনায়তনে ১২-৬-৯৩ তারিখে মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ সরকারের সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী (বিপনন ১৯৯১) হিসেবে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার দিচ্ছেন লেখক আলহাজ্ব নাজির হোসেনকে। পার্শ্বে রয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আঃ সালাম তালুকদার ও প্রতিমন্ত্রী জনাব আঃ হাই।

কিংবদন্তির ঢাকা

ইতিহাসের শহর ঢাকার ঐতিহ্য প্রাচীন ও গৌরবময় হলেও রহস্যমতায় প্রচ্ছন্ন। আজকের এই মহানগরী কোন একদিন আয়তনে ও অবস্থানে এমন ছিলো না এবং যুগে যুগে কালে কালে এর নামের প্রচ্ছন্নতাকে যেসব উপকাহিনী, কল্পকথা-কিংবদন্তি এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী রহস্যময় করে তুলেছে সেগুলিও কোন গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ রূপে সংগৃহীত হয়নি।

ফলে এই মহানগরীর রহস্যময়তার অতলে আরও অনেক কিছু প্রচ্ছন্ন আছে যা এই আধুনিক কালে আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে। বিশেষ করে সেই সুপ্রাচীন নগরী আজকের এই মহানগরীর কোন বিশিষ্ট অঞ্চলে তার নিজস্ব আয়তনের প্রথম ইমারতটি গড়ে তুলেছিল, তাও সঠিক করে বলা যায় না। গবেষকদের গ্রন্থাবলী, ছিন্নপত্র, পর্যটকদের বিবরণ, নবাব বাদশাহদের কাহিনী এবং প্রাচীন জনশ্রুতিকে অবলম্বন করে মোটামুটি যা জানা যায় তাতে অনুমিত হয় যে, প্রথম পর্যায়ে এই মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ভূমিতে, কিন্তু সেকালে সেই বুড়িগঙ্গার প্রবাহ ছিলো অন্য রকম। বুড়িগঙ্গার সেই প্রাচীন প্রবাহের তীরবর্তী একটি অংশে আজকে ঢাকা শহরের লালবাগ ও আমলীগোলা অঞ্চলটি অবস্থিত। আর সেই সূত্রেই বলা যায়, এই অঞ্চলটি এককালে সেই প্রাচীন নগরীর প্রাণকেন্দ্রের প্রাচুর্যময়তার গৌরবে সমুজ্জ্বল ছিলো।

আমলীগোলার একটি অতি প্রাচীন পরিবারের সন্তান এবং এই এলাকার একজন বাসিন্দা হিসাবে দীর্ঘ কাল যাবত আমার ইচ্ছা ছিলো নগরীর এই অঞ্চলের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার। কিন্তু সে কাজে হাত দিয়ে দেখা গেলো কাজটি তেমন সহজ নয়। মহানগরীর একটি ক্ষুদ্রাংশের এবং অন্যতম প্রাচীন অংশের কথা বলতে হলে পুরা নগরীর কাহিনী এসে পড়ে এবং যেহেতু এই নগরী প্রাচীনত্বের গৌরব ইতিহাসকে বিধৃত করে আছে, সেই হেতু তার কাহিনী বর্ণনা করতে গেলে গোটা বাংলাদেশ এমনকি পাক-ভারত উপমহাদেশেরও বহু প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ফলে গোটা ব্যাপারটাই রীতিমত জটিল এবং দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সেই দুঃসাধ্য সমাধান এবং জটিলতা উন্মোচন করার ক্ষমতা আমার নেই। তবু কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং অনুশীলন বৃত্তির তাগিদে এই কাজ থেকে সরে দাঁড়াতে পারিনি। আমলীগোলার কাহিনী যেমন বারবার নানা রঙ্গে, নানা বিন্যাসে আমাকে আকর্ষণ করেছে, তেমনি এই মহানগরী ঢাকার রহস্যময় স্তব্ধ ইতিহাসও আমাকে আহ্বান জানিয়েছে। আহ্বান জানিয়েছে আমার সমাজ কল্যাণমূলক মনোভাব ও ইতিহাস জানার মন-মানসিকতা।

একটি গ্রামকে যত সহজে বোঝা যায়, জানা যায়, একটা প্রাচীন ও বড় শহরকে তত সহজে চেনা জানা যায় না। যতই জানা যায়, ততই আরো জানার কৌতুহল বাড়ে। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে অনেক গ্রাম, গঞ্জ, শহর, নগর ঘুরেছি ইতিহাসের নেশায়। ঘুরেছি সামাজিক ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড দেখা ও জানার কিন্তু সে সব গ্রাম, গঞ্জ, ছোট্ট শহরকে এত দূর্জেয় মনে হয়নি, আর ঢাকা শহরে জন্ম নিয়ে– সারা জীবন ঢাকা শহরে থেকে আজও তার সকল মহল্লা, পথঘাট, অলিগলি, বাড়িঘর, মানুষজনকে চিনতে পারিনি, জানতে পারিনি।

ঢাকার এক একটা অঞ্চল, মহল্লা ও এক একটা সড়কের ইতিহাস নিয়ে রোমান্টিক উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনা করা যায় যেমন লালবাগ, আজিমপুর, আমলীগোলা, চকবাজার, মনর খাঁ বাজার, পোস্তা, নিমতলী, তাঁতী বাজার, নারিন্দা, পোস্তাগোলা, ফরাশগঞ্জ ইত্যাদি রাস্তার কাহিনী যে কোন কাহিনীর তুলনায় কম আকর্ষণীয় নয়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির দীর্ঘ দিনের একজন নির্বাচিত সদস্য তথা কমিশনার হিসেবে আয়ুব আমলের ২য় অধ্যায়ে প্রায় ৩/৪ বছর রেকর্ড রুমে ঢাকার পথঘাটের নামকরণের নথিপত্র ঘেটেছি উপরোক্ত নেশার কারণে। লক্ষ করেছি সিদ্ধান্তগুলো সংক্ষেপে সযত্নে রক্ষিত আছে কিন্তু অনেক স্থানের বিস্তারিত বিবরণ ও সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ তার মধ্যে খুব কম। ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ করে ঢাকা পৌর সভার খ্যাতিমান চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা কমিশনার যারা ইতিহাস সৃষ্টির মত কাজ করেছেন তাদের জীবন বৃত্তান্ত গুটিকতক ব্যতিত নেই। তাও অতি সংক্ষিপ্ত।

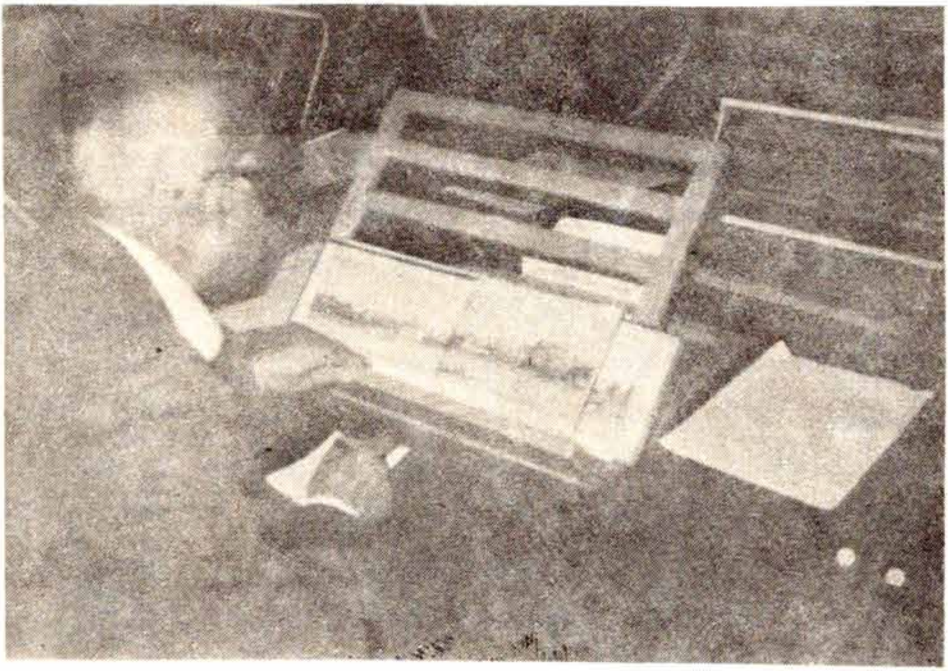
অথচ এসব জ্ঞানী-গুণী ও বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি, দরদীমনা মানুষগুলোর সামাজিক জীবন যাত্রার পরিচয় জানবার আগ্রহ আমার প্রচুর। কারণ তাতে নগরীর যে কোন স্থানের ও কালের ইতিহাস মর্মস্থল পর্যন্ত জানা যায়। কালের পটভূমিতে জীবনের স্পন্দন পর্যন্ত অনুভব করা যায়। তা যতক্ষণ না জানা যায় ততক্ষণ ইতিহাসের অনেক খানি অজানা থেকে যায়।

এরই মধ্যে দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে গমন করে, সেমিনার-সম্মেলনে অংশ নিয়ে, সামাজিক, আর্থ-সামাজিক, সমবায়, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে, শিক্ষামূলক সফরে গিয়ে বিভিন্ন জাতি, গোত্র, শ্রেণী ও বহু বিচিত্র লোকের সাহচার্য লাভ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, সে সবের ভ্রমণ কাহিনী ও স্মৃতি কথা নিয়ে সম্প্রতি ৫০০ পৃষ্ঠার উর্দ্ধে একখানা পুস্তক "দেশ দেশান্তরে" নামে প্রকাশ করেছি। ইতিপূর্বেও এধরনের শিক্ষা সফরের উপর আরো পুস্তক ও নিবন্ধ লিখেছি। অন্যদের

বই পুস্তকও বেশ কিছু পড়েছি। এসবের মধ্যে ঢাকা এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত ঢাকা সম্পর্কিত বইসমূহ পাঠ করে আরও আকর্ষিত হয়েছি ঢাকাকে জানার, ঢাকার বিগত দিনের মানুষকে জানার, ঢাকার অলিগলি পথঘাট এর পূর্ব ইতিহাসকে জানার।

পূর্বেই বলেছি ঢাকা শহরে আমি জন্ম নিয়েছি, ঢাকার লোক সমাজে মানুষ হয়েছি। ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের আমি একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত উত্তরাধিকারী বিধায় আমার মনের গহীণে ঢাকাকে তুলে ধরার বাসনা সৃষ্টিকর্তাই দিয়েছেন বলে আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি। কারণ ঢাকাবাসী বিশেষ করে আদি ঢাকাবাসীদের মধ্যে বর্তমানে প্রতি ঘরেই শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে আছে। আছে কমবেশী ধন সম্পদ। ব্যবসা বাণিজ্যেও পিছিয়ে নেই। কিন্তু ঢাকা সম্পর্কে কিছু লিখা, কিছু গবেষণা করার আগ্রহ তাদের মধ্যে অনেক কম। তাই বলি সৃষ্টিকর্তা যাকে যে বিশেষত্ব দান করেন তিনিই সে-দানের বদৌলতে সে কাজ সমাধা করে থাকেন। সে মতে আমাকে আকর্ষিত করেছে ঢাকাকে জানার– আরো জানার। সেই আকর্ষণেই আমি "কিংবদন্তির ঢাকা" তৃতীয় সংস্করণ রচনায় নতুন তথ্য দিতে সাধ্যমত সাড়া দিয়েছি মাত্র।

আপন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং গবেষণা শক্তির কৃচ্ছতাহেতু আমাকে এ কার্য সম্পাদনের জন্য বহুবিধ অবলম্বন এবং উপকরণকে উপজীব্য করতে হয়েছে। কিছু ইতিহাস, কিছু জনশ্রুতি, কিছু প্রত্যাক্ষ অভিজ্ঞতা এবং প্রাচীন পর্যটকদের বর্ণনা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপকরণগুলি অন্তর্ভূক্ত। এগুলি থেকে ঘটনা ও কাহিনী আহরণ করে আপন অনুভূতির আলোকে আমি পাঠক সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। আমার সেই চেষ্টার ফসল "কিংবদন্তির ঢাকা" এই বইটি রচনায় বিশেষ করে ব্রাডনেবার্ড রচিত "Romance of Eastern Capital" এর বঙ্গানুবাদ, রহিমুদ্দিন সিদ্দিকীকৃত "প্রাচ্যের রহস্য নগরী" মঃ তাইফুর রচিত "Glimpses of Old Dhaka" আহম্মদ হোসেন দানী রচিত "Dhaka" হাকিম হাবিবুর রহমান রচিত "আসুদগানে ঢাকা" ও 'ঢাকা পাচাস সাল পাহলে' আজিমুশ্শান হায়দার রচিত "Dhaka : History and Romance in Place names" ব্যতিত জিন্দাবাহার সহ আরো কতিপয় গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। আজিমুশ্শান হায়দার আমার অনেক দিনের বন্ধু। ঢাকা পৌর সভায় তার চাকুরীকালীন সময়েও আমি পৌরসভার একজন সদস্য (কমিশনার) ছিলাম। আমরা উভয়েই ঢাকা নগরীর বিভিন্ন মহল্লার নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে পৌরসভার রেকর্ড রুমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতাম। সে সময় থেকে তার সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাঁরই সৌজন্যে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে এই বইয়ের কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবির ফটো কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে আমি নিজেও লন্ডনে যেয়ে আরও কিছু ছবি সংগৃহীত করেছি।



লেখক লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে প্যানোরোমা অফ দি ঢাকার এলবাম থেকে অখ্যাত জার্ণাল শিল্পির ছবি দেখছেন

বইটিতে স্থানীয় মহল্লাগুলির নামের রহস্য, বিভিন্ন সড়কের নামের বিবর্তন কাহিনী, বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের ইতিকথা ও মসজিদ, মন্দির, দরগাহ প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত উপকাহিনী বিশেষ ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। এতে যে সব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তার দু'চার ক্ষেত্রে অন্য রকম তথ্য বা কাহিনী থাকাও বিচিত্র নয়। যেমন বংশালের নামকরণ সম্পর্কে বিদেশী ঐতিহাসিকদের মতে এক সময় বাংলাদেশে ডাচ বা ওলন্দাজদের যথেষ্ট আধিপত্য ছিলো। সে সময় কোন কোন খালে জাহাজ বা নৌকা চলাচলের জন্যে নদী তীরবর্তী কৃত ঘাটা হতে ওলন্দাজরা মোঘল শাসকদের অনুমতি নিয়ে অথবা তাদের ফরমান বলে নৌকা হতে টোল বা কর আদায় করতো, এই কর আদায়ের ঘরকেই বলা হতো ব্যাংকশাল। ব্যাংক শব্দের অর্থ নদীতীর আর শাল শব্দের অর্থ গৃহ। এই করের বিনিময়ে ডাচরা খালগুলো খনন কিংবা প্রশস্ত করে দিতো। অন্যদিকে লং সাহেবের মতে নিশ্চয়ই এখানে ইংরেজদের ব্যাংক বা বীমাভবন ছিলো।

এ ধরনের ভিন্নমত বা তথ্য সহৃদয় পাঠকবর্গের জানা থাকলে আমাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ রইল। বইয়ের কলেবর নতুন নতুন তথ্য সংযোজনের ফলে

অনেকটা বৃদ্ধি হওয়ায় বহু ক্ষেত্রেই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন হয়েছে। আবার কতিপয় ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন কথা ও কাহিনী এ সংস্করণে বাদও পড়েছে। আমার বিশ্বাস সহৃদয় বিদগ্ধ পাঠক তা সহজে অনুধাবন করতে পারবেন।

এই বইয়ের প্রথম সংস্করণের পান্ডুলিপি তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয় ১৯৭০ সালের শেষের দিকে, বইটি মুদ্রণের জন্য বি.এন.আর-এর কাছে সমর্পনও করা হয়েছিল। কিন্তু সামান্য মুদ্রণের পর ৭১ সালের মার্চের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ায় মুদ্রণ কাজ বন্ধ থাকে। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ায় বইযে উল্লেখিত মহল্লা, সড়ক প্রভৃতির নাম পরিচয় ও স্মৃতিচিহ্নগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন শুরু হওয়া স্বাভাবিক। সেই পরিবর্তনগুলি সকল ক্ষেত্রে সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা আমার পক্ষে এ সংস্করণেরও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ভবিষ্যতে এ বইয়ের পরবর্তী সংস্করণ বের হলে এগুলি এবং নতুন কোন তথ্য আরো অবগত হলে তা সংযোজনের আশা রইল।

বই খানি রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, তরুণ ও যুব সমাজকে আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করা এবং দেশের সংহতি ও ঐতিহ্যের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধে উদ্দেপিত করা– সেই সাথে ঢাকাবাসীদের লুপ্ত গৌরব পুনঃরুদ্ধার সংগ্রামে এগিয়ে আসার লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে সামান্যতম সাফল্যলাভ করে থাকলেও আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। অবশ্য ইতিমধ্যে ঢাকার বিভিন্ন দিক নিয়ে কেউ কেউ একক এবং সমষ্টিগতভাবে এগিয়ে এসেছেন। এটা অত্যন্ত আশার কথা।

এ বই রচনায় অনেকেই আমাকে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ কিছু তথ্য দিয়েও সহায়তা করেছেন। তাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত সহায়ক পুস্তকগুলির লেখক ও অনুবাদকের কাছে আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ঋণ স্বীকার করছি। বন্ধুবর মরহুম কবি হাবিবুর রহমান আমার প্রথম সংস্করণের পান্ডুলিপি দেখে দিয়েছিলেন এবং বইটির নামকরণও তিনিই করেছিলেন। তাঁরই অনুজ সাইফুর রহমান তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত অংশের পান্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। পৌর সভার সাবেক চেয়ারম্যান, প্রশাসক ও ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে কয়েকজনের ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন, পৌর করপোরেশনের সাবেক একাউন্ট অফিসার জনাব আব্দুল হামিদ। তাদের সকলের কাছে আমি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি ঢাকার আরও অসংখ্য লোকের নিকট কৃতজ্ঞ। যাদের কাছে এ বই-এর তথ্য নেবার জন্য সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়েছি। অনেকে কিছু কিছু তথ্য দিয়েছেন। অনেকে দিতে পারেননি বার্ধক্যের দরুন স্মৃতি থেকে সে অংশটুকু মুছে গেছে বা অনেকটা ভুলে গেছেন। আবার অনেককে সূত্র ধরিয়ে দিতে পারলে তথ্যের খন্ড খন্ড অংশ

বলতে পেরেছেন। তথ্য না দিতে পারলেও আমার এই আগ্রহকে উৎসাহিত করেছেন। আপ্যায়িত করেছেন অতি গরীব হয়েও, আমি তাদের কথা ভুলতে পারবো না। তাদের নাম এ বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ না হলেও আমার হৃদয়ের পাতায় তারা চির জাগরুক থাকবে।

কলকাতার ডেপুটি শেরিফ মিঃ উইলিয়াম হিকি তার রচিত "হিকির স্মৃতি কথা" লিখতে গিয়ে বিশেষ করে কলকাতার সমসাময়িক বাঙ্গালীদের সামাজিক রাজনৈতিক তথ্য জানার জন্যে বিখ্যাত হেয়ার ড্রেসার থেকে আরম্ভ করে ড্যানিয়েলের মত শিল্পী, চাঁদ ও মন্নুর মত এদেশীয় ভৃত্য, জমাদারনির মত হিন্দুস্থানী মেয়ে (হিকির উপপত্নি) সহ বহু বিচিত্র লোকের সাহায্য লাভ করেছিলেন। তার উপর হিকি সাহেব জীবন উপভোগ করতে জানতেন, বুঝতেন যে জীবনের সঞ্চিত ধন কিছুই ফেলা যায় না। এবং জীবনের কোন অভিজ্ঞতাকে তিনি উপেক্ষনীয় মনে করতেন না। লাট সাহেবের বাড়ীর ভোজ সভা, জজের বাড়ীর খানাপিনা থেকে শুরু করে ট্যাভের্নের হৈ-হল্লা, বাগান বাড়ীর সুরা, নারী-বিলাস সব রকমের অভিজ্ঞতাকেই তিনি জীবনে উপভোগ্য ও অভিনন্দনীয় মনে করতেন। জীবন দিয়ে জীবন দেখার ইচ্ছা ও আগ্রহের জন্য তার জীবন স্মৃতির তথ্যগুলো আজও তপ্ত।

হিকি সাহেবের মত আমি অনেক স্তরে গেলেও তার মত সর্বস্তরে যেতে বা সাহচার্য লাভ করতে পারিনি। তেমন ইচ্ছেও আমার মনে উদয় হয়নি। স্বাভাবিক ও সামাজিকতার মধ্য দিয়েই যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করেছি। যার কিছু গ্রহণ করেছি আবার কিছু বর্জনও করেছি। হিকি সাহেবের মত তথ্য সংগ্রহে এগিয়ে গেলে হয়তো এ বইটি আরো রসময় করে কিংবদন্তীর সমাহার উপহার দিতে পারতাম। এই অপরাগতার জন্য আমি কিঞ্চিত পরিমাণও দুঃখিত নই।

আমি কোন পেশাদার লেখক বা গবেষক নই। সেই কারণে এ বইয়ের বিন্যাসে যদি কিছু ত্রুটি থেকে থাকে এবং তথ্যগত অসংলগ্নতা এসে গিয়ে থাকে সেজন্য আমি বিদগ্ধ পাঠক সাধারণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমার সব অপরাগতার দায়ভাগ আমারই।

— নাজির হোসেন

এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে সব আলোচনা হয়েছে তা থেকে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলো –

দৈনিক বাংলা

"কিংবদন্তির ঢাকা"

রহস্যময় নগরী ঢাকা। হাজারো অলিগলি এর। আর সেই অলিগলির আড়ালে লুকিয়ে আছে বিচিত্র জীবন আর জীবনের জটিলতার কাহিনী। নানা কথা, উপকথা, কিংবদন্তি রয়েছে এই ঢাকা নগরীর। প্রাচীন ঢাকার বহু কিংবদন্তি আজ আধুনিক ঢাকার বর্ণাঢ্য নির্মাণের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে। মুছে যাচ্ছে সেই জীর্ণ দেওয়ালের স্মৃতি। যেখানে ছিল অন্ধকার ঝোঁপঝাড় ঘেরা বন্য প্রাণীর বাস, সেখানে এখন ভিসিআর শোভিত ড্রইং রুমে শোভা পাচ্ছে ঝাড়বাতি আর নিয়নের উজ্জ্বল আলোকমালা। কিন্তু এই মুছে যাওয়া প্রায় স্মৃতির কিংবদন্তিকে যথাসাধ্য আন্তরিকতা আর ভালোবাসায় পুরনো দিনের ঢাকার এ্যালবাম হিসাবে তৈরী করছেন ঐতিহ্য প্রেমিক, ঢাকা প্রেমিক আলোচ্য গ্রন্থের লেখক জনাব নাজির হোসেন।

পুরনো ঢাকার লালবাগ-আমলীগোলা এলাকার বাসিন্দা নাজির হোসেন, পুরনো ঢাকাকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন, সেই সুযোগ তাকে যেমন এই সুদীর্ঘ স্মৃতিময় গ্রন্থ রচনায় সহযোগিতা করেছে তেমনি সহযোগিতা করেছে শ্রুতি, লোক গাঁথা, উপকথা, কিংবদন্তির সংগ্রহও। পুরনো ঢাকার বিস্তার কতটুকু ছিলো, কোথায় ছিল এর প্রাণকেন্দ্র, বিভিন্ন সড়ক ও মহল্লার নামকরণ, তার বিবর্তনের কাহিনী, মসজিদ, মন্দির, দরগাহের উদ্ভব, নামকরণের নেপথ্য, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় লালবাগ আমলীগোলা এলাকার জনগণের ভূমিকা প্রভৃতি বহুবিচিত্র বিষয় উঠে এসেছে আলোচ্য গ্রন্থে। মোগল আমল, নবাবী আমল, বৃটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে তদানীন্তন পাক আমল পর্যন্ত বহু খন্ড খন্ড ঘটনা এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

তবে আগেই বলেছি ঢাকার ইতিহাস এত ব্যাপক এবং এত বিচিত্র রহস্যময় যে এর বিস্তৃত পূর্ণাঙ্গ চিত্র একক প্রচেষ্টায় তুলে ধরা অত্যন্ত দুরুহ কাজ। ভূমিকায় লেখক নিজেও এই অপূর্ণতার স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করেছেন। ইতিহাস, জনশ্রুতি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, প্রাচীন পর্যটকদের বর্ণনা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তারই ওপর ভিত্তি করে জনাব নাজির হোসেন প্রায়

আড়াই শত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।

লেখকের বর্ণনা ভঙ্গি যথেষ্ট আকর্ষনীয় এবং ভাষা সরল। এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনায় যে শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন গ্রন্থকার তা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ এটি। প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৯৭৬-এ। কিংবদন্তির ঢাকার প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই আকর্ষনীয়। প্রচ্ছদ ঃ আবদুর রউফ সরকার। মূল্য ঃ ২৫/- টাকা। বইটির প্রকাশক ঃ ঢাকাস্থ আজাদ মুসলিম ক্লাব। (বর্তমানে আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ)।

রঞ্জন

দৈনিক বাংলা

৩০শে আগস্ট, ১৯৮১ ইং

দৈনিক আজাদ

কিংবদন্তির ঢাকা ঃ নাজির হোসেন

প্রকাশক ঃ আজাদ মুসলিম ক্লাব (বর্তমানে আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স)।

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা।

কিংবদন্তির ঢাকা। নাজির হোসেনের বহু শ্রম ও নিষ্ঠার ফসল। এই বইটিতে রাজধানী ঢাকার কয়েকশত বৎসরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিচিতি এমনকি রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন অলি, গলি, মহল্লার নামকরণের যে তথ্য বিধৃত করা হয়েছে, তা বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে অনাগতকাল জীবন্ত রাখবে। পুরাতন ঢাকার এক অভিজাত পরিবারে জনাব নাজির হোসেনের জন্ম। তার নিজ দেখা এবং অতীত ইতিহাস তিনি যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে ঢাকা সম্পর্কে সব বিষয়ে কৌতুহল নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে।

কিংবদন্তির ঢাকার এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। অনেক নতুন তথ্য ও দুর্লভ ছবিও এই সংস্করণে স্থান পেয়েছে। যাতে করে বইটি সত্যিকার অর্থে তথ্যবহুল হয়ে উঠেছে।

লেখক বইটিকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহীকালে লালবাগ দূর্গের সিপাহীদের সাহায্য করতে গিয়ে আমলীগোলা ও লালবাগ অঞ্চলের যে সব মহল্লাবাসী আণ্টাঘর ময়দানে বৃক্ষসারিতে সিপাহীদের সাথে ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন এবং যারা নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়েছিলেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করে যেন ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে ঋণ শোধ করেছেন। বইটিতে ঢাকার মহল্লাগুলোর নামের রহস্য, বিভিন্ন সড়কের

নামের রহস্য, সড়কের বিবর্তন কাহিনী, অঞ্চলের ইতিকথা, মসজিদ, মন্দির, দরগাহ প্রভৃতির সাথে জড়িত উপকাহিনী যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে ঢাকা কৌতুহলী যে কোন পাঠকের কৌতুহল মেটাতে সক্ষম হবে।

সম্রাট আওরংগজেবের পুত্র মোহাম্মদ আজমের সুবেদারী আমলে ঢাকার বর্তমান আজিমপুর এলাকায় সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য গৃহনির্মাণ করা হয়েছিল বলেই এলাকার নামকরণ যে আজিমপুর করা হয় তা ক'জনের জানা আছে। তেমনি হিন্দুদের বিখ্যাত মন্দিরের নামানুসারে সংশ্লিষ্ট এলাকার নাম ঢাকেশ্বরী রোড করা হয়েছে। আজকের ঢাকার অভিজাত এলাকা ধানমন্ডিতে এক সময় ধান উৎপন্ন হতো বলে এবং এখানে বীজের হাট বসতো বলেই এলাকার নাম ধানমন্ডি করা হয়। এলাকার একটি ছোট্ট নদী মতিঝিলের নামানুসারে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার নামকরণ করা হয়েছে। যদিও আজ আর নদীর কোন অস্তিত্ব নেই। তৎকালীন বিশিষ্ট জমিদার মৌলভী আবদুল আলীর নামানুসারে মৌলভী বাজারের নামকরণ করা হয়েছে। কুটির শিল্পের আকারে 'টিকিয়া' তৈরী হতো এলাকায়, সেই এলাকাটি আজ টিকাটুলি নামে পরিচিত। গেন্ডারিয়া এবং আশে-পাশের এলাকায় অধিক আখ উৎপন্ন হতো বলে এই এলাকার নাম গেন্ডারিয়া রাখা হয়।

"কিংবদন্তির ঢাকা'র লেখক জনাব নাজির হোসেন তার বইটিতে এই দেশের মুসলমানদের শৌর্য, বীর্য এবং গৌরবময় ইতিহাস বিধৃত করেছেন খুব সুন্দরভাবে। সব দিক দিয়ে বইটি পাঠকদের নিকট যে সুপাঠ্য হয়ে উঠবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আড়াইশত পৃষ্ঠার এই বইয়ে অনেক দুর্লভ ছবি রয়েছে যা শতবর্ষের সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুন্দর মোড়কে বাঁধান বইটির মূল্য রাখা হয়েছে ২৫ টাকা। এই দুর্মূল্যের বাজারে এই মূল্য কমই বলতে হবে। জনাব নাজির হোসেনের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আজাদ মুসলিম ক্লাব, (আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স) বইটি প্রকাশ করেছে।

পরিবেশনের দায়িত্বে রয়েছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। বইটির ছাপা মোটামুটি ভালো। মুদ্রণ প্রমাদ নাই বললেই চলে। আমরা 'কিংবদন্তির ঢাকা'র দ্বিতীয় সংস্করণের বহুল প্রচার কামনা করি।

শাহজাহান সরদার
দৈনিক আজাদ

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৮২ ইং।

দৈনিক সংবাদ

কিংবদন্তির ঢাকা "নাজির হোসেন" প্রকাশনায় ঃ আজাদ মুসলিম ক্লাব (বর্তমানে আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স), ৮৮/১, জগন্নাথ সাহা রোড। প্রচ্ছদ ঃ আবদুর রউফ সরকার। দাম ঃ পঁচিশ টাকা।

কয়েক বছরের মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে। লেখক নতুন সংস্করণে সাময়িককালে ঢাকা শহরের আরও কিছু পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরতে পারেননি সে কথা উল্লেখ করেছেন।

তার এই বইখানিতে ইতিহাসের কিছু তথ্য আছে, আছে জনশ্রুতির কথা। লোকপ্রিয়তার লোভে লেখক কোন কিংবদন্তি আকড়ে ধরে থাকেননি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন বিষয়ের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারাটিকে তুলে ধরতে। ঢাকা নামটি নিয়ে যে রহস্য তা নিয়ে গবেষকরা পরিশ্রম করে আজও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। ইতিহাসের বহু উপকরণ কালের গর্তে হারিয়ে গেছে। উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

ঢাকার কাহিনী বলতে গিয়ে লেখক আমাদের যে ইতিহাস উপহার দিয়েছেন সেখানে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গিই প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের সত্য উপলব্ধিতে সাহায্য করা লেখকের উদ্দেশ্য বলে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই সত্য একাধারে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে সাহায্য করে ঢাকাবাসী যারা প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসিতে কিংবা নির্যাতিত হয়েছেন তাদের পক্ষে এবং তাদের নিগৃহিতকারীদের এ-দেশীয় সহযোগীদের সাথে একাসনে স্থান পেয়েছে বইখানিতে। এই গ্রন্থের এই মৌলিক দুর্বলতা বাদ দিলে কিভাবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাজপথের নামকরণ হয়েছে। এর প্রাচীন নিদর্শন ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর সাথে পাঠকের পরিচয় নিবিড় হবে। ইতিহাস শুধু নবাব বাদশাহ কিংবা এদেশে ইংরেজ আধিপাত্যের বর্ষপঞ্জী নয়। ঝড়ের মধ্যে পড়া পথিকের উর্ধশ্বাস দৌড়টাই শুধু সত্য নয়, সত্য তার লক্ষ্য যেখানে বিপুল জীবন প্রবাহ চলছে। আমাদের ইতিহাসের এই বাইরের দিকটা অন্তরের সত্যকে বারবার আড়াল করেছে। তাই গবেষকদের গ্রন্থে রান্নার বর্ণনাটা মেলে খাদ্যের স্বাদ সেখানে অনুপস্থিত। নাজির হোসেন সাহেব তার লেখার গুণে সেই স্বাদের আয়োজন থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করেননি।

বাহান্ন গলি তেপান্ন বাজার ঢাকা বাংলাদেশের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে সেই মোগল যুগ থেকে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশে ইতিহাসের ডাঙ্গাটায়

তখন থেকেই প্রাণের কলরব শোনা যেতে থাকে। কিংবদন্তির ঢাকা গ্রন্থে লেখক সেই কলরবকে আবেগ ও উপলব্ধির সীমানায় এনেছেন।

লেখক যথাসাধ্য ঐতিহাসিক তথ্য উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলা ভাষায় ঢাকার ইতিহাস নামে দুখন্ডের একখানি গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়াও ইংরেজী ও বাংলায় আরও কিছু গবেষণা গ্রন্থ আছে। তার মধ্যে ডঃ দানীর ইংরেজীতে লিখিত "ঢাকা" নানা কারণে মূল্যবান। বাংলা ভাষায় আমরা নাজির হোসেন সাহেবের বইয়ে জমিদার আর নবাবদের স্মৃতি বিজরিত ঢাকার তথ্যের চিত্রাগ্রাহী কাহিনী পেলাম। কৌতুহলী পাঠক এই বই পড়ার পর ঢাকার প্রতিটি রাস্তা ও গলির আত্মকাহিনী শুনতে পাবেন পথ চলতে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সুষুপ্তি ও দীর্ঘ বিশ্বাস এবং প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় কাহিনী অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের উল্লেখ এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। বইয়ের উৎসর্গপত্রের সার্থকতা তাতে রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। নবাব সলিমুল্লাহ ১৪ লাখ টাকা ঋণ হিন্দু মহাজনদের কাছ থেকে নিয়ে তাদের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন, তাকে হয়রানী করার চেষ্টা হয়েছে এই সত্যের পাশাপাশি তাকে ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন বৃটিশ স্বার্থে ব্যবহারের জন্য ১৬ লাখ টাকা অল্প সুদে ঋণ দিয়েছেন সেই তথ্যের উল্লেখ নেই। হিন্দু বা মুসলিমদের প্রতি বৃটিশের সুবিচার কিংবা অবিচার পালাক্রমে যেভাবে চিত্রিত করা হয় তার পেছনের নির্মম সত্য একটাই... তাহল বৃটিশের এই আচরণ বিশেষ কোন সম্প্রদায় প্রীতি বা কল্যানবোধ থেকে উৎসারিত নয়, সাম্রাজ্য শাসনের প্রয়োজনেই সে একাজটি করেছে। এই সহজ সত্যের স্বীকৃতি বইটিতে কোথাও নেই। হিন্দু বা মুসলিমরা সম্প্রদায় হিসাবে বাংলাদেশকে সুয়োরানী বা দুয়োরানী তা বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গভঙ্গ রদ দিয়ে বিচার বিবেচনাকালে আমরা ভুলে যাই যে, এই বৃটিশ শাসকরাই দক্ষিণ ভারতে মোপলা বিদ্রোহ অত্যন্ত নৃশংসভাবে দমন করেছে। ট্রেনের বন্ধ কামরায় ২২৬ জন বন্দী মোপলার মধ্যে ২৩ জন বাদে সকলেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল। এছাড়া জেলে ও গুলীতে প্রাণ হারিয়েছে আরও অনেকে। মোপলাদের উপর ওখানকার জমিদার (যারা উচ্চ শ্রেণীর বর্ণহিন্দু) আর বৃটিশরাজ্যের যুক্ত রোষ আর অত্যাচার প্রমাণ করে যেখানে যে সম্প্রদায় দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ নিরাপদ মনে হয়েছে তাকেই আদরে বর্গী হিসাবে ঠোঁটে কিংবা বিপরীত ক্ষেত্রে অন্যদেরের 'বর্গী' হিসাবে পিঠে করে নিয়েছে। এই বৃটিশ সরকারই বাংলাদেশে কৃষক বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ নির্মম হাতে দমন করেছে। লেখক স্বাধীনতাহীন অবস্থায় এদেশে হিন্দু মুসলমানের বিবাদে উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চ শ্রেণীর ভূমিকা দেখেছেন। অবশ্যই একথা স্বীকার্য, শিক্ষাদীক্ষা আত্মচেতনা স্বাতন্ত্রবোধ যা আধুনিক ব্যক্তিসত্বার অন্যতম উপাদান সেক্ষেত্রে বিত্তশালী শ্রেণীর কারুর কারুর অবদানকে এজন্য খর্ব করে দেখা ঠিক

নয়। মুসলিম জাগরণ বলতে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঠিকানা ও উৎপত্তির পরিসরে চেতনার স্ফুলিঙ্গ ক্রমেই পরিশ্রুত হয়ে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সমাজের আর্থিক ক্ষেত্রে যাদের অবস্থান নীচু তাদেরকেও গৌরবান্বিত করে। কিন্তু যেখানে চাকরি বাকরি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে বৃটিশ অনুগ্রহপুষ্ট নবাব বাদশাহ কিংবা রাজা জমিদাররা পারেননি। এই উপমহাদেশের ৭০০ দেশীয় রাজ্যের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়, তবে খন্ডকালে যারা স্ব-সমাজের জন্য কিছু করেছেন সেখানে নবাব সলিমুল্লাহর অবদান অনেক বেশী। এদেশে রাজনৈতিক সংঘাত ও ইতিহাসের ধারায় এই অবদানের মূল্যায়ন কদাচিৎ হয়েছে। আহসান মঞ্জিলের বর্তমান ভগ্নদশার কথা লেখক বেদনাভরে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একটা কথা তিনি বলেননি যে, ইতিহাসের নিদর্শন হিসাবে একে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে না। জীর্ণ দশা প্রাপ্ত আহসান মঞ্জিল ঢাকার ইতিহাসের অঙ্গ। হয়তো ভাবীকালের পাঠকরা বইয়ের ঝাপসা আলোক চিত্র দেখে তাদের কল্পনার জগতে একটি নতুন কিংবদন্তি আমদানী করবেন। এই ইতিহাস বোধের অভাবটাকে লেখক পাত্তা না দিয়ে শুধু নবাবদের ব্যক্তিগত খামখেয়ালী ও সামন্তসুলভ মেজাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। লেখক ভারতের রাজ রাজড়াদের কীর্তি কাহিনীর পাশে ভাওয়াল রাজ্যের কাহিনী নিয়ে সাধারণ মানুষের গান যে, আমাদের ইতিহাসে উপরের তলায় প্রভাব কতখানি নিঃস্বদের মোহগ্রস্ত করে রাখে সেই খবরটিও প্রসঙ্গ ক্রমে দিয়েছেন। লেখক তার সচেতন ও সংবেদনশীল মন নিয়ে ভাওয়াল রাজবাড়ীতে চক দিয়ে লেখা এক নির্মম সত্যকে আবিস্কার করেছেন অথচ পর মুহূর্তেই তিনি দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু আরও তথ্য জানার পর লেখকের দ্বিধা দূর হয়েছে। এখানেই লেখক তার স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। ঢাকার ১৯৪৮ সালের পুলিশ ধর্মঘটের কথা সংক্ষেপে হলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

এসব এ জন্যই উল্লেখ করতে হল এই বইখানিতে আমাদের ইতিহাসের বহু বিস্মৃত ও স্বল্পজ্ঞাত অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। মাত্র ২৪৮ পাতার পরিসরে তিনি কিংবদন্তির ঢাকা বইখানিতে আমাদের অতীত সম্পর্কে সচেতন করেছেন। তার বলার ভঙ্গী, ভাষার সাবলীলতা পাঠককে একনিশ্বাসে বইখানি পড়তে আগ্রহী করে। কয়েকটি দুর্লভ ছবির সমাবেশ গ্রন্থ খানির মর্যাদা ও মূল্য বাড়িয়েছে।

– সন্তোষ গুপ্ত

দৈনিক সংবাদ

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৮১ ইং

দৈনিক দেশ

কিংবদন্তির ঢাকা, নাজির হোসেন

প্রকাশক ঃ আজাদ মুসলিম ক্লাব (আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স)।

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা।

বাংলাভাষায় ঢাকা নগরী তথা মহানগরীর কথকতা, গল্পকথা বা ইতিহাস নেই বললেই চলে। জনাব রহিমুদ্দিন সিদ্দিকীর অনুদিত রোমান্স অব ইষ্টার্ণ ক্যাপিটাল (প্রাচ্যের রহস্য নগরী) ব্যতীত ঢাকার ওপরে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃত কোন গ্রন্থ নেই। ইংরেজী ভাষায় কয়েকটি বই রয়েছে। সেগুলি এতো অসম্পূর্ণ যে, তা ইতিহাস গ্রন্থের সকল শর্ত পূরণ করে না। তাছাড়া প্রায় বেশির ভাগ বইয়ের রচয়িতা বা প্রণেতাই ঢাকার অস্থানীয় অধিবাসী, প্রবাসী কিংবা পর্যটক। ফলে ইতি কথামূলক গ্রন্থ প্রণয়েনে ভালোবাসা, টান, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রয়োগের জন্যে যে পরিমাণ যোগাযোগ মাধ্যম ও ঘনিষ্টতা প্রয়োজন তা তাদের না থাকায় গ্রন্থের বহু তথ্য অনেকখানি শ্রুতি ও অনুমান নির্ভর। কোন কোনটি তো একান্তই "ঢাকাই কিংবদন্তির" সংকলন মাত্র। যদিও এখানে আলোচ্য "কিংবদন্তির ঢাকা" বইটি ও আংশিক শ্রুতি ও অনুমান নির্ভর, তথাপি ঢাকার মতো প্রাচীন মহানগরীর ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত ক্রমরূপান্তরণের আনুপর্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্যে কুশলতা এবং সংকলনের অভিজ্ঞতা ছাড়াও যেটি সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে নাড়ির যোগ। ঢাকার আদি বাসিন্দাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে বংশানুক্রমিক যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা কিংবদন্তির ঢাকা গ্রন্থের রচয়িতা নাজির হোসেন পেয়েছেন, তার সাথে স্বাভাবিকভাবেই যোগ হয়েছে ঢাকার ক্রমইতিহাসের পুংখানুপুংখ বিবরণের বাহন ঢাকার আদি সমাজের সাথে তার জন্মসূত্রের অবাধ প্রাণখোলা সুযোগ সুবিধা। ফলে যে কোন বহিরাগত, প্রবাসীর অনুসন্ধিৎসু বহু শ্রম প্রদত্ত লেখাতেও যে শূণ্যতা, বিপুল তথ্যাভিড়াক্যান্ত লেখার মধ্যেও যে ফাঁক এবং কৃত্রিমতা দেখা যায় জনাব হোসেনের লেখার অনেক অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও সেই ফাঁক বা কৃত্রিমতার শূন্যতা নেই।

"কিংবদন্তির ঢাকা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে সম্প্রতি। প্রায় ৬ বৎসর আগে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ পড়ে মনের মধ্যে যে অপূর্ণতার ব্যথা ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণ তার অনেক খানি লাঘব করলেও অনেক প্রশ্নের কাঁটা থেকে যায়। তথাপি তার এই ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠ প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে তিনি যে ধৈর্য্য ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন তা ঢাকার সুপ্রাচীন বিশাল বিস্তৃত ইতিহাসেরই একটি অংশ হয়ে রইল।

প্রথম সংস্করণের তুলনায় দ্বিতীয় সংস্করণ অনেক শোভন সুন্দর বৃহৎ হলেও মনে হয়েছে তার নিজের মধ্যেও তথ্যের সত্যা-সত্যের ব্যাপারে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে।

এটা থাকাই স্বাভাবিক কারণ ধারাবাহিক তথ্য সংরক্ষণের অভাব, ঐতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব, এমনকি প্রয়োজনীয় দলিল ও নথিপত্রের অপ্রতুলতা শুধু ঢাকার কেন আমাদের দেশের ইতিহাস কিংবা দেশ সম্পর্কে কোন তথ্য নিষ্ঠ রচনা সংকলনের পথে প্রধান বাঁধা। একারণেই জনাব হোসেন "কিংবদন্তির ঢাকা" রচনা করতে গিয়ে সরকারী কৃত্রিম ভংগি ও সীমাবদ্ধতার গন্ডী পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারেননি।

এটা অনস্বীকার্য, প্রথম যুগের ঢাকার মোগলাই শাসক প্রশাসন আমলে সীমিত হলেও ফারসী ও উর্দু ভাষায় সরকারী নথিপত্র সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু তৎপরবর্তী ইংরেজ আমলে ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় রচিত ও সংরক্ষিত বেশির ভাগ নথিপত্রেরই সত্যতা ও বাস্তবতা যাচাই করা মুশকিল। ইংরেজ বড়ো কর্তারা এসব নথিপত্র রচনায় কখনোই তাদের উপনিবেশিক স্বার্থকে ক্ষুন্ন হতে দেয়নি। ফলে অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাই বিকৃত বা আংশিক বিকৃত ভাবে নথিবদ্ধ হয়েছে। তবু এর মধ্যে থেকেই অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে ইতিহাসের সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা ঐতিহাসিকের দায়িত্ব।

নাজির হোসেন তার বইয়ে ঢাকার বিভিন্ন অলিগলি ও মহল্লার নাম নামান্তর ও পূর্বোতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেছেন। সংক্ষিপ্তকরণ করতে গিয়ে যা হবার তাই হয়েছে। কোন কোন মহল্লা, গলি বা বিশেষ স্থানের শুধু নাম দিয়েই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এটা অবশ্য নিন্দার্হ্য কিছু নয়। কেননা শুধুমাত্র একেকটি মহল্লা নিয়েই এর চাইতে বৃহৎগ্রন্থ রচিত হতে পারে। কারণ সুপ্রাচীন ঢাকার একেকটি মহল্লা গড়ে ওঠা তার রূপান্তর সমাজ জীবন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা বৈচিত্রে অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি অবশ্য দ্বিতীয় সংস্করণে সহজপ্রাপ্য তথ্যানুযায়ী ঢাকার একটি প্রাশাসনিক চিত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম সংযোজন করেছেন– এটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান বিষয়। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঢাকার পুরুষানুক্রমিক বাসিন্দা বর্তমানে ভারত নিবাসী জিন্দাবাহারের পরিতোষ সেন জিন্দাবাহার মহল্লা ও গলির উপরে একটি সুবৃহৎ বই লিখেছেন।)

জনাব নাজির হোসেন যে শ্রম ও কষ্ট করে তার বইটি রচনা ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বর্ধিত করেছেন তাতে তিনি ঢাকার ইতিহাসের অবিভাজ্য অংশ হয়ে রইলেন। বইটি অত্যন্ত সুমুদ্রিত এবং সুশোভন হলেও তিনি বইটির প্রারম্ভে বক্তব্য এবং পত্রিকা ও প্রচারণা সংস্থাসমূহে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সমালোচনা-আলোচনা থেকে সংকলিত অংশ না ছেপে বরং ঐ স্থানটুকুও ঢাকার আরো কিছু তথ্যের জন্যে উৎসর্গ করলে আমরা পাঠকরা আরেকটু বেশী উপকৃত হতাম।

সত্যশ্রয়ী
দৈনিক দেশ

৩০শে আগস্ট, ১৯৮১ ইং

সচিত্র স্বদেশ

কিংবদন্তির ঢাকা

নাজির হোসেন

প্রকাশক ঃ আজাদ মুসলিম ক্লাব (আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স), জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা।

দাম ঃ পঁচিশ টাকা।

প্রাচ্যের রহস্য নগরী ঢাকা। আজকের আলোকোজ্জ্বল শহর-মেট্রোপলিটন সিটি। বাংলাদেশের রাজধানী। অনেক ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক এই শহর। এখানে জন্ম নিয়েছে অনেক জ্ঞানী-গুণী, বিপ্লবী, যোদ্ধা। এই জনপদের তথা বাঙ্গালী-মুসলমানের ক্রমবিকাশের ধারায় রয়েছে এর অপরিসীম অবদান। যুগে যুগে উজ্জ্বল ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে ঢাকা আর ঢাকার মানুষ। পুরানো ঢাকার অসংখ্য জীর্ণ দালান-কোঠা সংকীর্ণ অলি-গলি, বাজার মহল্লা আজও বহন করছে এই শহরের অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতি। অবশ্য আজকের ঢাকার উজ্জ্বল আলোর ঝলকানিতে সে ঐতিহ্য ম্লান প্রায়। ক্রমেই বিস্তৃতির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে ঢাকার গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য। এর অন্যতম কারণ বাংলা ভাষায় লিখিত পরিপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থের অভাব। "কিংবদন্তির ঢাকা" রচনার মাধ্যমে নাজির হোসেন সেই অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বইটির দ্বিতীয়, সংস্করণ। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় এর প্রথম সংস্করণ। লেখক ঐতিহাসিক কিংবা গবেষক হিসাবে বিশেষ কোন খ্যাতি জনাব নাজির হোসেন এর নেই। এই শহরের সাথে তার আত্মিক সম্পর্কের কারণেই ঢাকার রহস্যময়, বৈচিত্রময় ইতিহাস উদঘাটনে তিনি এগিয়ে এসেছেন। প্রচলিত কিংবদন্তি, কথা কাহিনী ইত্যাদি থেকেই তিনি তার এই গ্রন্থের অধিকাংশ মালমসলা সংগ্রহ করেছেন। পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন অলি-গলি, মহল্লা, ইত্যাদির নামকরণের পিছনে ঐতিহাসিক কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন।

কিংবদন্তির ঢাকা বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর সুধী মহলে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আলোচনা। দৈনিক ইত্তেফাকে জনাব আখতার উল-আলম লিখেছেন, নাজির হোসেনের "কিংবদন্তির ঢাকা" যাকে বলে ইনফরমেটিভ বই। সাহিত্য ইতিহাসের মাপ কাঠিতে এই বই-এর বিচার সম্ভব নয়। বরং এই বই এর নাম অনুসারে কিংবদন্তির সমাহার, স্মৃতি ও শ্রুতি, ইতিকথা ও ইতিবৃত্তের সুলিখিত এক গ্রন্থনা বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। জনাব আখতার উল-আলম তার আলোচনায় বই এর দু'এক জায়গায় তথ্যগত ভুলের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমান সংস্করণের ভূমিকায় লেখক সে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

দৈনিক আজাদে প্রকাশিত সমালোচনায় ইবনে জলিল মন্তব্য করেছেন। ঢাকা নগরীর অতীতকে জীবন্ত করে তোলার কাজটি নিঃসন্দেহে দুরুহ এবং ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তা সহজ সাধ্য নয়। নাজির হোসেন সাহেব এই দুরুহ কাজটি সম্পাদন করতে পেরেছেন। একমাত্র দীর্ঘ দিনের আন্তরিক প্রয়াশের দ্বারাই এরপর এই বই সম্পর্কে নতুন করে বিশেষ কিছু বলার অপেক্ষা বোধ করি রাখে না।

কিংবদন্তির ঢাকার দ্বিতীয় সংস্করণে আরও কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। তার মধ্যে ঢাকা পৌরসভার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখযোগ্য।

জনাব নাজির হোসেন তাঁর এই বই এ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পের মত ইতিহাস বলে গেছেন। পাঠককে হোচট খেতে হয় না। তর তর করে পড়ে যাওয়া যায়। ইতিহাসকে এমনিই সুখ পাঠ্য করে পরিবেশন করার জন্যই লেখক প্রশংসার দাবী রাখেন। তাছাড়া ঢাকার ইতিহাস ঐতিহ্য তিনি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে এটা লেখকের একটা বড় সাফল্য।

এরপরও কিছু কথা থেকে যায়, তাহলো, এই গ্রন্থে কোনরূপ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটা রক্ষা করা বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন। তা না হলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনেক সময় গ্রন্থলব্ধ ইতিহাস মনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া এ ধরনের বই রেফারেন্স বুক হিসেবে ব্যবহার করাও কঠিন। অবশ্য, বর্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত নির্ঘণ্ট এ সমস্যার কিছুটা সুরাহা করতে পারে।

কিংবদন্তির ঢাকার আরেকটি বড় ত্রুটি হচ্ছে নিকট অতীতের কোন ঘটনা এই বইয়ে বিশেষ স্থান পায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান আন্দোলন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঢাকা ও ঢাকাবাসীর গৌরবময় ভূমিকার কথা এই গ্রন্থে সংযোজিত হতে পারতো। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গভঙ্গ ইত্যাদি বিষয় সংক্ষিপ্তকারে এসেছে। এগুলো আরও বিশদভাবে ভাবা উচিত ছিলো। একথা অনস্বীকার্য যে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই নগরীর ঐতিহ্যকে আরও উজ্জ্বল করেছে। বাঙ্গালী মুসলমনদের ক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে এই বিদ্যাপাঠের ভূমিকা কোনক্রমেই অনুল্লেখ্য নয়। ঠিক তেমনি– পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মত নিকট অতীতের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সমৃদ্ধ করেছে ঢাকার ইতিহাস। ১ম সংস্করণে সম্ভব না হলে ২য় সংস্করণে এগুলো আসতে পারতো। এতে গ্রন্থের মান বৃদ্ধি বৈ ক্ষুন্ন হতো না। আমরা আশা করি পরবর্তীতে লেখক আমাদের এই অনুযোগ বিবেচনায় রাখবেন।

কিংবদন্তির ঢাকার ছাপা ঝকঝকে। আব্দুর রউফ সরকারের প্রচ্ছদ বেশ চমৎকার। মোট কথা কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও "কিংবদন্তির ঢাকা" একটি "ভালো বই"। আমরা এই বই এর বহুল প্রচার কামনা করি।

মাহমুদ কুদ্দুস

২১শে জানুয়ারী, ১৯৮২ সচিত্র স্বদেশ।

দৈনিক সংগ্রাম

কিংবদন্তির ঢাকা

নাজির হোসেন

প্রকাশক ঃ আজাদ মুসলিম ক্লাব (আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স), জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা।

দাম ঃ পঁচিশ টাকা।

আমরা বাংলাদেশী মুসলমানরা ইতিহাস চর্চায় বিমুখ। এটা বেদনাদায়ক হলেও সত্য। আমাদের এই দুর্বলতার অন্ধকার সিঁড়ি পথ ধরে কত কথা, কত ঘটনা কত জীবন, ইতিহাসের কত মূল্যবান উপকরণ যে হারিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। বৃটিশ এদেশে রাজত্ব করেছে ১৯০ বছর। এই একশ' নব্বই বছরের মধ্যে প্রথম ১৫০ বছর মুসলমানরা জাতি হিসেবে এককভাবেই মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। একশ' পঞ্চাশ বছরের এই গোটা সংগ্রামটাই ছিল সশস্ত্র। অথচ ইতিহাসে শহীদের তালিকায় আমরা আমাদের লোক খুঁজে পাইনা। ফকির বিদ্রোহের সময় বাংলার পথে প্রান্তরে, তীতুমীরের বাঁশের কেল্লায়, শরিয়তুল্লার পাশে দাড়িয়ে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, ওহাবী আন্দোলনে শরিক হয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাহাড় উপত্যকা ও বালাকোটে, ইংরেজের জেলসমূহ ও আন্দামানের নির্বাসনে যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের নাম ইতিহাসে নেই। মুষ্টিমেয় যে কয়জনের নাম পাওয়া যায়, তা কোন সজ্ঞান প্রচেষ্টার ফল নয়। এই মর্মান্তিক ইতিহাস বিস্মৃতির মধ্যে কাউকে যখন ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতে দেখি তখন আনন্দই লাগে। "কিংবদন্তীর ঢাকা" গ্রন্থের লেখক নাজির হোসেন সাহেবের ২য় সংস্করণ পাঠ করে এই আনন্দই লাভ করেছি।

পলাশীর বিপর্যয় ছিল জাতির অনেকগুলো দুর্বলতার মিলিত ফল। রাজনৈতিক ভাবে জাতি দুর্বল ছিল। ঐক্যের অভাব ছিল এক্ষেত্রে। এটা এসেছিল জাতির অসচেতন অবস্থা থেকে আর সব কিছুর মূলে ছিল ইসলামী আদর্শ বোধের অভাব। পলাশীর অবিশ্বাস্য রকমের বিপর্যয়ের মূল কারণ খুঁজতে হবে এখানেই। কিন্তু মানুষ যখন দেখল, ক্ষমতার এ নিছক হাত বদল নয়, বিদেশী ও বিজাতীয় শক্তি এসে জেঁকে বসছে, তখনই প্রতিরোধের বহ্নি শিক্ষা জ্বলে উঠল মুসলিম জনতার কাতার থেকে। পরবর্তি একশ' পঞ্চাশ বছর ছিল সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাস। প্রথম মুক্তি সংগ্রামের নাম দিয়েছিল ইংরেজরা ফকির বিদ্রোহ। ইংরাজ বিতাড়নই ছিল এ আন্দোলনের মূল লক্ষ। এর পর একে একে আসে তীতুমীরের আন্দোলন, হাজী শরিয়তুল্লার আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহ। একটা জিনিষ লক্ষণীয়, যে মৌল দুর্বলতা থেকে পলাশীর মর্মান্তিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল। যে দুর্বলতা দূর করার মাধ্যমে মুক্তি অর্জনের কাজেই মুসলমানরা আত্ম নিয়োগ করে।

ফকির আন্দোলনের মধ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টা পুরোপুরি বর্তমান না থাকলেও একান্তভাবে ধর্মনুশীলনে আগ্রহীদের দ্বারাই এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। আর পরবর্তী আন্দোলন গুলো ছিল পরিস্কার ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন। এই আন্দোলন গুলোর লক্ষ ছিল ঃ মুসলমানদের ঈমান ও আমলকে কোরআন সুন্নার আলোকে পরিশুদ্ধ করা। আদর্শের শক্তিতেই মুসলমানরা একদিন দুনিয়ার নেতৃত্বে বরিত হয়েছিল। সেই আদর্শের শক্তি ফিরিয়ে আনার মাধ্যমেই শুধু সেই হারানো গৌরব ফিরে পাওয়া সম্ভব। তিতুমীর, হাজী শরিয়তুল্লাহ এবং সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলন, এমনকি সিপাহী বিদ্রোহেরও মৌল দর্শন ছিল এটাই। পরবর্তীকালে মুক্তি আন্দোলনের প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে। ইংরেজদের নির্মম নিপীড়ন এবং ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণীর বিকাশেরই ফলশ্রুতি ছিল এটা। অসির স্থান মশি এসে গ্রহণ করায়। ইংরেজদের হাতে শিক্ষিত এবং তাদের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত বিত্তশালীদের হাতে গেল এই আন্দোলনের নেতৃত্ব। ফলে মুক্তি আন্দোলনে তার নিখুত ইসলামী চরিত্র হারিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করায়। মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনে মুসলিম লীগই হলো এই পর্যায়ের প্রধান শক্তি। ইতিহাসের এই যে বিরাট অধ্যায় তাকে নাজির হোসেন সাহেব তাঁর গ্রন্থে তার নিজস্ব দৃষ্টিভংগিতে সংক্ষেপে ও সুন্দর করে বিবৃত করেছেন। বৃটিশ শাষনাধীন হিন্দু মুসলমানদের জাতিগত দ্বন্দ্ব, মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশা, পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি বিষয় তার বাস্তব অভিজ্ঞতা রসে সিঞ্চিত হওয়ায় খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

মোগল আমলের রাজধানী হিসেবে ঢাকা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই ঢাকার বিভিন্ন মহল্লা বিশেষ করে বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী পোস্তাগোলা থেকে লালবাগ, আমলিগোলাহ-র এর মত এলাকার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইতিহাসের অনেক দূর্লভ উপকরণ। নাজির হোসেন সাহেব তার অনেক গুলিকেই সজীব করে তুলেছেন তাঁর বইতে। বলতে গিয়ে বলেছেন ঢাকার ইতিহাস, বলেছেন দেশের ইতিহাস জাতীয় ইতিহাস। এইভাবে বইটি একটি ইতিহাস হয়ে উঠেছে। আমাদের ইতিহাস ধারায় এমনিতর সংযোজন যত বাড়বে, ততই পূর্ণতার রূপ নেবে আমাদের ইতিহাস।

আবুল আসাদ
সম্পাদক
দৈনিক সংগ্রাম।

ঢাকা, ৩রা মে, ১৯৮৩

দুটি কথা

এই বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩১ পৃষ্ঠায় ১৯৭৬ সালে। প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে গেলেও বিভিন্ন কারণে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে যথেষ্ট দেরী হয়। এর মূল কারণ, দ্বিতীয় সংস্করণে বহু নতুন তথ্য ও নতুন কাহিনী সংযোজিত করতে গিয়ে যথেষ্ট কালক্ষেপ করতে হয়েছে। বলতে গেলে প্রথম সংস্করণে দৈনিক পত্র পত্রিকা ও রেডিও বাংলাদেশের সমালোচনার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন তথ্য সংযোজিত করতে হয়– ফলে ২৪৮ পৃষ্ঠায় ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৮১ সালে। অবশ্যি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় আমি বইটিকে আরো তথ্যবহুল ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছা মনের মধ্যে লালন করে আসছিলাম। অপার করুনাময় আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আমার সে ইচ্ছা সফল হলো। আমার প্রিয় পাঠকবৃন্দ পূর্বের ন্যায় আরও নতুন তথ্য ও কাহিনী সম্বলিত বইটির তৃতীয় সংস্করণ পাঠ করে খুশী হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হবার পর দেশের জাতীয় দৈনিকসমূহ ও খ্যাতনামা সাময়িকী সমূহের মতামত এবং প্রকাশনা উৎসবে তৎকালীন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান সহ বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় ডঃ মফিজ উল্লাহ কবীর, ডঃ আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, ডঃ সিরাজুল ইসলাম, ডঃ কে. এম. মোহসীন, ডঃ এনামুল হক, ডঃ মিজানুর রহমান শেলী, ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, সৈয়দ মর্তুজা আলী, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, আবুল কালাম, মোঃ জাকারিয়া, এ. জেড. এম. শামসুল আলম, কবি শামসুর রাহমান, ফজলে রাব্বী, সানাউল্লা নূরী প্রমুখ ইতিহাসবেত্তা ও বুদ্ধিজীবিগণ যে সব আলোচনা সমালোচনা ও মন্তব্য করে নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত ও বৃহদাকারে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তজন্য তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। সে সবের মধ্যে সংবাদ পত্রের মূল্যবান মতামত উদ্ধৃত না করে পারছিনা। সংবাদ পত্রের এসব মূল্যবান আলোচনার জবাব প্রসেঙ্গও আমার দু'একটি কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে।

বহুল প্রচারিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় জনাব আখতারুল আলম প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর বইটির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, লেখক ঢাকার আদি বাসিন্দা হওয়া সত্বেও তার "কিংবদন্তির ঢাকায়" আদিবাসীদের পরিচয় অনুপস্থিত অর্থাৎ "কুট্টি" শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষন এই বইয়ে নেই। কতিপয় বিদেশী বুদ্ধিজীবিও এ প্রশ্নটা রেখেছিলেন। এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ২য় সংস্করণে দিলেও এবার আরো পরিস্কার করে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলাম। এজন্যে যে আমাদের

শ্রদ্ধাভাজন এক বাঙ্গালী প্রবীণ বুদ্ধিজীবি এ বিষয়ে মাঝে মাঝে একটি ছত্র আবৃত্তি করতেন– অবশ্য তিনিও নাকি তাদের মুরুব্বী প্রধানের নিকট থেকে শুনেছেন। ছত্রটি হলো ঃ-

“ঢাকা আজিব শহর
নাম জাহাঙ্গীর নগর
দো চার শারিফ হ্যায়
বাকী কুট্টি তামাম”

ছত্র শুনে কুট্টির ব্যাখ্যা অত্যন্ত কড়া ভাষায় দিয়েছিলাম, যাক সে কথা, কুট্টি শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গেলে আমার বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মোঘল আমলে ঢাকাবাসীদের মধ্যে যারা মোঘল শাহীর অধীনে চাকরি করতেন অথবা জমিদার কিংবা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত ছিলেন তারা নিজেদেকে উঁচু স্তরের লোক ভেবে যথেষ্ট গর্ব অনুভব করতেন এবং সমাজের অন্যান্য পেশাজীবিদের অনেককেই ঘৃণার চোখে দেখতেন। তৎকালে যন্ত্রের কোন প্রচলন হয়নি। মানুষকে নিজেদের চাহিদা মেটাবার সব রকম উপকরণ হাতেই তৈরী করতে হতো। এই সব পেশাজীবিদের অনেকেই ধান কুটতো, যব কুটতো, ডাল কুটতো, সুরকি কুটতো, ইট কুটতো অর্থাৎ যে কোন ধরনের কুটার কাজ যারা করতেন তারা ছিলেন খুবই দরিদ্র এবং এদের অধিকাংশই গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন। একদিকে তারা গরীব, অন্যদিকে তারা কুটার কাজ করতেন বলে শহরের উঁচু স্তরের লোকেরা যারা ইট গুঁড়ো করতো তাদের হাতকুটি আর যারা খাদ্য শস্য কুটে পরিস্কার করতো তাদের কুটিয়াল বলতো, তবে সাধারণ ভাবে এদের “কুট্টি” বলেই সম্বোধন করতেন। পেশাই যে কালে পদবীতে পরিণত হতো ইতিহাসে সে রকম ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এই কুট্টি শব্দটাও ঢাকায় এভাবেই প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। কালের প্রবাহে সেই সব পেশাজীবিরা তাদের পেশা পরিবর্তন করে অন্যান্য পেশাকে জীবিকা অর্জনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলেও তাদের পদবীর অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ১৮৩৮ সালে লোক গণনার সময়ও ঢাকা শহরের অধিবাসীদের পেশাভিত্তিক তালিকা করা হয়। তাতে ১৩৮ ধরনের পেশাজীবিদের মধ্যে কুট্টিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিলো। এই হলো কুট্টিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সর্বশেষে জনাব আখতার-উল আলম বইটিকে কিংবদন্তির সমাহার, স্মৃতি ও শ্রুতি ইতিকথা আর ইতিবৃত্তের সুলিখিত একটা গ্রন্থনা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

রেডিও বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রন্থ সমালোচনা অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ মুস্তাফা নূরুল ইসলাম পুস্তকটির প্রশংসা করেছেন এবং বইটির বৃহত্তর কলেবরের প্রত্যাশা করেছেন। এবারে তৃতীয় সংস্করণে সে উদ্যোগ গ্রহণের যথেষ্ট চেষ্টা করছি। বইটির ২য় সংস্করণ বের হবার পর জাতীয় পত্রিকা দৈনিক বাংলার জনাব রঞ্জন বইটির প্রশংসা করে বইটিকে “মুছে যাওয়া স্মৃতির

কিংবদন্তির এ্যালবাম" বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি আরো বলেছেন ঢাকা প্রেমিক লেখক নাজির হোসেন কর্তৃক বহু বিচিত্র বিষয় উঠে এসেছে আলোচ্য গ্রন্থে। তজ্জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে তাকে ও আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঐতিহ্যবাহী দৈনিক আজাদ পত্রিকার শাহজাহান সরদার বইটির ভূয়শী প্রশংসা করে উল্লেখ করেছেন লেখক বইটিকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকালে লালবাগ দূর্গের সিপাহীদের সাহায্য করতে যেয়ে দূর্গের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মহল্লাবাসী ধৃত সিপাহীদের সাথে ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন এবং যারা নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়েছিলেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করে যেন ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে ঋণ শোধ করেছেন। সত্যি যদি এ কারণে কিছুটা ঋণ শোধ করতে পেরে থাকি তাহলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি। তারাও সৌভাগ্যবান যারা আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করছেন। তিনি আরো বলেছেন, 'এই বইটিতে রাজধানী ঢাকার কয়েক শত বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য পরিচিতি এমনকি রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন অলিগলি মহল্লার নামকরণের যে তথ্য বিধৃত করা হয়েছে তা বিস্তৃতির গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের সামনে অনাগত কাল জীবন্ত রাখবে'।

পুরনো ঢাকার প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পত্রিকা দৈনিক সংবাদের আলোচক বাবু সন্তোষ গুপ্ত বইটি রিভিউ করতে গিয়ে অনেক কথার অবতারনা করছেন। তিনি বই এ যে ইতিহাস উপহার দেওয়া হয়েছে তাতে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গিই প্রধান্য পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, এব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো ইতিহাস বর্ণনায় চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই স্থান পাবে কারণ ইতিহাস পরিবর্তন করাটা সমীচীন নয়। তিনি আরেক স্থানে বলেছেন। লেখক যে উদ্দেশ্যে বইটি রচনা করেছেন বলে ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন সে সত্যে দুর্বলতা রয়েছে কারণ একাধারে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে সাহায্য করে ঢাকাবাসী যারা প্রাণ বিসর্জন বা নির্যাতিত হয়েছেন তাদেরকে এবং তাদের নিগৃহীতকারীদের এদেশীয় সহযোগিদের একাসনে স্থান পেয়েছে বইখানিতে। এরূপ দুর্বলতা পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিচারের মাপ কাঠিতে এসে যেতে পারে। এবার সিপাহী বিদ্রোহ ও সহকারীদের বিষয়টি আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুধী পাঠক ও ইতিহাস বেত্তাগণ এর সঠিক মূল্যায়ন করবেন বলে আশা রাখি। তবে সমালোচক সন্তোষ বাবু আবার একথাও বলেছেন– গবেষকদের গ্রন্থে রান্নার বর্ণনাটা মেলে, খাদ্যের স্বাদ সেখানে অনুপস্থিত। নাজির হোসেন তার লেখার গুণে সেই স্বাদের আয়োজন থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করেননি। আরেক স্থানে বলেছেন, "লোক প্রিয়তার লোভে লেখক কোন কিংবদন্তি আকড়ে ধরে থাকেননি। যথা সাধ্য চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন বিষয়ের উৎপত্তি ও বিকাশের বাধাটিকে তুলে ধরতে"। সন্তোষবাবু পুনরায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, বই এর উৎসর্গ পত্রের সার্থকতা

রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা করেছি। আরো করবো। এ সংস্করণে এরূপ ভাবনার অনেকটা সমন্বয় করেছি বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত করে। ভবিষ্যতে আরো তথ্য অবগত হয়ে সন্তোষ বাবুর আক্ষেপ নিরসনের চেষ্টা করবো। সন্তোষ বাবু বইটিতে আমাদের ইতিহাসের বহু বিস্মৃতি ও স্বল্পজ্ঞাত অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। এতেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করি।

জাতীয় পত্রিকা দৈনিক দেশ এর আলোচক সত্যাশ্রয়ী গ্রন্থালোচনা করতে গিয়ে বহু প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন প্রথম সংস্করণ পড়ে মনের মধ্যে যে অপূর্ণতার ব্যাথা ছিলো, দ্বিতীয় সংস্করণ তার অনেক খানি লাঘব করলেও অনেক প্রশ্নের কাঁটা থেকে যায়। তথাপি তার (লেখকের) এই ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠ প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে তিনি যে ধৈর্য্য ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন তা, ঢাকার সুপ্রাচীন বিশাল বিস্তৃত ইতিহাসেরই একটি অংশ হয়ে রইলো। আশা করি তৃতীয় সংস্করণ পাঠ করে তাঁর প্রশ্নের অনেক কাঁটা দূরীভূত হবে। তবে সব কাঁটা দূরীভূত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তিনি আমার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষার্ধে বলেছেন, "তিনি (লেখক) ঢাকার ইতিহাসের অবিভাজ্য অংশ হয়ে রইলেন।" দোয়া করবেন যেন ঢাকার আরো লুপ্ত গৌরবের কথা, অনেক অলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী উদ্ধার করে পরবর্তি সংস্করণে সংযোজন করতে পারি।

সাপ্তাহিক সচিত্র স্বদেশের আলোচক মাহমুদ কুদ্দুস বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক কথাই বলেছেন, অনেক প্রশংসাই করেছেন। এক স্থানে বলেছেন লেখক প্রশংসার দাবী রাখেন, ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য তিনি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে এটা লেখকের একটা বড় সাফল্য। আবার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন কিংবদন্তি ঢাকার আরেকটি বড় ত্রুটি হচ্ছে নিকট অতীতের কোন ঘটনা এ বই-এ বিশেষ স্থান পায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান আন্দোলন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঢাকা ও ঢাকাবাসীর গৌরবময় ভূমিকার কথা এই গ্রন্থে সংযোজিত হতে পারতো, কথাগুলো অত্যন্ত সত্য। ইচ্ছে করেই বিরত রয়েছি কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরের ইতিহাস আজো নাকি সঠিকভাবে রচিত হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ও তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ যুবশ্রেণী পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসের পাতাতো ছিঁড়েই ফেলেছে– সে আন্দোলন নাকি ভুলের মাসুল। আন্দোলনের কোন ভীত ছিলো না। ছিলো শুধু ইংরেজদের দেওয়া জাতিগত বিভেদ সৃষ্টির সাম্প্রদায়িকতাবাদ। আজকে যারা ৫০ বছর উত্তীর্ণ হয়ে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন তারা বুকে হাত রেখে বলতে পারেন– সে আন্দোলনের কত প্রয়োজন ছিলো। অন্তরের মর্মবেদনার কত বহিঃপ্রকাশ ছিলো। এর ভীত কত মজবুত ছিলো। তখন কিছু স্বজাতি বিরোধী বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক ব্যক্তি পাকিস্তান সংগ্রামের প্রবল বাঁধভাঙ্গা জোয়ার দেখে ঘাপটি মেরে চুপটি করে সাধু সেজে বসে ছিলো কেউবা

নকল মুখোস পরে আন্দোলনে নিজেকে হাল্কা ভাবে জড়িত রেখেছিলো। তাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অনেকটা সুর বদলালেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুখোস খুলে গা ঝাড়া দিয়ে পাকিস্তান নামের আন্দোলনকে অসার যুক্তিহীন সাম্প্রদায়িকতাবাদী মিঃ জিন্নার খেয়ালীপনা ইত্যাদি নানা অপবাদ চালিয়ে আজকের যুবা তরুণ ও কিশোরদের মনে সেই আন্দোলনের ইতিহাসকে অবাঞ্চিত একটি ঘটনা রূপে উত্থাপন করে তাদের অধিকাংশের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। তাই আজ শুনতে হয় তাদের কাছ থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের অপব্যাখ্যা। দুঃখের সঙ্গে আরো বলতে হয় তাদের যারা নেতা ছিলেন বা আছেন যারা পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন রাজনৈতিক নেতা হবার সুযোগ পেয়েছেন তারাও তরুণ যুবাদের ভ্রান্তিকর কথা শুনে চুপ থাকেন অথবা আরো উৎসাহিত করেন। ইতিহাস আপন গতিতে চলে। কখনও তার গতি স্তিমিত বা গতি পরিবর্তন হয় বটে। কিন্তু নিয়তির বিধানে আবার সঠিক স্থানে স্থান পায়। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। তাই তো দেখি বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা নিয়ে হাজারো মতদ্বৈত্যতা। কার রচিত ইতিহাস যে সত্য হবে এক মাত্র আল্লাহ আলেমুল গায়েবই জানেন। যখন এদেশে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাস সঠিক বলে দেশবাসী গ্রহণ করবে সে সময় যদি আল্লাহ পুনঃ কোন সংস্করণ বের করার তওফিক দান করেন তখনই এযুগের তথ্য আরো সন্নিবেশিত করবো। তবে যতটুকু বলার প্রয়োজন মনে করেছি, ততটুকুই এ কালের বিবরণ দান করেছি। একেবারেই যে করিনি তা নয়। তাছাড়া বর্তমান যুগ বা কালের কিছু ইতিহাস আমার লিখা সংগ্রাম সংগঠন ব্যক্তিত্ব নামক বইটিতে রয়েছে। সুধী পাঠকবৃন্দ বইটি পড়লে সচিত্র স্বদেশের আলোচক জনাব মাহমুদ কুদ্দুসের কিছু প্রশ্নের জবাব পেতে পারেন। মাহমুদ কুদ্দুস সাহেবকে উপরোক্ত সমালোচনার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই।

দৈনিক সংগ্রাম-এর সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বৃটিশ রাজত্বের ১৯০ বছরের মধ্যে ১৫০ বছর মুসলমানরা জাতি হিসেবে এককভাবেই মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করেছে বলে উল্লেখ করেছেন। এসব সংগ্রাম ও আন্দোলনের পটভূমিও বর্ণনা করেছেন বিস্তারিতভাবে। আরো বলেছেন মর্মান্তিক ইতিহাস বিস্তৃতির মধ্যে কাউকে যখন ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতে দেখি তখন আনন্দই লাগে। "কিংবদন্তির ঢাকা" গ্রন্থের লেখক নাজির হোসেন সাহেবের ২য় সংস্করণ সংযোজন যত বাড়বে, ততই পূর্ণতার রূপ নেবে আমাদের ইতিহাস। দোয়া করবেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে আরো তথ্য সংযোজন করতে পারি।

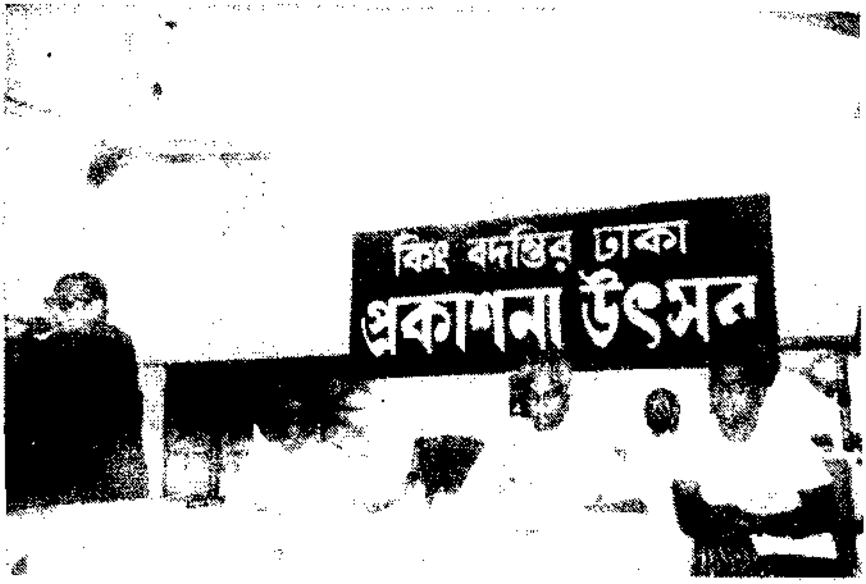
প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ বের হবার পর প্রকাশনা উৎসবেও অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ও ইতিহাসবেত্তাগণ কেউ কেউ বইটি ও লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আবার কেউ সমালোচনাও করেছেন এমন এক বন্ধুবর ইতিহাসবেত্তা বলেছেন, বইটি নাকি সম্পূর্ণ অনুকরণ তাঁর জবাবে শুধু এটুকুই বলবো ইতিহাস লিখতে গেলে পূর্বের

ইতিহাস বেত্তাদের বই বা তাদের তথ্যাবলী থেকেই তথ্য নিতে হবে। ইতিহাস এক এক জনের মনগড়া লিখা নয়। আমি লিখি আর তিনি লেখেন আবার ভবিষ্যতেও যিনি লিখবেন তাকেই পূর্ব ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। কেউ নতুন করে পূর্ব ইতিহাস দিতে পারে না। তবে দেখতে হবে সে ইতিহাসের সঙ্গে লেখক কতটুকু উপকরণ দিতে পেরেছেন। যে সব বইয়ের সহায়তা নিয়েছি আমি পূর্বেই তা স্বীকার করেছি। আমার বিশ্বাস এ সংস্করনে আমি সম্ভবমত প্রচুর নতুন নতুন উপকরণ দিতে পেরেছি। ইতিহাস প্রেমিক পাঠকবর্গ বইটি পাঠ করে আমার কথার সত্যতা যাচাই করবেন।

পরিশেষে সেই সব স্বনামখ্যাত আলোচক ও সমালোচক যাঁরা প্রচার মাধ্যমে অথবা বই এর প্রকাশনা উৎসবে সুচিন্তিত মতামত দিয়ে ও পরবর্তিতে আরো সচেতন হওয়ার উপদেশ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তজ্জন্য তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এবং আরও যে সব জ্ঞানী গুণী ও পন্ডিত ব্যক্তি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা জানিয়েছেন পুরস্কৃত করেছেন তাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই, পাঠক বর্গের কাছে পূর্বের মত বইখানি সাদরে গৃহীত হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করবো।

সর্বশেষে এই দুর্মূল্যের বাজারে আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত থ্রী ষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ বইটির তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রণের ভার গ্রহণ করায় তাদের কাছেও আমি যথেষ্ট ঋণী।

— নাজির হোসেন



নাজির হোসেন রচিত "কিংবদন্তির ঢাকা" পুস্তকের ২য় সংস্করণের প্রকাশনা উৎসবে বক্তব্য রাখছেন তৎকালিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন লেখক, ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক ডঃ মফিজউল্লাহ্ কবীর ও কমপ্লেক্স মহাসচিব সফিক আহমেদ।

[illegible]

প

পূর্ব ইতিহাস

আমলীগোলা ঢাকা নগরীর একটি মহল্লা। এর ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে ঢাকা নগরীর ইতিহাস পর্যালোচনা করা দরকার। আর ঢাকা নগরের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে সাধারণভাবেই পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের ইতিহাস না বলে উপায় নেই। কিন্তু প্রাচীন পূর্ববঙ্গের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে জানা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পূর্ববঙ্গের প্রথম যুগও রহস্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আবৃত। মুসলিম অভিযানের পূর্ববর্তী সময়ের যে সামান্য ইতিহাস জানা যায়, তা উপাখ্যান ও লোক-কাহিনী মাত্র। মুসলমানদের আগে এদেশে বৌদ্ধ ও হিন্দুরা বাস করতো। তারা ইতিহাস লিখতে জানতো না। বংশপঞ্জী সংকলনের মধ্যেই তাদের সাহিত্য-নৈপূণ্য সীমাবদ্ধ ছিল। তারা দেশের স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীও লিপিবদ্ধ করতে জানতো না। তাদের জীবন-ধারণ পদ্ধতি ছিলো বড়ই কঠোর। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে সব সময়েই নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হতো তাদের। এরূপ অবস্থায় সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচনার মত সময় তারা পেত না। তাছাড়া আগ্রহ ও প্রেরণা লাভের কোন অবকাশই ছিল না। অবশ্যি যাদের জীবন এত সংকটময় ও সংশয়-সংক্ষুব্ধ তাদের পক্ষে দেশের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার মত মানসিক অবস্থা থাকা কোন প্রকারেই স্বাভাবিক নয়।

পুরাকালের মানুষ ইতিহাস রচনায় ছিলো বিমুখ মনোভাবাপন্ন। এমন কি ইতিহাস রচনার সুযোগও দেয়া হতো না কাউকেও। যদি কোন লোক নিজের খেয়ালে দেশের স্মরণীয় ঘটনাবলী রচনা করার প্রচেষ্টা চালাতো তাহলে তার কাগজপত্র শুদ্ধ তাকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করতে হতো। এসব কারণেই পূর্ববঙ্গের সঠিক ইতিহাস জানা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

পুরাকালে পূর্ববঙ্গের গঠন-প্রকৃতি, সেখানকার অধিবাসীদের জীবন-ধারা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন কেমন ছিলো তার সামান্য মাত্র আভাস পাওয়া যায় বিজয়ী রাজাদের শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব-গাথা, উৎকীর্ণ শিলালিপি সমূহে। এছাড়া পূর্ববঙ্গের পুরাকালের ইতিহাস জানার মত আজও কোন প্রামাণ্য দলিল আবিষ্কৃত হয়নি এবং এ নিয়ে কোন গবেষণা করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

পরপর যে সব জাতি বা শক্তি এদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে তারা তাদের শাসন পরিচালনার প্রকৃত স্থান হিসেবে দেশের মূল কেন্দ্রভূমিতে রাজধানী স্থাপন করে এসেছে। অবশ্যি যুগের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রাজশক্তির উত্থান-পতন ঘটেছে, তেমনি রাজধানীও স্থানান্তরিত হয়েছে। সে-যুগে ক্ষমতাসীনরা তাঁদের নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করতেন। শহর বা নগর প্রতিষ্ঠা তারই ফলশ্রুতি। নিজ নিজ কীর্তি চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে নৃপতি বা বিজয়ীরা নগর প্রতিষ্ঠার আদেশ দেয়ার সাথে সাথে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নব নব নগরীর পত্তন হয়েছে। কিন্তু নৃপতির পরাভব, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, লোকজনের বিদ্রোহ, আর্থিক অনটন কিংবা তাঁদের অকাল মৃত্যু ইত্যকার কারণে কোন মন্দির, মসজিদ, মিনার বা ধর্মচূঁড়ায় শেষ প্রস্তর ফলকটি স্থাপন করার আগেই অনেক নগরীর বিলুপ্তি ঘটেছে।

পুরাকালে রাজা বিক্রমাদিত্য এই অঞ্চলে প্রথম যে রাজধানী পত্তন করেছিলেন আজও তাঁর স্মৃতি ভাস্বর হয়ে আছে। তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রথম বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের বিক্রমপুরের চতুর্দিক ঘিরে সংস্কৃতি ও সভ্যতা দানা বেঁধে উঠেছিলো। কয়েক শতাব্দী ধরে একটি বৌদ্ধ রাজবংশ অপ্রতিহত শক্তি ও প্রতিপত্তির সাথে রাজ্য শাসন করে যান। তাছাড়া, বংশাই নদীর পূর্বতীরে আজ থেকে বারো'শ বছর আগে সর্বেশ্বর নামে একটি নগর ছিলো। সর্বেশ্বর নামের অপভ্রংশই আজকের আধুনিক সাভার। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী সম্ভার নগরী হতেই সাভার নামের উৎপত্তি। সাভার সংলগ্ন রাজাশনে পাল রাজাগণ এক মহা বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেছিলেন। এখানে দেশ-দেশান্তর থেকে বহু বৌদ্ধ পড়াশুনার জন্যে আসতেন। শাসক হিসেবে বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের দক্ষতা যেমন প্রবল ছিলো, শিক্ষা প্রসারেও তাঁদের প্রচেষ্টা কোন অংশেই কম ছিলো না। সম্ভার বা সাভার নগরীর কিছু উত্তরে সুপ্রসিদ্ধ ধামরাই গ্রাম। সম্রাট অশোকের সময় স্থাপিত ধর্মরাজিকা হতে উদ্ভুত হয়েছে এ নাম। এখানেও ছিলো বৌদ্ধদের অপরিমেয় বিক্রম।

কিন্তু এত প্রতিপত্তিশালী হয়েও তাঁরা তাঁদের দীর্ঘকালীন রাজত্বের কিছুমাত্র নিদর্শন রেখে যেতে পারেননি। তাই তাঁদের সম্পর্কে সব কিছু জানা সম্ভব নয়। বিক্রমপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত সোনার গাঁওয়ে বহুদিন ধরে হিন্দু রাজন্যবর্গ অপ্রতিহত গতিতে রাজ্য শাসন করে যান। কিন্তু তাঁরাও উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন রেখে যেতে পারেননি। মুসলিম শাসকবর্গের মধ্যে সর্ব প্রথম আফগান সেনাবাহিনীর নায়করূপে বখতিয়ার খিলজি বঙ্গদেশের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে তাঁর রাজধানী লক্ষণাবতী থেকে বিতাড়িত করে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বিনা যুদ্ধেই সোনার গাঁও অধিকার করেন। এইভাবে তিনি দিল্লীর মুসলিম বাদশাহ্‌র অধীনে বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর প্রায় দু'শ বছর ধরে এই শাসন-কর্তৃত্ব ক্রমাগত হাত বদলায়। দেশের অধিকাংশ অধিবাসী তখনও হিন্দু ছিলো। রাজশক্তির উত্থান-পতনে তারা সব সময়েই উদাসীন থাকতো। মুসলমানদের সংখ্যা অতি অল্প থাকা সত্ত্বেও সামরিক শক্তি ও শাসন-পরিচালনা পদ্ধতির সুষ্ঠুতা হেতু মুসলমানগণ বঙ্গদেশে একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

সুলতানে সুলতানে বিবাদ বাঁধতো-লড়াইও চলতো-কিন্তু দেশের বিজিত অধিবাসীরা নির্লিপ্ত থাকতো। এইভাবে কাটে দু'শ বছর। এই দু'শ বছরের ইতিহাস বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র আর যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। কোন পরাক্রমশালী শাসকের আবির্ভাব হলে তিনি তাঁর সমস্ত শত্রু নিপাত করে নিজের শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে শুরু হতো যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভ্রাতৃ রক্তে রঞ্জিত হতো বঙ্গের শ্যামল প্রান্তর, দেশের বুকে নেমে আসতো অরাজকতা, হত্যা ও লুটতরাজ, শক্তির হতো জয়, রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা আসতো শক্তিধরের হাতে। এরপর কিছু দিনের জন্যে দেশের বুকে নেমে আসতো শান্তি-শৃঙ্খলা। দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো কিছু দিনের জন্যে। কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর দেশের বুকে আবার নেমে আসতো অরাজকতা। সেই একই ধারার পুনরাবৃত্তি চলতো। এভাবে আফগান শাসনের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে। আফগান শাসকরা ছিলো যোদ্ধা। চূড়ান্ত যুদ্ধ না করে তাঁরা বিজয়ী মোঘলদের কাছে রাজ্য ছেড়ে দেননি। মহামতি শেরশাহের নেতৃত্বে তারা একবার শক্তিশালী হয়ে শুধু বঙ্গদেশই নয়, গোটা ভারত সাম্রাজ্য মোঘলদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো। তাঁর ত্রিশ বছর শাসনের পর আবার সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনী বঙ্গদেশে আফগানদের শেষ আশাটুকুও চূর্ণ করে দেয়।

এই সময়ে সোনারগাঁও সমৃদ্ধির শীর্ষে উপনীত হয়েছিলো।

সে সময়ে বিজয়ী মুসলমানদের অবদান অত্যুৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্রের খ্যাতি বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়েছিলো। অবশ্যি সব মিলিয়ে দেখতে গেলে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি অরাজকতা এবং ভাগ্যান্বেষী যাযাবর পর্তুগীজদের সাহায্যপুষ্ট মগ, আরাকানী ও জলদস্যুদের দ্বারা পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এদেশের সমৃদ্ধি নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এদেশের মাটি চিরকালই উর্বর। শষ্য-শ্যামলা বঙ্গের কৃষক সম্প্রদায়ের চিরকালই গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু ও তাদের পুকুরে ছিলো অঢেল মাছ। সুখ-সমৃদ্ধিতে সবারই অন্তর ছিলো পরিপূর্ণ। তাই অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণে এদেশবাসীর যেটুকু ক্ষতি হয়েছে, প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে তা পূরণ করে দিয়েছে। বস্তুতঃ বঙ্গদেশে মোঘল বাদশাহী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই সোনার গাঁওয়ের সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।

এরপর এলেন এক নতুন শাসক। কতকটা নিজেকে চিরস্মরণীয় করে রাখার অভিলাষে আর কতকটা প্রয়োজনের তাগিদে। নতুন রাজধানী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তিনি। আবার পুরনো রাজধানী পরিত্যাক্ত হলো। নিঃশেষ হয়ে গেলো সেখানকার সকল সম্পদ, ঐশ্বর্য আর গৌরব। পুরনো রাজধানীর বিশ মাইল দূরে বুড়িগঙ্গার তীরে প্রতিষ্ঠিত হলো নয়া রাজধানী। গড়ে উঠতে লাগলো ঢাকা নগরী। পরিত্যাক্ত রাজধানীর সৌধমালার অঙ্গ থেকে খুলে নেয়া ইট-পাথর দিয়ে তৈরী হতে লাগলো নয়া রাজধানীর সৌধমালা-সুরম্য অট্টালিকাসমূহ। সুবেদার ইসলাম খাঁর পরিকল্পিত বঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরী এমনিভাবে গড়ে উঠলো।

রাজধানী প্রতিষ্ঠার এক'শ বছরকে ঢাকার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ-সময় অনেক পরাক্রান্ত ও মহানুভব সুবেদার পর্যায়ক্রমে শাসন-ক্ষমতা নিয়ে এদেশে আসেন। তাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছেন, নতুন রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা সুবেদার শেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ। ১৬০৮ সালে ৩৮ বছর বয়সে তিনি ঢাকায় আগমন করেন। তিনি ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের একান্ত বিশ্বাস ভাজন মন্ত্রী ও বন্ধু। ছোট বেলায় তাঁরা ছিলেন খেলার সাথী। তিনি আফগান শক্তিকে নির্মূল করে দেন। তারপর আসে ইব্রাহীম খাঁর কথা। শৌর্যে-বীর্যে পরম পরাক্রমশালী ইব্রাহীম খাঁ বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেন। শুধু সমর-বিদ্যায়ই নয়, সুকুমার শিল্প ও বাণিজ্যেরও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।

তারপর সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালেও এদেশবাসী খুবই সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করেন। সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে মুসলমান অধিবাসীরা শিল্পকলায় ও

স্থাপত্যে চরম উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেন। স্থাপত্যকলার পৃষ্ঠপোষকরূপে সম্রাটের খ্যাতি ছিলো জগৎজোড়া, তারই অক্ষয় কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে সম্রাটের প্রিয়তমা মহির্ষী মমতাজ মহলের সমাধির উপর নির্মিত তাজমহল। এ সময় থেকেই ইংরেজ বণিকরা ভারতে আসে বাণিজ্য করতে। নানা কারণে সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যুর পর মোঘল সাম্রাজ্যের শিথিলতা আসে। এই শিথিলতা প্রকট হয় শাহ সুজার আমলে।

সম্রাট শাহজাহানের জীবিতকালে শাহ সুজা বঙ্গদেশের সুবেদার নিযুক্ত হন। শাহজাদা সুজা ঢাকায় অবস্থানকালেই প্রেমে পড়েন সোনাই বিবির। একদিন কিমতি বজরায় চড়ে বাংলাদেশের শান্ত সমাহিত নদী তীরবর্তী গ্রামীণ সবুজের খেলা, ময়ুরপঙ্খী বজরা আর রং বেরং-এর পালতোলা কিস্তির পাশের বজরায় খিড়কী খুলে উঁকি দিচ্ছিলো অপরূপ রূপ লাবণ্য বেহেস্তের হুরের মত এক অনিন্দ্য সুন্দরী ষোড়ষী যুবতী। শাহাজাদা চমকে উঠলেন, রূপের শরাঘাতে শাহাজাদার দিল জখমী হলো। কে সেই যুবতী। তাকে যে তার চাই-ই। সে যেই হোক না কেন তাকে যে কোন মূল্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবেন। ডাক পড়লো আসফ খানের উপর, খোজ নেয়ার আদেশ হলো তার উপর। বিশ্বস্ত গোলামের মত সব খবর এনে দিলো শাহাজাদা সুজাকে। এ চাঁদের আলো অন্য কোথাকার নয়। ঢাকার অতি সম্মানিত নবাব আমীর আলির কন্যার।

ওদিকে আগ্রায় রয়েছে প্রথমা পত্নী নবাব আজম খানের কন্যা পরিবানু। শাহাজাদা ভাবনায় পড়লেন, শেষ পর্যন্ত রূপের জয় হলো। রূপের কাছে শাহান শাহ্‌র অসিয়েত ফরমান হেরে গেলো। ছিড়ে গেলো প্রথমা পত্নীর ভালবাসার জোর। শাহাজাদা বিয়ের পয়গাম পাঠালেন নবাব আমীর আলীর বাড়ীতে। আমীর আলী মহাখুশী। মেয়ে শাহী মহলে প্রধানা হবেন, এর চেয়ে আর কি সুখ হতে পারে? কিন্তু সোনাইর মা মেয়ের মন জানতেন, তাই তিনি সম্মত হতে পারলেন না তবে নবাবের হুকুমের বিরুদ্ধেও যেতে পারলেন না। ওদিকে সোনাই ছিলো মসনদে আলী ঈসা খাঁর প্রো-পুত্র মনোয়ার খানের প্রেমিকা। শুরু হলো শাহসুজা আর মনোয়ার খানের সঙ্গে প্রেম নিয়ে দ্বন্দ্ব। ভীষণ দ্বন্দ্ব। সে আরেক কাহিনী। এ কাহিনী বর্ণনা হয়েছে মনোয়ার খাঁ বাজার সড়ক প্রসঙ্গে আলোচনায়।

কোন এক অজ্ঞাত কারণে সুবেদার সুজা ঢাকা থেকে রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তর করেন এবং সেখানে এক সুরম্য প্রাসাদ তৈরি করে পরম বিলাসিতার সাথে কালাতিপাত করতে থাকেন। গঙ্গাতীরবর্তী রাজমহলের পূর্বনাম ছিলো 'আগমহল' ১৫৯২ সাল পর্যন্তও এনাম ছিলো, সম্রাট আকবরের রাজপুত সেনাধ্যক্ষ মান সিংহ

নাম পাল্টে রেখে ছিলেন রাজ মহল। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই এক নির্মম পরিহাস, যে ঢাকা নগরীকে শাহ্ সুজা একদিন পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, অতি দীনাবস্থায় তাঁকে সেই ঢাকায় প্রবেশ করতে হয় আশ্রয়লাভের উদ্দেশ্যে। সেদিন কেউ আসেনি তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে, আসেনি শাহজাদার প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করতে। সম্রাট বার্ধক্য-দশায় উপনীত হলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সিংহাসন দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বঙ্গদেশ শাহ্ সুজার নিজ দখলে থাকায় তিনি শক্তি পরীক্ষায় অনেকটা আশাবাদী ছিলেন। তাই এই সংগ্রামে তিনিই প্রথম অবতীর্ণ হন। কিন্তু ইতিমধ্যেই সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র আওরঙ্গজেব দিল্লী অধিকার করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তারপর আওরঙ্গজেব এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুজার মোকাবিলা করার জন্য বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। এই আক্রমনে শাহ্ সুজা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে টোণ্ডা দূর্গে আশ্রয় নেন। সেখানেও পরাভূত হয়ে পরিবার পরিজনসহ মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত সহচর নিয়ে তিনি এক দ্রুতগামী নৌকায় চড়ে ঢাকা চলে আসেন। যখন দেশী-নৌকা থেকে তিনি নদীর ঘাটে অবতরণ করেন, সাথে সাথে সেখানে একটা ভিড় জমে যায় সত্যি, কিন্তু জনতা নির্বাক, বিস্ফোরিত তাদের দৃষ্টি, তারা দেখতে পায় শাহজাদার চেহারায় পরাজয়ের সুস্পষ্ট গ্লানি। শাহ সুজার বিপদের দিনে যেসব বিশ্বস্ত অনুচর তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আওরঙ্গজেবের তণয় মুহম্মদ। টোণ্ডা দূর্গে যখন আওরঙ্গজেবের সাথে শাহ সুজার যুদ্ধ চলছিলো, সেই চরম বিপদের দিনে শাহ সুজার কন্যার সাথে আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহম্মদের বিয়ে হয়। ইতিপূর্বেই তাদের বাগদান হয়েছিলো– এসম্পর্কে একটা লম্বা কাহিনী রয়েছে। প্রাণপ্রিয় পুত্র মুহম্মদের নামে সম্রাট আওরঙ্গজেব কৌশল অবলম্বন করে একটা পত্র প্রেরণ করেন। জামাতার প্রতি শাহ সুজার মনে গভীর অবিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারে– এমনিভাবে লেখা হয়েছিলো পত্রটি। এমতাবস্থায় সেই ভ্রাতৃযুদ্ধের হানাহানির সময় শাহ সুজা সেদিন যে মহানুভবতার পরিচয় দেন তা অপূর্ব। কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিতে গিয়ে তিনি বলেনঃ সুজার সম্পদ ভাণ্ডার তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিলাম। সেখান থেকে তোমাদের যা খুশি-যতখুশি নিয়ে যাও। তারপর আমার দৃষ্টি থেকে দূরে চলে যাও। এতদিন যাকে পুত্রবৎ জ্ঞান করেছি, তাকে যেন শত্রু বলে মনে করতে বাধ্য না হই। মুহম্মদ অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। বহু শপথ উচ্চারণ করলেন, কিন্তু শাহ সুজা অটল রইলেন। নিজে এসে নদীর ঘাটে প্রাণপ্রিয় কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিলেন নিজের বজরায়। জামাতা মুহম্মদ তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত-সুজার

মনে এরূপ সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁকে রাজোচিত মর্যাদার সাথে বিদায় করে দিলেন। সে যুগে এ ধরনের মহত্ত্ব ও ঔদার্যের দৃষ্টান্ত বিরল। এই মহত্ত্ব ও ঔদার্যের জন্যেই তিনি এমন কতিপয় সহচর ও বন্ধু লাভ করেছিলেন, যাঁরা এই হতভাগ্য শাহজাদাকে কখনও পরিত্যাগ করেননি এবং তাঁরা শেষ পর্যন্ত শাহ সুজাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে গেছেন।

পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপদস্থ সুবেদার ঢাকায় এসেও শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। তিনি দেখলেন বাংলার সুবেদার রশিদ খাঁ বিশ্বাস ঘাতকতা করে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পক্ষে বড় কাটারার মাথার উপর বিজয় নিশান উড়িয়ে দিয়েছেন। অপর দিকে মীরজুমলার বিপুল বাহিনীর আগমন-বার্তা পেয়ে সুজা বুঝতে পারলেন, এর মোকাবিলা করা তাঁর সাধ্যের অতীত। অবশেষে পরিবারের সকলকে নিয়ে পলাতকের বেশে অবশিষ্ট ধন-দৌলতসহ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে নগরীর পূর্ব তোরণ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। সাথে চললো একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সেনাদল। নদী পার হয়ে তিনি ত্রিপুরার গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেলেন। অশেষ দুঃখ-ক্লেশ আর দুঃসাহসিক অভিযাত্রার পর আরাকানীদের হাতে হতভাগ্য সুলতান নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর অবশ্য বঙ্গদেশে মুসলমান শাসকবর্গের শক্তি বৃদ্ধি পায়। মনে পড়ে বিখ্যাত আসাম অভিযানকারী প্রবল পরাক্রমশালী মীরজুমলার কথা। যার রাজ্য জয়ের উচ্চাকাঙ্খা, অপরিসীম রণকুশলতা এবং অপ্রতিহত শাসন-ক্ষমতা সম্রাট আওরঙ্গজেবের মনেও ভীতির সঞ্চার করেছিলো।

মীরজুমলা ছিলেন ইরানের অধিবাসী। পরবর্তীকালে শাহজাদা সুজাকে সম্রাটের আদেশে বঙ্গদেশ থেকে বিতাড়িত করার পর তিনি এখানকার সুবেদার নিযুক্ত হন। মীরজুমলার দূরদর্শিতা ছিলো অসাধারণ। সম্রাটের চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেবই যে সবচেয়ে বেশী দক্ষতা ও যোগ্যতার অধিকারী তা বুঝতে পেরে মীরজুমলা প্রথম থেকেই তাঁর সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়িত করেন। আওরঙ্গজেবের আমলেই তিনি উজির নিযুক্ত হন এবং আমির-উল-উমরা খেতাবে ভূষিত হন। ঢাকায় অবস্থানকালেই তিনি বঙ্গদেশের সুবেদারী পদ লাভের সংবাদ পান এবং সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদা সুজা কর্তৃক রাজমহলে স্থানান্তরিত রাজধানী পুনরায় ঢাকায় সরিয়ে নিয়ে আসেন। সুবেদার মীরজুমলা বড় কাটরাকে স্বীয় বাসভবন রূপে মনোনীত করেছিলেন। এর তোরণ দ্বারে দুটি প্রকাণ্ড কামান সজ্জিত রাখতেন।

মীরজুমলার তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলের অধিকাংশ সময় কুচবিহার ও আসামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ অতিবাহিত হয়। সৈনিক জীবনের প্রতি তাঁর ছিলো

স্বাভাবিক আসক্তি। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করতেই তিনি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতেন। বঙ্গদেশে সুজার সৈন্যবাহিনী আওরঙ্গজেবের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সুযোগে কুচবিহারের রাজা ভীম নারায়ণ মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত কামরূপ জেলা অধিকার করে নিয়েছিলেন। এক্ষণে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মীরজুমলা ভীম নারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অজুহাত পেয়ে যান। তাঁর তত্ত্বাবধানে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠলো। ঢাকার উত্তর দিকের ফটকের বাইরে মাইলের পর মাইল ধরে সৈন্যদের বিরাট ছাউনী পড়লো এবং নদীতেও গড়ে উঠলো এক বিরাট নৌবহর। রসদ ও সমরোপকরণ বোঝাই করে নদীর ডান তীর দিয়ে মীরজুমলা তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন। এই দিক দিয়ে অভিযান পরিচালনার মত কোন রাস্তা ছিলো না। ফলে প্রায়ই তীরবর্তী গহীন অরণ্য কেটে সাফ করার প্রয়োজন হয়েছিলো। মীরজুমলা স্বয়ং সৈন্যদের সাথে নিজ হাতে কুঠার দিয়ে জঙ্গল কেটে সাফ করেছিলেন। মোঘল অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ অভিযানে সেনাপতির দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কর্মতৎপরতা অবলোকন করে বিপুল বিক্রমে জঙ্গল পরিষ্কার করে অগ্রসর হতে লাগল। এপথ যেমন বিপদসঙ্কুল, তেমনি দীর্ঘ। সুদীর্ঘ তিনমাস ধরে এইরূপ কষ্ট করে তাদের অগ্রসর হতে হয়েছিলো।

রাজা ভীম নারায়ণ কল্পনাও করতে পারেননি যে দূর্ভের্দ অরণ্য-বেষ্টিত এরূপ নিরাপদ অঞ্চলে কোনদিন শত্রু-সেনারা হানা দিতে পারে। মোঘল-সেনাদের আক্রমন সংবাদ পেয়ে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। কোন উপায়ন্তর না দেখে তিনি রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করলেন। মীরজুমলা বিজয়ীর বেশে কুচবিহার প্রবেশ করলেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতি শ্রদ্ধার নির্দর্শনস্বরূপ এর নাম রাখলেন আলমগীর নগর। এই বিজিত রাজ্যটিতে তখন হিন্দুদের প্রবল প্রভাব বিদ্যমান ছিলো। শহরের মধ্যভাগে সর্ব প্রধান মন্দিরে ছিলো নারায়ণ বিগ্রহ। বিজয়ী মীরজুমলা মন্দিরের কাছে এসে দাড়ালেন। ধীরে ধীরে গোটা সেনাবাহিনী এসে তাঁর সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। সমগ্র জনতা রুদ্ধশ্বাসে এসব দেখতে লাগলো। মীরজুমলা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেব-মূর্তিটিকে বের করে এনে সকলের সম্মুখে ওটিকে ভেঙ্গে ফেললেন। তখন নামাজের সময়। মন্দিরের ছাদে আরোহণ করে তিনি নিজেই আজান দিলেন। সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে কুচবিহার রাজ্যের প্রধান মন্দির থেকে এই প্রথম আজান ধ্বনি উচ্চারিত হলো। এরপর বিজয় পতাকা উড্ডীন করার জন্যে মীরজুমলা আসাম অভিযানে রওয়ানা হলেন। সে সময় আসাম ছিলো ভয়াল অরণ্যাচ্ছাদিত বন্ধুর বিপদসংকুল দেশ। পথ-ঘাট প্রায় ছিলো না বললেই চলে। পদে

পদে ছিলো ঘোর বিপদের আশঙ্কা। কিন্তু মীরজুমলা সেসব বাধা অতিক্রম করে এগুতে লাগলেন সম্মুখের দিকে।

পথিমধ্যে এক দূর্গে অসমীয় রাজা পূর্ণ শক্তি সংগ্রহ করছিলেন। কিন্তু মীরজুমলার আক্রমণের মুখে তিনি টিকতে পারলেন না। কামানের গোলায় দূর্গটি পর্যন্ত ধরাশায়ী হয়ে গেলো। রাজা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেন। মীরজুমলা দৃপ্ত-পদে দূর্গে প্রবেশ করলেন এবং এই স্থানের নামকরণ করলেন 'আতাউল্লাহ' বা আল্লাহর দান। কিন্তু শীগগীর গ্রীষ্মের অবসান হলো। বর্ষা এলো অঝোর ধারায়। মীরজুমলাকে এক বিরাট শিবির স্থাপন করে বর্ষা অবসান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। তাঁর এই শিবির সাত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। বিজয় সাফল্যে বিভ্রান্ত হয়ে মীরজুমলা এখান থেকেই তাঁর ঐতিহাসিক পত্র সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। পত্রে তিনি গর্বভরে লিখেছিলেন যে তিনি চীন অভিযানের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অভিযানে মোঘল পতাকা সম্রাটের তাতারী আত্মীয়দের পতাকার সাথে মিলিত হবে-এ সম্ভাবনা তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। হয়তো আল্লাহ তাঁর এই ঔদ্ধত্য পছন্দ করলেন না। বর্ষায় নদীনালা ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো। নদীতে প্রলয়ঙ্করী প্লাবনের সৃষ্টি হলো। দেশের সমস্ত মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর প্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে গেলো। মানুষ ও পশুর খাদ্য দূষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলো। মোঘল সৈন্যরা এই ভয়াবহ বন্যার মোকাবিলা করার অভ্যস্ত ছিলো না। এই সুযোগে অসমীয় রাজা শক্তি সঞ্চয় করে চতুর্দিক থেকে মোঘল সৈন্যদের বার বার আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। ইতিমধ্যে বন্যার ফলে মোঘল সেনাবাহিনীর মধ্যে মহামারী আরম্ভ হয়ে গেলো এবং বহু সৈন্য মহামারীর কবলে পড়লো এমন কি স্বয়ং মীরজুমলাও মহামারীর কবল থেকে রেহাই পেলেন না।

মীরজুমলার সেনাবাহিনী শত্রু-সৈন্যদের কাছে পরাজিত না হলেও প্রকৃতির কাছে পরাভব স্বীকার করে অভিযান স্থগিত রেখে পিছু হটতে বাধ্য হলেন। ব্যর্থকাম, ভগ্নমনোরথ ও রোগে জর্জরিত মীরজুমলা দ্রুত ঢাকা অভিমুখে ধাবিত হলেন। কিন্তু রাজধানীতে ফিরে আসা তাঁর ভাগ্যে ছিলো না। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যবাহিনীর অকৃত্রিম ভালবাসা, গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আনুগত্য এবং জনগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা নিয়ে ঢাকার অনতিদূরে খিদিরপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইস্পাহানের কাছে তাঁর জন্ম স্থানে তাকে দাফন করা হয়। সেখানকার লোক তাঁকে খান খানান নামে অবিহিত করতো।

মোঘল দরবারে মীরজুমলাকে খুবই শক্তিশালী সুবেদার বলে মনে করা হতো।

লোকে বলতো যে, যেদিন থেকে মীরজুমলা ইহধাম ত্যাগ করে যান সেদিন থেকেই আওরঙ্গজেব বঙ্গদেশের সম্রাট হতে পেরেছিলেন। মীরজুমলার মৃত্যুর সংবাদ যখন তাঁর পুত্র সম্রাটকে জানাতে আসেন তখন সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি হারিয়েছো তোমার স্নেহময় পিতাকে আর আমি হারালাম আমার জীবনের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক বন্ধুকে'।

ইতিপূর্বে সুবেদার মীরজুমলা ঢাকা নগরীকে মগ ও জল দস্যুদের আক্রমন থেকে রক্ষার মানসে ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ এলাকাধীন হাজীগঞ্জ ও ইদ্রাকপুরে দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন। ঢাকা নগরীকে সুরক্ষিত করতে হলে ঐ দুটি জায়গা থেকেই শত্রুপক্ষের গতির প্রতিরোধ আবশ্যক মনে করে। অনেক কাল পরে ঢাকার আহসান মঞ্জিলের নবাবদের বাগান বাড়ী নির্মিত হয় সেখানে। খাজা হাফিজুল্লার নামানুসারে বাগান বাড়ীটির নামকরণ করা হয় হাফেজ মঞ্জিল। সৈন্য চলাচলের সুবিধার্থে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে পাগলার পুল নামে কথিত পুলটিও মীরজুমলা তৈরী করেছিলেন। এ পুল তৈরীর ব্যাপারে বিশপ হেবার স্থানীয় নৌকার মাঝিগণ হতে যে প্রবাদ বাক্য পরিশ্রুত হয়েছিলেন, তাতে জানা যায় উক্ত পুল ফরাসী প্রকৌশলী দ্বারা নির্মিত হয়েছিলো।

কিন্তু এদের সবার উপর যাঁর নাম, তিনি হচ্ছেন সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের ভ্রাতা আমির উল-উমারা নওয়াব শায়েস্তা খাঁ। এই ঢাকা নগরীর ইতিহাসে তাঁর নাম চির অক্ষয় হয়ে আছে। তিনি শিল্প সাহিত্য ও স্থাপত্যে ঢাকা নগরীকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন। তাঁর শাসনামলে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক কম ছিলো– এমন কি টাকায় আটমন চাল পাওয়া যেতো। তাঁর আমলে প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ছিলো অপরিসীম। কিন্তু আলোর ওপারে অন্ধকার, তেমনি সুখের পর দুঃখ আসে। ঢাকার জীবনে শায়েস্তা খাঁর আমলের সুখও চিরস্থায়ী হয়নি। তার অবসান ঘটে একেবারেই আকস্মিকভাবে।

একজন সুবেদারের শাসনামলে এই নগরী যেমন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলো, তেমনি অন্য এক সুবেদারের শাসনামলে তার পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুরশিদ কুলি খাঁ তাঁর রাজধানী ঢাকা থেকে মুরশিদাবাদে স্থানান্তর করেন। সুবেদার, তাঁর দরবার ও পরিষদ পরিত্যাক্ত ঢাকার মর্যাদা ম্লান হয়ে গেলো। অস্তমিত হলো তাঁর সৌভাগ্য সূর্য। সুবেদারের স্থানে বহাল হন নায়েব নাজিম। ফলে ঢাকা নগরীর সম্ভ্রম ও গুরুত্ব আর তেমন থাকে না। বঙ্গের

বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে কদাচিৎ ঢাকার নাম উল্লেখ করা হতো। পরবর্তী পঞ্চাশ বছর এই নগরীকে নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। যশোবন্ত রায়ের শাসনামলে একবার এর সৌভাগ্য-সূর্য উঁকি দিয়েছিলো। কিন্তু মুরাদ আলীর আক্রমণে আবার বিব্রত হয়ে উঠেছিলো। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আজীবন যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি দূর্বল হয়ে তা দ্রুতগতিতে ভেঙ্গে পড়েছিলো। কেন্দ্রীয় সরকারের দূর্বলতার সুযোগে এখানকার শাসকবর্গ স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হয়ে ওঠে। তবে প্রদেশবাসীর সৌভাগ্য যে কোন কোন শাসক বেশ জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। মুসলিম সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত, তখন মারাঠাগণ বারবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করে নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগলো। এই সময় বাদশাহী ফরমান অচল হয়ে যাবার উপক্রম হয়ে পড়ে। তখন মুরশিদাবাদের রাজতখতে একজন স্বেচ্ছাচারী বিলাসী নওয়াব সমাসীন। ঠিক এহেন সময়েই নেমে আসে চরম বিপর্যয়।

ইংরেজরা তখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজ বণিকদের একটি ক্ষুদ্র দল কিছুকাল পূর্ব থেকেই বঙ্গদেশে সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য করে আসছিলো। এই সুচতুর বণিক সম্প্রদায় নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নিজেদের কুট বুদ্ধিবলে নিজেদের আসন স্থায়ী করে নেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তারা ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গের পত্তন করে। এই দূর্গের পত্তন যে ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ, হয়ত বণিক সম্প্রদায় সেদিন তা কল্পনাই করতে পারেনি। এরপর রাজনৈতিক শিবিরে দ্রুত উত্থান-পতন শুরু হয়ে যায়। একদিকে ছিন্ন ভিন্ন দূর্বল মোঘল রাজ্য বিরাট সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন, অন্য দিকে মসনদের লোভে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র আর নিজ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফলে স্থানীয় শাসকবর্গও দেশরক্ষায় ব্যর্থ হয়ে পড়েন। এই সুযোগে ইংরেজ বণিকরা তাদের তুলাদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। দিনে দিনে তাদের তৎপরতা বেড়েই যেতে থাকে। অবশেষে তারা এদেশের শাসক হয়ে বসে। ইংরেজরা সাধারণতঃ বেনিয়ার জাত। ব্যবসাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। অথচ এদেশ দখল করার সাথে সাথে ঢাকার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি লোপ পায়। ইহা অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কি! ঢাকার উৎপাদন-শিল্পের অবনতি ঘটার সাথে সাথে অনেক শহরবাসী অন্ন-সংস্থানের আশায় দেশের জেলা শহরগুলোতে এমন কি গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। তারা বসতি স্থাপনের জন্যে বহু জঙ্গল পরিস্কার করে, হিংস্র বন্য পশুদের বিতাড়িত করে, তারপর বিপুল উদ্যমে পরিশ্রম করে জমি আবাদ করে, যুগ

যুগ ধরে পতিত জমিতে সোনার ফসল ফলিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে শুরু করে।

বাদশাহী আমলে এই ঢাকানগরীর উত্থান-পতনই হচ্ছে এর বৈশিষ্ট্য। ঢাকার বুকে মহাকালের মানুষের মিছিল চলেছে যুগ যুগ ধরে আবার কালের করালগ্রাসে ধ্বংসলীলা চলেছে তেমনি সমান গতিতে। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন এদেশে কোন মহৎ স্থাপত্য শিল্পও প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে নি। মানুষের অবিশ্বাস্য বর্বরতা মহাকালের অত্যাচার-অনাচারকেও হার মানিয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের বর্বর হামলায় এখানকার অত্যুৎকৃষ্ট সৌধমালা অবলীলাক্রমে ভূমিসাৎ হয়েছে। আর পুরনো ঐতিহ্যকে বিলীন করে দিয়ে নতুনের অমরত্বলাভের বাসনা লোলুপ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার ফলে শিল্পসমৃদ্ধ নগরী ক্রমান্বয়ে শ্রীহীন হয়েছে–প্রাচীনত্বের গৌরবকে বহুলাংশে হারিয়ে বসেছে। তথাপি বার বার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত জর্জরিত হলেও এই নগরী তার নিজস্ব আকর্ষন হারায়নি। অবশ্য দু'শ বছর ধরে রাহুগ্রস্থ থাকার পর অর্থাৎ ১৯০৬ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে যে প্রদেশ গঠিত হয়েছিলো তার রাজধানী হবার গৌরব লাভ করায় ঢাকায় আবার প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিলো। পুনরুজ্জীবনের আশায় বাদশাহী আমলের ঢাকা নগরী আবার হৃত-গৌরব ফিরে পাবার আশায় বুক বেঁধেছিলো। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে এই নগরী যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যায়।

সাবেক প্রদেশে তৎকালে মুসলমানেরা সংখ্যায় ছিলো এক পঞ্চমাংশ, আর নতুন প্রদেশ গঠনের পর মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ালো এক কোটি আশি লক্ষ এবং হিন্দুর সংখ্যা হলো এক কোটি বিশ লক্ষ অর্থাৎ মুসলমানরা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রভুত উপকার সাধিত হবে বলে বঙ্গভঙ্গের খবরে পূর্ববঙ্গের প্রায় সকল অঞ্চলের মুসলমানরা প্রচুর আনন্দলাভ করেছিলো। কিন্তু দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ও কিছু সংখ্যক মুসলমানের মতে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ছিলো বাঙ্গালী জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাহত করা, কেননা বাঙ্গালী জাতি ভারত এর স্বাধীনতা আন্দোলনে সব সময়েই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছিলো। তাই তারা বেঁকে বসলো। ব্যাপক প্রচার শুরু করলো বঙ্গভঙ্গ রদের জন্যে। তারা কুটনীতিতে তখন সেরা, জ্ঞানগরিমায়ও অগ্রগামী–তাছাড়া সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমগুলো তাদের অর্থানুকুল্যে সৃষ্টি হওয়ায় তাদের প্রচারাভিযান খুবই বাস্তবভিত্তিক ও সংগত বলে প্রতীয়মান হয়েছিলো

তৎকালীন শাসক-গোষ্ঠীর কাছে। শেষ পর্যন্ত তারাই হলো বিজয়ী।

এমনিভাবে শাসক-গোষ্ঠীর অবহেলায় কালের করাল-স্পর্শে আড়াই শতাব্দীকাল ধরে ঢাকা নগরী তার ঐতিহ্য হারিয়ে জীর্ণশীর্ণ ও নিস্প্রভ হয়ে থাকার পর ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট বাংলার মুসলমানদের বহু আকাঙ্খিত পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঢাকা আবার পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয়। নতুন যুগসন্ধিক্ষণে বহু ক্ষেত্রে উন্নতি হয়, আর লোক সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে তার আয়তনও বাড়তে থাকে। তৈরি হয় আধুনিক ইমারত। দেহের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে ঠিকই, কিন্তু তাতে প্রাণের স্পন্দন ছিলো না। শাসক-গোষ্ঠী এ প্রদেশটিকে একটা কলোনী হিসেবে মনে করতো আর মনে করতো পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি পণ্যের একটা বাজার। তাই তারা ছলে-বলে-কৌশলে ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে মাতিয়ে রাখতে চাইলো এখানকার স্বাধীনচেতা মানুষকে। দমন মূলক সামরিক আইন দিয়ে দাবিয়ে রাখতে চাইলো গোটা জাতিকে। ফলে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠলো অসন্তোষ। সেই অসন্তোষ এখানকার মানুষের হৃদয়ে জ্বেলে দিলো আগুন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পশ্চিমা শাসকচক্র চরম ব্যবস্থা হিসেবে বাঙ্গালীর উপর সশস্ত্র আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞের তাণ্ডবলীলা শুরু করলো– সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়লো, যার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলো। আর সেই সাথে ঢাকা স্বাধীন পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের রাজধানী হওয়ার মর্যাদা পেলো।

ঢাকার নামকরণ

ঢাকা নগরীর নামকরণ সম্পর্কে বহু মতদ্বৈততা রয়েছে। এ-নগরীর নাম কেন ঢাকা হলো, কোথা থেকে এলো এ-নাম, কে রাখলো এই অদ্ভুত নাম-তার হদিস পাওয়া মুশকিল। এ নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা হয়েছে, কিন্তু এই নামকরণের রহস্যের সঠিক উদঘাটন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। একটা প্রচলিত কাহিনীতে দেখা যায়, প্রাক মুসলিম যুগ থেকে এই নগরী ঢাকা নাম বহন করে আসছে। কিন্তু এখানেও অনেক বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। ইসলাম খাঁর আগমনের পূর্বকালের ইতিহাস এতই কুয়াশাচ্ছন্ন যে এখানে কোন শহর বা কোন পল্লী ছিলো কি-না তা বলা দুরূহ। ইউরোপীয় পর্যটক ও মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা ভ্রমণ করে যে নগরটিকে 'বেনগলা' বলে উল্লেখ করেছেন, এখানে সেটিই অবস্থিত ছিলো বলে যথেষ্ট গবেষণা করা হয়েছে। যুক্তি-তর্কও খাড়া করা হয়েছে প্রচুর।

কথিত আছে, প্রাক মোঘল আমলে এখানে বায়ান্ন বাজার ও তেপান্ন গলি বিশিষ্ট একটি শহর ছিলো। এই শহরটিই নাকি 'বায়ান্ন বাজার তেপান্ন গলি' নামে খ্যাত হয়েছিলো। হয়ত এই বায়ান্ন বাজারের একটি বাজারের নামই ছিলো 'বেনগলা'। 'বেনগলা'র পূর্ব ইতিহাস রহস্যাবৃত থাকলেও ষোড়শ শতাব্দীতে পরিব্রাজক মেথল্ড রাজমহল ও বেনগলাকে সুদৃশ্য নগরী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর কথায় ঢাকার কোন উল্লেখ নেই। বেনগলা বা বায়ান্ন বাজার ও তেপান্ন গলি যদি এক না হয়, তবে এই শহরটি কোথায় অবস্থিত ছিলো তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। নদীর উত্তাল তরঙ্গে এর বিলুপ্তি ঘটলেও এ সম্পর্কে কিছু কিছু জনশ্রুতি বা কল্প-কাহিনীও প্রচলিত থাকতো। কিন্তু সে রকম কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। যা হোক, ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তারই কিছু বর্ণনা

করা যাক।

হিন্দুদের কল্প-কাহিনীতে ব্রহ্মপুত্র নদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। একটা কাহিনীতে দেখা যায় তিনি আদিদেব ব্রহ্মার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিক্রমপুরের সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আদিশুরের পুত্র ছিলেন বল্লান সেন। আদিশুরের পত্নীদের মধ্যে বল্লান সেনের মাকেই তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। এর পিছনে নাকি ছিলো দৈব নির্দেশ। রাজা তা বুঝতে পারেন নি। তিনি এক সময় ক্রুদ্ধ হয়ে রানীকে রাজপ্রাসাদ থেকে বহিস্কার করে দেন। রানী তখন গর্ভবতী, বল্লান সেনই তার গর্ভে। রানী রাজার বহিস্কারাদেশে উপায়ান্তর না দেখে ব্রহ্মপুত্রের পানিতে ঝাঁপ দেন। কিন্তু এই পূণ্য সলিলা নদ তাকে বুকে তুলে নিয়ে ত্বরিত গতিতে এবং নিরাপদে অপর পারে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে দেবী দূর্গার কাছে সঁপে দেয়। নিকটেই বুড়ীঙ্গার তীরে ছিলো তার গৃহ। সেখানে নদীর কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং দেবী দূর্গার রক্ষণাবেক্ষণে নবজাতকটি বড় হতে থাকে। বনে লালিত হয়েছিলেন বলে বল্লালের মাতা তার নাম রেখেছিলেন বন লাল সেন, পরবর্তিতে বল্লাল সেন নামকরণ করা হয়। সেখানে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং জ্ঞান-গরিমায় শৌর্যে-বীর্যে অত্যাধিক বুৎপত্তি লাভ করে। একদিন সে বেড়াতে বেড়াতে তার রক্ষাকর্ত্রী দূর্গার মূতিটিকে জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় দেখতে পায়। পরম শ্রদ্ধাভরে সে সেখানে "ঢাকা ঈশ্বরী" বা লুক্কায়িত দেবীর মন্দির নির্মাণ করে। সেই থেকে মন্দিরের নাম হয় "ঢাকেশ্বরী" এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরের আশে পাশে ঢাকা নাম ধরে ধীরে ধীরে একটা জনপদ গড়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে সেটাই রূপান্তরিত হয় ঢাকা শহরে।

এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট শ্রী জগদীশ চন্দ্র সরকার বলেছেন, হিন্দু রাজার রাজধানী বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও-এর উপর সর্তক দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে এস্থানটি ঢেক্কা বা ঢাক্কা তথা ডাক চৌকি হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে এটা ঢাকা নামে অভিহিত হয়েছে। নানা মুনির নানা মত। আর এক কাহিনীতে বলা হয়েছে যে নদী তীরে প্রাচীন কাল থেকে একটি ঢাক বৃক্ষ ছিল। সে গাছের নাম থেকেই শহরটির নাম ঢাকা হয়েছে।

অপর এক কাহিনী অনুযায়ী হিন্দুদের বাদ্যযন্ত্র ঢাক থেকে ঢাকার উৎপত্তি। কথিত আছে এই প্রদেশের প্রথম মোঘল শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ যখন নয়া রাজধানীর স্থান নির্বাচনের জন্যে বর্তমান ইসলামপুর এলাকায় বজরা থেকে অবতরণ করেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, সেখানে হিন্দুরা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজা-অর্চনা করছে।

ঢাকের শব্দে ইসলাম খাঁ অবাক হন। তিনি বাদকদের খুব জোরে ঢাক-ঢোল বাজাবার নির্দেশ দেন এবং তিন দিকে তিনজনকে প্রেরণ করেন। এক দিকের সীমানা থাকলো নদী। যে তিনজন তিন দিকে গেলো তাদেরকে যেখানে গিয়ে আর ঢাকের শব্দ শোনা যাবে না, সেখানে তাদের সীমান্ত পতাকা স্থাপন করতে বলা হলো।

পতাকা স্থাপনের পর ইসলাম খাঁর নির্দেশে এই সব স্থানে সীমান্ত স্তম্ভ নির্মাণ করা হলো। সম্ভবত এমনও হতে পারে যে ইসলাম খাঁ যে সীমান্ত চিহ্নিত করনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারই মধ্যে অবস্থিত বাজারগুলোর কোন একটি ঢাকা নামে পরিচিত ছিলো। আর এসব বাজার নিয়ে যে এখানে একটি শহর স্থাপিত হয়েছিলো তাও সর্বজন স্বীকৃত। এমনও হতে পারে কতকগুলো পল্লীর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় সেটির নামে কিংবা ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নামে পল্লীটির নাম ঢাকা হয়েছিলো অথবা মন্দিরের খ্যাতি কিংবা ঢাকগাছ অথবা ইসলাম খাঁর প্রথম আগমন প্রাক্কালে ঢাকের বাদ্য আকাশ-বাতাস মন্দ্রিত করার দরুণই এই রাজধানী শহরটির নাম হয়েছিলো ঢাকা। অনেকেই ইহা ধারণা করে থাকেন।

অবশ্য এখানে রাজধানী স্থাপন ও শহরের সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি ঘটিয়ে ইসলাম খাঁ ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে সম্রাটের প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ রাজধানীর সরকারী নাম দেন জাহাঙ্গীর নগর। মুসলমান ঐতিহাসিকদের লিখিত গ্রন্থে এই নগর জাহাঙ্গীর নগর নামেই অভিহিত হয়েছে। তবে ইসলাম খাঁর আগমনের সাথে সাথে কিংবা তার আগমনের পূর্বে এখানে শহর গড়ে উঠেছিলো কিনা সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। ঢাকা শহরের অভ্যুদয় সম্পর্কে অস্পষ্ট ও ধোয়াটে ধরনের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই সুস্পষ্ট ইতিহাস এ যাবৎ জানা যায় নি।

বল্লাল সেন যে ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন, বিখ্যাত রাজপুত সেনানায়ক মানসিংহ এই শহরে অবস্থান কালে সেটির নাকি সংস্কার করেছিলেন। মুসলমান আমলে এখানে বহু সংখ্যক মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদের সংখ্যা দেখে বোঝা যায় তৎকালে এ শহরে মুসলমানদের আধিপত্য ছিলো খুবই প্রবল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তাদের কোন ক্ষোভ বা বৈরীভাব ছিলো না। কারণ ইসলাম প্রগতিশীল ধর্ম। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সেনানায়ক মানসিংহ ঢাকার অসংখ্য মসজিদের মাঝে এই মন্দিরটি দেখে বড়ই প্রীত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তবে তৎকালে এরূপ একটি মন্দিরের অস্তিত্ব থাকলেও পরবর্তিকালে এর কোন

চিহ্ন পাওয়া যায় না। বর্তমান ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি যে পুরাকালে নির্মিত হয়েছিলো তার কোন সন্ধান মেলে না। তবে জানা যায় এটির বয়স দু'শ বছরের কিছু অধিক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক হিন্দু এজেন্ট এটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই মন্দিরটিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় ভক্তি ছাড়া আজকের ঢাকেশ্বরী মন্দিরের তেমন কোন আকর্ষণ নেই। তবে একথা সর্বজনস্বীকৃত যে ঢাকা সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের নগরী ছিলো– তার প্রমাণ অগণিত মসজিদ। ধর্মপ্রাণ ইমানদার মুসলমানগণ এই সব মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, দুনিয়ার বুকে যে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে সক্ষম হবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে বেহেশতে সত্তরটি মসজিদ তৈরী করে দেবেন। এই শহরে অবস্থিত প্রাচীন স্মৃতি বহনকারী ইমারতগুলোর মধ্যে নারিন্দা এলাকার বিনাত বিবির মসজিদই সম্ভবত সবচেয়ে পুরনো। ১৪৫৬ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ইসলাম খাঁর আগমনের দেড়শ বছর আগে নাসির উদ্দিন মাহমুদ যখন বাংলার সুলতান, সেই সময় এটি নির্মিত হয়েছিলো। এই ক্ষুদ্র এবং মজবুত ইমারতটির মধ্যে স্থাপত্যশিল্পের তেমন কোন নিদর্শন না থাকলেও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটির সমধিক গুরুত্ব রয়েছে। ইসলাম খাঁর শাসনামলের বহু পূর্ব থেকেই যে এ অঞ্চলে মুসলমানরা বসবাস করতো, এই মসজিদটি তারই স্বাক্ষর বহন করছে। বর্তমানে এটির সংস্কার সাধন করা হয়েছে। তবে বিনাত বিবির এ মসজিদ কেমন করে নির্মিত হয়েছিলো, সেসব আজ স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

অনেক ঐতিহাসিক এবং পর্যটকগণ ঢাকা নগরীকে মসজিদ নগরী বলে উল্লেখ করেছেন। কেহ কেহ পাশ্চাত্যের ভেনিস নগরীর ন্যায় উল্লেখ করেছেন, আবার কেহ পরীর শহর বলেও উল্লেখ করে গেছেন। এভাবেই ঢাকা নগরী বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিতি লাভ করেছে। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে নবাব ইসলাম খাঁ ঢাকা নগরীর গোড়া পত্তন করলেও নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলেই ঢাকা শহরে বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিলো। সে সব অট্টালিকার ধরন বা নির্মাণ কৌশল "শায়েস্তা খানী" রীতি নামে পরিচিত লাভ করেছিলো।

বর্তমান সেণ্ট্রাল জেল ছিলো শহরের কেন্দ্রস্থল। পূর্বে এখানে একটি পুরনো কেল্লা অবস্থিত ছিলো। কালের প্রবাহে তার অবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে যায়। তবুও হয়ত তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতো না, কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্পে এটি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়।

তৎকালে এধরনের বহু মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন বিদ্যমান ছিলো। বহু

উত্থান-পতন ঘটলেও যে সকল প্রাচীন শহর, পুরনো গ্রাম বা মহল্লা বহুদিন পর্যন্ত স্ব স্ব ঐতিহ্যবাহী নাম বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে তন্মধ্যে ঢাকা শহর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই শহরের বিভিন্ন অংশের নাম অদ্যাবধি অনেকাংশে পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই বিদ্যমান রয়েছে।

পুরাতনের পটভূমিকায়

মোঘল শাসনামলের পূর্বে ঢাকা নগরীটি বর্তমানের ন্যায় সমতল ছিলো না। স্থানে স্থানে নালা, ডোবা ও ঝিলের ন্যায় ছিলো। এসব জায়গায় বর্ষার পানি কমে এলে মশা-মাছি, পোকা-মাকড়ের উপদ্রবে ঢাকা শহরে তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠতো। তাছাড়া এসব জায়গায় পানি পচে দুর্গন্ধময় হয়ে উঠতো। ফলে কলেরা, বসন্ত, উদরাময় প্রভৃতি রোগ মহামারী আকারে দেখা দিতো। তখন শহরে যান বাহন ব্যবস্থার প্রসার তেমন ছিলো না। ফলে যাত্রী সাধারণের যেমন অসুবিধা হতো তেমনি আমদানী রফতানীযোগ্য মালপত্র একস্থান থেকে অন্যস্থানে আনা-নেয়া করা ছিলো খুবই দুরূহ।

যানবাহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন কল্পে সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম খাঁ বুড়িগঙ্গা থেকে একটি কৃত্রিম খাল খনন করান। খালটি বাবু বাজার থেকে আরম্ভ করে জিন্দাবাহারের উত্তর দিক হয়ে তাঁতী বাজারের পাশ দিয়ে গোয়াল নগর তৎপর নবাবপুর মৈষণ্ডি ও নারিন্দা রোডের সম্মুখ দিয়ে জালুয়া নগর ঘুরে শরাফতগঞ্জ হয়ে বর্তমান লোহার পুলের নিচ দিয়ে পুনরায় বুড়িগঙ্গায় মিলিত হয়েছে। অবশ্য এ স্থানে ইসলাম খাঁর আগমনের পূর্ব হতে যে একটি খাল ছিলো তা রেনেলের ম্যাপে দেখা যায়। আর এ খালের মাথায় বুড়িগঙ্গার দুধারে পাঠানদের দূর্গ ছিলো যা বেগ মুরাদের কেল্লা নামে অবহিত হতো। ম্যাপে তাও চিহ্নিত রয়েছে।

অপর একটি খাল শহরের মাঝখান তথা তাঁতী বাজার ও মালীটোলার সংযোগ স্থলের কাছ থেকে বংশাল রোড অতিক্রম করে সুরিটোলার পশ্চিম দিক দিয়ে নাজিরা বাজার ও দেওয়ান বাজারের মধ্য দিয়ে নিমতলি হয়ে শাহবাগ ও রমনাগ্রীন বা বাগ-ই-বাদশাহী হয়ে সেগুন বাগিচা পুরনো পল্টন ও মতিঝিল পার হয়ে চলে গেছে।

এদেশ নদীমাতৃক, নৌকাই ছিলো মাল আনা নেয়ার প্রধান বাহন। তাই এ দুটি

খাল খননের ফলে মাল আদান-প্রদানে শহরবাসী যেমন উপকৃত হয়েছিলো, তেমনি শহরের ময়লা পানি নিষ্কাশনের ব্যাপারেও যথেষ্ট সহায়তা হয়েছিলো।

এ খালটি সম্পর্কে এরূপ ধারনা করাও অমূলক হবে না যে বালু নদী হতে বহির্গত হয়ে দোলাই খালটি ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চলে দোলাই নদী হিসেবে প্রবাহিত– যাহা খাল নামে পরিচিত ছিলো। তাহা নবাব ইসলাম খাঁ জনগণের স্বাস্থ্য, চলাচল প্রভৃতির উন্নতি কল্পে আরো কিছু এলাকায় নুতন খাল খনন করেন এবং পুরাতন দোলাই খালটিরও পুনঃ খনন ও সংস্কার করে খালটিকে নৌযান চলাচলে ও মালামাল আনা-নেওয়ার ব্যাপারে সহজতর করেছিলেন। এবং কোন কোন স্থানে পাকা পোক্ত এবং বাঁশ কাঠের সেতু নির্মাণ করে শহরের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগের বিভিন্ন মহল্লার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা করে দিয়েছিলেন। দোলাই খালের নামানুসারে একটি এলাকায় খালের পূর্বপারে যেখানে পণ্য দ্রব্য বেচা-কোন হতো তা দোলাইগঞ্জ নাম ধারণ করে।

১৮৩০ সালে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালটার সাহেব জনগণের চাঁদায় লোহার ঝুলন্ত পুল নির্মাণ করে ঢাকা শহরের সঙ্গে দোলাইগঞ্জের সংযোগ সাধন করেন। ইংরেজ আমলে ১৮৬৪ সালে গভর্মেণ্টের ব্যয়ে খালটি পুনরায় সংস্কার সাধন করা হয়েছিলো। এতে তৎকালীন ২৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিলো বলে জানা যায় এবং ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাস হতে খালে চলাচলকারী জলযানের উপর মাসুল ধার্য্য করা হয়। এ খাল দিয়ে শহরে মাল আনা-নেয়ার ব্যাপারে ময়মনসিংহবাসীদের বেশী সুবিধে হয়েছিলো। দোলাই খালটি খনন করার ফলে শহরটি দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। বাবুবাজার থেকে যে খালটি নবাবপুর অতিক্রম করে (পাক আমলেই এ পর্যন্ত খাল ভরাট করা হয়েছিলো) নারিন্দা এবং শরাফতগঞ্জ হয়ে লোহার পুলের নিচ দিয়ে বয়ে গিয়ে মিল ব্যারাকের কাছে বুড়িগঙ্গায় মিলিত হয়েছে তার বেষ্ঠনী সীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলটিকে তৎকালীন শিল্প এলাকাও বলা যেতে পারে। এ খালটি দোলাই খাল নামে আজও পরিচিত। ঢাকার ইতিহাসে দোলাই খাল অতি পরিচিত নাম। এর বিবরণ অনেকে অনেক রকম দিয়ে গেছেন।

দোলাই খালটি ১৮৭২ সালে সরকার ঢাকা পৌর সভার হাতে ন্যাস্ত করেন। শুষ্ক মৌসুমে খালের ধার হতে মাটি কেটে শহরের অনেকেই ঘর তৈরীর কাজে লাগাতেন, তাই খালের পারে এখানে সেখানে কুয়োর মত দেখা যেতো। তখন ঢাকা শহরের মাটির কোঠা ঘরের সংখ্যা প্রচুর ছিলো। অন্যদিকে খালের অনেকাংশে মুসলমানরা শবদেহ কবরস্থ করতো। খালের কোন কোন অংশে নৌকা বাইচ

হতো। দেখার জন্য আশ পাশের লোকজন ভীড় জমাতো-খালের পারের আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে ও খালের পারে।

এখানকার নৌকা বাইচ নিয়ে ঢাকায় একটা কেচ্ছা প্রচলিত ছিলো। তা হচ্ছে খালের পাড়ের কোন এক পরিবারের নূতন বউ ডাল পাক করছিলো, আর নৌকা বাইচ দেখছিলো। তার ভাসুরের নৌকা খানা এগিয়ে যেতে দেখে সোল্লাসে "আমার ভাসুরের নাও আগে যায়" এই কথা বলছিলো অন্যদিকে ডালের হাড়িতে ঘুটনি দিয়ে নাও-এর তালে তালে ডাল ঘুটছিলো। এক সময় শুধু ভাসুরের নাও ভাসুরের নাও বলতে বলতে উত্তেজনায় মত্ত হয়ে পড়ে এবং জোরে ঘুটনি দিয়ে হাড়িতে চাপ দিলে মাটির হাড়ির তলদেশ ভেঙ্গে সব ডাল চুলোয় পড়ে যায়। এ কাহিনী ঢাকায় খুব প্রচলিত ছিলো। বিশেষ করে অন্য পাড়ার লোকেরা সেখানকার বৌ-ঝিদের উদ্দেশ্যে এ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো।

পরবর্তিতে খালটির উপরে বিভিন্ন মহল্লায় জনগণের স্বার্থে দানশীল ব্যক্তিগণ পাকা সেতু নির্মাণ করেছিলেন যেগুলো তাদের নামেই পরিচিত ছিলো, যেমন চাঁদ খারপুল–আজও লোকে নাজিমুদ্দিন রোডের একাংশকে ঐ নামে ডেকে থাকে। মূল খাল ও তার শাখা প্রশাখাগুলো ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়লে পুনরায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

[illegible]গুলো নৌকাচলাচলের জন্য উচু থাকাতে পরবর্তিতে আধুনিক ও অন্যান্য যান [illegible] বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় বিশেষ করে ঢাকার জনসংখ্যা বর্ধিত হবার কারণে পাক আমলে শহরের অভ্যন্তরস্থ খালগুলো ভরাট করে রাস্তা নির্মাণ করে। ফলে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, যান ও জন চলাচলের সুবিধে, ব্যবসা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ইত্যাদি সুবিধে হয়। স্বাধীনতার পর এমনকি মাত্র ক'বছর পূর্বেও নর্থ সাউথ রোড থেকে মীরনজলা হয়ে দেওয়ান বাজার পর্যন্ত যে খালটি ছিলো তা ভরাট করে নুতন রাস্তা করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে ঢাকার প্রধান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি পৌর সভার ওয়ার্ড চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব মাজেদ সরদারের উদ্যোগ থাকায় পৌর করপোরেশন সম্প্রতি এই নুতন সড়ক পথটির নামকরণ করেছেন হাজী মাজেদ সরদার রোড। এ পথের ধারে সাবেক আগা সাদেক ময়দানের দক্ষিণ পাশে যে কমিউনিটি সেন্টারটি পৌর কর্তৃপক্ষ নির্মাণ করেছেন তার নামও আলহাজ্ব মাজেদ সরদারের নামানুসারে মাজেদ সরদার কমিউনিটি সেন্টার নামকরণ করেছেন। মাজেদ সরদার নাজিরা বাজার এলাকায় ১৯১৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন তার বাড়ী আগা সাদেক রোডে ছিলো। তিনি বিচার

আচারের জন্য ঢাকাবাসীর নিকট খুবই পরিচিত ছিলেন। ঢাকার লোকজনের বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যকার গুরুত্ব ও ঝুকিপূর্ণ বিরোধ মীমাংসার জন্য বিভিন্ন স্থানে তার ডাক পড়তো। শেষ দিকে তিনি তার ওসমানগনী রোডস্থ ঢাকা-হোটেলে বসেই বিচার কার্য সমাধা করতেন। জিয়া সরকারের আমলে পুরাতন ঢাকা উন্নয়ন কমিটির সদস্য পদেও মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি ঢাকা পৌর সভার কমিশনার পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঢাকা সমিতি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে ঢাকাবাসীর মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও ঢাকাবাসীর দাবী দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তার ইন্তেকাল হলে ঢাকাবাসী একজন সাহসী কর্মী পুরুষকে হারিয়েছেন। এই সাহসী ও তেজস্বী পুরুষ বৃটিশ যুগে যখন জগন্নাথ হলের ছাত্রদের দ্বারা মুসলিম হল আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তখন তিনি তার দলবল নিয়ে মুসলিম হল পাহাড়া দিয়েছিলেন। তার আরও বহু গুণাবলী রয়েছে যা অন্যত্র বর্ণনা করবো।

দোলাই খাল ভরাট করে যে সব প্রধান প্রধান সড়ক নির্মিত হয়েছে। তার পূর্বাংশ দোলাই খাল সড়ক নামে আজো পরিচিত। আর বংশাল মালীটোলা হতে সুরিটোলা-সিদ্দিক বাজার পর্যন্ত সড়কটি নর্থ সাউথ রোড নামে পরিচিত। এ সড়ক দুটি এখন ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততম এলাকা।

ঢাকা শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন হওয়ার পূর্বে কয়েদীদের দ্বারা নগর পরিস্কার করা হতো। এক পর্যায়ে কয়েদীদের পরিস্কারের কাজ হতে প্রত্যাহার করার ফলে নগরের অবস্থা অত্যন্ত কদর্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ১৮৪০ সালে মিঃ জর্জ কুক মিউনিসিপ্যাল কার্যক্রম সমাধা কল্পে একটি কমিটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সে সময় ইহা কমিটি নামেই ঢাকাবাসীর নিকট পরিচিত ছিলো। এ কমিটি সে সময় চৌকিদারী ট্যাক্সের উদ্বৃত্ত টাকা আর ফেরীফাণ্ড ইত্যাদি আয়ের দ্বারাই নগর পরিচ্ছন্নতার কার্যনির্বাহ করতো। ১৮৬৩ সালে নুতনভাবে মিউনিসিপ্যাল আইন করে জনগণ হতে কমিশনার নিয়োগ করার আহবান জানানো হয় সরকারের নিকট। তারই ফলশ্রুতিতে ১৮৬৪ সালে ১লা আগষ্ট ঢাকা নগরবাসীর সাংগঠনিক কার্যাবলীর গোড়াপত্তনে তথা স্বায়ত্বশাসন তথা ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। ১১ই আগষ্ট কমিশনারদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায়ই নগরের গৃহাদীর উপর আয় ধরিয়া শতকরা সাড়ে সাত টাকা কর ধার্য করা হয়। তখন করদাতার সংখ্যা দাড়ায় ১৬০৬০ জন। কর আদায়ের সুবিধার্থে ১৬৬টি ট্যাক্সেস জোন বা মহল্লা করে ১৪ জন তহশিলদার নিয়োগ করা হয়। পরে তা কমিয়ে দশ জনে করা হয়। এই কার্যাবলীর

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধিত হয় ১৮৮২ সালে। ঐ বছর পৌরসভার অধীনে আনা হয় আরও সাতটি মহল্লা। এগুলির মধ্যে রায়ের বাজার, কালু নগর, জাফরাবাদ ও বিবির বাজার এলাকাগুলি ছিলো শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। পিলখানাকে পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পরবর্তীকালে তা বাদ দেয়া হয়েছিলো। ১৮৯৫ সালে রায় সাহেব দীননাথ সেন ও বাবু রজনী কুমার চৌধুরীর উদ্যোগে শহরের উপকণ্ঠ এলাকা (গেণ্ডারিয়া) বনজঙ্গল পরিস্কার করা হলে শহরের বহু অভিজাত নাগরিক সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে আসাম ও পূর্ববঙ্গের রাজধানী হয় ঢাকা। রাজধানী হওয়ার সাথে সাথে ঢাকার পৌর এলাকার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো। এই পরিবর্তনে ৬.১৫ বর্গমাইল এলাকা ঢাকা পৌর এলাকার অধীনে চলে আসে। ১৯৩৯-৪০ সালের দিকে ঢাকা পৌরসভা শহরের দক্ষিণ প্রান্তের কিছু এলাকা পৌরসভার আওতায় আনার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্যক উপলিদ্ধ করা হয়নি।

পাকিস্তান অর্জনের পর ঢাকা শহর পুনরায় প্রাদেশিক মর্যাদা লাভ করে। এ সময় পৌরসভার মর্যাদাও বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বৃহত্তর ঢাকা শহর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে তার সীমা-পরিসীমা বাড়াবার ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৫১-৫২ সালের দিকে নয়াপল্টন, পুরানা পল্টন, শান্তিনগর, শাহজাহানপুর প্রভৃতি এলাকাকে ঢাকা পৌরসভার আওতায় আনা হয়। অবশ্যি শহরের আয়তন বাড়লেও পৌরসভার আয় তেমন বৃদ্ধি পায়নি। ফলে অনুন্নত এলাকাসমূহের ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। এতে পৌরসভার নির্বাচিত কমিশনারগণ নিজ নিজ এলাকার উন্নয়ন সাধনে অপারগ ছিলেন বলে তাঁরা সব সময়েই দারুণ বিব্রত বোধ করতেন। পৌর আয় এত কম ছিলো যে নুতন নুতন এলাকার পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও বিজলী বাতি সম্প্রসারণ তৎকালে অসম্ভব ছিলো। কমিশনাররা প্রচেষ্টা চালিয়ে সরকারী সাহায্যে এসব নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বস্তুত এসব এলাকার উন্নয়ন সম্ভব হওয়ায় ঢাকা পৌর এলাকার পরিধি আরও বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়ে শহরের বেশ কিছু এলাকা ঢাকা পৌর সভার অধীনে আনা হয়। এতে ঢাকা শহরের পরিধি অনেক বিস্তার লাভ করেছিলো।

১৯৬১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ৪২টি এলাকা সমন্বয়ে বৃহত্তর ঢাকা পৌরসভা সম্পর্কে এক সরকারী প্রেসনোট প্রকাশিত হয়। তখন বর্ধিত এলাকাসহ বৃহত্তর ঢাকার পরিধি দাঁড়ায় ১৪.২০ বর্গমাইল এবং এর লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৬৬,৭১২ জন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, পৌর রেকর্ড অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে লোক সংখ্যা ছিলো ২,৫৮,০৩৮, ১৯৫১ সালে ৩,৩৮,৭৬২ জন। ১৯৬৪ সালে ৮,৫০,০০০

জন। ১৯৭৪ সালে ১৩,১০,৯৭৬ জন। ১৯৮১ সালে ২৮,০৭,২২৬ জন। আরো উল্লেখ থাকে যে, ১৮৩৭ সালে সরকারী বিবরণ মতে ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৬০,৬১৭ জন। তন্মধ্যে হিন্দু পুরুষ ১৫,৭৩৫ মহিলা ১২,৪১৯ জন। মুসলমান পুরুষ ১৫,৬৮৭, মহিলা ১৬,৭৭৬ জন। এই সংখ্যার মধ্যে ১৭,৬৭৫ জনের বয়স ১৫ বৎসরের নিম্নে ছিল। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীর পরিধি আরও সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এর আয়তন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সংযুক্ত হয়েছে গুলশান, বনানী, মিরপুর ও উত্তরা এলাকা। বর্তমান পরিধি দাড়িয়েছে ১৩,২৫৪ বর্গমাইল, যাহা ৯০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। আর এই নব্বইটি ওয়ার্ডের পৌর করপোরেশন তথা বর্তমান ঢাকা সিটি করপোরেশনে রেকর্ডকৃত ২,১২,০০০টি হোল্ডিং রয়েছে। (অবশ্য প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশী।) রাস্তা রয়েছে ১,৩৮৬ মাইল। নর্দমা ১,১৬৪ মাইল, বাজার ৫২টি, পার্ক ৪০টি, কবরস্থান ৫টি, শ্বশানঘাট ২টি, পাবলিক টয়লেট ১৫টি, কসাইখানা ৪টি, কমিউনিটি সেন্টার ৩৪টি, হাসপাতাল ২টি, মাতৃসদন ১টি, পৌর চিকিৎসালয় ১৮টি, শরীর চর্চা কেন্দ্র ১২টি, সম্প্রসারিত টিকাদান কেন্দ্র ৬টি, বাসটার্মিনাল ৪টি এসবই সিটি করপোরেশন পরিচালিত ও নির্মিত। এর বাইরেও সরকারী, বেসরকারী, সমবায় ও সেচ্ছাসেবী সংস্থার এ ধরনের অনেক কিছু রয়েছে। যেমন-কমিউনিটি সেণ্টার, দাতব্য চিকিৎসলয়, কাঁচা বাজার যার সংখ্যা সিটি করপোরেশনের চেয়ে অনেক বেশী। বর্তমানে সিটি-করপোরেশন নগরীতে ৫০ হাজারের উর্দ্ধে গাছ লাগিয়েছে, যা পরবর্তিতে পরিবেশ দূষণ হতে নগরী অনেকটা মুক্ত হবে।

ঢাকা এখন বৃহত্তর নগরীর মর্যাদায় সমাসীন। নুতন নুতন অত্যুচ্চ আধুনিক ইমারতে সুশোভিত। আধুনিক নগরীর উপযোগী তৈরী হয়েছে সুপ্রশস্ত রাজপথ। নিয়ন বাতি ও সোডিয়াম বাতির আলোয় রাতের নগরী স্বপ্নময় হয়ে উঠে। ঢাকা পৌরসভা ১৯৭৮ সালে রূপান্তরিত হয় ঢাকা পৌর করপোরেশনে। অতঃপর ১৯৮৯ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে ঢাকা সিটি করপোরেশনে পরিণত হয়েছে। লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে অর্ধকোটির উর্দ্ধে। ঢাকা মহানগরীর লোকসংখ্যার সঠিক তথ্য না থাকলেও সরকারী ও পৌর কর্তারা বলে থাকেন, কখনও ৬০ লক্ষ, কখনও ৭০ লক্ষ। অবশ্য এর মধ্যে ভাসমান লোক প্রচুর রয়েছে। রাজপথে আধুনিক গাড়ি ছুটছে অবিরাম গতিতে। অজস্র পথচারির পদভারে রাজপথের রূপ বদলে গেছে। স্থাপিত হয়েছে নুতন নুতন অত্যাধুনিক বিপণী কেন্দ্র ও বাজার। দেশী-বিদেশী পণ্যসম্ভারে ঝলমল করছে বিপণী কেন্দ্রগুলি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ায়

ঢাকা নগরীতে স্থাপিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দূতাবাস। অসংখ্য মিশন অফিস। ঢাকা মহানগরী এখন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর স্থাপন করে জগৎটাকে হাতের মুঠোয় আনতে সক্ষম হয়েছে। বিমান বন্দরের নামকরণ করা হয়েছে সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের নামানুসারে। তবুও ঢাকা নগরীর উন্নয়ন মন্থর হয়ে আসেনি। কালের কপোল তলে কোলাহল মুখর এই ঢাকা মহানগরী অচিরেই তিলোত্তমা– হবে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর ও আধুনিক নগরীর মর্যাদালাভে সক্ষম হবে– এতে কোন সন্দেহ নেই।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালটির নিজস্ব ভবন তৈরীর পর তার সম্মুখস্থ রাস্তাটির নাম মিউনিসিপ্যাল অফিস স্ট্রীট রাখা হয়। শুরুতে ওয়াইজ ঘাটের ওয়াইজ হাউজের একটি অংশ ভাড়া নিয়ে সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির অফিস স্থাপন করা হয়েছিলো। কিন্তু উপযুক্ত কক্ষের অভাবে মিউনিসিপ্যালিটির সভা হতো নর্থ ব্রুক হলে। অবশ্যি এ জন্যে মিউনিসিপ্যালকে ভাড়া দিতে হতো। পরে মিউনিসিপ্যাল অফিস তার নিজস্ব ভবনে চলে আসে। বর্তমানে মহানগরীর জনগণের সুবিধার্থে সিটি করপরেশনের জন্য ফুলবাড়িয়ায় নগর ভবন নির্মিত হয়েছে।

এখানে ঢাকা নগরীর অতি নিকটতম বন্দর শহর নারায়ণগঞ্জ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। ১৮৭৬ সালে মদনগঞ্জ বন্দরকে নারায়ণগঞ্জের অন্তর্ভূক্ত করে নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। তৎসময় নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি প্রদেশে অন্যতম মিউনিসিপ্যালিটি হিসেবে গণ্য হতো। কারণ নারায়ণগঞ্জ পূর্ববঙ্গের ব্যবসায়ের প্রধান স্থান ছিলো। ১৮৮০ সালে নারায়ণগঞ্জ বন্দরকে স্বাধীন বন্দর বলে সরকার ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৯০৬ সালেই পুনরায় এক ঘোষণায় বন্দরটিকে চট্টগ্রাম বন্দরের অধীন বলে বিজ্ঞপ্তি দান করে। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৮৬ সালে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাষণ আইন প্রবর্তিত হয়। তদনুসারে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ঢাকা জেলা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা কালেকটর মহোদয় জেলা বোর্ডে সভাপতি পদে সরকারী আদেশে আসীন হন।

মোঘল শাসনামলের পূর্বে ঢাকার অধিবাসীরা বিশেষ করে হিন্দুরাই বিভিন্ন হস্তশিল্পের কাজে নিয়োজিত ছিলো। হস্তশিল্প প্রসারের দিক দিয়ে তাঁতী বাজার ছিলো সর্বাগ্রগণ্য সেখানে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী তাঁতীরা বসবাস করতো। হয়তো তারাই এককালে দামী কাপড় চোপড় তৈরী করে বিশ্বের দরবারে বস্ত্রশিল্পে ঢাকার নাম অক্ষয় করে গেছে। ১৯২১ সালে প্রসন্নকুমার পোদ্দারের আবেদন ক্রমে ঢাকা পৌরসভা তার পিতার নামানুসারে তাঁতী বাজারের নাম বংশী চন্দ্রসেন পোদ্দার রোড

রাখার সিদ্ধান্ত নিলেও লোকে আজও একে তাঁতী বাজার বলেই অভিহিত করে আসছে।

ঢাকার শাঁখারী বাজার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানকার শাঁখা-শিল্পই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। পাড়ার বাসিন্দারা শঙ্খদ্বারা শাঁখা, অঙ্গুরী, বালা, চুড়ি, বোতাম, কানের দুল, প্রভৃতি নানারূপ আকর্ষণীয় দ্রব্য প্রস্তুত করে বিধায় এ এলাকাটি শাঁখারী বাজার নামে অভিহিত হয়। সেই সঙ্গে শাঁখা শিল্পীরা শাঁখারী সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। শাঁখারীদের এসব দ্রব্য প্রস্তুত করতে খুবই দৈহিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। এসব দ্রব্যাদিতে নানারূপ কারুকার্য খচিত হতো, সারা ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব দ্রব্যাদি ব্যবহার করার প্রচলন ছিলো। শঙ্খসমূহ শ্রীলংকা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইর উপকূল হতে ঢাকায় আসতো। এই শিল্পে প্রেমচাঁদ সুর ও দ্বারিকানাথ নাগ খ্যাতিমান শিল্পী ছিলেন। এ সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক ফরিদাবাদেও বসবাস করতো। কোম্পানী আমলে ঢাকার শাঁখারী পরিবারদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আলবেনীয় অধিবাসী বসবাস করতেন বলে জানা যায়। তখন তাঁতী সম্প্রদায়ের পরই শাঁখারীদের স্থান ছিলো। এরা ঢাকা শহর পত্তনের সময়কাল থেকেই বসতি স্থাপন করেছিলো। আজও তেমনি অপ্রতিহত গতিতে শাঁখারীরা তাদের শাঁখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঢাকর অনেক মহল্লাই হিন্দু প্রধান ছিলো এবং যে মহল্লায় যে পেশার বা গোত্রের লোকসংখ্যা বেশি ছিলো সেই সব স্থানের নাম সেই গোত্র বা পেশাজীবিদের নামানুসারে সর্বজন পরিচিত হয়ে উঠে। যেমন– জালুয়ানগর, গোয়ালনগর, বানিয়ানগর, সুতারনগর, কামারনগর, কুমারটুলি, চাম্যরটুলি, গণকটুলি, মালাকারটোলা, করাতিটোলা, শিংটোলা ইত্যাদি। মুসলমান প্রধান মহল্লাগুলোর নাম মোঘল আমলের নামের ঐতিহ্যই বহন করে আসছে। যেমন–মোঘলটুলি, নবাবগঞ্জ, নবাববাগিচা, রহমতগঞ্জ, মনোয়ার খাঁ বাজার, দেওয়ান বাজার, বেগম বাজার, নাজিরা বাজার, চৌধুরী বাজার, ইসলামপুর, নবাবপুর, আজিমপুর, শাহবাগ ইত্যাদি।

মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর বৃটিশ শাসনামলে ঢাকা পৌরসভার কর্মকর্তাদের মধ্যে মুসলমানরা সংখ্যায় নগণ্য থাকায় বহু মুসলমান প্রধান মহল্লার নাম পরিবর্তন করে প্রতাপশালী হিন্দু লোকদের নামানুসারে সেগুলোর নামকরণ করা হয়। তবুও বহু এলাকায় পুরনো নামই লোকমুখে চালু হয়ে আছে। অবশ্যি অনেক ক্ষেত্রেই নাম পরিবর্তিত করায় সেগুলোর পূর্ব নাম একে একে ঢাকাবাসীর স্মৃতির

অতলে তলিয়ে গেছে।

দোলাই খাল খননের মাধ্যমে বিভক্ত করা ঢাকার পূর্বাঞ্চলে আর যে'কটি বিশিষ্ট এলাকা ছিলো তন্মধ্যে ঐতিহাসিক আণ্টাঘর ময়দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ময়দানটিতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় ঘোষণাপত্র জনগণের মধ্যে পাঠ করে শোনানো হয় বলে ১৮৫৮ সালে ভিক্টোরিয়া পার্ক এবং পাক আমলে ১৯৬১ সালে সিপাহী বিপ্লবের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করে বাহাদুর শাহ পার্ক নামকরণ করা হয়।

১৮৫৭ সালের ২২শে নভেম্বর রবিবার ভোর পাঁচটায় কুয়াশাচ্ছন্ন আধো আলো আধো-অন্ধকারে বেশ কিছু সংখ্যক উইরোপীয় স্বেচ্ছাসেবক ও শতাধিক নৌসেনা এক অশুভ অভিযান চালনার উদ্দেশ্যে এই ময়দানের খোলা জায়গায় এসে দাড়ালো। তারপর তাদের একটি দল মার্চ করে এগিয়ে যায় ট্রেজারির দিকে আজ যেখানে সেণ্ট্রাল জেল অবস্থিত তখন সেখানে ছিলো ট্রেজারি সেখানকার সিপাহীদের অতি সহজেই নিরস্ত্র করে এবং ক্ষিপ্রগতিতে লালবাগ কেল্লাভিমুখে ধাবিত হয়ে তাদের অন্য দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে কেল্লার সিপাহীদের উপর বর্বর আক্রমন চালায়। এই আকস্মিক আক্রমনে দেশীয় সিপাহীরা নেতৃত্বের অভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও অনেকেই সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হন। আবার অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরাও পরেন। গ্রেফতারকৃত সিপাহী ও বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য ঢাকাবাসী কিছু লোককে সদর ঘাটে কামানের গোলায় উড়িয়ে দেয়। আবার অনেককে প্রহসনমূলক বিচার করে এই আণ্টাঘড় ময়দানে ফাঁসী দিয়ে এর সারিবদ্ধ বৃক্ষরাজীতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এদের লাশ বহু দিন যাবত বৃক্ষে ঝুলে থাকায় পচাগন্ধে সেই এলাকা দিয়ে যাতায়াত বা মানুষের বসবাস কঠিন হয়ে পড়েছিলো। আণ্টাঘড় ময়দানে ইংরেজ তাদের বিজয় স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সিপাহী বিদ্রোহে নিহত ইংরেজ সৈন্যদের স্মরণে ময়দানের পূর্বদিকে একটি ছোট মনুমেণ্ট তৈরী করে। এই নির্মাণ কাজে ঢাকার নবাববাড়ীর কিছু যুবক সহযোগিতা করেছিলো বলে জানা যায়। এই ভিক্টোরিয়া পার্কের পশ্চিমে যেখানে পূর্বে ঢাকা কলেজ ছিলো সেখানেই ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় ইংরেজ বণিকদের কুঠি ছিলো। কুঠির অধ্যক্ষ ছিলো মিঃ প্রাট।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত বহরমপুরের মঙ্গলপাড়ে করলেও পরবর্তিতে বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লীতে সমবেত হয়ে বৃদ্ধ নাম মাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহকে তাদের নেতা হিসেবে বরণ করেছিলেন, কারণ তখনও দিল্লীর সম্রাট নামের

পদবীর বিরাট মর্যাদা ছিলো। মহাদেশের সাধারণ মানুষ নাম সর্বস্ব দিল্লী সম্রাটকেই ভারত বর্ষের অধিপতি মনে করতো। চতুর মারাঠা রাজারাও শক্তি বলে চৌথ আদায়কালে সম্রাটের নামে চৌথ আদায়ের 'ফরমান' নিত।

যদিও বাহাদুর শাহ্ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন নামে মাত্র প্রকৃত পক্ষে সিপাহী বিদ্রোহ পরিচালনা করেছেন এক এক প্রদেশে এক এক শহরে এক এক জন। কোথাও বীর সেনানী, কোথাও জন নেতা, কোথাও ধর্ম নেতা, কোথাও স্বাধীন নবাব বা রাজা প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এদের মধ্যে সম্রাজ্ঞী জিনাত মহল, পেশোয়া নানা সাহেব, মারাঠা তাতিয়া তোপী, ঝাঁসির রানী বীরঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ, অযোধ্যার বেগম হজরত মহল, মৌলভি আহমদ উল্লা, রোহিলাখণ্ডের নেতা বখত খাঁ, বিহারের কুনওয়ার সিং প্রমুখ।

বিভিন্ন স্থান হতে অগণিত বিদ্রোহী সৈনিক এসে দিল্লীতে সমবেত হয় এবং ধ্বংসাবিষ্ট মোগল সাম্রাজ্যে নামেমাত্র অধিপতি বাহাদুর শাহ্কে ভারতবর্ষের সম্রাট ঘোষণাকে অভিনন্দিত করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরে। তখনই লর্ড কানিং সর্বাগ্রে দিল্লী অধিকার করে বিদ্রোহী সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হন। বৃটিশ সেনানায়কবৃন্দ গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশানুসারে দিল্লী অধিকারে সর্ব শক্তি নিয়োগ করে। দিল্লীর অভ্যন্তরে বিদ্রোহী সিপাহীদের অধিনায়ক ছিলেন মহাবীর বখত খাঁ। তিনি দীর্ঘদিন ইংরেজ সেনাদের আক্রমন প্রতিহত করে রাখেন। অস্ত্র শস্ত্রে বলীয়ান নিত্য নুতন বৃটিশ সৈন্যের আগমনে ক্রমশঃ ইংরেজ পক্ষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৩ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ তোপের আঘাতে দিল্লীর দূর্গ প্রাচীরের দুই স্থান ভেঙ্গে পড়ে। ১৪ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীর তোড়ন, কাবুল তোড়ন ও লাহোর তোড়নের অনেকাংশ বৃটিশ গোলার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়। ইংরেজ সেনাপতি নিকলসন অসীম সাহসে যুদ্ধ করে কাশ্মীর তোড়নের অদূরবর্তী "মেইনগার্ড" অধিকার করে ফেলে। ১৭ই সেপ্টেম্বর দিল্লী নগরীর অভ্যন্তরে উভয় পক্ষে হাতাহাতি যুদ্ধ চলে। অবশেষে ১৮ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ সৈন্যবাহিনী সমগ্র দিল্লী নগরী দখল করে নেয়। বৃটিশ দলে শুধু ইংরেজ সৈন্যই ছিলো না ভারতের অনেক স্বাধীন রাজ্যের অসীম সাহসী সৈন্য বাহিনীও তাদের রাজাদের নির্দেশে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহী সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এসব রাজাদের মধ্যে পাঞ্জাবের নাভা, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজ্যের রাজারাই ইংরেজ সাহায্যে এগিয়ে যান সর্বাগ্রে।

ইংরেজ বাহিনী দিল্লী দখল করে প্রতিহিংসা প্রতিশোধে মেতে ওঠে, দিল্লীর

বালক, বৃদ্ধ, শিশু, পঙ্গু, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ইংরেজ সৈন্যদের হাতে নির্দয়ভাবে নিহত ও লাঞ্ছিত হতে থাকে। তাদের অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড চেঙ্গিস খানের নিষ্ঠুরতার চেয়েও অধিকতর প্রতিপন্ন হয়েছিলো। অন্যদিকে পোয়াইনের রাজা জগন্নাথ সিং-এর বিশ্বাস ঘাতকতায় মহাবীর আহমাদ উল্লাহ নিহত হন। রানী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে আহত হয়ে পরে মৃত্যু বরণ করেন। তাতিয়াতোপী আত্মগোপন করলেও তার অনুচর মানসিংহ অর্থলোভে নিদ্রিত অবস্থায় গভীর অরণ্যে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেন। পরে সিপ্রিতে তাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। অযোধ্যার বেগম নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের দিকে চলে যান। তার শেষ জীবনের পরিণাম কি হয়েছিলো কেউ বলতে পারেনা। এভাবে এ দেশীয় বিশ্বাস ঘাতকদের হাতে ধৃত হয়ে ইংরেজদের হাতে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামের বীর মুক্তিযুদ্ধের নায়ক-নায়িকাগণ সাহাদৎ বরণ করেন। আর সেই সাথে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসান হয়।

অন্যদিকে দিল্লী ইংরেজদের করতলগত হওয়ায় বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ তদীয় পরিবারবর্গ সহ ১৯শে সেপ্টেম্বর সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি সৌধে আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু জনৈক বিশ্বাসঘাতক অনুচরের প্রতারণায় তারা ইংরেজদের হাতে ধৃত হয়। সম্রাটের বন্দী হওয়ার দৃশ্যটি বড়ই করুণ ছিলো। ৫০ জন বৃটিশ সৈন্যসহ ক্যাপ্টেন হড্‌সন গুপ্তচর রজব আলীসহ দিল্লীশ্বরের পদের উত্তরাধিকারী সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিস্থলে উপনীত হলে বেগম জিন্নাত মহল ও পুত্র জোয়ান বখতের হাত ধরে বৃদ্ধ সম্রাট কবরগাহ হতে বের হয়ে এসে সমাধির দ্বার দেশে নিস্কাশিত তরবারী হস্তে ক্যাপ্টেন হড্‌সনের হাতে মোঘল ঐশর্যের শেষ প্রতীক সম্রাট জাহাঙ্গীরের তরবারী খানা সমর্পন করেন। দিল্লীশ্বর অপরাধীর বেশে দণ্ডায়মান থাকেন। তৎপর শাহজাদা তিনজন-মীর্জা খিজির সুলতান, মীর্জ মোঘল ও মীর্জা আবুবকরকে বন্দী করে এনে ইংরেজ সৈনিকরা গুলিবিদ্ধ করে মৃতদেহগুলি ঝুলিয়ে রাখে কোতায়ালীর সম্মুখস্থ বৃক্ষ শাখায়।

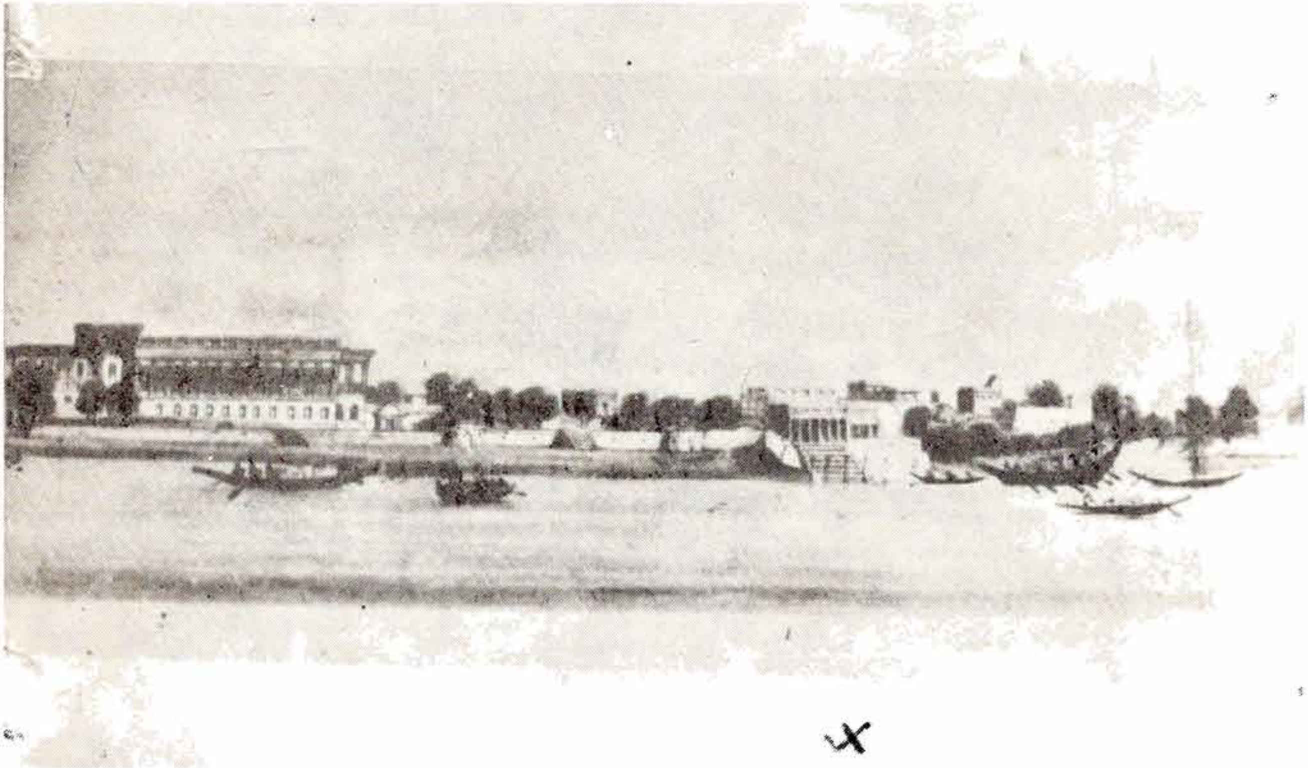
তারপর আসে বিচারের পালা। বিচার প্রহসনে ম্যাজিস্ট্রেট স্যার টমাস হাজার হাজার বিদ্রোহী সিপাহী ও দিল্লীবাসীকে ফাঁসীর হুকুম প্রদান করেন– আবার অনেককে তোপের মুখে উড়িয়ে দেন। দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ ও তদীয় বেগম জিন্নাত মহলকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। তাঁদের সমাধি আজও রেঙ্গুনে সেই সিপাহী বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সমাধি পরিদর্শনকারীদেরকে। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান সরকার ঢাকা পৌর সভার সহায়তায় এই স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্যে

একটি সৌধ নির্মাণ করে ভিক্টোরিয়া পার্ককে বাহাদুর শাহ্ পার্ক নামকরণ করে যথার্থই করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিক্টোরিয়া পার্কে আর্মেনিয়ানদের একটি ক্লাব ছিলো। সেখানে তারা বিলিয়ার্ড খেলতো। নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা বিলিয়ার্ড বলকে আণ্টা বলতো। সে কারণেই এ স্থানটিকে ঢাকাবাসী আণ্টাঘড় ময়দান নামে অভিহিত করে আসছে।

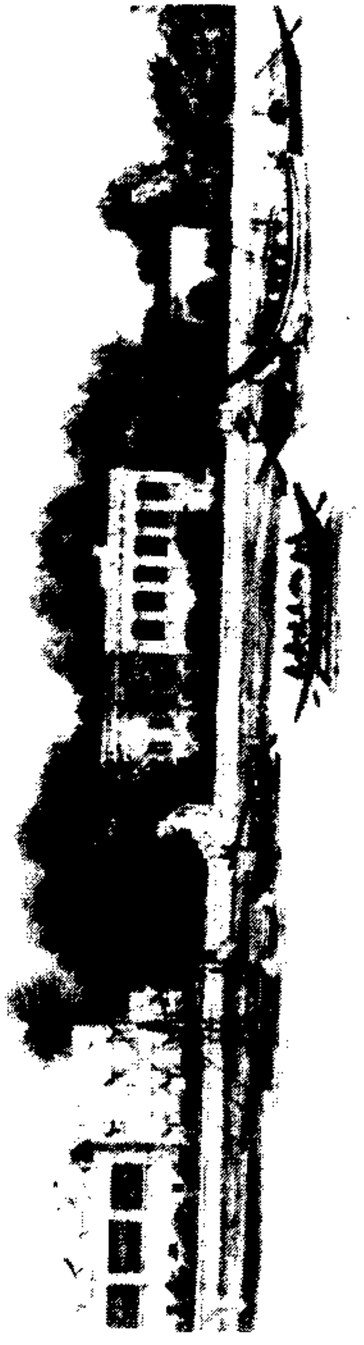
ফরাশগঞ্জের আদি নাম ছিলো ফ্রেঞ্জগঞ্জ বা ফ্রান্সগঞ্জ। ফরাসীগণ এখানে অবস্থান করতো, পরে ১৭৪০ সালে ফরাসীরা তৎকালীন ঢাকার নায়েব নাজিম নওয়াব নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এ এলাকায় একটি গঞ্জ বা বাজার স্থাপন করে বিধায় ফরাশগঞ্জ নাম হয়।

পরবর্তীকালে তথা ১৮৫৯ সালের সার্ভেম্যাপে এলাকাটি আজবপুর নামে উল্লেখ রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী হতেই এলাকাটি হিন্দু প্রধান হয়ে উঠে। এদের মধ্যে জমিদার রূপলাল দাস অন্যতম। তার বাড়ীর নাম রূপলাল হাউস। আজো সে নামে পরিচিত। রূপলাল বাবু ঢাকার অত্যন্ত বিলাসবহুল প্রভাবশালী হিন্দু জমিদার ও ব্যাংকার ছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকালে তিনিও ইংরেজদের আন্তরিকভাবে সহায়তা করেছিলেন। বিদ্রোহ দমনের পর তার ভবনেও বৃহদাকারে ইংরেজদের আনন্দ উৎসব চলে। চলে বল নাচ আর সুরা নহর। রূপলাল বাবুর নামে নিকটেই রূপলাল দাস লেন নামে একটি গলি পথের নাম রয়েছে। জমিদার রূপলাল দাস বাবুর পূর্ব পুরুষদের ধনৈশ্চর্য প্রাপ্তির একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। রূপলাল দাস বাবুর পূর্ব পুরুষ মথুরা নাথ সাহা ঢাকার রাস্তার ধারে চট পেতে বসে বাট্টায় টাকা ভাংগানির ব্যবসা করতেন। সে ব্যবসা কিছুকালের মধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠায় মথুরা নাথ নদী তীরে পাকা দালান ও ঘাট নির্মাণ করেন। পরবর্তিতে অনেক জমিদারী ক্রয় করতে থাকেন। এভাবে জমিদারী ক্রয় করেই একদিন মথুরা নাথ তার পূর্ব পরিচয় ঘুচিয়ে অভিজাত পরিবারের খাতায় নাম লিখায়। রূপলাল দাস পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আরো বিত্তশালী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তিনি ও তার ভাইয়েরা বিলাসে গা ভাসিয়ে দেদার টাকা উড়াতেন। আজো তার বাড়ী "রূপলাল হাউস" ইতিহাসের অংশ হয়ে দাড়িয়ে আছে। সম্প্রতি সরকার রূপলাল হাউসকে পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আর রূপলাল দাস লেনটি রূপলাল বাবুর রূপ কথার কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।



১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী তীরস্থ মথুরা পোদ্দার
ঘাট ও জমিদার আরাতুনের বাসভবন

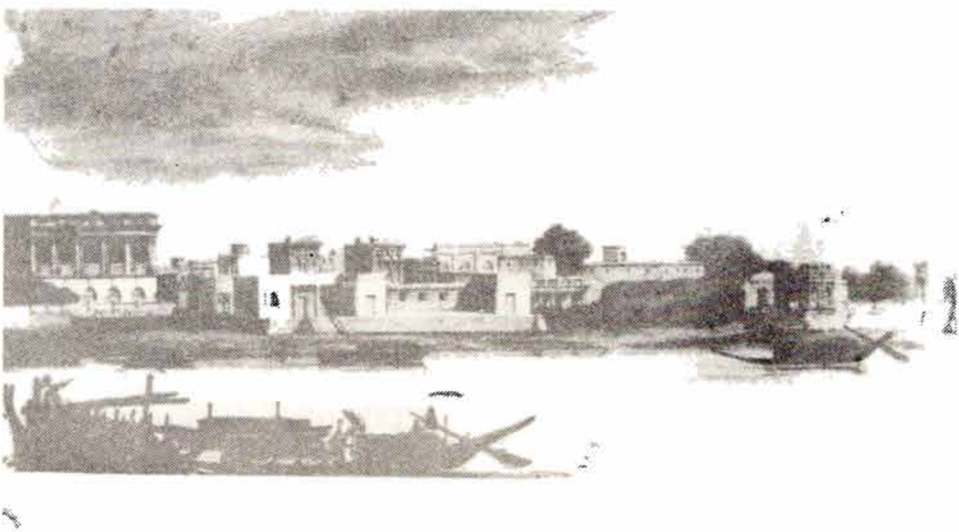
পরবর্তীতে ফরাশগঞ্জের একটি অংশে বিশিষ্ট বিত্তশালী সনাতন বাবুর পুত্র শ্যামবাবু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাজারটি শ্যামবাজার নামে আজও পরিচিত। বাজারটি কাঁচা মালের তথা তরিতরকারি মরিচ হলুদ ইত্যাদির আড়ত হিসেবে ঢাকায় খ্যাতি রয়েছে।



১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী তীরবর্তী সুপারেনটেন্ডিং সার্জন ডাক্তার ল্যাম্ব এবং জমিদার ও নীল কোম্পানির মিঃ ই. কে. হিউমের বাসগৃহ

কিছুকাল পূর্বেও অবশিষ্ট অংশের নাম পরিবর্তন করার জন্যে জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি পৌরসভায় বহুবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু এ স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিদ্যমান থাকায় নাম পরিবর্তনে বাধা আসে। তবুও ১৯২৭ সালে একাংশের নাম পরিবর্তন করে বি, কে, দাস রোড নামকরণ করা হয়। বসন্ত কুমার দাস বাবু প্রভাবশালী ও বরিশাল বড় ঘর ষ্টেটের জমিদার ছিলেন। এ মহল্লায় খ্যাতনামা চিত্রকর ব্রজগোপালসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে দেবেন্দ্র দাস, মোহিনি মোহন দাস, এন, কে, দাস অন্যতম ছিলেন, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার গৌরব অর্জনকারী প্রখ্যাত সাঁতারু ব্রজেন দাসও এ মহল্লারই ছেলে।

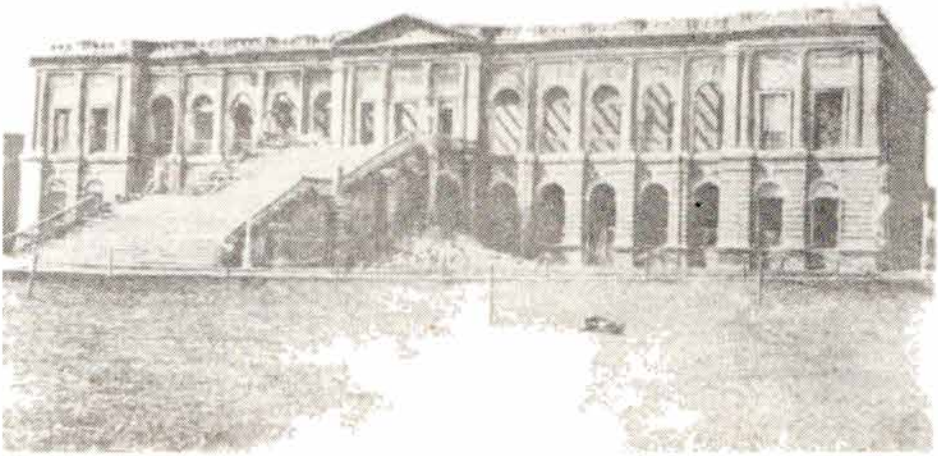
বসন্ত কুমার দাস রোড নিয়ে বর্তমানে কেউ কেউ কিছুটা বিভ্রান্তিতে পতিত হচ্ছে। পাক আমলের পঞ্চাশ দশকে পৌর নির্বাচনে এ এলাকারই বসন্ত কুমার দাস নামে আরেক ব্যক্তি পৌর কমিশনার নির্বাচিত হন। তিনিও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত ছিলেন। এ রোডের পূর্বাংশে এক বাড়ীতে বসবাস করতেন। অনেকের ধারণা এই বসন্ত কুমার দাস বাবুর নামেই এ রাস্তার নাম করা হয়েছে বি, কে, দাস রোড তা ঠিক নয়।



১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী তীরস্থ
মিঃ জীবন বাবুর বাড়ীর দৃশ্য

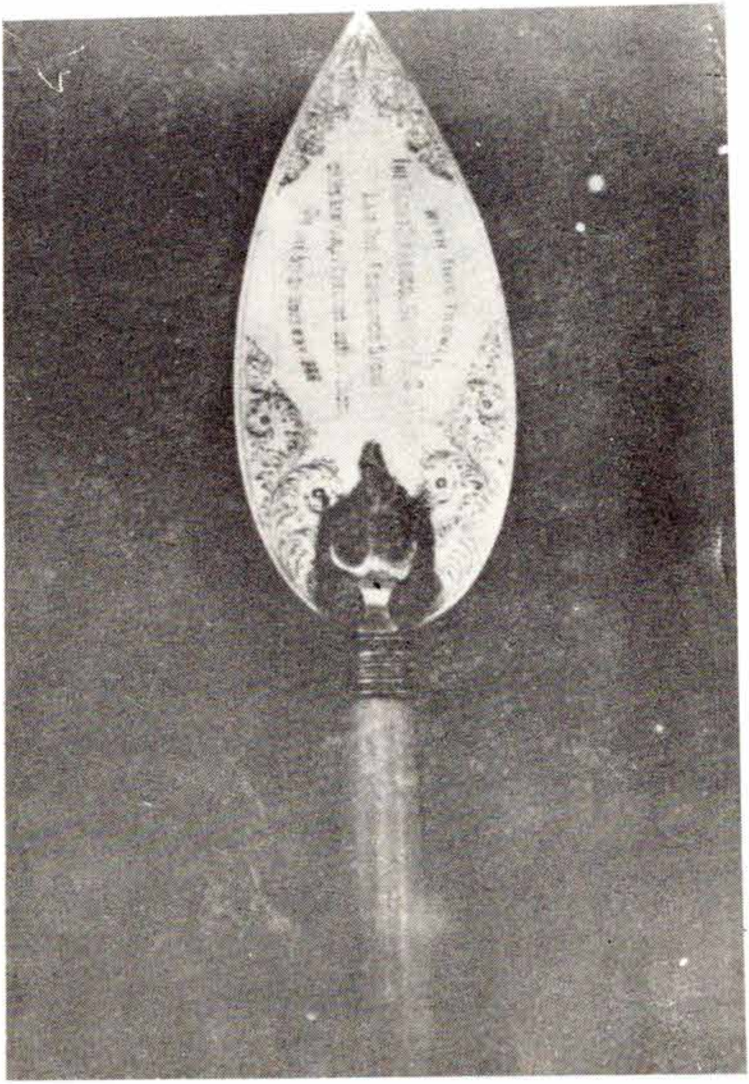
এলাকায় বিত্তশালী হিন্দুদের বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য থাকায় এখানে আজও তাদের বহু অট্টালিকা দেখা যায়। ফরাসীদের বসবাস কাল হতে এ পর্যন্ত বহুবার এখানকার ব্যবসার ধরণ বদলিয়েছে। যেমন কখনও কাঠের, মনোহরী দ্রব্য, পুস্তাকাদি, কখনও ফার্নিচার ইত্যাদি ব্যবসা জমজমাট ছিলো। যা ঢাকার অন্য কোন ব্যবসা স্থলে এত পরিবর্তন হয়নি। পূর্বে এ অঞ্চলে ফরাসীদের বসবাস থাকলেও বর্তমানে ফরাসীদের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ সে সময় পূর্ব বঙ্গে এ এলাকাটিই ফরাসীদের একমাত্র সম্পত্তি ছিলো। উল্লেখ্য ফরাসীদের ফ্যাক্টরীটি ১৭৭৮ সালে ইংরেজদের নিকট সমর্পন করা হয়। ইংরেজদের পক্ষে লেঃ কাউই ফ্যাক্টরীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বহুকাল পর্যন্ত এ এলাকাটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বে যশ অর্জন করতে পেরেছিলো। ১৮৩৫ সালে নওয়াব খাজা আব্দুল গনির পিতা খাজা আলিমুল্লাহ ফরাসীদের কাছ থেকে বর্তমান আহসান মঞ্জিল খরিদ করে নেন।



আহসান মঞ্জিলের পূর্ব দৃশ্য যাহা ১৯৩৫ সালে খাজা আলিমউল্লাহ্ ফরাসীদের নিকট থেকে খরিদ করেছিলেন

১৮৭২ সালে নওয়াব খাজা আবদুল গনি প্রাসাদটি পুন নির্মাণ করেন এবং প্রাসাদটির নাম তাঁর পুত্রের নামানুসারে "আহসান মঞ্জিল" নামকরণ করেন তখন থেকেই ঢাকার নওয়াব বাড়ী আহসান মঞ্জিল নামে পরিচিত হয়ে আসছে।



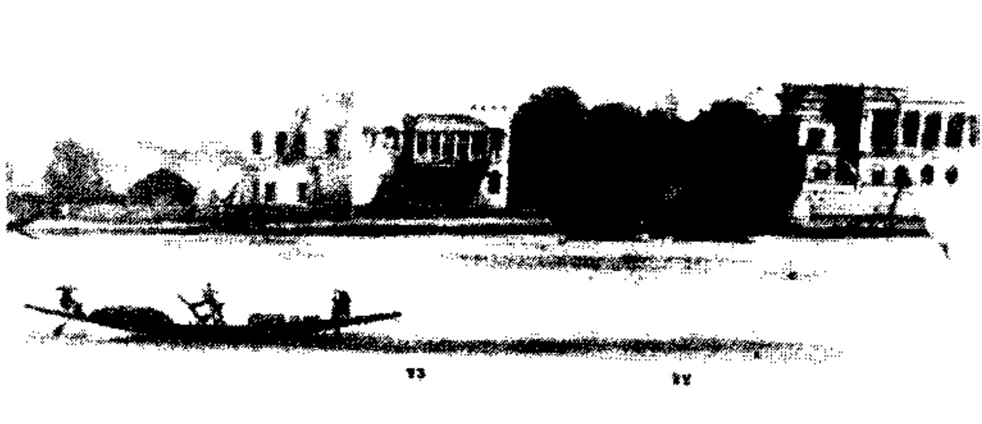
১৮৭২ সালে নবাব খাজা আব্দুল গনি আহসান মঞ্জিল প্রাসাদটি পুনঃনির্মাণকালে এই স্বর্ণের কর্ণি দ্বারা নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছিল

নওয়াব আবদুল গনির সময়কার অন্যতম কীর্তি সদর রাস্তার পাশে প্রধান তোরণের উপর নহবতখানা নির্মাণ। ইতিপূর্বে বর্তমান আহসান মঞ্জিলের উত্তর পশ্চিমে জালালদি ফরিদপুরের জমিদার শেখ এনায়েত উল্লাহর "রং মহল" নামে একটি বিরাট সৌধ ছিলো। শেখ এনায়েত উল্লাহর ছেলে মতিউল্লা এই সুদৃশ্য বিরাট সৌধটি ফরাসীদের নিকট বিক্রয় করেছিলেন।



১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী তীরস্থ সদরঘাট এলাকায় কাজী আলিমউল্লাহ্ জমিদারের বাসভবন ও ডানে তৎকালীন ঢাকার বিত্তবান ও বিশিষ্ট ব্যক্তি মীর্জা গোলাম পীর নির্মিত ভবন

সদরঘাট এলাকাটি বৃটিশযুগ থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এখানে নদী পথে মাল আমদানী-রপ্তানী ছাড়াও যাত্রীবাহী ও মালবাহী বিভিন্ন জলযান অহরহ যাতায়াত করে। কুলে নৌকা ভেড়ানো ও মালপত্র ওঠানামা ও যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে নদীতীরে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিলো ১৭৬৫ সালে, তার পরিধি ছিলো প্রায় চার মাইল। ধীরে ধীরে বাঁধের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের কিছুকাল পরে তদানীন্তন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মিঃ সি, টি বাকল্যাণ্ডের আগ্রহে পুনরায় আরও পোক্তভাবে বাঁধটি ফরাশগঞ্জ থেকে বাবুবাজার পর্যন্ত পুনঃনির্মাণ করা হয়। তখন থেকেই এ বাঁধটি "বাকল্যাণ্ড বাঁধ" নামে পরিচিত হয়ে আসছে। বাঁধটি নির্মাণ উপলক্ষ্যে সদরঘাটে এক সুসজ্জিত বজরায় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন এবং বাঁধ নির্মাণে চাঁদা প্রদান করেন। তন্মধ্যে খাজা আবদুল গনি ও বংশালের হাজী বদর উদ্দিন ওরফে ভূট্টো হাজীর দান উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৪ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকাবাসীদের সকাল ৯টার পূর্বে ও বিকেল ৩টার পর ঘাটে স্নান করা নিষিদ্ধ করে ফরমান জারী করেছিলেন। ঊনিশ শতকে লোকদের ঘুরে বেড়াবার প্রধান জায়গা ছিলো বুড়িগঙ্গার তীরে বাঁকল্যাণ্ড বাঁধে। তখন ঢাকা শহরে প্রধান সড়ক ছিলো মাত্র চারটি।



১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী তীরস্থ বৃক্ষসমূহের পরপারে আদালত কোর্টের কাচারী এবং বামে সেন্ট টমাস গীর্জার রেভারেন্ড শেফার্ড এ. এম. এর বসত বাড়ী

লক্ষ্মীবাজার এলাকাটি পূর্বে ময়দান নামে পরিচিত ছিলো। ১৭৩০ সালের দিকে কাশ্মীর থেকে মিয়া সাহেব আবদুর রহিম রিজভী এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৪৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর ওখানেই তার মাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তদবধি এই এলাকাটি মিয়া সাহেব ময়দান নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। আজও প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরা এই এলাকাটিকে ওই নামেই অভিহিত করে থাকেন। মিয়া সাহেব ঢাকা আগমনের পূর্বে কিছুদিন মুর্শিদাবাদে ছিলেন। তার সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শরফুদ্দিন। তাঁরা ছিলেন মুজাদ্দেদি তরিকার লোক। কথিত আছে, এক পাগলের তরবারির আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন। শাহ্ আবদুর রহিমের ইন্তেকালের পর শাহ্ নাজিমউদ্দিন গদীনশীন হন। ১২৩০ হিজরীতে শাহ্ নাজিমউদ্দিন ইন্তেকাল করলে তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। তারপর তাঁর ছেলে শাহ্ বদির উদ্দিন গদীনশীন হন। ১২৬৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করলে তাঁর ছেলে শাহ্ নাসিরউদ্দিন গদীনশীন হন। ১২৭৫ হিজরীতে শাহ্ নাসিরউদ্দিন ইন্তেকাল করলে গদীনশীন হন তাঁর ছোট ভাই কমর উদ্দিন। তিনি ১৩০৫ হিজরীতে অপুত্রক অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তজ্জন্য তার নাতি শাহ্ সৈয়দ আবু ইউসুফ মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রিজভীকে গদীনশীন করা হয়। তিনি ১৩৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, এরাঁ সকলেই বুজর্গানেদীন ও কামেল ব্যক্তি ছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর ভিকান ঠাকুর নামে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কার্য পরিচালনা করতেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন বিশ্বস্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি কোম্পানীর দেওয়ানী পদ পর্যন্ত লাভ করেছিলেন। এ সুযোগে তিনি বেশ জমি জমার মালিক হয়ে বিরাট জমিদার হয়ে যান। তার জমিদারীর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ বন্দরটি অন্যতম। পরবর্তীকালে তারই প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সহায়তায় হিন্দু দেবতা নারায়ণের নামানুসারে নারায়ণগঞ্জ এবং লক্ষ্মী দেবীর নামানুসারে ১৮৯০ সালে মিয়া সাহেব ময়দান এলাকাটিকে লক্ষ্মী বাজার নামে নামকরণ করা হয়। এখানে পূর্ব হতেই একটি বাজার গড়ে উঠেছিলো। ভিকান ঠাকুর অত্র এলাকার রাজা বাবুর বাড়ীতে লক্ষ্মীদেবী ও নারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

কথিত আছে জনৈক সন্নাসী কর্তৃক তিনি পাঁচটি নারায়ণ চক্র লাভ করেছিলেন। সন্নাসী প্রাপ্ত নারায়ণ মূর্তিগুলো তিনি নারায়ণগঞ্জ বন্দরে, ইন্দ্রাকপুরে পঞ্চাসী ঘাটে,

লক্ষ্মীবাজার রাজা বাবুর বাড়ীতে, ঢাকার নরসিংজির আখড়ায় স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে নারায়ণগঞ্জ বন্দরটি গর্ভমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করার মনস্থ করলে ভিখান ঠাকুর তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ ডগলাসের কাছে ১৭৯০ সালে একটি প্রতিবাদ লিপি প্রদান করেছিলেন।

১৯৩৬ সালের কিছু পরে লক্ষ্মীবাজার এবং বাংলা বাজারের কিয়দংশের নাম বিপ্লবী নেতা নেতাজী সুভাষ বোসের নামানুসারে ঢাকা পৌর সভা নামকরণ করেন সুভাষবোস এভিনিউ। নেতাজী ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক পদে বরিত হন। পরে তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুভাষ বোস কোন দিনই গান্ধীজির অত্যুগ্র অহিংসাবাদে আস্থাশীল ছিলেন না। অহিংসাকে অস্ত্র হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটায় তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি গঠন করেন এবং তাঁর প্রধান হন। তিনিই গঠন করেছিলেন বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় অগ্নি মন্ত্রে দিক্ষীত বীর বাঙ্গালী দলের অনেকে। বিপ্লবী ছাত্র সমাজ, বিপ্লবী অনুশীলন দল, যুগান্তর দল, পূর্ণ দাসের দল, হেমচন্দ্রের মুক্তি সংঘ, লীলা রায়ের শ্রী সংঘ ও মাষ্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী সংঘ।

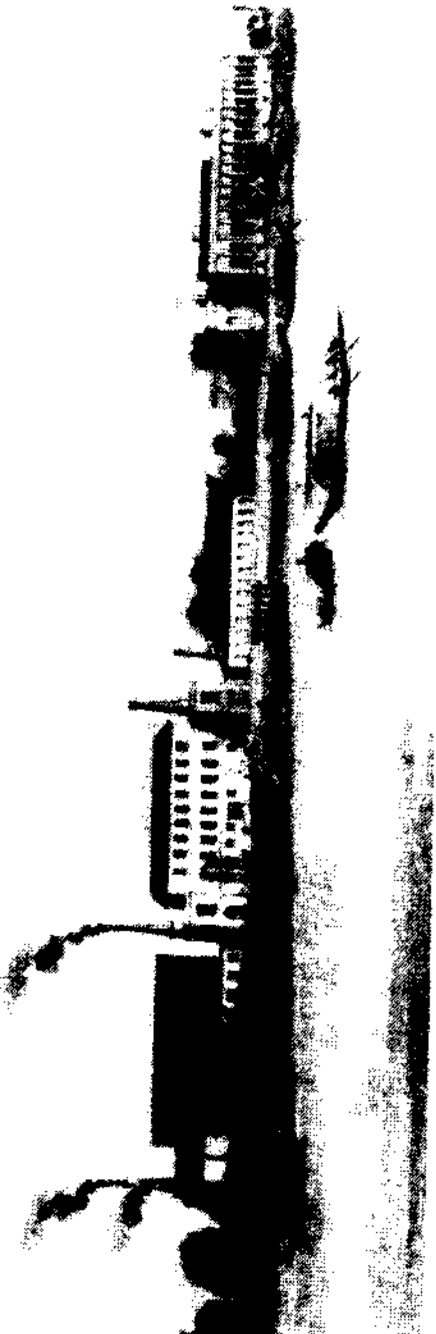
এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে কংগ্রেসের অহিংসাকে অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে ১৯২৯ সালের মে মাসে নেতাজী চট্টগ্রামে সফরে আসেন এবং ১১ই মে রাত্রে মহালক্ষ্মী ব্যাংকের একটি গোপন কক্ষে বিপ্লবী নেতা গণেষ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও ত্রিপুরা সেনের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনায় স্থির হয় কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ছদ্মবরণে তারা যুবকদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অনুপ্রাণিত করে তুলবেন। সে আলোচনার পরই চট্টগ্রামের বিভিন্ন মহল্লায় গড়ে ওঠে ক্লাব, সমিতি, সংঘ, ব্যায়ামাগার, লাইব্রেরী, কুস্তির আখড়া। মাষ্টার দা সূর্যসেন এই যুব সংঘের যুবকদের নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন এবং ঐ সব সংস্থাই সশস্ত্র বিপ্লবের উপযোগী যুবক তরুণ ছাত্র সংগ্রহের কর্ম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। এসব বিভিন্ন ধরনের সংস্থা শুধু চট্টগ্রামেই নয় বাংলার বিভিন্ন স্থানসহ ঢাকাতেও গড়ে উঠেছিলো। প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো অনুশীলন সমিতি। ফলে ১৯৩২-৩৩ সালে ঢাকা জেলাসহ সারা পূর্ব বঙ্গে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির জোয়ার বয়ে যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছাত্রদের বিপ্লবী দল

গড়ে ওঠে। বিশেষ করে হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের খুব কম পরিবারের ছেলেরা এই রাজনীতির অঙ্গন থেকে রেহাই পেয়েছিলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তিনি জার্মানীতে পালিয়ে যান। সেখান হতে ভারতের আজাদী হাসিল সম্ভব হবে না ভেবে জাপানে চলে আসেন এবং জাপানের সহায়তায় ভারতীয় সেনা বাহিনীর কিছু লোক ও বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত লোকদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। উদ্দেশ্য জাপানের সহায়তা ও ছত্র ছায়ায় ভারতবর্ষকে ইংরেজদের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে আজাদ করবেন। সে সময় তিনি সারা ভারতে কিংবদন্তির নায়ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। যুদ্ধের সময়ই তিনি কবে কেমন করে মৃত্যুবরণ করেন, সে রহস্য আজও উদঘাঠিত হয়নি। তার মৃত্যু নিয়ে সে সময় সারা ভারতের নেতৃবর্গের মধ্যে নানা সংশয় ছিলো। কেউ বলতেন আত্মগোপন করেছেন, যুদ্ধ শেষ হলেই পুনরায় আবির্ভূত হবেন ইত্যাদি। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পরও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তখনও অনেক লোকের মনে বিশ্বাস ছিলো তিনি প্রবাসী জীবন ত্যাগ করে স্বদেশে আগমন করবেন। কিন্তু তার দলের অনেকে ভারতে ফিরে আসলেও তিনি আর আসলেন না। বেশ কতক বছর তার মৃত্যু নিয়ে জল্পনা করার পর স্থির বিশ্বাস হলো তিনি আর ইহজগতে নেই। রয়েছে শুধু তার বিপ্লবী আদর্শ।

তিনি কংগ্রেস সভাপতি পদে বরিত হয়ে ঢাকায় একবার এসেছিলেন সে সময় অন্যান্য এলাকার ন্যায় ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে জগন্নাথ সাহা রোডে পুষ্পরাজ সাহার পুকুর পাড়ে তাকে বিপুল সংবর্দ্ধনা দেওয়া হয়েছিলো।

মিলব্যারাক এলাকায় ১৮৫৮ সালের পূর্বে ঢাকা সুগার কোম্পানীর অধীনে একটি সুগার মিল ছিলো। ১৭৮৫ সালে এখানে 'ফ্লাসিস ফ্লাওয়ার মিলু'ত্ম একটি ময়দা কলও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭-৫৮ সালে সারা ভারতে সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়। সিপাহী বিপ্লব দমনের উদ্দেশ্যে ইংরেজ নৌসেনাগণ এখানেই অবস্থান করে এবং বিপ্লব দমনে তৎপর হয়ে উঠে। ইংরেজ নৌসেনারা এখানে অবস্থান করতো বলে তখন থেকেই এ এলাকাটি মিল ব্যারাক নামে পরিচিত হয়ে আসছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ হওয়ায় এখানেই প্রাদেশিক পুলিশের ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। বর্তমানে এখানে সরকারী খাদ্য দফতরের গুদাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।



১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী তীরস্থ একটি চিনির কল ও উহার ম্যানেজারের বাসভবন।
এটি মিলব্যারাক নামে পরিচিত

এই মিল ব্যারাকের নিকটেই বেহারী সাধু নামে একজন নাম করা সাধু ছিলেন। তিনি বহু অলৌকিক কীর্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সিদ্ধিলাভের স্থানটি আজও মুসলমানরা বিশেষ ভক্তি সহকারে রক্ষা করে আসছে। তাছাড়া কল ঘরে দুটি কবর ছিলো। কবর দুটি বৃটিশ আমলে মেজর চামনি সংস্কার করে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে লোক জনকে জিয়ারত করার অনুমতি প্রদান করেন। কবর দুটি কোন আফগান পীরের ছিলো বলে ধারণা করা হয়।

মিল ব্যারাকের নিকটে রয়েছে আলমগঞ্জ। বাদশাহ আওরঙ্গজেব ওরফে আলমগীরের নামানুসারে এর নাম আলমগঞ্জ রাখ হয়। এখানেই ছিলো পাঠান দুর্গ বা পাঠান ফোর্ট। এটি বেগ মুরাদ খাঁ কেল্লা নামে পরিচিত ছিলো। অবশ্যি এখন তার কোন চিহ্নই নেই। সেসব বিলীন হয়ে গেছে বুড়িগঙ্গা নদীগর্ভে। আলমগঞ্জে গোংগা শাহের মাজার রয়েছে। মাজার সংলগ্ন গম্বুজওয়ালা একটা মসজিদ ছিলো। কথিত আছে, গোংগা শাহ্ কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন না সাধারণত চুপচাপ থাকতেন। কোন নজরানাই তিনি গ্রহণ করতেন না। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না বলেই লোকে তাঁকে গোংগা বা বোবা শাহ্ বলতো। মির্জা গোলাম পীর ছিলেন গোংগা শাহের বিশিষ্ট ভক্ত। তিনি ছিলেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অন্যতম। গোংগা শাহের জন্য তাঁর বাড়ি থেকে খানা আসতো। মন চাইলে শাহ্ সাহেব ওইখানা খেতেন নতুবা বাহককে খেতে দিতেন। গোংগা শাহের মাজারের উত্তরে রয়েছে কালাচাঁদ শাহের মাজার। তিনিও একজন কামেল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। জনশ্রুতি আছে, তিনি বহু অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।

পোস্তগোলার সঠিক উচ্চারণ 'পুশ্‌ত্‌-এ কিলা'। মানে কেল্লার পেছনে। পোস্তগোলা এলাকাটি পাঠান দূর্গ বা পাঠান ফোর্টের পিছনে অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহামতি শের শাহ্ যে প্রখ্যাত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন, তার সাথে সংযোগ রক্ষা করতো বর্তমানের নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-টঙ্গী রোড। বেগ মুরাদ খানের কেল্লা ছিলো এই রাস্তার উপরে দোলাই খালের প্রবেশ মুখের দুই ধারে, একটি বর্তমান মিল ব্যারাক আরেকটি উলটিনগঞ্জ নদী তীর এলাকায়। তখনকার দিনে দোলাই খালকে দুলাই নদী নামে অভিহিত করা হতো। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই ছিলো কেল্লাটির অবস্থান। পরবর্তীকালে পুশত্-এ কিলা নামটি বিকৃত হয়ে পোস্তগোলা নাম ধারণ করেছে।

বর্তমানে যে এলাকাটি সাঁচি বন্দর নামে পরিচিত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেটি 'সাঁচি পান দারিবা' নামে খ্যাত ছিলো। তৎকালে এখানে একটি উন্নত মানের পান

বিক্রয় কেন্দ্র ছিলো। আগে পান ছিলো অতিথি আপ্যায়নের প্রধান উপাদান। এজন্যে মানুষের কাছে পানের মর্যাদা ছিলো অনেক বেশী। মনে হয় এখানে একটি উৎকৃষ্ট ধরনের পান কেন্দ্র গড়ে ওঠার ফলেই এ এলাকটি 'সাঁচি পান দারিবা' বা সাঁচি বন্দর নামে সবার কাছেই পরিচিত হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালে প্রবল ঝড়ে উৎকৃষ্ট ধরনের পান চাষ এদেশে অত্যধিক পরিমাণে কমে যায়। ফলে এই পান কেন্দ্রটি ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। এর কোন নিদর্শনই আর বাকি থাকে না। অবশ্যি সদরঘাটের পূর্বাঞ্চলে শ্যামবাজার এলাকায় পানের ব্যবসা বেশ ভালভাবেই চলছে। ঢাকা পৌরসভা ১৯৩৬ সালের পূর্বে এ এলাকাটির নাম পালটিয়ে পি, কে, রায় রোড রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বাংলাবাজারের একটি অংশের নাম পি, কে, রায় রোড রাখার সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে শেষে এর পূর্ব নামই বহাল রাখা হয়। তথাপি সাঁচি পান দারিবার স্থলে এ এলাকাটি ঢাকাবাসীর কাছে সাঁচি বন্দর বলে অধিকতর খ্যাত। পরবর্তীকালে এ এলাকাটি ঢাকাবাসীর কাছে মশহুর হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে এখানে বারবনিতাদের বিরাট বসতি ছিলো। অবশ্যি পুরনো ঢাকার অনেক জায়গাতেই এদের কিছু কিছু বসতি গড়ে উঠেছিলো। ১৯০১ সালের এক জরিপে দেখা যায়, ঢাকা শহরে বারবনিতাদের সংখ্যা ছিলো ২ হাজার ১শ ৬৪ জন। বেসরকারী হিসেবে এদের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময়ে ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিলো ৯০ হাজার ৫শ ৪২ জন। শহরের লোকসংখ্যার তুলনায় রূপাজীবীর এ সংখ্যাধিক্য সত্যই উদ্বেগের কারণ ছিলো।

১৮৬৪-৬৫ সালের কোন এক সময়ে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিলো, ঢাকার রাজপথের উভয় পার্শ্বে যেসব সুরম্য অট্টালিকা ছিলো তার অধিকাংশতেই বারবনিতাদের আড্ডা ছিলো। সমাজে এসব দুষ্ট-চক্র দমনের ব্যবস্থা তেমন ছিলো না। কিন্তু পত্রিকা মারফত বারাঙ্গনাদের শহর থেকে উৎখাত করে তাদের পুনর্বাসনের যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হতো। অবশ্যি সামাজিকভাবে এই অনাচার প্রতিরোধের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিলো না। বরং সমাজে তারা একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে ঢাকাবাসীকে চরিত্রহীন ও অসামাজিক করে তুলতো। ঢাকা শহরে তৎকালে নাগরিকদের জন্য চিত্তবিনোদনের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিলো না। তাই শহরবাসীদের অধিকাংশই বারবনিতাদের সঙ্গ লাভ করে বেশ আনন্দ ও ফুর্তি উপভোগ করতো। শহরবাসীর এহেন কার্যকলাপে মনে হতো বারবনিতাদের সঙ্গলাভই ছিলো তাদের আমোদ-প্রমোদের প্রধান মাধ্যম। প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বহু ব্যক্তি ঢাকায় আসতেন

আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে।

ঢাকা শহরের নাগরিক জীবনে দেহপসারিণীদের আধিপত্য এত বিস্তারলাভ করেছিলো যে তারা সমাজে একটা দুষ্ট ক্ষতের মতোই বিরাজ করতো। তাদের ক্রুর ছোবলে শত শত সোনার সংসার ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। এদের লালসার শিকার হয়ে বহু যুবক সংসার বিরাগী হয়ে প্রিয়তম স্ত্রীকে ত্যাগ করে পঙ্কিলতার অতলে তলিয়ে যেত। তৎকালে মানুষ বারবনিতাদের জন্য এতই পাগল ছিলো যে বহু প্রৌঢ় ব্যক্তিও তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ত্যাগ করতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করতো না। তাদের খপ্পরে পড়ে কত ধনী নির্ধন হয়ে গেছে, কত সবল সুস্থ লোক হয়েছে কালব্যাধি যৌন রোগের শিকার এসবের হিসেব কে-ই-বা রাখতো সেদিন।

শত বর্ষের প্রচেষ্টায় সমাজদেহ থেকে এদের নির্মূল করা সম্ভব না হলেও সাঁচি বন্দর থেকে এদের উৎখাত করা সম্ভব হয়েছিলো। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা এত উন্নত হলেও ঢাকা শহর থেকে বারবণিতাদের একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। আজও বহু দেহপসারিণী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করছে। কিন্তু সেকালের মত তাদের দাপট আর তেমন নেই। নগরবাসীও তাদের সম্পর্কে এখন যথেষ্ট সজাগ ও আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। সমাজ বিবর্তনের অমোঘ ধারায় তারা হয়তো একদিন শহর থেকে নির্মূল হয়ে যাবে, পূনর্বাসিত হবে সমাজের মধ্যেই-বিভিন্ন মহল থেকেই এরূপ দাবী পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হচ্ছে।

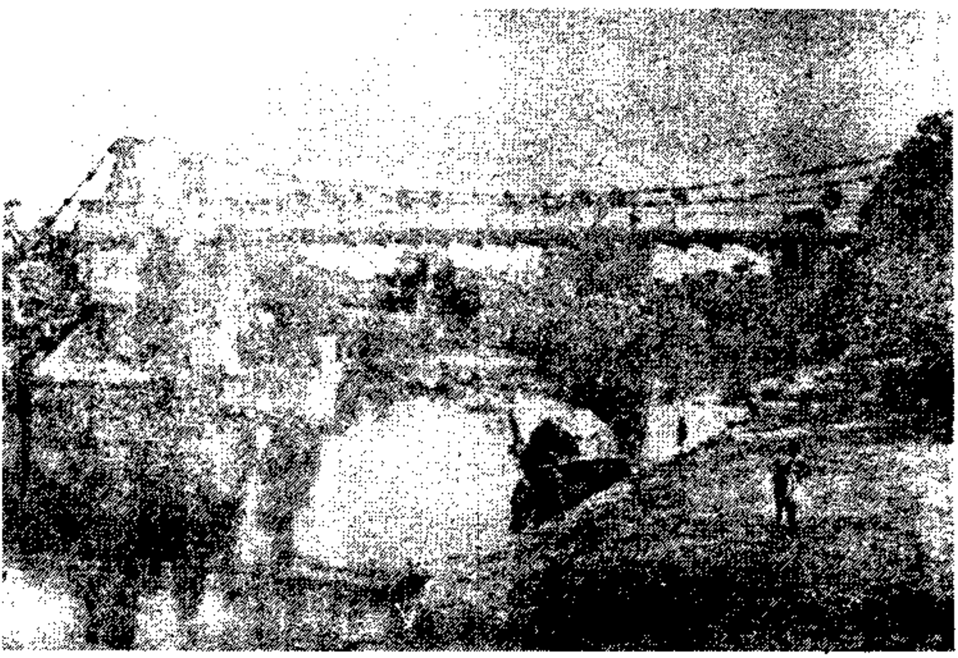
তৎকালে ঢাকায় বারবণিতাদের কেন্দ্র করেই অধিকাংশ বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হতো– এমন কি খুন-জখম, হত্যালীলাও সংঘটিত হতো। বারবণিতারা পয়সার বিনিময়ে দেহদান করেই সে পুরুষের কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্য এক পুরুষকে প্রলোভিত করতো। কিন্তু উভয় পুরুষই এটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারতো না। তাদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হতো। ফলে তাদের মধ্যে বাধতো বিবাদ–এমন কি সে বিবাদ এতই উত্তেজনার সৃষ্টি করতো যে একজন অন্যজনকে খুন করতেও দ্বিধা করতো না। আজকাল এমন ঘটতে আর দেখা যায় না। সমাজে এসেছে বিবর্তন-মানুষের মনে সমাজ সচেতনতার পরশ সেই সাথে বারবণিতাদের ব্যবসায়ের ধরণ গেছে বদলিয়ে, এ ব্যবসায়েও আধুনিকতার পরশ লেগেছে বৈকি।

বাংলাবাজার এলাকাটি ছিলো মোঘল আমলের আগের ঢাকার একটি অতিপুরাতন অংশ। সেই যুগে এ এলাকাটি ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র। পরবর্তীকালে ঢাকা শহর পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হয় এবং চকবাজার হয়ে ওঠে এর মধ্যমণি। কতিপয় পরিব্রাজক 'বেঙ্গলা নগর' এর কথা উল্লেখ করেছেন। অনেকে

মনে করেন বাংলাবাজার ছিলো সেই নগরেরই কেন্দ্রস্থল। রোমান নাবিক ভারটোমানাস ১৫০৬ খ্রীস্টাব্দে লিখে গেছেন যে বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট সিল্ক ও সূতা তৈরী হতো এই 'বেঙ্গলা'তে। সে যুগের ঢাকাই মসলিন ও সূতীবস্ত্র শিল্পের কথাই সম্ভবত তিনি উল্লেখ করেছেন। যাহোক, বাংলাবাজার এলাকাটি যে খুবই প্রাচীন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৩৬ সালে সাবেক জি, পি, ও, ভবন থেকে ইস্টার্ন ক্রসিং পর্যন্ত বাংলাবাজার রোডের নাম পরিবর্তন করে পি, কে, রায় রোড রাখা হয়। পরে আবার পরিবর্তন করে এর নাম রাখা হয় সুভাষ বোস রোড। তবে এ রাস্তাটি বাংলাবাজার নামেই সমধিক পরিচিত।

বৃটিশ আমলে রাজকার্য পরিচালনার জন্যে বৃটেন থেকে বহু রাজকর্মচারি এদেশে আগমন করেন। এসব বৃটিশ কর্মচারিদের নামেও ঢাকায় কতিপয় রাস্তার নামকরণ করা হয়। ওয়ালটার সাহেবের নামানুসারে ওয়ালটার রোডের নামকরণ করা হয়েছে। ১৮২৩ সালে মিঃ ওয়ালটার ঢাকার কালেকটর ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সহযোগিতায় ঢাকার বিখ্যাত লোহার পুল নির্মিত হয়।



বৃটিশ যুগের লোহার পুল

১৮৭৮ সালে পুলটির সংস্কার সাধন করে আধুনিক পুলে রূপান্তর করা হয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় পুলের নিচে একটি বাজারও স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর লোহার পুলটি পুনরায় মজবুত করে স্থাপন করা হয়েছে। ঐ পুলের নিকটে কেশব ব্যানার্জী রোডে বিশিষ্ট কামেল ব্যক্তি হযরত মাস্তাম শাহের মাজার রয়েছে। কেশব ব্যানার্জী মোরা পাড়ার জমিদার ছিলেন। তারই নামানুসারে সড়ক পথটির নাম হয়েছে কেশব ব্যানার্জী রোড। তাছাড়া আজকের ওসমানী উদ্যানে যে কামানখানি দেখা যায় সেটিকে ওয়ালটার সাহেব চকবাজারে স্থাপন করেছিলেন। কামানটি "বিবি মরিয়ম" নামে পরিচিত। বৃটিশ শাসনামলে তিনিই সর্বপ্রথম ঢাকা শহরের উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। এজন্য তিনি ১৮২৩ সালে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ঢাকাবাসীদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে এই কমিটিই ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি নামে অভিহিত হয়। কিছুকাল আগেও ঢাকাবাসীরা ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে শুধু কমিটি নামেই অভিহিত করতো। ঢাকাবাসীরা ওয়ালটার সাহেবের জনহিতকর কার্যাবলী দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলো যে তার নামে একটি ছড়া বেঁধে আবৃত্তি করে বেড়াতো। ছড়াটি হচ্ছে–

ওয়ালটার সাহেবনে পুল বানায়া
উনকা নিচে গঞ্জ বসায়া
আওর চাওকাধারি কামান,
গূড় গূড় চাল–!

ওয়ালটার রোডে সীতানাথ বাবু নামে একজন বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। তার ভবন তড়িৎ নির্মাণ কল্পে পাঁচ হাজার হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে রাত্রিতেও বাড়ীর নির্মাণ কাজ করিয়েছিলেন।

ডাঃ জেমস ওয়াইজের নামানুসারে ওয়াইজ ঘাটের নামকরণ করা হয়। তিনি ছিলেন ঢাকার সিভিল সার্জন। প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের প্রতি তার আগ্রহ ছিলো অপরিসীম। ঢাকার নাগরিক জীবন সম্পর্কে তার ঔৎসুক্য ছিলো প্রবল– এজন্যে ঢাকার নাগরিকদের সাথে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করে চলতেন। তিনি ঢাকা শহরকে খুবই ভালবাসতেন। ১৮৮৩ সালে তিনি "নোটস অন দি রেসেস কাস্টম এণ্ড ট্রেডস্ অব ইস্টার্ন বেঙ্গল" নামে একখানি খুবই তথ্য বহুল বই লিখেছিলেন। তিনি দীর্ঘ দিন ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৮৬৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠনের কিছুকাল পর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কার্যালয় স্থাপিত

হয়েছিলো ওয়াইজ ঘাটে। ডাঃ ওয়াইজ সাহেবেরা দু'ভাই ছিলেন। ছোট ভাই-এর নামের পরেও ওয়াইজ ছিলো। লোকে তাকে মিঃ ওয়াইজ নামেই চিনতো। তিনি ছিলেন একজন নীলকর। পরে নানা কৌশলে মহা বিত্তবান ও ভাওয়াল পরগনার জমিদার হয়ে উঠেন। তার ক্ষমতা এতদূর গড়ায় যে পল্লী অঞ্চলের জনগণ তাকেই সরকার বাহাদুর মনে করতেন। তিনি "ঢাকা নিউজ" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পত্রিকাটি ইংরেজ বিশেষ করে নীল করদের সমর্থনে ন্যস্ত ছিলো। তার বিশাল জমিদারী ভাওয়াল স্টেটটি ১৮৫১ সালে মাত্র চার লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকার বিনিময়ে ভাওয়াল রাজ পরিবারের কালী নারায়ণ রায়ের কাছে বিক্রি করে দেন।

পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশের প্রথম লেঃ গভর্ণর মিঃ রাম কিলডে ফুলার এর নামানুসারে ফুলার রোডের নামকরণ করা হয়। তিনি সুশাসক ও প্রজাবৎসল ছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের দাবিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের যে শ্রেণীটি বিক্ষোভ করেছিলো মিঃ ফুলার তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তৎসময় শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বাংলাদেশে বিপ্লবমন্ত্রের উদগাতা। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি প্রথমে বরোদা রাজ সরকারে মাসিক পনর শত টাকা বেতনে গাই কোয়ারের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ নেন। দেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই লোভনীয় পদ ত্যাগ করে মাতৃভূমি বাংলায় চলে আসেন। শ্রী অরবিন্দই সর্ব প্রথম তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমার, যতিন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র কানুনগোকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এবং বারীন্দ্র ও হেমচন্দ্রকে লেঃ গর্ভনর স্যার রামকিল্ডে ফুলারকে হত্যা করতে পাঠান কিন্তু তারা সফল হয়নি। ঐ সনেই তথা ১৯০৭ সালে ২৩শে ডিসেম্বর ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি, সি এলেনকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

কিন্তু গভর্নর মিঃ ফুলার সাহেবের সাথে তদানীন্তন ভাইস রয় লর্ড মিন্টোর মতের মিল ছিলো না। যার ফলে পরবর্তীকালে সিরাজগঞ্জের একটা স্কুল সংক্রান্ত সামান্য ব্যাপার নিয়ে নীতিগত বিরোধ দেখা দেয়ায় শেষ পর্যন্ত মিঃ ফুলার পদত্যাগ করেন। তিনি শুধু শাসন কার্যেই দক্ষ ছিলেন না। তিনি একজন সুপণ্ডিতও ছিলেন। বাংলার মুসলমানগণ তার নামানুসারে কতিপয় ছাত্রাবাসের নামকরণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা পৌরসভা ফুলার রোডের নাম পরিবর্তন করে স্যার সৈয়দ আহমদ রোড নামকরণ করেন। কিন্তু তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার ওই নামের অনুমোদন দেন নাই।

মিঃ ফুলারের পর পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রদেশে গভর্নর হয়ে আসেন মিঃ ল্যান সেলট

হিয়ার। ১৮৯৩ সালে তিনি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তারই নামানুসারে হেয়ার রোডের নাম রাখা হয়।

ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে, টি, র‍্যাঙ্কিন ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁরই নামানুসারে র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীট-এর নামকরণ করা হয়।

১৮৬৬ সালে ঢাকার কালেকটর এবং ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান মিঃ ডি, আর, লিয়াল এর নামানুসারে পটুয়াটুলির নাম পরিবর্তন করে লিয়াল স্ট্রীট নামকরণ করা হয়। ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকার অফিসিয়েটিং ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এই রাস্তাটি লয়াল স্ট্রীট নাম হলেও জনসাধারণের কাছে পটুয়াটুলি নামেই অবহিত হয়ে থাকে। এই লিয়াল সাহেবের নামানুসারে পাকিস্তানের লয়ালপুর শহরের নাম হয়েছে। যা আজ ফায়েসলাবাদ নামে পরিচিত। এ শহরের বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা অবলম্বনে কয়েকটি রাস্তার সংযোজন করা হয়।

পটুয়াটুলিতে এক সময় পটুয়াদের নিবাস ছিলো। পূর্ববঙ্গে যে সব মুসলমান ফিতা, রজ্জু, পায়জামার দড়ি, নেট বিশেষ করে গেছিয়া (টাকা রাখার ছোট থলি) তৈরী করতো। সাধারণত তারা পাটেয়া বা পটুয়া বলে সমাজে পরিচিত ছিলো। সেই পেশাজীবিদের নামানুসারেই এ এলাকার নাম হয়েছিলো পটুয়াটুলি। পটুয়াটুলি বৃটিশ যুগে ঢাকার অভিজাত লোকদের জন্য বিপণি কেন্দ্র ছিলো বর্তমানে তার অভিজাত্য হারালেও বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এ রাস্তায় ব্রহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাম মোহন রায় লাইব্রেরী ও রিডিং রুমটি এক কালে বেশ জমজমাট ছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত হিন্দুরাই এই ব্রহ্ম সমাজের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

আর যারা হাতপাখা বানাতো তাদের বাসস্থান ছিলো পাংখাটুলিতে। তা ছাড়া শহরের বাইরে শহরতলির মুসলমান কৃষকেরাও সে সময় হাত পাখা বানাতো। কোন কোন সময় হিন্দু বৈরাগীরাও হাত পাখা বানিয়ে বাজারে বিক্রি করতো। ১৮৯৩ সালে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ লাটম্যান জনসন। তারই নামানুসারে জনসন রোডের নামকরণ করা হয়। ১৯০৯-১৯১০ সালে তিনি বিভাগীয় কমিশনার হন। ঢাকা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিলো প্রবল। তিনি ঢাকা পৌর সভার ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত সময়কালের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেন।

জনসন রোডটি চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ হতে রায় সাহেব বাজার পুল পর্যন্ত

গিয়েছে। এ পথেই রয়েছে বাপটিষ্টচার্চ। একটু উত্তরে বৃটিশ যুগে ইম্প্রিয়েল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া ছিলো। এই ইম্প্রিয়েল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী আছে। তা হলো ব্যাংক যে সময় ভারত বর্ষে ছিলো না তখন মল্লিক উপাধিধারীগণই সারা ভারতে সুদের ব্যবসা করতেন তথা ইম্প্রিয়েল ব্যাংক। তাই অনেকেই মনে করেন মল্লিকগণের দ্বারা ভারতে ইম্প্রিয়েল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ থাকে পারস্য ভাষায় মল্লিক শব্দের অর্থ রাজা বা আমীর। অনেক হিন্দু বিশিষ্ট ব্যক্তি মুসলিম শাসক হইতে তৎকালে মল্লিক উপাধি পেয়েছেন।

আন্টাঘড় ময়দানের সামনের গীর্জাটিতে আজও বড় ঘড়িটা চলছে। গির্জাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে জেল খানায় কয়েদীদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিলো বলে জানা যায়। সামনে রয়েছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনিষ্টিটিউট। যাহা ১৯২৫ স্যালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি অপরিসর পুরাতন ভবনে। পরবর্তিতে সম্প্রসারিত হয়ে নির্মিত হয়েছে সাততলা বিশিষ্ট ভবন। হাসপাতালের প্রথম গভার্নিং বডির সভাপতি ছিলেন স্যার পি, সি, রায় (কেটি, সি, আই, ই) সহ-সভাপতি ছিলেন স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন ও ব্যারিষ্টার পি, কে ঘোষ। সুপারিনটেণ্ডেন্ট হিসেবে যোগদান করেন ঢাকার অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ শশাঙ্ক মোহন মুখার্জি। এই ইনষ্টিটিউটটি স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান ব্রত নিয়ে আর বৃটিশ সরকারের সহিত অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ ও পাক আমলে এখানকার পাশ করা ডাক্তারদের "ন্যাশনাল পাশ" ডাক্তার বলে আখ্যায়িত করতো।

মুকুল সিনেমা হলের মালিক মুকুল ব্যানার্জি যখন হলটি নির্মাণ করেন তখন রাজমিস্ত্রিদের পরিশ্রমিক না দিয়ে তাদের ঐ হলে শেয়ার হোল্ডার হিসেবে এবং অর্থের পরিমাণ শেয়ার মানি হিসেবে গণ্য হবে বলে রাজ মিস্ত্রি এবং শ্রমিকদের আশ্বাস দেন। কিন্তু পরে দেখা যায় শেয়ার রেজিষ্টারে তাদের নাম নেই। ফলে ঐ এলাকায় চাপা অসন্তোষ দেখা যায়। পরবর্তিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালে পুরনো আক্রোশের বশবর্তি হয়ে হলের মালিক মুকুল ব্যানার্জিকে ছুরিকাঘাত করা হয়। ঘাতক মুহিউদ্দিনের দীপান্তর হয়। হলটির বর্তমান নাম আজাদ সিনেমা। সঙ্গে যে ভবনটিতে বর্তমানে জেলা প্রশাসনের কাজকর্ম চলে সে ভবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সিভিল সাপ্লাই তথা রেশনিং অফিস স্থাপন করা হয়েছিলো। এ সড়কেই রয়েছে ঢাকা জেলা পরিষদ ভবন। রায় সাহেব বাজারটিও এ সড়কেই অবস্থিত।

পাক আমলে জনসন রোডের নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (মরহুম) নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের নামানুসারে লিয়াকত এ্যাভিনিউ নাম করা

হয়। শহীদ লিয়াকত আলী খান পাকিস্তান আন্দোলনের একজন পুরোধা ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের মাত্র কবছর যেতে না যেতেই রাওয়ালপিণ্ডির এক বাগে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা দানকালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। আততায়ীকেও সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলা হয়। ফলে এ ষড়যন্ত্রের রহস্য আজো অ-প্রকাশিত রয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর হতে সড়কটি পুনরায় জনসন রোড নামেই অভিহিত হচ্ছে।

বৃটিশ ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড মিণ্টো। তারই নামানুসারে মিণ্টো রোড, মিণ্টু রোডের লালদালানগুলোতে বৃটিশ যুগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাসভবন ছিলো। ১৯৪৭ সালের পর মন্ত্রীদের জন্য ঐ সব ভবন বরাদ্দ করা হয়। সদর ঘাটের নিকট একটি রাস্তা রয়েছে যার নাম সিম্পসন রোড। মিঃ সিম্পসন ১৮৭১ সালে ঢাকায় বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন। তারই নামানুসারে সিম্পসন রোড, এ রোডে মুরাপাড়ার জমিদারের বিরাট ভবন রয়েছে। যেখানে বর্তমানে কোতয়ালী থানা অবস্থিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ ভবনটিকেই পার্টি হাউজ নামকরণ করে প্রাদেশিক সংসদ সদস্যদের হোস্টেল করা হয়। এখানে নামী-দামী নেতা উপনেতা অবস্থান করে গেছেন। এ মহল্লায় ফায়ার সার্ভিসের সদর দফতরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। বর্তমানে এটি আঞ্চলিক দফতর।

১৮৮৭ সালে ঢাকায় বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন মিঃ ডবলিউ আর লারমিনি। তারই নামানুসারে লারমিনি স্ট্রীট। মিঃ আর, এফ র‍্যামপিনি ছিলেন একজন বেসামরিক কর্মকর্তা। ১৮৮৪ সালে নির্বাচন প্রথা চালুর আগে তিনি ঢাকা পৌর সভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তারই নামানুসারে র‍্যামপিনি স্ট্রীট।

অনেকের ধারণা মহীশুরের টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণেল বেইলী সুনাম অর্জন করে ছিলেন তজ্জন্য তারই নামানুসারে বেইলী রোড হয়েছে। তবে আমার ধারণা ওহাবী আন্দোলন দমনকালে স্পেশাল বেঙ্গল পুলিশের ডি, আই, জি, মিঃ জে, এইচ বেইলী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে ছিলেন এজন্য তারই নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে বেইলী রোড। উল্লেখ্য ঢাকার ভুট্টো হাজীর উক্ত আন্দোলনে ওৎপ্রোতভাবে জড়িতের বিষয়ে তদন্ত কাজে ডি, আই, জি মিঃ বেইলী সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বৃটিশ শাসনামলের কোন এক সময়ে মিঃ ইংলিশ (বা ইংলেস) ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন। তারই নামানুসারে ইংলিশ রোডের নামকরণ হয়েছে। কিন্তু শব্দ বিভ্রাটের দরুন অনেকেই মনে করেন, এই অঞ্চলে কোন এক সময়ে ইংরেজদের বসতি ছিলো। তাই এই রাস্তার নাম ইংলিশ রোড রাখা হয়েছে। ফ্রেঞ্চ রোডের

বেলায়ও অনেকে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে। তাদের ধারণা ফরাসী বসতি স্থাপনকারীদের স্মরণেই রাস্তাটির নাম ফ্রেঞ্চ রোড রাখা হয়েছে। আসলে ১৯১৮ সালে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন মিঃ এফ, সি, ফ্রেঞ্চ। তারই নামানুসারে এ রাস্তার নাম ফ্রেঞ্চ রোড। তিনি নর্থব্রুক হল লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই রাস্তা দুটোর নাম ইংলিশ রোড ও ফ্রেঞ্চ রোড হলেও অথবা এই এলাকায় ইংরেজ ও ফরাসীদের বসতির ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত থাকলেও জনসাধরণের কাছে এ অঞ্চলটি নয়া বাজার নামে পরিচিত।

মিঃ হার্নে ছিলেন জাতিতে আর্মেনিয়। তার বাস ভবন ছিলো আর্মানীটোলা এলাকায় যে স্থানে বর্তমান হাম্মাদীয়া স্কুল প্রতিষ্ঠিত। তিনি এক সময় ঢাকা পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। তিনি ঢাকার নায়েব নাজিমের অধীনে চাকুরী করতেন। তারই নামানুসারে একটি গলি পথের নামকরণ হয় হার্নী স্ট্রীট। এ এলাকার কিছু অংশ বলিয়াদির জমিদার কাজিমুদ্দিন সিদ্দিকীর নামানুসারে পৌর সভা কাজিমুদ্দিন সিদ্দিকী লেন নামকরণ করেন। এখানে মেথু মিয়া নামে আরেক জমিদারের বাস ভবন ছিলো। তার ওয়ারিশাগণই মৌলভীবাজার সংলগ্ন স্থানে তাজমহল সিনেমা হল স্থাপন করেন।

১৮৯৯ সালে ঢাকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার ছিলেন মিঃ স্যাভেজ। তারই নামানুসারে একটি রাস্তার নামকরণ হয় স্যাভেজ রোড। ১৯৬৭ সালে পৌর সভা এ নাম পরিবর্তন করে ঈশা খাঁ রোড নামকরণ করেন। কিন্তু তৎকালীন পৌর নিয়ন্ত্রক বিভাগীয় কমিশনার অনুমোদন না করায় সে নাম বহাল হয়নি। বাংলার ইতিহাসের বার ভুঁইঞাদের অন্যতম স্বাধীনচেতা বীর যোদ্ধা মসনদে-ই-আলী দেওয়ান ঈশা খাঁ। এদেশের মানুষ যখন ইংরেজদের গোলামীর জিনজিরে আবদ্ধ ছিলো তখন কত নাটকইনা ঈশা খাঁ নামে মঞ্চস্থ করতো। আর আজ স্বাধীন হয়েও স্বাধীনতা প্রিয় এই, বীর ঈশা খাঁর নামানুসারে রাস্তার নাম করতে পারিনি এর চেয়ে দুঃখ আর কি থাকতে পারে। তবে ভার্সিটি এলাকায় একটি পথের নাম ঈশা খাঁ রোড নামে অভিহিত হয়ে আসছে। দেওয়ান উপাধিধারী ঈশা খাঁনের বংশধররা এখনও ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ী এলাকায় বসবাস করছেন।

১৮৮৪ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অয়্যার এর নামানুসারে অয়্যার স্ট্রীট নামকরণ হয়েছে। অনেকেরই ধারণা সম্ভবতঃ অয়্যার শব্দটি বিকৃত হয়ে ওয়ারী হয়েছে। এ ধারণার ঐতিহাসিক কারণ এখনও নির্ণীত হয়নি। ওয়ারী এলাকাটি বৃটিশ সরকার একটি অভিজাত আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেন।

তজ্জন্য এখানকার জমি পদস্থ সরকারী চাকুরেদের মধ্যেই সাধারণত বণ্টন ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ রাখেন। বণ্টনকালে সরকার যে শর্ত আরোপ করেছিলেন তাহলো বিঘা প্রতি ছয় টাকা কর এবং তিন বছরের মধ্যে বাড়ী তৈরী করতে হবে। সে সময় সরকারী চাকুরীতে হিন্দুরাই বহাল ছিলো। মুসলমানদের জন্য তখন সরকারী চাকুরী বন্ধ ছিলো। সে কারণেই ওয়ারী এলাকাটি হিন্দু প্রধান হয়ে ওঠে।

ইংরেজ গ্রীক ও ফরাসীদের নামে ঢাকায় যেমন রাস্তাঘাট রয়েছে। তেমনি বিভিন্ন বিদেশী ব্যক্তি ও গোত্রের নামেও ঢাকায় কতিপয় রাস্তা রয়েছে। যেমন বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে মগদের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময়ে এরা মোঘল শাসকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিলো।

একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো মগ রাজাদের অনেকেই তাঁদের দেশীয় নাম ছাড়াও মুসলিম নাম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে হোসেন শাহ, সেলিম শাহ, কলিম শাহ্ ও সিকান্দার শাহের নাম শোনা যায়। তাঁরা ইসলামের কলেমা উৎকীর্ণ মুদ্রাও চালু করেছিলেন। ১৪৭০ সাল থেকে ১৬২৬ সাল পর্যন্ত এই শ্রেণীর মুদ্রা চালু ছিলো বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৬২০ সালে মগরা বাংলা আক্রমণ করেন। তাদের রাজা হোসেন শাহের সৈন্যাপত্যে তারা ঢাকা নগরীতেও প্রবেশ করে। অবশ্য ঢাকার তৎকালীন মোঘল সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ ফতেহজঙ তাদের বিতাড়িত করেন এবং মগদের যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রায় ৪ হাজার নৌযান দখল করে নেন।

১৬৩৫-৩৯ সালে চট্টগ্রামে আরকান রাজের মগ গভর্ণর ছিলেন মুকুট রায় বা ম্যাংগট রায়। ইনি ছিলেন আরাকান রাজার ভাইপো। মুকুট রায় এই সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সুবেদার ইসলাম খাঁর কাছে নিজের পরিবার-পরিজন ও দলবলসহ আত্মসমর্পণ করেন। মগদের এই আত্মসর্মপণকারী দলটিকেই মগবাজারে বসতি স্থাপন করতে দেয়া হয়। তজ্জন্যই এ বসতির নাম মগবাজার নামে পরিচিত হয়। সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলেও মগরা বসতি স্থাপন করে। এই মগরাও মোঘল ফৌজের কাছে পরাজয় বরণ করে এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে থাকে। তেজগাঁ অঞ্চলে ছোট মগবাজার নামেও একটি অঞ্চল আছে।

বড় মগবাজারে বিশিষ্ট বুজুর্গানেদীন হযরত শাহ্ নুরীর খানকা শরীফ ও মাজার রয়েছে। শাহ্ নূরীর পূর্বপুরুষ জনাব বাহাউদ্দীন বাগদাদের কোন এক স্থান থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি রাজশাহীর বিন্নাবাড়ির শাহ্ বাগু দেওয়ানের মুরিদ

হন। কালক্রমে কামেল ব্যক্তিগণের মধ্যে শামিল হয়ে তিনি শাহ্ বাহাউদ্দীন নাম ধারণ করেন। শাহ্ নূরী ও তৎপুত্র ও পৌত্রগণ সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, শাহ্ নূরীর পুত্রগণের মধ্যে দুটি জমজ পুত্র ছিলো। তারা বাল্যকাল থেকেই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। ভ্রাতৃদ্বয় বাগিচার ভৃত্যের কথা অমান্য করে একদিন কয়েকটি শসা খেয়ে ফেলে। ভৃত্য রাগারাগি করে শসা খাওয়ার কথা তাদের বাবার কাছে প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখালে তারা শসার খোসাগুলো গাছের দিকে ছুঁড়ে মারে। খোদার কি হুকুম, চোখের পলকে দেখা গেলো শসাগুলো গাছের যথাস্থানে পূর্ববৎ ঝুলছে এ দৃশ্য দেখে ভৃত্য অবাক হয়ে গেলো।

আরেক দিনের ঘটনা, বাগিচার আনার গাছে একটি আনার বেশ পুষ্ট হয়েছে। ক'দিনের মধ্যেই সেটি পেকে যাবে। শাহ্ নূরী আনারটিকে চোখে চোখে রাখার জন্যে ভৃত্যকে বলে রেখেছেন। মনিবের আদেশ অনুযায়ী ভৃত্য সেটিকে খুব যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করে। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয় ভৃত্যের অগোচরে একদিন আনারটিকে ছিড়ে খেয়ে ফেললো। ভৃত্য যখন দেখলো গাছে আনার নেই, তখন মনিবের ভয়ে সে কান্নাকাটি শুরু করে দিলো। ভৃত্যের অবস্থা দেখে ভ্রাতৃদ্বয় আনারের খোসাগুলি গাছের দিকে ছুঁড়ে মারতেই আনারটা আগের মতই ডালে ঝুলতে লাগলো। কিশোর বালক দ্বয়ের এসব অলৌকিক কাহিনী শাহ্ সাহবের কাছে প্রকাশ করলে তিনি মহা চিন্তিত হয়ে পড়েন।

এমনি আর একদিন জমজ ভাই দু'টি একই সঙ্গে খেলছিলো, এমন সময় সেই পথ দিয়ে শাহ্ সাহেবের এক মুরিদ কাপড় ঢাকা দিয়ে কিছু নিয়ে যাচ্ছিলেন। ভাই দু'টি জিজ্ঞেস করলো, অমন যত্ন করে কাপড় ঢাকা দিয়ে কি নিয়ে যাচ্ছেন? মুরিদান জবাব দিলেন, কি আর নিয়ে যাবো, সামান্য কটি কলা। ছেলে দু'টি কলা দিয়ে যাবার অনুরোধ জানালো। মুরিদান হাসতে হাসতে বললেন, কলা যে কাঁচা, খাবে কেমন করে। ছেলে দু'টি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আপনার কলা কিন্তু কাঁচাই হবে।

শিষ্য যখন কলা নিয়ে হুজুরের কাছে নামিয়ে কাপড়ের ঢাকনা খুললেন, অবাক বিস্ময়ে দেখলেন সত্যসত্যই কলাগুলো কাঁচাই হয়ে গেছে। তিনি তো মিথ্যা করে রহস্যচ্ছলে ছেলে দু'টির কাছে কলা কাঁচা বলে উল্লেখ করেছিলেন। হুজুরকে সবিস্তারে সব কিছু খুলে বললে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন যারা কিশোর বয়েসে এত অলৌকিক শক্তির অধিকারী, তারা বড় হয়ে না জানি কত শক্তিধর হয়ে উঠবে। বড় হয়ে তারা যাতে মানুষের কোন ক্ষতিসাধন করতে না পারে

তজ্জন্য তিনি তাদের চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার মনস্থ করলেন।

এ সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে ঃ একদিন শাহ্ নূরী দু'ভাইকে গোসল করে আসতে বললেন। বাবার কথা মত তারা যথারীতি গোসল সেরে এলো। শাহ্ সাহেব ছেলে দু'টিকে নিজ হাতে উত্তমরূপে আহার করালেন। তারপর তাদেরকে মসজিদে শুয়ে থাকতে আদেশ করলেন। বাবার আদেশ মত ছেলে দু'টি মসজিদে শোয়ার পর চির নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়ে। এ দু'ভাইয়ের কবর মসজিদ সংলগ্ন তাঁদের পারিবারিক গোরস্তানে রয়েছে। এর পাশেই রয়েছে শাহ্ নূরীর মাজার শরীফ।

হযরত শাহ্ নূরীর বংশধরদের একাংশ বাবুপুরায় গিয়ে আস্তানা গাড়ে। তাঁরা বাবুপুরা শাহ্ সাহেব নামে পরিচিত। হযরত শাহ্ নূরীর ইন্তেকালের পর তাঁর বুজর্গান পুত্র হযরত শাহ্ মুহম্মদী গদীনশীন হন। তিনি একজন জবরদশত্ আলেম ছিলেন। এজন্য বাদশাহ আলমগীরের দরবারে তাঁর খুবই সুখ্যাতি ছিলো। কথিত আছে, 'ফতোয়া আলমগিরি'তে শাহ্ মুহম্মদীর স্বাক্ষর ছিলো। তিনি যেমন ছিলেন জবরদশত্ আলেম, তেমনি ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তাঁর অলৌকিক কীর্তিকলাপের বহু কাহিনী লোকমুখে ছড়িয়ে রয়েছে।

হযরত শাহ্ মুহম্মদীর ইন্তেকালের পর তদীয় পুত্র শাহ্ আবদুল হামিদ গদীনশীন হন। তাঁর আর এক ভাইয়ের নাম ছিলো শাহ্ গোলাম আহমদ। এঁর সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। শাহ আঃ হামিদ মৃত্যুকালেও এক অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করে গেছেন। কথিত আছে শেষ বয়সে শাহ্ আব্দুল হামিদ সমুদ্র পথে হজ্বে যান। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি কি কারণে সমুদ্র বক্ষে জাহাজেই ইন্তেকাল করেন। জাহাজের নিয়মানুযায়ী তাঁর লাশ নামাজে জানাজার পর দরিয়ার পানিতে ফেলে দেয়া হলো। লাশ সাধারণত পানিতে ভাসে। কিন্তু তাঁর লাশ পানিতে ফেলার সাথে সাথে ডুবে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। জাহাজের লোকজন এ দৃশ্য দেখে সন্দিহান হয়ে পড়লো। তারা কাপতেনকে দূরবীন নিয়ে লাশের অবস্থা দেখার জন্যে অনুরোধ জানালো। কাপতেন দূরবীন নিয়ে অনেক চেষ্টা করে লাশের কোন চিহ্নই দেখতে পেলেন না। ইতিপূর্বে যাঁকে নামাজে জানাজার পর দাফনের জন্যে পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছে, তিনি জাহাজের সাথে সাথে পানির ভিতর হাঁটা শুরু করেছেন– এটা স্পষ্ট তিনি দেখতে পেলেন। অবাক বিস্ময়ে এঘটনা সবার কাছে বিবৃত করতেই সবাই হতবাক হয়ে গেলো। সবাই ভাবলো মৃত ব্যক্তি মানুষবেশী কোন দরবেশ তার আর সন্ধান পাওয়া গেলো না। একমাত্র শাহ্ হামিদের কবর ছাড়া আর সবারই কবর রয়েছে তাঁদের পারিবারিক গোরস্তানে। শাহ্ আবদুল হামিদের

ইন্তেকালের পর তদীয় পুত্র শাহ্ শামসুদ্দীন গদীনশীন হন। এর মৃত্যুর পর বর্তমান গদীনশীন শাহ্ সাহেব হচ্ছেন শাহ্ আবু আবদুল্লাহ। শাহ্ শামশুদ্দীনের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন হাসান আলী মিয়া। তিনি ভাওয়াল রাজ কুমারের নায়েব ছিলেন। পরে তিনিও পীর হয়ে ছিলেন, তার সম্মুখ দিয়ে সাপ যেতো না।

মনে করা হয় মগবাজারকে এক সময় মগরা পাড়া বলা হতো। এই মগরা পাড়ায় মোহাঃ ইউসুফের সমাধির নিকটে পাঠান শাসনামলে বিশ্রামাগার ও তৎ সংলগ্ন নহবৎখানা ছিলো। প্রতিদিন বিশ্রাম স্থলে সান্নিধ্য পরিজ্ঞানার্থে প্রভাতে ও সায়নকালে এই নহবৎখানা থেকে অনবরত তানলয় সংযোগে বংশীবাদন করা হতো, পথ শ্রমে ক্লান্ত নবাগত পথিক এবং পীর ফকিরগণ দূর থেকে এই সুমধুর বংশী শ্রবণ করতঃ আসক্ত হয়ে এস্থানে আগমন পূর্বক বিশ্রাম নিতো মসজিদ সংলগ্ন প্রাচীন অট্টালিকা যাহা তহবিল নামে পরিচিত ছিলো। সেখানে প্রবেশ করলে মসজিদের মুতাওয়াল্লী অভ্যাগতদের এ স্থানে স্বাদরে আহ্বান পূর্বক পানাহার ও চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করতেন। কিছুকাল পূর্বেও প্রাচীন ব্যক্তিদের স্মৃতি পটে ইহা জাগরুক ছিলো।

ঢাকার তেজগাঁও অঞ্চলটি তেজ তথা দ্রুত তথা ক্ষিপ্রতা সম্পন্ন লোক বসতির নামানুসারে হয়েছে। কারণ স্বরুপ বলা যায় পুর্তুগীজগণ এখানে বসতি স্থাপন করতঃ মেঘনার মোহনায় প্রধানতঃ জল দস্যুতা করে জীবিকা নির্বাহ করতো। এরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আক্রমণ চালাতো এবং দস্যুতা করে এত দ্রুততার সঙ্গে সরে যেতো যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীগণ তাঁদের গ্রেফতার বা শায়েস্তা করতে পারতো না। পরে অবশ্য মোঘল শাসন কর্তাগণ তাঁদের কিছুটা দমিত করে শাস্তির বদলে নানা কার্যে তাদের নিয়োগ করেন। তন্মধ্যে রণ তরীর গোলন্দাজ সৈন্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি তাঁদের মধ্য হতে মোঘলরা গোলন্দাজ সৈন্যদের সেনাধ্যক্ষও নিয়োগ করতেন। এছাড়া গোলন্দাজ ও নাওয়ারা বিভাগের কারিগর রূপে এবং কিছু লোক নবাবের তথা সুবেদারের অশ্বারোহী সৈন্যদলেও ছিলো। এরা অত্যন্ত দুর্দান্ত হারমাদ ও ক্ষিপ্র প্রকৃতির ছিলো বিধায় অতিদ্রুত বা ক্ষিপ্রতার পার্শী মর্ম তেজ থেকে এদের বসতিকে তেজগাঁ নাম দেওয়া হয়েছিলো। তেজ শব্দটি আমাদের ঢাকা তথা পূর্ব বাংলায় প্রচলিত। যেমন কোন লোক অত্যাধিক হাম্বি তাম্বি করলে তাকে বলা হয় বড় ত্যাজ দেখাইতাচ্ছ মিয়া, বা কোন হিংস্র কুকুর দেখলে যেমন বলা হয় তাকে, তেজি কুকুর। তেমনিই পর্তুগীজদের স্বভাব ছিলো। আর সেজন্যই তাদের পর্তুগীজ হিসেবে চিহ্নিত না করে তেজ নামে চিহ্নিত করে তাদের বসতিকে গাঁও বলা হতো। আর তজ্জন্যই পর্তুগীজদের বসতিটির নাম তেজগাঁও

রাখা হয়েছিলো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এবসতির কাছেই রয়েছে তেজকুনি পাড়া এ বসতি হয়তো এদেরই কোন গোত্রের নামানুসারে হয়েছে। তেজগাঁও এর গির্জাটি ১৫৯৯ খৃঃ পূর্বে সেন্ট আগাস্টাইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে কথিত আছে। তবে গীর্জার নির্মাণশৈলী দেখে অনুমান করা হয়, প্রথমে উহা ভার্তোমেনাস কর্তৃক খৃষ্টীয় বণিকদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিলো, পরবর্তীকালে রোমান ক্যাথলিক নারীগণ কর্তৃক সংস্কার সাধিত হয়। আরো অনেক পরে ঢাকার ওলন্দাজ এবং ফরাসীগণ বাগান বাড়ী নির্মাণ করে তেজগাঁওতে। আর ইংরেজদের ফ্যাক্টরী গড়ে উঠেছিলো তেজগাঁও অঞ্চলে। এর সীমানা বর্তমান শেরে বাংলা নগর পর্যন্ত ছিলো।

১৮৪০ সালে সেনানিবাস ছিলো তেজগাঁও'এ ১৮৫০ সালে স্থানান্তর করে লালবাগ দূর্গে স্থাপন করা হয়। তেজগাঁও'এ ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজদের ধোপা খোলা ছিলো। এ স্থানের কুপের পানি গুণ বিশিষ্ট ছিলো বিধায় ধৌত কাজ খুব ভাল ও শুভ্র হতো। ঢাকা শহরের সকল এলাকা হতে এখানকার পানির স্বাদ ভালো ও ভিন্নতর ছিলো। ১৮২২ সালের ১১ই মে ঢাকায় যে প্রবল ভূমিকম্প হয় তাতে তেজগাঁও এর বেশ কিছু সরকারী-বেসকারী দালান কোঠা বিধস্ত হয়েছিলো।

তেজগাঁও অঞ্চলটি বৃটিশ যুগে ঢাকা পৌর সভার অন্তর্ভূক্ত ছিলো না। পাকিস্তান আমলের শেষদিকে অন্তর্ভূক্ত হয়। বৃটিশ সরকার তেজগাঁও এলাকায় যে বিমান বন্দর স্থাপন করে যান সেটাই পরবর্তীতে তেজগাঁও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হিসেবে পরিগণিত হয়। স্বাধীনতার বেশ কয়েক বছর পর জিয়া আমলে নুতন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নির্মাণ কাজ টঙ্গীর নিকটে আরম্ভ হয়। বাংলাদেশ ফ্লাইং ক্লাবটি তেজগাঁও বিমান বন্দরে আজও রয়েছে। আজ আর তেজগাঁ টার্মিনাল ভবনে মানুষের কোলাহল নেই। নেই যানবাহনের ভীড়। দীর্ঘ কালের কত ঘটনা পঞ্জির ইতিকথা নিয়ে রানওয়ের বিরাট ভূমিখণ্ড মৌনতা ধারণ করে আছে। এখানে আসবেনা আর বিদেশী রাষ্ট্র নায়ক, আর-ভি, আই, পি বিদেশী ব্যক্তিবর্গ। অজস্রলোকের করতালি আর মুহুর্মুহু শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হবে না। কত আনন্দ আর দুঃখ বেদনার সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে থাকবে পরিত্যাক্ত তেজগাঁ বিমান বন্দর ভবনের প্রাচীরগুলো।

নব নির্মিত তেজগাঁও শিল্প এলাকাটি উপ-মহাদেশে একটি পরিচিত নাম। তেজগাঁয়ে যেমন বিমান বন্দর হয়েছিলো তেমনি রেল ষ্টেশন ও তেজগাঁও থানা ও প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ শাসনামলেই। তেজগাঁ বিমান বন্দরের নামানুসারেই সামনের রাস্তাটির নাম হয়েছিল এয়ার পোর্ট রোড। বর্তমানে এয়ার পোর্ট রোডটির নাম

পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ।

এয়ার পোর্ট রোডেই জাতীয় সংসদ স্থাপিত হয়েছিলো পরবর্তীতে সেটা আরো সংস্কার সাধন করে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের সচিবলায় করা হয়েছিলো বর্তমানে তা প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ে পরিণত হয়েছে। চিত্র জগতের প্রধান কেন্দ্র এফ, ডি, সিও তেজগাঁতেই প্রতিষ্ঠিত। তেজগাঁও অঞ্চলের মনিপুরী পাড়ার নামকরণ হয়েছে মনিপুরীদের নামানুসারেই। ১৬৬১ সালে মীর জুমলার আসাম বিজয়ের সময় এই সব মনিপুরীদের বন্দী করে ঢাকায় আনা হয়। বন্দী মনিপুরীদের অতঃপর ঢাকায় যে এলাকায় পূনর্বাসিত করা হয় সেই অঞ্চলটি এখন পর্যন্ত মনিপুরী পাড়া নামেই পরিচিত।

তেজগাঁও অঞ্চলের পূর্ব নাখাল পাড়ায় হাজী মরণ আলী রোড নামে একটি সড়ক রয়েছে। হাজী মরণ আলী সে এলাকার একজন বিত্তশালী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন তার প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ছিলো। ঐ সব ভূ-সম্পত্তির উপর দিয়ে বেশ কয়েকটি সড়ক ও গলিপথ হয়। তিনি সড়ক ও গলি পথের জন্য দেয় জমির মূল্য পৌর সভা হতে না নেয়ায় তার নামে রাস্তাটির নামকরণ করা হয়। তার পিতা হোসেন আলীর নামে হোসেন আলী উচ্চ বিদ্যালয় এবং হাজী মরণ আলীর নামে একটি মাদ্রাসা সে এলাকায় রয়েছে।

এখানে আরজত পাড়া নামেও একটি মহল্লা রয়েছে। আরজত আলী সেখানকার প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন তার কাছ হতে অনেকে জমি কিনে বাড়ী ঘর তৈরী করলেও পাড়াটি তার নামে পরিচিত। এখানকার মসজিদটি মধ্য প্রাচ্যের কোন এক আরব রাষ্ট্রের সহায়তায় নির্মিত হয়েছে। নাখাল পাড়া নামটি নাকাল গাছ হতে হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। পূর্ব দিনে ঢাকার কোন কোন অঞ্চলে নাকাল গাছ বিস্তর ছিলো। মতান্তরে বলা হয় এখানে রাখালদের পাড়া ছিলো। পূর্ব দিনে ঢাকাবাসী প্রায় বাড়ীতেই গরু প্রতিপালন করতো আর তজ্জন্য প্রয়োজন হতো রাখাল। পরবর্তীতে নামটি বিকৃত হয়ে নাখাল পাড়া হয়েছে। সঠিক তথ্য বলার মত আজ আর সেখানে তেমন লোক নেই। লোকে এ এলাকাকে এলেন বাড়ী বলেও অভিহিত করতো। এলেন নামে এখানে একটি কোম্পানী ছিলো। এখানে শিয়া সম্প্রদায়ের একটি গোরস্তান রয়েছে।

ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত তেজগাঁ বিমান বন্দর পাক আমলে আন্তর্জাতিক রূপ নিলেও স্বাধীনদেশে একটি আন্তর্জাতিক মানের উপযোগী বিমান বন্দর থাকা উচিৎ। সে কারণেই সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়া টঙ্গীর নিকট বিরাট এলাকা জুরে একটি আন্তর্জাতিক

বিমান বন্দর নির্মাণের কাজ হাতে নেন। তখন ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নামেই ইহা পরিচিত হতো। তাঁর মৃত্যুর পর বিমান বন্দরটির নুতন নামকরণ করা হয় শহীদ জিয়ার নামানুসারে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর।

শহীদ জিয়াউর রহমান বগুড়া জেলার বাগবাড়ি গ্রামে ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব মনসুর রহমান ছিলেন একজন কেমিষ্ট। জিয়ার স্কুল জীবন শুরু হয় কোলকাতায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পিতা করাচী চলে গেলে করাচীতে অধ্যায়ন করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পাক সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। বাল্যজীবনে জিয়া ছিলেন খুব লাজুক ও গম্ভীর প্রকৃতির। জিয়া পরবর্তীকালে লিখে গেছেন– "স্কুল জীবন থেকেই পাকিস্তানীদের দৃষ্টি ভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিতো। স্কুল জীবনে বহুদিন শুনেছি আমার স্কুল বন্ধুদের আলোচনা তা থেকেই আমি বুঝেছি অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে" তা সত্ত্বেও ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধে জিয়া ছিলেন খেমকারান সেক্টরে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার। এই ব্যাটালিয়ন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করায় লাভ করেছিলো দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক। বাঙ্গালীরা ভাল সৈনিক নয় এই অপবাদ ঘুচাবার জন্যে।

একজন মানুষের জীবনে একই সঙ্গে মুজাহিদ, গাজী ও শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য বিরল ঘটনা। সৃষ্টি কর্তার মানব কুলের মধ্যে ক'জন পেরেছেন শ্রম, মেধা এমনকি জীবন দিয়ে মানুষের মনে স্থান করে নিতে? ক'জন পেরেছেন ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম যুক্ত করতে? তাইতো দেখেছি জিয়ার অন্তিম যাত্রাকালে জানাজায় স্বতঃফুর্ত ভাবে প্রায় বিশ লাখ মানুষের উপস্থিতি। আজিও বাতাসে কান প্যাতলে যেনো শুনতে পাই তাঁর অভয় জড়িত নির্ঘোষ কণ্ঠ "আমি মেজর জিয়া বলছি" স্বাধীনতার যুদ্ধের ডাক দিয়ে নিজেও অবতীর্ণ হয়েছেন সেই যুদ্ধে।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিয়াকে নিয়োগ করা হয় চট্টগ্রামে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড হিসেবে। ১৯৭১ সালে সারাদেশে যখন স্বাধীনতার পক্ষে বিপ্লব চলছে, সে সময়ই ৪ঠা মার্চ তাঁর সাথী ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে বলেছিলেন "সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে।" সাথীদের নিয়ে পরিকল্পনা তৈরী করতে শুরু করেন।

এসে গেলো সেই ২৫ ও ২৬শে মার্চের মধ্যবর্তী কালোরাত, রাত একটায় জিয়ার কমাণ্ডিং অফিসার জিয়াকে নির্দেশ দিলেন নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে জেনারেল আনসারীর নিকট রিপোর্ট করতে। ঘটনা পঞ্জীর এক পর্যায়ে পথে ক্যাপ্টেন অলি আহমদের গোপন বার্তা পেলেন মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরীর কাছ

হতে। বার্তা পেয়েই জিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন "আমরা বিদ্রোহ করলাম" তুমি অলিকে বলো ব্যাটালিয়ন তৈরি রাখতে। আমি আসছি। পথেই জিয়া লাফ দিয়ে নেমে তাঁর ট্রাকের ৮ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে গ্রেফতারের লক্ষ্যে রাইফেল তাক করে নিরস্ত্র করলেন। তারপর দ্রুত গিয়ে তাঁর কমাণ্ডিং অফিসারকেও গ্রেফতার করেন। অফিসে গিয়ে বাঙ্গালী সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে বিফল হয়ে টেলিফোন অপারেটরকে অনুরোধ করলেন সকল অফিসার ও আওয়ামী নেতাদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৮ম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। তক্ষণই জিয়া ব্যাটালিয়ন অফিসার, জেসিও এবং জোয়ানদের ডেকে আহ্বান জানালেন সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। রাত দুটো পনর মিনিট এর কিছুক্ষণ পূর্বেই পাকসেনারা বন্দী করেছে বঙ্গবন্ধুকে। রাজনৈতিক নেতারা নিজ নিজ সুবিধেমত আত্মগোপন করেছেন। অন্য দিকে পাক সেনাদের ধ্বংস যজ্ঞে জাতি বিহ্বল, সেই কঠিন ক্রান্তিলগ্নে অনিশ্চয়তার আধার ভেদ করে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা "প্রিয় দেশবাসী আমি মেজর জিয়া বলছি, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আপনারা দুশমনদের প্রতিহত করুন। ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদের অবধারিত"।

সেই সংকটময় অমানিশায় জিয়ার অকুতোভয় সাহস, দৃপ্তভাষণ বাংলাদেশের জনগণকে এগিয়ে নিয়ে গেলো বিজয়ের দিকে। জিয়ার বিশ্বাস ছিলো দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তিনি সেক্টর কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। তাঁর নামে গড়ে ওঠে জেড ফোর্স। তার স্ত্রী ও দুই পুত্র ঢাকা সেনানিবাসে বন্দী। তাঁদের জীবন বিপন্ন জেনেও অবিচল ভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে "বীর উত্তম" খেতাবে ভূষিত করেন। দেশস্বাধীন হবার পর প্রথমে তাকে কুমিল্লা সেনানিবাসের এক ব্রিগেডের কমাণ্ডার করা হয়। ১৯৭২ সালে সেনা বাহিনীর ডেপুটী চীপ অব ষ্টাফ ও ১৯৭৫ সালে সেনা বাহিনীর প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এবছরই ৩রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। জিয়াকে বন্দী রাখা হয় ঢাকা সেনানিবাসে। অবশেষে ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে অভ্যুত্থানকারীরা পরাভূত হয়। দেশে জারি হয় সামরিক শাসন। জিয়া অস্থায়ী চীফ মার্শাল-ল এড মিনিষ্ট্রেটরের দায়িত্বে আসীন হন। '৭৬ সালের নভেম্বরে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। ৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তারপর তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে শেষ অবধি বাংলাদেশ

জাতীয়তাবাদী দল গঠন করে তার প্রধান মনোনীত হন।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে ৫ বছর বসেও তিনি অনাড়ম্বরভাবে জীবন যাপন করছেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ সবই অতি সাধারণ ছিলো। একদিন ঢাকা পৌর করপরেশনের মেয়র ও কমিশনার বৃন্দদের ডাকলেন বঙ্গভবনে, বিকেল বেলায় অনেক্ষণ বসার পর আলাপ আলোচনা আরম্ভ হলো, বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণকর কর্মকান্ডের উপর। আলোচনা বেশ দীর্ঘক্ষণ ধরে চলছে– রাত হয়ে গেছে কোন নাস্তা পানি নেই। সাথীরা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে কেউই কথা বলার সাহস পাচ্ছেনা মেয়রের পরই আমি বসেছিলাম আমার কানে কানে দু'একজন বললো– খাওয়ার কথা বলতে। আমাদের চাহনী দেখে তিনি বুঝে নিলেন, আস্তে করে ফোন উঠিয়ে কি যোনো বললেন। কাছে থেকেও কিছুই শুনতে পেলাম না। আরো কিছুক্ষণ আলাপ হলো। টেলিফোনে রিং হলো, আস্তে করে রেখে বললেন চলুন খাওয়া যাক। আমরা চলছি খাবার ঘরের দিকে জিয়ার পিছনে পিছনে। আর একে অপরের সঙ্গে বলছি– আজ শাহী খাওয়া খেতে পারবো। খাওয়ার ঘরে পৌছে সবার চোখ স্থির। টেবিলে রাখা রুটি, ভাত, ভাজি, ডাল ও ঝোল দেওয়া খাসির মাংস। সবাইকে স্থির দেখে নিজে প্লেট নিয়ে তাতে দুটুকরো নানরুটি ও কিছু সবজি নিয়ে খেতে আরম্ভ করে আমাদেরও বললেন নিন খেয়ে নিন। অগত্যা সবাই নিলো, মুখে রা শব্দও নেই, আমার জন্য খাওয়া ঠিকই ছিলো। আমিও রুটি ভাজি নিয়ে জিয়া সাহেবের সঙ্গে সমাজ কর্মীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি– আমাদের হাজারীবাগের কমিশনার খলিল সরদারও এসে যোগদিলেন। তিনি সেই অল্প আহার করেই ক্ষান্ত হলেন। আমাদের সাথীদের জন্য সেটা হলো "পানিশ ফুড"।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশবাসী বিশেষ করে গ্রামীণ গরীব মানুষগুলোর জন্য তিনি ছিলেন খলিফা ওমর ফারুকের অনুসারী, তাঁর বিরুদ্ধে কেহ কোন দূর্নীতি বা স্বজন প্রীতির অভিযোগ আনতে পারেনি। তিনি পায়ে হেটে মাইলের পর মাইল গ্রামগঞ্জে দুঃখী মানুষের দোরগোরায় পৌঁছে তাদের খবরাদি নিতেন, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন। একদা কামরাঙ্গিচর শ্বশান ঘাটের নিকট খাল খনন করতে আসেন। তখন আমি আমাদের আজাদ মুসলিম ক্লাব পরিদর্শনের কথা বলায় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে বল্লেন আজই এখনই যাবো। তার কথা শুনে সিকিউরিটি অফিসারবৃন্দ আমার উপর ক্ষেপে গেলেন। সত্যি খাল খনন উদ্বোধন শেষে আমাকে নিয়ে পদযাত্রা শুরু করলেন ক্লাব কার্যক্রম পরিবদর্শনের উদ্দেশ্যে। এক কিলোমিটারের উর্দ্ধপথ হেঁটে আমাদের উইমেন পাইলট ইণ্ডাস্ট্রীয়াল, হেলথ এণ্ড এডুকেশনাল সেন্টারে উপস্থিত

হলাম। তিনি মহিলা ও বালিকাদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেই অনুভব করলেন স্থানাভাবের কথা। আমাকে বললেন এখানকার শিক্ষার্থীরা তো জায়গার অভাবে ঠিক মত প্রশিক্ষণ নিতে পারছে না। এর সম্প্রসারণ করা যায় না। বললাম দোতলাকে তিন তলায় পরিণত করলে অনেকটা সুরাহা হবে। তিনি বললেন এতে কত টাকা লাগতে পারে। জবাবে বললাম প্রায় দু'লক্ষ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন আমি এক লক্ষ দিচ্ছি আপনারা বাকী টাকা সংগ্রহ করে অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করুন, আমি আবার এসে যেন দেখতে পাই কাজ হয়ে গিয়েছে। তার এবং আমাদের টাকা দ্বারা তড়িৎ কাজ আরম্ভ করলাম। কারণ আমি জানতাম তিনি ঠিকই একদিন এসে পড়বেন। কাজ শেষ হবার কিছু দিনের মধ্যেই সত্যি তিনি আসলেন খুশী হলেন এবং আমাদের সমাজ সেবীদের উদ্দেশ্যে বাস্তবধর্মী বক্তব্য রাখলেন। আমাদের ক্লাবের মনোগ্রাম খচিত এক খানা কোটপিন তাঁর কালো কোর্টে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেদিনই তিনি বিদেশ যাত্রা করলেন, দেখাগেলো সেই কোট পিন লাগানো কালো কোটটি পরেই তিনি চলেছেন বিদেশে। তিনি শিশুদেরও অত্যন্ত ভাল বাসতেন তজ্জন্য স্থাপিত করেছেন শিশু একাডেমী। তিনি গানও ভালোবাসতেন। তাঁর প্রিয় গান ছিলো নজরুলের "কারার ঐ লৌহ কপাট" বিশেষ করে' প্রথম বাংলাদেশ-আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ-আমার মরণ বাংলাদেশ।' রাষ্ট্র নায়ক থাকা অবস্থায় তিনি নজরুলের ঐ লৌহ শেকল সবগুলোকে ছিন্ন করতে পারেন নি। তাই অনেক সময় আক্ষেপ করে বলতেন আমি বড় একা। শুধু দেশের কথা বলেই যাচ্ছি।

স্ত্রী পুত্রদেরও সাধারণ জীবন যাপনের অভ্যস্থ রাখতেন। একদিন আজিমপুর গালর্স স্কুলে যুব রেড ক্রস র‍্যালী উপলক্ষ্যে রেডক্রস সদর দফতরে যুব রেডক্রস কর্মীদের নিয়ে সভা করছি। ঢাকা মহানগরীর রেডক্রস সভাপতির অনুপস্থিতিতে আমি সহ-সভাপতি হিসেবে সভার কাজ আরম্ভ করি। সভাকক্ষের সকল আসন পরিপূর্ণ হয়েও অনেক ছেলে দাড়িয়ে আছে। আমার অতি নিকটে পাতলা গড়ন একটি ফর্সা ছেলে সটান দাড়িয়ে আছে। ছেলেটিকে দেখে আমার কনিষ্ঠ পুত্রের কথা মনে পড়ছে তাঁর গড়ন ও রং এ-ছেলের মতই। তাই মমতার টানে তাকে একটু জায়গা করে দেবার জন্য আসনে বসা ছেলেদের বলছিলাম। সে না বসে এটেনসান অবস্থায় দাড়িয়েই রইলো। প্রায় পৌণে দু'ঘণ্টা র‍্যালী প্রোগ্রাম শেষ করে নাস্তা দেওয়া হলো পুনরায় বসে নাস্তা করার জন্য বললাম। এবারও অস্বীকৃত জানালো। নাস্তা খেয়ে অনেকেই চলে গেলে সে সামনে এসে আমাকে বললো। আব্বাকে আপনি বলবেন যেন আমাকে এ র‍্যালীতে আসতে দেয়। আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি তাঁর

দিকে। কার কথা বলছে। পিছনে দাড়ানো একজন বলিষ্ঠ পুরুষ বুঝতে পেরে আমাকে আস্তে আস্তে করে বললেন ইনাকে চেনেন না? ইনিতো রাষ্ট্রপতি সাহেবের বড় ছেলে। আমি ভরকে গেলাম। রাষ্ট্রপতির ছেলেকে দু'ঘণ্টা ধরে দাড়িয়ে রাখছি বলে। সে লোকটি জিয়ার ছেলের সিকিউরিটি গার্ড। সে চুপিসারে বললেন আপনি রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে কিছু বলবেন না। অগ্যতা আমি মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাকে বিদায় করলাম।

রাষ্ট্রপতি জিয়া এই জাতি ভবিষ্যতে যেনো মাথা উচু করে বিশ্বের দরবারে দাঁড়াতে পারে তজ্জন্য অবিরাম পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন নয় কোটি মানুষের আঠার কোটি হাত এক সাথে কাজ করতে হবে। উন্নয়নের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করলে চলবেনা। বুদ্ধি এবং নিজেদের হাতকে কাজে লাগাতে হবে। জিয়া একটি ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশের রাষ্ট্র প্রধান হয়েও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন সুপরিচিত ও সম্মানিত আসন লাভ করে ছিলেন। আর দেশকে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট করে গেছেন। আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য সার্ক গঠনের মূলরূপকারও তিনিই ছিলেন।

এহেন মানুষটিকে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে রাতের অন্ধকারে ঘাতকের তপ্ত বুলেটে তাঁর দেহ ঝাঁঝড়া করে তাঁকে শহীদের দরজায় পৌঁছে দিয়েছে। ৩০শে মে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সর্বভৌমত্বের জন্য দৃঢ় এক প্রত্যয়ের নাম। সেই প্রত্যয় দীপ্ত চেতনা নিয়ে আজো তিনি বাংলাদেশের গ্রামের পর গ্রাম হেঁটে চলছেন মেঠোপথ ধরে সবুজের প্রান্ত অবধি। আজ আত্ম সমালোচনার দিন এসেছে, সত্যি কি সরকার ও জাতি তার সেই স্বপ্ন নিয়ে তাঁর পিছু পিছু হেঁটে চলেছে?

শিখ সাঙ্গাতের নামানুসারে সাঙ্গাতটোলা নামকরণ হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে গুরুতেজ বাহাদুরের সময় পর্যন্ত এখানে শিখ সাঙ্গাতের অবস্থান ছিলো। কথিত আছে গুরু তেজ বাহাদুরের কাছে শিখরা এই মর্মে আবেদন করেছিলো যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের শিখদের পক্ষে সুদুর পাঞ্জাবে এসে গুরু দর্শন বা তীর্থ করে যাওয়া সম্ভব হয় না। সেই কারণে গুরুর আদেশে ঢাকায় শিখ সাঙ্গাতের প্রতিষ্ঠা হয়। সাঙ্গাত প্রতিষ্ঠার সময় স্বয়ং গুরুতেজ বাহাদুর নাকি ঢাকা এসেছিলেন। এই মন্দিরে গুরুতেজ বাহাদুরের তলোয়ার এবং একখণ্ড পাথরে শিখ ভাষায় অনেক তত্ত্ব কথা উৎকীর্ণ করে সংরক্ষিত ছিলো। এখনও এই অঞ্চলে শিখ সাঙ্গাতের অধিষ্ঠান আছে। যা হোক, এ কাহিনী অবশ্যি তেমন কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি খুজে পাওয়া যায় না।

পুরনো ঢাকার একটি মহল্লার নাম কসাইটুলি। পূর্বে তথা তূর্ক-আফগান আমলে কাসার টুলি বলা হতো। আরবী-ফার্সী শব্দ কাসার থেকে কসাই নামকরণ হয়েছে। পশু জবাই করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাঁদেরই কসাই বলা হয়। এক সময় এখানে শুধু কসাইদের বাসস্থান ছিলো। জনশ্রুতি আছে ঢাকার কসাইরা নাকি মাওলানা কেরামত আলীর অনুসারী ছিলো এবং তারা ছিলো গোঁড়া মুসলমান। তাঁদের মেয়েরা খুবই পর্দানশীন ছিলো। কিন্তু তারা সূচীকর্মে ছিলো অদ্বিতীয়া। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন কাপড়ের উপর সূচীকর্ম করে তারা যথেষ্ট পয়সা উপার্জন করতো। তাঁদের এই সূচীকর্ম দেশ বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলো। এ মহল্লায় একটি ডন ঘর ছিলো যাকে আমরা ব্যায়ামাগার বলে থাকি এবং একটি পঞ্চায়েতী বাংলা ঘর যা আজও আছে। এ বাংলা ঘরের জন্য জমি দান করেছিলেন মহল্লার বিশিষ্ট ব্যক্তি কমুরুদ্দিন সর্দার, মহল্লার লোকজন বেশ সুন্দর করে বাংলা ঘরটি নির্মাণ করে। এত সুন্দর বাংলা ঘর ঢাকার অন্যান্য মহল্লায় নেই বল্লেই চলে। এখানকার কিল ঘরের মুন্সির বেশ সম্মান ছিলো। ঢাকার নবাব বাড়ীর বৈঠকে তার যাতায়াত ছিলো। এ মহল্লার আলহাজ্ব সাখী মিয়া বৃটিশ ভারতে ঢাকার খাকসার আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন। এখনও তিনি সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চা করেন। এক সময় এখানকার পুরুষরা নাট্য চর্চা করতো তথা নাটক মঞ্চস্থ করতো। ধারণা করা হয় এই নাট্য চর্চা আর্মেনিয়ানদের প্রভাবে কসাইটুলিবাসীদের প্রভাবিত করেছিলো। কসাইটুলির একটি অংশের নাম সামশাবাদ। প্রকৃত উচ্চারণ সামস-আবাদ অর্থাৎ সূর্যের আলোকিত মহল্লা। শামসাবাদের কস্যাইখানা তথা কিল খানার নিকট বিশিষ্ট বুজুর্গানেদীন চেরাগ আলী শাহের মাজার রয়েছে।

কসাইটুলি, বাগডাসাগলি ও বংশাল এলাকার মধ্যে নাটকার পুল বলে কথিত (নাটকার পুল স্থানটি নির্জণ থাকতো এবং লোকের বিশ্বাস ছিলো যে সেখানে ভূত প্রেতের আড্ডা ছিলো আর সেই ভূত নাটকা অর্থাৎ নাকবোচা ভূত। তজ্জন্য লোকজন সন্ধার পর চলাচল করতে ভয় করতো।) স্থানের একটি অংশকে সুসাহিত্যিক বিদ্যাসাগর রায়বাহাদুর কালি প্রসন্ন ঘোষের নামানুসারে রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর স্ট্রীট নামকরণ করে। কালি প্রসন্ন বাবু সাহিত্যিক ক্ষেত্রে বঙ্কিম চন্দ্রের বিরোধী ছিলেন। বিশেষ করে বংগ দর্পনের সমালোচক ছিলেন। বান্ধব নামে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তিনি কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তার বাড়ীটি ছিলো আজকের বাওয়ানী স্কুল ভবনে, বান্ধব-কুটির নামে পরিচিত। পাক আমলে প্রখ্যাত শিল্পপতি ইয়াহিয়া বাওয়ানী ভবনটি খরিদ করে আহমাদ বাওয়ানী একাডেমীর নামে

দান করেন। এবং সেখানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা তাদের নাম বহন করে চলেছে।

১৯২১ সালে ঢাকা পৌরসভার সদস্য মিঃ শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তীর প্রস্তাবক্রমে কালী প্রসন্ন ঘোষ স্ট্রীট থেকে মিঃ হার্নের বাড়ি পর্যন্ত গলিটির নামকরণ করা হয় আর্মেনিয়ান স্ট্রীট। এই কালি প্রসন্ন ঘোষ স্ট্রীটেই অবস্থিত রয়েছে অত্যন্ত সুন্দর কারুকার্য খচিত একটি মসজিদ যা ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কার্তিকপুরের জমিদার গোলাম সাত্তার চৌধুরী এবং মির্জা আসকারী অন্যতম ছিলেন।

দিলু রোডের নামকরণ হয়েছে অত্র এলাকার দিলু বেপারী নামে এক ধর্মপ্রাণ বিত্তশালী ব্যক্তির নামানুসারে। দিলু বেপারী ঢাকা টঙ্গী ডাইভারসান রোডে ১৯৩২ সালে একটি মসজিদ স্থাপন করেন এবং তা ১৯৬৪ সালে পুনঃ সম্প্রসারিত করেন। তৎপুত্র হাজী হাফিজুদ্দিন দিলু রোডে ১৯৬৪ সালে একটি কাঁচা মসজিদ নির্মাণ করেন যা বর্তমানে পাকা ভবনে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান তোপখানা রোড এলাকায় কোম্পানী আমলে গোলন্দাজ বাহিনীর একটি অস্থায়ী আস্তানা ছিলো। গোলন্দাজ বাহিনী অপসারিত হওয়ার পর ঐ এলাকাটি আবাসিক এলাকায় পরিণত হলেও তোপখানা রোড নামে আজও পরিচিত হয়ে আসছে। এখানে বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ ভবন রয়েছে। পরিষদ এ ভবনে ফিরোজা বারী পঙ্গু শিশু হাসপাতাল পরিচালনা করছে।

টিকাটুলি নামে যে অঞ্চলটি পরিচিত, এককালে সেখানে কুটির শিল্প রূপে টিকিয়া তৈরি হতো। বহু পরিবার হুকার তাওয়ায় তথা ছিলিমে ব্যবহারের জন্য কাঠ কয়লার গুড়ো দিয়ে এই টিকিয়া তৈরি করতো। টিকাটুলির টিকিয়া সেকালে ঢাকার একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপে গণ্য ছিলো। ঢাকার টিকিয়া ছিলো এত হালকা আর নিখুঁত যে একটি মাত্র দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে বেশ কয়েকখানা টিকিয়া ধরানো যেতো। সেখানকার একজন টিকিয়া শিল্পীকে সবাই উপহাস ছলে মহারানীকা বেটা নামে সম্বোধন করতো বলে কথিত আছে। এই মহারানী আর কেউ নয়, স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া। টিকাটুলিতে অবস্থিত হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরী বৃটিশ যুগে একমাত্র কাচেঁর ব্যবহারিক দ্রব্যাদির প্রতিষ্ঠান ছিলো।

টিকাটুলি নামটি পরবর্তীতে হাটখোলা রোড নামের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেও অদ্যাবধি অনেকেই টিকাটুলি বলে সম্বোধন করে থাকে। হাটখোলা নামটি হয়েছে এককালে এখানে বেশ খোলা জায়গা ছিলো এবং সেখানে হাট বসতো। আর এই

হাটের খ্যাতিও ছিল বেশ। তাই পুরো এলাকাটি হাটখোলা থেকে হাটখোলা রোড ও হাটখোলা লেন নামে পরিচিত। কিন্তু কয়েক বছর হলো হাটখোলা রোডটি শহীদ নজরুল ইসলাম রোড নামকরণ হয়। নজরুল ইসলাম সেখানকার একজন ব্যবসায়ীর ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সড়কের নাম পরিবর্তন হলেও সাধারণ লোক হাটখোলা বলেই অভিহিত করে আসছে।

হাটখোলা রোডের একাংশের নাম শরৎ চন্দ্র গুপ্ত রোড। ১৯৩০ সালে শরৎ চন্দ্র গুপ্তের পুত্রের আবেদনক্রমে ঢাকা পৌরসভা এই নামকরণ করেন। শরৎ চন্দ্র গুপ্ত ঢাকার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। তিনি বহু বছর ধরে ঢাকা পৌরসভা, ডিস্ট্রিক বোর্ড ও নারায়ণগঞ্জ লোকাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি একজন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। হাটখোলা এলাকায় ঈসায়ী গোরস্তানের দক্ষিণে জিনজিরার মসুরিখোলা শাহ্ সাহেব হযরত আহসান উল্লাহর মাজার অবস্থিত। আসাম ও বাংলাদেশে তাঁর অসংখ্য মুরিদান রয়েছে।

স্বামীবাগ এলাকায় বসাকদের পূর্বপুরুষদের ঠাকুর-বৃত্ত ছিলো। এদের পূর্বপুরুষদের কোন একজন (ত্রিপুরার) লিঙ্গস্বামী নাম ধারণ করে ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে থাকতেন। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর খুবই কষ্ট হতো। এজন্যে তাঁর ভক্তরা তাঁকে নিয়ে আসেন টিকাটুলি এলাকায়, তাঁর পূজাঅর্চনার সুবিধার জন্যে একটা মন্দিরও নির্মাণ করে দেয়া হয় সেখানে। লিঙ্গস্বামী লোকান্তরিত হলে তাঁর মরদেহ ওখানেই সমাধিস্থ করা হয়। তাঁরই নামানুসারে স্বামীবাগের নামকরণ হয়েছে। বর্তমানে স্বামীজীর মন্দিরটি একটি ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরীর নিকট হতে ধুপখোলা মাঠ পর্যন্ত একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে স্বামীবাগের মধ্য দিয়ে। তজ্জন্য পুরাতন ঢাকার পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা অতি সহজেই আধুনিক বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিল, বঙ্গভবন ও অন্যান্য এলাকায় যাতায়াত করতে পারে। স্বামীবাগের এ রাস্তার পাশেই অবস্থিত বিখ্যাত শক্তি ঔষধালয়। এ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। অধ্যক্ষ মথুর মোহন চক্রবর্তী যিনি অধ্যক্ষ মথুর বাবু বলেই দেশবাসীর নিকট সমধিক পরিচিত। সেই মথুর বাবুই শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক ছিলেন। তৎকালে মানুষ এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার চেয়ে কবিরাজী ও হেকিমী ঔষধকে অধিকতর পছন্দ করত। মথুর বাবু ছিলেন নিঃসন্তান। তার মৃত্যুর পর শক্তি ঔষধালয়ের মালিকানা নিয়ে তুমুল বিতণ্ডা বাধে। যার ফলে মামলা মোকদ্দমা ঢাকার আদালতে গড়ায়। দীর্ঘ ৩৩ বছর অবধি এ মামলা চলে। মামলার তারিখে গরুর গাড়ি বোঝাই করে লাল

কাপড়ে বাধাই করা খাতাপত্র নিয়ে যাওয়া হতো আদালতে। মানুষ আগ্রহ ভরে দেখতো তাদের আইন-যুদ্ধ। অবশেষে স্বর্গীয় মথুর মোহন চক্রবর্তীর ভাইপো লালমোহন চক্রবর্তী আদালত কর্তৃক মালিক সাব্যস্ত হন। শক্তি ঔষধালয়ের হেড অফিসের নিকটেই তার বাসভবন ছিলো। তাদের কেউই আজ ঢাকায় না থাকলেও লালমোহন চক্রবর্তীর বাড়িটি জীর্ণ অবস্থায় এখনো দাড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। স্মরণ করিয়ে দেয় পথচারীকে তাদের বেশুমার ধন-ঐশ্বর্যের কথা। গোপীবাগে স্থাপন করা হয় গোপীনাথ জিঁউ বিগ্রহ। ফলে ঐ এলাকা গোপীবাগ নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ঐ এলাকাটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোপীনাথ সাহা বণিকের ট্রাস্ট সম্পত্তির আওতাধীন ছিলো।

১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গ-বিভাগের সময় ঢাকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি বাজার স্থাপন করা হয়। এই বাজারটি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই নয়াবাজার নামে পরিচিত। ১৯২৮ সালে ঢাকা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়ের নামানুসারে নয়াবাজারের একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছে ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায় রোড।

এক সময় ঢাকার একটি অঞ্চলে ফকিরদের (ভিক্ষুক) বাস ছিলো। এজন্যে সে এলাকাটি ফকিরটুলি নামে পরিচিত হয়ে পড়ে কিন্তু ১৯৩৩ সালে ঢাকা পৌরসভা এলাকাটির নাম পরিবর্তন করে হাফিজুল্লাহ রোড নামকরণ করেন। হাফিজ উল্লাহ সাহেব সে মহল্লার একজন প্রভাবশালী ও জমিদার ছিলেন। তার বাসভবন এ মহল্লায়ই ছিলো। ঢাকার আর একটি অঞ্চল স্টীমার-ঘাট রোড নামে পরিচিত ছিলো। ১৮৯৫-৯৬ সালে ঢাকা পৌরসভা স্টীমার-ঘাট রোডের নাম পরিবর্তন করে তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর ঈশ্বর চন্দ্র শীলের নামানুসারে ঈশ্বর চন্দ্র শীল রোড নামকরণ করেন। উল্লেখ থাকে সিপাহী বিদ্রোহের পর হতেই গর্ভমেণ্ট ঢাকা কলিকাতা ও আসামের মধ্যে স্টীমার সার্ভিস চালু করেন। পরবর্তীতে মিঃ ব্যাকল্যাণ্ডের প্রচেষ্টায় ঢাকা হতে কুষ্টিয়া পর্যন্ত স্টীমার সার্ভিস চালু হয়। তৎপর ঢাকার সাথে আরও অন্যান্য শহরের সঙ্গে স্টীমার যোগাযোগ সম্প্রসারণ হয়।

কোতোয়ালী রোডটি এককালে ঢাকাবাসীর কাছে জামদানি নগর নামে পরিচিত ছিলো। বিখ্যাত জামদানি শাড়ির বয়নকারী মুসলমানরা তাঁতী বাজারের একাংশে বাস করতো। তাদেরই নামানুসারে ঐ এলাকাটি জামদানি নগরে পরিণত হয়। সে সময়ে একমাত্র মুসলমান বয়নকারীরাই জামদানি কাপড় বয়ন করতে পারতো। জামদানি ছাড়া অন্য কাপড় বোনার কাজ সাধারণত হিন্দু তাঁতী সম্প্রদায়ই করতো। বর্তমানে জামদানি শাড়ির প্রচলন থাকলেও জামদানি নগরের অস্তিত্ব নেই। পরবর্তীকালে

জামদানি নগর কোতোয়ালী রোড নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। কোতোয়ালী থানা ওখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো বলে হয়তো পরবর্তীকালে অঞ্চলটি কোতোয়ালী রোড নামকরণ হয়েছে। ১৯২১ সালে হরিপ্রসন্ন মিত্রের পুত্র পৌরসভাকে মাত্র আড়াই'শ টাকা দান করেন এবং তাঁরই আবেদনক্রমে পৌরসভা কোতোয়ালী রোডকে হরিপ্রসন্ন মিত্র রোড নামে রেখে দেন।

ঢাকায় কাপুড়িয়া নগর নামে একটি মহল্লা আছে। মোঘল আমলের শেষে এবং ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে ঢাকার বসাক, তাঁতী, যোগী এবং তাদের পার্শ্ববর্তী বসতকারগণ যে সব কাপড় বুনতো সেগুলো এই কাপুড়িয়া নগরে বিক্রি হতো। সে কারণেই এ অঞ্চলটি কাপুড়িয়া নগর নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। বঙ্গ বিহারী সাহার পুত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে কালিচরণ সাহার পুত্র ১৯২২ সালে ঢাকা পৌর সভাকে সাড়ে তিন হাজার টাকা বিজলী বাতি সম্প্রসারণের জন্যে দান করায় ঐতিহাসিক কাপুড়িয়া নগরের নাম কালিচরণ সাহা রোড রাখা হয়।

ঢাকার এক শ্রেণীর লোক খুব ভালো ফুলের মালা বানাতে পারতো। রঙ্গীন কাগজ দিয়েও তারা কৃত্রিম ফুল ও নানা প্রকার খেলনা তৈরি করতে পারতো। এসব লোককে বলা হতো মালাকার এবং তারা যে এলাকায় বসবাস করতো তাকে বলা হতো মালাকার নগর। এক সময় মালাকাররা খুবই ঐক্যবদ্ধ ছিলো। একারণে তারা দুটো ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা করতো। ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় পূজাপার্বণ, বিবাহ ও বিভিন্ন উৎসবে এসব মালা ব্যবহার করতো। এই মালাকাররা এক সময় বসন্ত রোগের চিকিৎসা করতো। পেশাগত দিক দিয়ে মালাকাররা যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেছিলো। তারা বিভিন্ন ধরনের অতি উত্তম ফুলের মালা বানাতে পারতো। তাছাড়া কাগজ দিয়ে যেসব কৃত্রিম ফুল ও খেলনা তৈরি করতো সেগুলোও সবার কাছে সমাদৃত হতো। পূর্বাঞ্চলের মালাকার নগরকে অনেকে মালাকার টোলা বলেও উল্লেখ করে থাকে।

ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা এককালে হুঁকা শিল্পে নিয়োজিত ছিলো। হুঁকার ফটকা নল নির্মাণকারীদের একটি অঞ্চল ছিলো নদীর ওপারে এই অঞ্চলটির নাম ছিলো নিকাটুলি। নিকাটুলি নামকরণ করা হয়েছিলো নিকাবন্দ শব্দ থেকে। নিকাবন্দ মানে হুঁকার নল। এদের বসতি আজও আছে।

ঢাকায় যে অঞ্চলে হিন্দু বৈরাগী সম্প্রদায় বাস করতো সে এলাকার নাম বৈরাগী টোলা। যোগী নগর নামের সাথে কোন হিন্দু সন্ন্যাসীর সম্পর্ক না থাকলেও যোগীরা কোন এক সন্ন্যাসীর বংশধর বলে জানা যায়। তাঁতী সম্প্রদায় ভুক্ত হিন্দু শ্রম-শিল্পীদের

একটি শ্রেণীকে বলা হতো যোগী। তারা যে এলাকায় বাস করতো সে এলাকাকেই বলা হতো যোগী নগর। উল্লেখ্য মুসলমান তাঁতীদের জোলা বলা হতো। এরা সাধারণত মোটা কাপড় বুনন করতো অবশ্য তাঁতী বাজারের বসাকদেরও জামদানী নগরের মুসলমান বরণকারীদের পাশাপাশি অন্য যে কারিগর শ্রেণীটি ঢাকাই মসলিন তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো, যোগীদের অনেকেই সেই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলো। এক সময় এদের সংখ্যা ছিলো ষোল হাজারেরও বেশী। হিন্দু যোগী সম্প্রদায়েরা তাদের মৃতদেহ কবরস্থ করতো। তারা কবরের মধ্যে একটি পানির কলস, একটি হুঁকা ও চাটাই রেখে দিত।

এক সময় ঢাকার মসলিন কাপড় ছিলো বিশ্ববিখ্যাত। দেশে-বিদেশে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে এ কাপড় ছিলো আদৃত। সে সময় বিশ্বের বহু রাজ-রাণীরও প্রিয় ভূষণ ছিলো এই মসলিন কাপড়। দিল্লীর সম্রাজ্ঞী বেগম নূরজাহান এই কাপড় খুবই পছন্দ করতেন। বাদশাহ স্বয়ং বেগম নূরজাহানের জন্যে ঢাকা থেকে মসলিন কাপড় নিয়ে যাবার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। সে সময় মসলিনকে কেন্দ্র করে ঢাকার খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

মসলিন একপ্রকার সূক্ষ্ম সুতার কাপড়। এর বুনন নৈপূণ্য ছিলো যেমন অপূর্ব তেমনি সুতার সূক্ষ্মতাও ছিলো কারু-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন্। এত সূক্ষ্ম ও মসৃণ কাপড় তৎকালে পৃথিবীর আর কোথাও তৈরি হতো না। পৃথিবী আজ সভ্যতার চরম শিখরে। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও এমন সূক্ষ্ম ও মসৃণ কাপড় আজও তৈরী করা সম্ভব হয়নি। সে যুগে কলকারখানা কোথাও ছিলো না। তবুও হাতেবোনা মসলিনের খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। আজ আর সে মসলিন কাপড়ের কোন অস্তিত্ব নেই। ১৮০১ সাল থেকেই এই বিখ্যাত বস্ত্র শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়।

ডাচ পর্যটক স্ট্যাভোর নিউন-এর মতে বিশ গজ দীর্ঘ মসলিন কাপড় একটা সিগারেটের প্যাকেটে রাখা যেতো। অথচ বুনন নৈপুণ্যে কোন ফাঁক ছিলো না। সুতার মধ্যে কোন টানা-পোড়েন বা মোটা-সরুর অস্তিত্ব ছিলো না। একবার ইরানের শাহ ত্রিশ গজ লম্বা মসলিন একটা নারিকেলের মালার ভিতর নিয়ে গিয়েছিলেন। ত্রিশ গজ লম্বা ও তিন গজ চওড়া একখানি মসলিনের ওজন ছিলো মাত্র চার-পাঁচ তোলা। এবং সেটিকে গুটিয়ে একটি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে বের করা যেতো। ১৮৩৬ সালে ডঃ উরে বলেছেন ঢাকার মসলিন বস্ত্র ও সূতা এখনও তৈরি হচ্ছে যার নিকট ইউরোপের উদ্ভাবনী শক্তিও হার মানে। যাহা মাকুতে তৈরি করা যায় এবং তা দিয়ে কাপড় বুনন সম্ভব হয়।

মসলিনের সূতা সাধারণত ঠাণ্ডার সময় কাটা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সূতা কাটার কাজে নিয়োজিত থাকতো মেয়েরা। সূর্য তাপে মসলিম সূতা ভালো হতোনা। তাই গরমের দিনে সূর্য ওঠার আগেই সূতা কাটার কাজ শেষ করতে হতো। বর্ষাকালই ছিলো সূতা কাটার সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এমন কি হাতের উত্তাপেও সূতা ভালো হতো না। এজন্যে কারিগররা শরীর যাতে উত্তপ্ত না হয় সেজন্যে ঠাণ্ডা খাবার খেতো। তারা সব সময়েই রৌদ্রতাপ থেকে শরীরটাকে বাঁচিয়ে চলতো। শরীরের উত্তাপ যাতে না বাড়ে সেজন্যেও তারা কায়িক পরিশ্রম থেকে সব সময়েই বিরত থাকতেন। পুরুষদের পক্ষে এসব নিয়ম সব সময় মেনে চলা সম্ভব হতো না বলেই সূতা কাটার কাজে মেয়ে কারিগরদের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য ছিলো। সূতা কাটার পর সূতাগুলোকে বিশেষ এক পদ্ধতিতে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে নেয়া হতো। ধোয়ার পর সূতাগুলো খুবই উজ্জ্বল ও মসৃণ হয়ে যেতো। স্বচ্ছ কাচের ন্যায়ই দেখাতো সেগুলিকে। মসলিন কাপড় পানির নিচে রেখেও বোনা যেতো।

উৎকৃষ্ট মানের মসলিন তৈরি হতো ঢাকা, সোনার গাঁও, ডেমরা, সিদ্ধিরগঞ্জ, জঙ্গলবাড়ি, ধামরাই প্রভৃতি স্থানে। ঢাকার বসাক সম্প্রদায়ের লোকরাও মসলিন তৈরির কাজে পারদর্শী ছিলো। ঢাকার প্রায় সর্বত্রই মসলিন কাপড় বুননের প্রচলন ছিলো। কিন্তু যদুনাথ বসাক লেন, লাল চাঁদ মুকিম লেন, তাঁতী বাজার, যোগীনগর, মহাজনপুর এবং টাকারহাট লেনই ছিলো মসলিন তৈরির প্রধান কেন্দ্র। এসব এলাকায় যেমন ব্যাপকভাবে মসলিন তৈরির প্রচলন ছিলো, তেমনি এসব এলাকায় মসলিন ব্যবসার প্রসারও ঘটেছিলো যথেষ্ট।

তৎকালে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক টেলর ঢাকাই মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ১৬৬৬ হতে ১৬৭০ সালের কথা। সে সময় ঢাকাই মসলিন সুদূর ইউরোপেও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করে। ইউরোপীয় বাজারে মসলিন কাপড়ের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিলো। ইংল্যাণ্ডের রাজা-রানী থেকে শুরু করে ইউরোপের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা মসলিন কাপড় পরিধান করতে খুবই পছন্দ করতেন। এই অতি অল্প সময়েই ঢাকার মসলিন ব্যবসায়ীরা মসলিন কাপড় বিক্রি করে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা আয় করেছিলো। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এই মসলিন কাপড় ছিলো খুবই টেকসই এবং মসলিন পরিধান করে বেশ আরাম উপভোগ করা যেতো। এজন্যে উচ্চ মহলে এর যথেষ্ট সমাদর ছিলো।

তৎকালে ম্যানচেস্টারে বেশ কয়েকটি কাপড়ের মিল তৈরি হয়েছিলো। সে সব মিলেও বেশ উন্নতমানের কাপড় তৈরি হতো। কিন্তু গুণাগুণের দিক দিয়ে মসলিনের

সমকক্ষ ছিলো না, ফলে ম্যানচেস্টারের কাপড় ব্যবসায়িক দিক দিয়ে মসলিনের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতো না। বরং বলা যায়, ম্যানচেস্টারের কাপড় বিশ্ব-বাজারে তেমন সমাদর লাভ করতে পারেনি। পরবর্তীকালে ইংরেজরা এদেশ দখল করে যখন রাজদণ্ড হাতে পেলো, তখন তারা মসলিন কাপড় বোনা নিষিদ্ধ করে দিলেন। এমন কি বহু প্রখ্যাত কারিগরের হাতের আঙ্গুল কেটে দেয়া হয়েছিলো। এসব কাপড় দামের দিক দিয়ে ছিলো সস্তা, ব্যবহারে ছিলো খুবই টেকসই। এসময় ঢাকার মসলিনের ন্যায় বিক্রমপুর, সোনার গাঁও ও ধামরাইর ব্রাহ্মণ রমনীগণ অতি উৎকৃষ্ট পৈতার সূতা কাটিতে পারতেন। একটি পৈতা একটি এলাচির খোসার মধ্যে ভরে রাখা যেতো।

মৈশণ্ডির আসল নাম মভেশমণ্ডী। লোকমুখে নামটি ছোট হতে হতে এবং অপভ্রংশ হয়ে তা মৈশণ্ডিতে পরিণত হয়েছে। মোঘল আমলে এখানে গরুর হাট বসতো। গ্রামাঞ্চল থেকে নৌকাযোগে বা পায়ে হেটে গরু আনা হতো। কসাই ও অন্যান্য ক্রেতার কাছে এসব গরু বিক্রি করা হতো। এলাকাটি সাবেক ধোলাই খালের গতিপথের ধারে অবস্থিত। মনে হয় গ্রামাঞ্চল থেকে নৌকাযোগে গরু আনা-নেয়ার জন্যে খালটি ব্যবহৃত হতো। অপর এক তথ্যে জানা যায়, এলাকাটির আসল নাম মৈসুন্দী। এখানে গোয়ালাদের বসবাস ছিলো। নারিন্দা অঞ্চলটি যেমন নারায়নদীর অপভ্রংশ, এ ক্ষেত্রে তেমনি অপভ্রংশ হয়ে এলাকাটির নাম অন্য রকম নাম ধারণ করেছে।

এককালে বাঁশপট্টি ছিলো কুটির শিল্পের কেন্দ্র ভূমি। এখানে বাঁশ দিয়ে নানা রকম ঝুড়ি, কুলা ও অন্যান্য আসবাবপত্র তৈরী করা হতো। ঢাকার পুরনো ফুলবাড়িয়া রেল ষ্টেশনটি আগে যেখানে অবস্থিত ছিলো তারই দক্ষিণের এলাকাটিতে কিছু দিন পূর্বেও বহু বেত ও বাঁশের আসবাবপত্রের দোকান দেখতে পাওয়া যেত। ১৯২১ সালে জায়গাটির নাম বদল করার জন্যে জনৈকা সুশীলা সুন্দরী দেবী ও জনৈক বি,কে, দাস পৌরসভার নিকট লিখিতভাবে আবেদন জানান। সুশীলা সুন্দরী ছিলেন লেডী ডাক্তার জায়গাটির নাম তাঁর নামানুসারে হোক এই ছিলো তাঁর আবেদন। সে জন্যে তিনি পুরো এলাকাটিতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনে স্বীকৃত হয়েছিলেন। অপর পক্ষে বি,কে, দাস ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাকটর। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর নামানুসারে জায়গাটির নামকরণ করা হলে তিনি নিজের খরচায় পুরো অঞ্চলটিতে আণ্ডার ড্রেন করে দেবেন। শেষ পর্যন্ত দুজনের একজনেরও আবেদন গৃহীত হয়নি এবং এলাকাটির সাবেক নামই বিদ্যমান থেকে গেছে।

পুরানা পল্টন ও দিলকুশা এলাকা থেকে যখন বৃটিশ সেনা বাহিনীর ছাউনী সরানোর ব্যবস্থা হয় তখন এ অঞ্চলটি আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়। সে সময় ঢাকার নবাব আহসান উল্লাহ একটি কুঠি নির্মাণ করেন এবং তার নাম রাখেন দিলকুশা। তিনি এ কুঠিতে কিছু দিন অবস্থান করেছেন। অতঃপর তার কন্যা মেহের বানুর পতি খান বাহাদুর আজম ওরফে আজিম মিয়া এ কুঠিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তখন হতে এ বাড়ীটি আজিম মিয়ার কুঠি বলে ঢাকাবাসীর নিকট পরিচিত হয়।

খান বাহাদুর আজম একজন সমাজ সংস্কার হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি মুসলমানদের তরক্কীর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। ঢাকার লোক তাকে আজিম মিয়া বলে সম্বোধন করতো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনদরদী, গরীবের দুঃখ কষ্টে তিনি অকাতরে দান করতেন। বিপদে-আপদেও তিনি সবার সাথে থাকতেন। তার সময়ে একদা ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যাগুরু হিন্দুগণ হরিনামজপ কীর্তনের ব্যবস্থা করে। এ অনুষ্ঠানে ঢাকার অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুগণও যোগ দেয়। অতঃপর তারা হরিনাম জপ কীর্তনের এক মিছিল বের করে স্থানীয় মসজিদ গুলোর নিকট দিয়ে কীর্তন ও ঢোল বাজিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমলীগোলা এলাকায় বাধা প্রাপ্ত হয়। তখন আমলীগোলা মহল্লার মুসলিম বয়সী ব্যক্তিদের উপস্থিত বুদ্ধি ও আহসান মঞ্জিলস্থ নবাব বাড়ী হতে আগত ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে মিছিলের অর্দ্ধাংশ মসজিদের সীমানা নিঃশব্দে পেরিয়ে কীর্তন গাওয়া আরম্ভ করবে, পরের দল কীর্তন বন্ধ করে মসজিদ পার হয়ে একত্রে মিলবে এ ব্যবস্থায় সেদিন শান্তিপূর্ণভাবে কীর্তন মিছিল শেষ হলেও পরবর্তী বছর তারা তৎকালীন ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হতে ৪০ জন গুর্খা সৈন্যের অনুমতি নিয়ে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নেয়। একথা মহল্লাবাসী অবগত হলে আমলীগোলা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলমান মুরুব্বি প্রধানগণ আজিম মিয়ার সংগে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি জানান এবং উদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করান। আজিম মিয়া তৎক্ষণাত উপস্থিত ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চলে যান এবং বলেন আমাদের মহল্লা সরদার প্রধানগণ এসেছেন, আপনি মিছিলের জন্যে ৪০ জন গুর্খা সৈন্য দিয়েছেন। এদের সহায়তায় তারা মসজিদের নিকট দিয়ে ঢোল করতাল বাজিয়ে যাবে সরকারের নিষেধ থাকা সত্বেও। এরূপ হলে আমার মুসলমান ভাইগণ জীবন দিয়ে বাধা দিবে। ফলে রক্তের নদী বয়ে যাবে– এজন্য আপনি দায়ী হবেন। আজিম মিয়ার দৃঢ় এবং কঠোর বক্তব্য শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই হুকুমনামা বাতিল করে দেন ফলে কীর্তন মিছিল পূর্ব বছরের ন্যায়

শান্তিপূর্ণভাবে পরিসমাপ্তি হয়।

দিলকুশা কুঠি বাড়ীটি ছিলো ঝকমকে ও অনেক বড় আকারের। অভ্যন্তরে কৃত্রিম মাটির পাহাড় তৈরি করে ১২০ ফুট উঁচুতে একটি গৃহ নির্মাণ হয়েছিলো। মর্নিং ওয়াক করার পর সেখানে অবসর নেওয়ার জন্যে। তাছাড়া ছিলো একটি বিরাট জলাশয়। সেই জলাশয়ে থাকতো কয়েকটি কুমির। কুমিরগুলোর রক্ষণা-বেক্ষণ ও প্রতিপালনে আজিম মিয়া অনেক টাকা ব্যয় করতেন। কুমির দেখার জন্যে দূর দূরান্ত থেকে বহু লোক সমাগত হতো। এ কুঠির অভ্যন্তরে খোলা যায়গায় ঘুড়ি প্রতিযোগিতা হতো শীত মৌসুমে, তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো। ঘুড়ি উড়ানোর ব্যাপারে ঢাকার নবাব পরিবারের লোকরা বেশ পটু ছিলো, প্রতিযোগিতায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা জয়লাভ করতো।

বর্তমান রাজউক ভবনের (ডি, আই, টি ভবন) নিকটস্থ ছোট অনাড়ম্বর মসজিদটি দিলকুশা কুঠি বাড়ী অভ্যন্তরেই অবস্থিত ছিলো। এই মসজিদ প্রাঙ্গনে নবাব পরিবারের কয়েকটি সমাধি রয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন উত্তর দিকে যে মাজার রয়েছে তা হজরত শাহ্ নেয়ামত উল্লাহ্ বোদ সেকান্দ (রাঃ)-এর। কথিত আছে বোদ সেকান্দ পদবি এজন্য দেওয়া হয়েছিলো যে, উক্ত বুজুর্গ নেয়ামত উল্লাহর পবিত্র দৃষ্টি নিক্ষেপে দেবদেবীর মূর্তি আলৌকিকভাবে ভেঙ্গে যেতে।

বর্তমানে দিলকুশা একটি বাণিজ্যিক এলাকা হিসাবে পরিগণিত– তাই এখন দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা নামে পরিচিত, কিছু দিন হলো মসজিদটি সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেবের নির্দেশে সংস্কার সাধন করে এর পূর্ব রং এর পরিবর্তে হালকা সবুজ রং দেওয়া হয়েছে, ফলে মসজিদটি ছোট হলেও আধুনিক ও সৌন্দর্য রূপ ধারণ করেছে। এখন মসজিদ ও তৎসংলগ্ন কতিপয় সমাধি সৌধ ব্যাতিত নওয়াব আজিম মিয়া সাহেবের কুঠির কোন অস্তিত্ব নেই। নওয়াব সাহেবের কুঠির নামানুসারে এই এলাকার নামকরণ হয়েছে দিলকুশা।

ঠাটারী শব্দটির অর্থ হলো বৃহৎচক্র বা এক প্রকার বড় রথ যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার প্রতিবন্ধক রূপে সৈন্য বাহিনীর সম্মুখ ভাগে ব্যবহৃত হতো। এর আড়ালে সৈন্যদল দূর্গ আক্রমনের জন্য অগ্রসর হতো। মনে করা হয় এখানে এই প্রকার বৃহৎ চক্র বা রথ তৈরি হতো, তৈরিকারকদের ঠাটারী বলে চিহ্নিত করা হতো। আর সেই কারণেই এলাকাটি ঠাটারী বাজার নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে এস্থানটি পিতল, তাম্র, কাসা ইত্যাদি ধাতব দ্রব্যের পাত্রাদি তৈরিতে প্রসিদ্ধ ছিলো। পরবর্তীকালে ১৮৫০ সালের দিকে এখানে একটি বাজার স্থাপিত হয়। অনুমান করা

হয় এই একই সময় স্থাপিত হয় কোন ইংরেজ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের নামানুসারে ক্যাপ্টেন বাজার। যা ঢাকাবাসী কাপ্তান বাজার নামে অভিহিত করে আসছে।

ঠাটারী বাজারের একাংশ ১৯২৯ সালে জয়কালী মন্দির রোড নামে আখ্যায়িত হয়। জয়কালী মন্দিরের নামানুসারেই রাস্তাটির নাম জয়কালী মন্দির রোড করা হয়েছে। মন্দিরটি দু'শ থেকে আড়াইশ বছর আগে পঞ্চরত্ন রীতিতে নির্মিত হয়। কয়েক'শ বছর আগে শুনংয়ের জনৈক মহারাজ এখানে রাম সীতা লক্ষণের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন।

এখানে ঐ মহারাজার প্রাসাদোপম বাসভবন ছিলো। মোঘল সুবেদারদের সালাম দিতে এসে তারা এখানে উঠতেন। এছাড়া খেদা পেতে হাতি ধরে এনে এখানে বিক্রির ব্যবস্থা করার ফলে এলাকাটি বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে।

প্রায় তিন'শ বছরের এই মন্দিরের কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত কালী মূর্তি এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিমে ছটি মঠ রয়েছে। পশ্চিমের মঠটি পঞ্চ রত্ন এবং সন্নিকটস্থ মঠটি নবরত্ন নামে পরিচিত। নব রত্ন মঠটি নাকি মন্দির হতেও ৫০ বছরের বেশী প্রাচীন।

ঠাটারী বাজারের আরেকটি অংশ ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বামাচরণ চক্রবর্তী রোড নামকরণ করা হয়েছে। বামাচরণ চক্রবর্তী একজন নামকরা ডাক্তার ছিলেন। ১৯২৫-২৬ সালে তিনি ঢাকা পৌরসভার একজন কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

জুমরাইল লেনটির নাম আইল শব্দ থেকেই এসেছে। বাংলায় আইল মানে গ্রাম্য জমির মধ্যবর্তী রাস্তা। ধারণা করা হয়, জুমার নামাজ পড়ার জন্যে দুই জমির মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে মুসল্লিরা মসজিদে যাতায়াত করতেন বলে সংশ্লিষ্ট রাস্তাটি জুমারাইল নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৭৯৩ সালের বিভিন্ন কাগজপত্রে এই এলাকাটি জুমাহ আইল এবং জুমাস অয়েল বলে উল্লিখিত আছে। জুমরাইল লেনে মরহুম নওয়াব মিয়ার বাড়ীর একটি কক্ষ বার বার ভেঙ্গে পড়লে এতদাঞ্চলের লোকের মনে সন্দেহ হলো এখানে কোন অলিউল্লাহর মাজার রয়েছে। শেষে ঐ ঘরে একটি কবর নির্মাণ করা হয় এবং তৎসংলগ্ন স্থানে একটা কুতুবখানা বানানো হয়।

পরীবাগ ঢাকার একটি অভিজাত এলাকা। পরীবাগের একটি অংশ হাতির সড়ক, ময়মনসিংহ রোডের সংঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে। একটি মাত্র লেন পরীবাগ শাহ্ সাহেব লেন নামে আজ পরিচিত।

পরীবাগ নাম হয়েছে অনেকের মতে নবাব আহসান উল্লাহ্র মেয়ে পরীবানুর

নামানুসারে। পরীবানু নবাব আতিক উল্লাহ্‌র বোন এবং নবাব সলিমুল্লাহ্‌র সৎ বোন। এটা ছিল ঢাকার নবাবদের বাগান বাড়ী। পূর্বে এ এলাকাটি হিন্দু জমিদারদের ছিলো। নবাব সলিমুল্লাহ তাদের কাছ থেকে খরিদ করেছিলেন। এর দক্ষিণাংশ শাহবাগ নামে আজও পরিচিত। শাহবাগ ও পরীবাগের মধ্যবর্তী সীমানায় পূর্বে একটি দেওয়াল দ্বারা চিহ্নিত ছিলো। এখন সে দেওয়াল নেই।

মতান্তরে নবাব সলিমুল্লাহ পিতার অজ্ঞাতে পাটনা বেড়াতে গিয়ে যে মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন তার নামও ছিল পরী বেগম। সে বেগম পরীবাগেই অবস্থান করতো বিধায় সেটি পরীবাগ নামকরণ হয়েছিল। নবাব সলিমুল্লাহ্‌ও এখানে মাঝে মধ্যে অবস্থান করতেন। আমার মতে এ সুত্র থেকেই পরীবাগ নামকরণ হয়েছে। সেই নবাবী আমলের একটি বাড়ী আজও জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। যাকে পরীবাগ হাউস বলা হয়ে থাকে। এ বাড়ীটি অতীতের অনেক কথা-অনেক ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়। নবাবদের সম্পত্তি ভাগাভাগি হলে জামাতা সৈয়দ সেলিম, সৈয়দ সাহেবে আলম, খাজা নাজিমুদ্দিন, খাজা সাহাবুদ্দিন, খাজা ইসমাইল ও আরো কয়েক জনের অংশ এখানে পড়ে। বর্তমান পরীবাগ হাউসটিতেই সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প মন্ত্রী ও পার্লামেণ্ট মেম্বার সৈয়দ সেলিম সাহেব বসবাস করে গেছেন।

পরীবাগে নবাব পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যারা বসবাস করে গেছেন তাদের মধ্যে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিন। তার মেয়ে প্রখ্যাত সমাজসেবী বেগম তাহেরা কবির। যিনি তৎকালীন পাকিস্তানে মহিলা সমাজ কর্মীদের প্রথম সারির কর্মী ছিলেন। বাংলাদেশের জাতিসংঘের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি লেঃ জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন (মরহুম) এখানেই বসবাস করেছেন। তাদের বাড়ির এলাকাটি বায়তুল আমান নামে পরিচিত।

পরীবাগ মসজিদটি নবাব সলিমুল্লাহ তৈরি করে গেছেন। বর্তমানে মসজিদের অনেক সম্প্রসারণ হওয়ায় আকৃতি বদলিয়ে গেছে। মসজিদের সম্মুখস্থ রাস্তাটির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে বয়ে গেছে এক গভীর খাদের মত কাঁচা ড্রেন। দেখলেই ভয় হয়। এ ধরনের খাদের মত গভীর ড্রেন ঢাকায় আর কোথাও দেখা যায় না। এ ড্রেন তথা নালা দিয়ে ঢাকার বহু অঞ্চলের দূষিত পানি প্রবাহিত হয়। নালার অপর পারে হাতীর পুল সড়কের নিকট ছিল পাওয়ার হাউস। এটি স্থাপনেও ঢাকার নবাবদের বিরাট দান রয়েছে। এই পাওয়ার হাউস হতেই পূর্বে ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ হতো। বর্তমানে পাওয়ার হাউস বন্ধ হলেও এটি পাওয়ার ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড এর আওতাধীনে রয়েছে।

এবার আসা যাক পরীবাগ শাহসাহেব লেন নামকরণ প্রসঙ্গে। পরীবাগের শাহ্ সাহেব সৈয়দ শাহ্ আব্দুর রহিম উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত হরিপুর টাউনের উত্তরে প্রসিদ্ধ ওলী বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো সৈয়দ শাহ্ আব্দুল্লাহ ওরফে মাওলানা জীওন শাহ্। তাঁর পূর্ব পুরুষগণও ওলী বংশ হিসেবে এল্যাকায় পরিচিত ছিলেন।

পরীবাগের শাহ্ সাহেবের জন্ম নিয়েও এক কাহিনী রয়েছে। তাঁর পিতা হযরত শাহ্ আব্দুল্লাহর প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তেকাল করলে তিনি পুনঃ বিবাহ না করার মনস্থ করেন। কিন্তু একদিন হজরত খেজের আলাইহেস সালাম এসে তাঁর মাতাকে বলে গেলেন, তোমার ছেলেকে পুনঃ বিবাহ করতে বল। আল্লাহর হুকুমে তাঁর দু ছেলে জন্ম নেবে তাঁর মধ্যে একজন হবেন আল্লাহর খাস ওলী।

এরপর থেকে ছেলেকে পুনঃ বিবাহ করার জন্য প্রবল চাপ দিতে থাকেন। অবশেষে মায়ের আদেশে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সেই দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে সত্য সত্যই পর পর দু'পুত্রের জন্ম হয়। তাদের নাম রাখা হয় যথাক্রমে আব্দুর রহমান ও আব্দুর রহিম। আব্দুর রহমান-এর সন্তানাদি বর্তমানে ইরানে রয়েছে বলে জানা যায়। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হয় সৈয়দ আঃ রহিম।

শৈশবকালে নিজ পরিবারে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবার পর রাওয়াল পিণ্ডির এক প্রসিদ্ধ আলেমের নিকট শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরবর্তীতে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন মাদ্রাসায় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে হাদীস, তফসীর এবং ফেকা শাস্ত্রের সূক্ষ্ম সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জন করেন।

তিনি শাস্ত্রীয় মসলা মাসায়েল নিয়ে কোন তর্ক বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন না। তিনি যে মসলা সহী মনে করতেন তাঁর উপর নির্ভর করেই কাজ করে যেতেন। তিনি ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ফার্সী কবিতাও লিখেছেন অনেক। মাতৃভাষা পুশতু ও পাঞ্জাবী থাকলেও বহুদিন দিল্লীতে অবস্থানের জন্য বিশুদ্ধ উর্দুও বলতে পারতেন।

পরীবাগের শাহ্ সাহেব তাঁর পীরের নাম পরিচয় দিতেন না। তাই অনেকেই মনে করেন তিনি খেযেরী তরিকায় বিশ্বাসী ছিলেন। খেযেরী তরিকায় পীরের নাম প্রকাশ করার বিধান নেই। তবে কেউ কেউ বলে গেছেন শাহ্ সাহেব নিজেকে সুয়ারী শরীফের কাদেরীয়া তরিকায় প্রসিদ্ধ পীর হজরত খাজা আব্দুর রহমান (রাঃ)-এর সেলসেলা ভুক্ত বলে প্রকাশ করতেন, কিন্তু সে তরীকার বিধান মতে তাঁকে কাজ করতে দেখা যায়নি।

আজ হতে প্রায় শত বর্ষ পূর্বে সুদূর সীমান্ত প্রদেশ হতে ঢাকা নগরীতে আগমন

করেন, এবং একজন অপরিচিত বিদেশী ব্যক্তি হিসেবে কালাতিপাত করতে থাকেন। অতঃপর ঢাকার তৎকালীন নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুর তাঁকে পরীবাগস্থিত তার দুগ্ধ কেন্দ্রে দায়িত্ব প্রদান করে একটি চাকুরী দিলে তা তিনি গ্রহণ করেন। সে কারণে ঢাকাবাসীগণ পরবর্তীতে তাঁকে "হুজুর দুধ শাহ্ সাহেব" বলে সম্বোধন করতেন। শাহ্ সাহেব তাঁর দুগ্ধ কেন্দ্রের দায় দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে এবাদত বন্দেগীও যথারীতি করে যেতেন দেখে তাঁর প্রতি নবাব বাহাদুরের সুনজর পড়ে। এবং তখন হতে আরও সজাগ দৃষ্টি রেখে তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলেন। নবাব বাহাদুর যতই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শাহ্ সাহেবকে দেখতে লাগলেন, ততই যেন তাঁর নিকট হুজুরকে অসাধারণ ব্যক্তি বলে মনে হতে লাগলো। ফলে তিনি পরীবাগের একটি বাড়ী ও বাগান হুজুরকে দান করেন।

তখন থেকে শাহ্ সাহেব পরীবাগের বাড়ীতে একাকী বাস করতে লাগলেন, এবং তৎকালীন জংগলময় পরীবাগে আল্লাহর জেকর, ধ্যান ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হলো। শাহ্ সাহেবের সহধর্মিনী সীমান্ত প্রদেশেই অবস্থান করতেন। একদিন সংবাদ এলো তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ---- রাজেউন) তারপরও কয়েক বছর অতিবাহিত অবস্থায় থেকে একদিন নবাব সাহেবের নিকট পূনঃ বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নবাব বাহাদুর একথা শ্রবণ করে আশ্চর্যের সহিত বললেন, এই আশি বৎসর বয়সে আপনি আবার বিবাহ করতে চান? সে যা হোক নবাব বাহাদুরের প্রচেষ্টায় ঢাকার এক বিশিষ্ট সৈয়দ পরিবারে শাহ সাহেব এর বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়ে গেলো। তাঁর এ দ্বিতীয় বেগম শেরেবাংলা ফজলুল হকের প্রথমা বেগমের চাচাত বোন হতেন। সে সম্পর্কে শেরে বাংলা ফজলুল হক খালু শ্বশুর হলেও শাহ সাহেবকে শ্রদ্ধেয় মুরুব্বীর মতই সম্মান করতেন।

শাহ্ সাহেবের বিবাহের কার্য সমাধার কিছু দিনের মধ্যেই আরমানী টোলা এলাকায় একটি নিজস্ব বাড়ীরও বন্দোবস্ত হয়ে গেলো। তিনি সে বাড়ীতে সহধর্মিনীকে নিয়ে উঠে গেলেন সত্য। কিন্তু পরীবাগের মায়ার বন্ধন মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছাড়তে পারেননি। প্রতিদিন সকাল থেকে এশার নামাজ পর্যন্ত পরীবাগেই অবস্থান করতেন। তার পুত্র কন্যাদের বিবাহ দিনেও পরীবাগে পূর্ব নিয়মেই গিয়েছেন। নিয়মের বরখেলাপ করেননি।

শাহ্ সাহেবের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের পুত্র সৈয়দ শাহ্ আব্দুল গফুর। সীমান্তের হাজারা জিলার হরিপুর টাউনেই বসবাস করতেন। পরবর্তীতে ঢাকার সহধর্মিনীর

গর্ভে তিন পুত্র ও চার কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। তারা সকলেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। শাহ্ সাহেবের ইন্তেকালের পর জৈষ্ঠ পুত্র তার গদীনসিন হয়েছিলেন। ২য় পুত্র সরকারী উচ্চ পদে এবং তৃতীয় পুত্র অনেক দিন ঢাকা পৌর সভার সেক্রেটারী পদে আসীন ছিলেন।

পরীবাগের শাহ্ সাহেব মায়ারেফাত লাভ করেছিলেন বলে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। যার ফলে তিনি অনেক কেরামতি দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অন্তরের জ্যোতি এতই প্রবল ছিলো– যদ্বারা তিনি উপস্থিত লোকজনের মনের গোপন ভাব, কতদূর ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে তাঁর দরবারে হাজির হয়েছে তা সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন। এটা অবশ্য সত্য যে আল্লাহর ওলি দরবেশদের পক্ষে গোপনীয় অবগত হওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। পৃথিবীর বুকে তাঁর অনেক নজীর রয়েছে।

তার কেরামত সম্পর্কে এক পরম ভক্ত ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক মাওলানা মমতাজ উদ্দিন সাহেব বর্ণনা দিয়েছিলেন যে সাবেক পাকিস্তানের মন্ত্রী জনাব মফিজ উদ্দিন সাহেব একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ডাক্তারদের আপ্রাণ চেষ্টা, সেবা যত্নে কোন কিছুই কাজ হলো না। দিন দিন অবনতি হতে চললো একদিন তার মুমূর্ষ অবস্থা। প্রখ্যাত অধ্যাপক ও ডাক্তারগণ একমত হলেন তার বাঁচার আর কোন আশা নেই। লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য মুর্দা বহনকারী গাড়ীও তৈরি হয়ে আছে। সরকারের তরফ হতে শোক প্রকাশ করে স্কুল কলেজ ছুটিও ঘোষণা করা হলো। এমনি সংবাদ পেয়ে শাহ্ সাহেব হাজির হয়ে দেখলেন তখনও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয়নি। ডাক্তারগণ হুজুরকে অবহিত করলেন তাদের সকল চেষ্টা ডাক্তারী শাস্ত্রমতে ব্যর্থ। এখন আল্লাহই এক মাত্র ভরসা।

শাহ্ সাহেব মৃত প্রায় মন্ত্রী মফিজ উদ্দিনের শিয়রে বসে কোরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে মোনাজাত করতে লাগলেন। এরূপভাবে দেড় ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর মোনাজাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগী মুদিত চক্ষু মেলে চতুর্দিকে তাকাতে লাগলেন। এদৃশ্য দেখে পরিবারের স্বজন ও ডাক্তারগণ অবাক হলেন। এমনিতর অনেক ঘটনা ঘটিয়েছেন বলতে গেলে অনেক কথা বলা যেতে পারে তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রতিদিন অনেক রোগী নিরাময়ের জন্য তার আর্মানীটোলা ও পরীবাগে হাজির হতেন। তাঁর দোয়ায় নিরাময়ও হয়েছেন অনেকে। তিনি একজন আদর্শ সেবকও ছিলেন। তাঁর নিকট আসা শত শত রোগীর

মধ্যে বসন্ত এমনকি কুষ্ঠ রোগীও আসতেন। তাদের শরীরে নিজে হাত বুলিয়ে ধুয়ে মুছে দিয়ে দোয়া দরুদ পরে দোয়া করে দিতেন। বেশি ভালবাসতেন দুঃস্থ রোগা শিশুদের। শরীরের দুর্গন্ধ বা ছেড়া জামা কাপড়ের ময়লার গন্ধ তাঁকে বিরত রাখতোনা। শিশুর মুখে হুজুর নাক লাগিয়ে দাড়ি দিয়ে মুছিতে যে কি ভালবাসতেন তা যারা দেখেছেন তারাই অনুভব করতে পারছেন।

কথিত আছে তিনি জ্বিনদের পড়াতেন। অনেক জ্বিন ছাত্র ছিল তাঁর। যশোর অঞ্চলের এক লোককে জ্বিনে ধরে ছিলো। বহু চেষ্টা করেও তাঁকে ছাড়াতে পারলোনা। অবশেষে ঢাকার পরীবাগের উদ্দেশ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল আত্মীয়স্বজনরা। তখন জ্বিন বলে উঠলো আমাকে পরীবাগের শাহ্ সাহেবের নিকট নেবেন না, তিনি আমাদের অনেকেরই শিক্ষা গুরু। আমি এখন হতে চির বিদায় নিলাম। শাহ্ সাহেব মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে হঠাৎ একদিন বলে ফেললেন যে অনেক বোরকাধারী জ্বিন-সন্তান কোলে করে আমার বাসায় এসে ভিড় করে থাকে।

যা হোক– ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে সরল জীবন যাপন করতেন। ক্রোধ, রাগ, গর্ব-গরিমা-জাঁকজমক ইত্যাদি হুজুরের জীবনে কেহ দেখেনি। তিনি রমজানের ঈদের জামাতে প্রতি বছর এই দোয়া চাইতেন যেন আল্লাহ আগামী বছরের রোজা রাখার তৌফিক দান করেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ঈদ জামাতে সে ধরনের দোয়া চাহিলেন না। এতে ভক্তদের মনে সন্দেহ জাগলো যে, হয়তো হুজুর আগামী ঈদের পূর্বেই আমাদের ত্যাগ করে পরপারে চলে যাবেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পূর্বে ভক্তদের বলছিলেন পরীবাগের যে স্থানটিতে তিনি গামছা বিছিয়ে বসেন সে জায়গাটি বড়ই শীতল। এ রকম শীতল ও শান্তিময় জায়গা ঢাকা শহরে আর কোথায়ও নেই।

পরীবাগের শাহ্ সাহেব সৈয়দ শাহ্ আব্দুর রহিম ১৫১ বছর বয়সে ১৯৬১ সালের ১৯শে মার্চ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজের সময় সামান্য কাশিতে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহে--- রাজেউন)। অত্যন্ত শৃংখলার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর লেঃ জেনারেল আযম খাঁন ও বহু উচ্চ পদস্থ সরকারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং হাজার হাজার ধনী দরিদ্র ভক্তদের উপস্থিতিতে তাঁর জীবনের প্রায় শত বছরের বসার প্রিয় স্থানটিতে দাফন করা হয়। তাঁর কবরের স্থানটিকে পরে পাকা দালানে পরিণত করা হয়। এখনও অনেক ভক্ত সেখানে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য উপস্থিত হন।

আল্লার প্রিয় জান্নাতবাসী পরীবাগের শাহ্ সাহেবের স্মৃতিকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য

ঢাকা পৌর সভা পরীবাগের একটি গলির নামকরণ করেছেন পরীবাগ শাহ্ সাহেব লেন।

হাকিম হাবীবুর রহমান প্রদত্ত এক তথ্যে জানা যায়, ধূপখোলা এলাকাটিতে ধোবারা কাপড় ধোয়া ও শুকাবার কাজ করতো। একারণে এই এলাক্যটিকে ধোবখোলা বলা হতো। কিন্তু উচ্চারণ দোষে শব্দটি ধূপখোলা রূপান্তরিত হয়। ধূপখোলা এলাকায় একই স্থানে মোঘল আমলের তিনটি মাজার ছিলো। কথিত আছে এই তিনটি মাজার থেকে আলোর গোলা বের হয়ে পূর্বদিকে চলে যেতো। ঘণ্টা খানেক পর এই আলোর গোলা ফিরে এসে কবরগুলোর কাছে অদৃশ্য হয়ে যেতো। মহল্লার অধিবাসীরা অহরহই এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতো। এই অলৌকিক ঘটনায় সবাই বিস্মিত হয়ে যেতো। এজন্য কবর তিনটিকে সবাই খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। বর্তমানে ঢাকা পৌরসভা ধূপখোলা মাঠটিকে দুটি ক্লাবের জন্য ফুটবল গ্রাউণ্ড ও দর্শকদের খেলা উপভোগ করার জন্য গ্যালারী নির্মাণ করে দিয়েছেন।

অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের প্রিয় নেতা কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নাম সর্বজন বিদিত। তিনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম গর্ভণর জেনারেল। তাঁরই নামানুসারে যাহা পূর্বে পল্টন এলাকার আওতাভুক্ত ছিলো তাহার নামকরণ হয় জিন্নাহ এ্যাভিনিউ। মিঃ জিন্নাহ ডিসেম্বর, ১৮৭৬ সালে করাচীতে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হতেই জিন্নাহ পাঠ্যানুরাগী ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। বাল্য শিক্ষা আরম্ভ হয় বোম্বের গকুলদাসতেজ প্রাইমারী স্কুলে। স্কুলে পড়ার সময় হতেই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, প্রতিভা, তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি যা সহজেই যে কোন সিদ্ধান্তে পৌছুবার ক্ষমতা ছিলো অসাধারণ। ফলে ১৮৯২ সালে মাত্র ষোল বছর বয়সেই লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়তে যান। ইতিপূর্বেই তিনি ভারতের প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বিলেতে দাদা ভাই নওরোজির রাজনৈতিক প্রজ্ঞার আভাষ পেয়ে তার কাছে রাজনীতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অন্য দিকে নওরোজিও ১৭ বছরের তরুণের মধ্যে দেশ প্রেম ও নেতৃত্ব দান করার মত প্রজ্ঞা দেখে তাকে কাছে টেনে নেন। মিঃ নওরোজির দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এই তরুণের দ্বারা দেশ একদিন যথেষ্ট উপকৃত হবে।

সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করে মিঃ জিন্নাহ ১৮১৬ সালে ভারতে ফিরে আসেন। দেখলেন পিতা তার অর্থ যোগান দিতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি বোম্বের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী গ্রহণ করেন। বিচারকের আসনে বসে অপূর্ব দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগলেন।

১৯০৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে দাদা ভাই নওরোজীর সঙ্গে যোগদান করেন এবং তার একান্ত সচিব হন। ঐ সময় থেকে মূলতঃ গান্ধী যুগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। হিন্দু মুসলিম ঐক্যই তার লক্ষ্য ছিল। সেজন্যে সরোজিনি নাইডু মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'জিন্নাহই হিন্দু মুসলিম মিলনের অগ্রদূত।' কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সংস্কারের জন্য মিঃ জিন্নাহ ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। ১৯০৯ সালেই জিন্নাহ ভারতের সর্বচ্চো শাসন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে লর্ড মিন্টো প্রমুখ ঝানু রাজনীতিবিদদের বিস্মিত করেন। বৃটিশ যুগে তার যুক্তি তর্কের সামনে কেউই দাঁড়াতে সাহস পেতো না। এর প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় পরবর্তীতে তার ভারত বিভাগ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী কট্টর হিন্দু নেতাগণ এমনকি বল্লভ ভাই প্যাটেলের মত লোকও ভারত বিভাগকে সমর্থন করে কংগ্রেসকে রাজী করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯১৬ সালে লাখনৌ প্যাক্টের মাধ্যমে তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্য চিন্তায় বিশেষভাবে তৎপর হন। কংগ্রেসের নেতা হলেও অনেকের মত তিনিও ১৯১৩ সাল হতে মুসলিম লীগের কর্মী। ১৯২০ সালে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি পদে বরিত হন। তিনি দীর্ঘ দিন একই সাথে সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সভাপতি পদে আসীন থেকে হিন্দু মুসলিম মিলনের দূত হিসেবে কাজ করতে থাকেন। যা অন্য কোন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা করতে পারেননি। বাণী চাইলে তিনি বলতেন, 'মুসলমানদের কাছে আমার বাণী তারা যেন হিন্দু ভাইদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করেন। আর হিন্দুদের জন্য বাণী তারা যেন পিছিয়ে পড়া মুসলিম ভাইদের তুলে এক সাথে কাজ করেন।' যার ফলে ১৯২৭ সালে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু নির্বাচনে হিন্দু নেতাদের আসল রূপ দেখা গেলো। ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের প্রিয় নেতারা পর্যন্ত সে নির্বাচনে হিন্দুদের ঐক্য ও কৌশলের কাছে পরাভূত হলেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯২৮ সালে দিল্লীতে অলইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুসলমান সমাজের পক্ষে চৌদ্দ দফা দাবী উত্থাপন করা হয়। ১৯২৯ সালে ঐ দাবীর উপর ভিত্তি করেই মুসলিম অল পার্টিজ কনফারেন্সে ভারতীয় মুসলমানদের রক্ষা কবচ হিসেবে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন এর ব্যবস্থা, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদির পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তখনও মিঃ জিন্নাহর লক্ষ্য ছিল অখণ্ড ভারত।

১৯৩৩ সালে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস মুসলমানদের চৌদ্দ দফা প্রস্তাব

অগ্রাহ্য করলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অচলবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৩৬ সালে পুনঃ সমঝোতা করে নির্বাচন করলেও কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা গঠনে কংগ্রেস অস্বীকার করে। পণ্ডিত নেহরু প্রকাশ্যে বলেন কোয়ালিশন সরকার করলে ভারতে কংগ্রেস ব্যতিত আরো রাজনৈতিক দল আছে বলে স্বীকার করে নেয়া হবে। কংগ্রেস ভারতে বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেস ব্যতিত তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব স্বীকার করবেনা-করেনা। জবাবে জিন্নাহ বলেছিলেন কংগ্রেস লাখনৌ চুক্তি করে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এখন তা অস্বীকার করলে মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল হবে। এর পরও জিন্নাহ লীগ-কংগ্রেসে সমঝোতার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কংগ্রেসের জেদের ফলে তা সম্ভব হয়নি। ফলে ১৯৪০ সালে লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মুসলিম রাজনীতির ধারা সম্পূর্ণ বদলে যায়।

১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করা হলেও ১৯৪৬ সালে বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের সাথে লীগ ও কংগ্রেস আলোচনা করে পুনরায় ঐক্যমতে পৌঁছে যে শ্বেতপত্র প্রকাশ হয়, তাতে পাকিস্তান প্রস্তাব বাতিল করে ভারতীয় ইউনিয়ন লীগের প্রস্তাব করা হয়। কংগ্রেস শর্তাধীনে সে প্রস্তাব মেনে নিলেও পরবর্তীতে সে পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। তার পর ১৯৪৬ সালের ২৭শে জুন বোম্বেতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব যাতে লীগ স্বীকৃতি দিয়েছিল তা কংগ্রেসের কার্যক্রম দেখে প্রত্যাহার করে সক্রিয় কর্মপন্থা আরম্ভ করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে বৃটিশ উপাধি বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। অতঃপর কংগ্রেসের মুসলমানদের সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গ, ধোঁকাবাজী ও তাদের আসল উদ্দেশ্য অনুভব করে বাধ্য হয়ে ১৪ই নভেম্বর মিঃ জিন্নাহ ঘোষণা দিলেন একমাত্র পাকিস্তান হিন্দুস্তানের সৃষ্টির মাধ্যমেই ভারতের রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব।

সক্রিয় কর্মপন্থা পালন করতে গিয়ে ভারতের অনেক প্রদেশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। যা ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি। গান্ধী-জিন্নাহ দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানালেও তেমন কোন ফলোদয় হয়নি। অবশেষে অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে, অনেক রক্ত, জীবন, ধন সম্পদ, ইজ্জত আবরুর বিনিময়ে ভারত বিভাগ স্বীকৃত হলো। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো। ১৩ই আগষ্ট মধ্য রাত্রের শেষে পাকিস্তানের ডোমিনিয়নের গর্ভনর জেনারেল হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধার হবার পর তিনি ১৯৪৮ সালের মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে

আগমন করেন। তখন রাষ্ট্রভাষা উর্দূ হবে বলে ঢাকার জন সমাবেশে যে বক্তব্য রাখেন তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় প্রথমে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। তারপর তা ধীরে ধীরে একটি আন্দোলনে দানা বেধে ওঠে। আন্দোলনের পরবর্তী ধারা তিনি দেখে যেতে পারেননি। মিঃ জিন্নাহ অসুস্থ্য হয়ে পড়লে বলা যেতে পারে স্বার্থন্বেষী রাজনৈতিক ব্যক্তি বিশেষের চক্রান্তে তাঁকে কোয়েটায় পাঠানো হয়। অতঃপর তার অবস্থা আরো সংকটাপন্ন হয়ে পড়লে তাঁকে একটি ভাঙ্গা এম্বুলেন্সে করে করাচী আনয়ন করা হয়। এটা ছিলো তৎকালীন পাকিস্তানী অধিবাসীদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু সুচতুর রাজনৈতিকগণ তার অবস্থা জনগণকে অবহিত হতে দেননি। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধার মাত্র একটি বছর ছিলেন। সংগ্রামে তার ক্ষীণকায় শরীর ভেঙ্গে পড়ায় রাষ্ট্রের ভীত ও প্রশাসনিক কাঠামোকে তেমন সুষ্ঠভাবে সাজিয়ে যেতে পারেন নি।

আমরা যদি মুক্ত মন নিয়ে, নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে তখনকার হিন্দু ও কংগ্রেস নেতৃবর্গের কথা ও কার্যক্রম লক্ষ্য করি। ভাবাবেগ পরিত্যাগ করে তখনকার সার্বিক অবস্থার মূল্যায়ন করি, তাহলে দেখবো ঃ মুসলমানদের ঘোর অমাবশ্যার অন্ধকারের ভেতর দিয়ে মিঃ জিন্নাহ মুসলমানদের সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত নেতৃত্ব দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দিতে সফল হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে দ্বি-জাতিত্ব ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কোন ভুল পদক্ষেপ হয়নি, সেটাই ছিলো বাস্তব। এই বাস্তবতা যদি অস্বীকার করি তা'হলে পূর্ব বঙ্গ স্বাধীন বাংলাদেশ হতো কিনা সন্দেহ। আমরা বাংলাদেশের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদেশ কাশ্মীরের দিকে লক্ষ্য করলেই এর প্রমাণ পেতে পারি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অনুন্নত অশিক্ষিত মুসলমানরা ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য তথা সার্বিক উন্নয়নের সুযোগ পেলেও পরবর্তীতে আলাদা স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হওয়ায় সেটা আরও পরিপূর্ণতা লাভ করছে। যদি বাংলা বিভাগ না হতো তাহলে আজো বাংলার মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে থাকতো। কথাগুলো এজন্য বললাম কিছু দিন হলো একটি সাপ্তাহিক কাগজে "বিধাতার কাঠগড়ায় মিঃ জিন্নাহ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে, তাতে কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে মিঃ জিন্নাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যে যুক্তি প্রদর্শন করছেন আর তাকে অসার ও ভিত্তিহীন সর্বোপরি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা একটা ভুলের মাসুল বলে যে উপস্থাপনা তথা আরজী পেশ করিয়েছেন জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দিয়ে, লেখক কি ভুলে গেলেন খোদ সোহ্‌রাওয়ার্দী একজন মুসলিম লীগ নেতা ও পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রপথিক ছিলেন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের

গঠণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীত্ব করে গেছেন। এ ধরনের অসার কথার অবতারণা করে একজন সত্যিকারের রাজনীতিবিদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো ঠিক নয়। তখন সারা ভারতের শতকরা ৯০ জন মুসলমান তাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। একথা জেনেও যে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হবে না। তবুও তারা পাকিস্তান চেয়ে ছিল এজন্য যে এটা হবে তাদের রক্ষা কবচ তথা ভারত ভূ-ভাগের কিলক। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলে কি দেখা যায়, কত রক্তপাত ঘটিয়ে কত জান মাল ক্ষতি সাধন করে কত আনন্দ উল্লাসে কমিউনিজমবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। তা শতবর্ষ পূর্ণ হতে না হতেই ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। এটা প্রকৃতির নিয়ম এক পার ভেঙ্গে অপর পার গড়ে। এটাই আল্লাহর বিধান। "সব দিন সকলের সমান যায়না।" এটা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি একটি রাষ্ট্র, একটি দেশ, একটি জাতির প্রতিও প্রযোজ্য। পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে ভাঙ্গা গড়ার খেলা চলবে এটাই খোদার লীলা খেলা। তজ্জন্য সত্যকে অস্বীকার করা, ইতিহাসকে বিকৃত করা বা মুছে ফেলা সঠিক নয়। ইতিহাস তার নিজ গতিতে যথা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবেই।

শেরে কাশ্মীর শেখ আবদুল্লার জীবন কাহিনী যা তিনি নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছেন তাতেও দেখা যায় মিঃ জিন্নাহ ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আর অখণ্ড ভারতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। শেখ আবদুল্লাহর লিখা (বঙ্গানুবাদ) জলন্ত ভূসর্গ বইটি পড়লে দ্বি-জাতি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যথার্থতার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে তাঁর ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ জিন্নাহ এভিনিউ নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ রাখা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালে সাবেক ফরিদপুর জেলা গোপালগঞ্জস্থ টুঙ্গিপাড়ার এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান আদালতের সেরেস্তাদারের চাকুরী করতেন। ছোটবেলা থেকেই স্বভাবে একগুয়ে, জেদী ও খুব চঞ্চল ছিলেন। লেখা পড়ার চাইতে সামাজিক বিভিন্ন ব্যাপারে তার আগ্রহ থাকতো বেশী। পিতা তাঁকে আইনজীবি হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাস্তবে তা না হয়ে একজন বিপ্লবী রাজনীতিবিদ হিসেবে পেয়েছিলেন।

গোপালগঞ্জ হাই স্কুল পরিদর্শনে শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হকের আগমন উপলক্ষে যে সংবর্দ্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তা নিয়ে শহরের হিন্দু নেতৃবর্গের সঙ্গে

মুসলমানদের মতদৈত্বতা দেখা দিলে কিশোর মুজিবুর রহমান সংবর্দ্ধনা আয়োজনের একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে যান। তখন হতেই তাঁর মধ্যে স্বজাতি ও রাজনীতির অঙ্কুর প্রথিত হয়। সে সময়েই আইন শৃঙ্খলাজনিত কারণে অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে তাঁকেও সাতদিন হাজত বাস করতে হয়। তখন হতেই তিনি একজন রাজনৈতিক গুরত্বসম্পন্ন ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণের মনোবাসনা মনে মনে পোষণ করছিলেন। সে সময়েই গোপালগঞ্জে এলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। স্কুলে ছাত্রাবাসের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে কিশোর মুজিবুর রহমান সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। ১৯৪২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন তখন তিনি বিবাহিত। থাকার জায়গা নিলেন বেকার হোষ্টেলে।

কোলকাতা তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে সরগরম। মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন তখন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব তখন মুসলিম লীগের একজন জাঁদরেল নেতা। বঙ্গবন্ধু তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেন। তখন হতেই মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে কাজ আরম্ভ করেন। এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে রাজনৈতিক গুরু হিসেবে অন্য দিকে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবও তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

অন্যদিকে কোলকাতায় অন্য আরেকটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাহলো হলওয়েল মুনুমেণ্ট ভাঙ্গার আন্দোলন। এই মনুমেণ্ট বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য ইংরেজরা নির্মাণ করে ছিলেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নেতাজী সুভাস বোস। মুজিব এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে নেতাজীর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান কায়েম হওয়ায় শেখ সাহেব তাঁর রাজনৈতিক গুরুকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় আসার ইচ্ছা পোষণ করলেও সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব কোলকাতায় থেকে যান। বঙ্গবন্ধু ঢাকায় এসেই পিতার আশা পূরণ করার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু তিনি দেশ সেবা ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের নেশায় মত্ত হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর পিতার ইচ্ছে পূরণ করতে পারেননি। লেখাপড়ার আশা ত্যাগ করে রাজনীতিতে ফিরে আসেন। তখন মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু এই সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদকদের একজন নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে বিরোধী আন্দোলন ক্রমশঃ জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে এক ভূখা মিছিল পরিচালনা করার জন্য মাওলানা ভাসানী, সম্পাদক সামসুল হকসহ শেখ মুজিবও গ্রেফতার হন। তার পরই ভাষা আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৫২

সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই জেল থেকে মুক্তি পান। কারাগারে দলের সম্পাদক সামসুল হক সাহেব মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন শেখ মুজিব। তখন হতেই তিনি সারা দেশে স্বাধীকার আন্দোলনের দাবী ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। সরকার শেষ অবধি ১৯৫৪ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। এ সময়েই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব ঢাকায় চলে আসেন। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্যে বিরোধীদলগুলো একত্র হয়ে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনী অভিযানে সকল বিরোধী নেতৃবৃন্দ ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেই শেখ মুজিব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রী সভায় মন্ত্রী পদেও আসীন হন। তিনি জাতির জন্য স্বায়ত্বশাসন আদায়ের লক্ষ্যে ছয়দফা দাবী উত্থাপন করেন, যার স্বপক্ষে সারা দেশে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এর পূর্বে একুশ দফার দাবীও জনগণের সমর্থন পেয়েছিলো।

ছয়দফা দাবীর আন্দোলনে শেখ মুজিবের বক্তৃতায় পাকিস্তান ধ্বংসের গন্ধ খুঁজে বের করে তাঁকে জেলে পুরলেন তৎকালীন গর্ভনর মোনেম খাঁন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে এবং আরো পঁয়তাল্লিশ জন সামরিক ও বেসামরিক অফিসারসহ বিশিষ্ট নাগরিকের বিরুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন করার অভিযোগ আনা হলো। যা ইতিহাসে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" নামে অভিহিত। শেষ পর্যন্ত প্রবল আন্দোলনের মুখে এ মামলার ভিত উবে গেলো। মুক্তি পেলো শেখ মুজিব ও তাঁর সঙ্গী আসামীরা। প্রেসিডেন্ট আইউব খানের গোলটেবিল বৈঠক প্রাক্কালে তাঁর দৃঢ়তার জন্যই এ মামলা সরকার প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এভাবেই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সাফল্য লাভ হওয়ায় এক গণ সংবর্দ্ধনা সভায় শেখ মুজিব "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত হন। এবং সারা দেশের নেতায় পরিণত হন। গোলটেবিলে যোগদান কল্পে লাহোর পৌঁছুলে সেখানেও এক গণ সংবর্দ্ধনা পান। পরিশেষে আইউব ক্ষমতা ত্যাগ করে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁনের নিকট। আবার সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করা হলো। বন্দুকের নলকে পূর্বপাকিস্তানবাসীরা আর ভয় করলো না। ইয়াহিয়া সরকার অগত্যা সাধারণ নির্বাচন দিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হলো। পাকিস্তান গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। চললো ষড়যন্ত্র। গণপরিষদের অধিবেশন ইয়াহিয়া খাঁন ডেকেও বাতিল করে দিলেন। ফলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান এই স্বৈরাচারী আদেশের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলো।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষনের একপর্যায়ে তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ ভাষণ প্রমাণ করলো তিনি যে একজন সত্যিকারের বিপ্লবী নেতা। পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা ইতিহাসের বিরল সম্মানে ভূষিত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বলতে গেলে সেদিনের পর থেকেই ভাষণের নির্দেশানুসারে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী-বেসরকারী ও স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো চলতে আরম্ভ করে। স্বাধীনতা ঘোষণা না করেও যেন পূর্বপাকিস্তান স্বাধীন বাংলা হয়ে গেলো। অপর দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার মিশন নিয়ে ঢাকায় এলে চললো বৈঠকের পর বৈঠক। বঙ্গবন্ধু তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল অনড়। অন্য দিকে অলক্ষ্যে চরম আঘাত হানার প্রস্তুতি চললো। ২৩শে মার্চ ছাত্রনেতৃবর্গ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করলেন। বঙ্গবন্ধু অপেক্ষা করছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবর্গ ও সরকার প্রধানের আচরণের প্রতি। আচমকা ২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে পাক সেনাবাহিনী নিষ্ঠুর আক্রমণ করলো এদেশবাসীর উপর। প্রথমেই গ্রেফতার করলো বঙ্গবন্ধুকে। আর এই নিষ্ঠুর আক্রমণই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে দিলো।

ইতিমধ্যে মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলা দেশের সরকার গঠিত হলো। দীর্ঘ ন'মাস রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ চলার পর লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্ত ও হাজার হাজার মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করলো রমনা রেসকোর্স ময়দানে। এদিনটি বাংলাদেশ বিজয় দিবস হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেলো। আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। ৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে এলেন। এদিনটির গণঅভ্যর্থনার দৃশ্য ছিলো অভূতপূর্ব।

বঙ্গবন্ধু দলের প্রধান হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন। পরবর্তীতে দলীয় ঐক্য অটুট থাকেনি। ব্যক্তি স্বার্থ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে তিনি চারনীতির উপর ভিত্তি করে একটি নুতন সংবিধানও দিলেন জাতিকে। কিন্তু নানা স্থানে রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বাড়তে লাগলো। বঙ্গবন্ধু প্রায়ই চিৎকার করে ফিরতে লাগলেন কাকে তিনি শাস্তি দিবেন, সবাই যে তার আপন জন। বঙ্গবন্ধু কোন পদস্থ সরকারী আমলা কিংবা সামরিক বাহিনীর অফিসার কিংবা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন না। তাই তার মধ্যে প্রশাসনিক দক্ষতার চেয়ে রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান অরাধনাই ছিলো বেশী।

ফলে তিনি তেমন কিছু করতে পারলেন না।

তিনি নির্দিধায় উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, 'পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক আরেক দিকে শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' তাঁর এই উক্তি খ্যাতি অর্জন করেছিলো দেশ-বিদেশে। তজ্জন্যই তিনি জুলিওকুরী আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

গোপালগঞ্জে কিশোর বয়সে থানায় ঢিলছুড়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাকশাল নামক এক প্রকাণ্ড ঢিলছুড়ে তিনি সেই জীবনের ইতি টেনেছেন। বাকশালে জনগণের যোগদানের জোয়ার দেখে বঙ্গবন্ধু আত্মহারা হয়ে জীবন-এর নিরাপত্তার কথা ভুলে গেলেন। আর এই সুযোগ গ্রহণ করে মাত্র গুটি কতক সেনা বাহিনীর সদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট দু'কন্যা ব্যাতীত স্বপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো তাঁর বাসভবনে। তাঁকে কবর দেওয়া হলো সেই টুঙ্গি পাড়ায়– যেখানে তাঁর জন্ম। তাঁর মৃত্যুতে কেউ কাঁদলোনা, জীবনে অনেক মিছিল করলেও তার জন্য তার দলের লোকেরাও শোক মিছিল করলো না। কেউ করলোনা একটা শোক সভা।

তাঁর এই মৃত্যুর মধ্যে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ আমাদের জন্য শিক্ষা, জ্ঞান ও ভাববার বিষয় রেখে দিয়েছেন। যদি আমাদের বুঝবার মত মন থাকে, শোনবার মত কান থাকে, দেখবার মত দৃষ্টি থাকে, তাহলে আমরা অবশ্যই তাঁর মৃত্যুর মধ্য থেকে অনেক কিছু বুঝতে পারবো। সর্ব শেষে আমি এটুকু বলবো। এই বিপ্লবী নেতার নামানুসারে ঢাকায় একটি রাস্তা কেন একটি নগরের নাম রাখাও যুক্তি যুক্ত। আমরা আজ যাকে গুলশান বলে থাকি তার শব্দার্থ উর্দু বা ফার্সী। সেই গুলশান এলাকাকে মুজিবনগর নাম করা যেতে পারতো। তজ্জন্য পাক ভারত বাংলা উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং অবিসংবাদিত মুসলিম নেতা মিঃ জিন্নাহর নামানুসারে জিন্নাহ এভিনিউ এর নাম পরিবর্তন সমীচীন হয়েছে কি? যে উর্দু কথা বলার জন্য জিন্নাহ সাহেবের উপর আমাদের ক্ষোভ, সেই উর্দু ভাষায় গুলশান নামকে আমরা গ্রহণ করলাম। আর যিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পথ সহজ করে গেছেন তার নামকে আমরা মুছে ফেললাম। যে মুসলিম লীগ ভারত মাতাকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে সেই ভারতের বিভিন্ন শহর বন্দরে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক নেতাদের নামে আজও রাস্তার নাম ফলকে রয়েছে।

পাকিস্তান আমলে ঢাকা ছিলো প্রাদেশিক রাজধানী। দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদাদানের জন্যে পাকিস্তান এর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ঢাকার উত্তর

পশ্চিমাংশে একটি নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করেন। প্যাকিস্তান আমলে এই নগরটি আইয়ুবনগর নামে অভিহিত হতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলার কৃষককুলের নয়নের মনি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের দিশারী শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের নামানুসারে আইয়ুব নগরের নাম পরিবর্তন করে শেরে বাংলা নগর নামকরণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এখানকার জাতীয় পরিষদ ভবনেরই নামও পরিবর্তন করে সংসদ ভবন নাম করা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার-আইউব নগরের নাম শেরে বাংলানগর যথার্থভাবেই করেছেন। কারণ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পথিকৃত যেমন এ, কে, ফজলুল হক। তেমনি ছিলেন পাকিস্তান নামের প্রস্তাবক।

জনাব ফজলুল হক বরিশালের চাখারের সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৭০ সালের ২৬শে অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করেন। ফজলুল হক শৈশবকাল থেকেই জনক জননীর মতই দৈহিক গঠনে, আকারে ও শক্তি সামর্থে ছিলেন অসাধারণ। তেমনি ছিল তাঁর ধীশক্তি ও প্রতিভা। স্মৃতি শক্তি ছিলো অপূর্ব। অবিভক্ত বাংলায় প্রধান মন্ত্রী হয়ে ঢাকায় এসে সেই চৌষট্টি বছর বয়সে পয়তাল্লিশটি বড় আকারের ফজলি আম খেয়েছিলেন। এতেই বুঝতে পারা যায় তাঁর দৈনন্দিন ভোজন ছিলো ভীমের মত অসাধারণ। যৌবনে দাবা খেলায়ও ছিলো প্রচুর দক্ষতা। প্রতিপক্ষকে পূর্বেই বলে দিতেন এই গুটিটি দিয়ে তোমাকে মাৎ করবো। আর হতোও তাই–যাদুকরি দাবা খেলার মত রাজনীতির দাবা খেলায়ও অসাধ্য সাধন করে গেছেন শেরে বাংলা।

এ, কে, ফজলুল হক বরিশালে ওকালতি শুরু করার সাথে সাথে স্থানীয় রাজচন্দ্র কলেজে গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপনা, বরিশাল জিলা স্কুলে ফার্সী ভাষায় পরীক্ষক সেই সঙ্গে নিজ সমাজকে জাগ্রত করার জন্যে "সাপ্তাহিক বালক" পত্রিকার সম্পাদনা পরে "ভারত সুহৃদ" নামে আরেকটি পত্রিকায় যুগ্ম সম্পাদনাও করেছিলেন। সমাজের কল্যাণ ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। তাই তিনি বরিশাল পৌর সভার এবং বাকরগঞ্জ জেলা বোর্ডের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

মুসলিম বাংলার অবিসংবাদিত নেতা নবাব স্যার সলিম উল্লাহ্ তরুণ তেজস্বী ফজলুল হককে তার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য পুত্র তুল্য স্নেহ করতেন। আদর করে বলতেন, "ফজলু তোমার মাথাটা আমাকে দাও, আমার গদিটা তুমি নাও" নবাব সাহেব ফজলুল হককে মুসলিম ভারতের নেতারূপে গড়ে তুলতে সাধ্যমত সুযোগ ও সহায়তা করতে সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। পূর্ববঙ্গ-আসামের রাজধানী ঢাকানগরীতে যখন নবাব সলিম উল্লাহ্‌র মাধ্যমে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম এডুকেশনাল

কনফারেন্স হবার সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই সুযোগে নবাব সলিম উল্লাহ ভারতের মুসলমানদের সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করে মুসলিম রাজনীতির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ করতে উক্ত শিক্ষা সম্মেলনের ভেতর দিয়ে "অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ" প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেন তখনই ফজলুল হককে বরিশাল থেকে নিয়ে এসে সম্মেলনের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নবাব ভিকারুল মূলক এর সঙ্গে সারা ভারতের নেতৃবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা করার জন্য সফরের ব্যবস্থা করেন। ঐ সম্মেলনের ভেতর দিয়েই অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের জন্ম। তাই অনেক সময় ফজলুল হক বলতেন "লীগের জন্মকালে আমিও ছিলাম একজন ধাত্রী"।

ঢাকার এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের ভেতর দিয়ে ফজলুল হকের অসাধারণ প্রতিভা দীপ্তি সারা বাংলা ও ভারতে ছড়িয়ে পড়ায় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের গভর্ণর মিঃ ফুলারের দৃষ্টিও তার দিকে নিক্ষেপ হয়। তিনি মুসলিম সমাজের সংগ্রামী নেতাকে রাজনীতির ময়দান থেকে সরিয়ে বৃটিশ সরকারের উৎকণ্ঠা দূরীকরণ এবং সেই সঙ্গে একজন সুদক্ষ কর্মক্ষম কর্মচারী পাওয়ার জন্যে হক সাহেবকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী দিলেন। সে সময় এদেশীয়দের জন্য পদটি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। নবাব সলিমুল্লাহও এপদে চাকুরী করেছেন। তাই হক সাহেবও চাকুরী গ্রহন করেন। পরে তিনি এস, ডি, ও হয়ে জামালপুর যান এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়রত হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও সৌহার্দ ফিরিয়ে আনেন। সে সময় তিনি জামালপুর এর টুনিমীর্জার বাস ভবনে অবস্থান করতেন। এই টুনিমীর্জার পুত্র ইসকান্দার মীর্জাই এক সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধান হয়ে ছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় মর্মাহত নবাব সলিম উল্লাহ মুসলমানদের সংগ্রাম মুখর করে তোলার জন্যে ফজলুল হককে চাকুরী ছেড়ে বৃটিশের সঙ্গে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করলে হক সাহেব তার সুহৃদ বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাকে দেখেই স্যার আশুতোষ বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠেন যে, তোমাকে বারবার চাকুরী ছাড়তে বলেছি, তবু তোমার গোলামীর মোহ গেল না। ফজলুল হক শেষ পর্যন্ত চাকুরীতে ইস্তেফা দিয়ে ১৯১১ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং বছর খানেকের মধ্যে সেরা উকিল বলে পরিগণিত হলেন। বাংলার দুর্ধর্ষ মুসলিম নেতা স্যার সলিম উল্লাহ বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ ও বরিশালের অগ্নিপুরুষ মহাত্মা অশ্বিনী কুমারের স্নেহ মমতা, সাহচর্য ও আশীর্বাদ লাভ করেই সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যান বঙ্গ শার্দুল ফজলুল হক।

১৯১৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলের ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্রের শূণ্য পদে

সদস্য নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন হিন্দু। কারণ খাজনা পরিশোধকারীরাই ভোটার। অন্য দিকে বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। ফলে কোন মুসলমান নেতাই এ নির্বাচনে যেতে সাহস পেল না। কিন্তু স্যার সলিম উল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে দুঃসাহসী ফজলুল হক নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার প্রতিদ্বন্দ্বি রায় বাহাদুর কুমার মহেন্দ্র মিত্রকে পরাজিত করে রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সে সময় হতেই তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলার মানুষের কাছে কত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন তা আজকের দিনে ধারণা করা যায় না। বঙ্গীয় আইন সভায় প্রবেশ করে প্রথম অধিবেশনেই ফজলুল হক যে, সারগর্ভ ওজস্বিনী বক্তৃতা দান করেন তা আইন সভায় এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলো। বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল সভাপতির আসন হতে উঠে এসে হক সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করেন। ১৯১৩ সালে নবাব সলিম উল্লাহ যখন বঙ্গীয় মুসলীম লীগের যুগ্ম সম্পাদক এ বৎসরই মিঃ জিন্নাহ্‌র সঙ্গে আলাপ করে মিঃ জিন্নাহর লীগে যোগদানের ব্যবস্থা করেন।

১৯১৪ সালে নবাব সলিম উল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর মুসলিম বাংলার নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ে দেশ দরদী ফজলুল হকের উপর। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরো ভাগে কখনও হয়েছেন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস নেতা কখনও মুসলিম উভয়ের নেতা। খেলাফত আন্দোলনের নেতা, মুসলমানদের দাবীর জন্য হয়েছেন সর্বভারতের শীর্ষ স্থানীয় লীগ নেতা আবার সর্বহারা কৃষক-প্রজার মুক্তি সংগ্রামের নেতা। তাছাড়া মজলুম, শ্রমিক, নিপীড়িতদের নেতাও তাকে হতে হয়েছে সময় ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে। এসব আন্দোলন করতে গিয়ে তাকে ১৯১২ সাল থেকে মুসলিম লীগে, ১৯১৪ সাল থেকে কংগ্রেসে, ১৯১৫ সাল থেকে প্রজা আন্দোলনে, ১৯১৯ সনে খেলাফত আন্দোলনে, জীবন সায়াহ্নে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে পাকিস্তানে বিরোধী দলীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে জাতির সেবায় নিজেকে আত্ম নিয়োগ করে গেছেন।

ফজলুল হক রাজনীতিতে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, জমিদারী জুলুম বন্ধ করতে হলে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করে বাংলা তথা ভারতের কোটি কোটি সর্বহারা কৃষকের মুক্তির বিধান না করলে জনগণের কাছে স্বাধীনতার কোন অর্থই হবে না। তাই তিনি প্রজা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় পূর্ব বঙ্গের স্নায়ু কেন্দ্র ঢাকায় যারা আন্দোলনের মহামস্থন করেছিলেন তারা হচ্ছেন আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, নইমুদ্দিন আহম্মেদ,

রেজায় করিম উকিল, আব্দল হাকিম বিক্রমপুরী, সুন্দর আলী গান্ধী, আব্দুল সামাদ মোক্তার, তফাজ্জল হোসেন, মাহবুব আলী খাঁন মজলিস ও মির্জা আব্দুল কাদের সর্দার। প্রজা আন্দোলনকে সুসংহত করার জন্য ১৯২৪ সালে ঢাকায় যে ঐতিহাসিক মহাসম্মেলন হয়, তাতেই নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয়। এই সম্মেলনে হক সাহেবের জ্বালাময়ী অভিভাষণ ছিলো আগ্নেয়গিরির অনল প্রবাহের মত। কৃষক প্রজার মন থেকে ভয় ভীতি সন্ত্রাস দূরীভূত হয়ে এনে দিল নবপ্রেরণা-নবউম্মাদনা। এই মহা সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে যার বিশেষ অবদান রয়েছে তিনি হলেন মির্জা আব্দুল কাদের সর্দার।

জনাব ফজলুল হক একজন ধর্মভীরু ও আশেকানে রাসুল ছিলেন। ১৯১৭ সালে জনৈক পাদ্রী কর্তৃক এপিফেনি পত্রিকায় রসুলে করিমের চরিত্রে কলঙ্কলেপন করে ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকর লেখা প্রকাশ করায় সারা ভারতে মুসলমানদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হলে মুসলিম নেতৃবর্গ ও ওলেমাবৃন্দ কলকাতায় এক সম্মেলন আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে সারা ভারত থেকে বিক্ষুব্ধ মুসলিম জনতার ঢল কলকাতায় নেমে আসলে, বাংলার লাট উক্ত সম্মেলন বন্ধের ফরমান জারী করেন। ফলে বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের ভেতরে জ্বলে ওঠে জেহাদী মনোভাব। হাজার হাজার জনতা বজ্রনিনাদী তকবীর ও প্রতিবাদ ধ্বনি দিতে দিতে শোভা যাত্রা করে জাকারিয়া ষ্ট্রীটে সমবেত হয়। লাট ভবনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে। অন্য দিকে লাট লর্ড কারমাইকেল অবস্থা বেগতিক দেখে ফজলুল হককে পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠালেন। হক সাহেব লুঙ্গি পাঞ্জাবী রুমিটুপি ও চটি জুতা পরে উপস্থিত হলেন লাট ভবনে।

লাটের ফরমান ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল পুলিশের ব্যুহ ভেদ করে জাকারিয়া ষ্ট্রীটে মিলিটারী বেষ্টন ভেঙ্গে লাট ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে গোড়া সৈন্যগণ গুলি চালালে শত শত লোক আহত হয়, রক্তে রঞ্জিত হয় কলকাতার রাজপথ। মুসলমানগণ জেহাদী জোসে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলে গোড়া সৈন্যগণ মেশিনগান ও ছোট কামান বসিয়ে তাদের ছত্র ভঙ্গ করতে উদ্যত হয়। লাট ভবনে এখবর পৌছিলে দুঃসাহসী ফজলুল হক দৌড়ে এসে হাজির হলেন কামানের সামনে। তার বিশাল বক্ষ সটান করে বজ্র নির্ঘোষে চিৎকার করে বললেন, "আমার বক্ষ ভেদ না করে একটি মুসলমানের গ[illegible]ও গুলি লাগাতে দেব না। তোমরা আমার বুকে গুলি কর।" এ ঘোষণায় তাদের সুবুদ্ধির উদয় হলো, লাট সাহেব ফরমান জারী করে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণসহ এপিফেনির সকল কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়, সেই

সঙ্গে এক ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনগামী জাহাজে পাদ্রী সাহেবকে বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। লক্ষাধিক লোকের জেহাদে যা সম্ভব হচ্ছিলো না তা নর শার্দুল ফজলুল হকের কয়েক মিনিটের নাটকীয় ভূমিকায় সম্ভব হলো।

এ ঘটনার কয়েক বছর পর তথা ১৯২২-৩০ পর্যন্ত সারা ভারতে সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গায় মুসলিম সমাজ জানমাল তথা সর্ব দিক দিয়ে ক্ষতি হয়ে এক করুণ অবস্থায় পতিত হয়েছিলো। এমতাবস্থার পর ১৯৩৭ সালে লখনৌর লীগ সম্মেলনে মুসলমানদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, তাদের রক্তে হোলিখেলা সম্পর্কে ভারতের কংগ্রেস সরকারকে ধমকিয়ে ফজলুল হক উর্দুতে যে অনলবর্ষী, মর্মস্পর্শী ও বীরত্বব্যঞ্জক বক্তৃতা দান করেন তা শুনে লখনৌর মুসলিম জনগণ জনাব ফজলুল হককে শেরে বাঙ্গলা খেতাব দান করেন। আমাদের দেশের মানুষের একটি অভ্যাস যে, বিদেশ থেকে সম্মানের রাজ মুকুট বা জয়মালা আহরণ না করলে দেশ কখনও প্রতিভার স্বীকৃতি দেয় না। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ফজলুল হকের "শেরে বাঙ্গলা" খেতাব এর জলন্ত প্রমাণ। আজ সকল বাঙ্গালী বা বাংলাদেশীরাই তাকে শেরে বাংলা বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু এ খেতাব ভারতের লখনৌর অধিবাসীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে দিয়েছিলো। এই খেতাবের পুনঃ অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিলো ১৯৪০ সালে। তখন অন্যতম লীগ নেতা স্যার সেকান্দার হায়াত খাঁন ছিলেন পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী, সে সময় শিখ সম্প্রদায় লাহোরের বর্তমান শহীদ গঞ্জের মসজিদ তাদের গুরুদ্বার বলে দাবী করে, বাবরী মসজিদের মত। হাই কোর্ট এবং প্রিভি কাউন্সিলও শিখদের পক্ষে রায়দান করেন। ফলে মন্ত্রী মহোদয়গণ মসজিদের দখল শিখদের হাতে ছেড়ে দেবার সব রকম ব্যবস্থা করলেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে লাহোরের মুসলমানরা হাজারে হাজারে জমায়েত হয়ে মসজিদ ঘিরে রাখলো। আল্লামা মাসরেকীর নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রদেশ হতে বেলচাধারী খাকসার দল এসেও সমবেত হয়ে শক্তিশালী ব্যূহ রচনা করলো। ফলে বহু মুসলমান গ্রেফতার হলো। পরবর্তীতে সৈন্যদের গুলিতে ২/৩ শত খাকসারসহ বহু ব্যক্তি নিহত হলো। শহীদের রক্তে মসজিদ এলাকা রঞ্জিত হলো। তখন হতেই এ মসজিদের নাম হয় শহীদগঞ্জ মসজিদ। এই লোম হর্ষক ও হৃদয় বিদারক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিলো ১৯৪০ সালে লাহোরের ঐতিহাসিক লীগ সম্মেলনের মাত্র ৩/৪ দিন পূর্বে যাতে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো। লাহোরের বাতাস এতই উত্তপ্ত ছিলো যে সৈন্য মোতায়েনসহ কারফিউ বলবৎ ছিলো।

এহেন অবস্থায় বাংলা থেকে ফজলুল হক লাহোর ষ্টেশনে পৌঁছলে খাকসারগণ

ফজলুল হক ফিরে যাও ধ্বনি দিতে থাকে। সুচতুর হক সাহেব লাহোরের তখনকার পরিবেশ পরিস্থিতির জন্য তৈরী হয়েই গিয়েছিলেন। তিনি পকেট থেকে কয়েকটি মনিঅর্ডার রশিদ বের করে তাদের প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি পূর্ব হতেই খাকসারদের তহবিলে চাঁদা দিয়ে আসছেন। এবং মুখে বল্লেন আমি তোমাদের মতই একজন খাকসার। তাই এই সংকট মুহূর্তে তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা করার জন্য এসেছি। অনেক বছর পূর্ব থেকেই সর্বভারতীয় নেতারূপে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ১৯৩৭ সালে লখনৌতে শেরে বাঙ্গলা উপাধি পেয়ে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের প্রদেশগুলোতে হক সাহেব খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। এবার যখন তিনি নিজেকে খাকসার ও তাদের সহায়তার জন্যই এসেছেন তখন সমেবেত ও উত্তেজিত খাকসারগণ তাঁকে শেরে বাঙ্গাল জয় ধ্বনি দিতে দিতে তার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌছিয়ে ছিলেন।

১৯৪০ সালে ২১শে মার্চ ভারতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। গোলাগুলি, হত্যা-জখম এর জন্য লাহোর নগরীতে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি বিদ্যমান। মহাআতঙ্কের মধ্যে মুসলিম লীগ সম্মেলন বসেছে। হক সাহেব শাহী মসজিদ থেকে মাগরিবের নামাজ পড়ে ঐতিহাসিক সম্মেলনের দিকে এগিয়ে চললেন, জনতা শেরে বাঙ্গলা জিন্দাবাদ ধ্বনিতে উল্লসিত হয়ে নিয়ে গেলেন প্যাণ্ডেলের দিকে। এইটুকু পথ যেতে তার আধঘণ্টা সময় লেগে গেলো। এ সময় মিঃ জিন্নাহ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। জনতার শেরে বাঙ্গলা জয় ধ্বনিতে মিঃ জিন্নাহকেও কিছুক্ষণ বক্তৃতা থামাতে হয়েছিলো। ঐ দিনের সম্মেলন শেষ হলে ২৩শে মার্চ আবার লীগের ঐতিহ্যাসিক সম্মেলন শুরু হলো। সে দিনও পরিবেশ অশান্ত, আবহাওয়া বিক্ষুদ্ধ। শহীদগঞ্জ মসজিদের লোম হর্ষক হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি তখনও লাহোর বাসীর নিকট তাজা। শোকাগ্নিবিদগ্ধ জনতার সামনে কে পেশ করবে-লাহোর প্রস্তাব। যদিও সারা ভারতের কয়েক শত নেতা উপস্থিত। কিন্তু জনতার দৃষ্টি ফজলুল হকের দিকে নিবদ্ধ। অবশেষে পরিস্থিতি অবলোকন করে ইসলামের প্রবীনতম দুঃসাহসী মোজাহেদ জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হকের উপর পড়লো পাকিস্তান প্রস্তাব পেশের দায়িত্ব। তিনি সেই সম্মেলনে প্রথমে ইংরেজীতে পরে উর্দুতে চৌধুরী রহমত আলীর পরিকল্পনা ও আল্লামা ইকবালের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে তা বাস্তবায়িত করার রায় জনতার কাছ হতে নিয়ে প্রস্তাবটি নিয়মতান্ত্রিক মতে সম্মেলনে পেশ করলে লখনৌর চৌধুরী খালেকুজ্জামান সে প্রস্তাব সমর্থন করেন। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হর্ষধ্বনি এবং শেরে বাংলা জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সম্মেলন স্থল মুখরিত করে এ, কে, ফজলুল হকের

লখনৌর প্রদত্ত শেরে বাংলা খেতাবকে জীবনের তরে বহাল করে দিলেন-লাহোরবাসী ও সারা ভারতের নেতৃবর্গ। পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে ফজলুল হকের দান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

পরবর্তীতে যখন শেরে বাংলা ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বড় লাট সমর পরিষদে তাকে সদস্য করলে লীগ প্রধান মিঃ জিন্নাহর সঙ্গে মত বিরোধ হয়। এ মত বিরোধ নিরসনে কেউই এগিয়ে আসলো না, ভুল বুঝাবুঝির দরুন ফজলুল হককে লীগ থেকে বিদায় নিতে হয়। এক শ্রেণীর নেতারা ফজলুল হকের বিরুদ্ধে সব সময়ই হিংসা, শঠতা, ষড়যন্ত্র করেই আসছেন, লীগ থেকে বেরিয়ে তার প্রজাদলের মাধ্যমে তিনি অনায়াসে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসছেন। এমনি ভাবে তিনি বেকায়দায় পরে একবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন যা, বাংলার ইতিহাসে শ্যামা-হক মন্ত্রী সভা বলে পরিচিত। তখন সরকারী চাকুরীতে মুসলমান ও তফসিলি হিন্দুদের কোন স্থানই ছিল না। সরকারী চাকুরী ছিলো বর্ণ হিন্দুদের একচেটিয়া। বিদেশী কোম্পানীগুলোতেও মুসলমানদের অবস্থা তেমনি ছিলো। হক মন্ত্রী সভার আমলেই রংপুরের পরিষদ সদস্য মিয়া আঃ হাফিজের প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য চাকুরীর ৫০% ভাগ সংরক্ষণের আইন পাশ হয়। তারই আমলে জমিদারী উচ্ছেদের জন্য ক্লাউড কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের সুপারিশই হয় বাংলাসহ সারা ভারতের জমিদারী উৎখাতের পটভূমি। এক কথায় ফজলুল হকই গরীব মুসলমান কৃষক ও তফছিলি হিন্দুদের ঋণ মুক্তি, দায়মুক্তি এবং জমি মুক্তির আইনের হোতা।

বহু জানমালের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হলো, সৃষ্টি হলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের। দেশ ভাগের পর বাংলার সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রী সভার অবসান হলো। পূর্ব পাকিস্তানে স্যার নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রী সভা গঠন করতেও হক সাহেবের সহায়তা ছিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শেরে বাংলা ঢাকা এসে ওকালতি শুরু করেন। নাজিম সরকার তাঁকে এডভোকেট জেনারেল পদ দান করে দুশ্চিন্তা মুক্ত হলেন। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার এই সরকারের সৌজন্যে ঢাকায় কোন বাড়ী না পেয়ে প্রিয় ভক্ত কাদের সর্দারের বাসায় স্থান নিলেন। হক সাহেবের প্রতি কাদের সর্দারের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা চির স্মরণীয় বটে। আজও হক সাহেবের ব্যবহৃত অনেক তৈজসপত্র আলাদাভাবে রাখা আছে সর্দার সাহেবের বাড়ীতে যা এখনও হক সাহেবের বলে আখ্যায়িত হয়। পরবর্তীতে কে, এম, দাস লেনে নিজ বাড়ীতে চলে যান।

বৃদ্ধ বয়সে বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে লীগ সরকারের পতন কল্পে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন ও পূর্ব পাকিস্তানে একচেটিয়া জয় লাভ তারই মত রাজনীতিকের জন্য সহজ হয়েছিলো। সর্বভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রেও যে তার প্রবল প্রভাব ছিলো তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তিনি ১৯১৮ সালে প্রজাআন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা, মুসলিমলীগের সভাপতি, আবার সে বছরই অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী। বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে ফজলুল হক ব্যতীত অন্য কেহ অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব করার সৌভাগ্য পায়নি।

অভিনেতার অভাবহেতু রঙ্গমঞ্চে যেমন একই অভিনেতাকে বিবিধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় সেই দিনে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সু-অভিনেতা ফজলুল হককেও করতে হয়েছে তেমনি। তিনি ছিলেন অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী ও উপস্থিত বুদ্ধির রাজা। তাছাড়া বক্তৃতায় ছিলেন তিন গুণের অধিকারী যা সাধারণত অন্যরা একসঙ্গে প্রকাশ করতে পারে না, তা হলো হাস্যরস, বীর রস ও করুণ রস। কখনও তার বজ্রহুঙ্কারে মেদিনী কেঁপেছে, কখনও হাস্যরসাত্মক বক্তব্যে মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। কখনও তাঁর যুক্তি জালের সম্মোহনী বাক্য সুধায় অশ্রু শিক্ত হয়েছে। তাঁর সৎসাহসের স্বাক্ষর আরও পাওয়া যায়, ঐতিহাসিক লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩০-৩২) নামাজের সময় হলে ইংলণ্ডেশ্বরের বাকিংহাম প্যালেসে আজান দিয়ে জামাতে নামাজ পড়ার মধ্যে। ১৯৩৫ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে মসজিদ, মন্দির, গীর্জায় সম্রাটের দীর্ঘায়ু কামনা প্রার্থনা প্রস্তাব গৃহীত হলে কলকাতায় বিরাট জন সভায় নির্ভিক চিত্তে ঘোষণা দিলেন মুসলমান তার মসজিদে কোন বিধর্মী নাসারার জন্য প্রার্থনা করতে পারে না। ১৯৩৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে শক্তিশালী হিন্দু সমর্থিত নেতা মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকারকে পরাজিত করে প্রথম মুসলিম মেয়র হন। কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিজ স্যাণ্ডারসন একদা ফজলুল হককে আট আনা উকিলের সঙ্গে তুলনা দিলে জবাবে হক সাহেব বলেছিলেন ভারতের মহা দূর্ভাগ্য যে, বিলাতের ডুমারটেম্পলের মত মক্কেল বিহীন ব্যারিস্টার এদেশে পাঠানো হয় হাইকোর্টে চীফ জাস্টিজ করে। কতখানি বুকের পাটা বড় থাকলে এমনিভাবে জবাব দেওয়া যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি বহু অমর কীর্তি রেখে গেছেন। শুধু বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, ভারতের মুসলিম জন শিক্ষার জন্যও প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ফাউণ্ডেশন মেম্বার অব দি ফাস্ট কোর্ট। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাকে উন্নত করার যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। পূর্বে মুসলিম ছাত্রদের সংস্কৃত পড়তে হতো।

শিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে তারই নির্দেশে মৌলভি রাখার ব্যবস্থা হয় হাই স্কুলে ও পরবর্তীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে, খেলাধূলায়ও তিনি পিছপা ছিলেন না। কলিকাতা মোহামেডান স্পোটিং ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এ দলকে তিনি দিয়েছেন অসীম উৎসাহ আর মুক্ত হস্তে দান। অপরকে সাহায্যের জন্য তিনি কাবুলিওয়ালাদের নিকট হতে ধারও নিয়েছেন। অনেক লোক তাকে আল্লাওয়ালা মনে করে তার কাছ হতে পানি পড়াও নিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ফিরিঙ্গি পোষাক পছন্দ করতেন না। সাধারণতঃ বাংলায় বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন।

মুসলমানরা লেখাপড়ায় অনগ্রসর ও সরকারী চাকুরীতে পিছিয়ে থাকায় সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েও আসামী হয়ে জেল হাজতে পচতেন। তাদের মুক্তির জন্য তিনি এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে ছুটে বেড়াতেন। এ ব্যাপারে ঢাকার আসামীদের হাইকোর্টে মামলা পরিচালনার প্রয়োজন হলে কাদের সর্দার সেগুলো কলকাতায় ফজলুল হক সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। এগুলোর সমাধা করে ফজলুল হক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসামী ও সাজাপ্রাপ্তদের মুক্ত করে এনেছেন। এটা তৎকালের মুসলমানদের জন্য ছিলো এক গুরুতর সমস্যা।

বহুগুণ ও প্রতিভার অধিকারী, জ্ঞানবীর, দানবীর, ধর্মবীর ও কর্মবীর, মুসলিম রেনেঁসার অগ্রসেনা শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক অনেক ঘাত প্রতিঘাত, দুঃখ কষ্ট পেরিয়ে ১৯৬২ সালের ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার বেলা ১১টার পূর্বে সুরা ফাতেহা পড়তে পড়তে ৮৯ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি .... রাজিউন)।

এই মহান ব্যক্তির নামানুসারে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আইউব নগর তথা পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানীকে শেরে বাংলা নগর করে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ তার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনই করেছেন। শেরে বাংলা নগর ব্যতীত ঢাকা নগরীতে আরো দু'এক জায়গায় তাঁর নাম অথবা পদবীনুসারে রাস্তার নামকরণ করে জনগণ যেমন রায়ের বাজারের নাম শেরে বাংলা রোড।

সংসদ ভবনের পূর্বদিকের সড়কটির নামকরণ হয়েছে সংসদ এভিনিউ। এ সংসদ ভবন নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খাঁন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেন। তখন হতে এ সংসদ ভবন বাংলাদেশ-এর জনগণের এক কথায় ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে আসছে আইনের

মাধ্যমে, আর এ আইনই এখানে রচিত হয়, সংশোধিত হয় ও সংযোজিত হয়। আবার বাতিলও করা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার পর সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সার্ক সম্মেলনকালে সংসদ ভবনের আরো উন্নয়ন সাধন ও আধুনিকীকরণ করেন। আজকাল প্রায়ই সংসদ ভবনের নর্থ প্লাজায় রাষ্ট্রীয় অতিথিবর্গের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। সংসদ জাতির জন্য একটি পবিত্র স্থান। এ ভবন থেকেই জাতির উদ্দেশ্যে সরকারী, সরকার বিরোধী ও নির্দলীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ জাতির পক্ষ হয়ে কথা বলে থাকেন।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের মোড় থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত রাস্তাটির পূর্বনাম ছিলো অরফ্যানেজ রোড। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ বছর পরই ১৯৫২ সালে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবী প্রবল হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে তৎকালীন ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সমাজ। পূর্ব বঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের শাসনামলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন চলাকালে মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে পুলিশের গুলি বর্ষণে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার শহীদ হন এবং বেশ কিছু আহত হন। সে সময় হতেই এ সড়ক-এর নাম শহীদ সড়ক রাখার দাবী উত্থাপিত হয়ে আসছিলো। কিন্তু কোন সরকারের আমলেই তা বাস্তবায়িত হয়নি। অবশেষে জনগণের দীর্ঘ দিনের দাবী পূরণের লক্ষ্যে জিয়া সরকারের আমলে ঢাকা পৌর করপোরেশনের প্রথম মেয়র ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাত ১৯৮১ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী সলিম উল্লাহ্ মুসলিম হলের তথা সাবেক পলাশী রেলক্রস হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত সড়ক পথটির নামকরণকরেন "শহীদ স্মরণী"।

এ সড়ক পথটির শহীদ স্মরণী নামকরণ করে শহীদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাই জ্ঞাপন করেছেন ঢাকা পৌর করপোরেশন-এর মেয়র ও কমিশনারবৃন্দ। এখানে উল্লেখ্য যে ভারত বিভক্তির পূর্বে বৃটিশ শাসনামলে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা নাজির আহম্মেদ জগন্নাথ হলের ছাত্রদের দ্বারা ছুরিকাঘাতে নিহত হলে শহীদ নাজির হিসেবে তাকে বহু বছর স্মরণ করা হয়। তাঁর স্মরণে তৎকালীন সময়ে চক বাজারের উত্তর পশ্চিম কোণে যে বিরাট পাবলিক লাইব্রেরী ছিলো তা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে শহীদ নাজির পাবলিক লাইব্রেরী নামকরণ করা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর চক বাজারে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে শহীদ নাজির পাবলিক লাইব্রেরীটির অবলুপ্তি ঘটে। তৎকালে ছাত্রদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন থাকলেও তা আর নেই। আজ উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীগণের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি গড়ে

উঠেছে। তার জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় জগন্নাথ হল ধ্বসে পড়ে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিলো তৎসময়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এখানে পূর্ব বঙ্গীয় আইন পরিষদ তথা পূর্ব পাকিস্তান এসেম্বেলী বেশ কয়েক বছর প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

আসেক লেন আসেক জমাদারের নামানুসারে হয়েছে। বৃটিশ যুগে এক সময় আসেক লেনকে হিন্দু সম্প্রদায় আশোক লেন নামে অভিহিত করতেন। এর প্রমান কলিকাতা থেকে বুদ্ধদেব বসুর প্রকাশিত "আমার যৌবন" পুস্তকে পাওয়া যায়। অপর সূত্রে কলকাতা থেকে প্রকাশিত জিন্দাবাহার পুস্তকের লেখক পরিতোষ সেন তার ভূমিকায় বলেছেন। ফারসী শব্দ ইস্‌ক থেকে আসেক। এই আসেক থেকেই আসেক লেন নামের উৎপত্তি। পরিতোষ সেন বাবুর জন্ম স্থান ঢাকার জিন্দাবাহার গলিতে। এখানে উল্লেখ থাকে তখন এলাকায় বার বণিতাদের আবাসস্থল ছিলো। এ কারণেই হয়ত পরিতোষ বাবু এ নামের অনুমান করেছেন। তবে মোঘল যুগে নবাব আমির উমরাহ ও বিত্তশালীদের বাড়ীতে জমাদার খেতাবধারী পদেও কর্মচারী থাকতেন তারা হয়তো মহল বা ভবনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। তবে উল্লেখিত আসেক জমাদার এ শ্রেণী ভূক্ত নয় বলে মনে করি। তিনি নবাব আমির উমরাহ্‌দের একজন পদস্থ আমলা অথবা জামিনদার ছিলেন। তার বাড়ী এখানেই ছিলো। এবং তার প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যই এই গলির নাম আসেক জমাদার লেন হয়েছে। আর এক তথ্যে দেখা যায় লেনটি ইতিপূর্বে আসেক জমিদার নামে ছিলো। আবার কেউ বলেন আসেক জামিনদার লেন ছিলো। জামিনদার থেকে পরবর্তীতে জমিদার নামের উৎপত্তি। ভূ-সম্পত্তি যার প্রচুর ছিলো তাকেই মোঘল আমলে জামিনদার বলা হতো। বৃটিশ যুগের ১৯৩৬-৩৭ সালে ঢাকা কলেক্টরের রেকর্ডে দেখা যায় রেজিষ্ট্রিকৃত জমিদার ছিলেন ৬৩ জন। তন্মধ্যে ৪০ জন হিন্দু, ২০ জন মুসলমান, ৩ জন খৃষ্টান। তবে এরা সরকারকে ১৮০০ টাকার উর্দ্ধে রাজস্ব দিতেন। ১৮০০ টাকার নীচে রাজস্ব প্রদানকারী আরো বেশ কিছু জমিদার ছিলেন। তাদের সঠিক সংখ্যা রেকর্ডে লিপিবদ্ধ নেই।

পানি টোলার সঠিক নাম পান্নিটোলা। পান্নিওয়ালা তথা যারা টিনের পাতলা পাত তৈয়ারি করতো তাদেরই বাসস্থান ছিলো এ এলাকায়। সেজন্যে ঐ নামের উৎপত্তি।

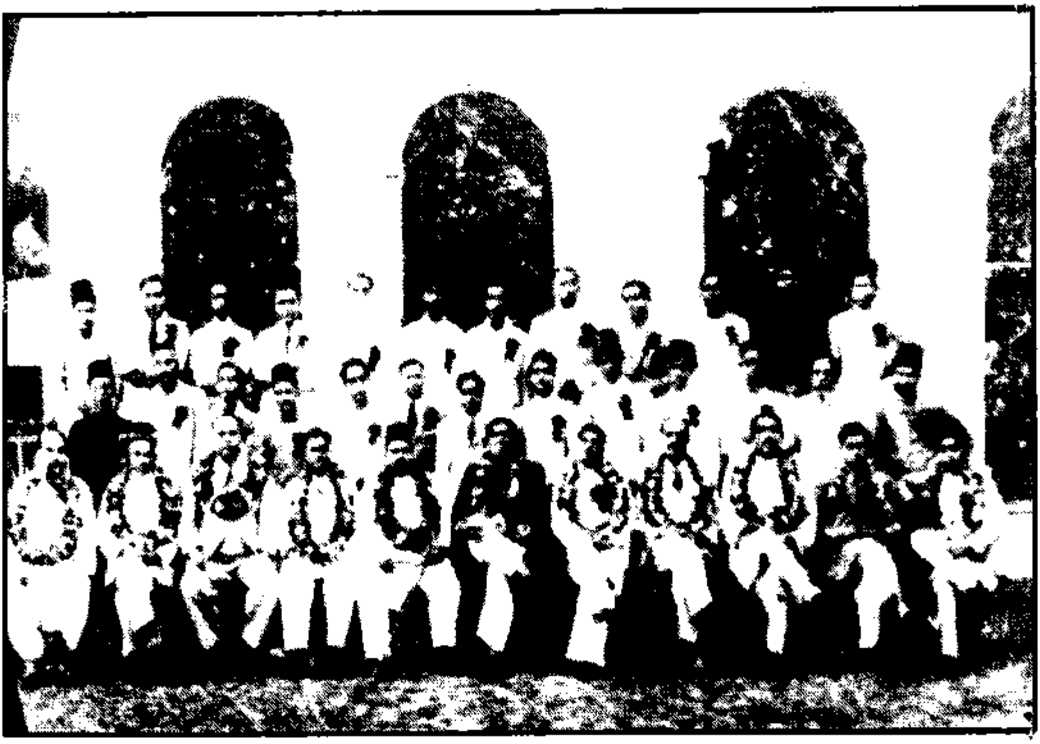
পত্রাদির মাধ্যমে জানা যায়, ১৭৬৫ সালের বহু পূর্বে দেওয়ান মানিক চাঁন্দ এর পুত্র দিয়া চাঁন্দ ওরফে দয়া চাঁন্দ নারিন্দা এলাকার পূর্ব দিকে একটি বাজার স্থাপন করেন। তখন হতে ঐ এলাকাটি দয়াগঞ্জ নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে দয়া চাঁন্দ বাজারটি বিখান ঠাকুরের নিকট বিক্রি করে দেন। তারপর বেশ কিছুদিন যাবত

বাজারটি বিখান বাজার নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এ নাম তেমন জনপ্রিয় না হওয়ায় এটা দয়াগঞ্জ নামেই আখ্যায়িত হয়ে আসছে।

বাবু বাজার এলাকার পশ্চিমে একটি গলিপথের নাম, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার জমিদার দিগবাবুর নামানুসারে দিগবাবু লেন নামকরণ হয়। এখানে জমিদারের একটি সুরম্য বাসভবন ছিলো। আজো গলি পথটি দিগবাবু লেন নামেই পরিচিত।

কতিপয় উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবীর প্রচেষ্টায় উত্তর শাহজাহানপুরে ১৯৫৮ সালে ওয়ার্ক ক্যাম্প এসোসিয়েশন নামে একটি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এর পুরোধা ছিলেন লেফটেন্যান্ট (অবঃ) আঃ গফুর। তারই প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্র এবং বিভিন্ন এলাকার স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে মাঠ, রাস্তা, সামাজিক ভবন ইত্যাদি নির্মাণ ও মেরামত কাজে নিয়োজিত হতেন। ফলে প্রতিষ্ঠানটি পাক আমলে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। আমাদের আজাদ মুসলিম ক্লাবের মহিলা শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ১৯৬০ সালে নির্মাণের সময়ও এ প্রতিষ্ঠানটি স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে সাহায্য করেছিলো। এ প্রতিষ্ঠানটির নামানুসারে উত্তর শাহজাহানপুরের একটি অংশের নাম ওয়ার্ক ক্যাম্প রোড নামে এলাকাবাসীর নিকট পরিচিত।

মোঘলবাগ-এ-পাদশাহী থেকেই শাহবাগের নামকরণ হয়েছে। শাহবাগ এলাকাটি মোঘলবাগের একটা অংশ ছিলো। বাগ-এ পাদশাহী মোঘল আমলের মহল্লা চিশতিয়ানের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। রমনা রেসকোর্স, রমনা গ্রীন, হাইকোর্ট কম্পাউণ্ড এবং দক্ষিণ দিকের নিমতলী এলাকা সমেত এই গোটা অঞ্চলটি ছিলো মহল্লা চিশতিয়ানের অন্তর্গত। ১৬০৮ থেকে ১৬১৪ সালের মধ্যে মহল্লা চিশতিয়ানের পত্তন করেছিলেন বাংলার প্রথম মোঘল সুবেদার নবাব ইসলাম খাঁ চিশতি। চলতি শতাব্দীর শুরুতে শাহবাগ ছিলো আমোদ-স্ফুর্তির কেন্দ্রস্থল। বৃটিশ প্রদত্ত উপাধিতে ভূষিত ঢাকার নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে প্রখ্যাত সুরশিল্পী ও নর্তকীদের মহফিল বসতো। সে-সময় শাহবাগের নিশাত মঞ্জিল, সোনালী মাছভর্তি তরঙ্গায়িত নদী, গোল তালাব, লৌহ নির্মিত ঝুলন্ত পুল, বিচিত্র চিড়িয়াখানা, নাচ ঘর আর নয়নাভিরাম বাগবাগিচা খুবই চিত্তাকর্ষক ছিলো। অবশ্যি এখন এসবের আর কোন অস্তিত্বই নেই। সর্ব ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন এবং ভারত বিভাগ আন্দোলনে মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ-এর গোড়া পত্তনও হয়েছিলো এখান থেকেই।



শাহবাগে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা কনফারেন্সে
সর্ব ভারতীয় নেতৃবর্গ

শাহবাগের অভ্যন্তরে গোল তালাবের পূর্বদিকে শাহ নূরউদ্দীনের কবর রয়েছে। তিনি নবাব নূসরত জঙ্গ বাহাদুরের মজলিশে কিতাবখানি করতেন। তাঁর পৌত্র মুন্সী গোলাম মাওলা এখানে ভাটিয়ালী ও মুর্শিদী গানের প্রচলন করেন। এসব গান, নবাব নূসরত জঙ্গ সুদুর মুরশীদাবাদ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। ভাটিয়ালী ও মর্সিয়া গায়করা এখানে অবস্থিত শাহ ফেকুর কবরটিকে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। এই ভাটিয়ালী ও মর্সিয়া গায়কদের এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। ফেকু শাহ নূরউদ্দীন শাহের আত্মীয় ছিলেন।

এই শাহবাগের নামনুসারে বর্তমানে রমনার ঢাকা গেট থেকে টি, এস, সি, মোড় পর্যন্ত সড়কটি শাহবাগ এভিনিউ নামকরণ হয়েছে। দিলকুশা এলাকার মধ্য দিয়ে ৩০০ বছর পূর্বের প্রবাহিত একটি খাল বা ছোট নদীর যাহার নাম ছিলো সেরন তুয়া। পরবর্তীতে নাম হয় মতিঝিল। বর্তমানে উক্ত খাল ঝিল না থাকলেও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ মতিঝিল নামে পরিচিতি লাভ করেছে। হাকিম হাবীবুর রহমানের মতে সাবেক কোম্পানীবাগে অর্থাৎ বর্তমান জাতীয় শিশুপার্কে যে পুকুরটি আছে সেটিই আসল মতিঝিল। জাতীয় শিশুপার্কটি পাক আমলে আইয়ুব খান নির্মাণ করান বলে

ইতিপূর্বে এটিকে আইয়ুব শিশুপার্ক বলা হতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আইয়ুব শিশুপার্কের নাম পরিবর্তন করে জাতীয় শিশুপার্ক রাখা হয়েছে। এটি মকিম কাটরা নির্মাণকারী মির্জা মুকিমের অন্দর মহলের পুকুর ছিলো।

সেগুন বাগিচায় এক সময় প্রচুর সেগুন গাছ ছিলো। পরবর্তীকালে সেগুন বাগান সাফ করে স্থানটিকে আবাসিক এলাকায় পরিণত করা হয়েছে। সেগুন সাফ হলেও এলাকাটির নাম পরিবর্তন করা হয়নি। এখানে বসবাস করার জন্য বাড়ী নির্মাণ করে ছিলেন অধ্যাপক ডঃ এস, এন, রায়, ডঃ জে, কে, চৌধুরী, চারু বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৮৮৫ সালে একটি সরকারী নথির সূত্র থেকে জানা যায় ধোলাইখালের (পূর্বাঞ্চলে) পাড়ে পানি বিশুদ্ধকরণের জন্যে একটি সরকারী ভাটিখানা বা ডিষ্টিলারী ছিলো। এই বিশুদ্ধ পানি শহরে সরবরাহ করা হতো। পরবর্তীতে খালটির গভীরতা কমে যাওয়ায় ও পানি প্রবাহে তেমন স্বচ্ছলতা না থাকায় এই ডিষ্টিলারীটি বন্ধ হয়ে যায়। ঐ ডিষ্টিলারীটির নামানুসারে এলাকাটি ডিষ্টিলারী রোড নামে আজও পরিচিত। অত্র এলাকায় একটি অংশ ঢাকাবাসীর নিকট ভাটিখানা নামে পরিচিত ছিলো। কালের প্রবাহে সে নাম অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

ফকিরাপুলের নামের সঙ্গে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। বহুকাল পূর্বে ফকিরাপুলে চারজন ফকিরের কবর ছিলো। সেই কবরগুলোর উপর হঠাৎ এক রাতে একটা সাঁকো হয়ে যায়। সেই থেকে ঐ সাঁকোটি ফকিরের পুল বলে পরিচিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ফকিরের পুল নাম অপভ্রংশ হয়ে ফকিরাপুল নামে খ্যাত হয়। মাত্র দু'যুগ পূর্বেও অজ্ঞ লোকেরা ঐ কাঠের পুলের আশেপাশে চেরাগ বাতি দিতো। আজ আর সে পুল নেই। তবুও ঐ এলাকাটি ফকিরাপুল নামে পরিচিত।

ঢাকার কোন এক ব্যক্তি ফুলের নির্যাশ সংগ্রহ করে এক বিশেষ শোধনপদ্ধতির মাধ্যমে চম্পা, বেলী, জুঁই ইত্যাদি নাম দিয়ে সুগন্ধি তৈরি করতেন। সে সময়ে এই সুগন্ধি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বাজারে সমাদর হয়। তাছাড়া তিনি গোলাপী আতর, গোলাপ পানি ইত্যাদিও তৈরি করতেন। তবে তাঁর তৈরি আতর বা গোলাপ পানি গাজীপুরে প্রস্তুত আতর, বা গোলাপ পানির সমকক্ষ ছিলো না। যিনি এসব সুগন্ধি তৈরি করতেন তিনি সবার কাছে গান্ধী নামেই পরিচিত ছিলেন। আর এই গান্ধী সাহেব যে গলিতে বাস করতেন সে গলিই গান্ধী গলি নামে পরিচিত হয়।

নাসাওয়ালা গলির সঠিক নাম নাসারা গলি। মোঘল যুগের পূর্বেকার (১৪৪২-৫৯) বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর মাহমুদ শাহ্ ওরফে

নাসির সাহেবের নামানুসারেই এই নামকরণ। গৌড় ছিলো সুলতান নাসির সাহেবের রাজধানী। ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এখানে একটি মসজিদ স্থাপন করেন। আগে এই মসজিদের পূর্বদিকে ছিলো একটি পাগলাগারদ।

কেরানীগঞ্জ থানার মিছরিখোলার শাহ্ সাহেবের নামানুসারে শাহ্ সাহেব লেন নামকরণ করা হয়েছে। শাহ্ সাহেবের আসল নাম ছিলো আহসান উল্লাহ। তিনি ঢাকার নারায়ণদি অর্থাৎ বর্তমান নারিন্দায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি যে এলাকায় স্থায়ীভাবে বসতি করেন সেই এলাকার একটি রাস্তা শাহ্ সাহেব লেন নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। ১৬০০ সাল থেকে ১৬০৮ সাল পর্যন্ত বাংলার বারো ভূঁইয়াদের দমনের জন্যে মোঘলরা এক অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানে মোঘল সৈন্যবাহিনীকে যিনি পরিচালিত করেন তাঁর নাম সুজাত খান রুস্তমে জামান। তিনি নবাব ইসলাম খাঁর একজন সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। তাঁর নামও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তাঁরই স্মৃতি বিজড়িত স্থানটি সুজাতপুর বলে পরিচিত ছিলো। এখানেই তাঁর বাসভবন ছিলো। সুজাত খান স্বল্প কিছুকাল বাংলার সুবেদারও ছিলেন।

১৮৫৯ সালে ঢাকার যে ম্যাপ তৈরি হয় এবং পরবর্তীকালে ১৯০৬ সালে ঢাকা শহরের পুনঃ যে ম্যাপ তৈরি হয়, সে দুটো ম্যাপে লাল চাঁদ মোকিম কুচাং এর উল্লেখ আছে। মোকিম মোঘল প্রশাসনের একজন সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। সম্ভবত তিনি এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এজন্যেই এলাকাটি লাল চাঁদ মোকিম লেন বলে পরিচিতি লাভ করে।

মোঘল আমলের পূর্ব থেকেই একটি এলাকা জালুয়ানগর নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এখানে মৎস্যজীবীদের বাস ছিলো বলেই এলাকাটি জালুয়ানগর নামে পরিচিত হয়ে গেছে। মৎস্যজীবীদের জেলে বা জালুয়া বলা হয়। আর জেলে অধ্যুষিত এল্যাকাকে জেলে পাড়া বা জালুয়ানগর বলা হবে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।

এমনিভাবে আর একটা এলাকার নাম হয়েছে বানিয়ানগর। হিন্দু ব্যবসায়ীদের সাধারণত বণিক বা বাণিয়া বলা হয়ে থাকে। আর হিন্দু বণিকরা যে এলাকায় বসবাস করতো সেটা মোঘল আমলের পূর্ব থেকেই বানিয়ানগর নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

ঢাকার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে গোয়ালদের বাস ছিলো। এই অঞ্চলগুলো গোয়ালপাড়া গোয়ালনগর বা গোয়ালটুলি নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। আজও ঐসব অঞ্চলকে ঐ নামেই ডাকা হয় যদিও গোয়ালাদের বাস কমে আসছে। ১৯২৮ সালে

গোয়ালপাড়া অঞ্চলটি নরেন্দ্র নাথ বসাক রোড নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। তিনি ১৯১২ সালে ঢাকা পৌর সভার কমিশনার ছিলেন। পৌরসভার কমিশনার গোপী মোহন বসাকের নামানুসারে গোপী মোহন বসাক লেন নাম হয়েছে। তিনি ১৮৮৪ সালে ঢাকা পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। কথিত আছে এই অঞ্চলটি বহু পূর্বে মির্জা-বাগ নামে পরিচিত ছিলো।

এমনিভাবে চামারটুলির নামকরণ হয়েছে। চামারটুলি অঞ্চলে সাধারণত চর্মকার বা চামারেরা বাস করতো। চামারদের কাজ ছিলো জুতা মেরামত বা জুতা সেলাই আর জুতা তৈরি করা। সূত্রাপুর এলাকাতে সূত্রধরদের বাস ছিলো। তারা কাঠের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সূত্রধর অধ্যুষিত অঞ্চলটি সূত্রাপুর নামে পরিচিত। কিন্তু দেশ বিভাগের পূর্বেই এ অঞ্চলটির নাম রূপলাল দাস লেন করা হয়েছে। তবুও অঞ্চলটি সূত্রাপুর নামেই সমধিক পরিচিত। হরি সাধু ওরফে সাধু-বাবা সূত্রাপুর বাজারের লাগ মন্দিরে থাকতেন। তাঁর অসাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিলো। তিনি ছিলেন মহুয়া রাজবংশের লোক। তিনি কলেরা ও বসন্ত রোগ নিরাময়ের কবজ দিতেন। এ কারণে তাঁর ভক্ত-সংখ্যা ছিলো অনেক বেশি।

"বিবিকা রওজা" নামক একটি স্মৃতি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে বিবিকা রওজা মহল্লার নামকরণ হয়। ফরাশগঞ্জে এই স্তম্ভের ভগ্নবিশেষ এখনও বিদ্যমান। এটিই ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন ইমাম বাড়া। জনৈক আমীর খাঁন ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এটি স্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে ১৮৬১ সালে আর, এম দোসানজী নামের জনৈক পার্শীক এটির সংস্কার সাধন করেন। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এ রওজার বেশ কিছু অংশের ধ্বংশ সাধিত হয়। শুধু নহবত খানাটি ভাঙ্গে নাই কারণ তাতে ভারতীয় পতাকা উড্ডীন থাকতো বলে। দাঙ্গা প্রসমিত হওয়ার পর রওজার তৎকালীন খাদেম পরিবার এসে দেখতে পান ৭টি মনুষ্য কঙ্কাল পড়ে আছে। প্রকৃত রওজার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ রওজার কিছু অংশ আমীর খাঁর ৭ম পুরুষ মুহম্মদ ওসমানগনী ওরফে নান্না মিয়া পুনঃ নির্মাণ করেন।

মতান্তরে রওজার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বর্তমান খাদেম আমীর খাঁর ৮ম পুরুষ মঃ ইয়াসিন-এর মতে বিবিকা রওজা হজরত ফাতেমা জান্নাতের (রাঃ) নামানুসারে সুন্নিজামাত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। একদিন আমীর খাঁর মাতা মনি বিবি স্বপ্ন আদেশ পান-যেন ঐ স্থানটি পরিস্কার করে রাখা হয়। তারপর দেখা যায় একটা ছোট্ট রওজা মাটি গর্ভ থেকে ওঠে, এটি নাকি স্বর্ণের ছিলো। তাই ডাচ ও পুর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে স্বর্ণের রওজাটিকে মাটি দ্বারা লেপে রাখা হতো। পারসিক আর, এম দোসানজি

মনি বিবির সঙ্গে আলাপ করে একটি মানত করেন। মানত পূর্ণ হওয়ায় সে রওজাটিকে পাকা করে দেন। পরে মনি বিবির ছেলে বিত্তশালী জমিদার আমীর খাঁ নহবত খানাসহ সকল ভবন নির্মাণ করেন। এ কাহিনীটি কিংবদন্তি হতে পারে। ইতিহাসের কষ্টি পাথরে টেকেনা, কারণ দোসানজি প্রায় আড়াই শত বছরের উর্দ্ধকাল পরে সেটির সংস্কার সাধন করেছিলেন।

এই রওজায় এখনও দশ দিনব্যাপী মহরম পর্ব সমাধা হয়। মহরমের নয় তারিখের সন্ধ্যায় মিছিল বের হয় এবং ভোর রাত্রে হায়দারী গাস্ত হয়। দশ তারিখ আশুরার দিবস বিকেলে বোলতা গাওরা বের হয় এই গাওরা বের হওয়ার মূলেও একটি কাহিনী প্রচলিত ছিলো। যে, দুপুর গড়াতেই রওজার খাদেম সেজদায় চলে যেতেন এবং যখন গওরা উঠানোর জন্যে গায়বি আদেশ পেতেন তখন তিনি সেজদায় থেকেই উঠাও বলে আওয়াজ দেন। সমবেত ভক্তরা তখন পাগলের হালতে গওরা নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ফরাশগঞ্জ হতে চকবাজার-আজিমপুর হয়ে ধানমণ্ডিস্থ ঈদগাহ পুকুরে নিয়ে আসে এবং বিসর্জন করে। তজন্যই এ গাওরা তথা তাজিয়া পাগলা গওরা বলে ঢাকাবাসীর নিকট আজও পরিচিত। এতে ভক্তরা সেহরা, কবুতর, মুরগী, টাকা-পয়সা, এমনকি সোনা চাঁদির দ্রব্যাদিও ফেলে মানত পূর্ণ করতো। এ ব্যাপারটি বর্তমান খাদেমকে প্রশ্ন করলে তিনি পূর্বে হতো বলে পূর্ব পুরুষদের মুখে শুনেছেন। বর্তমানে সময় ধরেই তাজিয়াটি উঠানো হয়। বিবিকা রওজাকে আজও হিন্দু মুসলমান সকল ধর্মের ভক্তরা শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে। প্রকৃত পক্ষে এটি আমীর খাঁ নির্মিত একটি প্রাচীন ইমাম বাড়া। হোসেনী দালানের ৪২ বছর পূর্বের নির্মিত।

এ ধরনের প্রাচীন ইমাম বাড়া ঢাকায় আরো ছিলো যেমন ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নিকট ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে সংলগ্ন, চাম্পাতলি মহল্লায়, চৌধুরী বাজার মহল্লায়, সেগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোর নামধাম সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে হোসেনী দালানের নিকট মীর ইয়াকুবের ইমাম বাড়া ও মুকিম কাটরার মীর্জা মুকিমের ইমাম বাড়া দুটির নিদর্শন আজিও রয়েছে। এমনকি মীর ইয়াকুবের ইমাম বাড়া হতে এখনও তাজিয়া যথানিয়মে বের হয়।

নাল শব্দ থেকেই নলগোলার নামের উৎপত্তি। এ শব্দটি স্থানীয় ও আঞ্চলিক শব্দ। নাল এক ধরনের ঘাস জাতীয় আগাছা, এগুলো জলাভূমি ও চরাঞ্চলে জন্মে থাকে। উচ্চতায় এগুলো প্রায় আট দশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এগুলো কেটে ঘরের মাচা কিংবা ছাউনীর নীচে ব্যবহৃত হতো। নলগোলায় নাল ঘাসের

বাজার বসতো। এই বাজারে নাল ও নাল থেকে তৈরি নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রি হতো। তখন থেকেই এ অঞ্চলটি নলগোলা নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

নলগোলায় ভাওয়াল রাজ পরিবারের বেশ কয়েকটি দর দালান ও একটি রাজ বাড়ী বলে কথিত বিরাট জায়গা জুড়ে টালীর বাড়ী ছিলো। এটিকে কাচারী ঘরও বলা চলে। রাজা ঢাকায় আসলে এখানে অবস্থান করে তার জমিদারীর সকল কাজ সমাধা করতেন। পরবর্তীতে ভাওয়াল রাজার মৃত্যু নিয়ে যে মামলা হয় তা এ রাজ বাড়ীতেই বেশ ক'বছর পর্যন্ত আদালতের কার্যক্রম চলে। বর্তমানেও বেশ কয়েকটি বাড়ী ভগ্ন অবস্থায় থাকলেও মিটফোর্ড সংলগ্ন সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদের হোস্টেল বহাল রয়েছে। জে, সি, এস, পগোজ সাহেবের একটি বাড়ীও নলগোলায় ছিলো। নলগোলা নরসিংহদির প্রভাকরদির বুজুর্গ শাহ্ আঃ হামিদ কলন্দরের নামানুসারে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে। এ মহল্লায় তার বেশ কিছু মুরিদান রয়েছে। তিনি নাকি আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। অত্র এলাকার নদী তীরে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি নুকু মিয়ার বাসভবন ছিলো।



১৮৪০ সালে ঢাকার নদী তীরস্থ নলগোলা (বর্তমান মিটফোর্ড রোড) এলাকায় ঢাকার তৎকালিন বিশিষ্ট ব্যক্তি নুকু মিয়ার বাসভবন

আজকের আবাসিক এলাকা ধানমণ্ডিতে বৃটিশ যুগে চাষাবাদ হতো। কিছু কিছু বসতিও ছিলো। তবে ধান উৎপন্ন হতো বলে ধানমণ্ডি নামকরণ হয়নি। এখানে ধানের ও অন্যান্য শস্যের বীজের হাট বসতো বলেই এর নাম হয়েছিলো ধানমণ্ডি। হাট বাজারকে ফার্সী ও উর্দু ভাষায় মণ্ডি বলা হয়ে থাকে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নুরুল আমীনের মন্ত্রিত্বকালেই বর্তমান গভঃনিউমার্কেট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখনও মার্কেটের আশে পাশে অভিজাত এলাকা গড়ে ওঠেনি। নিউ মার্কেটের পাশেই আয়ুব আলী সর্দার নামে একজন দানশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বাস করতেন। সে এলাকায় তার বহু ভূ-সম্পত্তি ছিলো। তারই দানে সেখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যা আজ আয়ুব আলী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে পরিচিত।

বর্তমানে অভিজাত এলাকা যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে তেমনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা কলেজ। ঢাকা কলেজের সুনাম রয়েছে অনেক দিনের। এ ছাড়া আরো বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু বিপণী বিতান, কাঁচা বাজার ইত্যাদি।

হাকিম হাবীবুর রহমান ১৯৪৬ সালে উল্লেখ করেছেন যে ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক ঈদগাহের সামনে একটা সুন্দর ব্রীজ ছিলো ভাঙ্গা অবস্থায়। তিনি ঠিকই বলেছেন– এই ব্রিজটি ছিলো পাণ্ডু নদীর একটি শাখার উপর। পাণ্ডু নদী এক সময় এই স্থান দিয়ে জাফরাবাদের দিকে প্রবাহিত হয়ে সাত গম্বুজ মসজিদের কাছে বুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়ে পড়তো। রেসেলের ম্যাপে এই তথ্যের সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে। পাণ্ডু নদীর ঐ শাখাটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে শুকিয়ে যায়। যার ফলে ঐ জায়গা থেকে শস্যবীজের হাটটিও উঠে যায়। ধানমণ্ডি এলাকায় রয়েছে ঈদগাহ। ১৬৪০ সালে শাহ্ সুজার আদেশে মীর আবুল কাশেম এটি নির্মাণ করেছিলেন। কিছু দিন পূর্বেও এর ধ্বংসাবশেষের মাত্র তিনটি দেয়াল বিদ্যমান ছিলো। মোঘল আমলে এখানে বহু সুরম্য হর্ম্য ছিলো। শহরের মুসলমানগণ এখানে সমবেত হয়ে পবিত্র ঈদের নামাজ আদায় করতেন। সে সময় ঈদগাহের উভয় দিকে শহরটি কয়েক মাইলব্যাপী বিস্তৃত ছিলো। কর্মমুখর আদালত দরবার, বাজার ও সৈন্য শিবিরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিলো ঈদগাহ। পবিত্র রমজানের দীর্ঘ এক মাসব্যাপী রোজা পালনান্তে নব নব বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহানগরীর মুসলমানগণ আনন্দময় ঈদ উৎসব পালনের জন্যে যখন এখানে সমবেত হতেন তখন নিশ্চয়ই একটা উদ্দীপনাময় দৃশ্যের অবতারণা হতো। আজ অবশ্যি সে সবের কোন অস্তিত্বই নেই। বর্তমান নতুন শহর গড়ে উঠার

পূর্বক্ষণেও অবহেলিত জনমানবহীন ঈদগাহ্ একাকী এক বিরাট প্রান্তরের উপর দাড়িয়ে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর জন্যে যেনো বিলাপ করতো।

কিছুদিন হলো পুরা কীর্তি দপ্তর ঈদগাহ্‌র শ্রী বৃদ্ধি করেছেন। ঈদগাহ্-এর পিছনে ইতিমধ্যে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এই ঈদগাহের নামানুসারে পশ্চিম ধানমণ্ডির একটি সড়কের নাম ঈদগাহ্ রোড।

লনকে ফার্সিতে 'রমনা' বলা হয়। আবার রমনীয় থেকে রমনার নামকরণ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। ১৮২৪ সালে ঢাকার কালেক্টর মিঃ ডাউজ রমনা গ্রীন ও রমনা রেসকোর্সের পত্তন করেন। তৎকালীন পুরোনো ক্যান্টনমেণ্ট ও বেগুন বাড়ীর (মীরপুরের নিকটে) মধ্যবর্তী একটি উন্মুক্ত প্রান্তর ছিলো এটি। দিলকুশা, তোপখানা রোড, পুরানা পল্টন প্রভৃতি এলাকাজুড়ে ছিলো পুরোনো ক্যান্টনমেণ্ট। গোটা এলাকাটির নাম ছিলো গার্ডবাজার। পরবর্তীকালে ঐ ক্যান্টনমেণ্ট গার্ডবাজার থেকে উঠে গিয়ে বেগুনবাড়ীতে স্থাপিত হয়। মোঘল আমলে গোটা রমনা এলাকাটি মহল্লা চিশতিয়ান ও সুজাতপুর নামে পরিচিত ছিলো। সে যুগে বাগবাগিচায় সুশোভিত এই এলাকাটি ছিলো প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিবাসস্থল।

এ রমনা নিয়ে বহু ইতিহাস আছে বহু কিংবদন্তী আছে, আছে আনন্দ আর দুঃখ বেদনার কথা। রমনা রেসকোর্স মাঠের মধ্যে রয়েছে রমনা কালিবাড়ী যা ভারত উপমহাদেশ খ্যাত। এই কালিবাড়ীতে দশনামী সন্নাসীদের একটি মঠ আছে। শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের গিরি উপাধিধারী উদাসীনগণ কর্তৃক এই মঠ সংস্থাপিত হয়। এই মঠ মধ্যে চতুর্ভূজা পাষাণময়ী কালিকা দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্তমান কালিবাড়ী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পূর্বতম কালিবাড়ীর ভগ্নাবশেষ মাঠের উত্তরে কিঞ্চিত রয়েছে। মহারাজ রাজ ভল্লভ এ মঠটির সংস্কার সাধন করেছিলেন। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মঠের শীর্ষদেশ ফেটে গেলে গর্ভণমেণ্ট উহার সংস্কার করেন। নিকটবর্তী পুস্করিনীটি ভাওয়ালের স্বর্গগতা রানী বিলাস মনি দেবীর ব্যয়ে খোদিত হয়েছে। পূর্বে প্রতি অমাবস্যায় দেবীর তৃপ্তার্থে বলির ব্যবস্থা ছিলো। প্রাঙ্গন মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড যাহা পরিলক্ষিত হয়, সাধক প্রবর ব্রহ্মানন্দ গিরির সিদ্ধাসন বলে লোকে এখনও উহা পূজা করে। ব্রহ্মানন্দের ন্যায় সাধক শ্রেষ্ঠের পূণ্য স্মৃতি এ স্থানের ধূলিকণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে আজও ইহা হিন্দুদের নিকট পুণ্য স্থান বলে সমাদৃত।

ব্রহ্মানন্দগিরি সম্পর্কে এক কিংবদন্তি রয়েছে, তাহলো-অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ব্রহ্মানন্দগিরির জননী দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হয়েছিলেন। পথিমধ্যে একতিল ক্ষেত্রে

ব্রহ্মানন্দ প্রসুত হন। নির্দয় দস্যুরা নবজাত শিশুকে তথায় ফেলে জননীকে লয়ে প্রস্থান করে অন্যত্র। পরে শিশুর পিতা সংবাদ পেয়ে পুত্রকে ক্ষেত হতে আনয়নপূর্বক প্রতিপালন করতে থাকেন। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ব্রহ্মানন্দ নিতান্ত দুর্ব্বিনীত, ভ্রষ্টাচারী ও চরিত্রহীন হয়ে পড়ে। কুলত্যাগিনী মাতাও অন্যোন্যপায় হয়ে বেশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে। কুসঙ্গ দোষে একদিন ব্রহ্মানন্দ তার মাতার ঘরেই প্রবেশ করে। ব্রহ্মানন্দের ললাটে একটি জড়ুল ছিলো, সে নিদর্শন দৃষ্টে জননী পুত্রকে চিনতে পারলো। অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে ব্রহ্মানন্দ সংসার পরিত্যাগ পূর্বক সন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ রমনা নির্জ্জনকালী বাড়ীতে এসে দশনামী সন্যাসীদের দলভুক্ত হন এবং গিরি উপাধি ধারণ করেন। শীঘ্রই এ পথ পরিহার পূর্বক তান্ত্রিক সিদ্ধি সাধনে কৃতসংকল্প হন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মহাশক্তির প্রেরণায় পৃথিবীর তাবৎকার্য যন্ত্র চালিতের ন্যায় সু-সম্পন্ন হয়। তদীয় দুস্কার্য্যও তারই প্রেরণা সম্ভূত। তাই তিনি দুস্কর্মের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প লয়ে তান্ত্রিক সাধনায় ব্রতী হন। তার কঠোর সাধনায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তের আসন মস্তকে বহন করবার ভার গ্রহণ করেন। উমা ও তারা এ দুই মুর্ত্তিতে দেবী প্রস্তর বহন করতঃ ভক্তের অনুগামী হতেন। লোকে দেখতো প্রস্তরখানা শূন্যের উপর দিয়ে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। কথা ছিলো, প্রার্থনার অন্যথা চারণ করলে দেবী অন্তর্ধান হবেন। একদা তিনি রমনা মাঠে যেয়ে প্রস্তর সমেত গুরুধামের প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করা সমীচীন মনে করলেন না। তাই দেবীকে পাথর নামিয়ে দ্বারদেশে বিশ্রাম করতে বলে ব্রহ্মানন্দ মঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে, দেবী কহিলেন "তোমার সঙ্গে কথাছিলো যখন তুমি পূর্ব প্রার্থনার অন্যথা করিতে বলিবে, তখন আমি প্রস্থান করিব। তুমি আমাকে প্রস্তর বাহক করিয়া তোমার সহিত বিচরণ করিতে বলেছিলে, উহা নামাইতে বলিলে কেন? অতএব আমি চলিলাম" এই বলিয়া তথায় প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করত দেবী অন্তর্ধান হন। কিংবদন্তি বা প্রবাদের মূলে যাই থাকুকনা কেন ব্রহ্মানন্দ এ প্রস্তর খণ্ডে উপবেশন করে সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করেছিলো সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

এ মন্দিরের পুরোনো নাম কৃপাসিদ্ধি আখড়া, প্রায় সাড়ে চার শত বছর পূর্বে গোপালগিরি নামে ভারতের বদ্রিনারায়ণ থেকে এসেছিলেন এক সাধু পুরুষ। তিনিই এ আখড়ার গোড়া পত্তন করেছিলেন। এখন যে মন্দির রয়েছে সেটা তৈরি করেন হবু চরনগিরি প্রায় আড়াইশত বছর পূর্বে।

রমনা কানন বেষ্টিত উন্নত চূড়া কালী মন্দিরটি ভাস্কর্যের শিল্প নৈপূণ্যের নিদর্শনের

স্বাক্ষর বহন করতো। দ্বাদশ সিড়ি বেয়ে মন্দিরে বারান্দায় উঠলেই মধ্য ভাগে বেদীর উপর সুদৃশ্যপূর্ণ কাষ্ঠ নির্মিত সিংহাসনে লাল পাড়ের শাড়ী পরিহিতা স্বর্ণ মনি মুক্তার নানা অলঙ্কারে ভূষিতা মূল্যবান কষ্ঠি পাথরের পাষণেময়া শ্রীশ্রী কালিকা মূর্তি এবং শ্রীশ্রী ভদ্র কালিমূর্তি ধর্ম ভীরুদের ধ্যান ও মন আকর্ষিত করতো। অর্ঘদিতে আসতো বহু বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিবর্গ। এই দিব্যদেবী বিভান্বীত ব্রহ্মাণি যিনি পরবর্তীতে মা আনন্দময়ী নামে সর্ব ভারতে খ্যাত হয়। মন্দিরটি পরিদর্শনে দেশ বিদেশের বহু পর্যটক এসেছেন। তন্মধ্যে নেপালের রাজা মহেন্দ্র অন্যতম। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আজম খাঁন গলফ খেলতে এসে জানতে পারেন এ মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন আনন্দময়ী আশ্রমে, ছাত্রবাস ইত্যাদিতে যে পরিমাণ লোক বাস করে সে তুলনায় মলত্যাগের পায়খানা অত্যন্ত কম এবং ভগ্ন। তাই তিনি কয়েকটি পাকা পায়খানা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মন্দির অঙ্গনের পশ্চিম পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে দশনামি যেমন গিরি, পুরি, বন, ভারতী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সাধকদের যে সমাধিগুলো ছিলো তা আজ নেই। এগুলোর অনেকটাই ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বিলীন হয়ে গেছে। জানা যায় কালো পাথরটি নাকি শাঁখারী বাজারে রক্ষিত আছে। রমনার কালী জাগ্রত দেবী বলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এবং রয়েছে। অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও একথা প্রচার ছিলো। তজ্জন্য নাকি এ দেবীর কেহ বিরোধীতা করতে সাহস পেতনা।

বাংলায় সন্নাসী বিদ্রোহকালে যতদূর সম্ভব মনে হয় সন্নাসী বিদ্রোহীরা প্রথম আক্রমণ চালায় ঢাকার ইংরেজ কুঠি। কারণ এ কুঠিতে চলতো ঢাকা অঞ্চলের যত অত্যাচার উৎপীড়ন। পেয়াদা দ্বারা ধরে এনে তাঁতীদের জোর করে দাদন দিয়ে দশ ভাগের এক ভাগ মূল্যে মসলিন কাপড় বুনিয়ে নিত। ফলে মসলিনের তাঁতীরা নিজেদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে তাঁত চালাবার অযোগ্য করেও ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা পেতোনা। সেজন্যে সমবেত বিদ্রোহ সন্নাসীদের লক্ষ্য ছিলো ঢাকার ইংরেজ কুঠি। কুঠিসমূহের রক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারই ছিলো। কিন্তু সে সব ভয় উপেক্ষা করে বিদ্রোহী সন্নাসীরা সমবেত হলো রমনা কালি মন্দিরে। এককালে গ্রীক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয়দের একত্রিত করতে চানক্য মন্ত্রণা দিয়েছিলেন। জননী জন্মভূমির উদ্ধার কল্পে সেদিন রমনা কালি বাড়ীতে পুরোহিত তাদের আশীর্বাদের সঙ্গে নুতন মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন বন্দে মাতরম। নুতন উদ্দীপনা নিয়ে সন্নাসীরা নিঃশব্দে চলল কুঠির দিকে, সহসা ঘিরে ফেললো কুঠি। অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে সকলকে পরাস্ত করে বন্দী করে ফেললো। কয়েকদিন ঢাকা নগরী রইলো

বিদ্রোহী ফকির সন্ন্যাসীদের অধিকারে। কিন্তু এ অধিকার রাখতে যে শিক্ষা, বুদ্ধি অস্ত্র তৎপরতার প্রয়োজন তা তাদের ছিলোনা। ফলে ইংরেজরা সংগঠিত হয়ে বড় সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করলো বিদ্রোহীদের। তখন বিদ্রোহীদের পরাজয় বরণ করে পলায়ন ছাড়া অন্য কোন পথ ছিলোনা।

রমনা মাঠটি নানা কারণে ঐতিহাসিক হয়ে আছে। ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখান হতেই ঘোষণা দিয়েছিলেন "যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে"। বঙ্গবন্ধুর সেদিনের নির্দেশেই বাঙ্গালীরা স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্দীপীত হয়ে ছিলো। তৎপর ২৫শে মার্চ হানাদার বাহিনীর বাঙ্গালী নিধনের ভূমিকায় নামলে প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আর এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তিও হয় এ রমনা মাঠেই ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর জেনারেল নিয়াজীর অশ্রু সজল নেত্রে সম্মিলিত সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল অরোরার নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এসে এ মাঠেই বিশাল জন সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন–ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাতও হয়েছিলো এ মাঠে এই ঐতিহাসিক সভার বক্তৃতা থেকে।

এই উদ্যানের উত্তরাংশে বর্ণাঢ্য শিশুপার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এই শিশুপার্কে ছোটদের খেলাধূলা ও আনন্দদানের উপযোগী বহুবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে এর পরিচালন ভার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের হাতে ন্যাস্ত। উত্তর-পশ্চিম কোণে রেসকোর্স অফিসাদির জন্য সে সব দরদালান ছিলো তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুলিশ কণ্ট্রোল রুম।

বৃটিশ যুগে রমনা ময়দানটি ছিলো ঘোড় দৌড়ের জন্য বিখ্যাত। এটা ছিলো বিদেশী প্রভু ও ঢাকার সকল স্তরের লোকদের মধ্যে চিত্তবিনোদনের একটি স্থান। প্রতি শনিবার হতো ঘোড় দৌড়। সপ্তাহব্যাপী জল্পনা-কল্পনা আলাপ-গুঞ্জন চলতো বিত্তশালী মহল থেকে নিম্ন পর্যায়ের দিন কামায় দিন খায় এমন লোকদের কর্মস্থল পর্যন্ত। শুধু কোন্ ঘোড়া কোন্ দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে, সেটার জোকি কে, বাজী জিতবার সম্ভাবনা কার ইত্যাদি। ঘোড় দৌড়ের ঘোড়াও পালতো বিত্তশালী থেকে নিম্নবিত্ত পর্যন্ত। সকালে ঘুম থেকে ওঠে ঢাকার অনেক কর্মস্থলেই শুধু রেস নিয়ে আলোচনা চলতো। রেসের ভবিষ্যৎ বাণী প্রকাশ করে পুস্তিকা বের হতো রেসের দুই তিন দিন পূর্বে। এটাকে রেসটিপ বলা হতো। তন্মধ্যে একটি জিমখানা রেসটিপ যাহা জিমখানা ক্লাবের পক্ষ হতে বের হতো, অন্যটি চাঁন মিয়া সাহেবের

রেসটিপ বলে সারা ঢাকাময় বেচে বেড়াতো হকাররা। চাঁন মিয়া সাহেব ঢাকার পৌর সভায় একসময় কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমাদের আমলীগোলা মহল্লারও অনেকেই রেস খেলতো এবং ২/৩ জন ঘোড়াও পালতো। এক এক ঘোড়ার এক এক নাম। নামের কি বাহার ঘোড়া চালকদেরও বেশ সমাদর ছিলো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার খ্যাতনামা আলেম মুফতী দীন মহম্মদ সাহেব তার চকবাজার মসজিদের তফসির ম্যাহফিল হতে ঘোড় দৌড়ের তথা রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত আরম্ভ করেন। আন্দোলন এক সময় বেশ দানাবেঁধে ওঠে। ঘোড়া দৌড় বন্ধের জন্য আবেদন নিবেদন করে যখন কোন ফল হচ্ছেনা দেখলো মৌলানা সাহেব তখন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় যারা ঘোড়া প্রতিপালন করতো তাদের পাকরাও করে নানারূপ নসিহত করে ঘোড়া বিক্রয় করিয়ে ছাড়তেন। তখন ঢাকা শহরে মাওলানা দীন মহম্মদ সাহেবের বেশ প্রতিপত্তি, তার উপর কথা বলে বা তার কথা না শুনে এমন লোক খুব কমই ছিলো। তাই তার আবেদন উপেক্ষা করতে পারতো না কেউই সহজে। অবশেষে অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ১৯৪৯ সালে ঘোড় দৌড় বন্ধ ঘোষণা করলেন। এটা বন্ধ হওয়ার ফলে অনেক গরীব পরিবার বেঁচে গেলো সত্য। এই রেস খেলতে গিয়ে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে। অনেকে খুন খারাবীও হয়েছে। মনে পড়ে আমাদের পাড়ার এক হিন্দু ব্যক্তি তার ছোট ভাইজিকে হত্যা করেছিলো তার গলায় স্বর্ণের চেইনটিকে নেবার জন্যে। অনেকে স্ত্রী কন্যার গহনা বিক্রয় করে রেসে জয়লাভ করে তার চেয়ে বেশি গহনা করে দেবে বলে সর্বশান্ত হয়েছে। হয়েছে গরীব থেকে গরীব। একা টিকিট কিনতে পারতো না বলে কয়েকজনে শেয়ার করে টিকিট কিনতো। জিতলে টাকা ভাগ করে নিত। কি আনন্দ তখন তাদের মধ্যে। আর সব খুইয়ে আসলে মুখ থুবরে করে ঘরে পরে থাকতো, স্ত্রী কিছু বললে বেধম প্রহার করতো। ফলে অনেক সালিশ পঞ্চায়েত হতো। এসব ছিলো রেস আমলের নিত্তনৈমত্তিক ঘটনা। রেস বন্ধের ফলে অবশ্য ঢাকার অনেক পরিবার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ঠিকই। তবে জুয়া আজও সর্বস্তরে এবং বিভিন্ন রূপে আসন গেড়ে আছে।

রেস বন্ধ হবার পর পুনরায় ইসকান্দার মীর্জার আমলে চালু হলেও পরবর্তীতে স্থানীয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অনেক দিন পর্যন্ত রমনা রেসকোর্স মাঠের চতুর্দিকের কাঠের রেলিং বলবৎ ছিলো। এ রেসকোর্সের সাথে আমার জীবনেও দু'একটি ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। তন্মধ্যে একটি ঘটে ১৯৫১-৫২ সালে ১৬তম পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের অধীনে শাহবাগে অনুষ্ঠিত সারা দেশের আনসার কমাণ্ডারদের নিয়ে

একটি ভি, পি, পি, ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তখন। ল্যাফটেন্যাণ্ট ছিলেন সিলেটের এ, আর, মজুমদার পরে তিনি ব্রিগেডিয়ার হয়ে সামরিক বাহিনী হতে অবসর নেন। সেকেণ্ড ল্যাফটেন্যাণ্ট ছিলেন জনাব নিয়াজী সেই প্রশিক্ষণের সময় এক রাত্রে যথা সময়ে নারায়ণগঞ্জে একটি জাহাজ আক্রমণের মহড়ায় যোগদানে যেতে না পাড়ায় ল্যাফটেন্যাণ্ট মজুমদার আমাদের সকলকে শাস্তিদান করেন– রাত্রি তিনটা হতে রেসকোর্সের মাঠে নিয়ে যেখান দিয়ে ঘোড়া দৌড়াতো সেই পথ দিয়ে আমাদেরকে দৌড়াইয়া ছিল সকাল ৮টা পর্যন্ত। এতে অনেকেই সজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। এই শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য হাফপ্যাণ্ট পরে এবং নিয়মিত নামাজি না হয়েও ফজরের নামাজের কথা বলে মাঠে নামাজে দাড়িয়ে ছিল। অনেকের সঙ্গে আমার সঙ্গী নিজামুদ্দিনও পুরো একটি চক্কর দিয়ে এসেও দেখি নামাজ তাদের শেষ হয়না। তখন বাধ্য হয়ে ওস্তাদদের বলেছিলাম এরা শাস্তি এড়াবার জন্য নামাজের বাহানা করে মাঠে অবস্থান করছে, ফলে ওস্তাদগণ তাদের লাঠি পেটা করে পুনরায় দৌড়ে ভিড়ায়। মনে হয় ১৩/১৪ বার রেসকোর্স মাঠ চক্কর দিয়েছি। জীবনে এরূপ শাস্তি কোন দিন পাইনি তাই আজও সে কথা মনে পড়ে।

বর্তমানে মাঠে রেসের কাঠের রেলিং নেই। উদ্যানে যে গাছপালা লাগানো হয়েছিলো তা বড় হতে চলেছে। অনেক তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী সে সব গাছের নীচে তাদের প্রেম নিবেদন করে। অনেক পরিবারও শান্ত পরিবেশ উপভোগ করার জন্য সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে যান কিন্তু গাছপালার গভীরতা না থাকায় গোপনীয়তা রক্ষা হয়না বলে খুব কমসংখ্যক লোকই এ পার্কে যান। ইতি পূর্বে বৃটিশ যুগ থেকে এ মাঠে গলফ খেলাও হতো। উদ্যান হওয়ার ফলে সে খেলা বন্ধ হয়ে গেছে।

উদ্যানটি গণতন্ত্রের নির্ভিক সেনানী বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রনায়ক রাজনৈতিক আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র অবিভক্ত বাংলা ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী, ১৯৬৪ সালের সর্ব বৃহৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাহসী শান্তির অগ্রদূত, পাক আমলের বিরোধীয় রাজনীতির অন্যতম অগ্রনায়ক মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ রমনা রেসকোর্স ময়দান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামকরণ যথার্থ হয়েছে বলে দেশবাসী মনে করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর ইন্তেকালের পর তাঁর নামাজে জানাজা এ মাঠেই হয়েছিলো এবং তাঁর মরদেহও এ উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সমাহিত করা হয়। সেই সঙ্গে আরও দুই প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী মরহুম শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ও খাজা নাজিমউদ্দিনের মরদেহও এখানেই সমাহিত হয়। এ তিন নেতার মাজারের উপর এক স্মৃতিসৌধ

নির্মিত হয়েছে। যা তাদের কীর্তি ও কর্ম দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেবে যুগ যুগ ধরে। এ কোণে আরো রয়েছে হাজী খাজা শাহবাজের প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটি ১৬৭৮ খৃঃ নির্মিত হয়। খাজা শাহবাজ কাশ্মীর থেকে বাণিজ্য ব্যাপদেশে ঢাকায় এসেছিলেন এবং টঙ্গীতে স্বীয় বাসভবন করেন। সেখানে হতে প্রতিদিন মাগরেবের নামাজ পড়তে এ মসজিদে আগমণ করতেন। হাজী সাহেব ইন্তেকাল করলে তাঁকে সেই মসজিদের সংলগ্ন স্থানে সমাহিত করা হয়। তার সমাধি স্থানও একটি পাকা মসজিদের ন্যায় আজও বিদ্যমান রয়েছে। পূর্বে এটি সড়ক পথ হতে স্পষ্ট দেখা যেত এখন শিশু একাডেমী ভবন তৈরি হওয়ায় পথচারীদের দৃষ্টি গোচর হয়না। শিশু একাডেমীর মাঠে প্রতি বছর বৈশাখী ও শীতকালীন সময়ে শিশু মেলা বসে। অন্য সময়েও নানা প্রদর্শনী চলে। তাছাড়া এখানে রয়েছে একটি বিরাট মিলনায়ত যা জিয়াউর রহমান মিলনায়তন নামে পরিচিত। বিশেষ করে এটা শিশুদের অনুষ্ঠানাদির জন্য নির্মিত হয়েছে।

রমনার ঢাকা গেটের মোড় ঘুরতে যে সাদা চুন কাম করা মাজার রয়েছে তা ঘুটে ওয়ালির মাজার নামে পরিচিত। তিনি নাকি অত্যন্ত পূন্যবতী ও কামেল ছিলেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের উত্তর-পূর্বদিকের রমনা পার্ক তথা রমনা গ্রীন। মনোরম ও সুন্দর সবুজের সমারোহ আর লেক মানুষকে শীতল পরশ দান করছে। মানুষ সারা দিনের ক্লান্তির পর বিকেলে আসে স্নিগ্ধ বাতাস শান্ত পরিবেশ আর বৃক্ষরাজির তলায় দু'দণ্ড নিরিবিলি বসে আপন জনের সঙ্গে কথা বলতে কেহবা একাকি আসে মনের যন্ত্রণা ও দেহের অবসাদ ঘুচাতে। আসে বিশুদ্ধ বাতাস সেবনের জন্যে স্বাস্থ্যজনিত কারণে। পাক আমলে বিশেষ করে আইউব আমলে দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও মেহমানদের এখানেই সংবর্দ্ধনা জানানো হতো, ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের সংবর্দ্ধনাও এখানেই হয় তজ্জন্য একটি মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। যা আজও আছে। এসব অনুষ্ঠানের বর্তমানের মত স্কুলের মেয়েদের স্বাগত জানাবার জন্য আনা হতো না। আমাদের আজাদ মুসলিম ক্লাব প্রতিষ্ঠিত পৌর শিশু সেনারা গার্ড অব অনার প্রদান করতো। ওদিকে রেস্টুরেন্টের নিকট ফাঁকা যায়গায় সাহিত্য সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বর্ষবরণ উৎসব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ করে থাকেন। রমনা পার্কের লেকটা এক সময় নিকটস্থ হাই কোর্টের ভিতরে একে বেঁকে বর্তমান সুপ্রিম কোর্ট ঘেষে খানিকটা পুকুরের মত ছিলো। সেটাতে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানী করা ভিক্টোরিয়া রেজিয়া ফুলের গাছ ছিলো, যা দেখতে অতিকায় পদ্ম ফুলের মতো। ঢাকা মহানগরীতে শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশে চিত্ত বিনোদনের এটাই একমাত্র স্থান। অবশ্য

এটা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলো মোঘল যুগের নবাব নাজিম আর আমীররা। সে যুগে বাগ বাগিচায় সুশোভিত এই এলাকাটি ছিলো প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিবাসস্থল। বৃটিশ যুগে ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের পর পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রশাসনিক দফতরসমূহ স্থাপনের জন্য বৃক্ষরাজী কেটে বহু নুতন দালান-কোঠা নির্মিত হয়। নির্মিত হয় লাট ভবন যা আজকের হাইকোর্ট। অবশ্য আজ হাইকোর্ট বিল্ডিং নুতন আঙ্গিকে নির্মিত হয়েছে। হাইকোর্ট প্রাঙ্গনেই প্রথম মোঘল সুবেদার ইসলাম খাঁ চিশতির দাফন সম্পন্ন হয়েছিলো যা পরবর্তীতে মোঘল সম্রাটের নির্দেশে কফিন তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ফতেপুর সিক্রিতে। তারই নামের পদবী অনুসারে এলাকাটি মহল্লা চিশতিয়ান নামকরণ হয়। হাই কোর্ট প্রাঙ্গনে এক বুজুর্গানেদ্বীন হযরত শাহ্ খাজা শরফুদ্দিন চিশতির (রা) দাফন হয় ৯৯৮ হিজরী সনে। বর্তমানে মাজারের দরওয়াজার ফটকে লিখা রয়েছে।

মাজারটি পাক আমলের প্রথম দিন পর্যন্ত সাদা সিদে শায়েস্তা খানি আঙ্গিকে খিলান ওয়ালা চৌচালা ও গম্বুজ সদৃশ্য এবং মাজারের সামনে একটা পাকা চবুতরা ছিলো। মাজারটি দেখতে তৎকালীন ঢাকার অনেকটা মসজিদের ন্যায় ছিলো। ইতিহাসের পাতায় হজরত খাজা শরফুদ্দিন চিশতীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি কখন এখানে এসেছেন কোত্থেকে এসেছেন তার পূর্ব পরিচয় কিছুই জানা যায় না। মাজারের খাদেমদেরকে কিছুদিন পূর্বে জিজ্ঞেস করে ছিলাম তার সম্পর্কে কোন পুস্তকাদি প্রকাশ হয়েছে কিনা বা তার কোন পূর্ব পরিচয়ের বৃত্তান্ত তাদের নিকট বা লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে কিনা? এসবের কিছুই তাদের জানা নেই বলে জানালেন। বৃটিশ আমলে এ মাজারে তেমন লোকজন জেয়ারতে আসতোনা এক কথায় ঢাকাবাসীর কাছে এ মাজারটির তেমন গুরুত্ব ছিলোনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারত থেকে আগত মোহাজিরদের আগমনে এর জিয়ারত আরম্ভ হলে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ইতিহাসবেত্তাদের অনেকেই বলে থাকেন এটা নবাব ইসলাম খাঁ চিশতীর কবর যা পরবর্তীতে বাদশার হুকুমে তার মৃতদেহ ফতেপুর সিক্রিতে নিয়ে দাফন করা হয়। তাই এ মাজারের সঠিক তথ্য বা হজরত খাজা শরফুদ্দিন চিশতীর সঠিক আগমণ এবং তিনি সে সময়ে কি ভূমিকা পালন করে ছিলেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণ কেউ দিতে পারেন না। অনেকে বলে থাকেন নবাব ইসলাম খাঁ চিশতীর আমলেই তিনি এসেছিলেন এবং এ এলাকাতেই তার এবাদতগাহ বা খানকা ছিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হজরত খাজা শরফুদ্দিন চিশতীর দরগাহ হাইকোর্ট মাজার নামে পরিচিতি লাভ করে। কিছু কথিত

ফকিরদেরও আস্তানা হয় সেখানে, তন্মধ্যে ফকির নূরা পাগলা অন্যতম। জেয়ারতে দিন দিন লোক বর্দ্ধিত হতে থাকলে ১৯৬০ সালে মাজার সংলগ্ন একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদ ও মাজারটি স্বাধীনতার পর নতুন করে সম্প্রসারণ করে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মাজার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। মসজিদে হজরত খাজা শরফুদ্দিন (রাঃ) নামানুসারে একটি দ্বীনি লাইব্রেরী রয়েছে। হাইকোর্ট প্রাঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নীচু ও গর্তজমি ভরাট করে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আদেশে একটি জাতীয় ঈদগাহ নির্মিত হয়েছে। আরো নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ও সড়ক ভবন, রমনা মাঠের সংলগ্ন পূর্বদিকে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট হল। যা তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জার সময় নির্মিত হয় এবং তিনি উহার উদ্বোধন করেন। তখন এই মিলনায়তনের নাম রাখা হয়েছিলো ইস্কান্দার মির্জা হল। ইস্কান্দার মির্জা একজন ঝুনো আমলা ছিলেন। তিনি মীর জাফরের নবম বংশধর, বুদ্ধি বলে তৎকালীন প্রধান সেনাপতি সাবেক প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আইউব খানের সহায়তায় পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদকে সরিয়ে দেন। পরে তিনিও জেনারেল আইউব খাঁন দ্বারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। রমনা পার্কের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে রয়েছে জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্স। তার সঙ্গে রয়েছে ঢাকা ক্লাব। যা ১৯১১ সালে স্যার ল্যানসেলট (কে, সি, এস, আই, সি, ই, আই) প্রতিষ্ঠা করেন। বৃটিশ যুগে বহুকাল পর্যন্ত এটি নাচঘর ছিলো। বিলেতি মেম সাহেব, রাজপুরুষ ও নারায়ণগঞ্জ পাট কলের ফিরিঙ্গিদের নৃত্য লীলা চলতো। তথা মদ্য বিলাসী বল নৃত্য প্রিয় শেতাঙ্গদের নৈশ আসর জমতো এখানে। তৎকালে ঢাকার নাগরিকদের জন্য এ ক্লাবে যাওয়া অপ্রবেশযোগ্য ছিলো। বর্তমনে ঐ অবস্থা না থাকলেও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের এ ক্লাবটি একটি প্রাইভেট ক্লাব-এ পরিণত হয়েছে। এ ক্লাবের পশ্চিমে রয়েছে ডায়েবেটিক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত ডায়েবেটিক হাসপাতাল। এ হাসপাতালটি বাংলাদেশের গৌরব। বহুমুত্র রোগীদের জন্য এটা এক আশীর্বাদ, এশিয়ার মধ্যে অন্যতম। এর কৃতিত্বের দাবীদার জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাঃ ইব্রাহীম, তারই অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এ হাসপাতাল।

১৯৩১ সালে রমনা ডাক বাংলাতে উঠেছিলেন ভাওয়ালের সন্নাসী কথিত রাজকুমার। যার কাহিনী বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তিনি এখানে উঠেছিলেন, তার জমিদারী তথা রাজ্য উদ্ধারের জন্য মামলা করতে। তার হাতে উর্দূতে লিখা উলকি কাটা ছিলো। উর্দূ থাকলেও ভাষা অন্য ছিলো। তখন ঢাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি

ও বুদ্ধিজীবি তাকে দেখতে এবং তার হাতের লেখার মর্ম উদ্ধারের জন্য যেতেন। লিখার মর্ম উদ্ধার করতে গিয়ে শেষ অবধি এটুকু জানা যায় যে, "বাবা ধরমদাস দা চিলা নাগা" বাকী অক্ষর গুলোর মর্ম কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। এসব দেখে অনেকে বলে ছিলেন ধরম দাস কুমারের সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী নাম।

রমনায় তিন নেতার মাজারের নিকট ময়মনসিংহ রোডের মাথায় রমনা গেট যাহা ঢাকার উত্তর গেট নামেও অভিহিত করেন। সেটি উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চালর্স ডি অলির প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিলো বলে জানা যায়। বর্তমান যে আকৃতিতে রয়েছে সে রুপই। যদিও তা পাক আমলে মহামান্য রানী এলিজাবেথের আগমনকালে রাস্তা চওড়া করতে গিয়ে বৃটিশ আমলের গেইটটি ভেঙ্গে রাস্তা চওড়া করে নতুন করে অনুরুপ ডিজাইন ও রং রাখা হয়েছে। গেইট নির্মাণের উদ্যোক্তা ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ডি অলি রমনা রেসকোর্সের আওতাভূক্ত টিলার উপরে অবস্থিত বাংলোয় অবসর সময় কাটাতেন। তিনি মর্নিং ওয়ার্ককালে এই বাংলোয় কফি খেতেন এবং অন্যান্য পরিচিত প্রাতঃ ভ্রমণকারীদেরও কফি খাওয়াতেন। তিনি রমনা রেসকোর্সেরও উন্নয়ন সাধন করে গেছেন। এই গেটের কিছু উত্তরেই ইতিহাস খ্যাত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলীয়দের সমালোচনার যে হাতিয়ার ছিলো সেই বর্দ্ধমান হাউস। এটি বর্দ্ধমানের রাজা তৈরী করে ছিলেন। পরবর্তীতে বাড়ীতে অনেক গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি থেকেছেন। এবং আগমন করেছেন তন্মধ্যে বৃটিশ যুগের অন্যতম বাসিন্দা কাজী মোতাহার হোসেন। তার সময়েই কাজী নজরুল ইসলাম এ বাড়ীতে আসতেন-থাকতেন। পাকিস্তান হবার পর বাড়ীটিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বসবাস করার পর হতে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা নানা রকম মুখারোচক ও মিথ্যা প্ররোচনা করে বাড়ীটি সম্পর্কে ঢাকাবাসী এমনকি দেশবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতা হারান। যদিও তিনি একজন বিজ্ঞ রাজনীতিক ও পার্লামেণ্টারিয়ান ছিলেন। পরবর্তীতে সরকার জনগণের দাবীর সঙ্গে একমত হয়ে বাড়ীটিতে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। আজও প্রতি বছর এখানে শহীদ দিবস উপলক্ষে বই মেলার আয়োজন চলে বৈশাখী মেলা বসে।

মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আজীবন তিনি সর্বহারা কৃষক, শ্রমিক, দুঃস্থ মানুষের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। এই সংগ্রামী নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে ঢাকা পৌর সভা রমনা রেসকোর্স ময়দান ও রমনা গ্রীনের মধ্যবর্তী সড়ক পথটির নামকরণ করেছেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী রোড।

মাওলানা ভাসানী পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামে ১৮৮০ স্যালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম আব্দুল হামিদ খান। পিতা হাজী শরাফত আলী খাঁন। বাল্যকালেই পিতা মাতাকে হারান। অসীম সাহস সুস্বাস্থ্য এবং দৈহিক শক্তির অধিকারী আব্দুল হামিদ খাঁন একজন সুদক্ষ লাঠি খেলোয়ার হিসেবে পরিচিত হন। কৈশোরে তিনি ভালো অভিনয় ও গান গাইতে পারতেন। কবিয়াল বলেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাই মেতে উঠেছিলেন যাত্রা ও কবি গান নিয়ে।

সে যুগটা ছিলো বৃটিশ শাসন ও শোষণ-এর বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আন্দোলন ও সংগ্রামের যুগ। তাই তিনিও তার যাত্রা, কবিগানের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী মনমানসিকতার বিকাশ ঘটান, ফলে স্থানীয় মাদ্রাসার পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারেন নি। তখনকার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিশোর মাওলানাকে হাতছানি দিচ্ছিলো। তার বয়স, রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা স্বভাবগত কারণেই এদেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াবার একমাত্র উপায় হিসেবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকেই গ্রহণ করে ইংরেজ নিধনের আন্দোলনে যোগ দিলেন। এবং স্থানীয়ভাবে কৃষক প্রজাদের নিয়ে ইংরেজের পোষ্য জমিদার মহাজনদের অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। ইংরেজ সরকারের পোষ্যরা তাঁকে গ্রেফতার করবার ফন্দি ফিকির করাতে তাঁর সুহৃদ শিক্ষক মাওলানা আব্দুল বাকী সাহেবের উপদেশে চলে গেলেন ময়মনসিংহের হালুয়া ঘাটে। সেখান হতে চলে যান আসামের গোয়াল পাড়া জেলার জলেশ্বরে শাহ নাসির উদ্দিন বোগদাদীর আস্তানায়। সাড়ে তিন বছর পীরের নিকট দীক্ষা নেন। এ সময়ই তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। এ সুবাদেই কয়েকবার দিল্লী যাবার সুযোগ পান। সেখানে তৎকালীন ভারত বর্ষের প্রখ্যাত রাজনৈতিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মহম্মদ আলী, শওকত আলী, ওবায়দুল্লা সিন্ধি প্রমুখ ব্যক্তিদের সানিধ্য লাভ করেন। খেলাফত আন্দোলনে ভাটা পড়ে গেলে তিনি জন্ম স্থানে ফিরে আসেন। চাচারা সংসারী হবার চাপ দিলে মাওলানা সায় দিলো না। ইংরেজ ও মহাজনদের অত্যাচারের প্রতিকারের পথ খুঁজতে খুঁজতে কলকাতায় এসে হাজির হলেন। সাক্ষাৎ করলেন মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষবোস এবং তৎকালীন কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে। তাদের ধ্যান-ধারণায় আকৃষ্ট হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করে রাজনীতিতে আত্ম নিয়োগ করেন।

এ সময়ে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভীষণ প্লাবন হওয়ায় নিঃস্ব দুর্গতদের সাহায্যার্থে নেতাজী সুভাষ বোসের নেতৃত্বে ত্রাণ শিবির গঠিত হয়। মাওলানা এ

শিবিরের কাজে যোগদান করেন। সরকার তাতে রাজনীতির গন্ধ পেয়ে মাওলানার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করায় বগুড়ার পাঁচবিবির প্রভাবশালী জমিদার নাসির উদ্দিন চৌধুরীর বাড়ীতে ওঠেন। সেখানে শিক্ষক হিসেবে চাকুরীতে ঢুকে জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজার সেই সঙ্গে অন্যান্য দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার গুণে মুগ্ধ হয়ে চৌধুরী সাহেব তাঁর প্রথমা কন্যা হালিমা চৌধুরীকে বিবাহ দান করেন। সেখানে দুই পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন টাঙ্গাইলের এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর সঙ্গে সেই সম্পর্ক ধরে টাঙ্গাইলের সাথে মাওলানার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

এ সময় সন্তোষের মহারাজার প্রজাপীড়ন ও শোষণের মাত্রা চরমে পৌছে। মাওলানা শোষিত প্রজাদের সংঘবদ্ধ করে মহারাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। মহারাজা নির্ভীক মাওলানাকে শায়েস্তা করার জন্য বৃটিশ সরকারের সাহায্য প্রার্থী হলেন। মাওলানা যেহেতু টাঙ্গাইলের অধিবাসী নন সেহেতু বৃটিশ সরকার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টাঙ্গাইল ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। মাওলানা বাধ্য হয়ে টাঙ্গাইলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কিছু জমিজমার মালিক হয়ে টাঙ্গাইলে বসবাসের অধিকার নিয়ে আন্দোলন চালাতে লাগলেন। অন্যদিকে ইংরেজের দোসররা মাওলানার বিরুদ্ধে নানা ধরনের মামলা রুজু করলে মাওলানা টাঙ্গাইল ছেড়ে ১৯২৮ সালে স্বপরিবারে পালিয়ে আশ্রয় নিলেন আসামের ঘাগমারার গভীর জঙ্গলে। মাত্র এক টাকা চৌদ্দ আনা খরচ করে একটি কুড়ে ঘর তৈরী করে বসবাস করতে লাগলেন।

জমিদারের অনাচার, মহাজনদের শোষণ, নদীর ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত হয়ে রংপুর, দিনাজপুর ময়মনসিংসহ আরো বহু অঞ্চলের ছিন্নমূল মানুষ আসামের বনজঙ্গলে গিয়ে জীবিকার সন্ধান করতো। তখনকার বৃটিশ আইনে আসামের বনজঙ্গল সাফ করে নিতে পারলেই চাষ বাস করে জীবিকা নির্বাহ করা যায়। তাই ছিন্নমূল তথা কৃষকের কাছে আসামের জঙ্গলাকীর্ণ স্থান আকর্ষণীয় ছিলো। মাওলানাকে যারা শ্রদ্ধা ও ভালো বাসতো, তাদের মধ্যে অনেকেই জীবিকার অন্বেষণে ঘুড়তে ঘুড়তে ঘাগমারার জঙ্গলে মাওলানার আশে পাশে আস্তানা গড়লো। তারা মাওলানাকে পেয়ে আনন্দিত হলো। কিছু দিনের মধ্যেই ঘাগমারার জনপদ মুখর হয়ে উঠলো। মাওলানার চেষ্টায় প্রতিষ্টিত হলো স্কুল, কলেজ পশু চিকিৎসালয় প্রভৃতি। তার ভক্তরা ঘাগমারার নাম পাল্টে নতুন নামকরণ করলেন হামিদাবাদ। তখনও মাওলানা "ভাসানী" উপাধি প্রাপ্ত হননি।

আসামের বন অঞ্চলে তখন ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের ভীষণ প্রকোপ, তার উপর হিংস্রজন্তুর আক্রমন। মাওলানার স্ত্রী এই বিপদ সঙ্কুল স্থানে বসবাস করাটা মোটেই পছন্দ করতেন না। স্ত্রী বেঁকে বসলেন, অগ্যতা তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ে মাওলানা চলে গেলেন ধুবরীর ভাসানীর চরে। সেখানেও কৃষকদের সুখ-দুঃখের সাথে জড়িত করলেন নিজকে। গড়ে তুললেন উচ্চ মাদ্রাসা ও কল্যাণ মুখী কার্যক্রম। কিছু দিনের মধ্যেই পরিচিত হয়ে পড়লেন ভাসানী চরের মাওলানা বলে। তার এই নামের পিছনেও একটি কিংবদন্তি রয়েছে।

ভাসানী চর ছিলো ভাসমান দ্বীপের মত। কিন্তু সারা বছর দ্বীপটি ভেসে থাকতো না, বছরের কোন কোন সময় পানিতে ডুবতো। ফলে কৃষকেরা চাষাবাদ করে তাদের শ্রমের ফসল ঠিকমত ঘড়ে তুলতে পারতোনা। তাই দ্বীপের কৃষকেরা একবার মাওলানাকে দাওয়াত করে সমস্ত চরটি ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে দেখায়। মাওলানা হাত তুলে খোদার কাছে মুনাজাত করেন। এই চর যেনো আর কোন দিন ডুবে না যায়, এর পর থেকে সত্যিই ডুবলো না। তখন হতেই নাকি তাঁর নাম মাওলানা ভাসানী হয়ে ছিলো বলে অনেকে মনে করেন। এ নামেই তিনি বিশ্বের মানুষের নিকট পরিচিত।

তিনি রাজনৈতিক বিচক্ষণতা দ্বারা দেখেছিলেন আসাম ও বাংলাদেশের মুসলমান কৃষক মজুর বিদেশী শাসক এবং দেশীয় দালাল জমিদার মহাজনদের দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। তাদেরকে এই দ্বিবিধ শোষণ এবং বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত করতে হলে শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তাড়ালেই চলবেনা। দেশীয় হিন্দু জমিদার মহাজনদের প্রভাব মুক্ত একটা স্বতন্ত্র আবাস ভূমিও অতি প্রয়োজন। তাই তিনি আসাম ও বাংলাদেশের শোষিত নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন এবং ১৯৩০ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা, কর্মদক্ষতা এবং ব্যক্তিত্বের বলে তিনি অল্প সময়ে দেশ জোড়া খ্যাতি লাভ করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। তিনি আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি পদ ছাড়াও আসাম আইন পরিষদের সদস্য পদে এগার বছর বহাল ছিলেন। মাওলানা হৃদয়াঙ্গম করতে পেরেছিলেন মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব অতি উত্তম ও বাস্তব ভিত্তিক। বৃটিশ শাসনের অবসান, সামান্তবাদী হিন্দু রাজা, জমিদার, মহাজন ও মাড়োয়ারী শোষণের উৎখাত কেবল এ পন্থাতেই সম্ভব হতে পারে। সেই সঙ্গে তফসিলি হিন্দুদের মহাকল্যাণ সাধিত হবে। তাঁর মতে পাকিস্তান আন্দোলন ছিলো তৎকালীন ভারত বর্ষের উপেক্ষিত, শোষিত, নির্যাতিত শ্রেণীর অন্তরের বিদ্রোহাত্মক

অভিব্যক্তি অস্তিত্ব রক্ষার রাজনৈতিক সংগ্রাম।

মাওলানা ভাসানী ছিলেন লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের বাঁচার সংগ্রামের পথ প্রদর্শক। তাঁর বিরাট বিরাট সম্মেলন মহা সম্মেলন আহবান এবং সুপরিচালনার ক্ষমতা ছিলো অসাধারণ। এসব সম্মেলনের মধ্যে সিরাজগঞ্জের কাওয়া খোলা ময়দানে তিনদিনব্যাপী বঙ্গ আসাম প্রজা সম্মেলন। বাংলা ১৩১৮ সালের বঙ্গ আসাম মুসলিম সম্মেলন, ১৯৩৭ সালের কামরুপ জেলার বড়পেটায় ঐতিহাসিক মুসলিম লীগ সম্মেলন উল্লেখযোগ্য, এসব সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি রাজনীতিকে নিয়ে গেছেন শহর থেকে বহুদূরের গ্রাম-গঞ্জের কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের ঘরে ঘরে।

পরবর্তীতে আসাম সরকার লাইন প্রথা প্রবর্তন করে বাঙ্গালী মুসলমানদের আসাম থেকে তাড়ানোর অভিযান আরম্ভ করলো। যা এদেশে বাঙ্গাল খেদাও আন্দোলন নামে পরিচিত। এতে বহু বাঙ্গালী মুসলমানের ঘর-বাড়ী সহায় সম্পদ হাতী দ্বারা মিসমার করে দিলো। বস্তিতে আগুন লাগিয়ে বিনাস করে দিলো। এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাওলানা দশ বছর সংগ্রাম করেছেন। কারাবরণ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ১৯৪৮ সালে ভারতের কারাগার থেকে বের হয়ে আসাম সরকারের নির্দেশে আসাম ছেড়ে মাওলানাকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসতে হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বার বার বলেছেন জোতদার, জমিদার, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী আর মজুতদাররা যদি মনে করে যে পাকিস্তানে অবাধ রাজত্ব কায়েম হবে তবে তারা ভুল করবে। কারণ এমন পাকিস্তান আমি চাইনা। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেলো ধীরে ধীরে এ যেনো তাদেরই রাজত্ব হয়ে গেলো। মিঃ জিন্নাহর ঘোষণার সূত্র ধরে প্রতিবাদে এগিয়ে গেলেন মাওলানা। ব্যর্থ হয়ে মুসলিম লীগের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে নিজেই ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় সফরে আসলে মাওলানা কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করার লক্ষ্যে ঢাকার রাজপথে এক বিশাল ভূখা মিছিল পরিচালনা করেন। সরকার জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে মাওলানা ভাসানীকে কারারুদ্ধ করলেন। ১৯৫০ সালে মাওলানা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় মাওলানাকে মুক্তি দেওয়া হলো।

মাওলানার মুক্তির পরই ঢাকায় আওয়ামী মুসলীম লীগের ওয়ার্ড কমিটি গঠনের প্রচেষ্টা চললো। ঢাকা তখন সাতটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। ৭নং ওয়ার্ডের কমিটি গঠন কল্পে চকবাজারস্থিত হোটেল "আল হামরা" বর্তমানে চক বোর্ডিং নামে পরিচিত, সে

সময় এ হোটেলটি ঢাকায় অভিজাত হোটেল হিসেবেই পরিচিত ছিলো। হোটেল কক্ষটি প্রৌঢ়, যুবা ও তরুণদের দ্বারা পরিপূর্ণ। সে সময় ঢাকার রাজনৈতিক অঙ্গনে বয়সে তরুণ হলেও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমি সুপরিচিত। সভার কাজ আরম্ভ হলো। বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা মুসলিম লীগের আদর্শ চ্যুতির কথা ব্যাখ্যা করে অনেক নেতা উপনেতা বক্তব্য রাখলেন। এখন কমিটি গঠনের পালা। প্রথমে সভাপতি পদে নির্বাচন। কারো মুখে শব্দ নেই একে অপরের দিকে চাইছে। বুঝলাম মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের গ্রেফতার আর জেলজুলুমের কথা ভেবে কেউ এগিয়ে আসছে না। হঠাৎ কতিপয় প্রবীণ ব্যক্তি আমার নাম প্রস্তাব করে বসলেন। আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হলাম। প্রভাবশালী প্রবীণ, যুবা রাজনৈতিক কর্মী থাকা সত্ত্বেও আমার নাম কেন প্রস্তাব করলো! বললাম আমার বয়েস মাত্র ২২ বছর। সভাপতি পদে আমাকে মানায় না, আমাকে কোন ছোট দায়িত্ব দিন। কিন্তু কেউ বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে চাইছে না। এবার সমবেতভাবে আমাকে চাপ প্রদান করায় অবশেষে আমাকেই সভাপতির পদ গ্রহণ করতে হলো। অন্যান্য পদগুলো প্রবীণ নবীনে পরিপূর্ণ করা হলো। তারপর হতে নব উদ্যমে বিরোধী রাজনৈতিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বিভিন্ন স্থানে ঢাকা নগর দলের সেক্রেটারী গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেবের সাথী হিসেবে সভা সমিতি করে যাচ্ছি। প্রত্যেক সভাতেই নেতৃবর্গ অঙ্গীকার করছে একক নীতিতে আমরা অটল থাকবো। দশবছর অপেক্ষা করতে হলেও করবো তবুও নীতি ভঙ্গ করে ক্ষমতায় যাবো না। সরকার রাজনৈতিক গতি ধারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার নির্বাচন ঘোষণা করলেন। ইতিমধ্যে আওয়ামী মুসলীম লীগ রাজনৈতিক সুবিধে লাভের জন্য মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ হয়েছে।

বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা একত্রিভূত হয়ে যুক্ত ফ্রণ্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ এর জন্য বৈঠকের পর বৈঠকে বসছে। আমি নীতিগতভাবে যুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের বিপক্ষে। তখনও যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হয়নি। এ বিষয়ে ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে দলের পক্ষ হতে সভা ডাকা হলো। তখন সাধারণতঃ ঢাকার বার লাইব্রেরীতেই রাজনৈতিক সভা সমিতি হতো বেশী। সন্ধ্যার পর প্রবীণ রাজনৈতিক নেতারা মঞ্চে উপবিষ্ট হলেন। একের পর এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে চলছেন। এক সময় ওয়ার্ড সভাপতি হিসেবে আমারও ডাক পড়লো, আমি কোনরূপ ভঙ্গিমা না করে আমার বক্তব্যের একস্থানে বললাম 'আপনারা অনেকেই মৌলভী বাজারে বাজার করতে যান। (তখন মৌলভী বাজারই ছিলো ঢাকার অভিজাত ও প্রধান বাজার) কসাই পট্টি

গেলে দেখে থাকবেন প্রত্যেক দোকানের নিকট কতক কুকুর একে অপরের গাঁ লাগিয়ে অত্যন্ত মিলে মিশে মাংসের দিকে তাকিয়ে আছে। খরিদ্দার এলে মাংস কাটার সময় অখাদ্য মাংস পিণ্ড কসাই যখন নীচে ছুড়ে ফেলে তখন একে অপরের সঙ্গে লড়াই এ অবতীর্ণ হয়। যুক্তফ্রণ্টের অবস্থাও তদ্রুপ হবে, কারণ আমাদের রাজনীতির মূলনীতি ও উদ্দেশ্য এক নয়। মাত্র কদিন পূর্বে জনস্বার্থ বিরোধী কাজের জন্য যাদের মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে তারাও এদলে ঠাই পাচ্ছে' এ কথাটুকু শেষ করার পূর্বেই মার মার করে আমার উপর কিছু কর্মী ঝাঁপিয়ে পড়লো, অবস্থা বেগতিক দেখে মঞ্চের নেতারা আমাকে টেবিলের নীচে দিয়ে কোন প্রকারে রাস্তায় বের করে নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবার জন্যে কর্মী দিয়ে আমাকে বংশালে পৌছে দেওয়া হলো। সেখান হতে মহল্লায় এসে চৌরাস্তার লাইট পোষ্টের নিকট দাঁড়িয়ে আমার কিছু কর্মীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করছিলাম। রাত প্রায় বারোটা বাজে। আমাদের মহল্লার বদর উদ্দিন আহম্মেদ সে সময় বাসায় যাচ্ছিলো। আমাকে দেখেই বললো, তুই সভাতে অবমাননাকর কথা বলছিস তজ্জন্য তোঁকে দল থেকে বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাল সকালেই খবরের কাগজে দেখবি। কথাটা শুনে বললাম ওরা আমাকে বহিস্কার করার পূর্বে আমি আমার নীতির স্বপক্ষে পদ ত্যাগ করবো। একথা বলেই বাসায় যেয়ে পদত্যাগ পত্র লিখে রওয়ানা হলাম, প্রথমে দৈনিক আজাদ-এ, আজাদের কর্মচারীগণ আমার পদত্যাগ পত্র ছাপতে বারণ করলো। তাদের কথা বার্তায় বুঝলাম দৈনিক আজাদ মুসলিম লীগের মুখপত্র হলে কি হবে কর্মচারীদের প্রায় সকলেই বিরোধী রাজনীতির পক্ষে। অগত্যা এতরাতে মৌলানা আকরাম খাঁর শরনাপন্ন হই। তিনি পত্রটি ছাপার নির্দেশ দিলেন। তার পর দৈনিক সংবাদে গেলাম। পর দিবস আমার পদত্যাগ পত্র ছাপানো হয়েছে দেখলাম। কিন্তু আমার বহিস্কারাদেশ কোন পত্রিকায় দেখলাম না। নগর আওয়ামী লীগের কর্মকর্তারা আমাকে পদত্যাগ পত্রের জন্য দোষারোপ করলো। বললাম আপনারা আমাকে বহিস্কার করছেন, তাই নিজেই পদত্যাগ করলাম, তারা জানালেন এ রকম কথা সভায় উঠেছিলো কিন্তু তোমাকে বহিস্কার করা হয়নি। আমাকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের জন্য বলা হলো। আমি সিদ্ধান্তে অটল থেকে রাজনীতি থেকে কিছু দিন বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। এরূপ বানোয়াট সংবাদ প্রদানের মধ্যেও কুটকৌশল ছিলো। যাক সে কথা, যুক্তফ্রণ্ট বিপুল ভোটে বিপুল সংখ্যক আসনে জয়ী হলো। মাওলানাও টাঙ্গাইল থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট সরকারের নীতি ও কর্ম পন্থার সাথে অল্প দিনের মধ্যেই মত বিরোধ দেখা দিলো মাওলানা

সংসদ সদস্য পদে ইস্তেফাদান এবং সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেন। কিছু দিনের মধ্যে সন্তোষে দলের কাউন্সিল সভা আহবান করেন। তার রাজনৈতিক জীবনে এটা ছিলো এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পরবর্তীতে এনিয়ে আওয়ামী লীগে কোন্দল আরম্ভ হয়। অগত্যা ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে মাওলানা ঢাকায় রূপ মহল সিনেমা হলে গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন আহবান করলেন। আওয়ামী লীগের সমর্থকবৃন্দ এ সম্মেলনকে ব্যাহত করার চেষ্টা করলে মাওলানাসহ বেশ কিছু কর্মী নাজেহাল হন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলন হলো এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি তথা ন্যাপ নামে মাওলানার নেতৃত্বে একটি নূতন রাজনৈতিক দলের প্রকাশ ঘটলো। প্রকৃত পক্ষে তখন থেকেই শুরু হয়েছিলো মাওলানার রাজনীতির বিপ্লবী অধ্যায়। তবে অনেকেই মৌলানাকে মনে করতো কমিউনিষ্ট, নাস্তিক, এসব প্রচারের জবাবে মাওলানা ভাসানী মাঝে মধ্যে ধর্ম সভা, আলেম সম্মেলন, ইমাম সম্মেলন, ওরশ ইত্যাদি করে ধর্মের প্রতি যে তিনি আস্থাশীল তা দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিতেন।

১৯৫৯ সালে মাওলানা গণচীন সফরকালে চীনের মহান নেতা মাওসেতুং-এর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান। ঢাকায় এসে তিনি ঘোষণা দেন যে, এখন হতে আমি কৃষক, মজুর, জোলা, কামার, কুমার প্রভৃতি মেহনতি মানুষ নিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করবো। প্রত্যক্ষ বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবো। অবশ্য এ ইচ্ছা তিনি বাস্তবে রূপ দিতে পারেন নি। তখন নির্বাচনের রাজনীতিতে আর বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে একজন ভালো এবং জ্ঞানী লোক চিন্তা ভাবনা করে যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাতে মানুষের মঙ্গল নিহিত থাকবে। বেশী লোকের তথা সংখ্যা গরিষ্ঠতার সিদ্ধান্ত যে, সব সময় ভালো সিদ্ধান্ত হবে এমন কোন কথা নেই। যে সিদ্ধান্ত অধিক লোকের মঙ্গল হবে সেটাই জাতির জন্য একান্ত দরকার বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

স্বদেশের স্বাধীনতা ও সর্বভৌমত্বের প্রশ্নে মাওলানা ছিলেন কট্টর জাতীয়তাবাদী। যতদিন পাকিস্তান ছিলো ততোদিন একজন অকপট দেশ প্রেমিক পাকিস্তানী ছিলেন। পাকিস্তানী হিসেবেই তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে ১৯৬৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে জনসভা ডাকেন। কারফিউ ভঙ্গ করে আইন শৃঙ্খলা পদদলিত করে প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করলে প্রেসিডেন্ট আইউব খাঁন ১৯৬৯ সালে ২৪শে মার্চ বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন এবং বাঙ্গালীদের দাবী মেনে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইয়াহিয়া খানের উপর ন্যস্ত করেন। ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচন ঘোষণা করে এক গোলটেবিল বৈঠকের

ব্যবস্থা করা হয়। মাওলানা ভালভাবেই বুঝেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে যে ঘৃণা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে তা সাময়িক নয়। একটা মারাত্মক ঘা অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে ফেলেছে। বিছিন্ন ব্যাতীত গত্যন্তর নেই, তাই তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেননি। এবং শেখ সাহেবকে বৈঠকে যোগ না দিতে পরামর্শ দিলেন। তখনই চূড়ান্ত বিছিন্নতা ঘোষণা তার ইচ্ছে ছিলো।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা দলীয় কর্মীদের গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম কমিটি গঠন করে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন এবং ১৯৭১ সালে ৯ই জানুয়ারী সন্তোষে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের সাংবিধানিক রূপরেখা প্রণয়ন করে পর দিবস পল্টন ময়দানের বিশাল সভায় ঘোষণা করলেন 'তোমরা সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।' অবশেষে ৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্য রাত্রে পাক সামরিক বাহিনীর সর্বাত্মক হামলা শুরুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিছিন্নতার সংগ্রাম শুরু হলো। বিপ্লবী মুজিব গ্রেফতার হলেন। মাওলানা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিলেন। মাওলানাকে দিল্লিতে সুরক্ষিত অতিথিশালায় রাখা হলো। তাঁকে জানতে দেওয়া হয়নি যুদ্ধ কিভাবে হচ্ছে। যুদ্ধের যবনিকা শেষ হলে, স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের জানুয়ারী অতিথিশালা থেকে ছাড়া পেয়ে দেশের অবস্থা দেখে, বিভিন্ন বাহিনীর লুটপাটের কথা অবগত হয়ে বুঝতে পারলেন দেশের সার্বভৌমত্ব প্রায় শেষ পর্যায়ে। মাওলানা তড়িত পল্টন ময়দানে জনসভা করে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন ক্ষমতাশীন দলের বিভিন্ন বাহিনীর লুট পাট জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে। দাবী জানালেন ভারতীয় সৈন্য বাহিনী সরিয়ে নিয়ে সীমান্ত পাচার বন্ধ করতে। সেই সঙ্গে ভারতের গোপন উদ্দেশ্যকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে আবেগজড়িত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন পশ্চিম বাংলা, বাংলাদেশ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে বৃহত্তর বাংলা গঠন করার জন্যে। বৃহত্তর বাংলা গড়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত বাঙ্গালী জাতির বৃহত্তম মুক্তি ও প্রভুত কল্যাণ।

ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারার ভারতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি ৯৫ বছর বয়সেও চরম দুঃসাহসিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ফারাক্কা মিছিলের প্রস্তুতি দেখে বিশ্ব বিবেক নড়ে উঠলো, জাতিসংঘ জরুরী সভা আহবান করলো। এদিকে ১৯৭৬ সালের ১৬ই মে লক্ষ লক্ষ লোকের মিছিল মাওলানার নেতৃত্বে এগিয়ে চললো ফারাক্কার দিকে শেষ অবধি ভারত একটা চুক্তি করতে সম্মত হলো।

মাওলানার প্রতিষ্ঠিত ন্যাপ এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় তিনি দলের নেতৃত্ব পদ থেকে সরে দাড়াবার সিদ্ধান্ত দিয়ে একটি বিপ্লবী ক্যাডার বাহিনী তৈরি

করার মনস্থ করেন। মাওলানার জীবন সায়াহ্নে ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে সন্তোষে এক বিপ্লবী যুব সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে খোদায়ী খিদমতগার সংগঠনের উদ্বোধন করেন। এবং লিখিত ভাষন পাঠকালে এ সংগঠনের পটভূমিকা ও তার ৭৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের উত্থান পতনের আবেগময় বর্ণনা দান করেন। আহবান জানান 'সেবাই পরম ধর্ম।' এই নীতি বাক্য অনুশীলন করতে এবং আল্লাহর আদেশ নির্দেশ যারা মেনে চলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে আর যারা আল্লাহর দুশমন তাদেরকে নিজেদের দুশমন মনে করতে। তার এই শেষ ভাষন দিয়েছিলেন ১৩ই নভেম্বর ১৯৭৬ সালে সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দরবার হলে। এর চারদিন পর তথা ১৭ই নভেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি সেখানেই সমাহিত হয়ে আছেন।

গেণ্ডারিয়া ও এর আশে পাশে প্রচুর সুপুষ্ট আখ হতো। আখকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় গেণ্ডারী। ১৮৮৫ সাল হতে ভদ্র লোকেরা এখানে বসবাস শুরু করেন। কালক্রমে জায়গাটি আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়। কিছু দিন পূর্বেও এ এলাকার আশে পাশে আখের চাষ করা হতো। আখ ক্ষেত শহরাঞ্চলে পরিণত হলেও এর নাম গেণ্ডারিয়াই রয়ে গেছে। অবশ্য একটা বড় অংশ দীননাথ সেন রোডের অঙ্গীভূত হয়েছে। গেণ্ডারিয়া এলাকাকে আবাসিক এলাকা করার ব্যাপারে রায় সাহেব দীন নাথ সেন ও ঢাকা পৌর সভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান আনন্দ চন্দ্র রায় সহায়তা করেছেন।

রায় সাহেব দীন নাথ ছিলেন একজন স্কুল পরিদর্শক, অবশ্য প্রথম জীবনে স্কুল শিক্ষক ছিলেন। তার নিজ বাড়ীতেই ১৮৬৩ সালে ঢাকা ব্রক্ষ স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে স্কুল ভবনটি অর্থাভাবে বালিয়াদির জমিদার কিশোর লালের নিকট মালিকানা বদল হলে স্কুলটির নাম পালটিয়ে জগন্নাথ স্কুল রাখা হয়। অতঃপর প্রধান শিক্ষককে বরখাস্ত করে পুনঃ স্কুলটির নাম তার নামের সংগে মিলিয়ে কিশোরী লাল জুবিলি স্কুল করেন কিন্তু পরবর্তীতে শুধু জুবিলি স্কুল নামে পরিচিত হয়। ব্রক্ষ সমাজের তিনি ছিলেন একজন নেতা। সমাজ সংস্কারের সাথে সাথে তিনি সমাজ সেবী হিসেবে সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এসব কর্মের জন্যে সরকার তাঁকে রায় সাহেব উপাধি দেন।

তিনি রজনীকুমার চৌধুরীর সহায়তায় ১৮৯৪ সালে গেণ্ডারিয়ার তৎকালীন জঙ্গলসমূহ পরিষ্কার করিয়ে ছিলেন। এর ফলে তথায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বসতি স্থাপন করেন। ১৮৮২ সালের গোড়ার দিকে দীন নাথ সেনের অনুরোধে গেণ্ডারিয়া

এলাকায় যত্র তত্র কবর দেওয়া ও শবদাহ্ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরে স্থানীয় ব্যবস্থা হিসেবে পৌর সভার প্রচেষ্টায় গেণ্ডারিয়া গোরস্থান স্থাপন করা হয়।

তিনি "ঢাকা প্রকাশ" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনা ও পরিচালনা করতেন। পত্রিকাটি বিংশ শতাব্দীর ষাটদশক পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিলো। অবশ্য তাঁর তিরোধামের পর অন্যান্য ব্রহ্ম সমাজের মধ্যবিত্ত চাকুরী জিবীগণ প্রকাশনার ভার নিয়েছিলেন। ঢাকায় "ঢাকা প্রকাশ" নামক পত্রিকার আবির্ভাব একটি অন্যন্য ঘটনা। কেননা তখন সমগ্র বাংলার সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ভূমি কলিকাতায় ছিলো। ঢাকায় বিদ্যাশিক্ষা বিশেষ করে নারী শিক্ষার জন্যে জনমত গড়ে তুলতে বিরাট অবদান রেখেছে। তৎকালীন সময়ে বিত্তশালীরা স্বীয় পুত্র কন্যা বিবাহে রাশি রাশি টাকা ব্যয় করতেন। পত্রিকা তাদের কঠোর সমালোচনা করতো, অন্য দিকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যারা সামান্যতম সাহায্য করতো তাদের বিপুল প্রশংসা করতো। বাবু দীন নাথ সেন ছিলেন মানিকগঞ্জ-এর একটি গ্রামের অধিবাসী। তাঁরই নামানুসারে দীন নাথ সেন রোড। আর তাঁর একান্ত সহযোগী বাবু রজনী কুমার চৌধুরীর নামানুসারে হয়েছে রজনী চৌধুরী রোড।

পর্তুগীজ পরিব্রাজক ম্যানরিকের বিবরণে ১৬৪০ সালেও ফুলবাড়িয়া নামটির উল্লেখ রয়েছে। ১৭৯০ সালের কিছু কাগজপত্রেও আমরা "ফুলবাড়িয়া" ও "ফুল মণ্ডি" এ দুটো নামই পাই। হতে পারে, ফুলবাড়িয়া ও ফুলমণ্ডি গান্ধি গলির আতর প্রস্তুত কারকদের ফুল সরবরাহ দিতো। সাবেক ফুলবাড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন একটি মাজার রয়েছে। এটা নাকি ফুল সাহেবের মাজার। ফুল শাহ্ কখন কোন্ আমলে এখানে এসে তাঁর আস্তানা গেড়েছিলেন তা আজও জানা যায়নি। পাক আমলের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ঢাকার রেলওয়ে স্টেশনটি ফুলবাড়িয়ায় অবস্থিত ছিলো। উল্লেখ্য যে ১৮৮৫ সালে জানুয়ারী মাসে ঢাকায় রেল লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন শুধুমাত্র ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ রেল চলাচল করতো। ১৮৮৬ সালের আগস্টে ঢাকা থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত হয়। তবে ঐ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গেশ্বরের (লাট সাহেব) ময়মনসিংহ গমন উপলক্ষে ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথ চালু করা হয় এভাবে ধীরে ধীরে ঢাকার সঙ্গে প্রদেশের রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। শত বর্ষ পূর্বে ঢাকা জেলায় মাত্র ৫২ মাইল লাইন ছিলো। পাক আমলে কমলাপুরে ঢাকা রেল স্টেশন স্থানান্তরিত হলে এখানে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ঢাকা নগরীর কয়েকটি স্থানে পৌর কর্তৃপক্ষ বাসটার্মিনাল স্থাপন করলেও মিনিবাস ফুলবাড়িয়া হতে বিভিন্ন জেলা উপজেলায় গমনাগমন করে থাকে।

ঢাকার অতি প্রাচীন মহল্লা নারিন্দার পূর্বনাম নারায়ণদিয়া। নারায়ণের দীপ বা নারায়ণ (হিন্দুদের) প্রদত্ত দীপ। এটা ছিলো মোঘলদের আগমনের পূর্বে দেয়া নাম। সপ্তদশ দশকের প্রথম দিকে নারিন্দা এলাকা বাহাদুর শাহ্ পার্ক পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিলো। ১৭৩৫ সালের দিকে যখন এখানে ইংরেজদের ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়, তখন নারয়ণ দিয়ার নাম পরিবর্তন করে এর নামকরণ করা হয়েছে নারিন্দা। অনেকে বলে থাকেন নারিন্দা অঞ্চলটি নারায়ণদিয়ার অপভ্রংশ নাম।

ঢাকা শহরে অবস্থিত প্রাচীন স্মৃতি বহনকারী ইমারতগুলোর মধ্যে নারিন্দার বিনাত বিবির মসজিদই সম্ভবত সব চেয়ে পুরনো। ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ইসলাম খাঁর আগমনের দেড়শ বছর আগে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ যখন বাংলার সুলতান, সেই সময় এটি নির্মিত হয়ে ছিলো। এই ক্ষুদ্র এবং মজবুত ইমারতটির মধ্যে স্থাপত্য শিল্পের তেমন কোন নিদর্শন না থাকলেও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটির সমধিক গুরুত্ব রয়েছে। বিনাত বিবির পিতা মার হামাট একজন তুর্কী ব্যবসায়ী ছিলেন।

অন্য আরেক সূত্রে বর্ণিত আছে তুর্কী ব্যবসায়ী মারহামাট কাঠের জাহাজে করে ব্যবসা উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসেন। তখন তার কন্যা বিনাত বিবি মারা যাওয়ায় তাকে সেখানে কবর দেওয়া হয়। তৎপিতা কন্যার স্মৃতিস্বরূপ মসজিদটি নির্মাণ করেন ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে।

মসজিদের উত্তর দিকে বিনাত বিবির কবরটি অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে, এতে মনে হয় মসজিদ নির্মাণের পরই বিনাত বিবি ইন্তেকাল করেন। অনুমান করা হয় তুর্কী আফগান, পাঠান ও তুরানীদের বসবাস ছিলো অত্র অঞ্চলে দোলাই খালের পার ধরে।

এক সময় নারিন্দাতে ঝিনুক দ্বারা বুতাম, চেইন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হতো। এগুলো সারা দেশে খ্যাতি ছিলো। তাছাড়া নারিন্দা থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত এক কালে বহু ধোপা খোলা ছিলো। কুপের জল গুণ বিশিষ্ট ছিলো বিধায় কাপড় ধৌত কাজ খুব ভাল এবং শুভ্র হতো। এবং ঢাকার অন্যান্য এলাকা হতে পানির স্বাদ ছিলো আলাদা।

কোম্পানী আমলে ইস্কাটন এলাকায় কিছু সংখ্যক স্কটল্যাণ্ডবাসী থাকতেন। তারা সেখানে একটি গির্জা নির্মাণ করান। সম্ভবত এখানে স্কটরা বাস করতেন বলেই এ এলাকাটি স্কটল্যাণ্ড এবং পরবর্তীকালে স্কটল্যাণ্ড শব্দটি অপভ্রংশ হয়ে ইস্কাটন হয়ে গেছে।

নিউ ইস্কাটন রোডে একটি মসজিদ রয়েছে নূরনগর জামে মসজিদ নামে। নূরনগর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ

পার্লামেণ্টারীয়ান মরহুম নূরুল আমীনের নামানুসারে। যদিও নামটি ঢাকা পৌর কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেননি তবুও স্থানীয় অধিবাসীরা নিউ ইস্কাটনের ছোট্ট অংশের নাম নূরনগর বলে থাকেন। তার মৃত্যুর পর পাকিস্তান সরকার তার মরদেহ পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নাহর স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গনে সমাহিত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। অন্যদিকে ভাষা আন্দোলনকালে ঢাকায় বাংলা ভাষার দাবীতে মিছিলে গুলী চালাবার জন্যে দেশবাসী তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে আসছেন।

১৯০৫ সালে সাবেক পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেঃ গভর্ণর এর জন্যে যে বাস ভবন নির্মিত হয়েছিলো যাকে বর্তমানে হাইকোর্ট (পুরাতন ভবন) বলা হয়ে থাকে। সেটা গভর্ণর বাহাদুর পছন্দ না করায় কিছুদিনের জন্যে সে ভবনটি একটি ইণ্টার মিডিয়েট কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো, যার ফলে হাইকোর্টের মূল ফটকের দক্ষিণে এবং কার্জন হলের পূর্ব পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে তার নামকরণ করা হয় কলেজ রোড, আজও সেটি কলেজ রোড নামেই পরিচিত।

রমনার দক্ষিণ প্রান্তে যেখানে তিন নেতার মাজার রয়েছে সেখান হতে বর্তমান সোনারগাঁ রোড-স্যার নাজিমুদ্দিন রোড সংযোগস্থল পর্যন্ত রাস্তাটির নাম আজও দেওয়ান মুসা খানের নামানুসারে দেওয়ান বাজার রোড, এক সময় দেওয়ান বাজার রোড চাঁদখাঁর পুল তথা স্যার নাজিমুদ্দিন রোড পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিলো। দেওয়ান মুসা খাঁ মসনদ-ই-আলা দেওয়ান ঈসা খাঁর পুত্র ছিলেন। এ রাস্তার ধারে কার্জন হলের নিকটে দেওয়ান মুসার নামানুসারে একটি মসজিদ রয়েছে এবং তার সামান্য দূরেই তার কবর গাহ রয়েছে।

অন্য সূত্রে বলা হয়েছে এ এলাকায় মোঘল শাসনামলে শেষের দিকে রাজস্ব দফতরের প্রধান দেওয়ানের সরকারী দফতর ও বাস ভবন ছিলো। অনেকের মতে দেওয়ানের নামানুসারেই অঞ্চলটি দেওয়ান বাজার নামে পরিচিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র আন্তরিক প্রচেষ্টায় বঙ্গ ভঙ্গ হয়ে আসামকে নিয়ে যে আলাদা প্রদেশ মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নকল্পে গঠিত হয়েছিলো সেই নুতন প্রদেশের সচিবালয় হিসেবে নির্মিত হয়েছিলো আজকের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। সেই সচিবালয়ের নামানুসারে আজও সড়ক পথটি সরকারী কাগজ পত্রে ওল্ড সেক্রেটারীয়েট রোড নামে উল্লেখিত রয়েছে। এ রোডেই মুসলিম শাসনামলের শেষ দিকের নবাবদের বাসভবন যাহা নিমতলি ভবন নামে পরিচিত। তার ধ্বংসাবশেষ বার দুয়ারী আজও

রয়েছে। সে এলাকাটি নিমতলি বলে লোকে পরিচিতি দিয়ে থাকে। সেই নিমতলি ভবনের একটি অংশে ঢাকা যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, অন্য একটি অংশে আজও এশিয়াটিক সোসাটির অফিস ভবন বিদ্যমান। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উইলিয়াম বোন।

এই রোডের পূর্বদিকে তথা রেলওয়ে হাসপাতালের পশ্চিম দিকে বর্তমান সম্প্রসারিত ফজলুল হক হল যা পূর্বে পি ডাবলিউ ডি সিটি ডিভিশন ছিলো। সেখানে ঢাকার তথা পূর্ব বঙ্গের সর্ব বৃহৎ জমিদার মীর আশ্রাফ আলীর বাস ভবন ছিলো। তিনি ইরানের সিরাজ প্রদেশ থেকে ভারত আগমন করে প্রথমে এলাহাবাদ পরে ঢাকায় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এবং একের পর এক জমিদারী ক্রয় করে তার আয়তন করেছিলেন প্রায় তিন লক্ষ বিঘা। এসব জমিদারী সাধারণতঃ ঢাকা, কুমিল্লা ও হায়বত নগরেই ছিলো বেশী। জমিদারী থেকে তার বার্ষিক আয় ছিলো তৎকালীন সময়ে আড়াই লক্ষ টাকার উপরে।

১৮২৪ সালে যখন পরিব্রাজক বিশপহেবার ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন গির্জার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে আসেন তখন তিনি ঢাকার সব চেয়ে অভিজাত ব্যক্তি এই মীর আশ্রাফ আলীর সঙ্গে তার নিমতলী তথা ওল্ড সেক্রেটারীয়েট রোডস্থিত বাস ভবনে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তার নামকরা বই নেরেটিভ অব এ জার্নীতে সৈয়দ আশ্রাফ আলীকে পূর্ববাংলার একজন মহৎ ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সে সাক্ষাৎকারের সময় মীর সাহেবের পুত্রদ্বয় সৈয়দ আলী মেহেদি খান ও সৈয়দ মেহেদী আলী খাঁন কথাচ্ছলে হেবার সাহেবকে বলেছিলেন কত অগুরুত্বপূর্ণ লোককে সরকার নবাব বা নানা উপাধি দান করছেন অথচ আমাদেরকে উপাধি দেওয়া হচ্ছে না। মনে হয় বিশপ হেবারের শুপারিশেই অথবা মীর আশ্রাফের পুত্রগণ বার্মা যুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করেছিলেন বলে পরবর্তীতে মীর আশ্রাফ আলীর পরিবারবর্গকে নবাব উপাধি সরকার প্রদান করেছেন। যা হোক বিশপ হেবার মীর আশ্রাফ আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিমতলির বার দুয়ারীতে তৎকালীন নবাবের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। মীর আশ্রাফ ১৮২৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার কবর গাহ কার্জন হল প্রাঙ্গনে সমাহিত আছে। পূর্বেই বলেছি মীর আশ্রাফ আলী নিজেদের অত্যন্ত অভিজাত শ্রেণীর মনে করতেন। কথিত আছে তথকালীন ঢাকার নব্য জমিদার খাজা আলিম উল্লাহ তার পুত্রের সঙ্গে মীর আশ্রাফের কন্যার বিবাহের পয়গাম পাঠালে তিনি এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে "যার শরীর থেকে এখনও

চামড়া ও লবণাক্ত পসিনার (ঘাম) গন্ধ যায়নি সে কোন সাহসে আমার মেয়ের জন্য পয়গাম পাঠিয়েছে"।

কিন্তু আল্লাহর রাব্বুল আলামিন কোন অহংকার পছন্দ করেন না। পরবর্তীতে কোম্পানী সরকার কর্তৃক সুর্যাস্ত আইন জারীর ফলে কর অনাদায়ের জন্য মীর আশ্রাফ আলীর সমগ্র জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়ে নিলাম হয়ে যায়। ফলে মীর সাহেবের অধস্তন পুরুষগণ জমিদারী হারিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েন। আশ্রাফ আলীর প্রো-পৌত্র নবাব সৈয়দ মহম্মদ হোসেন ওরফে সৈয়দ মহম্মদ আজাদ। আজাদ তার ছদ্ম নাম ছিলো। তিনি ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তার রচিত কাব্য ও লিখা আজাদ নাম পরিচয়ে প্রকাশ ও পঠিত হতো। তিনি হাকিম হাবিবুর রহমানের মজলিসেও কবিতা পাঠ করতেন। পূর্বেই বলেছি তাদের জমিদারী চলে যাওয়ায় দারিদ্রতা গ্রাস করলেও অভিজাত্য পূর্বের ন্যায় বজায় ছিলো।

এখানে অর্থনৈতিক উন্নতির কোন পথ না দেখে নবাব মহম্মদ হোসেন কলিকাতা চলে যান এবং একটি সম্মানজনক পেশার খোঁজ করতে থাকেন। এ সময় নবাব আব্দুল লতিফ তাকে নিজের কাছে নিয়ে মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেন এবং পাটনার ডেপুটি রেজিষ্ট্রারের চাকুরী দানের ব্যবস্থা করেন, পরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। নবাব মঃ হোসেনের এই স্ত্রী মারা গেলে স্ত্রীর বিধবা বোনকে পুনঃ বিবাহ করেন। তার গর্ভে তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কন্যা খুরশিদ তালাত বেগমকে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক এবং ২য় কন্যা সহর বানুকে হোসেন সোহ্‌রাওয়ার্দীর মামা স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তার এক পুত্র সৈয়দ আলী আহম্মদ ভাল ক্রীড়াবিদ ছিলেন। পরবর্তীতে ঢাকার ডেপুটি পুলিশ সুপার নিয়োজিত হয়েছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সাঈদ হোসেন খ্যাতনামা জার্নালিজম, ঝানু পলেটিশিয়ান ও কট্টর জাতীয়তাবাদী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি আলীগরে লেখা পড়া করেন। পরবর্তীতে ১৯০৯ সালে লণ্ডনে চলে যান। তিনি লিঙ্কন ইন এ ছয় বছর অধ্যায়ন করেও আইনের ডিগ্রী নেননি। কারণ তিনি ব্যারিষ্টার হওয়ার চাইতে জ্ঞান অর্জনের পক্ষপাতি বেশী ছিলেন। তার আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ ছিলো জার্নালিজম পেশা। ইংল্যাণ্ডে তিনি টাইমস ও অন্যান্য প্রখ্যাত পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক লেখা পড়ায় খুব বেশী আগ্রহী ছিলেন না। দিনের অধিকাংশ সময় বিছানায় কম্বল গায়ে দিয়ে কাটাতেন। রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে লিখতে শুরু করতেন যা

কেহই জানতেন না। বাল্য জীবনে ছাত্র অবস্থায় তিনি ইংরেজদের সম্পর্কে স্টেটম্যান ও অন্যান্য পত্রিকায় লিখতেন। '

দি বোম্বে ক্রনিক্যাল পত্রিকায় খ্যাতনামা সম্পাদক, বি, জি, হার্নিম্যান এর সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্যে ১৯১৬ সালে তাকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানালে তিনি এসে সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। পত্রিকাটির মালিক যদিও একজন আইরিশ ভদ্র লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। পত্রিকাটি কংগ্রেসের মতামত তুলে ধরতেন। এ সময় (১৯১১) এলাহাবাদ হতে কংগ্রেসের পক্ষে কোন দৈনিক পত্রিকা বের হতো না।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পিতা মতিলাল নেহেরু এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন নামজাদা আইনজীবি এবং কংগ্রেসের একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি কাশ্মীরের একজন খাটি ব্রাহ্মণ পরিবারের হলেও ধর্মের বাধ্য-বাধকতায় তেমন আবদ্ধ ছিলেন না। বৃটিশ সংস্পর্শে এসে অতি আধুনিক চালচলনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন।

তিনি সংস্কৃতির একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তি হয়েও ইংরেজদের মত জীবন যাপন ও পোষাক পরিচ্ছদ পরতেন, তার কাপড় চোপর এলাহাবাদ থেকে প্যারিসে ধোলাইর জন্যে পাঠাতেন। এক কথায় তিনি রাজ পুত্রের মত চলতেন। তার মনটাও ছিলো সম্পূর্ণ উদার। মতিলাল নেহেরু কংগ্রেসের স্বপক্ষে একটি দৈনিক খবরের কাগজ প্রকাশের জন্য অতি সুন্দর চেহারার যুবক সাঈদ হোসেনকে এলাহাবাদে আনান এবং তার পত্রিকা ইণ্ডিপেডেন্ট এর সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করেন। কিছু দিন সৈয়দ হোসেন মতিলাল নেহেরুর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবেও কাজ করেছেন। মতিলাল নেহেরুর জ্যৈষ্ঠ কন্যা বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানেই প্রথম পরিচয় মেলামেশা, তারপর প্রেম অতঃপর পরিণয়। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে অবশ্য সৈয়দ হোসেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে বাবার অনুমতির কথা বলেছিলেন। উদার পণ্ডিত পিতা কন্যার সম্মতি থাকায় কোন আপত্তি করেননি। একটি সূত্রে জানা যায় তাদের বিবাহ হয়েছিলো সৈয়দ হোসেনের বাংলোতে এবং বিবাহ সম্পাদন করেছিলেন মৌলানা রশিদ বোখারী, বিবাহের পূর্বে মিস লক্ষ্মী মুসলমান হয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু বাদ সাধলেন জওহরলাল নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, সে কারণে বেশী দিন সেখানে থাকতে পারলেন না।

বিবাহের পরই পারিবারিক রেষা রেষি আরম্ভ হয় এক পর্যায়ে তারা দু'জন কয়েক

দিনের জন্য উধাও হয়ে যান। পুনরায় ফিরে এলে শত্রু-বন্ধু অনেকেই সৈয়দ হোসেনকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ ও চাপ প্রদান করতে থাকেন। অন্য দিকে শোনা যায় বিজয় লক্ষ্মীকে এক আশ্রমে বেশ কিছু দিন রেখে তার মত পাল্টানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষ পর্যন্ত বিবাহটি মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপে বাতিল করা হয়। অবশেষে ১৯২০ সালে সৈয়দ হোসেনকে খেলাফত আন্দোলনের তিন সদস্য বিশিষ্ট ডেলিগেটের সদস্য করে ইংল্যাণ্ড পাঠানো হয়। যাতে তিনি ভারতে ফিরে না আসতে পারেন তজ্জন্য নানা ফন্দি ফিকির চলতে থাকে ভারতের খ্যাতনামা নেতৃবর্গের মধ্যে। প্রতিনিধি দলের কাজ শেষ হবার পর তাকে ব্রিটিশ কমিটি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। এবং এই কমিটির মুখপাত্র "ইণ্ডিয়া"-এর সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯২১ সালে তিনি ইংল্যাণ্ড হতে আমেরিকা গমন করে সেখানে সেকেণ্ড হোম হিসেবে ২৫ বছর তথা ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত থাকেন এর মধ্যে তিনি "দি নিউ ওরিয়েন্ট" পত্রিকার সম্পাদনা করেন এবং সাউদান ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিষ্ট্রি অব সিভিলাইজেশনের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। এখানেই তাকে অনারারী ডক্টরেট সম্মানে ভূষিত করা হয় বলে জানা যায়। আমেরিকায় অবস্থানকালে সৈয়দ হোসেন একটি ভারতীয় গ্রুপের সঙ্গে থাকতেন। গ্রুপটি ভারতীয় স্বাধীনতার স্বপক্ষে কাজ করতো।

ওদিকে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মনমানসিকতার পরিবর্তন এনে অনত্র বিবাহ দান করা হয়। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সে স্বামীও বেশী দিন তার ভাগ্য বিধাতা হয়ে থাকতে পারেনি। ১৯৪৫ সালে বিজয় লক্ষ্মী ওরফে স্বরুপ লক্ষ্মীর ২য় স্বামী যখন জীবিত ছিলনা তখন সে আমেরিকায় চলে যায় এবং বেশ সময় সেখানে অতিবাহিত করেন। তখন মিসেস বিজয় লক্ষ্মীর বয়স ৪৫ এ পদার্পন করেছে। এ সময় (১৯৪৬) আমেরিকায় বসবাসরত মহাত্মা গান্ধী কয়েকজন ভারতীয়দের নিকট থেকে অভিযোগ পান যে সৈয়দ হোসেন বিজয় লক্ষ্মীর সঙ্গে মেলামেশা করছে। আসলেও তাদের দু'জনের মধ্যে পুনঃ সম্পর্ক গড়ার সুযোগ হয়। অবশেষে ১৯৪৬ সালেই বিজয় লক্ষ্মী ভারতে চলে আসেন। আমেরিকায় ভারতীয়দের মধ্যে এ ধরনের কথা-বার্তা হওয়ায় বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত একদিন তড়িঘড়ি করে ওয়াশিংটন প্রেস ক্লাবে যান এবং সেখানে ঘোষণা দেন যে ধর্মের কোন পার্থক্য নাই। সে এ ধরনের কোন দিন ছিলো না।

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে সৈয়দ হোসেন ওয়াশিংটন ডি সি পোর্ট ল্যাণ্ড বিল্ডিং থেকে এক তার বার্তা প্রেরণ করেন পণ্ডিত নেহরুকে, তাতে

সৈয়দ হোসেন বলে ছিলেন যে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য কাজ করতে ভারতে আসার চিন্তা ভাবনা করছি। প্রয়োজনে মুসলিম জাতীয়তাবাদী হিসেবে কেন্দ্রীয় নির্বাচনে অংশ নেব। এ ব্যাপারে মূল্যবান মতামত জানাবেন আশা করি।

পণ্ডিত নেহেরু এই তারবার্তা পেয়ে কংগ্রেস নেতা আসফ আলীসহ কতিপয় নেতৃবর্গের সাথে আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করতেও ভুল করলেন না। তাদের সঙ্গে পরামর্শের পর, পণ্ডিত নেহেরু সৈয়দ হোসেনকে তার বার্তার জবাব প্রেরণ করলেন। তাতে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, তোমার নাম ভোটার তালিকায় নেই বলে আইনগত সমস্যা রয়েছে। সেজন্য তোমার কেন্দ্রীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। মিঃ গান্ধীর মতে আমেরিকা থেকেই তুমি ভাল কাজ করতে পার।

অবশেষে ১৯৪৭ সালে জানুয়ারী মাসে সৈয়দ হোসেন ভারতে ফিরে আসেন। তখন ভারতে সাম্প্রদায়িক অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর ধারণ করেছে। বিশেষ করে দিল্লীতে। পণ্ডিত নেহেরু তখন ১৭নং ইয়র্ক রোডে থাকতেন। সৈয়দ হোসেন দিল্লীর ইম্পিরিয়েল হোটেলে আস্তানা গাড়লেন। তিনি প্রত্যেক দিন ভোরে মিঃ নেহেরুর বাসভবনে রিমলেশ গ্লাস সংযুক্ত চশমা পরে আসতেন। ওদিকে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও লখনৌ থেকে দিল্লী চলে আসতে ভুল করলেন না। এবং অধিকাংশ সময় দিল্লীতেই অবস্থান করতে লাগলেন। বেশীরভাগ সময়ই সৈয়দ হোসেনের অবস্থানকৃত ইম্পিরিয়েল হোটেলে থাকা-উগ্র হিন্দু ও শিখদের মধ্যে জানাজানি হওয়ার ফলে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তারা তাদের চক্ষুশূল হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত সৈয়দ হোসেন ও বিজয় লক্ষ্মীর নিরাপত্তার ব্যবস্থায় পুলিশি তৎপরতা বেড়ে যায়। এই নাজুক পরিস্থিতি বেশী দিন থাকলো না। ভারত স্বাধীন হবার সাথে সাথে সৈয়দ হোসেনকে মিশরের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইতিপূর্বে ডঃ সৈয়দ হোসেন ১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য ভারতে ফিরে এসেছিলেন এবং লখণৌ মুসলিম লীগ অধিবেশনে বক্তৃতা দান ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বক্তৃতা দান করেন। এ সময় তিনি মাতৃভূমি ঢাকায়ও আসেন। তখন কার্জন হলে তিন দিনব্যাপী এক ঘণ্টা করে বিস্ময়কর এবং সারগর্ভ বক্তৃতা দান করে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। সভায় সলিমুল্লাহ হলের তৎকালীন প্রভোষ্ট ডঃ মাহমুদ হোসেন সভাপতিত্ব করছিলেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের পক্ষ হতে ডঃ সৈয়দ হোসেনকে মানপত্র দেওয়া হয়েছিলো। তাতে বলা হয়েছিলো আমরা সলিমউল্লাহ হল

ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে আপনার স্বেচ্ছা নির্বাসনের সতের বছর পর মাতৃভূমি এই ঢাকা শহর পরিদর্শনের জন্য অকৃত্রিম ও আন্তরিক স্বাগতম জানাই। ডঃ সৈয়দ হোসেনের মত এত সুন্দর বক্তৃতা শোনার সুযোগ অনেকেরই হয়নি। যিনি আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন সেই সৈয়দ হোসেনকে যখন বাংলায় রাখার জন্য জন্য শেরে বাংলা ফজলুল হক কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হতে বলেছিলেন তখন বাংলাদেশেরই কোন কোন মহল থেকে তার প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী নেই বলে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়েছিল। ফলে তাকে আর ধরে রাখা যায়নি।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে মিশরের রাষ্ট্রদূত ডঃ সৈয়দ হোসেন এবং রাশিয়ায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মিসেস বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত লখণৌ গভর্ণর হাউজের প্রাঙ্গনে টিব্বিবুয়া এবং টিব্বিবুয়া গোলাপ নামের দুটি ফুলের চারা গাছ রোপণ করেছিলেন বহু গণ্যমান্য সরকারী-বেসকারী ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে। এখানে অবশ্য প্রথম রোপণ করেছিলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু।

তার মৃত্যুর পর "ডঃ সৈয়দ হোসেন" নামে একখানা সংক্ষিপ্ত বই কলকাতার আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক জে, এন, চক্রবর্তীর সম্পাদনায় পি, ঘোষ এণ্ড কোম্পানী প্রকাশ করেন। তাতে ডঃ হোসেনের জীবনী, বক্তৃতা, এবং লেখা রয়েছে। রাশিয়াতে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত জনাব আসফ আলী এবং উড়িষ্যার গভর্ণর বইটির মুখবন্ধ লিখেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার একজন নির্ভিক যোদ্ধা সৈয়দ হোসেনের লেখা, বক্তৃতা যা বইটিতে রয়েছে তা পড়ে ইংরেজী ভাষা প্রিয় অনেক খুঁত খুতেদেরও মনে দাগ কাটে এবং সন্তুষ্টিদান করে।

সৈয়দ হোসেনকে পূর্ব ও পশ্চিমের একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা, লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে বিবেচনা করা হয় "হোয়াট প্রাইস টলেরেন্স" নামক তার বইটি সম্পর্কে এইচ, জি, ওয়েলস বলেন এটি সুস্পষ্ট ও অত্যন্ত চমৎকার বই। এ ধরনের মন্তব্য আরো নামকরা বুদ্ধিজীবিগণ করে গেছেন। ঢাকার গৌরব ডঃ হোসেন যেমন দেখতে সুশ্রী ছিলেন তেমনি তার বক্তৃতা ও লেখনীও অত্যন্ত সুন্দর সুশ্রী ছিলো।

মিশরে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সৈয়দ হোসেন কায়রোতে অবস্থানকালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণকল্পে বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত সেক্রেটারী জেনারেল গীর্জা শংকর বাজপাইকে নিউইয়র্কের পথে কায়রোতে যাত্রা বিরতির কথা প্রকাশ করলে বাজপাই প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে জানালেন তাঁদের সরাসরি নিউইয়র্ক চলে যেতে হবে। তা সত্বেও বিজয় লক্ষ্মী কায়রোতে যাত্রা বিরতির ব্যবস্থা করেন।

তখনকার প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার লোকেরা জানান যে এ বিরতি এয়ার ইণ্ডিয়া বিমানের যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ হয় যে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য কোন যাত্রীর যাত্রা বিরতি হয়নি।

ডঃ সৈয়দ হোসেন ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বল্পকালীন বিশ্রামের জন্য আপার ইজিপ্ট এ অবস্থান করছিলেন। শেফাউস হোটেলে ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে যখন তিনি ঘুম থেকে জাগেন তখনই তিনি অস্বস্থি বোধ করছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রীক পাপ্যায়ান হাসপাতালে চেক আপের জন্য যান। সেখানেই তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে হৃদ রোগে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে মিশরেই দাফন করা হয়। মিশর সরকার কায়রোর একটি সড়ক পথের নামকরণও তার নামানুসারে করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলন হতে ফেরার পথে কায়রোতে যাত্রা বিরতি করে কায়রোর ভারতীয় দূতাবাসের সদস্য কর্মচারীদের নিয়ে ১৫ মাইল মটরযোগে গিয়ে মুসলমানি আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তার বহু দিনের পুরাতন বন্ধু মিশরের প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডঃ সৈয়দ হোসেনের কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেছিলেন।

ফরিদাবাদ এলাকার নামের উৎস সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়নি। জনশ্রুতি আছে, শাহ্ ফরিদের নামানুসারে ফরিদাবাদ নামকরণ করা হয়েছে। সূত্রাপুর থানার কাছে শাহ্ ফরিদের মাজার রয়েছে। ১৯৩৯ সালে ফরিদাবাদ নাম বদল করে মনোরঞ্জন ব্যানার্জী রোড রাখা হয়। এই নামকরণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন পেশ করা হয়। এই আবেদনে বহু হিন্দুও স্বাক্ষর করেছিলেন। অভিযোগে বলা হয়েছিলো, ফরিদাবাদ নামের সাথে একটি আবেগ জড়িত আছে এবং বহু ঐতিহাসিক উপাখ্যানও এই নামের সাথে জড়িত। কর্তৃপক্ষ জনগণের আবেদন ও যুক্তি বিবেচনা করে এলাকাটির নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। অদ্যাবধি এলাকাটি ফরিদাবাদ নামেই পরিচিত হয়ে আসছে।

অপর এক ভাষ্যে জানা যায়, ইসলাম খাঁ চিশতির সঙ্গে তাঁর এক আত্মীয় ঢাকা এসেছিলেন। ঐ ব্যক্তির নাম ছিলো ফরিদ চিশতি। তাঁরই নামানুসারে ঐ এলাকার নাম হয় ফরিদাবাদ।

ফরিদাবাদে নওয়াব আলী শাহ্ নামে এক কামেল ব্যক্তি ছিলেন। ফরিদাবাদে তাঁর মাজার রয়েছে। কোন কাজে তাঁর কাছে গেলে তিনি পাচ হাজার টাকা দেয়ার জন্যে সওয়াল করে বসতেন।

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিলো তাঁর একটি চাতুরী। কাজ সমাধা হওয়ার পর তিনি এক

কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। ঢাকার নবাব স্যার আহসান উল্লাহ তাঁর খুবই ভক্ত ছিলেন। তিনি শাহ্ সাহেবের থাকার জন্যে একটা ইমারত নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ধোলাইগঞ্জ রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী রাস্তার ধারে তাঁর মাজার রয়েছে। ফরিদাবাদ পোষ্ট অফিসের নিকট রয়েছে আরেকজন বুজর্গের মাজার। তাঁর নাম হলো হযরত আলী রেজা শাহ্। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায়। কথিত আছে বাংলা ১৩২৬ সনে ঢাকায় প্রবল ঝড় হয়েছিলো। ঝড়ের তাণ্ডবতা দেখে তিনি লাঠি ঠুকে চিৎকার করে বলেছিলেন, তুফান ওদিক দিয়ে যা। তাঁর এই কথায় নাকি ঝড় ফরিদাবাদে কোন আঘাত হানেনি।

কমিটিগঞ্জ ছিলো ঢাকা পৌর সভার একটি বাজারের নির্দিষ্ট জায়গা। ১৮৮৬ সালে অর্ধডজন বেসরকারী বাজারের সঙ্গে একটি সরকারী বাজার ছিলো। এই বাজারটি ছিলো পৌর পরিচালিত। এই বাজারটি যেখানে অবস্থিত ছিলো সে এলাকাটি কমিটি গঞ্জ নামে আখ্যায়িত।

১৯২১ সালে গোপীনাথ দত্ত কবিরাজ কমিটিগঞ্জের একাংশের বিজলী বাতি সম্প্রসারণের জন্যে ঢাকা পৌরসভাকে পাঁচ শত টাকা দান করেছিলেন। তজ্জন্য কমিটিগঞ্জের ব্যাপক এলাকার নাম পরিবর্তন করে গোপীনাথ কবিরাজ লেন রাখা হয়। বর্তমানে সামান্য কটি হোল্ডিং নিয়ে কমিটিগঞ্জের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ঢাকা পৌর সভা, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি নাম ধারণের পূর্বে কমিটি নামেই কাজ চালাতো।

অনুরূপভাবে ১৯১০ সালে পাঁচশত টাকা দান করায় নবীন চন্দ্র গোস্বামীর নামানুসারে আলমগঞ্জের দক্ষিণাংশকে নবীন চন্দ্র গোস্বামী রোড এবং উত্তরাংশকে ১৯২৯ সালে ব্রজ সুন্দর পোদ্দারের নামানুসারে ব্রজসুন্দর পোদ্দার রোড নামকরণ করা হয়েছে।

বরদা কান্ত গাঙ্গুলী ঢাকা পৌরসভার একজন কমিশনার ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৮৯৯ সালে তাঁর নামানুসারে ঢাকার একটি রাস্তার নাম বরদা কান্ত গাঙ্গুলী লেন রাখা হয়। ১৮৮৫-৮৬ সালে রমাকান্ত নন্দী ঢাকা পৌর সভার একজন কমিশনার ছিলেন। তার নামানুসারে রমাকান্ত নন্দী লেনের নামকরণ করা হয়।

পুরানা পল্টন ও নয়া পল্টন এলাকায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনানিবাস ছিলো। দিলকুশাস্থ এই এলাকাটিকে গার্ড বাজার বলা হতো। ১৮৪০ সালে জন সাধারণের স্বার্থে বাজারটি সেখান থেকে অপসারণ করা হয়। পরবর্তীকালে সেনানিবাসটি রমনা রেসকোর্সে স্থানান্তর করা হয়। পরে সেখান থেকে মীরপুরের বেগুন বাড়ীতে স্থানান্তর করা হয়। সেনানিবাস ছিলো বলেই ঐ এলাকাটি পুরানা পল্টন ও নয়া পল্টন

নামে পরিচিত হয়ে আসছে। পুরানা পল্টনের আজ যে স্থানে হাউস বিল্ডিং কর্পরেশন ভবন রয়েছে। সেখানে একটা পুকুর ছিলো। এ পুকুরে প্রতিবছর জোড়া ভোগ নিত। অর্থাৎ একজোড়া ছেলে-মেয়ে প্রতিবছর ডুবে মারা যেতো। ঢাকাবাসীর নিকট এ পুকুরটি জোড় ভোগ পুকুর বলে পরিচিত ছিলো।

এক সময় ঢাকার হিন্দুরা পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার অনুকরণে খুব জাঁকজমকের সাথে রথযাত্রা উৎসব পালন করতো। বিরাট বিরাট রথ তৈরী করে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে সেগুলো রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়াতো। যে সব রাস্তায় এই রথ টেনে নিয়ে যাওয়া হতো সেগুলো রথখোলা নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। এভাবেই নবাবপুরের রথখোলা ও আমলীগোলার রথখোলা এলাকা গুলোর নামকরণ হয়েছে। এ দুটি এলাকাতেই অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে রথ যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হতো।

কাওরান বাজার কারওয়ান বাজারের বিকৃত নাম। মোঘল সিপাহসালার মীরজুমলা ঢাকা থেকে টক পর্যন্ত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের যে অংশটি নির্মাণ করান তার দুপাশে ছিলো অনেকগুলো সরাইখানা। আর বর্তমান কাওরান বাজারে ছিলো অনুরূপ একটি সরাইখানা। তেজগাঁও থানা হতে দুমাইল উত্তরে কালান সরাই নামে আর একটি সরাইখানা ছিলো। পরবর্তীকালে কালান সরাই নাম বিকৃত হয়ে কালু সরাই নামে পরিচিতি লাভ করেছে। কারাবান সরাই মানে সরাইখানা বা পান্থনিবাস। কালে কারাবান সরাই নাম লোকমুখে বিকৃত হয়ে কারওয়ান তথা কাওরান বাজার নামকরণ হয়েছে। কাওরান বাজারে প্রখ্যাত সুফী মহান সাধক পুরুষ খাজা আম্বরের দরগাহ রয়েছে। তৎসংলগ্ন খাজা আম্বরের মসজিদ সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলে নুতন আঙ্গিক ধারণ করেছে।

নবাব আবদুল গনি ঢাকা শহরে পানি সরবরাহের (ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস) উন্নয়নের জন্যে এক ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সালে এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়। তৎকালীন বৃটিশ সরকার নবাব আবদুল গনিকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করেন এবং নবাব পরিবারের ভাবী বংশধরদের নবাবজাদা উপাধি প্রদানে সম্মত হন। নবাব আবদুল গনির কর্মজীবন বহু জনহিতকর কার্যাবলীতে বিভূষিত ছিলো। তিনি দানশীল, পরোপকারী, জাত্যাভিমানী ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালে তিনি ছিলেন ঢাকা পৌরসভার কমিশনার। তাঁরই নামানুসারে নবাব আবদুল গনি রোড নামকরণ করা হয়। ওয়ারী এলাকায়ও একটি রাস্তার নাম তাঁরই নামানুসারে নওয়াব স্ট্রীট নাম করা হয়। নবাব আবদুল গনির পুত্র নবাব আহসান উল্লাহর দানে ঢাকার

বৈদ্যুতিকীকরণ ব্যবস্থা (ইলেকট্রিক সাপ্লাই) সম্পন্ন করা হয়। তিনি ঢাকা পৌরসভার একজন কমিশনার ছিলেন। তাঁরই নামানুসারে কুমারটুলির একটি বৃহৎ অংশ আহসান উল্লাহ রোড নামকরণ করা হয়।

ঢাকার কারিগরদের মধ্যে কুমারদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিলো। চুড়িহাট্টা ও লালবাগের মধ্যবর্তী এলাকায় একদল কুমার বাস করতো। যাদের বলা হতো রামহলী কুমহার। তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা হুকার ছিলিম বানাতো। দেশে তখন ছিলিমের অস্বাভাবিক চাহিদা ছিলো। নৌকা বোঝাই করে এই ছিলিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে চালান দেয়া হতো। আর একদল কুমার রায়ের বাজারে বসবাস করতো। এ ছাড়া শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক কুমার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো। এদের অধিকাংশই হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি তৈরি করতো। এই সব হাঁড়ি-পাতিল এত জনপ্রিয় ছিলো যে সুদুর আসাম পর্যন্ত চালান দেয়া হতো। পূজাপার্বণে তারা হিন্দুদের দেবীর মূর্তি বানিয়ে দিতো। ঢাকার কুমার সম্প্রদায়ের জন্যে জেমস ওয়াইজ বলেছেন ঃ 'ঢাকা শহরে কুমারদের দুটো সম্প্রদায় বা ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। একটার নাম ইসলামপুর, অন্যটার নাম ভাগলপুর।' এই দুই নামে ঢাকা শহরে তাদের দুটো আবাসিক এলাকাও গড়ে উঠেছে। ঢাকার কুমাররা সাধারণত এদুটো জায়গাতেই বসবাস করছে। তিনি আরও বলেছেন ঃ 'ঢাকায় কুমার সম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যা হচ্ছে ১৪ হাজার ৮শ ৩৫ জন। কালে ইসলামপুর এলাকার কুমারদের বস্তিটাই কুমারটুলি নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। আর ভাগলপুর এলাকাটির বেশ কিছু অংশ নীলাম্বর সাহা রোডের অন্তর্ভুক্ত হলেও একটি অংশ ভাগলপুর লেন নামে পরিচিত।

রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্র কুমার দাস ছিলেন একজন প্রখ্যাত জমিদার, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও বিশিষ্ট প্রেস মালিক। তিনি তৎকালে ঢাকা পৌর সভার চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর নামানুসারে লোহার পুলের পূর্ব দিকে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয় সত্যেন্দ্র কুমার দাস রোড তথা এস, কে দাস রোড। এ সড়কেই সেবামূলক প্রতিষ্ঠান "আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম" অবস্থিত। তিনি ওয়াল্টার রোডের বিজলীবাতি প্রদানের সমূদয় ব্যয়ভার বহন করেন। এজন্যে ওয়াল্টার রোডের একটা বিরাট অংশকে তাঁর পিতার নামানুসারে রেবতী মোহন দাস রোড নামকরণ করা হয়েছে। তার বাসভবনটি যাহা সূত্রাপুরে অবস্থিত সম্প্রতি পুরাকীর্তী হিসেবে ঘোষণা পেয়েছে। অনুরূপভাবে মিউনিসিপ্যাল স্ট্রীট হতে নারিন্দা পুল পর্যন্ত রাস্তার বিজলী বাতির খরচ প্রদানের জন্যে জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হৃষিকেশ দাসের নামানুসারে ওয়াল্টার

রোডের অপর অংশের নাম ঋষিকেশ দাস রোড রাখা হয়। ঋষিকেশ বাবু হাটখোলার রোজ গার্ডেনের মালিক ছিলেন।

১৯৩২ সালে আবুল হাসনাত রোড ও কে, এম, আজম রোডের মধ্যবর্তী একটি বাই-লেনের নামকরণ করা হয়েছে কেদার নাথ দে রোড। কেদার নাথ দের পুত্র উক্ত রোডের পার্শ্বস্থ ড্রেনসমূহ পাথর দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন। যোগেন্দ্র নারায়ণ শীল বহুদিন যাবৎ ঢাকা পৌর সভার হেড ক্লার্ক ছিলেন। তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট লুটম্যান জনসন ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত ঢাকার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেন। উক্ত ইতিহাসে বর্ণিত ঢাকা পৌর সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণীর সহ-সংকলক ছিলেন যোগেন্দ্র নারায়ণ শীল। তাঁর মৃত্যুর পর তার কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকার একটি রাস্তার নাম যোগেন্দ্র নারায়ণ শীল লেন রাখা হয়।

১৯১৬ সালে পৌর সভার চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর প্যারিদাস বাবুর নামানুসারে প্যারিদাস রোডের নাম রাখা হয়। প্যারিদাস বাবু একজন জমিদার ও আইনজীবি ছিলেন। ১৯২৩ সালে লালমোহন পোদ্দার বাবু ঢাকা পৌর সভাকে এক হাজার টাকা দান করেন। এই অর্থ দ্বারা তাঁর এলাকার কয়েকটি পানিয় জলের কল স্থাপন করা হয়। এই দানের স্বীকৃতি স্বরূপ নূরপুর লেনটিকে লালমোহন পোদ্দার লেন নামকরণ করা হয়েছে। লালমোহন পোদ্দার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ও বৃহৎ ব্যবসায়ী ছিলেন তার অন্যতম ব্যবসা ছিলো স্বর্ণ রৌপ্যের লেনদেন তথা বন্দকী ব্যবসা।

মদন মোহন বসাক বাবু এক সময় ঢাকা পৌর সভার কমিশনার ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় নবাবপুরের রথখোলা ক্রসিং থেকে জোড়পুল পর্যন্ত পানির লাইন সম্প্রসারণ করা হয়। তজ্জন্য তারই নামানুসারে রথখোলা ও জোড়পুল মহল্লাটি মদন মোহন বসাক রোড নামকরণ করা হয়। তিনি নিকটস্থ রায় সাহেব বাজারের মালিক ছিলেন। পরবর্তীতে এ রোডে একটি উচু পানির ট্যাঙ্কও স্থাপিত হয়। যা আজ অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

১৯৬০ সালে ঢাকা পৌর সভার সিদ্ধান্তনুসারে এই রাস্তাটির নাম টিপু সুলতান রোড রাখা হয়। কিন্তু পৌর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় উহা অদ্যাবধি বৈধভাবে কার্যকরী হয়নি। তবুও উক্ত রাস্তাটি টিপু সুলতান রোড নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এবং সকল ব্যবসা বাণিজ্য ও বর্হিদেশীয় পত্রপত্রাদি টিপু সুলতান রোড নামেই চলেছে। বৃটিশ আমলে এ এলাকাটি হিন্দু প্রধান অঞ্চল ছিলো। এখানকার লালমোহন সাহার ঠাকুর বাড়িটি ঢাকা শহরে খুব নাম ডাক ছিলো। যাহা রাধাকৃষ্ণ মন্দির নামে পরিচিত, এ মন্দিরটি সরকার সম্প্রতি পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা

দিয়েছেন, সেই সঙ্গে শঙ্খনিধি হাউসটিও পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এ সড়কে গ্রাজুয়েট হাই স্কুল রয়েছে পাক আমলে এ বিদ্যালয় ভবনেই সলিমুল্লাহ কলেজটি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় যা আজও চলছে। বাড়ীটি ভজহরি বাবুর, যাহা ভজহরি লজ নামে পরিচিত। সম্প্রতি এ ভবনটিকেও সরকার পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। প্রকাশ থাকে কলেজটি বৃটিশ যুগেই ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো উলটিগঞ্জের নিকট। এই কলেজ সংলগ্ন একটি কক্ষে এক বুজুর্গ ব্যক্তির কথিত মাজার যা হজরত খোরেশা শাহ নামে পাক আমলে স্থানীয় অবাঙ্গালীগণ আবিষ্কার করেন– তাতে শিরনী ও মোহরমের সময় সেহরা চড়াতো। বৃটিশ যুগে এ মাজারের তেমন কথা শুনা যায়নি তবে হয়তো কাহারো কবর থাকতে পারে সে ঘরে। এ ধরনের কবর ঢাকার বহু স্থানেই ছিলো। এ রাস্তার পূর্ব মাথায় একটি কমিউনিটি সেন্টার ঢাকা পৌর কর্পরেশনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠার পিছনে ঢাকা পৌর সভার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও তৎকালীন পৌর কমিশনার আব্দুর রহিম (মরহুম) সাহেবের প্রচেষ্টা কাজ করে ছিলো। এখানে কোন মসজিদ ছিলো না। ১৯৮৬ সালে জনাব শওকত মাষ্টার নামে এক ব্যক্তি একটি মসজিদের গোড়া পত্তন করেন। মসজিদটি টিপু সুলতান রোড জামে মসজিদ নামে পরিচিত। সাবেক পৌর কমিশনার আওলাদ হোসেনের প্রচেষ্টায় বোখারী মসজিদের সম্প্রসারণ কাজ চলছে। মসজিদটি ১৯৮৫ সালে হাজী মুঃ কালু মিয়া প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বলে শোনা যায়। পাক আমলে মোহাজেরগণের এ অঞ্চলে বসবাস ছিলো। তাদের মধ্যে বি, করিম একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পৌর কমিশনারও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনিই মনে হয় ঢাকার প্রথম ডেকোরেশন ব্যবসা আরম্ভ করেন। বৃটিশ আমলে ঢাকায় কোন ডেকোরেশন ব্যবসা ছিলো না।

টিপু সুলতান রোড নামকরণ পৌর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেননি কারণ মদন মোহন বসাক বাবু নিজ অর্থ ব্যয় করে পানির লাইন সম্প্রসারণ করে ছিলেন বলে। অথচ এমনিভাবে আরো কিছু লোক অর্থ ব্যয় করে রাস্তার নামকরণ করে নিয়েছিলো। তাদের নিজ অথবা পিতা-পিতামহের নামে। সে সব রাস্তার দু'চারটি নাম যে পাল্টানো হয়নি তা নয়। সে সব রাস্তার মধ্যে শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী রোড অন্যতম। এই তো সেদিন একজন রাজনৈতিক কর্মীর দল বদলের পর সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে তার নামে নাম করা হয় অহিউল্লাহ সড়ক অথচ ভারত উপমহাদেশের আজাদী রক্ষা ও ইংরেজ বিতাড়নে যিনি সারা জীবন একনিষ্ঠভাবে সংগ্রাম করে গেছেন জেহাদ করে গেছেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাকুলের কল্যাণ

সাধন করে গেছেন সেই টিপু সুলতানের নামানুসারে রাস্তার নামের অনুমোদন আজও হয়নি। এর চেয়ে দুঃখ এর চেয়ে বেদনাদায়ক এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কি হতে পারে।

টিপু ছিলেন সেই মুজাহিদ দলের নেতা, আল্লাহ যাকে মনোনীত করে ছিলেন– এক পতনমূখী কওমের অতীত গুনাহর কাফফ্‌ারা আদায়ের জন্যে। অথচ এই দেশেরই কতক সুযোগ সন্ধানী ক্ষমতা লিপ্সু স্বার্থপরায়ন, বিবেক বর্জিত মুনাফিক, এই মহিমান্বিত মানুষটিকেই তাদের পথের কণ্টক মনে করতো। শেষ পর্যন্ত তার বুকের রক্ত দিয়েই এদেশের গাদ্দারদের মনোরঞ্জন করতে হয়েছে।

টিপু ছিলেন মহীশুর রাজ্যের সুলতান। মহীশুর রাজ্য ছিলো দাক্ষিণাত্যের মাঝখানে ত্রিভুবনের মতো। এবং সমৃদ্ধশালী। নদী বয়ে আনতো লোহার আকর গ্রামবাসীরা তা দিয়ে লৌহ তৈরী করতো। মারাঠা-মোঘলদের লড়াই কালে মহীশুরের রাজা প্রজারা ছিলো শান্ত। অতিরিক্ত সমৃদ্ধি আর শান্তির কারণে হিন্দুরাজ হয়ে ওঠেন অতি বিলাসী। মীরজাফরকে সরিয়ে যখন মীর কাশিম বাংলার নবাব হন। তখনই মহিশুরের হিন্দু রাজাকে গদিচ্যুত করে সিংহাসন দখল করে নেন তৎসেনাপতি হায়দার আলী। হায়দার আলী দুরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সারা ভারতের উপর যখন ইংরেজদের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে তখন দুর্বল শক্তি নিয়ে বাঁচা যাবেনা। সেনাপতি হিসেবে আরও বুঝে ছিলেন মান্ধাতা আমলের অস্ত্র ও যুদ্ধ বিদ্যা দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হওয়া যাবেনা। তাই তিনি জায়গীর প্রথা বিলুপ্ত করে দেন। কারণ জায়গীরদারদের সৈন্য বাহিনী মূলরাজার প্রতি তেমন অনুগত হতোনা। রাজ্যের সব সৈন্যকে তার অধীনে এনে বিদেশী যুদ্ধ বিশারদ দিয়ে আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শি করে তুললেন। পদাতিক বাহিনী বিরাটাকার করে বন্দুক হাতে দিলেন। গোলন্দাজ বাহিনীকে নুতন সাজে সজ্জিত করলেন। অশ্বারোহীদেরও আধুনিক সাজে সজ্জিত করলেন। এসব কাজে পিতার সাথে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন টিপু। নুতন রণকৌশল আয়ত্ত করে পার্শ্ববর্তী অনেক রাজ্য জয় করে, আর হায়দারাবাদের এক বিরাট অংশ খরিদ করে রাজ্যকে সম্প্রসারিত করেন। মারাঠা-ইংরেজ, মুসলিম-অমুসলিম ভিন্ন রাজারা তার সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠতে পারছে না। পিতা পুত্রের বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়লো ভারত বর্ষের আনাচে কানাচে। এহেন অবস্থায় ইংরেজরা অনেক ক্ষেত্রে সন্ধি করলেও মনে পুসতো মহীশুর আর হায়দার টিপুর পতন। ওদিকে হায়দার টিপু বুঝে ছিলেন তাদের প্রধান শত্রু ইংরেজ।

একদিন টিপুকে ডেকে পিতা হায়দার বল্লেন, শোন টিপু সামনে তোমার পবিত্র কোরান আর তরবারী। বল, এদেশ থেকে ইংরেজ বণিকবেশী দস্যু, স্বাধীনতা হরণকারীদের তাড়াবার জন্য আমি আমার শেষ রক্ত বিন্দুও ঢেলে দেবো। পিতাও প্রতিজ্ঞা করলেন ইংরেজদের ধ্বংশ সাধনের কথা। আজীবন পিতা পুত্র করেও গেছেন তাই। বুকের রক্ত দিয়ে বীরত্বের ইতিহাস রচিত করে গেছেন ভারত বর্ষে।

মারাঠা ও পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজন্য বর্গকে নিয়ে ইংরেজরা কুটবুদ্ধির আশ্রয় নিলো। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো সব দিক দিয়ে। অন্য দিকে সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইংরেজ বীর কর্ণেল বেইলী সপ্তগড়ে অপেক্ষা করছিলেন টিপুকে বাধা দিতে। পেরাম্বাকমের কাছে কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে ইংরেজ বীর সৈন্য বাহিনীসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। কাঞ্জিতরমের বৃটিশ বাহিনী প্রধান হেকটর টিপুর ধাক্কায় উর্দ্ধশাসে দৌড়ালেন মাদ্রাজে। আর্কট-কর্নাটক মহীশুরের অধিকারে এলো।

পূর্বেই বলেছি ইংরেজরা কুটবুদ্ধির আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশ থেকে হেষ্টিং দাক্ষিণাত্যে পাঠালেন ক্যাপ্টেন কুটকে। কুট এসেই কুটচাল সূক্ষ্মভাবে চালালেন। এক সময় মারাঠা-নিজাম ও মহিশুর এক জোট হয়ে ছিলো ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে। কুট প্রথমেই গুণ্ট প্রদেশ নিজামকে ফিরিয়ে দেবার টোপ ফেলে প্রলুব্ধ করে নিজামকে আলাদা করে দেন। তারপর মারাঠাগণও জোট ত্যাগ করলো। হায়দার আলীর সঙ্গে ফরাসীদের সৎভাব ছিলো। ইউরোপে ইংরেজদের যুদ্ধ চলাকালে ফরাসীরা হায়দার-টিপুকে উৎসাহিত করতো ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। পরবর্তীতে ইউরোপ যুদ্ধের অবসান হয়ে সন্ধি হলো ইংরেজ ফরাসীদের মধ্যে। ফলে ভারতেও ফরাসীরা আর অস্ত্রধারণ করেনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে। এমনি সময় দীর্ঘ রোগ ভোগের পর সুলতান হায়দার আলী মারা গেলেন। টিপু এতদিন পিতার সহযোগী হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করতেন। এবার স্বয়ং সুলতান হলেন। তিনি পিতার নীতি অনুসরণ করে শত্রুদের সঙ্গে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন এক রণক্ষেত্র থেকে অন্য রণক্ষেত্রে বিরাম নেই, ক্লান্তি বোধ করেননি কোনদিন ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে, ইংরেজ-ফরাসী সন্ধির কারণে টিপুর সৈন্য বাহিনীতে যে সব ফরাসী রণ কৌশলী ছিলেন তারা টিপুর বাহিনী থেকে বিদায় নিলেন। নানা সংঘাত আর কুট ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে মহিশুরের কাবেরী নদীর পানি গড়াতে লাগলো। এক দিন এই টিপুকে সন্ধি করতে হলো ইংরেজদের সঙ্গে। ১৭৮৪ সালের ১১ই মার্চ বাঙ্গালোরে সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো। অবশ্য দুপক্ষই জানতো এ শান্তি সাময়িক। দুদলই শক্তি সংগ্রহে মেতে উঠলো। টিপু দূত পাঠালেন ফ্রান্সে, তুরস্কে ও কনষ্টান্টিপোলের

মুসলিম শাসন কর্তার কাছে, কিন্তু নানা কারণে তারাই ইংরেজদের সাহায্যের প্রত্যাশি থাকায় অপরাগতা জানালেন।

এদিকে হেষ্টিং-এর পরিবর্তে কর্নওয়ালিস গভর্ণর হয়ে এসেই প্রথমে নিজাম ও পেশোয়ার সঙ্গে, পরবর্তীতে অন্যান্য ছোট রাজাদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে সবাই একত্রিত হয়ে টিপুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। টিপুর অবসান হলে বৃটিশ বন্ধু হিসেবে সকলেই কিছু কিছু সুবিধে পাবে। এবার টিপু চার দিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো। ইংরেজ বাহিনী তিন দিক হতে আক্রমণ চালালো, আর অরক্ষিত অঞ্চলগুলোতে মারাঠা আর নিজামের সৈন্যরা লুটপাট ও হত্যা করে চললো। টিপু শেষ রক্ষা হিসেবে বাঙ্গালোর প্রবল অবরোধের সৃষ্টি করলেও ইংরেজ বাহিনী মহীশুরের রাজধানী শ্রী রঙ্গপট্টম অবরোধ করলো। আমৃত্যু যুদ্ধের পণ নিয়ে লড়াই চালিয়েও শেষ পর্যন্ত টিপুকে সন্ধি করতে হলো ইংরেজদের সঙ্গে। ১৭৯২ সালে শ্রী রঙ্গপট্টমে সন্ধি হলো। অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও সড়ক ইংরেজদের দখলে গেলো। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাড়ে তিন কোটি টাকা দেওয়ার শর্তে তার দুই পুত্র ইংরেজদের হেফাজতে গেলো। টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পুত্রদ্বয় জামিন স্বরূপ ইংরেজদের কাছে রইলো। বীর পিতা অক্লান্ত পরিশ্রম করে রাজ্যের আয় বাড়িয়ে সন্ধির টাকা পরিশোধ করে পুত্রদের মুক্ত করে এনে ছিলেন।



টিপু সুলতান ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে সন্ধি করার পর ক্ষতিপূরণ পরিশোধের
জামানত হিসেবে টিপুর দুই পুত্রকে লর্ড কর্ণওয়ালিস গ্রহণ করছেন

বীর টিপু সাহস আর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কৃষি ও কুটির শিল্পের প্রসার এবং বাণিজ্যের ব্যবস্থা করে কিছু দিনের মধ্যেই হতাশা কাটিয়ে উঠলেন। আবার পূর্ণ উদ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। বন্ধুর খোজে আবারও দূত পাঠালেন দেশে বিদেশে। বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশে। কোথাও বন্ধু পেলেন না। নিজের দেশ ভারতের অযোধ্যার রোহিলা খণ্ডে রোহিলাদের কাছেও। কিন্তু সবই বৃথা হলো। অন্যদিকে টিপুর শক্তি সংগ্রহের খবর পেয়ে গভর্ণর জেনারেল ওয়েলেসলি টিপুকে শেষ করে দেবার পরিকল্পনা নিলেন। বাংলার মীর জাফরের মত দেশীয় রাজন্যবর্গ হতে অনেক বন্ধু পেয়ে গভর্ণর জেনারেল চারদিকে বিদ্রোহের আগুণ ছড়িয়ে দিলেন। টিপু শুধু বীরই না তার চরিত্র ছিলো নিষ্কলুস, সমাজ সংস্কারক হিসেবেও তিনি ইতিহাসের পাতায় নাম লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাই হিন্দু সতীদাহ ও বড় ভাই-এর স্ত্রীর সঙ্গে ছোট ভাইদের যৌন নিষিদ্ধ করেছিলেন মানবিক কারণে, তজ্জন্য তিনি গোড়া হিন্দুদের শত্রুতে পরিণত হন। এসব নানা কারণে, আর সর্বোপরি তিনি একজন ধর্ম ভীরু সত্যিকারের মুসলিম হওয়ার কারণে বিদ্রোহের লেলিহান শিক্ষা দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিলো স্বার্থপর ক্ষমতা লোভীরা। যাদের উপর টিপুর ভরসা ছিলো তারাই ইংরেজদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে এলো জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যদিয়ে।

১৭৯৯ সাল ২৮ শে এপ্রিল অতর্কিতে বৃটিশ এবং অন্যান্য দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রবল শক্তি নিয়ে আক্রমণ করলো মহীশুরের রাজধানী শ্রী রঙ্গপট্টম। কাবেরী নদীর পানি স্বাধীনতা প্রিয়দের রক্ত দ্বারা লালে লাল হয়ে গেলো। বীরের মত লড়তে লড়তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন ভারতের শেষ স্বাধীনতা রক্ষাকারী মর্দে মুজাহিদ টিপু সুলতান। সারা ভারত বিজয়ে বাধা দিতে বৃটিশদের সামনে আর কেউ রইলো না।

আজাদীর মশাল নিভে গেলো দুই শতাব্দীর জন্যে। টিপু ব্যক্তিগতভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমী দৃঢ়চেতা, শিক্ষিত, চরিত্রবান, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও ধর্মভীরু সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তিনি ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন, এছাড়া উর্দু ও কানাড়ি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। তার গ্রন্থাগারে আরবী, ফার্সী, ফরাসী, তুর্কী, উর্দু ও হিন্দি গ্রন্থ ছিলো। স্বাধীনতা প্রিয় এই নরপতি-নিজাম ও অন্যান্য রাজার মত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে চাননি। প্রকৃত বীরের মত বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন স্বাধীনভাবে।

পরবর্তীতে তার এই বীরত্বগাঁথা কাহিনীকে অম্লান রাখার জন্য যারা চেষ্টা করেছেন তারাও বিরাগ ভাজন হয়েছেন ইংরেজ প্রভু ও দেশীয় মীরজাফরদের দ্বারা,

তাই তার ইতিহাস বিকৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাকে অনেকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করেছে। করেছে তাকে অবমূল্যায়ন। বৃটিশ ভারতে তার নামে যে নাটক মঞ্চস্থ হতো-তাতেও তার প্রকৃত রূপকে ঢেকে রেখে শুধু তার ইংরেজ বিদ্বেষীতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যখনই কেউ তার প্রকৃত ইতিহাস রচনা বা অন্য কোনভাবে তার চরিত্রকে পরিস্ফুটিত করতে চেয়েছে, সেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। এই সেদিন ৮ই ফেব্রুয়ারী '৮৯ মহিশুরের প্রিমিয়ার ষ্টুডিওতে পরিচালক ও প্রযোজক সঞ্জয় খানের ব্যয় বহুল "দ্যা সোর্ড অব টিপু সুলতান"-এর টিভি সিরিজ চিত্রায়িত করার সময় বনার্ঢ্য বিয়ের চিত্র ধারণ প্রাক্কালে বড় এক তুবড়ির অগ্নি স্ফুলিঙ্গে ষ্টুডিওতে আগুন ধরে যায়। ফলে সেখানেই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে ৪০ জন এবং পরে আরো ২০ জনের অধিক অভিনয়কারী ও কলাকুশলী মৃত্যুবরণ করেন এবং অর্ধশতাধিক ব্যক্তি মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। স্টুডিওতে বোম্বে, কর্ণাটক ও মাদ্রাজের দুই শতজনের অধিক অভিনয়কারী ও কলাকুশলী তখন কর্তব্য কাজে নিয়োজিত ছিলো। এ কাহিনীর স্বত্ব পনর বছর পূর্বে ক্রয় করেও চিত্রায়িত করতে পারেনি। তার কারণ টিপু সুলতানকে নিয়ে কোন ছবি হোক তা সমর্থন করার জন্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। শেষ পর্যন্ত কাহিনীটি সঞ্জয় খাঁন খরিদ করে ২রা অক্টোবর '৮৮ খুব ঘটাকরে শুভ মহরৎ করেন মহীশুরের ললিত মোহন প্যালেসে। প্রথমে তিনি এ কাহিনীকে পূর্ণ চিত্রে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে টিপুর কাহিনী নিয়ে ছবি করার মনস্থ করেন, সেদিন হতেই একের পর এক বাধা-বিঘ্ন, বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে থাকেন। ফলে পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে টিভি সিরিজেই খুশী থাকতে হয়েছিলো। ছবির বহিঃদৃশ্য চিত্রায়ন টিপুর অবস্থানগুলো থেকেই গ্রহণ করা হচ্ছিলো। প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছবির কাজ সমাধাও হয়েছিলো। কিন্তু যে বিপদ আপদের জন্য অদ্যাবধি টিপুর সত্যিকারের বীরত্ব গাথা কাহিনী চিত্রায়িত হতে পারেনি। চিত্রনাট্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট রেখে যতটুকু করা হয়েছে তা এবারও মনে হয়েছিল ভেঙ্গে গেলো। কারণ কর্ণাটক সরকার বোম্বের হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইকারী সঞ্জয় খানের উপর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেন, অতগুলো লোকের মৃত্যু ও গুরুতর আহত হওয়ার কারণে। অথচ অগ্নিকাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথীদের বক্তব্য হলো "সঞ্জয় খান ইচ্ছে করলে অগ্নিদগ্ধ হবার আগেই ফ্লোরের বাইরে বেরুতে পারতেন। কিন্তু তিনি সকলকে ফ্লোরের মধ্যে থেকে বের করে আনবার চেষ্টা করতে থাকেন, এর ফলেই তার শরীরের অনেকাংশ পুড়ে যায়। সঞ্জয়ের ড্রাইভার জোর করে গাড়ীতে না বসালে

ওর অবধারিত মৃত্যু ছিলো। তার বুদ্ধি আর সাহসের জন্যেই অর্ধেক লোক অগ্নিদগ্ধ থেকে বেঁচে গেছে।" তাহলে আমরাও কি কোন অজ্ঞাত ভয়ে বীর টিপু সুলতানের নামটাকে মদন মোহন বসাক রোডে শুধু সাইন বোর্ড আর চিঠি পত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো? না, তা বাস্তবে রূপদান করবো। কারণ শত বাঁধার মধ্য দিয়ে উল্লেখিত নাটকটি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হচ্ছে। ঢাকা সিটি করপোরেশনের কর্ণধার আর স্থানীয় সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে কোন তড়িৎ ব্যবস্থা নেবেন কি? আজ ঢাকাবাসী তা জানতে চায়।

টিপুর শাহাদত বরণের পরের ঘটনা আরো নির্মম, নিষ্ঠুর, বেদনা বিধুর। মিঃ উইলিয়াম হিকি তার স্মৃতি কথায় বলেছেন ঃ কলকাতায় যখন ডেপুটি শেরিফ ছিলাম এবং শেরিফের সব কাজকর্ম করতাম তখন কারা বন্দী টিপু সুলতানের পুত্র ময়জুদ্দিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিলো। তিনি প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তার অভাব অভিযোগ নিবেদন করতেন। তার শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার খুবই কষ্ট হতো, কিন্তু কিছুই করবার ছিলো না। মধ্যে মধ্যে কেবল কথার সান্তনা ছাড়া। আমার ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হলেন। আমি যখন তার সঙ্গে কারাগারে দেখা করতে গেলাম তখন পাগলের মতন হাত পা ছুড়ে বলতে লাগলেন, আপনি চলে গেলে এদেশে বন্ধু বলে আমার আর কেউ থাকবে না। কে-ইবা তখন আমার কাছে আসবে, আমার দু'টো দুঃখের কথা শুনবে এবং মানুষের মতন ব্যবহার করবে। আমি আর তা হলে বাঁচবো না। দ্বিতীয় দিন যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তখন তিনি উদ্ভ্রান্তের মতন আমার পা দু'টি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, এবং মিনতি করে বললেন, হিকি সাহেব, আপনার সঙ্গে আমাকেও দয়া করে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে চলুন। এ দেশে আমার কেউ নেই। কিছু নেই, এখানে আমি কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারবো না। টিপু সুলতানের পুত্রের মুখ থেকে এই কথা শুনলে নিতান্ত লোকের মনেও করুণার উদ্রেক হবে। আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। বললাম, আপনাকে সঙ্গে করে ইংল্যাণ্ড নিয়ে যেতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো। কিন্তু আমার ইচ্ছায় তো আপনি যেতে পারবেন না। কোম্পানীর কর্তারা অথবা এখানকার গভর্ণমেণ্ট আপনাকে বাইরে কোথাও যাবার অনুমতি দেবেন না।

কথাটা শুনে রাজকুমার ময়জুদ্দিন লোহার গরাদের ভিতরে দাড়িয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে বললেন, "কেন" কেন অনুমতি দেবেন না, কেন? আমাদের উপর এত অত্যাচার করেও কি ইংরেজদের প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হয়নি? আমার পিতাকে

হত্যা করে, আমাদের সমস্ত রাজ্য কেড়ে নিয়ে, পরিবারের সকলকে নানা জায়গায় জেল খানায় বন্দী করে রেখেও কি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাগ যায়নি। আমাকে জেল খানায় বন্দী করে দণ্ধে মেরে ফেলতে চান? সকলে বলাবলি করে যে, নুতন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো নাকি মানুষ হিসেবে উদার চরিত্র, তাই ভেবে ছিলাম তিনি আমার একটা ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু গতিক দেখে মনে হচ্ছে তা দুরাশা মাত্র। আপনি আমার কথা, তার কাছে গিয়ে বলুন। আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন। আমার কোন দাবী নেই। দৈনিক এক মুঠো ভাত আর একটু জল পেলেই চলবে। বিলেত গিয়ে আমি আপানার গোলাম হয়ে থাকবো, যে কাজ দিবেন তাই করবো। আমাকে এদেশের কারাগার থেকে মুক্ত করে দিন, দোহাই আপনার।

কথাগুলো এমন উম্মত্তের মতন প্রাণপণ চেঁচিয়ে তিনি বলতে লাগলেন যে আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। জেলার সাহেবকে ডেকে বললাম তাকে সামলাবার জন্যে। পরে তাকে মিথ্যা সান্তনা দিয়ে এই বলে বিদায় নিলাম যে তার জন্য যথাসাধ্য কিছু করার চেষ্ট করবো। তার পর আর কোন দিন তার সাথে দেখা করতে যাইনি।

কলকাতার কারাগারেই টিপু সুলতানের এ পুত্রের মৃত্যু হয়, পরে সংবাদ পত্রে তার বিবরণ পড়েছি।

ঢাকার সদর ঘাটের প্রধান সড়কের নাম চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। চিত্তরঞ্জন দাস ১৮৭০ সালে কোলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ভুবন মোহন দাস। আদি নিবাস ঢাকার তেলির বাগে ছিলো। ১৮৯০ সালে বি, এ পাস করে ব্যারিষ্টারী পড়তে যান বিলেতে। ১৮৯৩ সালে দেশে ফিরে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তার রাজনীতির সংগে যোগ ছিলো। বৈপ্লবিক আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী পক্ষের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ বি, চক্রবর্তী অর্থনৈতিক কারণে যখন মামলা চালাতে অস্বীকার করলেন তখন চিত্তরঞ্জন দাস বিনে পারিশ্রমিকেই আসামী পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তার অসাধারণ আইনজ্ঞান, কুটতর্ক ও যুক্তিকালে অনেক আসামীকে মুক্ত করেন এবং ফাঁসির আসামীদের ফাঁসির আদেশ রদ করে বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডাদেশ করতে সমর্থ হন। এই মামলা পরিচালনা করতে করতে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দুতে চলে আসেন। এ সময় হতেই তিনি দেশবাসীর কাছে সি, আর, দাস নামে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯০৩ সাল হতেই কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে থাকেন। তিনি গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন কালে আইন সভা বর্জনের বিরুদ্ধে ছিলেন। বিপ্লবীদের আলিপুর বোমা মামলা বিনে পয়সায় করতে গিয়ে এবং পরবর্তীতে আইন ব্যবসা

পরিত্যাগ করায় তার সমস্ত আয় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অর্থাভাবে তাহাকে স্বীয় সকটের অশ্ব বিক্রয় করতে হয়। রাজনীতি করতে গিয়ে ১৯২১ সালে কারাবরণ করেন। পরবর্তী বছরে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে আবার পুরনো প্রস্তাব রাখেন। গান্ধীজি সভায় অনুপস্থিত থাকলেও তার প্রস্তাব ও মত সমর্থন না করায় কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। মতিলাল নেহেরু অবশ্য তার মতের সমর্থক ছিলেন। অতঃপর তিনি নিজেই স্বরাজ্য দল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তার দল ক্রমে সারা ভারতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ফলে ১৯২৩ সালে কংগ্রেস তার নীতি বদল করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ আইন সভায় যোগ দেবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। স্বরাজ্য দল মুসলিম লীগের সংগে "বেঙ্গল প্যাক্ট" করে নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে। ১৯২৪ সালে তিনি কোলকাতার মেয়র এবং সুভাষ চন্দ্র বোসের প্রধান কার্য নির্বাহী নিযুক্ত হন। কিন্তু সরকার বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারী করে সুভাষ বোসসহ অনেককে গ্রেফতার করলে সি, আর, দাস নিজ বাড়ীতে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডাকেন। এবার গান্ধীজি তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেন।

উল্লেখ থাকে ১৯১০ সালে সুপ্রসিদ্ধ "ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা" সরকার ৫৫ জনকে আসামী দিয়ে দায়ের করলে ৪৫ জন ধৃত হন। এদের মধ্যে ত্রৈলক্য মহারাজ ছিলেন এ মামলার অন্যতম আসামী। এ মামলায়ও আসামী পক্ষে প্রধান কৌশলী ছিলেন সি,আর, দাস।

পূর্বেই বলেছি বিনে পয়সায় ওকালতি আর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অনেককেই সাহায্য সহযোগিতা করতে গিয়ে সেই সঙ্গে দেশের কল্যাণধর্মী কার্যক্রম করতে গিয়ে অভাব অনটনে পতিত হন। বিশুদ্ধ রাজনীতি, সৎকর্ম ও জনকল্যাণ কাজের প্রয়োজনে বিত্তশালী বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য প্রার্থী হয়ে প্রত্যাখান হয়েছেন রাজ ভিখারী চিত্তরঞ্জন দাস, দেশবাসী ইতি পূর্বেই তাকে দেশবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি একবার ঢাকায় এসে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস, খেলাফত ও স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষ থেকে সদর ঘাটস্থিত করোনেশন পার্কে অনুষ্ঠিত জনসভায় ঢাকা নগরীর বিশিষ্ট সৎ, নিঃস্বার্থ ও সংগ্রামী কর্মী নবাবগঞ্জ এলাকার অধিবাসী জুম্মন মিয়াকে বীর বালক রাজা উপাধি ও রৌপ্য প্লেটে প্রশংসা পত্র প্রদান করেছিলেন। এই রাজাও শেষ বয়সে দরিদ্রতায় জর্জরিত হয়ে অনেক দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

যিনি এমনি কত লোককে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার দিয়েছেন আর তারই ভাগ্যে দেশবন্ধু উপাধি পেয়েও শেষ জীবনে রাজ ভিখেরী উপাধি পাওয়ায় ধীরে ধীরে

স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়ে তিনি দার্জিলিং এ যান- স্বাস্থ্য উদ্ধারে। নিয়তি তার এ দুঃখ দেখতে না পেরে ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন তাকে পরলোকে নিয়ে গেলেন। ঢাকা পৌর সভা সদরঘাটে যাওয়ায় প্রধান রাস্তাটিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্মরণে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নাম করে যথার্থই করেছেন।

নবাব শায়েস্তা খানই সম্ভবত বাদামতলী ঘাট নির্মাণ করিয়েছিলেন। এখানে পান্থগণ নবাবের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। পালিশ করা কাঠের চতুর্ভূজ একটা ঘেরাওয়ের মধ্যে নবাব বাস করতেন। একে বলা হতো কাটরা এ কাটরার জন্যেই মহল্লাটির নাম হয়েছিলো কাটরা পাকুড়তলি (১৬৭৮ সালের আগে পর্যন্ত লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি) ঘাটের উপরে ছিলো একটা নহবতখানা এবং এরই পশ্চিম দিকে ছিলো নবাব শায়েস্তা খানের কন্যা লাভলী বেগমের সমাধি সৌধ। সম্ভবত এখানে কিছু বাদাম উৎপন্ন হতো। অথবা বাদাম বিক্রয়ের স্থান ছিলো যার জন্যে জায়গাটির নাম হয়েছে বাদামতলী।



১৮৪০ সালে ঢাকার নদী তীরবর্তী বাদামতলি ও বাবু বাজার এলাকায় আমিরুদ্দিন দারোগার সমাধি স্তম্ভ। হিন্দুদের একটি মন্দির ও সর্ব বামে নবাবের প্রসাদের প্রবেশ দ্বারস্থ মন্ডপের দৃশ্য

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উত্তরদিকে রয়েছে তাঁত খানা রোড। মোঘল আমলে রাজকীয় তত্ত্বাবধানে একটি মসলিম বস্ত্র তৈরীর কারখানা এখানে স্থাপন করা হয়েছিলো। যদিও সে কারখানাটি বহু পূর্বেই উঠে গেছে, তবুও পৌর কর্তারা আজও

সে অঞ্চলটিকে তাঁত খানা রোড বা লেন নামেই অভিহিত করে আসছে। তাঁত খানায় যে মসজিদটি রয়েছে তা কবিরাজ মসজিদ নামে পরিচিত। মানিক গঞ্জের অধিবাসী এক কবিরাজ এখানে বাসভবন নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই সাথে নিজ খরচে এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন বিধায় মসজিদটি কবিরাজ মসজিদ নামে আজও পরিচিত। কবিরাজ সাহেব বিত্তবান এবং ধর্মপরায়ন ব্যক্তি ছিলেন।

ঢাকা নগরীর ফরাশগঞ্জ এলাকায় ১৮৮০ সালে তৎকালীন বড় লাট নর্থ ব্রুকের ঢাকা আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে তারই নামানুসারেই নর্থ ব্রুক হলটি তৈরী করা হয়। যাহা নর্থ ব্রুক হল নামে আজও পরিচিত। নর্থ ব্রুক হলটি বেশ সুন্দর কারুকার্য খচিত। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হয় যা ১৮৮০ সালের ২৫শে মে শুভ উদ্ধোধন হয়। এখানে পদস্থ রাজকর্মচারীদের এবং উঁচু দরের লোকজনের সভা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হতো। আজও সেটিতে সাধারণ সভা সমিতি বা অনুষ্ঠানাদি করতে দেওয়া হয় না। বহু পূর্ব হতেই হল ও লাইব্রেরীটি ঢাকা পৌর সভা তথা পৌর কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। পৌর কর্পোরেশনের কোন নাগরিক অনুষ্ঠানাদি হলে এ হল ব্যবহার করা হয়। এই হল কম্পাউন্ডেই ১৮৮২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয় জনগণের চাঁদায়। লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা কল্পে যারা উল্লেখযোগ্য অর্থ দান করেছিলেন তাদের মধ্যে ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় ৫,০০০, ত্রিপুরার মহারাজা ১,০০০/= বালিয়াদির জমিদার রাজেন্দ্র কুমার রায় ১,০০০/= মহারানী স্বর্ণময়ী ৭০০/= টাকা এবং আরো অনেকে দান করেছিলেন। এটি সাধারণতঃ হিন্দু রাজা মহারাজা ও জমিদার বিত্তশালীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। উনবিংশ শতাব্দীতে এই নর্থ ব্রুক হল সর্বাধুনিক ও অভিজাত মিলনায়তন হিসেবে গণ্য হতো। সম্প্রতি সরকার এ হলটিকে পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। নর্থ ব্রুক হলের নামানুসারেই তৎসংলগ্ন রাস্তাটির নাম নর্থ ব্রুক হল রোড রাখা হয়েছে। বর্তমানে নদী তীর ও আশে পাশের পরিবেশ পূর্বের মত নেই। ইট, বালি ও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ এর চতুসীমার পরিবেশ নষ্ট করে ফেললেও আজও এটি পুরোনো ঢাকার ঐতিহাসিক নিদর্শন-সুন্দরের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। এর সীমার মধ্যেই পাক আমলে আয়ুব দশকে ঢাকা পৌর সভার চেয়ারম্যান (মরহুম) মঈনুদ্দিন চৌধুরী একটি মিলনায়তন ও একটি স্পোটিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। যা মঈনুদ্দিন চৌধুরী হল ও ফরাশগঞ্জ স্পোটিং ক্লাব নামে পরিচিত। এ ব্যাপারে তৎকালীন পৌর সভার ওয়ার্ড চেয়ারম্যান (মরহুম) মালাবক্স সরদারের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

জনাব মাওলা বক্স সরদার ১৯৪৪ সালে ঢাকার নবাব খাজা হাবিব উল্লাহ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে সরদার নির্বাচিত হন। তাঁর পিতা পেয়ার বক্সও সরদারি পাগড়ি পেয়েছিলেন নবাব স্যার সলিম উল্লাহ বাহাদুর হতে। মাওলা বক্স সরদার ১৯০৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন দক্ষ মটর মেকানিক ছিলেন। বৃটিশ যুগেই তিনি মটর সাইকেল ব্যবহার করতেন। তখন মুসলমানদের মধ্যে অতি নগণ্য সংখ্যক লোকই মটর সাইকেল চালাতেন। জনাব মাওলা বক্স প্রথম ১৯৫২ সালে পরে ১৯৫৯-৬০ সালে ঢাকা পৌর সভার কমিশনার নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে পুরাতন ঢাকা উন্নয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এ আর পি সংস্থা গঠন হলে সে সময়ে লালবাগ, রমনা, ভিক্টোরিয়া পার্ক ও পোস্তাগোলার এম্বুলেন্স, রেসকিউ গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত হন। বৃটিশ যুগে চকবাজার মসজিদে মৌলানা দীন মহম্মদ সাহেবের তফসীর যাতে শহরের পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ শুনতে পারে তজন্য চকবাজার থেকে নবাব বাড়ী ময়দান পর্যন্ত মাইকের লাইন টেনে নেওয়ার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাছাড়া তফসীর মাহফিলের মাইকের প্রধান অপারেটর ছিলেন। জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটেছে। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সরদারী প্রথা এবং পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের অতীতের সাক্ষী হিসেবে আমাদের মাঝে ছিলেন। কিছু দিন হলো তিনি জান্নাতবাসী হয়েছেন।

মোঘল আমলে হাতীর মাহুত (পরিচালক)দের যে স্থানে কোয়ার্টার বা বাসস্থান ছিলো সে এলাকাটি মাহুতটুলি নামে সবার নিকট পরিচিত। কিন্তু ১৯২১ সালে শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী পৌর সভায় কিছু অর্থদান করে তার নামানুসারে মাহুতটুলির নামকরণ করেন শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী রোড। কিন্তু ঢাকা বাসী আজও মাহুতটুলি নামেই পরিচয় দিয়ে থাকে।

এরশাদ আমলে তৎএলাকার পৌর কমিশনার বিরোধী রাজনৈতিক দলের ঢাকা নগর শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-বিরোধী দলত্যাগ করে সরকার দলে যোগদেওয়ার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে তৎকালীন পৌর প্রশাসক শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী রোডটিকে মৃত রাজনৈতিক কর্মী পৌর কমিশনারের নামানুসারে অহিউল্লাহ সড়ক নামকরণের কথা ঘোষণা দেন এবং পৌরতে রাস্তার ফলকাদি স্থাপন করেন।

প্রকাশ থাকে পাক আমলে ঢাকা পৌর সভা সর্বসম্মতিক্রমে মদন মোহন বসাক রোড ও স্যাভেজ রোড এর নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে "টিপু সুলতান রোড" ও

ঈশা খাঁ রোড নামকরণের প্রস্তাব গ্রহণ করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পৌর সভার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হলেও আজ অবধি তা আইনগত অনুমোদন লাভ করেনি। পৌর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নামকরণের প্রস্তাবটি অনুমোদন না করণের কারণ হিসেবে বলেছেন যেহেতু অর্থের বিনিময়ে নামকরণ হয়েছে অতএব সেনাম পরিবর্তন হতে পারে না। আর শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী নামের বেলায় দেখছি পৌর কর্পোরেশনের কোন সিদ্ধান্ত ব্যতীত এক কলমের খোঁচায় হয়ে গেলো অহিউল্লাহ সড়ক, রাস্তার নাম পরিবর্তনের বিষয়টি এত হাল্কা ও সহজভাবে নেওয়া উচিৎ নয়। নতুবা নামকরণ মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় লিখা নাম মাহুতটুলিতে প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমানের নানা মুন্সি আপ্তাব উদ্দিন আহমাদ সাহেবের বাস ভবন ছিলো। এ বাড়ীতেই কবির জন্ম। টমি সাহেব নামে এক দেশী সাহেবের বাগান যুক্ত বাড়ী ছিলো। তৎকালে মহল্লায় বাড়ীটি বেশ সুন্দর ছিলো। ছিলো প্রভাবশালী, খ্যাতনামা তামাক ও সাবান ব্যবসায়ী মহল্লা সর্দার আলী জান বেপারীর বাসস্থান। যিনি ঢাকার ঐতিহাসিক তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে একটি অতি সুন্দরতম মসজিদে পরিণত করেছিলেন। বৃটিশ রাজ্যের একেবারে শেষ অধ্যায়ে ঢাকার মুসলমানদের ক্লাব ও সমিতি গুলোকে নিয়ে যে সেণ্ট্রাল ক্লাব কমিটি গঠিত হয়েছিলো পরবর্তীতে তার সভাপতি পদে আসীন হয়েছিলেন (মরহুম) আঃ মালেক সরদার পাক আমলে সমাসাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তিনি ঢাকা পৌর সভার সদস্য হন।

সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, এটি ইসলামপুর এলাকার একটি গলিপথের নাম। এ গলি পথেই ঢাকা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা নবাব ইসলাম খাঁর ঐতিহাসিক ইসলাম খাঁ নির্মিত মসজিদ রয়েছে। অবশ্য বর্তমানে মসজিদটি সম্প্রসারিত হয়েছে। রয়েছে অনেক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের বাড়ী। জনাব সৈয়দ আওলাদ হোসেন ১৯০৫ সালে ঢাকা পৌর সভার কমিশনার ছিলেন। ইতিপূর্বে ডিষ্ট্রিক রেজিষ্ট্রারও ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকার হতে খাঁন বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্তি হন। তিনি ঢাকার একজন বিখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, বহু পুস্তক রচনা করে গেছেন তন্মধ্যে ফার্সী পুস্তক অন্যতম। তারই নামানুসারে ইসলামপুর এলাকার লায়ন সিনেমার নিকট হতে নবাব ইউসুফ রোড তথা সিরাজ উদ্দৌলা পার্ক পর্যন্ত রাস্তাটির নামকরণ হয় সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন। তিনি কলিকাতার অধিবাসী হলেও উনবিংশ শতাব্দীতেই ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চলে আসেন।

এই লেনে সবচেয়ে খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন বৃটিশ যুগের শেষ দিকে মির্জা

আবদুল কাদের সরদার। তাঁর পিতা মঃ হায়াত ঢাকার প্রথম মুসলমান সেটেলমেণ্ট অফিসার ছিলেন। তাঁর কাজে, তাঁর লিখায়, কাব্যে ও অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে বৃটিশ সরকার তাঁকে মির্জা উপাধি প্রদান করেন। তাদের পরিবারে কেউ কেউ বলে থাকেন তাদের বংশধর কাশ্মীর থেকে ঢাকায় আগমন করেছিলেন এবং ইসলাম খাঁর ভ্রাতা নাদের খাঁর বংশধর।

যাক সে কথা, মির্জা হায়াতের তিন পুত্র যথা মির্জা আঃ কাদের, মির্জা ফকির মহম্মদ ও মির্জা মাহমুদ। তন্মধ্যে দুজন সমাজে পরিচিত। মির্জা ফকির মহম্মদ একজন উর্দু কবি এবং সেটেলমেণ্ট অফিসার ছিলেন। তিনি ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর একজন সহচর ছিলেন। মির্জা আবদুল কাদের ও তাদের পরিবার সংস্কৃতিবান ছিলেন। ঢাকার মুসলিম সমাজে নাট্যশিল্প ও সংস্কৃতির প্রচলন বলতে গেলে তাঁরাই করে গেছেন। তজ্জন্য লোক নিন্দা তাদের কম সহ্য করতে হয়নি। ওসব সহ্য করেই তারা সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছেন।

লক্ষ্মী বাজারের বিশিষ্ট সংস্কৃতিবান ব্যক্তি পরশুরাম দাস বর্তমান লায়ন সিনেমা স্থলে সৌখিনি থিয়েটার ডায়মন্ড চালাতেন। অন্যমতে ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছেন জগন্নাথ কলেজ ও জুবিলি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কিশোরী রায় লাল চৌধুরী। হয়তো পরশুরাম দাস ইহা পরিচালনা করতেন। এতে মির্জা আঃ কাদের তরুণ বয়স থেকেই জড়িত ছিলেন। পরশুরাম বার্ধক্য অবস্থায় পৌছুলে থিয়েটার হলটি মির্জা আঃ কাদেরকে বুঝিয়ে দেন। সে সময় মির্জা কাদের পিতার অর্থে ইসলামপুরে লিলি ষ্টোর নামে একটি দোকান পরিচালনা করতেন। দোকানের আয় থিয়েটারে ব্যয় হতে থাকলে দোকানটির পুজি নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে দোকান বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাংলা থিয়েটারকে কনভার্ট করে হিন্দি কমার্শিয়াল থিয়েটার করলেন ডায়মন্ড থিয়েটারকে। বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকে এক প্রচন্ড ঝড়ে ডায়মন্ড নাট্যশালা বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় মির্জা কাদের বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বগুড়া ও অন্যান্য স্থানে ভ্রাম্যমান নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন অর্থের বিনিময়ে। তাঁরপর নতুনভাবে ঢাকার ডায়মন্ড নাট্যমঞ্চ পুনঃ নির্মিত করে তার নাম দেওয়া হয় লায়ন থিয়েটার। তাঁর পরই নির্বাক সিনেমার প্রচলন হয়। ঢাকার আর্মেনিয়ানরাই প্রথম নির্বাক সিনেমার প্রচলন করে পিকচার প্যালেস নাম দিয়ে আরমানীটোলায় একটি সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করে। তা দেখেই মির্জা কাদের তাঁর লায়ন থিয়েটারে নির্বাক ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ১৯২৭ সালে লায়ন থিয়েটারের পরিবর্তে তাঁর নাম করেন লায়ন সিনেমা। আজও এ সিনেমা হলটি আওলাদ হোসেন লেনে পূর্ব স্মৃতি নিয়ে

প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তবে এর আঙ্গিক বদল হয়েছে সম্মুখে হয়েছে মার্কেট।

মির্জা আঃ কাদেরের ভ্রাতা কবি মির্জা ফকির মহম্মদ ১৯৪৫ সালে মারা যান। তার নামানুসারে এ পথে একটি পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎপুত্র মরহুম আবু নাসের আহম্মদ, তিনিও ঢাকা পৌর সভার সদস্য ছিলেন। মির্জা আবদুল কাদেরের একমাত্র পুত্র মির্জা আবদুল খালেকও ইসলামপুর অঞ্চলের মনোনীত চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। পিতা মির্জা আবদুল কাদের বৃটিশ আমলে কয়েক বছর নির্বাচিত পৌর কমিশনার পদে ছিলেন।

মির্জা আবদুল কাদেরের সঙ্গে ঢাকার নবাব পরিবারের সংযোগ ঘটার পর থেকে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়, ফলে তিনি ঢাকার তৎকালীন বাইশ পঞ্চায়েতের প্রধান সর্দার নিয়োজিত হন। ১৯০৫ সালে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ মির্জা আবদুল কাদেরকে সরদারী পাগড়ি প্রদান করেছিলেন। তখন ঢাকার সকল মুসলিম মহল্লা নিয়ে সামাজিক কাজকর্ম ও মহল্লা অধিবাসীদের বিরোধ মীমাংসার জন্য বাইশটি পঞ্চায়েত গঠিত হয় এবং একটি পঞ্চায়েতের জন্য এক একজন সর্দার মনোনীত হন। কোন কোন মহল্লায় সহকারী তথা নায়েব সর্দারও নিযুক্ত হন মির্জা আবদুল কাদের নবাব সাহেবের অনুকম্পায় শুধু বাইশ পঞ্চায়েতের সরদার হননি। তার বহুমুখী প্রতিভা ও গুণ ছিল। প্রখর এবং উপস্থিত বুদ্ধি, সৎসাহস, অর্থ, যশ, বিচার আচার, দয়া দাক্ষিণ্য বিশেষ করে জাতী ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার সেবার আদর্শে ব্রত ছিলেন। দেখতে শুনতে তিনি অত্যন্ত পাতলা গড়ন ও বেটে ছিলেন। কিন্তু চোখ দুটি তার অত্যন্ত প্রখর ছিলো। তার চোখেচোখ মিলালে এবং তার রুদ্র মুর্তি দেখলে যে কোন সাহসী গুন্ডাবদমাইসও মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারতো না। এমনি বহু গুণে গুনান্বিত মির্জা আবদুল কাদের সরদার বাইশ পঞ্চায়েতের সরদারগণের প্রধান হয়ে ঢাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে গিয়েছিলেন। তার মত বিচক্ষণ সরদার আর জন্মেনি। তিনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও বেশ সচেতন ছিলেন। নবাব পরিবারে তিনি একজন বিশ্বস্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন। ঢাকার আহসান মঞ্জিলের নবাবী আমলের শেষ দিকে রাজনৈতিক ও ঢাকার সামাজিক বিষয়াদি বিশেষ করে পঞ্চায়েত নিয়ে পরবর্তীতে নবাব হাবিব উল্লাহ ও তাদের পরিবারের অনেকের সঙ্গে তার মত বিরোধ দেখা যায়। বৃটিশ শাসনামলের শেষ দিকে খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলার প্রধান মন্ত্রীত্ব থাকা কালে তাকে ঢাকা থেকে বহিস্কারাদেশ দেওয়া হয়। ফলে কাদের সরদারকে প্রায় তিন মাসাধিকাল ঢাকার বাহিরে থাকতে হয়।

নবাব পরিবারের সঙ্গে তাঁর শত মতবিরোধ থাকলেও তাদের সম্মানের প্রতি তিনি কোন দিন অশ্রদ্ধাবোধ দেখাননি। তাদের বিপদকালে অর্থনৈতিক দৈন্যতার সময় সহায়তার হস্ত সম্প্রসারিত করেছেন। জানা যায় পাক আমলের প্রথম দিকে প্রভেন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের অর্থ তসরুফ ব্যাপারে ঢাকার নবাব হাবিব উল্লাহ বাহাদুর, তার বেগম এবং তৎকালীন গণপরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং মন্ত্রী এক মামলায় অভিযুক্ত হলে নবাব সাহেব করাচীর সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হয়ে জামিন লাভ করেন। অতঃপর এই কাদের সরদারই সকল মতভেদ ভুলে নবাবের মর্যাদারক্ষায় এগিয়ে যান এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে ধরে ৬৮০০০/- আটষট্টি হাজার টাকা পরিশোধ করে তাদের অভিযোগ থেকে রেহাই দান করেন। এখানেও তার মহানুভবতা প্রকাশ পায়। কেন না নবাব হাবিব উল্লাহর সঙ্গেই তার বিরোধ ছিলো প্রবল।

তিনি বহু লোককে উচ্চাসনে বসানোর জন্য নিজের অর্থ, প্রভাব প্রতিপত্তি সবই প্রয়োগ করতেন। যেমন বৃটিশ শাসনামলে ধীরেন বাবু পৌর চেয়ারম্যান থাকাকালে কাদের সরদারের প্রচেষ্টায় এডভোকেট নঈমুদ্দিন ভাইস চেয়ারম্যান হতে পেরেছিলেন। মির্জা কাদের সর্দার রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিম লীগের একজন প্রথম কাতারের নীরব নেতা ছিলেন। নিজে নেতা হতেন না অন্যকে নেতা বানানোর মধ্যেই তিনি আনন্দ খুঁজে পেতেন। কিন্তু তার জীবনে এ সব ব্যক্তিদের প্রভাব নিয়ে কারো বা কোন গোষ্ঠীর উপর অন্যায় অবিচার করতে দেখা যায়নি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় বিরোধি দল গঠনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ঢাকার আনাচে কানাচে বক্তৃতা বৈঠক করে বেরিয়েছেন। বিরোধি নেতাদের তিনি নিজের বাসায় অতিথি হিসাবে রেখেছেন এবং বিভিন্ন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ বিরোধি শিবিরকে সহায়তা করেছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও কথার বিশ্বাসেই ঢাকার তৎকালীন আদি অধিবাসীরা কট্টর মুসলিমলীগ পন্থী হওয়া সত্ত্বেও যুক্ত ফ্রন্টের পত্যাকা তলে সমবেত হন এবং যার ফলশ্রুতিতে ঢাকার আসনে মুসলিম লীগ পরাজিত হয় এবং যুক্ত ফ্রন্ট জয়লাভ করে। এর আগে বিরোধি দলের সভা প্রায়ই ভণ্ডুল করে দেওয়া হতো। এগুলোরও প্রতিরোধে কাদের সর্দার এগিয়ে গেছেন তার শক্তি সামর্থ দ্বারা। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনেও তার অনেক অবদান রয়েছে।

২য় মহাযুদ্ধকালে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশে দেখা দেয় তার বহিঃপ্রকাশ ঢাকায়ও ঘটে। গ্রামগঞ্জ থেকে প্রত্যেহ বহু লোক খাদ্যের আশায়, সাহায্যের আশায়, কর্মের আশায় ঢাকা শহরে এসে অনাহারে আর মহামারীতে মারা যায়। এসব মৃত

মুসলিম লাশগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে কবরস্থ করার জন্য তৎকালে ঢাকায় কাউকে দেখা যায়নি। তখন কলকাতা শহরে আনজুমান মফিদুল ইসলাম এধরনের কাজ করে খুবই প্রশংসা লাভ করেছিলো। কিন্তু ঢাকায় অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান ছিলো না। এমতাবস্থায় কাদের সরদার তার অর্থ ভান্ডার নিয়ে এগিয়ে আসেন, এসব লাশ সমাহিত করার জন্য। বেশ কিছু লোক এবং কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ী একাজে নিয়োগ করেন। ঢাকার অধিকাংশ মুসলমান তিনি সিনেমা চালিয়ে অর্থ উপার্জন করেন বলে তার অর্থ কোন ধর্মীয় কাজে লাগাতেন না, যেমন মসজিদ তৈরী মাদ্রাসা বা অন্য কোন দ্বীনি কর্মসূচীতে। কিন্তু বহু বিত্তশালী লোক ঢাকায় থাকলেও দ্বীনি কাজ তথা দুঃস্থ ও বেওয়ারিশ মুসলিম নর-নারীর লাশকে দাফন করার জন্য এগিয়ে আসতে দেখিনি, কাদের সরদারকেই দেখেছি। তখন কিন্তু এ কাজে কাউকে প্রতিবাদ করতে দেখিনি। দেখিনি পবিত্র রমজান মাসে যখন ঘোড়ার গাড়ী করে মসজিদে মসজিদে ইফতারের জন্য বিরানী পোলাও পাঠাতো।

যাক সে কথা, ঢাকায় প্রায়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতো, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই। তবে তা তৃতীয় চতুর্থ দশকে প্রবল আকারে দেখা যায়। মুসলমানরা লেখাপড়া না জানায় এবং পুলিশ বিভাগে ও আদালতে মুসলমান কর্মচারী সংখ্যা অতি অল্প থাকায় ঢাকার মুসলমানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রেফতার হতো এবং মামলায় জড়িয়ে পরে জামিন না পেয়ে মাসের পর মাস এমনকি বছরাধিকাল হাজতবাস করতো। এর প্রতিকারেও কাদের সরদার এগিয়ে আসেন। তিনি একটা লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করে তদ্বারা নিজের অর্থে গ্রেফতারকৃত ও অভিযুক্ত মুসলমানদের মুক্তির ব্যাপারে সক্রিয় সহায়তা করে চলেন। ঢাকার আইন জীবিদের মধ্যে সাবেক মুখ্য মন্ত্রী সর্ব জনাব নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার। মন্ত্রী আঃ লতিফ বিশ্বাস মৌলভী ইব্রাহিম (পরবর্তীতে বিচারপতি হয়েছিলেন) কফিল উদ্দিন চৌধুরী, রেজাউল করিম, মেসবাহ উদ্দিন আহম্মদ, নঈম উদ্দিন, শামসুল হক মোক্তার প্রমুখ ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তাছাড়া যে সব মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াতো সেগুলোর জন্য শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রমুখ খ্যাতনামা আইনজীবিগণ কাদের সরদারের সহায়তায় কাজ করেছেন। তজ্জন্য পরবর্তীতে এসব খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে তার খুবই সৎভাব ও বন্ধুত্ব ছিলো। অবশ্য হিন্দু সম্প্রদায়দের অনুরূপ ডিফেন্স কমিটি ছিলো-আনন্দরায় উকিলের বাড়ীতে। তাদের মধ্যে তখনকার খ্যাতনামা উকিল শশাংক ঘোষ অন্যতম। মির্জা কাদের সরদার প্রতিভাবান রাজনৈতিককর্মী ও নেতাদের আশ্রয় সহ

সার্বিক সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। যে কারণে আজও বহু সরকারী ও বিরোধি দলের নেতাগণ এ পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কাদের সরদারের বাস ভবনে যে সব নেতা উপনেতা বিশিষ্ট ব্যক্তি অতিথি হিসেবে আসতেন তন্মধ্যে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবই একাধারে অনেক দিন থাকতেন। মুসলিম লীগ আমলে ও লীগ বিরোধি মোর্চায় থেকেও একাধারে থাকার জন্য বাড়ীতে বাসন কোসন পেয়ালা চামচ থেকে শুরু করে সব কিছুই তার আলাদা থাকতো। তজ্জন্য বাড়ীর সবাই বলতো এটা হক সাবের ওটা হক সাবের। সেসব অন্যকে ব্যবহার করতে দেওয়া হতো না। এককথায় তিনি ছিলেন এ বাড়ীরই একজন।

তাই হক সাহেব আর কাদের সর্দারের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শ্যামা- হক মন্ত্রী সভা প্রাক্কালে ঢাকায় একটি জনসভা করার জন্য মূখ্যমন্ত্রী জনাব হক সাহেব ঢাকায় আসেন। সভাস্থল নির্ধারিত হয় সদরঘাটস্থিত করনেশন পার্কে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন তার মন্ত্রিসভার সদস্য নবাব হাবিব উল্লাহ বাহাদুর। সভার আয়োজন ঠিকই হলো কিন্তু হঠাৎ করে সভা আরম্ভের পরই সভা পন্ড করে দেওয়া হলো। এতে হতচকিত হলো ঢাকার মুসলিম লীগ বিরোধি পক্ষ, যে, হক সাহেবের মত লোকের সভা পন্ড করে দেওয়া হয়েছে। শহরে উত্তেজনা দেখা দিল। পুলিশ যথা সময়ে সভাস্থল নিয়ন্ত্রণে এনে নেওয়ায় কোনরূপ শান্তি ভঙ্গ হয়নি সে দিন। তবে নবাব বাহাদুর খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি রাত্রেই আহসান মঞ্জিলে ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সভা করে আরেকটি জোরদার সভা করার প্রস্তাব রাখলেন। সভায় মতদ্বৈততা দেখা দিলো। এলাকার অধিবাসীদের প্রায় সকলেই মুসলিম লীগের কর্মী ও সমর্থক থাকায় সভার আয়োজন করার সাহস পেলনা কেহই। সেমতাবস্থায় কাদের সর্দার এগিয়ে এলেন ফজলুল হক সাহেবের পাশে, তিনি দুই দিনের মাত্র ব্যবধানে নয়া বাজারস্থ সিরাজ উদ্দোলা পার্কে সভার ব্যবস্থার ভার নিয়ে একটি সুন্দর মঞ্চ তৈরী করালেন। জনগণের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, কাদের সর্দার সে সবে ভ্রূক্ষেপ না করে সভা অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করলেন। সভা বিকেল ৩টায় হবে। কিন্তু হঠাৎ দুপুর বারটার দিকে এক দল লোক এসে কয়েক মিনিটের মধ্যে মনোরম মঞ্চটি জ্বালিয়ে দিল, সরদারের উপস্থিত কর্মীরা ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেলো ফলে সভা এবারও পন্ড হলো। কিন্তু কাদের সর্দারের সঙ্গে নবাব পরিবারের খাজা সেলিম ও খাজা সৈয়দ সাহেবে আলম ওরফে কালু মিয়ার মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করলো।

অপর দিকে, জনাব কাদের সর্দার সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে থাকলেও ঢাকায়

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যখন চরম পর্যায়, একদিন হিন্দু বেশ্যা অধ্যুষিত নবরায় লেনে অবস্থিত মসজিদ দুটিতে বন্দে মাতরম ধ্বনি দিয়ে আক্রমন করলো হিন্দুরা। সে গলিতে কোন মুসলমান বসবাস করতো না। নামাজের সময় ইসলামপুরের ব্যবসায়ী মুসলমানরা শুধু নামাজ আদায় করতে যেতো। তজ্জন্য ইমাম সাহেব রাখার ব্যবস্থা মসজিদ দুটোর অন্যান্য ব্যয়ভারও সর্দার করতেন, কেননা মসজিদ দুটোর কোন আয়ের পথ ছিলো না। হিন্দু বেশ্যাগণ উক্ত নবারায় লেনে থাকলেও মুসল্লিদের সঙ্গে কোন সময় বেয়াদপি করতো না। হিন্দুগণ মসজিদ আক্রমন করলে ইমাম সাহেব ছাদ টপকিয়ে কোনরূপে কাদের সর্দারের বাসায় গিয়ে সংবাদ পৌছালেন, সাথে সাথে ইসলামপুর-আসেক লেন হতে শত শত মুসলিম যুবক আল্লাহ্ আকব্বর ধ্বনি দিয়ে সর্দারের নির্দেশে নবরায় লেনে ঢুকার চেষ্টা করলেন, কতক যুবক অতিসাহস করে মসজিদের নিকট গিয়ে আক্রমনকারীদের বাধা দিলে হিন্দুগণ মসজিদ ধ্বংসের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে দ্রুত পালিয়ে গেলো। সর্দারের এ হেন ব্যবস্থায় এলাকার মুসলমানরা আল্লাহর শুকুর গোজার করলো। এ ধরনের বহুমুখী প্রতিভার লোক খুব কমই ঢাকায় জন্মেছে। ঢাকাবাসী আজ তাঁকে ভুলতে বসেছে। ঢাকার ইতিহাসের পাতা থেকে কাদের সর্দারের নাম যারা মুছে ফেলার চেষ্টা করছে তারা ঢাকার ইতিহাসকেই বিকৃতি করবে।

এহেন মহানুভব ও প্রভাবপ্রত্তিশালী সংস্কৃতিক পুরোধা সামাজিক তথা প্রতিভাবান ও রাজনৈতিক নেতার কথা লিখতে গেলে কয়েকটি পুস্তক রচনা করা যেতে পারে।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ঢাকার কত রাস্তা ও অলিগলির নাম সামান্য কারণে ব্যক্তি বিশেষের নামে নামকরণ করা হয়েছে, সরকারী বা পৌর-মিলনায়তনগুলোর নামকরণ হচ্ছে অথচ বহুগুণে গুনান্বিত ঢাকার এমন এক মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নামে না কোন রাস্তা না কোন সাংস্কৃতিক মিলনায়তনের নাম সরকারী বিশেষ করে পৌর কর্পোরেশন থেকে রাখা হয়নি। এর চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে। অবশ্য পৌর কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র নাজিউর রহমানের আমলে ঢাকার প্রায় ডজনখানেক সর্দারদের নামে কতক নতুন রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে রায় সাহেব বাজার মসজিদের নিকট হতে সাবেক ওয়াইজ বাজার পুল তথা নর্থ সাউথ রোডের পূর্ব মাথা পর্যন্ত ধোলাই খালের উপর নির্মিত এ নতুন রাস্তাটির নাম মির্জা আঃ কাদের সর্দারের নামে নামকরণ হয়েছে। সরকার বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছেন। কিন্তু এটা কতদূর সফল হবে জানি না। এ রাস্তার দক্ষিণে অবশ্য সাবেক ইংলিশ রোডটি পূর্ববৎ রয়েছে। পৌর কর্পোরেশনের সেই সভায় আমি এ প্রস্তাবের সঙ্গে নর্থ

সাউথ রোডটিকে নবাব সলিমউল্লাহর নামে নামকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করলে কতক কমিশনার তার বিরোধিতা করায় প্রস্তাবটি পরবর্তীতে বিবেচনার জন্য স্থগিত হয়ে যায়। এটা এক দুঃখজনক ব্যাপার।

কাদের সর্দারের শালিসের কথা শুনলে জাদরেল গুন্ডারাও ভয় পেতো আর সাধারণ লোকের অবস্থাতো আরও করুণ হয়ে উঠতো। বিশেষ করে যে সব মাতাগণ পুত্রের বিরুদ্ধে খায় খোরাকী না দেওয়ার জন্য যেতেন তাদেরকে এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধীকে তার নিজস্ব লোক দ্বারা হাণ্টার দিয়ে পেটাতেন; তাঁর মার খেয়ে সোজা হয়ে যেতো প্রায় অপরাধীই। সাধারণ অপরাধীদের অনেক সময় নিজ হাতে খুব আচ্ছামত মেরে বা জুতা পেটা করে শেষে কচকচে কয়েকটা ১০/৫ টাকার নোট ধরিয়ে দিতেন। মারের কথা ভুলে গিয়ে নোট হাতে পেয়ে খুশীতে ডগমগিয়ে দোয়া করতে করতে বের হয়ে যেতো। অভাবীরা তার প্রচন্ড ধমক খেয়েও যারা টিকে থাকতো তারা মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে ফিরতো। তিনি যেমন দয়ালু তিমনি ধর্ম পরায়ণ ছিলেন। আজমীর শরীফে যাতে ঢাকাবাসী সুবিধেমত থাকতে পারে তজ্জন্য একটা বাড়ী নির্মাণ করেছেন যার নাম কাদের মঞ্জিল। সেটা এখনও আছে।

সিনেমা চলাকালে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য শো বন্ধ হয়ে গেলে দর্শকরা চেয়ার ভাঙ্গার চেষ্টা করে বিফল হয়ে গালি গালাজ আরম্ভ করলে প্রায়ই সরদার স্বয়ং উপরে বেলকুনির সামনে গিয়ে রুদ্র মূর্তি নিয়ে দাঁড়াতেন। তার আগমন বার্তা পেয়ে তখন সবাই চুপ হয়ে যেতো যেন কিছুই হয়নি। সাধারণতঃ নিম্ন ক্লাশের দর্শকরাই হৈচৈ করতো বেশী আর সে সব ক্লাশের চেয়ারগুলো ছিলো অত্যন্ত পুরু ও ভারী। ভাংগতে গিয়ে নিজেরাই দুঃখ পেতো, দুই তিন আনা পয়সা যোগার করেই তরুণ যুবকরা ছুটতো চুঙ্গা ফিল্ম দেখতে। তখন আজকালকার মত মারদাঙ্গা, তলোয়ারবাজী, ঘুষাঘুষি দেখার জন্য ঐ হলেই ভীড় হতো, অন্য সব হলে সামাজিক ছবিই বেশী প্রদর্শিত হতো।

আমাদের আজাদ মুসলিম ক্লাবের ইতিহাসেও তার নাম জড়িত রয়েছে। ১৯৫১ সালে যখন আমরা ক্লাব ঘরটি স্থানান্তর করে বর্তমান স্থানে নিয়ে যাই। তখন আমাদের তহবিল শূন্য। চেয়ার টেবিল কেনার মত আমাদের সামর্থ নেই। আমাদের মহল্লা সর্দার ও ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক (মরহুম) আব্রাহিম তার সিনেমা হলে চাকুরী করতেন। তিনি আমাদের অভিহিত করলেন যে লায়ন সিনেমা হলের বেশ কিছু লৌহ কাঠ দ্বারা সংযুক্ত চেয়ার পরিবর্তন করা হয়েছে। সেগুলো গুদামে রাখা আছে

বিক্রির অপেক্ষায়। তোমরা যদি সর্দার সাহেবকে বল তা হলে খুবই সস্তায় তোমাদের দিয়া দিতে পারে। আমরা কিছু তরুণ যুবক একদিন গিয়ে উঠলাম লায়ন সিনেমায়। তাকে দেখে আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দাড়িয়ে আছি কিছু বলার সাহস পাচ্ছি না। তিনি অবশ্য বুঝতে পেরেছেন আমরা কিছু বলতে চাই। আমাদেরকে তিনি প্রশ্ন করলেন কিছু বলবা। আমাদের মুখ আড়ষ্ঠ হয়ে এলো ভয়ে তবুও সাহস করে কাচুমাচু করে বললাম আমলীগোলা থেকে এসেছি। আমরা একটা ক্লাব করেছি কিন্তু ঘরের চেয়ার খরিদ করার মত পয়সা আমাদের নেই। আপনার হল থেকে বের করা কিছু চেয়ার যদি দিতেন তবে আমরা খুশী হতাম, তিনি বললেন এগুলো অত্যন্তভারী এবং এক সঙ্গে জড়ানো এগুলো কি করে ঘরে লইবা, টানাটানি করতে খুবই কষ্ট হবে। আমরা বললাম, পারবো আপনি মেহেরবাণী করে দিলেই হয়। ক্ষানিকক্ষন চুপ করে ম্যানেজারকে ডেকে বললেন এরা যে কয়টা চেয়ার নিতে চায় দুই টাকা দাম ধরে দিয়ে দিও। আমাদের বললো কুলি ও গাড়ী নিয়ে আস। আমরা বললাম, আমরাই বের করতে পারবো। যেমন কথা তেমন কাজ ম্যানেজারকে নিয়ে গুদামে চেয়ার টানতে গিয়ে মনে হলো সদর ঘাটের কামান টানছি। তবুও খুশীর উত্তেজনায় টেনে হিচরে বের করলাম প্রয়োজন মত। একটা বইল গাড়ী করে অনেক কষ্টে নিয়ে ক্লাব কক্ষে লাগালাম। বহু বছর এ চেয়ারগুলো ছিলো।

আওলাদ হোসেন লেনে আরো কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বসবাস করতেন। কাদের সর্দার কর্তৃক খরিদকৃত বর্তমান আশিয়া বিল্ডিংটি ছিলো নবকুমার দাসগুপ্ত বাবুর, যিনি নবকুমার ইনষ্টিটিউশন নামক একটি বিদ্যালয় ঢাকায় বকশীবাজারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাছাড়া খ্যাতনামা আয়ুবের্দীয় কবিরাজ পার্বতীচরন, খ্যাতনামা ফৌজদারী উকিল অনন্ত কুমার বোস এবং মুরা পাড়ায় জমিদার মুকুল ব্যার্নাজীর বাড়ী ছিল যেখানে, সেখানে আজ ইউনির্ভাসেল প্রেস এবং শ্রদ্ধেয় কবি শামসুর রাহমানের বাড়ী। এই মুকুল ব্যানার্জী ঢাকা কোর্টের অপর পারে মুকুল সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এই মুকুল সিনেমাই আজকের আজাদ সিনেমা হল। বর্তমানে ইসলাম খাঁর ঐতিহাসিক মসজিদটি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

মির্জা আবদুল কাদের সর্দার আজ আমাদের মধ্যে নেই তবে তার অনেক স্মৃতি অনেক কথা অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যে রয়েছে। তিনি ১৮৭৯ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৬৩ সালের ২৭শে আগষ্ট জান্নাতবাসী হন। তার কবর তাদের আজিমপুরস্থ পারিবারিক কবরস্থানে রয়েছে।

বংশাল এলাকার মালীটোলা নামটি আজও আছে যদিও এর কিছু অংশের নাম

হাজী মাঈনুদ্দিন রোড নামকরণ হয়েছে। মালী টোলায় মালীগণ বসবাস করতো। এরা মুসলিম শাসনামলে বিভিন্ন মহল্লা তথা বিভিন্ন বাগ হতে ফুল সংগ্রহ করে মালা, সেহরা, মালার চাদর, ফুলের গহনা তোড়া ইত্যাদি তৈরী করে বেচাকেনা করতো, তখন ঢাকায় বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ফুলের চাষ হতো যেমন বাগে হোসেন উদ্দিন, শাহবাগ, বাগেপাদশাহী, গোলাব বাগ, হাজারীবাগ ইত্যাদি স্থানে, তাছাড়া অনেক সুরুচী সম্পন্ন বাড়ীর মালিকরাও বাড়ীর একটি অংশে ফুলের বাগান রাখতো হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই। তখন নারীদের সৌন্দর্য্য চর্চার জন্য ফুলের গহনা মালা ইত্যাদি নিয়মিত ব্যবহৃত হতো। বেল ফুলের মালাতো চুলের খোঁপায় পরতোই। ফুল তখন সুরুচীর পরিচায়ক ছিলো। লোকে ভাল বাসতো ও ঢাকার মুসলমানরা সাধারণত যুই, বেলী, চামেলী, গোলাপ, গেন্দা, ইত্যাদি পছন্দ করতো হিন্দুদের মধ্যে কাঁঠাল চাপা, জবা, রক্তজবা, গেন্দা, (মেরীগোল্ড) শেফালী ইত্যাদির প্রচলন ছিলো। হিন্দু মুসলিমের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি হলেও ফুলের সমারোহ দেখা দিত বেশী, মসজিদ মন্দিরেও নিয়মিত ফুল রাখা হতো। ফুলের চাষ করা হতো প্রায় মসজিদ মন্দির ও উপাসনালয়ে। কবর গাহ ও মাজার শরীফেও ফুলের ব্যবহার ছিলো প্রচুর এখনও অবশ্য প্রচলন আছে তবে যায়গার অভাবে মসজিদগুলোতে ছোট খাটো যেসব বাগান ছিলো আজ আর সেগুলো দেখা যায় না সহজে। অবশ্য গ্রামগঞ্জে দেখা যায়। বর্তমানে বংশাল মালী টোলায় মালী সম্প্রদায় নেই বললেই চলে তাদের বংশধরগণ এখন অন্যান্য ব্যবসায় নিয়োজিত হয়ে গেছে।

এ মহল্লায় একটি শরীর চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো হাজী মঈনুদ্দিনের জমিতে। মালীটোলা রোডে একটি পুরাতন মসজিদ রয়েছে যা ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদটি মরহুম নিয়ামত উল্লাহ সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায় তার কবরও মসজিদ প্রাঙ্গনে রয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে মালীটোলার একটি অংশ ১৯৩২ সালে ঢাকা পৌরসভা সেখানকার দরদী সমাজসেবী হাজী মাঈনুদ্দিনের নামানুসারে নামকরণ করেছে। এ নামকরণ যথার্থ হয়েছে বলা যায় কেননা হাজী মাঈনুদ্দিন তাঁর নিজ বাড়ীতে মালীটোলা বালিকা বিদ্যালয়টি প্রথমে স্থাপন করেছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি নিজ খরচে পাশেই একটা জমিতে স্কুল ভবন নির্মাণ করে তথায় বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করেন। এ মহল্লায় একটি মসজিদ ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এতেও মঈনুদ্দিন সাহেবদের দান উল্লেখযোগ্য।

পাক তথা আইয়ুব আমলে সামান্য টাকার বিনিময়ে ঢাকা পৌর সভা তৎকালীন

স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল করিমের আবেদনক্রমে বিদ্যালয়টির নাম তৎ পিতা বংশালের মজু বেপারীর নামানুসারে হাজী মাজহারুল হক বালিকা বিদ্যালয় নামকরণ করেন। জনাব হাজী মাজহারুল হক ১৯৫০ সালে এবং তার পূর্বে তৎভ্রাতা শরিফ হোসেন মাষ্টার ঢাকা পৌর সভার কমিশনার ছিলেন। তাদের পিতার নামানুসারেই মনোয়ার খাঁ বাজার রোডের নাম হাজী ওসমান গণী রোড করা হয়। হাজী মাজহারুল হক বংশালের একজন বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। বেশ বিষয় সম্পত্তি রয়েছে তাদের। বৃটিশ শাসনের শেষ দিকে ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সেখানকার প্রায় আড়াই শত মামলার আসামীকে তিনি আশ্রয় দান করে তাদের মামলা মোকদ্দমা পরিচালনে সহায়তা করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ছিলেন, তজ্জন্য পাশ্ববর্তী হিন্দুদের সঙ্গে তার ভাল সম্পর্ক ছিলো। তিনি দয়ালুও ছিলেন। দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের পর যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন বেশ অর্থ তিনি দান করেন এবং চাউল আনয়ন করতঃ বিক্রয়ের পারমিট বের করে ন্যায্য মূল্যে চাউল বিক্রয় করেছেন।

হাজী মযহারুল হক বালিকা বিদ্যালয়ের অনুরূপ ঢাকা শহরে বহু পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে। তন্মধ্যে ঢাকা পৌর সভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী জনাব কে. এম. বশিরের নামানুসারে কে, এম, বশির প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়; তার দাদার নামানুসারে নারিন্দা কে, এম, হামিদ প্রাথমিক বিদ্যালয়; নবাবপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী, ঢাকা শহর রিকশা মালিক সমিতির সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম তাজ উদ্দিন আহমদের পিতার নামানুসারে হাজী গোলাম মওলা প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় গোপীবাগ এলাকার সাবেক চেয়ারম্যান আঃ খালেকের মাতার নামানুসারে স্বামীবাগ হাসিনা হাকিম বালক ও বালিকা বিদ্যালয়; শরাফতগঞ্জ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ব্যবসায়ী জনাব গিয়াস উদ্দিনের পিতার নামানুসারে কোব্বাদ সরদার প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়; ইসলামপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজসেবক মরহুম আবু নাসের আহমদের পিতার নামানুসারে ফকির মোহাম্মদ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, জগন্নাথ সাহা রোডের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সাবেক এমপি আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন এর নামানুসারে আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন শহীদ নগর প্রাথমিক বিদ্যালয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী স্বর্গীয় জগৎ মোহন বাবুর নামানুসারে জগৎ মোহন প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়; তেজগাঁও পশ্চিম ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শামসুল

আফতাবের পিতার নামানুসারে বি, কে, আফতাব প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়; সূত্রাপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান (মরহুম) আহমদ উল্লার পিতার নামানুসারে শফিউল্লা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়; ঢাকার বিশিষ্ট দানশীল, ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী ও প্রাক্তন কমিশনার (মরহুম) সিরাজ উদ্দীনের নামানুসারে সিরাজ উদ্দিন প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়; আজিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজসেবী ও মহল্লা সরদার, বৃটিশ আমলে সিভিল গার্ড বাহিনীর কর্মকর্তা এবং ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাতের পিতা মরহুম হাজী আবদুল গনির (তমঘা-ই-খিদমত) নামানুসারে হাজী আবদুল গনি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী ও নবাবগঞ্জ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শুকুর মোহাম্মদের মাতার নামানুসারে হাজী রাহেলা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়; হোসেনী দালান এলাকার পেয়ারু সরদারের নামানুসারে পেয়ারু সরদার প্রাথমিক স্কুল উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া ঢাকা মহানগরীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে এ ধরনের কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। তন্মধ্যে হাজারী বাগ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান এবং মহল্লা সরদার ও বিশিষ্ট সমাজসেবী মরহুম খলিলুর রহমানের মাতার নামানুসারে সালেহা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং দানশীল ও সমাজকর্মী জনাব আনোয়ার হোসেন, তদীয় ভ্রাতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ হোসেন ও আমার (লেখকের) মাতা শিক্ষানুরাগী মরহুমা জামিলা খাতুনের নামানুসারে জামিলা খাতুন লালবাগ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব রহমত উল্লার নামানুসারে রহমতউল্লাহ মডেল হাইস্কুল বলিয়াদির জমিদার ও বিশিষ্ট দানশীল ব্যক্তি ফরিদ উদ্দীন সিদ্দিকীর নামানুসারে স্যার সলিমউল্লহ মুসলিম এতিমখানার অভ্যন্তরে ফরিদ উদ্দীন সিদ্দিকী উচ্চ বিদ্যালয়, গেন্ডারিয়া এলাকায় শরাফতগঞ্জ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান (মরহুম) খানবাহাদুর মুজিবর রহমানের মাতার নামানুসারে মনিজা রহমান গার্লস হাইস্কুল এবং নাজিম উদ্দীন রোডে ঢাকা পৌরসভার সাবেক মনোনীত কমিশনার ডি, আই, টির সাবেক ট্রাস্টি ও বিশিষ্ট সমাজসেবক এ, ইউ, এম, ডি, খলিলুল্লাহর স্ত্রী আনোয়ারা বেগমের নামানুসারে আনোয়ারা বেগম মুসলিম গার্লস হাইস্কুলের নাম উল্লেখ করা যায়। কাজী রেয়াজুদ্দিন রোডে মরহুম গিয়াস উদ্দিন সাহেবের নামানুসারে গিয়াস উদ্দিন সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, জনাব গিয়াস উদ্দিন এক নৈশ বিদ্যালয় সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাক আমলে লেখক স্কুলটিকে নতুনভাবে নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করে এক পূর্নাঙ্গ বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। তাছাড়া বিদেশী রাষ্ট্র নায়ক ও

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শিক্ষাবীদদের নামেও কতিপয় বিদ্যালয় ঢাকায় রয়েছে তন্মধ্যে বাদশা ফয়সালের নামানুসারে বাদশা ফয়সল ইনষ্টিটিউট, ব্রাদার গাদ্দাফী কিন্ডারগার্ডেন স্কুল, কিং খালেদ ইনষ্টিটিউট।

আবার আল্লাওয়ালা বুজুর্গ ব্যাক্তিদের নামেও স্কুল রয়েছে, যেমন নল গোলায় নরসিংদি জেলার প্রভাকরদির বুজুর্গ শাহ্ আবদুল হামিদের নামানুসারে শাহ্ আঃ হামিদ কলন্দর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

ইহা ব্যতীত ঢাকার বহু মহল্লার নামানুসারেও প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে তন্মধ্যে যেমন আমলীগোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লালবাগ সরকারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, চৌধুরী বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাগলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বকশীবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নবাব বাগিচা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আজিমপুর মডেল সরকারী প্রাথমিক ও আজিমপুর আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বংশাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুরিটোলা সরকারী প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাহুতটুলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাজেদেওয়ান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রহমতগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাজিরা বাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বাংলা বাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, গোড়ে শহীদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গণকটুলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় লালবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২ রোকনপুর গালর্স স্কুল ইত্যাদি ব্যতীত আরো বহু মহল্লার নামানুসারে ঢাকায় বহু স্কুল, হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তেমনি বহু সুন্দর সুন্দর লোভনীয় আকর্ষণীয় নামেও কিন্ডারগার্ডেনসহ সব ধরনের স্কুল রয়েছে। সকল স্কুলের যথা ব্যক্তিকে নিয়ে মহল্লাভিত্তিক ও দেশী বিদেশী স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের নামে বিদ্যালয়ের তালিকা দিতে গেলে সেটাই একখানা বই হয়ে যাবে। একটি পুরনো তথ্য দিয়ে স্কুল নামের প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করবো। তথ্যটি হলো এই ১৮৩৮ সালে ঢাকায় ১১টি হিন্দু, ৯টি মুসলমান স্কুল ছিলো তন্মধ্যে হিন্দু স্কুলগুলোর শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিলো ৩২০ জন এবং মুসলমান ১১৫ জন ছাত্র বেতন দুই আনা মাত্র। তবে গরীবরা অনেকেই বেতন দিতো না।

হাজী মঈদুদ্দিন সাহেবের বাড়ীর নিকটে ইংলিশ রোডের সুন্দর রাস্তার ধারে কিছুটা যায়গায় বাঁশ বেচা-কেনা হতো বলে সে যায়গাটি বাঁশপট্টি নামে সুপরিচিত। এখনকার মসজিদটিও বাঁশপট্টি মসজিদ নামে আখ্যায়িত হয়ে আসছে। ১৯৮৪-৮৫ সালের দিকে পৌর প্রশাসক মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসানের আমলে অত্র এলাকা তথা ইংলিশ রোডের উত্তর পারে একটি বিরাট বিপনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলেও

বাঁশ পট্টির নাম একেবারে অবলুপ্তি হয়নি। এলাকার লোক বিপনী কেন্দ্রের একটি অংশকে এখনও বাঁশপট্টি বলে থাকে।

এ এলাকায় আরেকটি মহল্লা রয়েছে পুরোনো মোঘলটুলি। ১৬০৮ সালের পূর্বে অর্থাৎ ইসলাম খাঁর ঢাকা আগমনের পূর্বে একজন ফৌজদারের অধীনে পুরনো মোঘলটুলি এলাকায় একটি মোঘল আউট পোষ্ট ছিলো। সেখানে কিছু সংখ্যক মোঘল সৈন্য বসবাস করতো। তজ্জন্য ইউনিয়নের নামই পুরনো মোঘলটুলি ইউনিয়ন নাম ছিলো।

বেচারাম আনুমানিক ১৭৯০ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তৎকালে তার নামে একটি পানশালা ছিলো বলে জানা যায়। তার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য বিরাট একটি দেউড়ী ছিলো। দেউড়ী বলা হয় পাকা ফটককে। সেকারণেই মহল্লাটির নাম বেচারাম দেউড়ী নামকরণ করা হয়েছে। এখানে বুজের্গানেদ্বীন হযরত শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ আল কাদরী সাহেবের একটি মাজার রয়েছে। তিনি ১৩৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। কাশ্মীরি শাহ নামে তিনি সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন।

মোহনী মোহন দাস ছিলেন জমিদার, ব্যাংকার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তিনি মথুরা মোহন পোদ্দারের জৈ্যেষ্ঠ পুত্র। তার নামানুসারে ঢাকার একটি রাস্তার নাম মোহনী মোহন দাস রোড রাখা হয়। মথুরা মোহন দাস নিজ খরচে বহু ধর্মীয় ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে গেছেন। মোহনী মোহনের মামা ছিলেন জমিদার রূপলাল দাস ও রঘুনাথ দাস। তারা অত্যন্ত আনন্দময় জীবন যাপন করে গেছেন।

১৮৮৪ সালে একটি এ্যাক্ট জারী করা হয়। এই এ্যাকট অনুসারে আনন্দ চন্দ্র রায় ১৮৮৫ সালে নির্বাচিত হয়ে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা পৌর সভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি একজন আইনজীবি ছিলেন। তারই নামানুসারে একটি রাস্তার নাম রাখা হয় আনন্দ চন্দ্র রায় রোড। আরমানীটোলাস্থিত তার বাস ভবনেই আনন্দময়ী স্কুল প্রতিষ্ঠিত।

বাবুবাজার এলাকায় দু'জন প্রতাপশালী জমিদারের প্রাসাদোপম ভবন রয়েছে। তাদের একজন হলেন মোমেন শাহী জেলার হায়বত নগরের জমিদার আকমল খাঁন। তারই নামানুসারে বাবু বাজারের দক্ষিনাংশ আকমল খাঁন রোড নামকরণ হয়েছে। তিনি শ্যামপুরে নদীতীরে একটি সৌখিন বাগানের উন্নয়ন সাধন করেছিলেন এবং সেই বাগানের মধ্যে একটি সুরম্য ভিলা নির্মাণ করিয়েছিলেন। তার ভবনটি বাবুবাজার এলাকায় আমির উদ্দীন মসজিদ ও মাজারের কাছে অবস্থিত ছিল। মরহুম

আকমল খাঁন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার বংশধর বলে জানা যায়।

জমিদার আকমল খাঁর বিবিদের একজন এসেছিলেন ঢাকার বাড়ীতে। তাকে পালকীতে করে বাবু বাজার মসজিদের অপর পার্শ্বস্থিত গলিপথ দিয়ে জমিদার বাড়ীতে আনা হয়েছিল। সে সময়ই তিনি ঐ গলিটির নাম দিয়েছিলেন হায়বত নগর। তখন থেকেই ঐ গলিটি হায়বত নগর লেন নামে পরিচিত হয়ে আসছে। পৌর কর্তৃপক্ষও ঐ নামই অদ্যাবধি বহাল রেখেছেন।

বরিশাল অঞ্চলের এক জমিদার সৈয়দ হাসান আলী। বাবু বাজার মসজিদের উত্তরাংশে তাঁর বাসভবন নির্মাণ করেছিলেন। তাই তার নামানুসারে মহল্লাটির নামকরণ হয়েছে সৈয়দ হাসান আলী লেন। সৈয়দ হাসান আলীর পূর্ব পুরুষগণ নাকি সুদুর আরবদেশ হতে বাংলায় আগমন করেছিলেন। এ মহল্লায় এক খ্যাতনামা পরিবার ছিলো কাজী পরিবার। এই পরিবারের নামেই তাদের বাড়ীটি কাজী বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় দিল্লী থেকে কাজী পরিবারের ১ম ব্যক্তির আগমন। তৎকালীন মোঘল সুবেদারের অধীনে ঢাকার শহর কাজী অর্থাৎ বিচারক পদে নিয়োজিত হন। বৃটিশ যুগে শহর কাজীর পদ বিলুপ্ত হলে সেই পরিবারের কাজী আলিমুদ্দীন সাহেব মুসলিম বিবাহ রেজিষ্ট্রার ও কাজী নিযুক্ত হন। তিনি বহুবৎসর সুনামের সাথে বিবাহজনিত কাজীর দায়িত্ব পালন করে একশত পনর বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

১৭৭৫ সালের দিকে রায়হরিরাম মল্লিক ছিলেন ঢাকা কালেক্টরেটের একজন দেওয়ান। অনুমান করা হয়, তারই নামানুসারে রায়সাহেব বাজারের নাম রাখা হয়েছে। এই বাজারের নামানুসারে পার্শ্ববর্তী মহল্লাটি রায় সাহেব বাজার নামে ঢাকাবাসীর নিকট পরিচিত।

চাঁদনিচরণ বোস ঢাকা পৌর সভাকে একখন্ড জমি দান করেছিলেন। ১৯২২ সালে তার পুত্র খগেন্দ্র মোহন বোসের আবেদনক্রমে পৌরসভা অয়্যার স্ট্রীট ও র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটের মধ্যবর্তী একটি রাস্তার নাম চাঁদনি চরন বোস স্ট্রীট নামকরণ করেন।

সাত গম্বুজ মসজিদের নামানুসারে একটি সড়ক পথের নাম হয়েছে সাত মসজিদ রোড। মসজিদটি প্রথম দিকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র জাফরাবাদ এলাকায় বুড়িগঙ্গার উত্তর পারে অবস্থিত ছিলো। কিন্তু চঞ্চলা নদী বহু দূরে সরে গেছে। আজও মসজিদটি সাতটি গম্বুজ নিয়ে একটা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। কিছুকাল আগেও উক্ত এলাকাটি জনহীন মাঠ আর তার নীচে ছিলো জলা ভূমি। নদী একে ছেড়ে গেলেও আল্লাহর বিশ্বাসীগণ একে ছেড়ে যাননি। শায়েস্তা খাঁর আমলে এখান থেকে

যেমন সুমধুর আজান ধ্বনি উচ্চারিত হতো, আজও তেমনি সুললিত আজান ধ্বনি শোনার সাথে সাথে বিশ্বাসীদের মনের সকল বিভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। মনের মাঝে পবিত্রতা আর গভীর নিস্তব্ধতা নেমে আসে। তারা অপার করুনাময়ের দরবারে মোনাজাত করার উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়ে হাজির হন। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনি উচ্চারণের সাথে সাথে সকল নীবরতা ভঙ্গ করে ধনী-দরিদ্র ভিক্ষুক-দরবেশ নির্বিশেষে সকলেই এক কাতারে শামিল হয়ে খোদার দরগায় আত্ম নিবেদন করেন। নামাজীদের মধ্যে নেমে আসে গভীর প্রশান্তি। ইসলামের এই প্রশান্তি ও গভীর সংহতি বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের বহু জাতির প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করেছে। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে জেহাদ ও শাহাদত বরণ করতে। এ শান্তির ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত চিরঅম্লান ও সমুজ্জ্বল থাকবে এবং বিশ্বমানবের অশেষ কল্যান সাধন করবে। পথ ভ্রান্ত মানুষকে দেবে সত্য ও ন্যায়ের পথের সন্ধান, বিদিশাকে দেবে আত্মোপলব্ধির প্রশান্তি। এ মসজিদটি স্থাপন করেছিলেন নবাব শায়েস্তা খাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র বুজুর্গ উদ্দিন (উমিদ) খাঁ।

সাত মসজিদ প্রাঙ্গনে বিবির মাজার বলে কথিত একটি দরগাহ আছে এটি ছোট খাটো একটা কেল্লার মত ছিলো তা শায়েস্তা খাঁর কন্যা বেগম বিবি ও গোলজার বিবির বলে জানা যায়। এর নিকটেই রয়েছে দারা বেগমের স্মৃতি সৌধ, তার অনতি দূরেই রয়েছে আলী কুরী মসজিদ।

স্যার নবাব আঃ গনি সাত মসজিদটির সংস্কার করে একজন মোল্লা রেখেছিলেন। তার ভরণ পোষণের জন্য প্রায় বার পাখী জমির উপসত্ব এবং বেতনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্তমানে এলাকাটি পুনরায় ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, মসজিদে একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃটিশ আমলেই এটি পুরাকীর্তি তথা আরকোলজি দফতরের আওতাধীনে চলে যায়।

জগন্নাথ কলেজের ফার্সির শিক্ষক হরিমোহন মুন্সী দাসের নামানুসারে ১৯০৪ সালে ঢাকার একটি রাস্তার নাম হরিমোহন মুন্সী লেন রাখা হয়েছে। তিনি ফার্সি ও হিন্দি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন।

১৯০৬ সালের মানচিত্রে 'কুচা পাতলা খান' বলে একটা জায়গা চিহ্নিত রয়েছে। ফার্সি ভাষায় কুচা মানে গলি। এই গলিতে পাতলা খান নামে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি বাস করতেন বলে জানা যায়। তাঁকে সবাই যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। তারই নামানুসারে পাতলা খাঁন লেনের নামকরণ হয়েছে।

শিরিশ দাস লেন, ঐ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি শিরিশবাবুর নামানুসারে গলি পথটির

নামকরণ হয়। শিরিশ বাবু একজন নামকরা শিকারী ছিলেন। তার বাড়ীতে বহু জাতীয় পশু পক্ষীর ছাল বা চামড়া ছিলো। এসব চামড়া অভ্যাগতদের স্মরণ করিয়ে দিতো তিনি যে একজন প্রখ্যাত শিকারী।

১৯৩০ সালে আবু জাফর জিয়াউল হক-এর ডাকনাম অনুযায়ী একটি গলির নাম রাখা হয় নাবালক মিয়া লেন। পূর্বে এ লেনের নাম ছিলো তাঁরই আসল নামে আবু জাফর লেন। ১৮৮৪ সালের পূর্বে গোবিন্দ দাস ছিলেন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার। তিনি একজন নামকরা কবি ছিলেন। মাহুতটুলীর একটি গলির নাম তারই নামানুসারে গোবিন্দ দাস লেন রাখা হয়েছে। ক্রীতদাসের হাটকে ফার্সিতে "নাখাস" বলা হয়। মধ্য যুগে দাস ব্যবসার প্রচলন ছিলো। হয়ত পুরনো জামানায় যে স্থানে দাস ব্যবসা চলতো সেই জায়গাটি পুরানা নাখাস নামে পরিচিত হয়ে আসছে। পূর্বে রজনী বোস রোডটির নাম ছিলো মীর আতার রোড। মীর আতার পুরো নাম মীর আতাউর রহিম। তিনি ছিলেন বলিয়াদি পরগনার জমিদার এবং মগবাজারের শাহ মোহাম্মদীর একজন শিষ্য। হোসেনী দালানের পশ্চিমে তার বাড়ী ছিলো। পরবর্তীকালে রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে রজনী বোস রোড রাখা হয়। রজনী বোস ছিলেন ধীরেন বোসের পিতা।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের নামানুসারে স্বাধীনতার পর রমনা এলাকায় ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তন থেকে নতুন এয়ারপোর্ট রোড পর্যন্ত রাস্তাটির নামকরণ হয় নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ। কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমানের আসান সোলের অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে ১৩০৬ বাংলা সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা কাজী ফকির আহমদের পূর্ব পুরুষ সম্রাট শাহ আলমের সময় পাটনা থেকে আগমন করেন। কবির ডাক নাম দুখু মিয়া। তার বাল্যজীবন অপরিসীম দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত হয়। বাড়ী থেকে বের হয়ে কোথাও সামান্য বেতনে চাকুরী, কখনও লেটো দলের (যাত্রা দল) ওস্তাদগিরি ও গীত রচনা করেছেন। কিশোর বয়সেই সুর সংযোজন এবং কবিতা লিখার বৈচিত্র দেখা যায়। মক্তবে শুধু পড়তেন না পড়াতেনও তাই ছাত্র ছাত্রীরা তাকে ছোট ওস্তাদজী বলে ডাকতো।

তিনি ইংরেজী ১৯১৭ সালে ৪৯তম বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করেন। তখন এই বেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ঐ রেজিমেন্টে যোগদান করে কিছু দিনের মধ্যে হাবিলদার হয়ে যান। সৈনিক থাকা অবস্থায়ও তার লিখা কবিতা ছাপানোর জন্য কাগজে আসতো। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দিলে পুনরায় বাংলায় ফিরে আসেন। ১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলেস ভারত আগমন কালে ভারতীয়

কংগ্রেস সারা ভারতে হরতাল আহ্বান করে। কবি তখন কুমিল্লায়, বাধঁন হারা, গৃহছাড়া বাউন্ডুলে নজরুল বেড়াতে এসে প্রেমের বাঁধনে আটকে পড়েন, হরতাল উপলক্ষে স্থানীয় কংগ্রেস নেতাগণ তাকে বিক্ষোভ মিছিলের গীত রচনার জন্যে বললেন তিনি শুধু গীত রচনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। নিজে সে গীত গেয়ে কুমিল্লার পথ ঘাটের মানুষগুলোকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মাতিয়ে তোলেন। কুমিল্লায় অবস্থান কালেই নজরুলের আমন্ত্রণকারী দৌলতপুরের খাঁ বাড়ীর নার্গিস নামে এক তরুণীর প্রেমে পড়েন কবি নজরুল। অনেক বাধার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিন্তু সৌরভময় ফুলটি বাসর রাতেই যেনো শুকিয়ে গেলো। বিয়ের পরই কি এক ষড়যন্ত্রের ফলে দুটি হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জানা যায় নজরুল জীবনের এই করুণতম অধ্যায়টির পিছনে যারা কাজ করেছেন তন্মধ্যে কমরেড মোজাফফর আহমাদ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

কুমিল্লা থেকে কোলকাতায় এসে অর্ধসপ্তাহিক ধুমকেতু পত্রিকা বের করে বৃটিশ সরকারের প্রবল সমালোচনা করতে থাকায় কবির এক বছর কারাদন্ড হয়। জেলখানায় বসেও অনেক কাব্য, গান রচনা করেন তন্মধ্যে "শিকল পরা" অন্যতম। জেল কর্তৃপক্ষের অবিচারের জন্য তিনি অনশন আরম্ভ করেন, তার মাতা সহ অনেক বন্ধু বান্ধব, ভারতের মুসলিম অমুসলিম নেতৃবৃন্দ তার অনশন ভঙ্গ করাতে পারেনি। পেরেছিলেন কুমিল্লায় থাকাকালীন আরেক প্রেয়সীর কাকিমা বিরজা সুন্দরী দেবী। তিনি নজরুলকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। জেল থেকে বের হবার পর পুনরায় কুমিল্লায় চলে যান। আকর্ষণ ছিলো প্রেয়সী আশালতা সেন গুপ্তা দুলী। জেল অভ্যন্তরে থাকাকালেই "বিজয়িনী" নামে কবিতা রচনা করে বিদ্রোহী কবি-প্রেমিক কবির নিকট পরাজয় বরণ করে। কবির সকল বিদ্রোহ প্রিয়তমা দুলির কাছে লুটিয়ে পড়ে ধন্যে হতে চায়।

নজরুল-দুলির প্রেম প্রণয় পরিণামের দিকে অগ্রসর হলে বিভিন্ন দিক থেকে বাঁধা আসতে থাকে। দুলীর সেন পরিবারের তরফ থেকে আরম্ভ করে হিন্দু সমাজ এমনকি কলকাতার ব্রাহ্মণ সমাজ পর্যন্ত নজরুল-দুলীর বিয়েতে প্রবল আপত্তি তোলে। কিন্তু মাতা গিরিবালা দেবী দৃঢ়তার সাথে সকল বাঁধা উপেক্ষা করে সেন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে হুগলীর মিসেস এম. রহমানের সহায়তায় বিয়ের আয়োজন সমাপ্ত করলেও বেশ কিছু অসুবিধে দেখা দেয়, তাহলো একজন মুসলিম ছেলে অপর জন হিন্দু মেয়ের মধ্যে কেমন করে বিয়ে হয়? দুলীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা দুলীর মা মেনে নেননি। অন্য দিকে নজরুল বাঁধাধরা নিয়ম ও কুসংস্কার বর্জন করলেও হিন্দু

হতে পারেননি। তবে দুলীর ধর্মান্তকরনে নজরুল চাপও সৃষ্টি করেননি। ফলে মুসলিম বন্ধু বান্ধবরা এর সুরাহা করতে পারছিলেন না। কারণ, দুলীর বয়স তখন মাত্র ১৬। অবশেষে উদারপন্থী মুসলিম বন্ধুরা যুক্তি দাঁড় করালেন, মুসলিম মোঘল সম্রাটরা যেমন হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে নিজ নিজ ধর্ম কর্ম পূজা পার্বন করেছেন। তেমনি এরাও স্ব-স্ব ধর্মমত বজায় রেখে সংসার ধর্ম পালন করবেন, দুলীর মা ও এটাই চেয়েছিলেন। অবশেষে এভাবেই তাদের বিয়ে ১৮২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল সম্পন্ন হয়। কাজীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন সু-সাহিত্যিক মঈনউদ্দিন হোসাইন। উকিল ছিলেন কুমিল্লার আঃ সালাম। বিয়ের পরও কোলকাতার অনেক পত্র-পত্রিকা এবং সেন পরিবারের কর্তা ব্যক্তিরা প্রতিবাদ জানায়, কবি নজরুল এসব উপেক্ষা করে নব বধুকে গ্রহণ করে নাম রাখেন প্রমীলা নজরুল।

এ বিবাহ প্রাক্কালে তার প্রথমা স্ত্রী নার্গিস আসার বেগমকে তালাক দেননি। নার্গিস বহুবার স্বামীর সঙ্গে মিলনের চেষ্টা করেছেন। বহু অপেক্ষার পর অবশেষে তালাক নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কবি নজরুল দুলীকে বিবাহ করার পর হুগলীতে বসবাস করতে থাকেন। প্রমীলার মাতা গিরি বালা দেবীও আর স্ব-সমাজে ফিরে যাননি।

১৯২৮ সালের প্রথম দিকে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করতে এসে কবি বর্দ্ধমান হাউসে কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের অতিথি হন। এ সময়ও এম, এ, ক্লাসের এক কৃতী ছাত্রী ফজিলতুন্নেসা নামক যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হন। ফজিলতুন্নেসা কবিকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করতেন। সে সময় কবি নজরুলের সংসারে পুত্র বুলবুল এসেছেন। কবি পত্রে কবিতায় গানে তাকে দেবীর আসনে বসিয়ে হৃদয়ের সব কিছু দিয়ে তার পূজা করতে চেয়েছেন। কিন্তু নিষ্ঠুর দেবী সে পূজা গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে আবার যখন ঢাকা আসেন তখন বনগ্রামস্থ রাণু সোমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রায় প্রতিদিন তার বাসায় যেতেন। এজন্য পাড়ার হিন্দু যুবকগণ নজরুলের উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে একদিন তারা কবির উপর চড়াও হয়। কবি নজরুল লাঠি খেলায়ও ওস্তাদ ছিলেন তাদের একজনের লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের পরাস্ত করে ফিরে আসেন বর্দ্ধমান হাউসে। কাজী মোতাহার সাহেব অনেক দিন পর্যন্ত লাঠিটি স্বারক হিসেবে রক্ষা করেছিলেন।

এ সময় রানু সোম ওরফে প্রতিভাসোম ছাড়াও রমনা হাউসে বসবাসকারী ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্র মৈত্রের কন্যা অপরুপ সুশ্রী উমা মৈত্রের সান্নিধ্যে এসে কবি নজরুল মন দেওয়া নেয়ার খেলায় ঝুঁকে পড়েছিলেন। নজরুলের জীবনে শুধু

এরাই নয় কোলকাতার জাহানারা চৌধুরী, লীলাবতী, নাসরিন এবং আরো অনেকে। তাই কৃষ্ণনগরের অধিবাসীরা নজরুলকে 'কলির কেষ্ট' বলে আখ্যায়িত করতো।

নজরুলের হাত ও দিল দুইই ছিলো অত্যন্ত দরাজ। তজ্জন্য তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করেও দু'দিনের পয়সাও সঞ্চয় করে রেখে যেতে পারেননি। মাথায় ঝকড়া চুল, সুগঠিত শরীর সিংহের মত চেহারার কবি একদা "প্রহলাদ" নামক ছায়াছবিতে নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। কাজী নজরুল শুধু বাংলাই নয় উর্দু গজলেও সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তিনি মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্যে ইসলামী জোস সম্বলিত গীত ও কাব্য রচনা করে গেছেন। যা আজও সে সব গান গেয়ে আমরা ধন্য হই। তিনি বৃহত্তর বাংলার হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্যে অনেক গান অনেক কবিতা লিখে গেছেন। লিখে গেছেন জাতিভেদ প্রথা, ছুৎমার্গ, গোঁড়ামী কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও আঘাত হেনে গেছেন। এই বাঁধন ছাড়া কবি একদিন অসুস্থ ও নির্বাক হয়ে গেলেন। কবি নির্বাক হলেন সত্যি কিন্তু তার গান তার কবিতা হাজারো হাজারো নর নারীর মুখের ও প্রাণের বাণী হয়ে বাজছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনলেন, তাঁর যথাযথ মর্যাদা দিলেন। কিন্তু কবি একদিন সকলের ভালবাসা আর শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করে চলে গেলেন পরপারে। তার মরদেহ সমাহিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে ১৯৭৬ সালে। কবির রচিত একটি বিখ্যাত গান ঃ-

মস্‌জিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই–

কবির এই বিখ্যাত গানের সূত্র ধরেই হয়ত কবিকে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে সমাহিত করা হয়। কবির জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীতে হাজার হাজার ভক্ত ফুল দিয়ে কবির মাজার জিয়ারত করে থাকে।

তাকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে আর যাতে যুগে যুগে অনুপ্রেরণা দেয় তার কাব্য তার গীত বাংলার মানুষকে, তজ্জন্য ঢাকার বৃহৎ সড়ক পথটির নাম রাখা হয়েছে নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ।

সিদ্দিক বাজারের নামকরণের পিছনেও ঐতিহাসিক কাহিনী জড়িত আছে। দেওয়ান পরিবারের ধর্মীয় পীর বা পথ প্রদর্শক মিয়া মুহম্মদ সিদ্দিকের নামানুসারে সিদ্দিক বাজারের নামকরণ করা হয়। এ মহল্লাতেই তাঁর মাজার রয়েছে।

সিদ্দিক বাজার মহল্লায় কবি জসিম উদ্দিন তাঁর নানা শ্বশুরের সহায়তায় একটি বাড়ী করেছিলেন। তার নানা শ্বশুরের বাড়ী নারায়নগঞ্জে ছিলো। সে বাড়ীটিকে লোকে মর্ডান বাড়ী কেউবা খৃষ্টান বাড়ী বলে উল্লেখ করতো। এ মহল্লায়

ইতিহাসবেত্তা তাইফুর সাহেবেরও বাড়ী ছিলো।

সিদ্দিক বাজার এলাকায় কিচকপট্টি নামে একটি বসতি ছিলো। সে বসতির লোকেরা ভূট্টা গেন্ডারী ও বিভিন্ন জাতীয় শাকসব্জী ও শষ্যাদি চাষ করতো বলে প্রথমে সে বসতিটি কৃষকপট্টি নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত হয়। পরবর্তীতে বৃটিশ যুগে সেটেলমেন্ট সার্ভে করার সময় কৃষকপট্টি নামটি বিকৃত হয়ে কিচকপট্টি বলে উল্লেখ হয়। এখন আর এই নাম কেহ উচ্চারণ করে না। সিদ্দিক বাজারের যে অংশটি স্থানীয়ভাবে বান্দর গলি বলা হতো সেটির নাম পৌর সভা কাজী আঃ হামিদ লেন নামকরণ করেন। কাজী আঃ হমিদ অত্র এলাকার একজন বিশিষ্ট কাজী এবং ঐতিহাসিক মনওয়ার খাঁন মসজিদের মুতওয়াল্লী ছিলেন।

পল্লী কবি জসিম উদ্দিনের নামানুসারে পরবর্তীতে কমলাপুর এলাকার তার বাড়ীর নিকটস্থ সড়কটির নামকরণ করা হয় কবি জসিম উদ্দিন রোড। কবি জসিম উদ্দিন ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইসলামী ঐতিহ্যের আদর্শবাদী কবি, এবং একজন আদর্শ শিক্ষক। কবি জসিম উদ্দিন মুসলিম জাতীয়তা বোধের আদর্শে উজ্জীবিত হলেও অন্য ধর্মের প্রতি কোনদিন কটাক্ষ করেননি। তিনি চেয়েছিলেন অনগ্রসর মুসলিম জাতিকে আত্ম-নির্ভরশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে। ১৯১৩ সালে কবির কিশোর বয়সের প্রথম কবিতা "আদ্রিয়া নোপল বিজয়" প্রকাশিত হলে সুধী জনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কবি তার ইপ্সিত মঞ্জিলে পৌছুতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি ঢাকায় হিজরত করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। কবি ১৯৭৬ সালে ১৪ই মার্চ ইন্তেকাল করেন। তিনি অত্যন্ত সদালাপী অমায়িক বন্ধুবৎসল ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

ঢাকার শেরেবাংলা নগরের সবচেয়ে প্রশস্ত সড়কটির নাম "মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ"। ঢাকার বহুলপ্রচলিত জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়ার নামানুসারে ঢাকা পৌর কর্তৃপক্ষ এ সড়কটির নামকরণ করেছেন। তিনি যেমন ছিলেন নির্ভীক সাংবাদিক, তেমনি উপমহাদেশের প্রতিথযশা রাজনৈতিক নিবন্ধকারও ছিলেন।

বর্তমান পিরোজপুর জেলার অন্তর্গত ভান্ডারিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১১ সালে মানিক মিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের প্রাইমারী স্কুল হতে শিক্ষা জীবন আরম্ভ করে ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করে পিরোজপুর

সিভিলকোর্টে চাকুরী গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন থেকেই তার মেধা ও বুদ্ধি সাংগঠনিক ক্ষমতা ও নেতৃত্বদানের স্পৃহা পরিলক্ষিত হয়।

পিরোজপুর কোর্টে চাকুরীরত অবস্থায় একসময় তিনি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। তখন উপমহাদেশে প্যাকিস্তান আন্দোলন চলছে। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব মানিক মিয়ার কর্মদক্ষতা, চিন্তাধারা, বুদ্ধিমত্তা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হন অন্যদিকে মানিক মিয়াও বাংলার রাজনৈতিক আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, আদর্শবাদ মহান ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। এমনি করেই সে সময় তাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবং সেই সুবাদেই কোর্টের চাকুরী পরিত্যাগ করে বাংলা সরকারের বরিশাল জেলার জনসংযোগ অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। কিছুদিন পরই সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের পরামর্শক্রমে সরকারী চাকুরী ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এ স্থান হতেই উপমহাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ও মতাদর্শের সাথে পরিচয় ঘটে মানিক মিয়ার। কিন্তু যেহেতু প্রথম থেকেই জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন সেহেতু তিনি শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক দর্শন তথা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বাভাবিকভাবেই তিনি শহীদ সাহেবের পক্ষ নেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শহীদ সাহেব হেরে গেলে তিনি প্রতিপক্ষের বিরাগভাজন হন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারীর পদে ইস্তফা দিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের উদ্যোগে ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক "ইত্তেহাদ" পত্রিকার পরিচালনা বিভাগে সেক্রেটারী হিসাবে যোগদান করেন। এবার রাজনীতির সঙ্গে সাংবাদিকতায়ও জনাব মানিক মিয়ার প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সূত্রপাত ঘটলো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদের পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ বারবার নিষিদ্ধ হতে থাকলে শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এর পরই মানিক মিয়া চলে আসেন ঢাকায়। ১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগের বিরোধি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হলে প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে "সাপ্তাহিক ইত্তেফাক" প্রকাশিত হয়। পত্রিকার আনুষ্ঠানিক সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ১৯৫১ সালের ১৪ই আগষ্ট মানিক মিয়া এই পত্রিকার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের আসন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনের প্রাক্কালে শহীদ

সাহেবের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগীতায় ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'দৈনিক ইত্তেফাক' প্রতিষ্ঠা করে মানিক মিয়া স্বয়ং সম্পাদকের দায়িত্বগ্রহণ করেন। তাঁর "মোসাফির" কলামে শক্তিশালী নির্ভীক ও কালজয়ী লেখনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের মনে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতালোভী কেন্দ্রীয় শাসক ও অর্থনৈতিক লুটেরাদের সম্পর্কে চিত্তে রেখাপাত ঘটায়। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। নির্বাচন প্রাক্কালে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ ইত্তেফাকের প্রতিটি কথা ও খবরকে বেদবাক্যের মতো বিশ্বাস করতো। তখনকার সরকার সমর্থক এমনকি নিরপেক্ষ সংবাদপত্রগুলো ইত্তেফাকের কোন সংবাদের প্রতিবাদ করলে তা বিশ্বাস না করে আস্তকুঁড়ে ফেলে দিতো। অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষও ইত্তেফাকের সংবাদ বিশেষ করে মোসাফিরের কলাম শুনে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো।

মানিক মিয়া সাংবাদিকতা জগতে নির্ভীকতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য ১৯৬৩ সারে আন্তর্জাতিক প্রেস ইনষ্টিটিউটের পাকিস্তান শাখার চেয়ারম্যান, পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রেস কোর্ট অব অনার এর সেক্রেটারী ছাড়াও পি, আই, এ র ডিরেক্টর পদে বরিত হন। পাকিস্তানের সাংবাদিক পরিমন্ডলের বাইরেও তিনি সমাদৃত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসক চক্র তাঁর নির্ভীক ভাষণ, যুক্তিসঙ্গত দাবী বরদাস্ত না করে সেগুলোর অপব্যাখ্যা করে তাঁকে বার বার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করেছে। এমনকি শেষপর্যন্ত তাঁর প্রেসও বাজেয়াপ্তও করা হয়েছিলো। এসব কারণে তাঁর মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তির দরুন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। এমতাবস্থায় ১৯৬৯ সালে পিন্ডিতে ইত্তেফাকের প্রাতিষ্ঠানিক কাজে গমন করলে ৩১শে মে রাতে আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি)।

অনেক সুধী ব্যক্তির সুচিন্তিত অভিমত, বাংলাদেশের আবির্ভাবে মানিক মিয়ার ভূমিকা শুধু অনস্বীকার্যই নয় অপরিহার্যও বটে। তিনি বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের ধারা অন্যখাতে প্রবাহিত হতো। এর কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে তাঁর রচিত 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, মোসাফিরের রাজনৈতিক মঞ্চ ও অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলী থেকে।

মানিক মিয়া এ্যাভিনিউর উত্তর দিকে রয়েছে জাতীয় সংসদ ভবন। সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা আজ সুন্দর পরিবেশের প্রতীক। মাঝে মধ্যে এ প্রশস্থ সড়কে

রাজনৈতিক সভা সমাবেশ ঘটে এবং জাতীয় দিবসগুলোতে সামরিক কুচকাওয়াজেরও ব্যবস্থা হতো। সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়ার নামাজের জানাজা উপলক্ষে এখানে হয়েছিলো স্মরণকালের বৃহৎ জনসমাবেশ। সড়কটির পশ্চিম প্রান্তের উত্তরদিকে সমাহিত হয়ে আছেন পাকিস্তান আন্দোলনের কয়েকজন অগ্রপথিক। তাদের মধ্যে জনাব তমিজ উদ্দিন খান, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে (বৃটিশ ভারতের) গণপরিষদের সদস্য হয়েছিলেন ঢাকা বিভাগের একটি আসন থেকে। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ময়মনসিংহের প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা আবদুল হালিম গজনভীর সাথে। আমি তখন মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড কর্মী হিসেবে তাঁর নির্বাচনে কাজ করেছি। রাজনৈতিক প্রাসাদ চক্রান্ত যখন জমজমাট, সেই ক্রান্তি লগ্নে পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পীকার নির্বাচিত হন তমিজ উদ্দিন খান। প্রাসাদ-রাজনীতির পুরোধা ও সামরিক জান্তার মুরুব্বী তখন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ। তার স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হওয়ায় উৎসাহিত হয়ে ১৯৫৪ সালে কলমের এক খোঁচায় আইন পরিষদ ভেঙ্গে দিলেন। সেই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সামরিকজান্তা ও প্রাসাদ চক্রান্তকারী রাজনীতিবিদদের সকল ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে সৎসাহস নিয়ে দেশের বুকে পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিন্ধু হাইকোর্টে আইন পরিষদ বাতিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করেন। সে সময় তার সাথী বলতে মাত্র কয়েকজন রাজনীতিবিদ। হাইকোর্টের রায় তমিজউদ্দিন খানের পক্ষে হলে, সরকার সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপীল করলে প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ মুনীর দেশের হাল হকিকত ও পরিনাম চিন্তা করে সরকারের পক্ষে মামলার রায় প্রদান করেছিলেন। মৌলভী তমিজ উদ্দিন খানের সৎসাহসের কথাটাই আজও স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি এক সময় পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি পদেও বরিত হয়েছিলেন। এই সাহসী পুরুষ গণতন্ত্রের সৈনিক ইহ জগৎ ত্যাগ করলে তাকে এখানে সমাহিত করা হয়। তিনি ফরিদপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর সমাহিত হয়েছেন খানে সবুর। খাঁন আবদুস সবুর পাকিস্তান আন্দোলনের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক। তিনি খুলনার তেরকাদা এলাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বলতে গেলে তিনি আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় কাটিয়ে গেছেন। কলকাতায় এক সময় এরিয়ান ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। যদিও তিনি মোহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান সংসদের সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী আপন ভ্রাতা ব্যারিষ্টার গণী

সাহেবের নিকট তিনি একবারই পরাজিত হন। মুসলিম লীগের পতাকাতল থেকে তিনি আমৃত্যু সরে যাননি। পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হয়ে সংসদ নেতার পদেও আসীন হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ডাক তার ও যোগাযোগ মন্ত্রী পদেও বরিত হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ মুসলিম লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়ার আমলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে এক সঙ্গে তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনটি আসনেই জয় লাভ করে প্রমাণ করে গিয়েছেন যে তিনি এদেশের একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট পার্লামেণ্টারীয়ান। খুলনার সর্বস্তরের লোকের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। সুবক্তা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কালে খুলনাকে হিন্দু প্রধান অঞ্চল হিসেবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার যে প্রচেষ্টা চলেছিলো সে সময় খানে সবুর এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ফলে ইংরেজ রাজ প্রতিনিধিও কংগ্রেসের চক্রান্ত বানচাল হয়ে যায় এবং খুলনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত থাকে। তিনি ১৯৮২ সালের ২৫শে জানুয়ারী ইন্তেকাল করেন।

এখানে শায়িতদের মধ্যে উত্তর বঙ্গের তথা রংপুরের এক কালের মুসলিম লীগের জাদরেল নেতা মসিউর রহমান রয়েছেন। যাকে উত্তর বঙ্গবাসী যাদু মিয়া বলে ডেকে থাকেন। সত্যিই তার মধ্যে যাদু ছিলো। কায়েদে আজম মঃ আলী জিন্নাহ যখন রংপুর গিয়েছিলেন তখন লক্ষ লক্ষ লোক তাকে দেখার জন্যেই হোক আর তার কথা শোনার জন্যেই হোক সমবেত হয়েছিলেন। সেই অগণিত লোকের হট্টগোলের মধ্যে যখন যাদু মিয়া উঠে বললেন আমি যাদু বলছি আপনারা চুপ করুন। সত্যিই মিনিটের মধ্যে যাদুর স্পর্শে বিশাল জনতা চুপ হয়ে গেল। যেন বাক শক্তি লোপ পেয়ে গেল। সেই যাদু মিয়া অবশ্য পরে মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে বাম পন্থী রাজনীতিতে অংশ নিয়ে ন্যাপে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। জনাব মসিউর রহমান ইহলোক ত্যাগ করে এখানেই শায়িত আছেন।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক এক কালের মুসলিম লীগ নেতা পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা আবুল মুনসুর আহমদও এখানে শায়িত আছেন। তিনি প্রথম জীবনে মুসলিম লীগ সমর্থিত কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদ এর সম্পাদক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর একজন বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। পাক-আমলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সদস্য পদেও বরিত হয়েছিলেন, আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে। তিনি একজন বিশিষ্ট পার্লামেণ্টারীয়ান ও

সতর্ক রাজনীতিবিদ। তার রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি পাঠ করলে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উচ্ছৃংখল ও চরমপন্থী রাজনীতি পছন্দ করতেন না। পূর্ন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। আওয়ামী লীগের জন্ম লগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

আরো একজন বিশেষ ব্যক্তি সমাহিত হয়েছেন। তিনি হলেন, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার। জিয়া আমলে তিনি রাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। কলকাতার আইনজীবি আঃ সাত্তারও মুসলিম লীগের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। এদেশে আগমন করে তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কর্ণধার নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি সাত্তারের নিকট থেকেই সাবেক রাষ্ট্রপতি তৎকালীন প্রধান সেনাপতি জনাব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে সংসদ ও মন্ত্রিসভা বাতিল করে সামরিক সরকার গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবের সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় ছিলো। তাই যেদিন তিনি শেষ বারের মত পিজি হাসপাতালে ভর্তি হতে আসেন। আমার সঙ্গে হাসপাতালের প্রধান করিডোরে দেখা। তাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল। আমি তার অসুস্থতার কথা জেনে দেখে না দেখার ভান করে এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার নজর এড়াতে পারলাম না। তিনি নাম ধরে কাছে ডেকে আলাপ শুরু করে দিলেন। তাঁর এহেন আলাপে আমি নিজে অস্বস্তিবোধ করছিলাম। শেষ পর্যন্ত তার সহগামী ডাক্তারের বাধায় আলোচনায় ছেদ পড়লো। তাঁর মলিন অথচ হাসি খুশী চেহারা আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিলো সেদিন। কে জানতো এটাই আমাদের শেষ দেখা। তিনি হাসপাতালেই ইন্তেকাল করেন। এই সমাধি চত্বরটিতে আগামীতে দেশবরেন্য আরো নেতাদের যে বক্ষে ধারণ করবে এটা আজ নিশ্চিত।

ঢাকার মীরপুরের নাম শুনলেই ধারণা জন্মে এখানে কোন মীর সাহেবের বসত ছিলো। সেই মীর সাহেবের নামানুসারেই এলাকাটির নাম হয়েছে মীরপুর। এ সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য আজও পাওয়া যায়নি। মোঘল আমলে মীরপুর-এর নদী বন্দর শাহ বন্দর নামে খ্যাত ছিলো।

এ মীরপুরে খ্যাতনামা মাসলান্দ এ হযরত শাহ আলী বোগদাদীর (রাঃ) মাজার রয়েছে। মাজারটি একটি প্রাচীন মসজিদের অংশ বিশেষ। মসজিদটি ৮৮৫ হিজরীতে বাংলার বাদশাহ্ ইউসুফ শাহের আমলে তৈরী হয়েছিলো। এ মসজিদেই হজরত শাহ আলী বোগদাদী (রাঃ) চিল্লা নিয়েছিলেন।

কথিত আছে বোগদাদের জনৈক রাজকুমার সংসারে বীতশ্রদ্ধা হয়ে চারজন

শিষ্যসহ নানা দেশ পর্যটন করে মীরপুরের একটি ছোট্ট মসজিদে আশ্রয় নেন। বেশ কিছু দিন পর তিনি দেড় বছর কাল অনশনব্রত পালন কল্পে মসজিদের দ্বার রুদ্ধ করে ধ্যানমগ্ন থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ সময়ের মধ্যে যাতে তাকে কেহ ধ্যান ভগ্ন না করে তজন্য শিষ্যদের নির্দেশ দান করেন। দেড় বৎসর অতীত হবার একদিন অবশিষ্ট থাকতেই শিষ্যগণ মসজিদের মধ্য হতে শুনতে পেলেন নানারুপ আওয়াজ, উৎসুক হয়ে শিষ্যগণ দরজা খুলে দেখতে পান সেখানে সাধক শাহ্ আলী ধ্যান মগ্নে নেই, তদস্থলে একটি পাত্রে আলো জ্বলছে। সেই আলো হতে শাহ্ আলীর কণ্ঠ স্বরে আওয়াজ হলো দাফন করার। সে-মতে শিষ্যগণ সেই আলোক পাত্রকে সমাধিস্থ করলো মসজিদের ভিতরেই। এ ধরনের কিংবদন্তি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সূফী সাধক ও দরবেশদের নামে ছড়িয়ে আছে।

অপর সূত্রে বর্ণিত আছে ৯৮৫ হিজরীতে একদিন মসজিদের দরজা বন্ধ করে এত্তেকাপে থাকা অবস্থাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাকে সেই মসজিদেই দাফন করা হয়। প্রায় একশ বছরের মধ্যে মসজিদটি জরাজীর্ণ ও ধ্বংশ প্রায় হয়ে গেলে মাজার বাদ দিয়ে মসজিদটি পুনরায় তৈরী করা হয়। তৃতীয় বারের মত ১২২১ হিজরীতে মগবাজারের শাহ্ সাহেব শাহ মুহম্মদি পুনরায় মসজিদটিকে নির্মাণ করেন। হজরত শাহ্ আলী বোগদাদী (রাঃ) আল্লাওয়ালা ও কামেল ব্যক্তি ছিলেন। এই কামেল ব্যক্তিকে বাংলার বহু মানুষ বিশেষ করে ঢাকাবাসী বিভিন্ন মহল্লার মানুষ বজরা যোগে মীরপুরে গিয়ে শাহ্ বোগদাদীর মাজার জিয়ারত করতো। মাজার জিয়ারতের নামে আবার অনেকেই মাজারের অনতি দূরে বেগুন বাড়ীতে নানারূপ নাচগান আমোদ-স্ফুর্তিতে মশগুল থাকতো। কয়েক বছর ধরে এ রেওয়াজ স্তিমিত হয়ে গেছে। তবে এখনও মাজারে বহু ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে।

পূর্ব দিনে বহুলোক বিশেষ করে মহিলারা বিশ্বাস করতো যে, শাহ্ আলীর মাজারটি ধীরে ধীরে উপর দিকে উত্থিত হচ্ছে। যখন এ মাজার ছাদের সঙ্গে ঠেকে যাবে তখনই রোজ কেয়ামত নাজিল হবে। হজরত শাহ্ আলীর সময়ে ঢাকা জেলা ও শহরে যে সব বুজুর্গানেদীনের আগমন ঘটে ছিলো তাদের মধ্যে শাহ্ জালাল দক্ষিণি, সোনার গাঁওয়ে হাজী বাবা সালেহ ও হজরত শাহ্ লঙ্গরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মীরপুরের খাসবান্দা খাঁনও একজন কামেল ব্যক্তি ছিলেন। তার বাড়ি দরগার উত্তর দিকে অবস্থিত ছিলো।

সরকার বেশ কিছু দিন হলো দরগাহর পরিচালন ভার ঢাকা জেলা প্রশাসককে চেয়ারম্যান করে একটি পরিচালনা কমিটি করে দিয়েছেন কমিটি দরগাহটিকে আরো

আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে একটি কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেমতে দরগাহর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিসহ বিরাট মাদ্রাসা ও মসজিদটির আরো সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। দরগাহর বহিঃ সড়কের সুউচ্চ তোরণটি নির্মিত হওয়ায় আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়েছে। মাজারের অনতিদূরে ঢাকা পৌর কর্পোরেশন স্থাপিত কবরস্থানেরও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করা হয়েছে।

পাক আমলে মীরপুর এলাকাটি অবাঙ্গালী অধ্যুষিত হওয়ায় মাজার জিয়ারত প্রথা আজমীরের অনুকরণে হতো। বর্তমানেও ধুমধাম বাদ্যযন্ত্র ও কাওয়ালী মিছিল সহকারে অনেককেই চাদর চড়াতে আসতে দেখা যায়।

বৃটিশ শাসনামলে ঢাকা শহর হতে সামরিক ছাউনী তথা ক্যাণ্টনমেণ্ট সরিয়ে মীরপুরের বেগুন বাড়ীতে স্থানান্তর করা হয়েছিলো। মীরপুরের গাবতলি গরুর হাটটিরও খ্যাতি ছিলো দেশের সর্বত্র। ঐ এলাকায় এক সময় প্রচুর গাবগাছ ছিলো বিধায় স্থানটির নাম গাবতলি হয়েছে। ঢাকা পৌর কর্পোরেশন অতিপ্রাচীন গরুর হাটটিকে গাবতলি হতে সরিয়ে আরো পশ্চিমে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

গাবতলিতে হজরত মৌলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের পৌত্র ফকির মৌলানা আঃ বাতেন সাহেবের মাজার রয়েছে। মাওলানা বাতেন ইসলাম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। তার অজস্র মুরিদান ছিলেন বাংলা ও আসামে, কথিত আছে যাদের মুখে ঘা হতো তারা এই বুজুর্গ ব্যক্তির খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ খেলে মুখের ঘা সেরে যেতো।

মীরপুরে কুমির শাহ্‌র মাজারটিরও খ্যাতি ছিলো। অনেকে সেখানে গিয়ে মাজার সংলগ্ন বিরাট পুকুরটিতে অবস্থিত কুমীরগুলোর প্রতি মুরগী ছুড়ে দিতেন। এসব তাঁদের মানত ছিলো। কুমীরের মুরগী খাওয়া নিয়েও কুসংস্কার রচিত ছিলো। খাদেম বলতো যিনি খাস নিয়তে মানত করেনা তার মুরগী কুমীর খায়না। আসলে কুমীরের সামনে মুরগী ছুড়লে মুরগী ঝাপ্টা মেরে পালাতে চেষ্টা করে। আবার কুমীর মুরগী ধরে প্রথমে পানিতে ডুব দেয় পরে মাথা উঠিয়ে ঝাকি দিয়ে মুরগীটাকে মুখের মধ্যে সোজা করে তার পর গিলে ফেলে। অনেক সময় মুখ সোজা করতে গিয়ে মুরগী কোন প্রকারে মুখ থেকে বের হয়ে পালাতে সক্ষম হতো। থাক সে কথা।

মীরপুরের একটি অংশ জঙ্গলাকীর্ণ ও মাটির টিলার মত স্থান ছিলো বিধায় ঐ এলাকাটি পর্বতা নামে পরিচিত ছিলো। আবার যে অংশে সেন পদবীধারী হিন্দুগণের বসবাস ছিলো সে স্থানটি সেন পাড়া বা সেন পর্বতা বলে আখ্যায়িত হতো। এতদসঙ্গে একটি অংশ কোন প্রভাবশালী কাজী পরিবার বাস করতো বা কাজী উপাধি

ধারীগণ বসবাস করতো বলে সে স্থানটি কাজী পাড়া নামে পরিচিত হয়। আবার যে অংশে শেওড়া গাছ বেশ ছিলো তজ্জন্য সে স্থানটি শেওড়া পাড়া নামে আখ্যায়িত হতো।

বর্তমানে এসব পাড়ার মধ্য দিয়ে বেশ প্রশস্ত একটি রাস্তা হয়েছে যা সংসদ এ্যাভিনিউ পর্যন্ত এসেছে। সে সড়কটিকে বাংলার মুসলিম নারী শিক্ষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা সুলেখিকা বাংলার অধঃপতিতা নারী সমাজের মুক্তির পথ প্রদর্শিকা উত্তর বঙ্গের রংপুরে ১৮৮৩ সালে জহীর মোহম্মদ আবু আলী সাহেবের ঔরষে জন্ম গ্রহণকারী বাঙ্গালী নারী জাতির গৌরব বেগম রোকেয়ার নামানুসারে সড়কটির নামকরণ হয়েছে রোকেয়া স্মরণী।

মীরপুর অঞ্চলটি ঢাকা পৌর করপোরেশনের আওতা ভুক্তির পূর্বে একটি মডেল টাউনের মর্যাদা নিয়ে মীরপুর পৌর সভার আওতাধীন ছিলো। মীরপুরে এখন ষ্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে যেখানে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। নির্মিত হয়েছে টাউন হল, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি। তাছাড়া মীরপুরের একাংশে এখনও সামরিক অফিসাদি রয়েছে। এক কথায় পাকিস্তান আমলের আইয়ুব যুগ হতে মীরপুরে উন্নয়নের যে জোয়ার আরম্ভ হয় তা স্বাধীনতার পর আরো দ্রুত গতিতে চলা শুরু হয়েছে। পাক আমলে অবাঙ্গালীদের এ অঞ্চলে পূনর্বাসন করায় এলাকাটি ভারত হতে আগত মোহাজেরদের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। মীরপুরে বুদ্ধিজীবিদের স্মৃতি সৌধও রয়েছে।

শাহাজাহান পুরের নামকরণের কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সম্রাট শাহাজাহানের নামানুসারেই উক্ত নামকরণ করা হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পর শাহাজাদা খুররম (শাহজাহান) ঢাকার দিকে অগ্রসর হন এবং ঢাকা পৌছলে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। তিনি ১৬২৪ সালের মে মাসে এই শহরে মাত্র সাত দিন অবস্থান করেছিলেন। খিলগাঁও সম্বন্ধে জানা যায় যে এই এলাকাটি ছিলো একটি সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য কেন্দ্র। সে সময় পাণ্ডু নদী এই এলাকার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। ঢাকার কোন কোন পুরনো মানচিত্রে খিলগাঁওকে শহর খিলগাঁও বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে খিলগাঁও এলাকায় চাষাবাদ হতো না– মাঝে মধ্যে টিলা টক্কর ছিল। আমাদের দেশের গ্রামগঞ্জে যে ক্ষেত খালি থাকে অর্থাৎ চাষাবাদ হয় না তাকে খিল বলা হয়। চাষাবাদ অযোগ্য এই খিল এলাকায় গুটি কয়েক পরিবার বসবাস করতো, তখন থেকেই এই এলাকাটি খিলগাঁও নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিরাট বসতি স্থাপন

করলেও এটি খিলগাঁও নামে পরিচিত হয়ে আছে। পরবর্তীতে এখানে এক বিত্তশালী চৌধুরী পরিবার বেশ কিছু জমিজমা খরিদ করে বসবাস করতো। সেই চৌধুরী পরিবারের নাম থেকেই এখানকার কিছু এলাকা খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

ঢাকার বৃটিশ যুগের অভিজাত এলাকা ওয়ারীতে একটি পথের নাম এ, কে, সেন, স্ট্রীট। এ নামকরণ হয়েছে জাস্টিস অক্ষয় কুমার সেন-এর নামানুসারে। তিনি এ এলাকায় বসবাস করতেন। আজও পথটি বিচারপতি অক্ষয় কুমার সেনের নাম স্মরণীয় করে রেখেছে।

এখানে সৈয়দ আহম্মদ নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি পাক আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। তার আত্মীয়ের মধ্যে বাংলার দুই প্রিয় ও খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ রয়েছেন। তন্মধ্যে মরহুম শেরে বাংলা ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তার পিতা মরহুম সৈয়দ আলী আহম্মদ একজন খ্যাতিমান ফুটবলার ছিলেন। বৃটিশ যুগে কুচবিহার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোহন বাগানকে পরাজিত করেন। তিনি ১৯৩৯ সালে কলিকাতা মোহন বাগানকে হারিয়ে মোহমেডান স্পোটিং ক্লাবের ক্যাপ্টেন মনোনীত হন।

সৈয়দ আলী আহম্মদ ১৯১০ সালে ঢাকার ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেন্ট অব পুলিশ (ডি, এস, পি) পদে সরাসরি নিয়োগ লাভ করেন এবং ১৯৪২ সালে পুলিশের চাকুরী থেকে অবসর নেন। পুলিশের চাকুরীকালে তিনি জেলায় জেলায় ফুটবল ও টেনিস খেলায় অংশ নেন। টেনিস খেলোয়ার হিসেবেও তার বেশ খ্যাতি ছিলো। তৎ পিতা সৈয়দ মহম্মদ ওরফে সৈয়দ মহম্মদ আজাদ। আজাদ তার ছদ্ম নাম, এ নামে তার রচিত কাব্য পরিচিতি হতো। তিনি ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি কলিকাতায় নবাব আব্দুল লতিফের কন্যাকে বিবাহ করে ডেপুটি রেজিস্ট্রারের সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন অর্থনৈতিক কারণে। সৈয়দ মহম্মদের কনিষ্ঠ পুত্র এবং সৈয়দ আহমাদের চাচা ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর ভগ্নি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর কন্যা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের প্রথম স্বামী ও মিসরের প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডঃ সাঈদ হোসেন। ডঃ সাঈদ হোসেন ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের প্রেম ও বিবাহের কথা ওল্ড সেক্রেটারীয়েট রোডের বর্ণনাকালে উল্লেখ করেছি বিধায় তার পুনরাবৃত্তি করা নিস্প্রয়োজন মনে করছি।

ওয়ারী এলাকায় আরেকটি নাম রয়েছে চণ্ডিচরণ বোস স্ট্রীট, চণ্ডিচরণ একজন

জমিদার ছিলেন বলে জানা যায়। দিলকুশায় পাক আমলে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডি, আই, টি) নামে একটি সংস্থা কায়েম করেন তৎকালীন সরকার। আর এর কর্ণধার করেন জি, এম, মাদানীকে। সেই অফিসের নামানুসারেই তার সম্মুখস্থ সড়ক পথটির নামকরণ করা হয় ডি, আই, টি, এভিনিউ। বর্তমানে এ সংস্থার নামকরণ হয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তথা রাজউক। আর এই নামেই ডি, আই, টি রোডের নাম নুতন করে রাখা হয় রাজউক সড়ক। ডি, আই, টির প্রথম চেয়ারম্যান মাদানী সাহেবের আমলেই ঢাকায় বেশ কয়েকটি উপশহর নির্মিত হয়। তন্মধ্যে মহম্মদপুর, মীরপুর, গুলশান অন্যতম। তাঁর বিভিন্ন অবদানের জন্য বারিধারা উপশহরে একটি সড়ক পথের নামকরণ করা হয়েছে মাদানী এ্যাভিনিউ।

সূত্রাপুরে ডালপট্টির পূর্ব নাম ছিলো ডালবাজার। এই ডাল বাজারে অবস্থিত বর্তমান রূপলাল হাউসে আর্মেনিয়ান জমিদার আরাতুন বাস করতেন। রূপলাল হাউস আজকের দিনে একটি ঐতিহাসিক ভবন। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে বিধায় তার পুনরাবৃত্তি করা হলো না। চক বাজারের পূর্ব দিকে মোগলটুলি মকিমকাটরার মধ্যবর্তী একটি ছোট পথের নাম ছিলো রুই হাট্টা। এখানে রুই এর (তুলা) বাজার ছিলো। এই বাজার থেকে তুলা খরিদ করে তাঁতী সম্প্রদায় কাপড় বুনতো। রুই হাট্টার নাম আর তেমন মসহুর নেই। আস্তে আস্তে এ নাম মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যাচ্ছে। একদিন হয়তো কারো স্মরণপটে উদিত হবে না। কারণ এখানে বর্তমানে মনোহরী, স্পোর্টস দ্রব্যসহ বহুবিধ দেশী-বিদেশী মালের দোকান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ বলে ১০নং গলি, কেউবা মকিমকাটরা নাম উচ্চারণ করে থাকে। রুই হাট্টা নাম এখন কোন ব্যবসায়ীই পরিচয় দেয় না। তবে দোকানীদের সাইনবোর্ডে এখনও রুই হাট্টা নামটি স্থান পেয়ে আসছে। এভাবে ঢাকার বহু পুরনো নাম সবার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে ও যাচ্ছে।

ঢাকা নগরীর পশ্চিমাংশে বৃটিশ যুগে পালবংশীয় হিন্দুগণ সজ্ঞবদ্ধভাবে বসবাস করতেন। এরা সাধারণতঃ মেটে হাড়ি পাতিল ও অন্যান্য মাটির আসবাব পত্র তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতো। এদের তৈরী তৈজস পত্র সারা বাংলা ও ভারতের আসাম প্রদেশে চালান হতো। গুণাগুনের দিক থেকে এগুলো যেমন সমাদর লাভ করেছিলো তেমনি যথেষ্ট সুনামও অর্জন করে ছিলো। এই পাল বংশের মধ্যে রায় উপাধিধারী এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐ এলাকায় নদীর ধারে একটি হাট ও বাজার স্থাপন করে ছিলেন বলে এলাকাটি ঐ সময় হতেই রায়ের বাজার নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। তবে ঢাকাবাসী রায়ের বাজারকে সংক্ষেপ করে রাড় বাজার নামে আখ্যায়িত

করতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্যালেরা ধীরে ধীরে ভারতে চলে যাওয়ায় এখানকার মৃৎশিল্প লুপ্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য এখনও সামান্য কয়েক ঘড় পাল ঐ এলাকায় বসবাস করছে তারা মাটির হাড়ি পাতিল ও অন্যান্য মৃৎশিল্প তৈরী করেই জীবিকা নির্বাহ করছে। এই পালদের ভাষা ঢাকাইয়া ভাষা থেকে একটু পৃথক ছিলো। অনেকটা রাজশাহী অঞ্চলের লোকদের কথাবার্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্বাধীনতার পর বাংলার সর্বহারা মানুষ তথা কৃষক কুলের নয়ন মনি মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের নামানুসারে রায়ের বাজার নামে পরিচিত সড়ক পথটির নাম শেরে বাংলা রোড রাখা হয়। মনে হয় সরকারীভাবে এ নাম এখনও অনুমোদিত হয়নি, যেহেতু আইউব নগর (পাক আমলের ২য় রাজধানী)কে শেরে বাংলা নগর নামকরণ করা হয়েছে।

রায়ের বাজারের সন্নিকটেই রয়েছে ঝিগাটোলা। টোলার অর্থ বসতি। এক সময় ঝিগাটোলা এল্যাকায় প্রচুর ঝিগাগাছ জন্মাতো। বিশেষ করে প্রতিটি বাড়ীর চতুঃসীমা ঝিগা গাছ দ্বারা বেষ্টিত ছিলো। বর্তমানে ঝিগা গাছের সমারোহ না থাকলেও এ এলাকাটি আজও ঝিগাটোলা নামে পরিচিত। অনেকে ঝিকাতলা বলেও অভিহিত করে থাকে। অবশ্য এক সময় ঢাকার অন্যান্য বসতির গরীব লোকেরা তাদের বাড়ীর প্রাচীর ইট বা বেড়া দ্বারা বেষ্টিত করতে না পেরে এই ঝিগা গাছ দ্বারাই বাড়ীর চতুঃসীমা বেষ্টিত করতো।

নবাবপুর রাস্তার পূর্বনাম ছিলো উমরাপাড়া। মোঘল আমলের শেষের দিকে এখানে আমির উমরাহগণ বসবাস করতেন বলে অঞ্চলটি উমরা পাড়া বা উমেরপুর নামে পরিচিত ছিলো। মোঘল আমলের এই নাম পরিবর্তন করে এর নাম রাখা হয় নবাবপুর। এই নব্যবপুর এলাকার মধ্যেই আবার টাকারহাট ও মহাজনপুর নামে দুটি বস্তি ছিলো। মোঘল আমলের শেষের দিকে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ধার দেওয়া (ঋণ প্রদান) এবং বন্দকী ব্যবসা ও স্বর্ণ রৌপ্য টাকায় পরিবর্তনের কাজ কারবার টাকার হাট এলাকায় চলতো। আর মহাজনপুরে উপরোক্ত অর্থ বিনিয়োগকারীদের বাসস্থান ছিলো।

পুরনো ঢাকায় মোঘল সুবেদারীর আমলে সরকারী বিভিন্ন দফতরের নাজিরগণ যেখানে বসবাস করতেন, সেখানেই তাঁদের একজন বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই উক্ত এলাকাটি নাজিরা বাজার বলে পরিচিত হয়ে আসছে।

বর্তমান নাজিরা বাজার ১ম লেনটিকে স্থানীয়ভাবে বাংলা দুয়ার বলা হয়, এজন্য যে সেখানে পঞ্চায়েতি বাংলা অর্থাৎ পঞ্চায়েত ঘর তাঁর সম্মুখে বড় পরিসরের একটা

দুয়ার অর্থাৎ খোলা চত্বর ছিলো। পরবর্তীতে সেখানে পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। এই বাংলা দুয়ারে মহল্লাবাসীর কোন স্বজন ব্যক্তি আসলে ঘরে স্থান না হলে এই বাংলা ঘরে তাঁকে থাকার ব্যবস্থা করা হতো। এ মহল্লাটিকে পূর্বে মোরগানি টোলা বলা হতো। নামটি থেকে অনুমান করা যায় যে এখানে কোন মহিলা মোরগ মুরগী প্রতিপালন করতো বিধায় এ অংশটিকে মোরগানি টোলা বলা হতো। এ মহল্লায় মাতবর ব্যক্তিদের মধ্যে সাচি বেপারীর নাম উল্লেখযোগ্য (সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে তার নাম পাওয়া যায় সাচি গাবিওয়ালি) এখানে প্রায় দুইশত বছর পূর্বেকার তৈরী একটি মসজিদ রয়েছে। যাকে বাংলা দুয়ার মসজিদ বলা হয়ে থাকে।

নাজিরা বাজার ২য় লেন বলেও একটি গলির নাম রয়েছে। পূর্বে এসব এলাকায় মাটি কোঠা ও ছনের ঘর বিদ্যমান ছিলো। বর্তমানে সেগুলোর স্থলে দালান-কোঠায় পরিপূর্ণ।

বর্তমানে যে দালানটিতে নাজিরা বাজার হাই স্কুল পরিচালিত হচ্ছে, সেটি খুব গরীব লোকের ভিটিবাড়ী ছিলো। অন্য জেলার কোন এক বিত্তশালী ব্যক্তি উক্ত ভিটিটি ক্রয় করে তার বসতবাড়ী নির্মাণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে এক অজ্ঞাত কারণে বাড়ীটি পৌর সভাকে একটি স্কুল করার জন্য দিয়ে যান। নাজিরা বাজার এলাকায় ইমামবাগ বলে একটা মহল্লা ছিলো যাহার আজ কোন অস্তিত্ব নেই।

বংশাল, চৌরাস্তা হতে বর্তমান ফায়ার সার্ভিস হেড কোয়াটার পর্যন্ত নাজিরা বাজারের প্রধান অংশ ও সাবেক ফুল বাড়িয়া রোডটিকে ১৯৩৬ সালে এলাকাবাসীর আপত্তি থাকা সত্বেও কাজী রেয়াজুদ্দিনের (১৮৯৯ সালের পৌর কমিশনার) ভ্রাতা কাজী আলাউদ্দিনের নামানুসারে কাজী আলাউদ্দিন রোড রাখা হয়। তার অপর আরেক ভাইয়ের নামে তাঁদের বাবুবাজার-বাদাম তলিস্থিত জমিদার ভবনের নিকটবর্তী রাস্তাটিকে কাজী জিয়াউদ্দিন রোড নামকরণ হয়। বর্তমান সিদ্দিক বাজার কমিউনিটি সেণ্টারের রাস্তার পশ্চিম দিকে অবস্থিত মসজিদটি খুব পুরাতন ও জরাজীর্ণ ছিলো, নবাব পরিবারের আতর বানু নামক এক মহিলা উক্ত মসজিদটির পুনঃ নির্মাণ করায় মসজিদটি আতর বানুর মসজিদ বলা হতো। পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মসজিদটির আরো সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিলে একজন অবসর প্রাপ্ত রেলওয়ে গার্ড উক্ত সমজিদটির সম্প্রসারণ করেন বিধায় বর্তমান উক্ত মসজিদটি গার্ড সাহেবের মসজিদ বলে পরিচিত হয়ে আসছে।

অন্যদিকে সিদ্দিক বাজার কমিউনিটি সেণ্টারটি যেথায় নির্মিত হয়েছে সেটি ছিলো নসিবন বাঁইজির পুকুর। পাক আমলে জনগণের কল্যাণার্থে ঢাকা পৌর সভা উক্ত

পুকুরটি ভরাট করে এই কমিউনিটি সেন্টারটি নির্মাণ করে। সেন্টারের সম্মুখস্থ জমিগুলোও নসিবন বাঁইজির ছিলো।

নাজিরা বাজারের সন্নিকটে রয়েছে সিক্কাটুলি মহল্লা। সিক্কাটুলি নামের পিছনেও এক ছোট ইতিহাস রয়েছে। এখানে ১৮৭৮ সালের পূর্বে অর্থাৎ ঢাকা পৌর সভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পূর্বে সাক্কা অর্থাৎ ভিস্তি ওয়ালাগণ শহরে পানি সরবরাহ করতো। অবশ্যি আজও সাবেক ভারত উপ-মহাদেশের অনেক শহরের কোন কোন স্থানে ভিস্তিওয়ালারা পূর্ব প্রচলিত চামড়ার মোসকে করে পানি সরবরাহ করে থাকে। তখনকার দিনে ঢাকার ভিস্তিওয়ালাদেরও একটি সংস্থা ছিলো। সে সংস্থার প্রধান নওয়াব ভিস্তি বলে আখ্যায়িত হতো। যে এলাকায় ভিস্তি বা সাক্কাদের বসবাস ছিলো সে এলাকাটি সাক্কাটুলি নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীতে নামটি বিকৃত হয়ে সিক্কাটুলি হয়েছে।

সিক্কাটুলিতে ১৮৯৪ সালের দিকে মুন্সি এমদাদ হোসেন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। যিনি ঢাকা কোর্টে টুন্নিগিরি কাজ তথা মামলার তদবিরগিরি করতো। মনে করা হয় তারই পদবী অনুসারে সিক্কাটুলির একটি অংশকে মুন্সি পাড়া বলা হতো।

ঊনবিংশ শতাব্দিতে নেয়ামত উল্লাহ ওস্তাগার নামে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। যিনি নাজিরা বাজার পুলের সঙ্গের মসজিদটি তৈরী করেছিলেন বলে এক দলিলে দেখা যায়। দলিলের তফছিলে বর্ণিত সীমানায় উল্লেখ করছে "নেয়ামত উল্লা ওস্তাগারের নির্মিত খানে খোদাই মসজিদ" সিক্কাটুলিতে যে পুকুর আছে তাহাও এক দলিলে উল্লেখ পাওয়া যায় যে নেয়ামত উল্লা ওস্তাগারের স্ত্রী বোচা বিবির দেন মোহরের টাকায় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পুকুরটি খনন করে দিয়েছে। এরা মুগা সুতা দিয়ে টুপি ও রুমাল তৈরী করতো। এসব টুপি ও রুমাল আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশে রপ্তানী হতো। আমাদের দেশের তথা ঢাকার লোকজন ওস্তাগার আখ্যা প্রাপ্ত ব্যাক্তিদের রাজ মিস্ত্রি বলেই জেনে এসেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর অর্থ অন্যরুপ। ওস্তাগার শব্দটি ওস্তাদগার থেকে হয়েছে অর্থাৎ অনেক বিষয়ে বিশেষ করে সুক্ষ্ম ও দক্ষ হাতের কাজের ওস্তাদ বহু মুখী পারদর্শী বিধায় তাঁদের "গার" শব্দ দিয়ে তথা অনেক বিষয়ের কাজের ওস্তাদ বলে "ওস্তাগার" নামের প্রচলন হয়। পরবর্তীতে ইংরেজ রাজত্ব কালের শেষ দিকে ঐসব কাজের বিলুপ্তি ঘটে, তবে রাজ মিস্ত্রি হিসেবে যারা নব নির্মিত দর দালানে বহু সুন্দর সুন্দর কারুকার্য করতো। হিন্দু বিত্তশালীরা শুধু তাদেরকে ওস্তাগার নামে আখ্যায়িত করতো বিধায় পরবর্তীতে ঢাকাবাসী শুধু রাজ মিস্ত্রিদেরই ওস্তাগার বলে জেনে আসছে।

সদর রাস্তার ধারে যে মসজিদ রয়েছে তা চাঁদখাঁ ১৯০৬ সালে নির্মাণ করেছিলেন তারই নামানুসারে মসজিদটিকে চাঁদখাঁর মসজিদ বলা হয়। অপর একটি মসজিদ পাক আমলে নির্মিত হয় যার মিনারটি ছাতার ন্যায় বিধায় সেটা ছাতি ওয়ালা মসজিদ নামে পরিচিত। সিক্কাটুলির ভিতর একটি মাজার রয়েছে তাকে লোকে গলাকাটা সৈয়দের মাজার বলে উল্লেখ করে। মাজারের পাশে একটা পুরনো বটগাছ রয়েছে। সিক্কাটুলিতে প্রায় ৫০ বছর পূর্বেও ভিস্তি তথা সাক্কাদের বসবাস ছিলো এরা পৌর সভার রাস্তায় পানি ছিটাতো এবং হোটেল রেঁস্তোরাগুলোতে পানি সরবরাহ করতো। সেই সাক্কা পরিবারের ২/৩টি পরিবার এখনও রয়েছে তবে তারা বর্তমানে অন্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। সিক্কাটুলির ফাঁকা যায়গায় খালের ধারে পশুর চামড়া শুকানো হতো। এসব যায়গাকে "খোলা" বলা হতো।

সিক্কাটুলি সংলগ্ন রয়েছে মীরন জলা। এ নামটি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের একটি দলিলেও উল্লেখ রয়েছে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল তৈরীর সময় মার্টিন এন্ড কোম্পানী ইট ঢোলাই করার জন্য দুটো ইঞ্জিন ও বগি এনেছিলো। নির্মাণ কাজ শেষ হবার পর পৌর সভা সেগুলো খরিদ করে মল পরিবহনের কাজে ব্যবহারের জন্যে। মীরন জলার পাশে সিক্কাটুলি সংলগ্ন পৌর সভার মেথর সেড ও মলের ডিপো ছিলো। এই ডিপো থেকে মল ডাব্বায় ভরে ইঞ্জিনে দিয়ে টেনে সেই মল মনিপুরি পাড়ার নিকটস্থ নালা ডোবা খালে ফেলতো। এই ইঞ্জিনধারী ডাব্বা চলার জন্য পৌর সভা আগা সাদেক রোড, আগামাসি লেন, নাজিমুদ্দিন রোড, নিমতলি, হোসেনী দালান এলাকার কিছু লোকবসতি উঠিয়ে রেল লাইনের মত করে মলটানার ইঞ্জিনের পথ তৈরী করেছিল, মলটানার সময় ডাব্বার সঙ্গে কিছু সংখ্যক মেথর মদ খেতো আর আনন্দ উল্লাস করতে করতে যেতো এবং বাঁশের বাম্বু দিয়ে ডাব্বাগুলো উলটিয়ে মলসমূহ ফেলে দিয়ে আসতো মনিপুরি পাড়ার নির্দ্ধারিত স্থানে।

আগাসাদেকের বাড়ীর বেষ্টনী বিরাট এলাকা নিয়ে ছিলো। তন্মধ্যে বড় বড় কয়েকটি জলাশয় ছিল। ইতিহাসবেত্তা মুনশী রহমান আলী তায়েশ ঢাকা শহরের বিখ্যাত ধনী আগামাসীহ কে তার ভাই বলে অভিহিত করে গেছেন। এ বাড়ীর বেষ্টনীর সঙ্গে মীরনজল্লা বা জলাশয় নামে এখনও কিছু এলাকা পরিচিত। প্রাচীন তথা শর্তবর্ষের বৃদ্ধদের নিকট থেকেও এই মীরন কে ছিলেন জানা যায় না-তারাও শুনে আসছেন মীরন জলা। একটি কারণে ধারণা করা হয় যে মীর জাফরের পুত্র মীরনের নামেই এ জলার নামকরণ হয়েছিল। কেননা আগাসাদেকের সময়েই মীরনের আবির্ভাব। হয়তো এসব জলাশয় মীরন খনন করিয়াছিলেন। কিংবা জায়গীর

পেয়েছিলেন। কেননা তখন ঢাকার অধিবাসীদের বাড়ী ঘরের মল ও দূষিত পানি নিস্কাষণের জন্য এরূপ জলাশয়ের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া শহরের দোলাই খালের সঙ্গে অনেক জলাশয় খনন করে সংযুক্ত করা হয়েছিল-সোয়ারী ও মালপত্র নৌকা যোগে শহরের অভ্যন্তরে আনা নেওয়ার জন্য। এই মীরন জল্যার একটি অংশের উপর ঢাকা পৌরসভা ওয়ার্কশপ করে তার নাম দিয়েছিল মীরন জল্লা ওয়ার্কস সপ এবং ধাঙ্গর কলোনী স্থাপন করে তার নামও দেওয়া হয়েছিলো মীরন জল্লা ধাঙ্গর কলোনী। পরবর্তীতে মাজেদ সরদার কমিউনিটি সেণ্টারও মীরন জল্লার মধ্যে নির্মিত হয়।

হাকিম হাবীবুর রহমান প্রদত্ত এক তথ্যে জানা যায় বংশাল মানে বাঙ্গালীদের বাসস্থান। শালকে বাংলায় ঘর বলা হয়। ঢাকার মুসলিম অধিবাসীরা নিজেদেরকে বাঙ্গালী নামে নয় বরং মুসলমান নামে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত ছিলো। হিন্দু সম্প্রদায় ও মফস্বল থেকে আগত মুসলমানদেরকে বাঙ্গালী বা বাঙ্গাল নামে অভিহিত করতো।

বংশাল রোডের পশ্চিমাংশে পীর দুদু মিয়ার বাস ভবন ছিলো। ১৯৫৪ সালে দুদু মিয়ার নামানুসারে বংশালের নামকরণ করার প্রস্তাব ঢাকা পৌর সভায় পেশ হলে স্থানীয় অধিবাসীগণ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন পেশ করেন। আবেদনে যুক্তি দেখানো হয় যে মেরামতের জন্যে পোতাশ্রয়ের যে স্থানে নৌযান নোঙ্গর করা হতো তাকে বলা হয় ব্যাঙ্কশাল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের দলিল পত্রে এ নামের উল্লেখ রয়েছে। দেশ বিদেশের বিভিন্ন নদী তীরবর্তী প্রায় রাস্তাগুলোর নাম ব্যাঙ্কশাল দেখা যায়। ঢাকার এই বংশালের পাশ দিয়ে বিরাট একটা খাল ছিলো। মেরামতের জন্যে হয়তো এই খাল দিয়ে নৌযান আনা নেওয়া করা হতো। তাই এই এলাকাটি অন্যান্য শহরের ন্যায় ব্যাঙ্কশাল নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। পরে তা বংশালে রূপান্তরিত হয়।

দুদু মিয়া ওরফে মুহসিন উদ্দিন আহমদ বাংলার ইতিহাসখ্যাত সংগ্রামী নেতা হাজী শরিয়ত উল্লাহর পুত্র। হাজী শরিয়ত উল্লাহ ইংরেজ নীল করদের বিরুদ্ধে এক অ-প্রতিরোধ্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। দুদু মিয়া তাঁর পিতার ফরায়েজী সংগ্রামকে আরও ব্যাপক ও জোরদার করেছিলেন। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাঁর আন্দোলনকে বানচালের উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালিয়ে ছিলো। তাঁকে ওহাবী আন্দোলনের একজন প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিলো। আসলে তিনি ছিলেন হানাফি মাজহাবের লোক।

দুদু মিয়া ১৯১৮ সালে বর্তমান মাদারীপুর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে

তার পিতার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। অধিকতর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি মক্কায় গমন করেন। মক্কা যাওয়ার পূর্বে তিনি কিছুদিন কলিকাতা অবস্থান করেন। এসময় তিনি তিতুমীরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিতুমীর এই তেজদীপ্ত বালককে একছড়া তসবীহ উপহার দিয়ে তার ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করেন। ১৮৩৬ সালে তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে পিতার একান্ত নৈকট্যে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন।

১৮৩৮ সালে তিনি এক বিশাল লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। তার পিতা ১৮৪০ সালে ইন্তেকাল করলে পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব লাভ করেন এবং তার পিতার আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য তেজদীপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে পিতার আন্দোলনকে আরও বেগবান ও তীব্রতর করে তোলেন। সেই সাথে গড়ে তোলেন এক দুর্বার কৃষক আন্দোলন। এ সময় হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেন এক সশস্ত্র লড়াই। তার আহবানে বাংলাদেশের কৃষক, সর্বহারা ও মেহনতি মানুষ তাঁর পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হন। তাদের নিয়ে তিনি ইংরেজ ও তাদের দোসর হিন্দু সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি ঘোষনা করেন আল্লাহর রাজ্যের সব মানুষ সমান। লাঙ্গল যার জমি তার, এর উপর কর আরোপ করার অধিকার কারো নেই। তার এই সংগ্রাম দেশব্যাপী অকুন্ঠ সমর্থন লাভ করে।

দুদু মিয়া যে সময় এ আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন ছিল বাংলার মুসলমানদের এক ভয়াবহ অবস্থার কাল, হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের ধর্ম কর্ম করার উপরও বাধা সৃষ্টি করে মুসলমানদের উপর পূজা করও বসায়। তাছাড়া মুসলিম সমাজের কেউ যদি দাড়ি রাখত তাহলে তার উপরও কর বসিয়ে দিত। এমন কি কয়েকজন মুসলমানকে ধরে এনে ফরিদপুরের ঘোষ জমিদার তাদের দাড়ি একত্রে বেঁধে নাকে নস্‌সি কিংবা শুকনা মরিচের গুড়ো প্রবেশ করিয়ে অমানবিক ও পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়ে আসছিল। ফরিদপুরের ঘোষ জমিদার ও অন্যান্য হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌছলে তিনি সর্বত্র অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবদের চিহ্নিত করে ঘেরাও আন্দোলনের আহবান জানান। ফরিদপুরের বাহাদুরপুর হয়ে উঠে তার এই সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল। দুদু মিয়ার নেতৃত্বে শত শত লাঠিয়াল বাহিনী কানাইপুরের শিকদার জমিদার বাড়ী ঘেরাও করে জমিদারের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি আপনি কৃষকদের দাবী মেনে নিয়ে শান্তি পথে চলেন তাহলে আমরা ফিরে যাব। নইলে আপনার এই সুরম্য দালানের প্রতিটি ইট খুলে নেব আমরা, তার কঠোর উক্তি

শুনে জমিদার নতি স্বীকার করতঃ প্রজা সাধারণকে কোনরূপ জুলুম করব না। পূজা কর আদায় করব না ইত্যাদি শর্ত স্বাক্ষর করলে লাঠিয়াল বাহিনী ফিরে যান। এমনিভাবে অত্যাচারী ঘোষ জমিদারের বাড়ী ঘেরাও হয়। কানাইপুরের জমিদারের মত তাকেও অনুরূপ শর্ত পালনের আহবান জানানো হলে উদ্ধত্ত জমিদার দাবী না মেনে দুদু মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনীর উপর আক্রমন করলে বাধ্য হয়ে দুদু মিয়া পাল্টা আক্রমনের নির্দেশ দেন। জমিদারের সাধের প্রসাদ তছনছ করে দেয়া হয়। জমিদার পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেও পরে গণআদালতের রায়ে মৃত্যু দন্ড দেওয়া হয়।

ফরিদপুরের জমিদার দমন ঘটনা সারা বাংলায় বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলার মানুষের কাছে দুদু মিয়া হয়ে উঠে মুকুটহীন সম্রাট। তিনি বাংলাদেশের বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে মূলতঃ এক স্বাধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। সারা অঞ্চলকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করেন। প্রতি বিভাগকে বলা হতো হল্কা। হল্কা পরিচালিত হত একজন খলিফা দ্বারা। খলিফ্যর দায়িত্ব ছিল এলাকার শান্তি বজায় রাখা। জনগণের মধ্যে ঐক্য সুসংহত করা, মজলুমদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। কর আদায় ছাড়াও মানব কল্যাণ কাজ করা বিশেষ করে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গ্রামের ইমাম ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়ে আদালত গঠন করেন। তিনি কড়া হুকুম জারী করেন এসব আদালত ছাড়া যদি কেউ সরকারী আদালতে বিচার প্রার্থী হয় তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। ফলে হিন্দু মুসলিম খৃষ্টান সবাই এ আদালতের শরণাপন্ন হতে থাকে। অল্প কালের মধ্যেই সারা এলাকায় মানুষের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় পঞ্চচর নীলকুঠিতে ডানলপের ব্রাহ্মণ গোমস্তা কালী প্রসাদ কাঞ্চি লালের অত্যাচারে এলাকার মানুষ জর্জরিত হচ্ছিল। তার ঔদ্ধত্য এত চরম আকার ধারণ করে যে, একদিন রাতে দুদু মিয়ার বাহাদুর পুর বাড়ীতে চড়াও হয়ে নগদ অর্থ ও বহুবিধ অস্থাবর মালামাল ডাকাতি করে নিয়ে যায় এবং চার জন পাহারাদারকে হত্যা করে। এই অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ দুদু মিয়ার বিশিষ্ট মুরীদ কাদির বক্স একটি লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে নীলকুঠি পুড়িয়ে দেন এবং কাঞ্চিলালকে হত্যা করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেন।

এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দুদু মিয়া সহ ১০৬ জনকে সোপর্দ করা হয়। বিচারে ২২ জনকে ৭ বৎসর করে সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। দুদু মিয়া বেকসুর খালাস পান। এরপর ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্কালে তাকে গ্রেফতার করে কলকাতার জেলে আটক রাখা হয়। ১৮৫৯ সালে

মুক্তি পেলেও বাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গে ফরিদপুর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে জেলে বিনা বিচারে আটক রাখে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত।

তিনি তার অগণিত মুরীদদের যেমন জেহাদী প্রেরণায় উদ্ভাসিত করেছিলেন তেমনি তাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় বলীয়ান করেছিলেন। সাধারণ মানুষের নয়নমনি পীর দুদু মিয়া ১৮৭২ সালে ঢাকার বংশালস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। সেখানে তাঁদের পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। বর্তমানে তাঁদের বংশধরদের কেহই এ বাড়ীতে থাকেন না, শুধু তাঁর মাজার তাঁর অমর স্মৃতি বহন করে চলেছে।

এই বংশাল মহল্লার প্রধান অংশটির নাম আব্দুল্লাহ সরকার লেন। মৌলভী হাজী আবদুল্লাহ এ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও একজন আলেম এবং সুবিচারক ছিলেন। তিনি ওহাবী মতাবলম্বী ছিলেন। তৎপুত্র মৌলভী আলা বক্স সরকার একাধারে ঢাকা পৌর সভার নির্বাচিত কমিশনার পদে পঁয়তাল্লিশ বছর ছিলেন। যৌবনকালে কুস্তিগীর ছিলেন।

মৌলভী আলা বক্স সরকারের কমিশনার পদে আসীন থাকাকালে স্থানীয় জনগণ প্রখ্যাত আলেম ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং কমিশনার সাহেবের সুযোগ্য পিতার স্মরণে বংশালের প্রধান বসতিটির নাম হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন রাখার জন্য পৌর সভায় আবেদন জানালে ঢাকা পৌর সভা এ প্রস্তাবটি গ্রহন করে এলাকাটি হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন নাম করণ করেন।

হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেনের নাম করণ নিয়ে বংশাল এলাকার জনগণের মধ্যে দারুন মত বিরোধ দেখা দিলে সে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে তৎকালীন ঢাকা পৌর সভার চেয়ারম্যান নবাব ইউসুফ জান ঐ এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি হাজী বদরউদ্দীন ওরফে ভুট্টো হাজীর ভ্রাতা হাজী আব্দুর রশিদের নামানুসারে বংশাল মালীবাগের একটি ছোট গলি পথের নাম করে দেয় হাজী আঃ রশিদ লেন। এভাবেই সে সময়ের বংশালবাসীদের বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছিলো।

এই বংশাল মহল্লাতে একজন সমাজহিতৈষী ও দানশীল ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁর নাম শেখ ভুট্টো ওরফে হাজী বদরউদ্দীন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট চামড়া ব্যবসায়ী। হাজী বদরউদ্দীন ঢাকাবাসীদের কাছে ভুট্টো হাজী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ঢাকার বাকল্যান্ড বাঁধ নির্মাণের জন্যে সরকারকে চার হাজার টাকা দান করেন। সদরঘাটে নদীবিহারের সময় নবাব আবদুল গনি সাহেবের উদ্যোগে এই অনুদানপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তিনি ঢাকাস্থ বাংলার বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন, মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা তৈরি ও পুষ্করিনী খননে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে গেছেন।

হাজী বদরউদ্দীন ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ফরায়েজী আন্দোলনের পরই শুরু হয় ওহাবী আন্দোলন। এ আন্দোলন সুদূর আরব দেশ থেকে আফগানিস্তান হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী সময়ে যেসব অবাঞ্ছিত ও অবাস্তব মতবাদ ইসলামে অনুপ্রবেশ করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে বিকৃত, কলুষিত করার প্রয়াস পেয়েছিলো সেগুলো প্রতিহত করে তার মূলোৎপাটনই ছিলো ওহাবী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যেই চতুর্দশ শতাব্দীতে ইমাম তায়মিয়া এসব অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এ আন্দোলন তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জনাব আবদুল ওহাব ইসলামের এইসব অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রতিবাদ ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আরব জাহানে জনাব আবদুল ওহাব ছিলেন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আরবের রাজনীতিতেও ছিলো তাঁর যথেষ্ট প্রভাব। এ কারণেই তাঁর আন্দোলনে সাড়া দিয়ে তাঁর অনুসারীরা আরব জাহানে ব্যাপক আকারে আন্দোলন শুরু করে দেয়। পরে এ আন্দোলনের যৌক্তিকতা অনুধাবন করে ভারতীয় মুসলমানরা সমগ্র ভারতে এ আন্দোলন শুরু করে দেয়। ইতিহাসে এটাই ওহাবী আন্দোলন নামে খ্যাত আর যেহেতু আবদুল ওহাব এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা সেহেতু এ আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। যারা এ আন্দোলনের মতবাদকে গ্রহণ করেছেন তারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস হিসেবে পরিচিতি হয়ে আসছেন। ঢাকায় বংশাল ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি মহল্লায় আহলে হাদিস পরিবার বর্গ অবস্থান করছেন।

সমগ্র ভারতকে আজাদ করে খালেস ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনায় বেরেলীর মৌলানা সৈয়দ আহমদ এবং আল্লামা শাহ ইসলাইল যে ধর্মীয় আন্দোলন, সংস্কার ও সশস্ত্র জিহাদের ডংকা নিনাদিত করেন। সে সময়ে ভারতে মোঘলদের পতন ও শিখ শক্তির উত্থান আরম্ভ হয়। শিখ রাজা রঞ্জিত সিং মুসলমানদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার চালাতে শুরু করেন। ওহাবী নেতৃবৃন্দ এ জুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অস্ত্র ধারণ করেন।

রাজা রনজিৎ সিং প্রথম দিকে ওহাবী আন্দোলনকে তেমন গুরুত্ব দেননি। যখন পেশোয়ারের পতন ঘটে তখনই তার টনক নড়ে ওঠে। শিখরা উপর্যুপরি কয়েকবার আক্রমন চালিয়েও পেশোয়ার উদ্ধার করতে পারেনি। এ সময় সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু মুজাহিদ পেশোয়ার রওয়ানা হয়। আল্লাহর রাহে জুলুমের বিরুদ্ধে জেহাদ করাই ছিলো তাদের একমাত্র বাসনা। ফলে পেশোয়ারে

একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেসময় মোঘল সাম্রাজ্যের সীমানা সংকুচিত হয়ে দিল্লির চার পাশে এসে সীমাবদ্ধ হয়। ওহাবী নেতৃবৃন্দ শুধু পেশোয়ার জয় করেই শান্ত হলেন না। কিছুকাল পর ১৮৩০ সালে তারা শিখ রাজধানী বালা কোট আক্রমনে অগ্রসর হয়। এ সংবাদ শ্রবণে শিখরা বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বালা কোটের পার্বত্য প্রান্তরে মুজাহিদদের মোকাবিলা করে।

এই ভয়াবহ যুদ্ধে সৈয়দ আহমাদ বেরেলভি ও আল্লামা ইসমাইল শাহাদত বরণ করেন। নেতৃদ্বয়ের শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনে মুজাহিদগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ফলে তাদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়। এ পরাজয়ে সাময়িকভাবে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও একেবারে উদ্যম হারায়নি। কিছু দিনের মধ্যেই মাওলানা বেলায়েত আলী তৎভ্রাতা মাওলানা এনায়েত আলী আজিমাদি ও মাওলানা মুহম্মদ আলী রামপুরী ওহাবী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে পুনরায় তৎপরতা শুরু করে দেয়। এ সময়ের মধ্যেই মাওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলীর সঙ্গে হাজী বদরউদ্দীন তথা ভূট্টো হাজীর সঙ্গে সংযোগ ঘটে।

এই ওহাবী আন্দোলনে হাজী বদরউদ্দীন এর অবদান কম ছিলো না। আন্দোলন পরিচালনার জন্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বহু অর্থ ব্যয় করে গেছেন। তাছাড়া ঢাকা, ময়মনসিংহ-বিশেষ করে উত্তর বঙ্গ থেকে ওহাবী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে যেসব অর্থ সংগৃহীত হতো সেসব ভূট্টো হাজীর মাধ্যমেই বিভিন্ন পন্থায় বাংলার বাইরে মূল আন্দোলন কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছতো। জনাব হাজী বদরউদ্দীন ও তাঁর সহকর্মীদের গ্রেফতার করার জন্যে বৃটিশ সরকার বহুবার ঘোষণা জারি করেন, কিন্তু ঢাকার শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমান না পাওয়ায় এবং ঢাকার মুসলমান অধিবাসীদের উপর তাঁর প্রভাবের কথা চিন্তা করে তাঁকে গ্রেফতার করা থেকে বিরত থাকেন। বৃটিশ সরকারের কাছে ভুট্টো হাজী ও তাঁর সহকর্মীরা "কুখ্যাত ওহাবী এজেন্ট" বলেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ওহাবী আন্দোলনে তাঁর সঙ্গে যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নবাবপুরের জনাব আজিম উদ্দীন এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী এলাকা আটিয়ার অধিবাসী মৌলভী ইব্রাহীম অন্যতম।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ওহাবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ঢাকার মুসলমানরাও জেগে উঠেছিলো। ছোটবেলায় আমার আব্বা ও অনেক প্রবীণ মুসলমানের মুখে শুনেছি ঃ এ ধর্মীয় জেহাদে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু সংখ্যক তরুণ ও যুবক পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করে আর ঢাকা ফিরে আসেনি। শুধু ঢাকা কেন,

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও বহু সংখ্যক মুসলমান পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করেছিলো। এদের অনেকেই জ্বরাব্যধি আর অনাহারে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেকেই শাহাদত বরণ করেছিলেন শত্রুপক্ষের সশস্ত্র আক্রমনে। তাঁরা আল্লাহ্‌র রাহে জীবন উৎসর্গ করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এই নাম না-জানা শহীদদের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ না থাকলেও তাঁরা যে ইসলামে অনাচার প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছিলেন–এটা মুসলমানদের কাছে কম গৌরবের বস্তু নয়। তাঁরা ছিলেন সব রকম প্ররোচনার উর্দ্ধে। লোভলালসা তাঁদের মহৎ জীবনকে এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি। শত্রুর পুরস্কারকে তাঁরা তিরস্কার স্বরূপই গণ্য করে গেছেন। তাঁদের নেতা বা পীরের নির্দেশকে তাঁরা জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁদের এই জেহাদী মনোভাবের পরিচয় পেয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা হাণ্টার সাহেব তাঁর ইন্ডিয়ান মুসলমান গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের বীরত্ব গাঁথা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বাংলার তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার তাঁর রিপোর্টের এক স্থানে বলেছেন, "দুর্বল ভীতু বাঙ্গালী জাতি জেহাদের মত্ততায় পাঠানদের চাইতে কম ছিলো না।" তাঁরা একে অন্যের কাজকে নিজেদের কাজ বলেই মনে করতেন এবং বিপদের সময় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। হাণ্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে আরও লিখেছেন ঃ 'মুজাহিদদের আক্রমন শিখ পল্লী সমূহের উপরই প্রচন্ড ছিলো। অবশ্যি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে সব সময়েই তাঁরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। তাঁরা কাবুল যুদ্ধে আমাদের শত্রুদের সাহায্যার্থে বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ প্রেরণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে হাজার খানেক প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। হাণ্টার সাহেবের ও পুলিশ কমিশনারের উক্তি থেকেই আন্দোলনের তীব্রতা অনুভব করা যায়।

১৮৫৭ সালের শেষের দিকে আম্বালায় ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মুজাহিদদের বৃহত্তম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সম্মুখ সমরে বীর মুজাহিদদের প্রচন্ড আক্রমনে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় ইংরেজ সরকার ছল চাতুরী ও কুটনীতির আশ্রয় গ্রহন করে উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে পাহাড়ী পাঠানদের বশীভূত করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্যাদা রক্ষা করেন। এ যুদ্ধের পরপরই ইংরেজ শাসকগণ মুজাহিদ বাহিনীর পশ্চাতে সমগ্র ভারত বর্ষে বিরাট সমর্থক দলের সন্ধান পান। নতুন নতুন মুজাহিদ কাফেলা প্রেরণ এবং অর্থ পাচারের বহু বিস্তৃত তথ্য উদ্ঘাটন করেন। ফলে ওহাবীদের বিরুদ্ধে পর পর পাঁচটি বিচার প্রহসন সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে ১৮৬৪ সালে আম্বালার বিচার ১৮৬৫ সালে পাটনা, ১৮৭০ সালে মালদহ এবং রাজমহলে ও ১৮৭১ সালে

পাটনার দ্বিতীয় বিচার উল্লেখযোগ্য। উক্ত বিচার কালে জিহাদে অংশ গ্রহণ ও সাহায্য প্রদানের অভিযোগে সারা ভারতে হাজার হাজার মুসলমান বন্দী হয়। বহু নিরাপরাধ ব্যক্তি অশেষ দুর্ভোগের শিকার হয়। অভিযোগের রিপোর্টে হাজী বদর উদ্দীন ওরফে শেখ ভূট্টো হাজীর মুজাহিদ আন্দোলনে জড়িত থাকা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্থান পায়। ১৮৬৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী হতে স্পেশাল ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ লোয়ার প্রভিন্সের জেনারেল অব পুলিশের নিকট পত্র পাঠান তাতে হাজী বদর উদ্দীনের পরিচয় দেওয়া হয় "শেখ ভূট্টো ঢাকার প্রসিদ্ধ চামড়ার ব্যবসায়ী এবং কুখ্যাত ওহাবী" উক্ত সালেই ২৮শে অক্টোবর মালদহের অফিসিয়েটিং ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে ও কিনলি বাংলা সরকারের অফিসিয়েটিং আণ্ডার সেক্রেটারীর নিকট লিখিত পত্রে ওহাবীদের দীর্ঘ দিন হতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ এবং ভূট্টো হাজী প্রকাশিত পুথি পুস্তকের বিবরণ উল্লেখ করে। এক স্থানে বলেছেন ঢাকার হাজী বদর উদ্দীন পাটনা ষড়যন্ত্রের একজন সক্রিয় সহায়তাকারী। এবং ভার্নাকুলার প্রেসে মুদ্রিত মৌলভী মিঠা জান রহমান (আসলে মাওলানা মিজানুর রহমান হবে) ও হাজী বদর উদ্দীন কর্তৃক লিখিত ধর্মীয় দৃষ্টি কোণ হতে তুতুয়া নামে ওহাবী আন্দোলনের সমর্থনে লিখিত বাংলা পদ্যের বইটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

এরপর হতেই ঢাকায় হাজী বদর উদ্দীন ও মাওলানা আযীমুদ্দিন ও টাংগাইলের মাওলানা ইব্রাহীম সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা ও তথ্য সংগ্রহে বাংলা সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। স্পেশাল বেংগল পুলিশের ডি, আই, জি মিঃ জে, এইচ, বেইলী, লোয়ার প্রভিন্সসমূহের আইজির নিকট লিখিত চিঠিতে জানান যে তিনি ঢাকা ও ময়মনসিংহে ওহাবী বিশেষ করে তিন নেতার সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য চারজন হেড কনেষ্টবলকে প্রেরণ করেছেন। তারা ছিলো মাধ্যরায়, কুঞ্জ বিহারী হাজরা, নুন্ন বেগ ও সূর্য কুমার চৌধুরী ইহাদের প্রেরিত রিপোর্ট হতে ডি আই জি ওহাবীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পান। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্পেশাল বেংগল পুলিশের ডি আই জি ১৮৬৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর-এর পত্রে হাজী বদর উদ্দীন ও মাওলানা ইব্রাহীম সম্বন্ধে নিজে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, "মাওলানা ইব্রাহীম এবং চামড়ার ব্যবসায়ী শেখ ভুট্টো ওরফে বদর উদ্দীন উভয়েই দীর্ঘ দিন হতে ওহাবীদের নেতা রূপে পরিচিত এবং ময়মনসিং ও ঢাকা জিলার ওহাবীদের উপর তাদের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক"।

ঐ একই পত্রে বলা হয় যে, হাজী বদর উদ্দীন একজন ধনবান চর্ম ব্যবসায়ী এবং

অন্যান্য দ্রব্যের বণিক ওহাবী দলের সর্বাধিক কর্মঠ প্রতিনিধি, পূর্বাঞ্চলীয় জিলাসমূহের যাবতীয় আদায় পত্র তাঁহার মাধ্যমে আসতো। ফাগুলাল নামক পাটনার একজন মহাজনের মাধ্যমে উক্ত টাকা পাটনার সাদেকপুরের প্রধান কেন্দ্রে প্রেরিত হতো। আম্বালা, পাটনা প্রভৃতি কোর্টে যখন বন্দী মৌলভীগণের বিচার কার্য চলছিলো তখন তিনি তাহাদিগকে অর্থ প্রভৃতি দিয়ে সক্রিয় সাহায্য করেন। আমার নিকট এ সংবাদ পৌছিয়াছে যে, পাটনার মধ্যস্থতায় উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কেন্দ্রে সাহায্য প্রেরণ যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন তিনি বিশেষ কাসেদের মাধ্যমে রংপুর তথা হতে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জিলাসমূহের মধ্য দিয়ে সিত্তানার মুজাহিদ কেন্দ্রে অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।"

যা হোক লোয়ার প্রভিন্সসমূহের অফিসিয়েটিং ইন্সপেক্টর জেনারেল পুলিশ লেঃ কর্ণেল এ, এইচ, প্যাটার স্পেশাল ডি আই জি মিঃ বেইলীর প্রস্তাব সমর্থন করে বেংগল গর্ভমেন্টের জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর নিকট ১৫ই ডিসেম্বর এক পত্রে বাবু কিষ্ট ঘোষকে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বগুড়া ও পাবনা জিলার ওহাবীদের সম্বন্ধে তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্যে প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করলে বাংলার তৎকালীন লেঃ গভর্ণর উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার হাজী ভূট্টোকে কয়েকবারই গ্রেফতার করার ইচ্ছা করলেও সফল হতে পারেননি। এরকম এক বার গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্কালে বাংলার তদানীন্তন লাট সাহেব তখন ঢাকায় আসেন। ঢাকার অবিসংবাদী জন নায়ক নবাব আব্দুল গণীর সঙ্গে হাজী সাহেবের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিলো। তিনি তাকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। নবাব আঃ গণী লাট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং হাজী বদর উদ্দীনের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপন করে তাঁর সম্পর্কে সরকারের সন্দেহ অপনোদনের চেষ্টা করেন। তিনি হাজী বদর উদ্দীনের ওহাবী আন্দোলন বিষয়ে নির্লীপ্ততা প্রমাণের জন্য লাট সাহেবকে নিয়ে আকস্মিকভাবে হাজী সাহেবের চামড়ার গুদামে উপস্থিত হন। হাজী সাহেব নবাব সাহেবের পূর্ব ইংগিত অনুসারে তখন চামড়ার দবাগতের কাজে ভীষণ ব্যাস্ত। লাট সাহেব দেখতে পেলেন ভূট্টো হাজী নিজ পেশায় মশগুল, সাদা সিদা পোষাক, নিজ হাতে চামড়ায় লবণ পানি ছিটাচ্ছেন, চোখে মুখে সারল্যের ছাপ। নবাব সাহেব বললেন, এ লোক কি সরকার বিরোধি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারেন? গভর্ণর নীরব, তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল হাজী বদর উদ্দীনের বিরুদ্ধে সন্দেহ অমূলক। ফলে তাঁকে গ্রেফতার করা থেকে সরকার বিরত হলেন।

আরেক বারের ঘটনা লাট সাহেব পুণরায় ঢাকায় আসলে নবাব আব্দুল গণী তাঁর সম্মানার্থে বুড়িগঙ্গা নদীর উপর জাহাজে এক সংবর্ধনার আয়োজন করেন। শহরে গণ্যমান্য বিশিষ্ট জমিদার ও লোকজনকে দাওয়াত করা হয়। হাজী বদর উদ্দীনও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের একজন। তিনি লাট সাহেব এবং অন্যান্য মেহমানদের পরে উপস্থিত হন। তাহার উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাট সাহেবের উপস্থিতিতে সকল মেহমান দাঁড়িয়ে সম্মানের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। লাট সাহেব কৌতুহল বশত জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন ইনি সেই হাজী বদর উদ্দীন যার সম্পর্কে ডিটেকটিভ পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট তদন্ত কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। উক্ত সভাতে বুড়িগঙ্গার ধারে সুদীর্ঘ বাঁধের জন্যে (বাকল্যাণ্ড বাঁধ) চাঁদা দেওয়ার কথা উঠে। নবাব সাহেবের মোটা অংকের দানের পরেই হাজী বদর উদ্দীন তাঁর চাঁদার কথা ঘোষণা করেন। লেঃ গভর্ণর সাহেব সরকারী কাজে এমন মুক্ত হস্তে দাতার দানে মুগ্ধ হন। তাঁর সম্পর্কে সরকার বিরোধি ভূমিকা অভিযোগ অমূলক বলে মনে হয়। ফলে ভূট্টো হাজীর গ্রেফতারের পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হয়।

হাজী বদর উদ্দীন কোন দিন পুলিশের হাতে ধরা পড়েননি, গ্রেফতারি পরওয়ানা জারী হয়েছে বলে কোন প্রমাণাদিও নেই। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সাহসী এবং অত্যন্ত হুশিয়ার। জিহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং প্রেরণ কোন দিনই বন্ধ হয়নি। কিভাবে তিনি টাকা প্রেরণ করতেন তা সহজে কেউ ধরতে পারতেননা। যারা অর্থ নেওয়ার জন্য ঢাকায় আসতেন তারা ছদ্মবেশে আসতেন। কাহারো পক্ষে বুঝিবার উপায় ছিলোনা সে ব্যক্তির সঙ্গে জিহাদের সম্পর্ক থাকতে পারে। উপরোক্ত ঘটনার পরও আদায়কারীদের আগমন অব্যাহত থাকে। সিআইডি কর্মচারীদের শ্যেন দৃষ্টি ও কড়া নজর ব্যর্থ করে দিয়ে জেহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে যেতো। বলা যেতে পারে মহান করুণাময় আল্লাহ হাজী বদর উদ্দীনের উপর সহায় ছিলেন। যার ফলে তিনি শুধু জেহাদি আন্দোলনেই সফল হন নাই, ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রচুর সফলতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। ঢাকায় আর্মেনিয়ানদের একজন লেজারস সাহেবের সঙ্গে তার পাটের ব্যবসাও ছিলো। তিনি ডেভিড কোম্পানীতে পাট সরবরাহ করতেন। চামড়া ব্যবসা থাকায় পূর্ব বাংলার আনাচে কানাচে হতে তার গুদামে চামড়া আসতো তজ্জন্য তার নাম সুদুর মফঃস্বলের সাধারণ লোকের নিকট সুপরিচিত ছিলো। নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে তাঁর মৃত্যুর পরও হালের গরুকে ভয় দেখানোর জন্যে তাঁর নাম কি রূপে ব্যবহার হতো তার পরিচয় পাওয়া যায় নোয়াখালীর গ্রাম্য ভাষায়। কৃষকের মুখে ধীর গতি গরুর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত

এই সতর্কবাণীতে গরু হাডিছ না কা। খাল বটু হাজীর দোহানে আডাইয়াম। অর্থাৎ হালের গরু। জোরে হাটঁছ না কেন? না হাটঁলে জবাই করে তোমার চামড়া বটু হাজীর চামড়ার গুদামে পাঠিয়ে দেব।

তিনি শুধু গরীব অভাব গ্রস্থদের সাহায্য দানেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না সমাজ উন্নয়ন এবং ধর্মীয় কাজেও অগ্রগামী ছিলেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে তিনি মসজিদ মাদ্রাসা পুকুর খননে যথেষ্ট সাহায্য করে গেছেন, বংশাল রোড তথা হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেনের সংযোগ স্থলে ভুট্টোহাজীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সুদৃশ্য, সুবৃহৎ বংশাল আহলে হাদীস জামে মসজিদ। শত বর্ষের পূর্ব ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। আর হাজী বদর উদ্দীন তথা ভূট্টো হাজীর নাম ঢাকাবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলেছে। যদিও তিনি এ মসজিদ নির্মাণে একক টাকা ব্যয় করেননি। একক ব্যয়ে বহু মসজিদ নির্মাণ হয়েছে পৃথিবীর বুকে। তিনি এলাকাবাসীকে জমায়েত করে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, "মসজিদ তৈরি করার সকল খরচ বহন করার তওফিক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন কিন্তু আমি এককভাবে উহার নির্মাতা হতে চাইনে। পাছে আমার বংশধরদের মনে ফখরের ভাব জাগ্রত হয় এই বলে যে, আমাদের পিতা, আমাদের দাদা বা আমাদের পূর্ব পুরুষ এ মসজিদ এককভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মসজিদ আল্লাহর ঘর সকল মুসলমানের এবাদত গাহ্ ইহার নির্মাণ কাজে আপনারা সবাই শরীক হোন যার যা সাধ্যে কুলায় প্রকাশ্যে দিন অথবা বাক্সে ফেলুন" খরচের অবশিষ্ট সমুদয় খরচ তিনি নিজে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তার ভ্রাতাগণ বহন করে ছিলেন। মসজিদের নির্মাণকাল আরম্ভ হয়েছিলো ১৮৭০ সালে। মসজিদের নির্মাণ সমাপ্তি তিনি দেখে যেতে পারেননি। এ মসজিদ-এ মহল্লার মহিলাগণ জুমার নামাজ জামাতে আদায় করেন। তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে। এ ছাড়া এ মহল্লার একটি শান বাধানো পুকুরও খনন করে গেছেন যা ভূট্টো হাজীর তাওলা বলে খ্যাত। ভূট্টো হাজী সামান্য বাংলা জানতেন তাছাড়া কিছু আরবী ফারসী ও উর্দু লেখা পড়া শিখেছিলেন। ১৮৭৪-৭৫ সালে তিনি আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে চির বিদায় গ্রহণ করেন। বংশাল রোডস্থ মালিবাগ মসজিদ সংলগ্ন তাদের পারিবারিক কবরস্থানে শায়িত রয়েছেন মর্দে মুজাহিদ হাজী বদর উদ্দীন।

খাজা মোহাম্মদ আজমের এক ছেলের ডাক নাম ছিলো শাহজাদা মিয়া। খাজা মোহাম্মদ আজম ঢাকার পঞ্চয়েতসমূহের সুপারিটেনডেন্ট ছিলেন। তাঁর "পঞ্চায়েত-এ-ইসলাম" নামক পুস্তকে তিনি ঢাকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এই শাহজাদা মিয়ার নামানুসারেই লেনটির নামকরণ করা হয়েছে

শাহাজাদা মিয়া লেন। বাবু বাজারে রয়েছে সৈয়দ হাসান আলী লেন। হাসান আলীর পিতার নাম আলী হোসেন খান। তাঁরা শ্যামপুরের জমিদার ছিলেন। এই জমিদারের নামানুসারে আলী হোসেন খান রোড রয়েছে মৌলভী বাজারের পূর্ব দিকে।

পূর্বে পীল খানায় থাকতো হাতি। এই হাতিগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাবার জন্যে যে রাস্তার উপর দিয়ে যাওয়া হতো সেই রাস্তাটির নাম রাখা হয়েছে এলিফ্যান্ট রোড। জনপদের ভিতর দিয়ে হাতিগুলো নিয়ে যাওয়া হতো বলে ঐ এলাকার লোকজন একবার বেশ প্রতিবাদমূখর হয়ে উঠেছিলো। তখন হাতিগুলোকে অন্য পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো।

মহম্মদপুর ঢাকার একটি মডেল টাউন যাহা পরবর্তীকালে ঢাকা পৌর সভার অন্তর্ভুক্ত হয়। পৌর সভার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও সেখানে দ্বৈত প্রশাসন চলে। বর্তমানে ঐ সব সমস্যা দূরীভূত হয়ে গেছে। এখন ঢাকা মহানগরীর একটি উন্নত এলাকা বলা যেতে পারে মহম্মদপুরকে।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে নিজ মাতৃভূমির মানুষের কাছ হতে নানা দুঃখ কষ্ট পাওয়ার পর আল্লাহ তা'লার অহিপ্রাপ্ত হয়ে স্বীয় জন্মভূমি মক্কা নগরী থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা তথা ভাবত বিভাগের পর পরই ভারতের নানা স্থানে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাংগা বেধে উঠলে ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার অবাংঙ্গালী মোহাজের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে হিজরত করেন। এরূপ হিজরতকারী বহু মোহাজের ঢাকা শহরে আগমণ করে পুরাতন ঢাকার বিভিন্ন মহল্লায় আশ্রয় নিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

১৯৫৮ সালে হাউজিং স্যেটেলমেন্ট দফতরের মাধ্যমে এ সব মোহাজেরদের স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের জন্যে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আইউব খাঁনের আমলে মডেল টাউনের গোড়াপত্তন করেন তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গুভর্ণর লেঃ জেনারেল আজম খাঁন।

এসব মোহাজেরদের হিজরতের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে শান্তির দূত মহানবী হযরত মোহাম্মদের (দঃ) নামানুসারে মডেল টাউনটির নাম রাখা হয় মহম্মদপুর।

এই মহম্মদপুর এলাকার বাড়ী ঘরগুলো যেমনি সুবিন্যাস্ত তেমনি এখনকার রাস্তাগুলোও সোজা ও বেশ প্রশস্ত। এ মডেল টাউনটির রাস্তাগুলোর নাম দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত মুসলিম রাজন্যবর্গ এবং বৃটিশ যুগের শেষ অধ্যায়ে ভারতীয়

মুসলিম জাগরণের অগ্রদূতদের নামানুসারে রাখা হয়। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইউব খাঁন ঢাকা আগমন করে প্রথম পনেরটি বাড়ী মোহাজের পরিবারের মধ্যে বরাদ্দ দান করেন। সে কারণেই মহম্মপুরের প্রধান সড়কের প্রধান ফটকটির নামকরণ করা হয়েছিলো আইউব গেট। স্বাধীনতা পূর্বকাল পর্যন্ত আইউব গেট নামেই সে ফটক পরিচিত ছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত ১৯৬৯ সালে ১১ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে যে গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। সে আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামন আসাদ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। যদিও তিনি আসাদ গেটের নিকট শহীদ হননি তবুও সে আন্দোলনটি ছিলো প্রেসিডেন্ট আইউব খাঁনের বিরুদ্ধে। তজ্জন্যই আসাদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকার সর্ব স্তরের নেতৃবৃন্দ আইউব গেটের নাম পরিবর্তন করে আসাদ গেট নামকরণ করেন। যা আজ সর্বজন পরিচিত ও স্বীকৃত।

মহম্মদপুর এর কয়েকটি এলাকা তথা বাবর রোড, হুমায়ুন রোড, শাহজাহান রোড, শেরশাহ সুরী রোড, রিজিয়া সুলতানা রোড, খিলজি রোড, ও তাজমহল রোড এলাকার জমি বৃটিশ যুগে কিছুটা চাষাবাদী, অনেকটা জংগলাপূর্ণ আবার অনেকটা জলা ভূমি ছিলো। অধিকাংশ জমির জমিদার হিন্দু ছিল। অবশ্য মুসলমান জমিদারদের জমিও কম ছিলোনা। তন্মধ্যে মীরপুরের আদি বাসিন্দা ডাঃ মাঈজুদ্দিন খানের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে তৎএলাকার সাবেক ওয়ার্ড চেয়ারম্যান হাজী চিনু মিয়ার পূর্ব পুরুষদেরও বেশ জমি ছিলো। নীচু জমিসমূহে আউশ ও রোয়া ধান ফলানো হতো। বাবর রোডে যাদের জমি জমা ছিলো তাদের মধ্যে প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে আলীজান, ইয়াকুব আলী সরদার, তাজে মুল্লুকের নাম বলা যেতে পারে। এদের বাড়ীগুলোকে বাথানবাড়ী বলা হতো। এখানে মৌসুমী ফসল হতো। শীত মৌসুমের ধান কেটে বাথান বাড়ীতে রাখা হতো। পাকিস্তান আমলে ১নং বাড়ীটিই পাক গণ পরিষদের স্পীকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রদূত মরহুম তমিজ উদ্দিন খাঁনের ছিলো।

বাবর রোডের নামকরণ হয়। ভারতের মোঘল রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের নামানুসারে। বাবরের আসল নাম জহির উদ্দিন মুহম্মদ। তিনি মধ্য এশিয়ার ফারগানা রাজ্যের রাজা, আফগানিস্তানের বাদশা। তাঁর শিরায় ছিলো বীর তৈমুর ও মোংগল বীর চেংগিস খাঁনের রক্ত। সিংহের মত ছিলো তার সাহস তজ্জন্য তাঁকে বাবর নামে সম্বোধন করা হতো। তিনি একজন পাকা সেনাপতি, যুদ্ধ বিশারদ

অন্যদিকে অতি ধর্মপরায়ন মুসলমান হিসেবে আল্লাহর উপর ছিলো অগাধ বিশ্বাস। কবি, জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন তিনি। তার রচিত "বাবুর নামা" বিশ্ব সাহিত্যে সেরা সম্পদ বলে অনেক বিদেশী ইতিহাস বেত্তা স্বীকার করে গেছেন। তিনি চমৎকার ঘোড় সরওয়ার ও সুপুরুষ ছিলেন। বক্তৃতা দেবার ক্ষমতাও তাঁর অদ্ভুত ছিলো। কথায় ছিলো যাদু। মানুষকে সহজেই আপন করে নিতে পারতেন। একজন সাহসী খেলোয়াড় ও শিকারী হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিলো। তিনি তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় কথা বলা ও লিখতে পারতেন। শিল্প কলাও ভালবাসতেন। সাহস ও অপরিসীম ধৈর্য্যের জন্য নিজ দেশে বারবার রাজ্য হারিয়েও বনে জংগলে পালিয়ে থেকে শক্তি সঞ্চয় করে হারানো রাজ্য পূনরুদ্ধার করেছেন। হার মানতে জানতেন না তিনি। যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের সঙ্গে সুখ দুঃখকে সমানভাবে ভাগ করে নিতেন। সৈন্যরাও তাঁকে মনে প্রাণে ভালবাসতেন। তজ্জন্য তিনি ১৫২৬ সালে একুশে এপ্রিল পানি পথের প্রথম যুদ্ধে পাঠান রাজ ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে মোরের শক্তিশালী রাজপুত রাজা সাহসী বীর যোদ্ধা সংগ্রাম সিং দেশের লাখ লাখ রাজপুত ও হিন্দু সৈন্য সমবেত করে খানুয়ায় বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে বাবর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী ইসলামী জেহাদের মর্মবানী শুনিয়ে আল্লাহর নামে অনেক গুণ বেশী শত্রু সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং যুদ্ধে জয়ী হন। এসব কারণেই তার বাবর নাম স্বার্থক হয়েছিলো। তাঁর মত বাদশা পৃথিবীতে কমই জন্মেছে।

স্নেহ পরায়ন পিতা হিসেবেও পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। পানি পথের যুদ্ধের চার বছরের মাথায় হঠাৎ তাঁর প্রিয় পুত্র হুমায়ুন এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। কতো হেকিম, কবিরাজ, বৈদ্য দেখালেন, কেহই তাঁকে ভাল করতে পারলোনা। সবাই আশা যখন ছেড়ে দিলো। অসুখও দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল, বাবর চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা তাঁকে যে তিনি পরবর্তী বাদশা ঠিক করে রেখেছেন মনে মনে। তাই তাঁর কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। আল্লাহর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল তিনি ওজু করে এসে পবিত্র কোরআন মাথায় নিয়ে হুমায়ুনের রোগ শয্যায় চারদিকে তিনবার ঘুরলেন। তারপর দু'রাকাত নামাজ আদায় করে আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন। কান্না ভেজা কণ্ঠে মুনাজাত করলেন। আয় পরওয়ার দিগার হুমায়ুনের বদলে তুমি আমার জীবনকে কবুল করো, কবুল করো তিনবার এ কথা উচ্চারণ করলেন। মুনজাত আর শেষ হয় না।

অশ্রু সিক্ত নয়নে ফরিয়াদ করেই চলেছেন। সহসা তাঁর চেহারায় হাসির রেখা ফুটে ওঠলো। উপস্থিত সকলের মনে হলো তিনি যেন আল্লাহার ইশারা জানতে পেরেছেন। সত্যি সত্যি আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন– সিংহের মত সাহসী আর পাথরের চট্টানের মত বিশাল হৃদয়ের অধিকারী পিতার ফরিয়াদ। পিতা মাতার অন্তরের অন্তস্থলের দোয়া কোন দিন বিফল হয়না। বাবর সেটাও প্রমাণ করে দিলেন। পর দিবস থেকে হুমায়ুন ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলেন। অন্য দিকে বাবরের শরীর দিন দিন ভেংগে পড়তে লাগলো। অবশেষে একদিন সবাইকে কাঁদিয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন পরপারে। তাঁর মৃত্যুও এক পুত্র স্নেহের বিরল কাহিনী। এ রকম নজির দুনিয়ায় আর কেহ দেখিয়েছেন বলে শোনা যায় না। ভারতের মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর নিজের জন্মভূমিকে মৃত্যুকালেও ভুলেননি। তাই মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে গেলেন তাঁকে যেন কাবুলে তাঁর পছন্দ করা যায়গায় সমাহিত করা হয়। এখানেও প্রমাণ করলেন জন্মভূমি স্বর্গের মতই শ্রেষ্ঠ। সম্রাট বাবরের নামে ঢাকার একটি রাস্তার নামকরণ সঠিক পদক্ষেপ বলেই মনে করি।

হুমায়ুন রোডটির নাম সম্রাট বাবরের জ্যৈষ্ঠ পুত্র সম্রাট হুমায়ুনের নামানুসারে রাখা হয়েছে। সম্রাট নাসির উদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহনের পর পিতা সম্রাট বাবর মৃত্যু শয্যায় ভ্রাতাদের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ ও উদারতা প্রদর্শন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সেমতে ভ্রাতাদের সাম্রাজ্যের তিন অংশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু ভ্রাতাগণ সিংহাসন লাভের জন্য তার বিরোধিতা করতে লাগলেন। এর ফলে আফগান ও হিন্দু রাজ শক্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পিতৃব্য পুত্রদ্বয়ও সিংহাসন লাভের জন্য শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে হুমায়ুনের চরিত্রে শান্ত স্বভাব, দয়ালু, বাৎসাল্য প্রবণ, শিক্ষিত, মার্জিত শিষ্টাচারী ছিলো, সেই সঙ্গে সমর দক্ষতাও অবশ্যই ছিলো। তবে রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও কুটনৈতিক গুণের অভাব ছিলো বলেই জীবনব্যাপী বিদ্রোহ দমন, সংগ্রাম ও যুদ্ধে জড়িত থাকায় বেশী দিন জীবন ভোগ করতে পারেননি। তাঁর ভাগ্য পতনের সংগেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত ছিলো। তাই সাম্রাজ্য লাভের কিছুকালের মধ্যেই পাঠান বীর শের খাঁন বিদ্রোহ ঘোষণা করে একের পর এক এলাকা দখল করে নেন। হুমায়ুন তাঁকে দমন করার জন্যে অগ্রসর হলেন বটে। কিন্তু হুমায়ুনের সেনাবাহিনী পাঁচ মিশালী লোকদের নিয়ে গঠিত ছিলো বলে সম্রাট বাবরের আমলের একতা তাদের মধ্যে ছিলো না। তাই ১৫৩৯ সালে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য গংগানদীতে ঝাঁপ দিলেন। তিনি অশ্বসহ

প্রায় ডুবে যাচ্ছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ নিজাম নামে এক ভিস্তি ওয়ালা তাঁর মশকের সাহায্যে সম্রাট হুমায়ুনকে গংগানদী পার হতে সাহায্য করেছিলেন, আর এ ভাবেই সম্রাট তার জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলেন। অনেক বছর পর রাজ্য পুণরুদ্ধার হলে সেই ভিস্তি ওয়ালাকে একদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

যা হোক– শেরশাহ হুমায়ুনকে পরাজিত করে রাজ্য সম্প্রসারণে মনোযোগ দিলেন। শের খাঁন তথা শের শাহের মৃত্যুর পর আরো দশ বছর তার বংশধরগণ রাজত্ব করেন ভারতবর্ষে। এ সময়ে রাজ্যে খুন-খারাবী তথা অরাজকতা চরমে পৌঁছে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন আদিল শাহ, কেউ তাকে মানে না। এ সময় হুমায়ুন ইরানে। এ সুযোগে ইরানের শাহের মদদ নিয়ে প্রথমে কাবুল দখল করেন তারপর লাহোর দখল করেন। ১৬ বছর পর দিল্লী দখল করে নিজ সিংহাসন তথা হারানো রাজ্য ফিরে পান। সিংহাসন পুণরুদ্ধারের পর বছরই লাইব্রেরী ঘরের সিড়ি দিয়ে নামার সময় পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মহম্মদপুরের শাহজাহান সড়কটিও মোঘল সম্রাট শাহজাহানের নামানুসারে নামকরণ হয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাদা শাহজাহান ও শাহজাদা শাহরিয়ারের মধ্যে সিংহাসন লাভের সংগ্রাম শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বে মালেকা নুরজাহান তাঁর জামাতা শাহরিয়ার পক্ষে আর আসফ খান তাঁর জামাতা শাহজাহানের পক্ষ নেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা জটিলতর ধারণ করে। অবশেষে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬২৮ সালে আবুল মুজাফফর শিহাব উদ্দিন মুহম্মদ সাহিব কিরান সানি শাহজাহান বাদশা গাজী উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর সিংহাসন লাভের পশ্চাতে আসফ খানের সতর্কতা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতা বেশ কাজ করেছিলো। তিনি সিংহাসন লাভ করে সম্ভাব্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বিকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়েছিলেন।

১৬১২ সালে ২২ বছর বয়সে মোঘল দরবারের বিশেষ প্রভাবশালী আমত্য আসফ খানের কন্যা আর্জুমান্দ বেগমকে শাহজাদা শাহজাহান বিবাহ করেছিলেন। আর্জুমান্দ বেগমই পরবর্তীতে মমতাজ মহল নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সম্রাট শাহজাহান রাজ সিংহাসন লাভের পরেই নানা বিদ্রোহ দমনে ও রাজকার্য্যে নিজেকে লিপ্ত রাখেন। তন্মধ্যে ১৬৩২ সালে পর্তুগীজ দমন উল্লেখযোগ্য। তৎকালে পর্তুগীজগণ বাংলার হুগলীতে ঘাটি ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করতঃ নিজেদের সুরক্ষিত করে ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে চলে। সেই সঙ্গে অত্যাধিক উদ্ধত হয়ে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ, নারী হরণ, লুঠতরাজ, শুল্ক ফাঁকি, ক্রীত দাস ব্যবসাসহ

নানাবিধ দুর্নীতি ও অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়ে সম্রাট শাহজাহান তাদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমূচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফলে প্রায় ১০ হাজার পর্তুগীজ নারী পুরুষ প্রাণ হারায় এবং ৪৪০০ জন বন্দী অবস্থায় আগ্রায় প্রেরিত হয়। তাঁর আমলে দাক্ষিণাত্যে এক মারাত্মক দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যার ফলে অসংখ্য লোক মৃত্যুবরণ করে। সে সময় সামান্য রুটির জন্য সন্তান বিক্রয়ে কুণ্ঠিত হতোনা মানুষ। ময়দার সঙ্গে মৃত জীবের হাড়ের গুড়া মিশ্রিত, ছাগলের মাংসের নামে কুকুরের মাংস বিক্রয় হতো। এমন কি মানুষ নিজ সন্তানের মাংস ভক্ষণেও দ্বিধা করতোনা। এমনতর ভয়াবহ দূর্ভিক্ষে রাজ্য কোষ থেকে খাদ্য বিতরণ এবং রাজস্ব মওকুফের ব্যবস্থা করলেও এই ভয়াবহ দূর্ভিক্ষে মানুষের যে অভাবনীয় দুঃখ দুর্দশা হয়েছিলো তার তুলনায় ছিলো সাহায্য অতি নগণ্য। মোঘল সম্রাটদের মধ্যে সর্বাধিক জাকজমকপূর্ণ সম্রাট ছিলেন শাহজাহান। সিংহাসনে আরোহন করার পরই প্রসিদ্ধ ময়ুর সিংহাসন তৈরীর আদেশ দেন যাহা সাত বছরের পরিশ্রমে আট কোটি মুদ্রা ব্যয়ে মনি মুক্তা ও স্বর্ণ খঁচিত সিংহাসন নির্মিত হয়। ইহা তাহার শিল্পনুরাগ, সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের উজ্জলতম নিদর্শন। বাল্যকালে সাহিত্যের প্রতিও তার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিলো। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা, সাহিত্য ও কাব্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিলো। মোঘল সাম্রাজ্যও গৌরবের স্বর্ণ শিখরে এবং প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির উচ্চ পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছিলো। প্রজাবাৎসল্য, সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা, নিরপেক্ষ বিচার ও রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধির জন্যে সম্রাট বিদেশী পর্যটকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। উল্লেখ থাকে যে, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্ব আরম্ভ হয়েছিলো নির্মম রক্তপাতের মাধ্যমে এবং অবসানও হয়েছিলো আরো অধিক রক্তপাত ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে। বৃদ্ধ সম্রাট স্বীয় পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক ১৬৫৮ সালে আগ্রা দূর্গে বন্দী হয়ে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট-মর্মবেদনা ও মানসিক যাতনা ভোগ করে ৭৪ বছর বয়সে ১৬৬৬ সালে শেষ ঃিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অতি সখের ময়ুর সিংহাসনটি পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমনকালে লুণ্ঠন করে পারস্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। শাহজাহান নিজ নামানুসারে "শাহজাহান বাদ" নামে যে নুতন নগর স্থাপন করেছিলেন সেটাই আজ নুতন দিল্লী নামে পরিচিত।

তাজমহল রোড নামেও একটি সড়ক এখানে আছে। যা বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য্য আগ্রার তাজমহলের নামানুসারে। এ তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের ভালোবাসার প্রতীক। পত্নী প্রেমের অমর স্মৃতি। পত্নী আর্জুমান্দ বেগম ওরফে মমতাজ মহল যেমন পরমা সুন্দরী ছিলেন তেমনি বুদ্ধিমতীও ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের জীবনের

সুখ দুঃখ বেদনার সমান অংশীদার। রাজকার্য্য পরিচালনায় বিদূষী উদারমনা ও ধর্ম পরায়না মমতাজ সম্রাটকে গুরুত্বপূর্ন ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য তাঁকে 'মালিকা-ই-জামান" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৬৩১ সালে বুরহানপুরে মমতাজ মহল ইন্তেকাল করলে প্রিয়তম পত্নীর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য যমুনা নদীর তীরে দাম্পত্য প্রেমের অবিনশ্বর প্রতীক স্বরূপ শোকে বিহবল শাহজাহান মমতাজের দেহাবশেষের উপর বিশ্ব বিখ্যাত শ্বেত মর্মরের স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করেন, যা বিশ্বে "তাজ মহল" নামে খ্যাত। এই তাজমহল বিশ হাজার ভারতীয় ও বিদেশী শিল্পী, নির্মাণ কুশলী ও শ্রমিকের দীর্ঘ বাইশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মিত হয়েছিলো। আগ্রার তাজমহল ভাস্কর্য্য বিদ্যার এক অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে আজও বিশ্ববাসীর কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের সকল স্থান হতে প্রত্যহ হাজার হাজার সফরকারী ইহা পরিদর্শন করে নয়ন সার্থক করছেন। যদিও শোনা যাচ্ছে বর্তমান আধুনিক শিল্প কারখানা প্রসারের ফলে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাজমহলের শুভ্রতা ও পাথরের ক্ষয় হচ্ছে। তবুও পৃথিবী যতদিন থাকবে ইতিহাসের পাতায় তাজমহলের নাম স্মরণীয় হয়েই থাকবে। সেই বিশ্ব বিখ্যাত তাজমহলের কোন সাদৃশ্য আমাদের এই তাজমহল রোডে না থাকলেও এ নামটিই যুগ যুগ স্মরণ করিয়ে দিবে সম্রাট শাহজাহানের অমর কীর্তি আগ্রার তাজমহলের কথা।

মোঘল যুগের যে সব রাজন্যবর্গ ও সম্রাজ্ঞীদের নামে রাস্তার নাম রয়েছে তন্মধ্যে মোঘল শাহীর সবচেয়ে প্রতাপশালী ও বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী শাহানশাহ আওরঙ্গজেবের নামানুসারে আওরঙ্গজেব রোড নামকরণ হয়েছে। আওরঙ্গজেবের আমলেই মোঘল সাম্রাজ্যের পরিধি সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। এবং তিনি তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে সব চেয়ে চতুর, বুদ্ধিমান, প্রতাপশালী ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি রাজ্য পরিচালনা, প্রজাদের সুখ-শান্তি, শত্রু দমন ও অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তার পরিবার পরিজন বিশেষ করে পুত্রদের উদ্দেশ্যে অনেক মূল্যবান উপদেশ দান করে গেছেন। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস তাঁর ইন্তেকালের পর হতেই বৃহৎ মোঘল সাম্রাজ্যের ক্ষয় আরম্ভ হয়। তার সকল আদেশ উপদেশ পুত্র কন্যা ও বংশধরদের তেমন কোন প্রভাবিত করতে পারেনি। শেষ পরিণতি মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ও ইংরেজ শক্তির উথান।

পূর্ব যুগের মনীষী ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণ বলে গেছেন যে কোন সম্প্রদায়ের-গোষ্ঠীর রাজত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি ধন ঐশ্বর্য্য সাত পুরুষ পর্যন্ত বর্দ্ধিত, সম্প্রসারিত হবে। তার পর যদি তারা সুপথে ও সুশৃংখল এবং জনগণের আস্থা ও ভালবাসার অধিকারীও হয়

তাহলে কিছু কাল ঐ অবস্থায় থেকে পরবর্তীতে নিম্ন দিকে প্রবাহিত তথা সকল ঐশ্বর্য্য, রাজত্ব, ধন-সম্পদ সবই ক্ষয় হতে হতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে এসে যাবেই। এটাই আল্লাহর বিধান তথা নিয়তির খেলা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর ইতিহাস দেখলে এই অমর বাক্যের সত্যতাই প্রমানিত হয়। সাত পুরুষের পর অষ্টম পুরুষ তার পূর্ববর্তীদের সবদিক দিয়ে অতিক্রম করে গেছেন এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

শাহজাদা আওরঙ্গজেবের বয়স তখন চৌদ্দ। লাহোরে অবস্থানকালে সম্রাট শাহজাহান শলিমারবাগে প্রায়ই হাতীর লড়াই দেখতেন। বাংলার সুবেদার তাঁকে চল্লিশটি উচ্চ প্রশংসিত লড়িয়ে হাতী উপহার পাঠিয়েছিলেন। একদিন সম্রাট বারান্দায় আমিত্যদের দ্বারা পরিবেশিত হয়ে হাতীর লড়াই দেখছিলেন। চার জন শাহজাদাও ঘোড়ায় চড়ে সে লড়াই অবলোকন করছিলেন। হঠাৎ একটি হাতী তার প্রতিদ্বন্দ্বি থেকে পালিয়ে শাহজাদাদের দিকে এগিয়ে এলো। তিন জন শাহজাদা এদিক সেদিক পালিয়ে গেলেন। কেবল মাত্র বালক মুহম্মদ আওরঙ্গজেব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটুকুও লড়লেন না। পলাতক হাতীটি তার পাশ দিয়ে চলে গেলো। কিন্তু পিছনের অন্য হাতীটি প্রতিদ্বন্দ্বি হাতীকে ছেড়ে তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। শাহজাদার হাতে ছিলো বর্শা, তিনি তাই দিয়ে আক্রমন করলেন। হাতীর দাঁতের আঘাতে তাঁর ঘোড়াটি মাটিতে পড়ে গেলো। আওরঙ্গজেব লাফিয়ে উঠলেন এবং হাতীর মাথায় বর্শা নিক্ষেপ করার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। এ সময় চাকর বাকর, লড়াইয়ের লোকজন হাতীটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এমনকি সম্রাট নিজেও বিপদাশংকায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বারান্দা থেকে নিচে নেমে এলেন। হাতীটি সরে যাওয়ায় ধীর পদক্ষেপে আওরঙ্গজেব সম্রাটের দিকে এগিয়ে গেলেন। নাজির ইতিমাদ খাঁ চিৎকার করে বললেন, সম্রাট ভীষণ উদ্বিগ্ন আর তুমি ধীরে সুস্থে আসছো। শাহজাদা ছোট্ট উত্তর দিলেন, হাতীটি যদি কাছে থাকতো তাহলে দ্রুত হাঁটার প্রয়োজন হতো। সম্রাট আল্লাহর শোকর আদায় করে আওরঙ্গজেবকে এক লক্ষ টাকা উপহার দিলেন, আর বললেন, খোদা না খাস্তা ফল যদি অন্যরূপ হতো তাহলে কি লজ্জার কথাই না হতো। শাহজাদা পুনরায় সম্রাটকে সালাম দিয়ে বললেন– ফল অন্যরূপ হলেও লজ্জার কিছুই ছিলো না। আমার ভাইয়েরা যা করেছে, তাই বরং লজ্জার কথা। এই একটি মাত্র ঘটনা থেকে আমরা তার সাহসের পরিচয় পাই।

সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহকে একদিন কাছে বসিয়ে নিম্নবর্ণিত

উপদেশ দেন। সম্রাটের অবস্থান হতে হবে কোমলতা ও কঠোরতার মাঝামাঝি যায়গায়। যদি এর কোন একটি গুণ অন্যটিকে অতিক্রম করে তাহলে তাঁর সিংহাসন ধ্বংস হয়। কারণ, তার অতিমাত্রিক কোমলতার ফলে প্রজারা উদ্ধত হয়, আর কঠোরতার আধিক্যহেতু তাদের হৃদয় ভয়ে দূরে সরে যায়।

তিনি আরো বলেছিলেন ঃ সম্রাট তথা ক্ষমতাসীনদের পথে আয়েশী ও কর্ম বিমুখ হওয়া উচিৎ নয়। এই কু-অভ্যাসের ফলে রাজ্যের অবনতি ও রাজকীয় ক্ষমতার ধ্বংস ঘটে। যতটা পারবে সব সময় ঘোরাফেরা করবে। আরো বলেন ঃ সব সময় তোমার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করো। এবং তাদের কাজের প্রতি দৃষ্টি রেখো। আর তুমি যাঁকে যে কাজের উপযোগী মনে কর সেই কাজে নিয়োগ করো। গালিচা ওয়ালাকে কামারের কাজ দেওয়া বোকামী, বুড়োদের কাজ ছোঁড়াদের বা ছোঁড়াদের কাজ বুড়োদের দিও না।

চুগল খোরদের সম্পর্কে তিনি বলে গেছেন ঃ চুগলখোর ও মিথ্যাবাদীদের সঙ্গ রাজা ও ধনশালী লোকদের সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। চুগলখোর খুনের চেয়েও খারাপ। চুগলখোরের চরিত্র বাইরে মন মুগ্ধকর, কিন্তু অন্তরে মারাত্মক বিষধর। এদের থেকে দূরে থেকো।

তিনি আরো বলেছিলেন ঃ এতটা লোনা হয়োনা যাতে লোকেরা তোমাকে থু করে ফেলে দেয়, আর এতটা মিষ্টিও হয়ো না যাতে তারা তোমাকে গিলে না খায়।

এ সব উপদেশ থেকে বুঝা যায় সম্রাট আওরঙ্গজেব কত জ্ঞানী ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অভিজ্ঞ ছিলেন। আজও যারা দেশের কিংবা এলাকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন বা হবেন তাদের বেলায়ও এসব উপদেশ প্রযোজ্য।

ক্বোরআনের বাণী আওরঙ্গজেবের জীবনে ধ্রুব আদর্শ ছিলো বলে তিনি এক দিকে যেমন স্বধর্ম নিষ্ঠা ছিলেন। অন্য দিকে তেমনি ছিলেন পরধর্ম সহিষ্ণু। আওরঙ্গজেবের স্বধর্ম ও পর ধর্ম নিষ্ঠা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন অনেক ইতিহাসও লিখেছেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদী মহল বিশেষ করে হিন্দু লেখকগণের অনেকেই তাঁকে হিন্দু বিদ্বেষী বলে চিত্রিত করেছেন। তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য অনেক যুদ্ধ অনেক ষড়যন্ত্রও হয়েছে। এখানে একজন হিন্দু লেখকের উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না।

আরঙ্গজেবের স্বধর্ম নিষ্ঠা সম্পর্কে স্যার যদুনাথ তার গ্রন্থে বলে গেছেন, “কুরআনে মুসলিম নরপতির জন্য যে কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে, তা থেকে কোন কিছুই তাঁকে একচুল পরিমাণও বিচ্যুৎ করতে পারতো না। অন্যকেও তিনি এর

থেকে বিচ্যুৎ হতে দেবেন না বলে স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আর্থিক ক্ষয় ক্ষতির ভয় অথবা প্রিয় পাত্রদের প্রভাব, অশ্রু বা কাকুতি মিনতি কোন কিছুই তাঁকে শরিয়ত বিরোধী কাজে প্ররোচিত করতে পারতো না।

চাটুকাররা তাঁকে বলতো শাহানশাহ আলমগীর "জিন্দা পীর"। এমন লোকের জন্য চাটুকারের প্রয়োজন হয় না। কারণ, নিজ গুণে স্বাভাবিক ভাবেই এরা "জিন্দা পীর"।

ব্যক্তি জীবনে আওরঙ্গজেব ছিলেন সাদাসিদে মুনি ঋষির মতোই সংযমী। স্বধর্ম নিষ্ঠা। আওরঙ্গজেব প্রথম জীবন থেকেই পরধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। পিতা সম্রাট শাহজাহানের আমলে মুদ্রায় কলেমা শাহাদাত 'লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' খোদিত থাকতো। সিংহাসনে আরোহনের সাথে সাথেই আওরঙ্গজেব এ প্রথা রহিত করেন। কারণ, মুদ্রার মাধ্যমে ধর্মের বাণী প্রচারকে তিনি ক্বোরআনের অমর বাণীর বরখেলাপ এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের মনে আঘাত স্বরূপ মনে করতেন। ক্বোরআনের নির্দেশ মতে সম্রাট আওরঙ্গজেব যেমন জিজিয়া কর হিন্দুদের উপর পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন, তেমনি ক্বোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ন্যায় ও সাম্যের প্রতিষ্ঠাও ছিলো তাঁর জীবনের ব্রত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বধর্ম নিষ্ঠা প্রচারের জন্য শালিম্যান ও অশোক হয়েছিলেন যে পরিমানে সংবর্ধিত, বিদ্বেষ পুষ্ট ঐতিহাসিকদের কারসাজিতে স্বধর্ম নিষ্ঠার জন্য আওরঙ্গজেব হয়েছেন সে পরিমাণে ধিক্কৃত। স্যার যদুনাথের এ সব কথায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের মহান ধর্ম নিষ্ঠা ও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সাম্য প্রতিষ্ঠার যে অবদান রেখে গেছেন তা কারো থেকেই যে কম নয় এটাই ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণ করে।

তাঁর জীবনের আরেকটি বিশেষ গুণ ছিলো সেটা চাতুরী ও কুটবুদ্ধি। এ সম্পর্কে নিজ জাতি ও গোষ্ঠীর সহ বহু লোকের কাছ হতেই নিন্দাভাজন হয়েছেন জীবিতকালে ও মৃত্যুর পর অদ্যাবধি। কেননা সাধারণ লোকের মতে চাতুরী ও কুটবুদ্ধি তথা কৌশল অত্যন্ত ঘৃনার্থ। কিন্তু পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ কুট-কৌশলকে তাঁর নিজের গুণ বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই কৌশল বা কুটনীতিকে দোষের মনে করা ঠিক নয়। তবে অবশ্য মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই যদি করা হয়। যেমন আনবিক শক্তি মানব জাতিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে তেমনি তা মানব কল্যাণে ব্যয়িত হলে মানবগোষ্ঠীর অত্যাধিক উপকারেও আসে। তাঁর স্বরচিত কাব্যের একটি পংক্তি এখানে উল্লেখ করছি আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে।

ইচ্ছা করলেই যায় না করা কাজ,
প্রতি কাজে খোদার দয়া চাই
বেপরোয়া কর্ম দিয়েই যায় না বড় হওয়া
যোগাড় করো বড় হওয়ার মাল মশলাটাই।

আওরঙ্গজেব রোড এলাকাটি পূর্বে ময়লা খানা বলে পরিচিত ছিলো। সেখানে সাবেক রেল লাইনের ধারে ট্রেঞ্চ তথা খন্দক ছিলো। তখন পুরাতন ঢাকার অনেকাংশের আবর্জনা ফেলা হতো। ১৯৪০ সালের দিকে আবর্জনা ফেলা সরকার বন্ধ করে দেয়। তৎপর ১৯৪১-৪২ সালের দিকে তৎকালীন বৃটিশ সরকার একটা রেডিও সাব-ষ্টেশন খুলে। এলাকাটি অনাবাদি থাকলেও বেশ কিছু গরীব অধিবাসী বসবাস করতো। এদের মধ্যে কিচক সম্প্রদায় ভুক্ত লোকেরাও বসবাস করতো, তারা সাঁওতালদের ন্যায় ছিলো। বন্য জীব জন্তু যেমন সাপ, গুই সাপ, খাটাশ ইত্যাদি ধরনের জন্তু খেতো। তারা কোন্ ধর্মের ছিলো বুঝা না গেলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলেই মনে হতো। এদের বংশধরদের ২/৪ জন মহম্মদপুর এলাকায় এখনও রয়েছে।

বর্তমানে যেটা মডেল স্কুল সেটা প্রথম মুসলিম সিভিল সার্জন (মিটফোর্ড হাসপাতালের) ডাক্তার মাঈজুদ্দিন খাঁন এর বাসস্থান ছিলো। বর্তমানে যেটা মহম্মদপুর থানা সেটায় স্বাধীনতার পূর্বে মোহাজের নেতা দেওয়ান বাসারতের বাসস্থান ছিলো। বাঙ্গালী বিদ্বেষী অবাঙ্গালী নেতাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অন্যতম। এর বিবৃতি ও বক্তৃতার জন্যই বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিরোধ স্বাধীনতার পূর্বে চরম আকার ধারণ করে ছিলো।

ভারতের মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে এক মাত্র নারী রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করে সুলতানা রাজিয়া নাম ধারণ করেছিলেন। রাজিয়া তাঁর অল্পকাল রাজত্বের মধ্যে শাসনকার্যে দক্ষতা, বীরত্ব ও সাহসের যে পরিচয় দিয়ে গেছেন তা ইতিহাসে বিরল।

ব্যক্তি জীবনে রাজিয়া জ্ঞানী, ন্যায়বতী, মহানুভতা, বিদ্যোৎসাহিনী ছিলেন, তিনি বিশুদ্ধ ভাবে কোরআন পাঠ করতে পারতেন। পুরুষের পোষাক পরিধান করে রাজদরবারের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পালন করে গেছেন।

পিতা দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিশ তাঁর জীবিত পুত্রদের অক্ষমতা ও অকর্মন্যতার পরিচয় পেয়ে মৃত্যুর পূর্বেই কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের অভিজাতবর্গ ও আমীর ওমরাগণ কোন নারীকে

দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে সুলতান ইলতুৎমিশ এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পুত্র কমর উদ্দিন ফিরোজকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। পিতা যা ভেবে গেছেন তাই হলো। অকর্মন্য ও ব্যভিচারী কমর উদ্দিনের রাজ্য শাসন ভেঙ্গে পড়লো। শাসনের নামে অত্যাচার, অবিচার ও অমিতাচার চরমে পৌঁছুলো। এই চরম অবস্থায় তার মাতা শাহতুর্কান শাসন ক্ষমতা হস্তগত করলেও সমগ্র দেশে উচ্ছৃংখলতা ও বিদ্রোহ দেখা দিলো। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাসহ অনেক দেশ দিল্লীর শাসন উপেক্ষা করে স্বাধীনভাবে চলতে লাগলো। উপায়ন্তর না দেখে দিল্লীর অভিজাত বর্গ ও আমীর ওমরাগণ অত্যাচারী ও ব্যভিচারী রুকন উদ্দিন ও তাঁর রাণী মাতাকে কারাগারে বন্দী করে সুলতান ইলতুৎমিশের কন্যা রাজিয়াকে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট করালেন।

সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে বহু বাধা বিপত্তি ও সমস্যা গ্রহণ করতে হয় তাঁকে। প্রধানমন্ত্রীসহ প্রভাবশালী অভিজাত বর্গের বেশ কিছু রাজিয়ার সিংহাসন লাভ সহজ ও সরলমনে গ্রহণ করতে না পেরে বিরোধীতার পথ অনুরসণ করলেন। ফলে প্রতিভা সম্পন্ন রাজিয়া অদম্য সাহস আর সুদক্ষ কুট কৌশলে তাদের পরাস্ত করলেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশের বিদ্রোহ দমন করে স্বীয় আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করলেন। পরবর্তীতে তুর্কী মুসলিমদের দুটি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহও কঠোর হস্তে দমন করলেন, কিন্তু জালাল উদ্দিন ইয়াকুত নামের জনৈক আবিসিনীয় হাবসী অনুচরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের ফলে তুর্কী অভিজাতবর্গ অসন্তুষ্ট হয়ে সরহিন্দের শাসনকর্তা ইখতিয়ার উদ্দিন আরতুনিয়ার নেতৃত্বে সুলতানা রাজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

বিদ্রোহ দমনে রাজিয়া অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হলেন এবং হাবসী ইয়াকুতও নিহত হলেন। বিদ্রোহীগণ রাজিয়াকে বন্দী রেখে তৎভ্রাতা মুইযউদ্দিন বাহরামকে সুলতান বলে ঘোষণা দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন। বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে রাজিয়া বিজয়ী আলতুনিয়াকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু এ কৌশলও ব্যর্থ হলো। আলতুনিয়া ও রাজিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলে মুইযউদ্দিন বাহরামের সেনাবাহিনীর হস্তে উভয়েই পরাজিত হলেন। এ দুঃসময়ে নিজ সৈন্যগণও তাদের পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় কাইথল নামক স্থানে ১২৪০ সালে এক হিন্দু আততায়ীর হাতে স্বামী আলতুনিয়া সহ রাজিয়া নিহত হলেন। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে মুসলিম শাসনামলের একমাত্র নারী শাসকের অবসান ঘটেছিলো। আর এই মুসলিম নারী শাসকের নাম স্মরণীয় করে

রাখার উদ্দেশ্যেই মুহম্মদপুরে এই রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে রিজিয়া সুলতানা রোড।

শেরশাহ্ সূরী রোডটির নাম করণ হয়েছে আফগান জাতির সূর উপদল সম্ভূত বীর শেরখান তথা দিল্লীর সম্রাট শেরশাহ এর নামানুসারে। তাঁর আদিনাম ফরিদ। পিতা সাদারামের জায়গীরদার হাসান। ফরিদ ছোট বেলায় কনিষ্ঠ বিমাতার বিদ্বেষে পিতার স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে ২২ বছর বয়সে গৃহ ত্যাগ করে জৌনপুরে চলে আসেন এবং সেখানে বিদ্যা শিক্ষার প্রতি যথেষ্ঠ মনোযোগ দিয়ে অল্পকালের মধ্যেই আরবী ও ফারসী ভাষায় যথেষ্ঠ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ছোট বেলা থেকেই মহান শাসকদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী পড়ে আনন্দ লাভ করতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রতিভা ও চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে বিহারের শাসন কর্তা জামাল খাঁনের মধ্যস্থতায় পিতার কাছে চলে আসেন এবং পিতার জায়গীরদারী পারদর্শিতার সঙ্গে পরিচালনা করলে পুনরায় বিমাতার ক্রোধে নিক্ষিপ্ত হয়ে স্বেচ্ছায় জায়গীরদারী ত্যাগ করে আগ্রায় চলে যান। পিতার মৃত্যু হলে দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহীম লোদীর হুকুমে পিতার জায়গীর পুণঃপ্রাপ্ত হয়েও বিহারের স্বাধীন সুলতান বাহার খান লোহানীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। একদিন সুলতানের সঙ্গে শিকারে যেয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে এক হিংস্র ব্যাঘ্রের আক্রমন হতে সুলতানের জীবন রক্ষা করেছিলেন। আর সে জন্যেই সুলতান বাহার খান হতেই ফরিদ শেরখান উপাধি লাভ করেন। শের খাঁনের ভাগ্য বেশী দিন সুপ্রসন্ন হলো না। অভিজাত বর্গের কুচক্রে পড়ে সুলতান কর্তৃক জায়গীর ও চাকুরীচ্যুত হয়ে ভবিষ্যতের আশায় ১৫২৭ সারে আগ্রায় এসে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। শেরখান বাবরের প্রাচ্যের সামরিক অভিযান গুলোতে যথেষ্ট সহায়তা করেন। এবং মোঘলদের সাহায্যে পিতার জায়গীর পুণঃলাভ করেন। এ সময় সম্রাট বাবর শেরখানের শক্তি, ক্ষমতা ও বীরত্ব দেখে তাঁর মন্ত্রীকে বলেছিলেন, "শেরখান একজন সুচতুর ব্যক্তি তাঁর ললাটে রাজ মর্যাদার চিহ্নপ্রতীয়মান হয়"। অদৃষ্টের পরিহাস তাঁর ছেলে হুমায়ুনকে পরাজিত করেই দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেছিলেন শের শাহ্।

ওদিকে বিহারের সুলতান বাহার খাঁনের মৃত্যু হলে তাঁর নাবালক পুত্র জালাল খাঁনের অভিভাবক হিসেবে রাজ্য শাসনের জন্য শেরখানের ডাক পড়ে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি নামে মাত্র জালাল খানকে শাসক রেখে নিজেই বিহারের সুলতান হয়ে চার বৎসরের মধ্যে সেনাবাহিনীর সহায়তায় স্বাধীন হয়ে গেলেন। ১৫৩০ সালে চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খাঁনের বিধবা পত্নী লাদ মালিকাকে বিবাহ করে চুনার দুর্গ

নিজ অধিকারে নেন। শের খাঁনের প্রধান্য বৃদ্ধিতে দিল্লীর মোঘল সম্রাট হুমায়ুন শংকিত হয়ে চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। রাজনীতিতে চতুর শের খাঁন হুমায়ুনের আনুগত্য স্বীকার করে নিজেকে রক্ষা করলেন।

শেরখানের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আফগান অভিজাতবর্গ তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিলো। নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে শেরখান ১৫৩৭ সালে বাংলার রাজধানী গৌর অবরোধ করেন।

সম্রাট হুমায়ুন শেরখানের প্রত্যাশিত শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে শেরখানকে দমন করতে বাংলার দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু হুমায়ুনের অদুরদর্শিতার জন্যে বাংলায় না গিয়ে শেরশাহের কর্মকেন্দ্র চুনার দুর্গ জয় করে গৌড়ের দিকে ধাবিত হলেন। এদিকে শেরখাঁন গৌড় জয় করে আরো প্রবল শক্তি নিয়ে হুমায়ুনের সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে মোঘল অধিকৃত বিহার এবং জৌনপুর থেকে কনৌজ পর্যন্ত দখল করে নিলেন। হুমায়ুনের বাংলাদেশ হতে আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ হলে শংকিত হয়ে গৌড় ত্যাগ করে আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হলেন। পথে মুংগেরের নিকট গংগানদীর তীরে ১৫৩৯ সালে চৌসায় শেরখাঁনের হস্তে হুমায়ুন পরাজিত হয়ে অধিকাংশ সৈন্যসহ গংগানদী অতিক্রম করতে গিয়ে অনেক সৈন্য মৃত্যুবরণ করলো। হুমায়ুন এক ভিস্তির মোষকের সাহায্যে নদী পার হয়ে জীবন রক্ষা করলেন। এ সময় শেরখাঁন এক বিস্তৃত রাজ্যের প্রকৃত শাসক হলেন এবং শেরশাহ উপাধি ধারণ করে রাজকীয় মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা অংকনের আদেশ দিলেন। সিংহাসন লাভের পরও তিনি বহু রাজ্য জয় করেছিলেন।

অবশেষে কালিঞ্জরের দুর্গ অধিকার করতে গিয়ে নিজ সৈন্যদের হাতবোমা দুর্গ প্রাচীরে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ফিরে স্তুপকৃত গোলাবারুদ এর উপর পতিত হলে আকস্মিক বারুদের বিস্ফোরণ ঘটায় শের শাহকে অর্দ্ধদগ্ধ ও মুমূর্ষু অবস্থায় শিবিরে আনা হয়। এ সময় সৈন্যরা দুর্গ পূনঃ বিজয়ের সংবাদ দিলে শের শাহে'র মুখ মণ্ডল শেষ বারের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অতিকষ্টে তিনি উচ্চারণ করলেন আল্লাহ শুকরিয়া। এর পর ধীরে ধীরে প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক। উন্নত, সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনের সঙ্গে নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ও সংস্কারাদি নিঃসন্দেহে শের শাহের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়। তাঁর শাসন পদ্ধতিতে হিন্দু-মুসলিম প্রজাবর্গের মধ্যে সমন্বয় সাধনই হলো মূল নীতি। সমগ্র রাজ্যের শাসন ক্ষমতা নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত রেখেও শের শাহ

জনমতের উপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করায় সমগ্র ভারতের হিন্দু-মুসলিম জনগণের শ্রদ্ধা ভাজন হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যকে বহুভাগে ভাগ করে পরগণায় সৃষ্টি করতঃ পদস্থ হিন্দু-মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। বাংলাদেশকেও অনুরূপ ভাগ করে বাংলার শাসন কর্তাকে আমীন-ই-বাংলা উপাধি দান করেছিলেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি।

শের শাহের সুবিচারের খ্যাতিও সর্বজন স্বীকৃত। সাম্রাজ্যব্যপী জনগণের সুবিধার্থে বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন তন্মধ্যে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড অন্যতম। এ বিশাল রাস্তাটি পূর্ব বঙ্গের সোনার গাঁ থেকে সিন্দু দেশ পর্যন্ত একটানা চলে গেছে। কারো মতে পেশোয়ার পর্যন্ত ছিলো। আর পথিকদের সুবিধার্থে রাস্তার পার্শ্বে ছায়াপ্রদত্ত ফল বৃক্ষ রোপণ এবং হিন্দু-মুসলিম উভয়ের জন্য পৃথকভাবে সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। এসব সরাইখানার সঙ্গে কুপ ও মসজিদ নির্মাণ করে গেছেন। সংবাদ সরবরাহের জন্য "ঘোড়ার ডাক" ব্যবস্থার প্রচলন করেন যাহা ডাকচৌকি নামে পরিচিত ছিলো। তিনি রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্কারক ব্যতিত-স্থাপত্য শিল্পেও ব্যক্তিত্বের ছাপ রেছে গেছেন। তন্মধ্যে দিল্লীতে পুরানা কিল্লা মসজিদ ও সাসারামের হ্রদের মধ্যে তাঁর সমাধি সৌধ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। চরিত্রের অনন্য সাধারণ বহুমুখী গুণের জন্যে ধুমকেতুর ন্যায় ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছিলেন মহামান্য শের শাহ। তাঁর স্থিতিশীল শাসন ব্যবস্থা ও প্রজাদরদী শাসন নীতি অনুসরণ করে পরবর্তীতে মোঘল সম্রাট আকবর দেশে সুদক্ষ শাসন ও প্রজাদের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। তজ্জন্য অনেক ঐতিহাসিক শের শাহকে সম্রাট আকবরের পথ প্রদর্শক বলে থাকেন।

সুলতান মাহমুদ গজনবীর নামানুসারেই গজনবী রোড নামকরণ হয়। গজনীর আমীর সবুক্ত গীণের জ্যৈষ্ঠ পুত্র মাহমুদ পিতার মৃত্যুর পর কণিষ্ঠ ভ্রাতা ইসমাইলের সঙ্গে গজনীর সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধে জয়ী হয়ে সিংহাসন লাভ করে এবং অল্পকালের মধ্যে পারস্যের সামানিদ বংশের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেকে গজনীর সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তখন তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিলো আফগানিস্তান, খোরাসান তথা পূর্ব পারস্য।

সুলতান মাহমুদ গজনীর সুলতান হওয়ায় তাঁর নামে ইতিহাসে সুলতান মাহমুদ গজনবী বলে আখ্যায়িত হয়ে আসছে। তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষদের অন্যতম ও একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা ছিলেন। তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে এবং ভারতীয় রাজাগণ কর্তৃক সন্ধিচুক্তি ভংগ, আনুগত্য অস্বীকার এবং সুলতানের ভারতীয়

মিত্রবর্গের উপর হিন্দু রাজদের অত্যাচার উৎপীড়নের সুযোগ নিয়ে ১০০০-১০২৭ সালের মধ্যে প্রায় ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে বহু ধন দৌলত অধিকার করে গজনী ফিরে যান।

এ সব অভিযানের মধ্যে ষোড়শ অভিযান সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠণ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সোমনাথ অভিযান ইসলামের ইতিহাসে "অতি দুঃসাহসিক সামরিক কার্য্য" ১০২৬ সালে যখন মাহমুদ গজনবী সোমনাথ মন্দিরের নিকট উপস্থিত হন অসংখ্য বীর রাজপুত যোদ্ধা এবং রাজগণের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য হিন্দু যোদ্ধা মন্দির রক্ষার্থে যুদ্ধে লিপ্ত হলেও শেষ পর্যন্ত মাহমুদেরই জয় হলো। এ যুদ্ধে প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু যোদ্ধা প্রাণ হারায়। মাহমুদ যখন মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙ্গায় লিপ্ত ছিলেন তখন পূজারী ও ব্রাহ্মণগণ মাহমুদকে প্রভূত ধন-রত্ন প্রদানে স্বীকৃত হয়ে প্রার্থনা করে ছিলেন যেন বিগ্রহটি না ভাঙ্গেন। উত্তরে তিনি নাকি বলে ছিলেন তিনি পৃথিবীতে "বিগ্রহ বিক্রেতার চেয়ে বিগ্রহ ধ্বংসকারী" হিসেবেই পরিচিত হয়ে থাকতে চান। মন্দির হতে অগণিত ধন দৌলত, স্বর্ণমুদ্রা ও বিগ্রহের অলংকারাদি থেকে প্রভূত পরিমাণ মনিমুক্তা স্বদেশে নিয়ে যান। ভারতীয় হিন্দু যোদ্ধাগণ অধিক সংখ্যায় থাকা সত্বেও মাহমুদের দুর্ধর্ষ তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যদের আক্রমন প্রতিহত করতে পারেনি। মুসলিম সৈন্যরা ছিলো ইসলামী জোসে মদমত্ত। মাহমুদের ভারত আক্রমন হিন্দুরাজ ও হিন্দুজনগণের মধ্যে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করেছিলো। যার ফলে পরবর্তীতে মুসলিমদের ভারত আক্রমন সাফল্য লাভ বহুল পরিমাণে সহজতর হয়েছিলো এবং রাজ্য বিজয়ের পথ সুগম করে ছিলো। অন্য দিকে ইসলাম ধর্মের ভবিষ্যত অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছিলো। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে তিনিই ভারতে ইসলাম প্রচারের অগ্রদূত। এও স্বীকার করতে হবে যে যুদ্ধ ব্যতিত কোথাও কোন হিন্দুকে তিনি মৃত্যুদণ্ড বা হত্যা করেননি।

খিলজী রোড প্রথম বঙ্গ বিজয়ী তুর্কী মুসলিম বীর বখতিয়ার খিলজীর নামে নামকরণ হয়েছে। তবে ধারণা করা হয় দিল্লীর রাজ সিংহাসনে খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজি (খলজি শব্দার্থ থেকেই খিলজী)। দিল্লীর পংগু সুলতান কায়কোবাদকে হত্যা, তুর্কী মালিক ও আমীরদের দূর্বলতার সুযোগে জালাল উদ্দিন খলজি দিল্লীর সিংহাসন লাভ করে। কিন্তু হত্যা কাণ্ডের জন্য দিল্লীর জনগণের সমর্থন লাভ করতে না পেরে ১২৯০ সালে কিলোঘরী নামক প্রাসাদে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করে নিজেকে দিল্লীর সুলতান বলে ঘোষণা

করেছিলেন। অবশ্য পরে তাঁর ন্যায়পরায়নতা ও উদার চিত্তের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনের বাধা দূর হয়েছিলো।

সিংহাসনে আরোহনের পর অন্যায় অত্যাচার বা রক্তপাত না করে রাজকার্য পরিচালনা করাই ছিলো জালাল উদ্দিন ফিরোজের লক্ষ্য। তিনি হালাকুখানের পৌত্র আব্দুল্লাহ ও চেংগিস খানের পৌত্র উলুঘু খাঁনের সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে দিল্লীর উপকণ্ঠে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ করে দেন। ভারতের ইতিহাসে এরাই "নব মুসলিম" নামে পরিচিতি লাভ করে, সুলতান জালাল উদ্দিন খিলজি ধর্ম ভীরু ও শান্তি প্রিয় থাকা সত্বেও মর্মান্তিক অপমৃত্যু হয়। তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিনের সঙ্গে নিজ কন্যা বিবাহ দান করে তাকে প্রথমে কারা প্রদেশের শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। পর পর আলাউদ্দিন বেশ কয়েকটি অভিযান সাফল্যের সঙ্গে বিজয় লাভ করে দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন। দেবগিরির ঐতিহাসিক মুসলিম অভিযানে জয়যুক্ত হয়ে প্রভূত ধন রত্নাদিসহ দিল্লী প্রত্যাগমন না করে আলাউদ্দিন কারায় চলে যান। সভাসদগণের পরামর্শ উপেক্ষা করে স্নেহান্দ্বতার বশবর্তী হয়ে জামাতা আলাউদ্দিনকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে জালালউদ্দিন কারায় গমণ করে স্নেহাভরে আলিঙ্গন করার মুহূর্তে তাকে আক্রমন করা হয়। পালাবার চেষ্টা করেও রেহাই পেলেন না। তার মস্তক ছেদন করা হয়। হত্যার পর আলাউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করে ১২৯৮ সালে রাজ্যভিষেক অনুষ্ঠিত করেন। অন্য দিকে সাধারণ সৈনিক ব্যতিত রাজকার্যে নিযুক্ত না হতে পারায় মংগোল "নব মুসলিমরা" বিদ্রোহী হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে তা প্রকাশ হয়ে পড়ায় সুলতানের আদেশে একদিনে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার মংগোল নব মুসলিমদের নির্দয় ভাবে হত্যা করা হয়। এভাবেই তিনি অভ্যন্তরীণ ও মংগোলদের সমস্যা সমাধান করেন।

তিনি নিজে অশিক্ষিত থাকলেও বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। স্থাপত্য ও শিল্প কলার প্রতিও অনুরাগ ছিলো। কুতুব মিনার হতে দ্বিগুণ উচুঁ আলাই মিনার নামে এক নূতন মিনার নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেননি। তবে তাঁর আমলের আলাই দারওয়াজা নির্মাণ কৌশলের দিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলো।

মুসলিম ভারতের তুর্কী-আফগান সুলতানদের মধ্যে খ্যাতনামা বিজয়ী, সুদক্ষ সেনাধ্যক্ষ এবং সুযোগ্য শাসক হিসেবে আলাউদ্দিন খিলজীর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। শেষ বয়সে স্বাস্থ্য ও মন দুই-ই-ভেঙ্গে পড়লে এক মারাত্মক উদরী রোগে আক্রান্ত

হয়ে ১৩১৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের সম্মুখে তাকে সমাহিত করা হয়।

বাংলার মুসিলিম ইতিহাসে বখতিয়ার খলজির নাম প্রথমেই আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনিই সর্ব প্রথম নদীয়া জয় করে বাংলার লক্ষণাবতীর হিন্দু মহারাজা লক্ষণ সেনকে পরাভূত করে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় পতাকা বহন করে নিয়ে আসেন তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি। ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসারের জন্যে তিনিই নানাবিধ ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের কথায় "বঙ্গে যত দিন ইসলাম ধর্ম থাকিবে, বখতিয়ার খলজি ততদিন স্বমহিমায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবেন।"

বখতিয়ার খলজির দৈহিক গঠন ও চেহারা ছিলো কুৎসিত। বিশেষ করে তার শরীর অনুসারে হাতটি ছিলো অস্বাভাবিক লম্বা। তার উপর নিরক্ষর এবং প্রথম জীবনে বিত্তহীন। এ সব থাকা সত্ত্বেও বখতিয়ারের গৌরবময় সাফল্যের মূলে ছিলো তাঁর দুর্দমনীয় আকাংখা, সাহসিকতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা। তাই যুগোপযোগী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দীর্ঘ বার বৎসর সুনিপুণ ও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন।

তিনি ছিলেন অসম সাহসী যোদ্ধা। ভাগ্যান্বেষণে সিস্তান থেকে তিব্বত পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে কখনও ঘন বনানী, কখনও তরঙ্গ সংকুল ও খরস্রোতা নদ-নদী, আর হিমালয়ের তুষারাবৃত গিরিপথ অশ্বপৃষ্ঠে দূর্বার বেগে অতিক্রম করেছেন। জীবনে চলার পথে কোন বিপদ বা বাধা তাঁর পথ রোধ করতে কিংবা সংকল্পচ্যুত করতে পারে নাই।

আফগানিস্তানের গরমশির ভাগ্যান্বেষী, দারিদ্রের নিস্পেষণে স্বদেশ ত্যাগী বখতিয়ার ভাগ্যন্নোয়নের জন্য স্বীয় কর্ম শক্তির উপর নির্ভর করে প্রথমে গজনীর সুলতান মুহম্মদ ঘোরী এবং দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের সৈন্য বিভাগে চাকুরী লাভে ব্যর্থ হয়ে বদায়নের শাসন কর্তার অধীন সামান্য বেতনে সৈন্য বিভাগে চাকুরী নেন। কিছুকাল চাকুরী করেই অযোধ্যার শাসন কর্তার নিকট কর্মপ্রার্থী হলে, বিচক্ষণ শাসনকর্তা মালিক হুসাম উদ্দিন তাঁর প্রতিভা অনুধাবন করে তাকে ভাগবত ও ভিউলী নামে দুটি পরগণার জায়গীর দান করেন। এ সময় হতেই বখতিয়ারের নুতন জীবন শুরু হয়। কিছু দিনের মধ্যেই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্যগুলি একের পর এক আক্রমন করে অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে এক বিশাল সৈন্য বাহিনী গঠন করেন। বখতিয়ারের শক্তি ও সাহসের কাহিনী চতুর্দিকে

ছড়িয়ে পরায় সুলতান কুতুব উদ্দিন উদীয়মান বখতিয়ারকে অভিনন্দন জানান এবং একটি খিলাত প্রদান করেন। ফলে বখতিয়ার স্বীয় শক্তিতে আরো উৎসাহিত হয়ে নব উদ্যমে সমরাভিযানে প্রবৃত্ত হন। এ সময় ভারতের বহু মুসলিম বিশেষ করে ভাগ্যান্বেষী মুসলিম খলজিগণ তার পতাকা তলে সামিল হয়। সমরাভিযানে অগ্রসর হয়ে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাচীর বেষ্টিত দূর্গের মত স্থানে উপস্থিত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র চালনা করেন কিন্তু অপর পক্ষ থেকে কোন বাধাই আসলো না। ঐ স্থানটি জয় করে বখতিয়ার দেখলেন, সেখানকার অধিবাসীরা সকলেই মুণ্ডিত মস্তক ও স্থানটি বই পুস্তকে ভরা। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন এটা কোন দূর্গ নয়, একটি বৌদ্ধ বিহার আর মুণ্ডিত মস্তক লোকগুলো বৌদ্ধ ভিক্ষু। বিহারটির নাম ছিলো ওদন্ত বিহার। সে সময় থেকেই মুসলমানরা নাম দিলেন বিহার। যা আজ পর্যন্ত শহরটি বিহার শরীফ নামে পরিচিত।

বিহার বিজয় করে বহু ধন রত্ন নিয়ে বখতিয়ার দিল্লীর সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যান। এ সময় দিল্লীর কয়েকজন আমীর বখতিয়ারের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে সুলতানের নিকট নানা কুৎসা রটনা করেন। ফলে কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার খলজির সাহসিকতা পরীক্ষার নামে তাঁকে বিপদে ফেলার জন্যে একটি প্যাগলা হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেন। বখতিয়ার এই চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অসম সাহসিকতার পরিচয় দেন। ফলে কুতুব উদ্দিন হতে পুরস্কার ও খেতাব গ্রহণ করে বিহারে ফিরে আসেন। পর বৎসর আরো অধিক সৈন্য সংগ্রহ করে বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের অস্থায়ী রাজধানী নদীয়া বা নবদ্বীপ অভিযানে অগ্রসর হন। এই অভিযানই বাংলায় সর্ব প্রথম মুসলিম অভিযান। আর মহারাজা লক্ষণ সেনের রাজ প্রাসাদ খিলজী কর্তৃক অধিকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার হিন্দু সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটে। সে সময় কোন আগত বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে "ঐন্দ্রিক মহা শান্তি যজ্ঞের" ব্যবস্থা করা হতো। তৎকালীন বঙ্গাধিপতি রায় লখমনিয়া এ যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। এতে রাজ্যের গুণী, পণ্ডিত, জ্যোতিষী ও পরামর্শদাতাগণ রাজ সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে, এদেশ তুর্কী জাতি কর্তৃক বিজিত হবে এবং সে সময়ও অত্যাসন্ন, তারা রাজাকে আরও অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন দেশ ত্যাগ করে পূর্ব বঙ্গ বা কামরূপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহলেই তিনি বিধর্মী তুর্কীদের অত্যাচার হতে রক্ষা পাবেন। রাজা সেই বিধর্মী বিজেতার দেহাকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তারা উত্তর দিলেন যে, প্রাচীন গ্রন্থে বিজেতার রূপ বর্ণনা রয়েছে তিনি হবেন আজানুলম্বিত ভূজ। এ কথার সত্যতা

নিরূপণের জন্যে বিশ্বস্ত অনুচর পাঠানো হলো। ফিরে এসে তারা রাজ সমীপে নিবেদন করলেন যে, মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর দেহাকৃতিতেই শাস্ত্র বর্ণিত বিধর্মী বিজেতার রূপের সাদৃশ্য রয়েছে। এ তথ্য জানবার পর রাজ্যের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পূর্ববঙ্গ ও কামরূপে পলায়ন করেন। কিন্তু রাজা স্বচ্ছ মনে রাজ্য ত্যাগের পরামর্শ গ্রহণ না করে রয়ে গেলেন নবদ্বীপে। এ কথা লক্ষণ সেনের মাধাই নগর তাম্র শাসনে উল্লেখিত আছে। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে মুসলিম প্রভূত্ব স্থাপনকরেই ১২০৬ সালে দশ হাজারের এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হন। এ সময় বাংলা ও কামরূপে বেশ কিছু হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তা জয় না করেই তিব্বত অভিযান তার জীবনের এক মারাত্মক ভুল তিনি ভাবতেও পারেন নাই এটাই যে হবে তাঁর শেষ সমরাভিযান।

যাই হোক, তিব্বতের পথ ছিলো অত্যন্ত দুর্গম, খাদ্য ব্যবস্থা বিঘ্ন বহুল, শত্রুর শক্তি অজ্ঞাত এবং ভবিষ্যত অনিশ্চিত। তবুও তার দুঃসাহসী মনকে সংযত করতে পারেনি কেহ। তিনি পথে এক প্রস্তর নির্মিত পুল দেখতে পেয়ে দুই সেনাপতিকে পুল রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে কামরূপে গিয়ে পৌছান। কামরূপ রাজ-রাজ্যের মধ্য দিয়ে সৈন্য পরিচালায় বাধা দিলেন না। তবে দূত মারফত জানালেন এ সময় তিব্বত আক্রমন সমীচীন হবে না এবং তাঁকে ফিরে যাবার উপদেশ দেন। কিন্তু বখতিয়ার সে কথায় কর্ণপাত না করে আরো উত্তরে ক্রমাগত পনর দিন পথ চলার পর বিপদ সংকুল দূর্গম পার্বত্য পথ শেষ করে ষোড়শ দিবসে এক বিশাল উপত্যকা, জনবহুল ভূখণ্ড ও একটি দূর্ভেদ্য দূর্গ দেখতে পেলেন। এদিকে অপরিচিত বিদেশী সৈন্য দেখতে পেয়ে দূর্গের সৈন্যও পাশ্ববর্তী এলাকার জনগণ বখতিয়ারের বাহিনীকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমন করলো। বিপুল ক্ষতি স্বীকার করে যুদ্ধে জয় লাভ করলো মুসলিম বাহিনী। বন্দী তিব্বতিদের মুখে জানতে পারলো পঞ্চাশ মাইল দূরে রয়েছে তিব্বতের বিখ্যাত শহর করবর্তন।

এদিকে বখতিয়ারের মুসলিম বাহিনী দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই আর ঝুঁকি নিয়ে বখতিয়ার সম্মুখে অগ্রসর হলেন না। সৈন্যগণকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। ফেরার পথে পনর দিনের রাস্তায় তাঁর সৈন্য বাহিনী ও ঘোড়ার জন্যে কোন খাদ্যই সংগ্রহ করতে পারলেন না। পার্বত্য লোকেরা পূর্বেই পথের সকল খাদ্যশষ্য ও ঘোড়ার খাদ্য নষ্ট করে ফেলেছিলো। খাদ্যাভাবে সৈনিকরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ঘোড়া জবাই করে ক্ষুধা নিবারণ করেছেন আবার অনেকে খাদ্যাভাবে অথবা পথ শ্রম সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করলেন।

অবশেষে সেই পুলের নিকট এসে দেখতে পেলেন, যাদের পুল পাহারা দেবার জন্যে রেখে যাওয়া হয়েছিলো তারা নেই এবং পুলের খিলান ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যাগমণের পথ অবরুদ্ধ দেখে নদী তীরে শিবির ফেলে নৌকা সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন। এতেও বিফল হলেন। এমতাবস্থায় নিকটবর্তী একটি দেব মন্দিরে সৈন্য আশ্রয় নিয়ে নৌকা বা ভেলা নির্মাণের চেষ্টা করতে লাগলেন। এই করুণ পরিস্থিতিতে কামরূপ রাজ্যের সেনাবাহিনী তাদের ঐ দেব মন্দির ঘিরে ফেলে বাঁশের অবরোধ প্রাচীর সৃষ্টি করলো। বখতিয়ারের সৈন্যগণ চারিদিক বন্ধ দেখে মরিয়া হয়ে প্রাচীরের একটি দিক ভেঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে নদী অতিক্রম করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মরুভূমি অঞ্চলের মুসলিম বীরগণ যুদ্ধে সুনিপূণ হলেও সাঁতারে দক্ষ না থাকায় বিশাল সৈন্য বাহিনীর নদীতে সলিল সমাধি ঘটলো। বখতিয়ার কোনরূপে নদীর ওপারে বন্ধু লোকদের সহায়তায় মাত্র এক শত সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন দেব কোটে। এখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরাজয়ের ক্ষোভ ও অপমানে বখতিয়ার সমাজ ও বন্ধুদের সঙ্গ পরিহার করে গৃহ প্রাচীরের ভিতরেই থাকতে চেষ্টা করতেন। কেননা নিহত সৈন্যবর্গের আত্মীয় স্বজন তাঁকে দেখলেই অভিসম্পাত ও বিদ্রুপ করতো। এ অবস্থা তাঁর জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। শয্যাশায়ী অবস্থায় ১২০৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারই সুদিনের বন্ধু আলী মর্দান খলজী, বন্ধু দর্শনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যে এসে রুগ্ন ও পীড়িত বন্ধুকে বক্ষে ছুরি বিদ্ধ করে বন্ধুকে অপমানের হাত থেকে নিস্কৃতি প্রদান করেন।

এ সব জয় পরাজয়ের মধ্যেও তেজস্বী পুরুষ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী বঙ্গ বিজেতারূপে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়েই থাকবেন। সড়কটি পূর্ণ নাম না থাকার কারণে অনেকের ধারণা খলজী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জালাল উদ্দিন খলজী অথবা দিল্লীর খিলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর কুশলী ও সুদক্ষ শাসক আলাউদ্দিন খিলজীর নামানুসারে হয়েছে। এ ধারণা থাকতে পারে, তবে বঙ্গ বিজেতা বখতিয়ার খিলজীর নামানুসারেই খিলজী রোডের নামকরণ হয়েছে।

মহম্মদপুর এলাকার নূরজাহান রোডটিতে পূর্বে লোক বসতি খুবই কম ছিলো। ধান ও বেগুনের ক্ষেত খামার ছিলো অধিকাংশ জায়গা জুড়ে। বেশ সংখ্যক ডিচও ছিলো। এসব ডিচ থেকে সে সময় প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো।

নূরজাহান রোডটির নামকরণ হয়েছে মোঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাজ্ঞী মালেকা নূরজাহানের নামানুসারে। মালেকা নূরজাহানের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা পাক

ক্বোরআনের একটি আয়াতের প্রতিফলন দেখতে পাই। আয়াতটি হচ্ছে, ওয়াতুয়েজ্জুমান তাসায়ু ওয়াতুজেল্লুমানতাসায় বিয়াদিকাল খায়ের, ইন্নাকা আলা কুল্লি সাইয়েন কাদির। অর্থাৎ "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমাণিত করেন, তাঁরই হস্তে রয়েছে সমস্ত কল্যাণ, নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।"

এক অজ্ঞাত তাতারী নারী মেহেরুন্নিসা কি বিপুল ঐশ্বর্য্য আর মর্যাদা লাভ করেছিলেন– প্রবল পরাক্রমশালী মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান মহিয়ষীর গৌরব অর্জন করার পর। মেহেরুন্নিসার পিতা খাজা গিয়াস ছিলেন পশ্চিম তাতারের অধিবাসী। তিনি এক ভদ্র দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বদেশে তাঁর উন্নতির কোন আশা না দেখে তিনি হিন্দুস্তানে আগমন করার কথা চিন্তা করেন। হিন্দুস্তান তখন দরিদ্র তাতারীদের কাছে স্বর্গরাজ্য ছিলো। সমসাময়িককালে তাতার দেশের বহু লোক এখানে এসে সৌভাগ্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন। খাজা গিয়াস সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহন করার জন্যে কৃতসংকল্প হন। তাঁর এই অভিযান চরম দারিদ্র ও দুঃখ-দূর্দশার কাহিনীতে ভরপুর। ক্ষীণাঙ্গী ও ভগ্ন স্বাস্থ্য সহধর্মিনীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওয়ানা হন হিন্দুস্তানের পথে। রশদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বহনের জন্যে সঙ্গে ছিলো মাত্র একটি অশ্ব। দীর্ঘ পথ মোটেই শেষ হতে চায়না। যে সামান্য পরিমাণ অর্থ ছিলো তা শীগগীরই নিঃশেষ হয়ে যায়। তাতার সীমান্তে প্রাণঘাতি মরুভূমিতে তাঁরা এক রকম মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হন। খাদ্যহীন, সঙ্গী হীন অবস্থায় তাঁরা দূর্ভাগ্যের শেষ সীমায় এসে পৌছান। সামনে অগ্রসর হওয়া অথবা স্বদেশে ফিরে যাওয়া দুই-ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতের কোন আলোর সন্ধানই তাঁরা দেখতে পান না। এই চরম দুর্দশার মধ্যেই খাজা গিয়াসের পত্নী এক কন্যা সন্তান প্রসব করেন। যে শিশু কন্যা এমন দূর্দশা ও অশুভ দারিদ্রের মধ্যে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন, তিনিই যে ভবিষ্যতে মোঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ্য সম্রাজ্ঞী রূপে একদিন আবির্ভূত হবেন তা কেইবা জানতো সেদিন!

সদ্যজাত এই শিশু কন্যাকে বুকে নিয়ে পথ চলার শক্তিটুকুও প্রসূতির ছিলোনা। তাই রাস্তার এক ধারে শিশু কন্যাকে রেখে তাঁরা পথ চলতে শুরু করেন। কিন্তু শীগগীরই মাতা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। খাজা গিয়াসকে অগত্যা ফিরতে হয়। তিনি এসে দেখেন একটা বিরাট কালো অজগর সাপ শিশুকে কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। কোন রকমে সাপের কবল থেকে সন্তানকে মুক্ত করে তাঁরা আসন্ন ও অনিবার্য্য মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে সেখানে একদল পর্যটক এসে উপস্থিত হন। তাঁরা এই দুঃস্থ পরিবারটির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে অর্থ সাহায্য

করেন। ক্রমে তাঁদের জীবনের অমানিশার অবসান হয়। নির্বিঘ্নে তাঁরা গন্তব্য স্থানে পৌছে যান। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই খাজা গিয়াস সম্রাট আকবরের চিত্ত জয় করে নেন। তাঁকে সাম্রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয় এবং ইতিমাদ-উদ-দৌলা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যে কঠোর সংকল্প তাঁর স্বজাতির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিলো, সেই গুণের বলেই তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই কপর্দকহীন ভাগ্যন্বেষী এক অনাকাংখিত পদ লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। যে শিশু কন্যা চরম দারিদ্রের মধ্যে জন্ম গ্রহণের পর অগ্নিশ্রাবী মরুভূমিতে পরিত্যাক্ত হয়েছিলেন, সেই কন্যার মধ্যে সর্বগুণের বিকাশ সাধনে খাজা গিয়াস কোন ত্রুটি করেননি। এই হতভাগী মেহেরুন্নিসা সর্ব গুণের অধিকারী হয়ে শাহাজাদা সেলিম তথা সম্রাট জাহাঙ্গীরের চিত্ত জয় করে তার সহ-ধর্মিনী হয়ে নূরজাহান নাম ধারণ করে মোঘল সম্রাজ্ঞীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব হওয়ার গৌরব অর্জন করে গেছেন। মালেকা নূরজাহান ঢাকার মসলিন কাপড় খুবই পছন্দ করতেন। এটা তার প্রিয় ভূষণ ছিলো। বাদশা স্বয়ং বেগম নূরজাহানের জন্যে ঢাকা থেকে মসলিন কাপড় নিয়ে যাবার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। এই মোঘল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নামানুসারেই নূরজাহান রোডের নামকরণ করা হয়।

ইকবাল রোড মহাকবি আল্লামা ইকবালের নামানুসারে রাখা হয়েছে। বৃটিশ শাসনামলে এ এলাকাটি ময়লাখানা নামে পরিচিত ছিলো। এখানে কোন জন বসতি ছিলোনা। নালা বা খাদ ছিলো। এসব খাদে তৎকালীন ঢাকা শহরের মানুষের মল ফেলা হতো পুরাতন ঢাকার মীরন জলার মল ডিপো হতে এক প্রকার ট্রেন বগির মত মলের বগি চালিয়ে নিয়ে সেখানে ফেলা হতো। ১৯৪০ সালে এরূপ মল ফেলা বন্ধ হয়।

ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা কবি,সাহিত্যিক, দার্শনিক, অধ্যাপক, আইনবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুসলিম জাতীয়তাবাদের তুর্যবাদক আল্লামা শায়খ মুহম্মদ ইকবাল ১৮৭০ সালে পাঞ্জাবের শিয়াল কোটে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা শেখ নূর মহম্মদ ছিলেন সূফীসুলভ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাকবি ইকবালের পূর্ব পুরুষ কোন এক দরবেশের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই উত্তরাধিকার সূত্রেই কবি ইকবাল পেয়েছেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বৃত্তি ও বলিষ্ঠ ধর্মীয় মনোভাব। শিয়াল কোটের স্কচ মিশন কলেজে অধ্যয়নকালে মাওলানা মীর হাসানের প্রভাবেই কবি ইকবালের অন্তরে প্রথিত হয়েছিলো ইসলামী কৃষ্টির প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা, ইসলামী সাহিত্য ও ফারসী সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ।

আরও এক ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তিনি হলেন আলীগড় কলেজের অধ্যাপক আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও ইসলামী কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগী মিঃ টি, ডি, ডব্লিউ আর্নোল্ড (পরবর্তীকালে স্যার টমাস)।

কবি ইকবাল তাঁর কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করেন উনিশ শতকের শেষ ভাগে, লাহোর ভাটিগেটের অন্তর্গত বাজার-ই-হাকীমান নামক স্থানে হাকীম আমীন উদ্দিন নামক এক ব্যারিষ্টারের গৃহে। এখানে প্রখ্যাত শায়েরগণ জমায়েত হয়ে সাহিত্য চর্চা করতেন। তরুণ ইকবাল তাঁর কবিতা আবৃতি করে প্রশংসা অর্জন ও সাহিত্যবিদদের মনে রেখাপাত সৃষ্টি করে এ মাহফিল হতেই ভবিষ্যত জীবনের খ্যাতি লাভের গোড়াপত্তন করেন। অবশ্য তাঁর উর্দু কাব্য শুরু হয় ১৮৯৬ সাল হতে। কিছুকাল পর হতেই তাকে আর কাগজ কলম ও চিন্তা করে কবিতা লিখতে দেখা যায়নি। একই বৈঠকে অসংখ্য কবিতা রচনা করে চলতেন বাক্যের ঝর্ণা ধারার মতো। তাঁর স্মৃতি শক্তি অতি তীক্ষ্ণ থাকায় তাঁর রচিত কবিতাসমূহ লিখে রাখার প্রয়োজন হতোনা। এতসব গুণ থাকা সত্বেও তিনি কাহারো অনুরোধে বিশেষ কবিতা রচনা করতে পারতেন না। একমাত্র অন্তরের তাগিদেই কবিতা রচনা করতেন এটাই তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য।

তৎকালীন ভারত বর্ষের উর্দু কাব্যের একছত্র অধিনায়ক নিজাম হায়দরাবাদের ওস্তাদ ও তাঁর দরবারের আলোক শিখা ছিলেন কবি দাগ। ইকবালও অন্যান্য কবির ন্যায় তাঁর নিকট কিছু কবিতা সংশোধনের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। কবি দাগ তাঁর রচিত কবিতাগুলো দেখে ইকবালকে লিখেছিলেন এগুলোর সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই। এভাবেই কবি দাগের সঙ্গে কবি ইকবালের গুরু শিষ্যের সূচনা হয়।

কবি ইকবাল ১৯০৫ সালে ইংল্যাণ্ডে গমণ করেন, তেত্রিশ বছর বয়সে আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, ব্যাতিত কতিপয় ইউরোপীয় ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে এসে তিনি লাহোর চীফ কোর্টে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন। তাছাড়া এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ন্ন হওয়ার পর লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আইন ব্যবসা আরম্ভ করলেও তিনি সে ব্যবসায়ে খুব মনোযোগ দিতেন না। যখন মনোযোগ দিতেন তখন প্রচুর মোকদ্দমা তার হাতে আসতো। পাটনায় ডুমরাও রাজের বিখ্যাত মামলার সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মামলার বিরোধীয় শব্দসমূহের তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্যে আদালতে আমন্ত্রণ জানান। দৈনিক এক হাজার টাকা ফি ধার্য্য করে পাটনায় গমণ করেন। এ মামলায় ডক্টর

আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীসহ বহু প্রখ্যাত আইনজীবি ছিলেন। অপর পক্ষের কৌশলী ছিলেন আইনজীবি পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু। ডঃ ইকবাল পাটনায় পৌছুলে মিঃ দাস অর্ভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন। কিন্তু পরের দিন মিঃ দাস সাক্ষাৎ করতে এলেননা। যখন সাক্ষাৎ হলো কবি জানালেন তিনি লাহোরে ফিরে যাবেন এবং তাঁর মতামত অনতিবিলম্বে আদালত সমক্ষে জ্ঞাপন করবেন। কিন্তু পরদিনই যখন মিঃ দাস ও অন্যান্য আইনজীবি মামলা পরিচালনা করছিলেন সে সময়ই কবি আদালতে হাজির হয়ে তার মতামত আদালতে পেশ করে পরের ট্রেনেই লাহোর চলে এলেন।

বিংশ শতাব্দীর আগমণকালেই ভারত বর্ষে নুতন যুগের আবির্ভাব ঘটে। কবি ইকবাল ইতিহাসের ছাত্র বিধায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তৎকালীন দেশের দূরবস্থা ও জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বোধ তাঁর কবি প্রতিভাকে প্রভাবান্বিত করেছিলো। এবং স্বদেশের জন্য তাঁকে ভাবিয়ে তুলছিলো। তখন হতে তিনি দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করলেন। তন্মধ্যে তারানায়ে হিন্দ্‌ এবং তসবীর-ই-দর্দ নামক কবিতায় যেমন ছিলো দেশাত্মবোধের সুর, তেমনি ছিলো হিন্দু মুসলিম ঐক্যের আবেদন।

ইউরোপে (১৯০৫-১৯০৮) তিন বৎসর অতিবাহিত করে দেশে ফিরে আসার পর, মনে মহা পরিবর্তনের দ্বন্দ্বে নিপতিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, আর তিনি কবিতা রচনা করবেন না। শেষ পর্যন্ত মিঃ আর্নোল্ডের অনুরোধে দেশের খাতিরেই পুণরায় কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। তখন হতেই কবির চোখে তাঁর দেশবাসীর অদূরদর্শিতা ও জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়লো। এবং সেই সঙ্গে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সাম্য ও আল্লাহর একাত্মের প্রতি তাঁর মনোযোগ আরো প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলো। কোরআন শরীফ তেলাওয়াৎ করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে পবিত্র গ্রন্থের উপর তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো।

পাঞ্জাবের অন্যতম গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড ম্যাক লাগান একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যমোদী ও কলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তিনি ইকবালের জ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তাধারার বিশেষ করে বহির্বিশ্বে তার খ্যাতির জন্যে ১৯২২ সালে তাঁকে নাইট উপাধি (স্যার) প্রদান করেন। এসব খেতাব বা পদক তাকে কোন দিনই স্বাধীনতার বাণী প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারেনি। ১৯২৪ সালে আফগান বাদশাহ আমান উল্লার শাসনামলে ছাত্রদের এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্বয়ং বাদশাহ বিদেশী দূত, খ্যাতনামা নাগরিক ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের উপস্থিতিতে সামরিক ব্যাণ্ডের মধুর সুরের মধ্যে ছাত্রদের কণ্ঠে কবির তারনায়ে মিল্লিঃ চীন ও আরাব

হামারা, হিন্দুস্তা হামারা। মুসলিম হ্যায় হাম ওয়াতান হায় সারা জাহা হামারা। কাবুলের পার্বত্য ভূমির লোকদের পাথরের মত বুকের পাটা ভেদ করে অন্তর স্পর্শ করেছিলো সেদিন ইকবালের সংগীত। অবশ্য ইকবালের প্রথম জীবনের রচিত তারানায়ে হিন্দ্ বহুদিন ভারতের জাতীয় সংগীত ছিলো। ইকবালের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অগণিত বন্ধু ও ভক্তগণের অনুরোধে বিনা পরিশ্রমেই ১৯২৬ সালে পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ লাভ করে রাজনীতির অংগনে প্রবেশ করেন। ১৯২৯ সালে মহীশুরের মহারাজা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বাঙ্গালোরে গমণ করলে মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে একটি বক্তৃতাদানের অনুরোধ জানান। কবির বক্তৃতার সময় মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের এক অমুসলিম অধ্যাপক মন্তব্য করেছিলেন, "মুসলিম সমাজ ডঃ ইকবালকে লক্ষ বার তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি বলে দাবী করতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের সকলের। তিনি কোন ধর্ম বা শ্রেণীর একচেটিয়া সম্পত্তি নন। ইকবাল তাঁদের ধর্মের অন্তর্গত বলে যদি তাঁরা গর্ববোধ করেন তাহলে ইকবাল ভারতীয়, তাতেও আমাদের কম গর্বের কথা নয়।" এতেই প্রমাণিত হয় ভারতের সকল ধর্মের লোক তাঁকে কত ভালবাসতো।

১৯৩০ সালে স্যার ইকবাল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন এবং সেই আলোকেই তার কবিতা এবং সকল কর্ম প্রতিফলিত হতো। কিন্তু ভারতীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেসের চাতুর্য্যপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য তিনি ভারতীয় একক জাতীয়ত্যবাদের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের কোন সুফল হবেনা দেখে দ্বিজাতিত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে তার কর্ম পরিচালনা আরম্ভ করেন। ভারতীয় রাজনীতির জটিল সমস্যা নিরসন কল্পে ভারত বিভক্তের মূল ধারণা যদিও প্রথমে হিন্দু নেতা লালা লাজপত রায়ের কাছ থেকেই এসেছিলো কিন্তু মুসলিম ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ থেকে ইকবাল এই ধারণার পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করে তাকে সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেন।

আজ আমাদের দেশের সংকীর্ণ মনা অনেকেই পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য ইকবালকে, তাঁর কার্যকে, তাঁর দর্শনকে দূরে ঠেলে দিয়েছে অথচ এই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলেই আজ পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত করতে পেরেছে। ভারত বিভক্ত না হলে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা একটি স্বপ্ন থেকে যেতো। অন্যদিকে যে ভারতের বুক চিরে পাকিস্তান হলো সেই ভারতের

অমুসলিমরা আজও তাঁর রচিত কাব্য ও গীতকে ভালবাসে, সম্মান দেয়, ঢাকায় যে প্রথম সার্ক সম্মেলন হয়েছিলো তাতে ভারতের পশ্চিম বাংলার যে সাংস্কৃতিক দল এসেছিলো তারাও অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে ইকবালের তারানায়ে হিন্দ্

সারে জাহাসে আচ্ছা

হিন্দুস্তা হামরা-হামারা ....

গীত গেয়ে গেলেন এতেও আমাদের সংকীর্নতাবোধ ঘুঁচলোনা। ইকবালের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, আক্রোশ যাই বলিনা কেন তা ভারতীয় অমুসলমানদেরই থাকার কথা। যাহোক মহাকবি ইকবালের নামানুসারে ঢাকায় একটি সড়কের নাম রয়েছে এটাই আমাদের সান্তনা এটাই আমাদের গর্ব।

কবি অত্যন্ত লঘু আহার করতেন, দিনে একবার-রাত্রে শুধু এক কাপ লবণাক্ত চা পান করতেন। কোনদিন সামান্য দুধ আবার কোনদিন না খেয়েও কর্মস্থলে চলে যেতেন। ফলে ১৯২৪ সাল হতেই তার পাকস্থলীর পীড়া দেখা দেয়। এ পীড়াই তাঁকে মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে টেনে নেয়। ১৯৩৫ সালে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ইন্তেকাল করলে তিনি আরো ভেঙ্গে পড়েন। এরই মধ্যে হৃদরোগসহ আরো অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে এক সময় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ১৯৩৮ সালে একুশে এপ্রিল সুবে সাদেকের সময় কবির একান্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য আলী বখসের কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)।

স্যার সৈয়দ রোডটি পরাধীন ভারত উপ-মহাদেশের মুসলিম জাগরণের বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের অগ্রদূত স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নামানুসারে নামকরণ হয়। সে যুগে রাজ্য হারা মুসলমানরা যখন সর্ব ক্ষেত্রেই পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর ছিলো। বিশেষ করে ১৮৭৫ সালের সিপাহী বিপ্লবের হোতা এক মাত্র মুসলমানদের মনে করে ইংরেজগণ ভারতীয় মুসলমানদের সর্ব প্রকারে ক্ষমতাচ্যুত ও বিপন্ন করে নিজেদের আধিপত্য সুদৃঢ় করার মানসে অমুসলমানদের প্রীতি অর্জনের সব রকম ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই সংকটময় ক্রান্তিলগ্নে সৈয়দ আহমদ খান ইংরেজ শাসকবর্গের মধ্যে মুসলমানদের রাজানুগত্য প্রমাণ করে একদিকে মুসলিমদের রাজরোষ হতে মুক্ত করতে এবং ভালো ভালো ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করে তারকথা যুক্তির সার বত্তা প্রমাণ এবং ইংরেজী ভাব ধারায় প্রতি এদেশের মানুষের আগ্রহ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হন। ইংরেজগণ তার কথা অনেকটা বিশ্বাস করতো, কেননা ১৮৫৭ সালে সারা ভারতে যখন বিপ্লবের আগুণ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সেই সময়ে সৈয়দ আহমেদের চরিত্রে নানা রকম বিকাশের লক্ষণ দেখা

যায়, একদিকে সমাজ ও স্বজাতি বাৎসল্য, অপর দিকে রাজ ভক্তিও আত্মত্যাগ উল্লেখযোগ্য।

নবাব মহম্মদ খাঁ নামক জনৈক বিদ্রোহী দলপতি প্রায় এক হাজার সিপাহী নিয়ে বিজনৌর আক্রমণ করলে সেখানকার ইংরেজরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সে সময় দৃঢ়চেতা ও প্রভুভক্ত সৈয়দ আহমদ নিজের জীবন বিপন্ন করে বিদ্রোহীদের সম্মুখে গিয়ে তাদের বিজনৌর থেকে চলে যেতে বহু অনুরোধ ও প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু মহম্মদ খাঁ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না। অবশেষে বিজনৌর ইংরেজ কালেকটর মিঃ সেকস্‌পীয়রকে সৈয়দ সাহেব বাধ্য করে তাঁকে দিয়ে একখানা চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়ে দেন যে ইংরেজরা না ফিরে আসা পর্যন্ত বিজনৌর মহম্মদ খাঁর অধীন থাকবে। অন্যদিকে গোপনে বিজনৌর থেকে সকল ইংরেজ নর নারীকে মিরাট নগরে পাঠিয়ে দেন। তিনি যদি উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা অনুরূপ ব্যবস্থা না করতেন তাহলে ইংরেজ নর-নারীর রক্তে সেদিন বিজনৌর প্লাবিত হয়ে যেতো। তার আপ্রাণ চেষ্টায় সেদিন ইংরেজরা নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলো।

অন্যদিকে এখবর বিদ্রোহীদের গোচরীভূত হলে তারা সৈয়দ আহমদের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বাড়ী ঘর, বিষয় সম্পত্তি বারবার লুণ্ঠন করতে লাগলো। অনেক আত্মীয়, বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে প্রাণ হারালেন। তিনি অতি কষ্টে পলায়ন করে নিজের জীবন অবশ্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এরপরই যখন লর্ড ক্যানিং-এর প্রচেষ্টায় বিদ্রোহ দমন হয়ে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে এলো, তখন আরম্ভ হলো বিচারের নামে প্রহসন। দোষী নির্দোষী বহু ব্যক্তিকে ধরে ধরে নৃশংসভাবে হত্যা শুরু করলে, স্যার সৈয়দ আহমদের প্রাণ কেঁদে ওঠে। তিনি অকুতোভয়ে নির্দোষ ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থন করেন, ফলে অনেকের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়। বিদ্রোহ দমন হলেও রাজা প্রজার মনের মিল ছিলো না বললেই চলে। ভারতীয় সেনা সংখ্যা কমিয়ে ইংরেজ সেনা সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হলো। সৈয়দ আহমদ ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রমাদ গুণলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এ অবস্থা দেশে চললে দেশবাসীর বিশেষ ক্ষতি হবে। তাই উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি দূর করতঃ ভারতীয়দের উপরেও দায়িত্বপূর্ণ কাজ ন্যাস্ত হওয়া প্রয়োজন অনুভব করে এর বিহিত ব্যবস্থার জন্য তিনি লর্ড ক্যানিং সঙ্গে সাক্ষাত করে পরিস্থিতি আলোচনা করলেন। তার সুযুক্তি ও সংগত কথায় রাজ প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব প্রথম ভারতীয়দের প্রবেশ করার অধিকার প্রদান করেন। এটা সৈয়দ আহমদের বিরাট কৃতিত্ব।

ভারতীয় মুসলমানরা সে সময়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক

খুঁজে পাওয়া ছিলো দুষ্কর তারা অতীত গৌরব, যশ ও কীর্তির দীপ্তিতে তখনও জ্বলছিলো। তাই চোখে অশ্রু থাকা সত্ত্বেও নবাগত মনিব ইংরেজদের বরণ করে নিতে পারছিলোনা। অন্যদিকে হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে সরকারের ছোট বড় সকল দপ্তরে চাকুরী দখল করে নিলো। এসব দেখেও মুসলমানদের আভিজাত্যের বৃথা গর্ব দূর হলোনা। কাফেরের ভাষা বলে ইংরেজী না শিখে আরবী ফার্সী শিক্ষা করতে লাগলো। মুসলমানদের ভবিষ্যত অন্ধকার দেখে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের অহমিকার ঘুম ভাংগিয়ে নব জাগরণ আনয়নে ব্রত হলেন। কিন্তু পথ হয়ে উঠলো কণ্টকাকীর্ণ। প্রাচীন পন্থী মুসলিম মৌলভিরা তার বিরোধিতা এমনকি হত্যার ভয় দেখাতেও কসুর করলো না। তিনি এক দিকে ইংরেজ রাজ পুরুষদের মন থেকে রুষ্টভাব দূর করে অপর দিকে মুসলিমদের সম্মুখে যুগের নব নব চাহিদা আকৃষ্ট করতে প্রয়াসী হলেন।

তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। পিতাপুত্র দুজনেই বিলেত গিয়েছিলেন। বিলেতে দেড় বৎসর অবস্থান করাকালেই সম্মানসূচক সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। সেখানকার শিক্ষা প্রণালী বিধিব্যবস্থা শৃংখলা সবই আমাদের দেশ থেকে পৃথক। তিনি মনস্থির করলেন দেশে ফিরে অনুরূপ ধরনের একটি আদর্শ শিক্ষায়তন স্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে পিতা পুত্র অনেক আলাপ আলোচনা করে ১৮৭০ সালে দেশে ফিরেন এবং ৩৭ বৎসর দক্ষতার সঙ্গে সরকারী চাকুরী করার পর ১৮৭৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন এবং বাকী জীবন আলীগড়ে একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানেই অবস্থান করবেন বলে স্থির করলেন।

চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ এর পর ১৮৭৮ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ লাভ করেন এবং সরকার কর্তৃক নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি লণ্ডন হতে যে মনোভাব নিয়ে দেশে ফিরছিলেন তা বাস্তবায়নে অনেক বাধা বিপত্তি দেখা দিলেও এমনকি মোল্লারা তাঁকে শয়তানের দোস্ত বলে আখ্যায়িত করা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৮৭২ সালে একটি "অর্থ সংগ্রহ কমিটি" গঠন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে দান সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং নিজেও যতটুকু সম্ভব দিতে লাগলেন। নিজের বই বিক্রি করে, লটারী খেলার প্রবর্তন করে, কেউ নিমন্ত্রণ করতে আসলে তাকে বলতেন আমাকে না খাইয়ে সে অর্থ বিদ্যালয়ের জন্য আমাকে দাও, কারো ছেলে হলে তার নিকট হতে খয়রাত চাইতেন, বিবাহ মজলিশে গিয়ে দান চাইতেন এমনকি রাস্তায় গজল গেয়ে টাকা সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাছাড়া নর্তকীদের কাছে হাত পাততেও কুণ্ঠিত হননি।

অবশ্য হায়দারাবাদের নিজাম ও তার মন্ত্রী মহোদয়ের দান যথেষ্ট ছিলো। সেই সংগৃহীত টাকা দ্বারা আলীগড়ে বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। পরে ১৮৭৫ সালেই বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত হয়। আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্যার সৈয়দ আহমদের আজীবন সাধনার মূর্ত প্রতীক। যতদিন আলিগড় কলেজ থাকবে ততদিন স্যার সৈয়দ আহমেদের নাম পাক-ভারত বাংলা উপ-মহাদেশের শিক্ষিত মুসলমানদের মনে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮১৮ সালে দিল্লী মহানগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মীর মওকী, অর্থ, সম্মান, মর্যাদা, জ্ঞানে-গুণে সব দিক দিয়েই উচ্চ স্থান অধিকারী ছিলেন। তাঁরা বংশানুক্রমে, দিল্লীর বাদশাহদের দরবারের মর্যাদা সম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতা মীর মওকী দিল্লীর বাদশাহ্ দ্বিতীয় আকবরের অন্তরংগ সুহৃদ ছিলেন। পরবর্তীতে শেষ দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহ কর্তৃক নবাব উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ (সাঃ) বংশের পবিত্র রক্ত থেকে উদ্ভূত। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর আচার আচরণ সৌজন্য ও সহৃদয়তা সকলেরই দৃষ্টান্ত স্থল ছিলো। এই মহাপুরুষ ১৮৯৮ সালে ৮১ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে .... রাজেউন)।

মহম্মদপুরের একটি সড়ক পথের নাম কায়েদে আজম রোড। মঃ আলী জিন্নাহ্ প্যাকিস্তান আন্দোলনের পুরোধা ও ভারতীয় মুসলমানদের অবিসংবাদি নেতা হিসেবে বরণ হয়েছিলেন। তাঁর কর্মস্পৃহা, নিষ্ঠা, বিশেষ করে মুসলিম সমাজের পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও দৃঢ়তা পোষণ করে গেছেন তজ্জন্য ভারতের মুসলিম সমাজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাকে “কায়েদে আজম” উপাধিতে ভূষিত করে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেই উপাধির নামানুসারেই সড়ক পথটির নামকরণ হয়েছে কায়েদে আজম রোড।

১৯০৬ স্যালে ভারতের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা দাদা ভাই নওরোজীর একান্ত সচিব হওয়ার পর থেকে গান্ধী যুগের পূর্ব পর্যন্ত মিঃ জিন্নাহ্ ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ছিলেন। হিন্দু, মুসলিম ঐক্যই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিলো। ভারতীয় প্রখ্যাত হিন্দু নেতা বোম্বে হাই কোর্টের বিখ্যাত আইনজীবি মিঃ গোখলে প্রায়ই বলতেন, “জিন্নাহ্ হিন্দু মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত।” মহারাষ্ট্রের উগ্র পন্থী হিন্দু নেতা মিঃ তিলক রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হলে মিঃ জিন্নাহ্ একমাত্র আইনজীবি হিসেবে মিঃ তিলককে নির্দোষ প্রমাণিত করেছিলেন। এসব সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে ছলচাতুরী ও ন্যায্য দাবীর প্রতি অনীহার ফলে মিঃ জিন্নাহ্ মুসলিম

লীগের মাধ্যমে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন এবং পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মনোনীত হন।

আজ আমাদের দেশের অনেকেই মিঃ জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি তত্ত্বের রাজনীতির সমালোচনা করেন। মিঃ জিন্নাহ্‌ যদি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা না করতেন তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হতোনা। আর আমরা বাংলাদেশে থেকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাজ্য কাশ্মীরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে ভারতের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

যাক, সত্যের আলোকে ইতিহাসের ছেড়া পাতার অক্ষরগুলোতে হৃদয়াঙ্গম করার জন্যে কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদী নেতা কংগ্রেসের অকৃত্রিম বন্ধু শেখ আবদুল্লাহ্‌র আত্মজীবনী থেকে দু'একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছিনা। শেখ আবদুল্লাহ একস্থানে বলেছেন "১৯৩৫ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছিলেন। তখন তিনি সমগ্র ভারতের একজন জাতীয় নেতা রূপে পরিচিত। রাজনৈতিক বৈশিষ্টের পাশাপাশি একজন শীর্ষ স্থানীয় আইনজীবি রূপেও পরিচিত। সে সময় কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতির আদালতে একটা জটিল মোকাদ্দমার সাথে আমরা জড়িত হয়ে পরেছিলাম। মামলাটিতে আমরা জিন্নাহ্‌ সাহেবকে উকিল নিযুক্ত করার জন্য আগ্রহী হয়ে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। এ মহান ব্যক্তিত্বের সাথে এটাই ছিলো আমার প্রথম সাক্ষাৎ। পাশ্চাত্য পোষাকে সজ্জিত জিন্নাহ্‌ সাহেবের ব্যক্তিত্ব ছিলো অন্যন্য। হালকা পাতলা গড়ন কিন্তু চোখ দুটি ছিলো তার প্রতিভা দীপ্ত। চেহারার মধ্যে এমন একটা উজ্জ্বল আভা ফুটে বের হতো যা স্বাভাবিক ভাবেই অন্যকে অভিভূত করে ফেলতো। তিনি কথা বলতেন মার্জিত ও পরিমিত ভাষায় এবং হ্যাসতেন খুবই কম। ফলে সব সময়ই তাঁকে ঘিরে একটা গাম্ভীর্যময় পরিবেশ বিরাজ করতো। আমাদের অনুরোধে তিনি মামলা পরিচালনা করতে সম্মত হলেন এবং নির্দ্ধারিত দিনে বহু সংখ্যক আইনজীবি ও দর্শক পরিবৃত্ত প্রধান বিচারপতির আদালতে সামান্য একটা সূত্র অবলম্বন করে তিনি আইনের এমন সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিলেন যা শুনে আদালত স্তম্ভিত হয়ে গেল। মামলায় আমাদের জয় হলো।

এ সময় ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে শাহী মসজিদে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল, আমরা একটা অধিবেশনে তাঁকে সভাপতিত্ব করার জন্য দাওয়াত করলাম। সভাপতির ভাষনের এক পর্যায়ে তিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন 'কাশ্মীর যেহেতু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য এজন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের পক্ষে অমুসলমনাদের সাথে শুধু মাত্র হৃদদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কই গড়ে তোলা যথেষ্ট নয়, বরং তাদেরকে রাজনৈতিক

গাড়ীর একটা অপরিহার্য চাকা রূপে গণ্য করা উচিৎ।'

তিনি আরেক স্থানে বলেছেন ঃ –

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকেই আমরা বুঝতে পারি যে জনগণের প্রকৃত সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছে একদল শোষকের হৃদয়হীন আচরণ, যাদের কোন জাতি নেই। সকল ধর্ম মতের মধ্যেই এদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের ভিত্তিতে কায়েদে আজম যে রাষ্ট্র কায়েমের কথা বলছিলেন, সেটা যে যুক্তি সিদ্ধ নয়, এ কথাটা আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। মনে হলো আমার যুক্তিগুলো তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। আমি তার চোখে মুখে বিরক্তির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলাম। তবে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আমার কথাগুলো শুনে গেলেন। শেষে একজন বিজ্ঞ মুরুব্বীর ন্যায় উপদেশের ভাষায় বলতে লাগলেন।

আমি তোমার পিতৃতুল্য। রাজনীতির মধ্যেই আমার চুল পেকেছে। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে হিন্দুদের উপর কোন অবস্থাতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। ওরা কখনও তোমার বন্ধু হতে পারে না। সারা জীবন আমি ওদেরকে আপন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওদের আস্থা অর্জন করতে পারিনি। এমন সময় আসবে যখন আমার কথাগুলি মনে করে তোমরা আক্ষেপ করবে। জিন্নাহ্ সাহেব আরো বলেন ঃ

ঃ এমন এক জাতির উপর কি করে তোমরা আস্থা স্থাপন করতে পার, যারা তোমাদের হাতে একটু পানি পান করাও পাপ বলে জ্ঞান করে আসছে। ওদের সমাজে তোমাদের জন্য কোন স্থান নেই। ওরা তোমাদের ম্লেচ্ছ বলে জ্ঞান করে।

ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে কায়েদে আজম বললেন একবার আমি ও আমার স্ত্রী দুপুরের খানা খাওয়ার জন্য মাত্র টেবিলে বসেছি, এমন সময় কাজের ছেলেটি একজন সাক্ষাৎ প্রার্থীর কার্ড এনে সামনে রাখলো। দেখলাম বিখ্যাত হিন্দু নেতা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য (এক সময় ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতির পদেও বরণ হয়েছিলেন) এসেছেন। আমি উঠে গিয়ে তাঁকে ভিতরে নিয়ে এলাম এবং আমাদের সাথেই খাওয়ায় শরীক হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি বললেন, আপনি তো জানেন যে, ধর্মীয় কারণেই আমি আপনার সাথে এক টেবিলে বসে খেতে পারি না। "আমি বললাম আপনার জন্য পাশে আরেকটা পৃথক টেবিল সাজানোর ব্যবস্থা করে দেই।" মালব্যজী বললেন না তাও সম্ভব নয়। কেননা, ঘরজোড়া কার্পেট বিছানো রয়েছে আর এর মাধ্যমে ছুঁৎ লাগতে পারে। জিন্নাহ্ সাহেব বললেন, মালব্যজীর এ ছুঁৎ ... বোধের কারণে শেষ পর্যন্ত আমি কার্পেট গুটিয়ে এবং আমাদের স্পর্শ থেকে বেশ দূরে একটা স্বতন্ত্র টেবিল লাগানোর ব্যবস্থা

করলাম এবং তাতে মালব্যজীর জন্য দুধ ও ফল পরিবেশন করলাম। মিঃ জিন্নাহ্ ঘটনাটি বেশ আবেগের সাথে বর্ণনা করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে সম্প্রদায়ের বরণীয় নেতৃবৃন্দেরই এরূপ মানসিকতা, ওরা তোমাদিগকে কতটুকু বাচঁতে দিবেঃ"

হ্যাঁ আমি এতক্ষণ জিন্না সাহেব ও মালব্যজীর কথা শেখ আবদুল্লার আত্মজীবনী থেকে বলছিলাম। মালব্যজীর প্রতিষ্ঠিত বানারসের বিরাট হিন্দু ইউনিভার্সিটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বহু দেশসহ বাংলাদেশের অনেকেই সেখানে পি,এইচ,ডি করছে। সেখানকার প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নিকট ইউনিভার্সিটির যে আইডেনটিটি কার্ড রয়েছে তাতে প্রথমেই মালব্যজীর মহানুভবতার পরিচয় রয়েছে। বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রধান ফটকের নিকটস্থ প্রধান সড়কের মাঝখানে তার প্রস্তর মূর্তি রয়েছে। সেই মূর্তি দেখে তাঁকে অত্যন্ত পূজনীয় ব্যক্তিবলেই মনে হয়েছে। কিন্তু সেই মানুষটির অন্তরেও যে এত ছুঁৎ মার্গের স্থান ছিলো তা তার মূর্তি দেখে কল্পনাও করা যায়না। এই ছিলো তখনকার দিনে উপ-মহাদেশের পরিবেশ।

এটা শুধু কায়েদে আজমের কথাই নয়, যারা ১৯৩০/৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতের মাটিতে জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের অনেকেই কমবেশী এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দু-একটি বাস্তব ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারলাম না।

ছোটবেলা রাস্তায় কানামাছি আমাদের ঢাকাইয়া কথায় চোর চোরানী খেলছি। আমাদের বাড়ীর পাশেই এক ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছিলেন এক বয়স্কা রমনী। আমার ধাক্কা বা ছোয়া লাগেনি, হয়তো ছায়া পরেছে, কিন্তু সে বলছে আমার কাপড় নাকি লেগেছে তার গায়ে, আমি হাফ প্যাণ্ট ও হাফসার্ট পরা ছিলাম কাপড় লাগার মতো কোন কারণ দেখলাম না। তবুও রমনী হাতের মিষ্টিগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়ে লোকজন নিয়ে আব্বার কাছ থেকে মিষ্টির ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করে নিল। আরেকটি ঘটনা হলো।

বৃন্দাবন নামে আমার এক সহপাঠী প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতো, মা তাকে এটা সেটা খেতে দিত। আদর করে ঘরে বসাতো। সে প্রায়ই তাদের বাসায় আমাকে যেতে বলতো। একদিন মামাবাড়ী থেকে ফেরার পথে তাদের ঘরে প্রবেশ করলাম। তারা তখন দুপুরের আহার করতে বসেছে। আমাকে প্রবেশ করতে দেখে বৃন্দাবনের মা চিৎকার করে নেড়ার বাচ্চা আরো কত কি গালাগাল দিয়ে সমস্ত ভাত, ডাল, মাছ, তরকারী সব রাস্তায় ফেলে দিলো আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাড়িয়ে রইলাম, সহপাঠী তার মার আচরণে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। কয়েক ফোটা চোখের অশ্রুজল ফেলে চলে আসলাম। এর কিছুকাল পরই পাকিস্তান রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। ভয়ে তারা পাড়া ছেড়ে অনত্র যেতনা। তখন সেই বৃন্দাবনের মাতাই আমাকে দিয়ে তাদের বাজার সওদাসহ খাদ্য দ্রব্য কিনিয়ে আনাতেন বাজার থেকে। কোথায় গেলো তার ছুঁৎ মার্গ?

আরেক দিন ঢাকায় রায়ট থাকায় ৪র্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা দানের জন্য নারায়ণগঞ্জ স্থিত চাষারা স্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়েছি সকল হিন্দু সহপাঠীর সঙ্গে। মাথায় তুর্কী টুপি পরিধান করতে ভুলিনি। তখন এ টুপি পরাকে মুসলিম ঐতিহ্য হিসেবে গর্ব অনুভব করতাম, পরীক্ষার মধ্যবর্তী সময়ে দুপুরের আহারের জন্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষক চাঁদ মোহন বাবুর সঙ্গে কালির বাজার গেলাম। নারায়ণগঞ্জ তখন হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল। মাষ্টার মশায় এক মোদকের দোকানে নিয়ে বসালেন। মোদক আমাকে দেখে হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, আমি কেন দোকানের ভিতর এসে বসেছি। (মুসলমানদের জন্য বাইরে আলাদা স্থান নির্দিষ্ট থাকতো প্রতি মিষ্টান্নর দোকানেই) দোকানীর গালাগাল আর তার ধমকে আমি কিছুটা ভয়ই পেয়ে গেলাম। কিন্তু মাষ্টার চাঁদ মোহন বাবু ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে। তিনিও রেগে আড়ি দিয়ে দাড়ালেন, ও যাবেনা এখানে বসেই খাবে, সেও মানুষ-মানুষের দাবী নিয়েই এখানে বসেছে। তাদের মধ্যে বাক বিতণ্ডা তুমুল চললো – অসংখ্য পথচারী (প্রায় সকলেই হিন্দু) জড়ো হয়ে গেলো দোকানের সামনে। আমি ভয়ে উঠে যেতে চাইলাম কিন্তু মাষ্টার মশায় আমাকে আদেশের সুরে বললেন, আমি যদি তোর শিক্ষাগুরু হয়ে থাকি তা হলে তুই এখানেই বসে থাকবি। অগত্যা দুরুদুরু বুকে চুপচাপ বসে থাকলাম দোকানের বেঞ্চে। মাষ্টার মশায় হার মানলেন না। অগত্যা মোদক সকলের সঙ্গে আমাকেও মিষ্টি পরিবেশন করলো পাতার ঠোঙ্গায়। কিন্তু পানি দিলো না। শেষ পর্যন্ত রাস্তার ধারে ড্রেনের উপর দুই আচল পাতলাম। বহু উচু থেকে পানি ঢাললো আমি সেই পানি আজলা পেতে পান করলাম। আজও মাষ্টার চাঁদ মোহন বাবু বেচেঁ আছেন, হুগলীতে থাকেন। এধরনের ঘটনাবলী আমার কচি মনকে ঠেলে দিয়েছিলো সাম্প্রদায়িকতার দিকে। এই পরিবেশে কায়েদে আজম ভারত বিভাগ করে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে ভুল করেননি। যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে আজ যারা আমাদের দেশে উক্ত ভুলের কারণে জিন্নাহ্‌র সমালোচনা করেন অন্য দিকে বাংলাদেশী যে সব প্রয়াত নেতৃবৃন্দের প্রসংশা করেন, তারাও কি ভুল করেননি? কেন না ঐসব নেতৃবৃন্দের সবাই তখন মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়ে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, সেনানায়ক হিসেবে ইংরেজ-কংগ্রেস আর অন্যান্য উগ্রপন্থী হিন্দু রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংগ্রাম করেছে। এদের মধ্যে

স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর, মানিক মিয়া আরো কত ছোট বড় নেতা ও বুদ্ধিজীবি রয়েছেন বিশেষ করে বর্তমান প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের বর্ষীয়ান নেতৃবর্গের মধ্যে।

বাংলার অধিকাংশ মানুষ তাকে "পাকিস্তানে একমাত্র উর্দূ ভাষাই রাষ্ট্র ভাষা হবে" রমনার এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই সমালোচনা করে থাকেন তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ, সহনশীল, রাজনীতিবিদ ছিলেন। বাংলার মানুষের মধ্যে তখনও প্রবলভাবে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ হয়নি। তিনি যদি আর কিছু দিন বেচেঁ থাকতেন তাহলে অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারতেন বাঙ্গালীদের প্রাণের ভাষা-বাংলা ভাষার দাবীকে। যেমন তিনি অতীতে ভারতবাসী মুসলমানদের অনেক ন্যায্য দাবীকে উপস্থাপিত না করে হিন্দু মুসলিম মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সচেষ্ট ছিলেন। অখণ্ড ভারত কায়েমের পক্ষেই কাজ করেছেন।

পাকিস্তান আন্দোলন যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে কায়েদে আজমের নেতৃত্ব তার ভূমিকাও ভুল নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সেও বেঁচে থাকবে অন্যান্যদের মতই। এভুল আমরা করলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবেনা, কারণ পাকিস্তান হয়েছিলো বলেই আমরা স্বাধীনভাবে একটি রাজ্য পরিচালনা করতে পারছি। তৎকারণেই কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে আমাদের মাঝে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ন্যায় স্মরণীয় করে রাখতে হবে।

স্বাধীনতার পর মহম্মদপুরের কায়েদে আজম রোডটির একটি অংশ সলিমুল্লাহ রোড নামকরণ হয়েছে। সলিমুল্লা সাহেব কুমিল্লার অধিবাসী ছিলেন। মহম্মদপুর থেকে ঠিকাদারী ব্যবসা করতেন। তার পুত্রগণ আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে অবাঙ্গালীগণ সলিমুল্লাকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী শাসনামলে তার পরিবার বর্গের আবেদন ক্রমে কায়েদে আজম রোডের একটি অংশ সলিমুল্লাহ রোড নামকরণ করা হয়।

মহম্মদপুরের একটি ছোট্ট অংশ আজও কায়েদে আজম রোড নাম ধারণ করে বৃটিশ যুগের মুসলিম আন্দোলনের সেই স্মৃতি বিজরিত দিনগুলোর কথা আর অকুতোভয় কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র তেজোদৃপ্ত কথা পথচারীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সড়কের স্মৃতি ফলক সরিয়ে ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া যায় না। ইতিহাস আপন মহিমায় স্থান করে নেয় দুনিয়ার বুকে, ইতিহাসের পাতায়।

মহম্মদপুরের রাস্তাগুলোর নাম দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত মুসলিম রাজন্যবর্গ এবং

বৃটিশ যুগের শেষ অধ্যায়ে ভারতীয় মুসলিম জাগরণের অগ্রদূতদের নামানুসারে রাখা হয়েছে। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে পাক আমলের কীর্তিমান লোকদের নামেও রাস্তার নামকরণ হয়েছে। যেমন আজম রোড, মাদানী রোড।

আজম রোডটি হয়েছে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রিয় গভর্ণর আজম খাঁনের নামানুসারে। আজম খাঁন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করে গেছেন। গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর পরিভ্রমণ করে মানুষের কল্যাণের চেষ্টা করেছেন। ছাত্র সমাজের সঙ্গেও তার বিরোধ ছিলো খুবই কম। এক কথায় অধিকাংশ লোকের প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। প্রেসিডেণ্ট আইউব খাঁনের শাসনামলে মহম্মদপুরের প্রথম যে পনরটি বাড়ী মোহাজেরদের জন্য বরাদ্দ করা হয় তা এ রোডেই হয়েছিলো। তখন গভর্ণর ছিলেন আজম খাঁন সে জন্যই এ রোডের নামকরণ হয় আজম রোড।

মাদানী রোডের নামকরণ হয় ঢাকা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের (ডি, আই, টি) প্রথম চেয়ারম্যান জনাব জি, এ, মাদানীর নামানুসারে। মাদানীর আমলেই ডি, আই, টি, ঢাকার মাষ্টার প্লান তৈরী করেন। যা আজও সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়নি বা নতুন মাষ্টার প্লান তৈরী হয়নি। তাঁকে নতুন ঢাকার স্থপতি বলা হতো। মাদানী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন। সরকারী মহলে প্রভাবও ছিলো প্রচুর। যেহেতু তিনিই মহম্মদপুর টাউনের স্থপতি সেজন্য তার নামানুসারেও একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়। যা আজও মাদানী রোড নামেই রয়েছে।

এখানে পেশোয়ারের হরিপুর অঞ্চলের শ্রী কোটের খ্যাতনামা হজরত হাফেজ ক্বারী আলহাজ্ব সৈয়দ তৈয়ব শা-এর একটি বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহ তৈয়ব প্রতি বছর ঈদে মিলাদুন্নবীর সময় এখানে আগমন করতেন। তার বেশ কিছু শিষ্য এখানে রয়েছেন। এদের মধ্যে এ এলাকার প্রবীণ প্রভাবশালী ও এলাকার সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম আলহাজ্ব চিনু মিয়া ছিলেন অন্যতম।

প্রাচীনকালে ঢাকা শহরে যে এলাকায় যে গোত্র বসবাস করতো তাদের নামানুসারেই এলাকার নামরকণ করা হতো। মোঘল বা মুসলিম শাসনামলে ঢাকায় বেশ কয়েকটি সুন্দর সুন্দর গার্ডেন বা বাগান ছিলো। যেমন শাহবাগ, বাগ-এ-শাহী, কাজীরবাগ, আমিনবাগ, হাজারীবাগ, বাগে-মুসা, বাগে-হোসেন উদ্দীন, নবাব-বাগিচা ইত্যাদি। এগুলো সাধারণত রক্ষণাবেক্ষণ করতেন সরকার, নবাব বা আমীর উমরাহগণ। এই সকল বাগের যত্ন নেওয়ার জন্যে বহু সংখ্যক মালী নিয়োজিত ছিলো। এরা আবার সংঘবদ্ধভাবে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করতো, যদিও

এসব এলাকায় বর্তমানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করছে। তবুও আগে থেকেই মালীরা বসবাস করতো বলে এগুলো আজও মালীটোলা ও মালীবাগ নামে পরিচিত হয়ে আসছে। ১৯২১ সালে পৌরসভা তৎকালীন সমাজসেবী ও পৌরসভার কমিশনার আবদুল আজিজ মাষ্টারের জন সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর নামানুসারে মালীবাগের (নবাবগঞ্জ এলাকার) নাম পরিবর্তন করে রাখেন আব্দুল আজিজ লেন।

আঃ আজিজ ছিলেন পরোপকারী সমাজহিতৈষী ও দেশ প্রেমিক এবং প্রকৃত রাজনীতিবিদ। তিনি আজীবন কংগ্রেসের আদর্শে অটল থেকে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি সব সময় সাদা লুঙ্গি খদ্দরের পাঞ্জাবী ও মাথায় গান্ধী টুপি পরিধান করতেন। ঢাকাবাসীর নিকট তিনি কংগ্রেস নেতা হিসেবেই সুপরিচিত ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি বহু গরীব দুঃস্থর উপকার সাধন করে গেছেন। ঢাকা পৌরসভার তদানিন্তন ৭নং ওয়ার্ডে (ঢাকা তখন ৭টি ওয়ার্ড বিভক্ত ছিলো) ১৫ বছর কাল পৌরকমিশনার পদে অধিষ্ঠিত থেকে জনগণের খেদমত ও এলাকার সম্ভবমত উন্নয়ন সাধন করে গেছেন। নবাববাগিচা মক্তবটি স্থাপনেও তিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। তাঁর নিজের অর্থ দিয়ে ইটবালু খরিদ করে মহল্লার মুসলিম পরিবার হতে মুষ্টি ভিক্ষার চাউল সংগ্রহ করে তদ্বারা রাজমিস্ত্রি খরচ সংকুলান করেছেন। মক্তবটি পরবর্তীতে নবাব বাগিচা পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। মক্তবটি অতি জীর্ণ হয়ে পড়লে আয়ুব শাসনামলে আমি ঢাকা পৌর সভার মাধ্যমে ভবনটির পুনঃ নির্মাণ করে দেই।

তাঁর আমলে এ মহল্লায় মুসলমানদের মধ্যে যে ৩/৪ জন লেখাপড়া জানতেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। মহল্লার অশিক্ষিত লোকের পত্রাদি লিখতে পড়াতে তারই শরনাপন্ন হতো। সে কারণেই মহল্লাবাসী তাকে মাষ্টার বলে সম্বোধন করতেন। আঃ আজিজ মাষ্টার একজন আদর্শ কংগ্রেস কর্মী হিসেবে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসনের জন্যে আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আর এ পথেই তিনি জীবন পাত করে গেছেন। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! যাদের বিশ্বাস করতেন তারাই তাঁকে অতি বৃদ্ধ বয়সে ছুরিকাঘাতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। সে সময় প্রায়ই ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হতো। তখন মুসলমানরা তাঁকে হিন্দু পাড়ায় যেতে বারণ করলে তিনি শান্ত কণ্ঠে বলতেন, তারা আমার কোন ক্ষতি করবেনা। তাঁর এ বিশ্বাস কোন কাজই দেয়নি। হত্যার পূর্বক্ষণে যখন তিনি শেখ সাহেব বাজার এলাকার দিকে সাদা লুঙ্গি সাদা খদ্দরের কুর্তা আর গান্ধী টুপি পরিধান করে মাথায় ছাতা ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখনও মুসলিম আধিবাসীরা অনেক বারণ

করেছিলো। কেননা ঐ মহল্লার অধিকাংশই হিন্দু মহাসভা পন্থী ছিলেন। তিনি কারো কথায় কর্ণপাত না করে এগিয়ে গেলেন শেখ সাহেব বাজার এল্যাকায়।

হিন্দু মহাসভা নেতা শান্তির ধারক সিভিল গার্ড এর কর্মকর্তা বাবু অনুকূলশীল এর বাড়ীর নিকট যেতেই আততায়ী তাঁর বক্ষে ছোরা আমুল বসিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আঃ আজিজের শ্বেত বসন লাল হতে চললো। হাতের ছাতা পড়ে গেল। টলতে টলতে অগ্রসর হতে লাগলো ভাঁট মসজিদের দিকে। বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলেন না। বর্তমান ডাঃ এ, কে, নূরুল ইসলামের লালবাগ রোডের সাবেক বাড়ীর নিকট এসে পড়ে গেলেন। সামান্য দূরে বসা ক'জন মুসলমান তার টলটলায়মান অবস্থা ও তার লাল বসন দেখে আতংকিত হয়ে এগিয়ে গেলো। তাদের চিৎকারে এল্যাকার মুসলমানরা এগিয়ে এলো। একমাত্র কন্যা পাগলীনি বেশে হাজির হলো মৃত্যু পথযাত্রী ভুলুণ্ঠিত পিতার শিয়রে। তখনকার সময় ঢাকায় রিকসা গাড়ী চালু হয়নি। অতি তাড়াতাড়ি তাকে ঘোড়া গাড়ী করে হাসপাতালে নেওয়া হলো। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। শবদেহ আনা হলো বাড়ীতে। ছুড়িকাঘাতে না মারলেও কিছুকালের মধ্যে এমনিতেই তাঁর মৃত্যু হতো। বার্ধক্যের দরুণ তিনি বহুকষ্টে পথ চলতেন কেঁপে কেঁপে। নিষ্ঠুর হত্যাকারী শুধু সাম্প্রদায়িকতার রুদ্ররোষে গান্ধীজীর অহিংস নীতির পরম পূজারীকেও রেহাই দিলো না। হত্যার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে আত্মীয় স্বজনসহ মুসলিম মহল্লাগুলো থেকে দলে দলে যুবা পুরুষ ছুটলেন হাসপাতালে, কেহ ছুটলেন তার বাস স্থানের দিকে। শোকের কালো ছায়া নেমে এলো ঘরে ঘরে। অনেক বিবেকবান হিন্দুও স্তম্ভিত হলো তাঁর হত্যাকাণ্ডে। তারাও শোক প্রকাশ করলো। দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে আশপাশের সকল মুসলিম মহল্লা হতে সর্ব শ্রেণীর মানুষ যোগদান করলো তাঁর শব মিছিলে। শেষ বারের মতো শ্রদ্ধা জানিয়ে দাফন করলো আজিমপুর কবর গাহে। শ্রদ্ধা সেই সব মুসলমানরাও জানালো যারা পৌরনির্বাচনে সামান্যকটি টাকার জন্য তাঁকে ভোট না দিয়ে ঢাকার অপর প্রান্ত তথা অন্য ওয়ার্ড থেকে আগত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করিয়ে পরাজয়ের শরাঘাত দিয়ে তাঁর বক্ষপিঞ্জর বিদীর্ণ করেছিলো। ১৫টি বছর নির্বাচিত পৌর কমিশনার হিসেবে আঃ আজিজ মাষ্টার নিঃস্বার্থভাবে এলাকাবাসীর খেদমত করেও ঐ সব লোভী ভোট দাতাদের জন্য তিনি পরাজিত হয়েছিলেন বংশালের মৌলভী আলাবক্স সরকারের কাছে। হিন্দু সম্প্রদায়ও তাই করে ছিলো নিজ এলাকার প্রার্থীকে জয়যুক্ত না করে সূত্রাপুর এলাকার সত্যেনদাস ওরফে সতু বাবুকে জিতিয়ে ছিলেন।

আমি তখন কিশোর। ভোট কাজে মামার সঙ্গে আলাবক্স সরকারের পক্ষেই কাজ করেছি। এলাকার কয়েকজন যোগ্য প্রার্থীর তরুণ যুবা প্রৌঢ় সব শ্রেণীর কর্মীদের আকুতি মিনতিকে পদদলিত করে যখন ভোটাররা ঢাকার অপর প্রান্তের প্রার্থীর পক্ষে রায় দিচ্ছিলেন আর মাত্র তিনটি করে টাকা নিয়ে খুশী মনে চা পান খেয়ে বাড়ী ফিরছিলেন তখন হতেই আমার মনে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে ওঠে। মামা আঃ কাইউম (মরহুম)কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ৭নং ওয়ার্ডে বেশ কয়েক জন যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্বেও সে কেন বাহিরের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছে? জবাবে শুধু ধমকই খেয়েছিলাম – "তুমি এসব বুঝবেনা" সেদিন এ এলাকার যোগ্য প্রার্থীদের পরাজয় শুধু আমার বুকেই জ্বালা ধরায়নি, ধরিয়েছিলো আরো কিছু তরুণ যুবার মনে। এরপর সোচ্চার হই এই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে। ফলে আর কোন দিন অন্য ওয়ার্ডের আগত প্রার্থী পৌর নির্বাচনে আমাদের এলাকা থেকে জয়যুক্ত হতে পারেনি। পরবর্তীতে তথা পাক আমলে প্রথম বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রথায় নির্বাচনে এই ৭নং ওয়ার্ডটিকে ৫টি ইউনিয়নে ভাগ করে লালবাগ ইউনিয়নবাসী সেই বিদ্রোহের অগ্নিশিখার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আমাকে তরুণ বয়সেই পৌর প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন ১৯৫৯ সালে। ১৯৯১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পৌর প্রতিনিধি হিসেবে এলাকাবাসীর সম্ভবমত কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত ছিলাম।

যাহোক শেষ বয়সে আঃ আজিজ মাষ্টার পরাজয়ের গ্লানি বহন করেও এলাকাবাসীর কল্যাণে আমৃত্যু বিমুখ হননি। তাই এলাকাবাসীর কাছে অমর হয়ে আছেন তাঁর কর্মফলের জন্য।

যে এলাকাটি তার নামানুসারে আঃ আজিজ লেন নামকরণ হয়েছে, সেটা পূর্বে মালীবাগ নামে অভিহিত হতো। এই মালীবাগে মুসলমান মালীরা বসবাস করতো। এ মহল্লার আশে পাশেই ছিলো নবাব রশিদ খাঁ কা বাগিচা, নবাব বাগিচা, বাগে হোসেন উদ্দিন ইত্যাদি মুসলিম শাসনামলে নবাব ও অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানগণ সুরুচি ও অভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে ফুলের বাগান রাখতেন। এ এলাকার মালীরা নবাবদের বাগ বাগানে ফুল পরিচর্যার কাজ করতো। পুরাতন ঢাকায় আরও মালীটোলা নামে মহল্লা থাকায় এখানকার মালীরা মালীবাগ নামে নিজেদের মহল্লার পরিচয় দেয়া আরম্ভ করে ফলে এ মহল্লাটি মালীবাগ নামে আজও পরিচিত।

নবাবদের বাগ-বাগিচা এ এলাকা হতে শেষ হয়ে গেলে তদস্থলে বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নিজ নিজ বাড়ীতে বা বাড়ী সংলগ্ন বাগান প্রতিষ্ঠা করে। সে সব বাগান হতে এবং বিভিন্ন বাড়ীতে বিচ্ছিন্নভাবে যারা ফুলের গাছ লাগাতো সেখান

হতে মালীরা মওশুমের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে ফুল সংগ্রহ করে চকবাজারে ও কোতয়ালীতে ফুলের তোড়া, গয়না, মালা, সেহরা ইত্যাদি বেচা-কেনা করতো। এখানকার মালীরা খুব ধর্মপরায়ন ছিলেন তজ্জন্য পূর্ব দিনে এ মহল্লাকে অনেকে বুজরুকে মালীবাগ বলেও আখ্যায়িত করতো। ফাতেহা দোয়াজ দাহাম তথা রসুলে করিমের জন্ম দিন উপলক্ষ্যে চক মসজিদের ইদাঁরার নিকট যে মৌলুদ প্রতিযোগিতা হতো, সেই প্রতিযোগিতায় এখানকার মালীরা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রাখতো। কোন এক বছর চুরিহাট্টাবাসী মৌলুদের দল এদের মৌলুদে ভুল তথ্য রয়েছে বলে চ্যালেঞ্জে প্রদান করলে এ নিয়ে আজিমপুর দায়রা শরীফে এক দরবার হয়। তাতে মৌলুদ এ সঠিক তথ্য রয়েছে বলে প্রমাণিত হলে চুরিহাট্টাবাসীদের মালীবাগের ৫০ জন মৌলুদ পাঠককে ভোজে আপ্যায়ন করতে হয়।

এ ছোট্ট মহল্লায় প্রথমে একটি মসজিদ ছিলো। আলাবক্স মহাজন নামে অন্য এক ব্যবসায়ী জেদের বশবর্তী হয়ে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ-এর ব্যবস্থা করেছিলো। এ মহল্লার শেষ সরদার লালমিয়া এখানকার পুরনো মসজিদের মুতওয়াল্লী ছিলেন। তিনি মহল্লার লাশ বহন করার জন্য দুটি খাট তৈরী করেছিলেন খুব সুন্দর কারুকার্য করে। খাটটি মসজিদে রেখে বলেছিলেন যার ভাগ্য ভালো হবে সেই প্রথমে এই খাটে চিরকালের জন্য যাত্রা করবে। আল্লার মহিমা কেউ জানতে পারেনা, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথমেই সরদার লালমিয়াকে পরপারে যেতে হয়, তারই তৈরী এই সুন্দর কারুকার্য খঁচিত খাটে।

বর্তমানে ফুলের চাষ কমে যাওয়ায় অন্যদিকে কাগজ ও প্লাষ্টিকের ফুলের চাহিদা হওয়ায় অনেক মালী তাদের পূর্ব পুরুষের ব্যবসা ত্যাগ করে অন্য ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়ায় অর্থাৎ ফুলের ব্যবসা ত্যাগ করলেও এলাকাটি আজও মালীবাগ নামেই সবার নিকট পরিচিত।

বংশাল ও মনর খাঁ বাজারের মধ্যস্থলে একটি আদি মহল্লা সুরিটোলা। এই সুরিটোলা নাম নিয়ে অনেক মতভেদ। অনেকের ধারণা মুসলমান শাসনামলে এ এলাকায় বসবাসকারী রাজকর্মচারীরা সুরা পান করতেন বলেই এখানকার নামকরণ হয় সুরিটোলা। আসলে সুরা বিক্রয় কারীদের বলা হয় শুঁড়ি। কিছু দিন পূর্বেও অনেক মদ্যপ শুঁড়িখানায় গিয়ে মদ পান করে আসতো। মনে হয় সুরি টোলায় বেশ কিছু সংখ্যক শুঁড়ির বাস ছিলো। কিংবা সুরা ব্যবসায়ের অনেকগুলো দোকান ছিলো সে জন্যই এ অঞ্চল সুরিটোলা নামে পরিচিত হয়। কিন্তু একথা সঠিক নয় বলে বিশিষ্ট সমাজ সেবী ও আইনজীবি ঢাকা পৌর সভার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জনাব

ইয়াকুব আলী পাকিস্তান আমলে এক মাসিক পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন, তাঁর মতে এ এলাকায় আশেপাশে পুরোনো মোঘলটুলিতে মুঘল সৈনিকদের ঘাটি বা আউট পোষ্ট ছিলো, মনর খাঁ বাজার-নাজিরা বাজার, প্রভৃতি স্থানে উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীগণ থাকতেন। তাদের দেহ রক্ষীদের বাসস্থান ছিলো সুরিটোলায়। যখনই কোন সংবাদ পেতেন দেহরক্ষীরা সোর করে অর্থাৎ হৈচৈ হাঁক ডাক করে সদল বলে বের হতেন। এই সোর করে বের হওয়ার জন্যে এবং সোরকারীরা এখানে বসবাস করতেন বলেই ঐ এলাকার নামকরণ হয়েছিলো সোরিটোলা। পরে এ নাম অপভ্রংশ হয়ে সুরিটোলা হয়েছে। আবার কারো কারো মতে শের শাহ সুরির সময় এখানে বেশ কিছু সংখ্যক সুরি-মতান্তরে এলাকায় যারা বল্লম অর্থাৎ সুর যারা চালাতো সে সব সেনারা এখানে বসবাস করতো বলে এখানকার নাম হয় সুরিটোলা।

পূর্বে এখানকার লোকেরা রাজ তামাকের ব্যবসা ও আতসবাজী তৈরী করতো। আজ তাদের সংখ্যা নেই বল্লেই চলে। সুরিটোলা মহল্লাটি এক সময় নরসিং হাজীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। নরসিং হাজী সুরিটোলায় একখানা সুন্দর পুকুর খনন করিয়ে ছিলেন। তজ্জন্য পুকুরটিকে নরসিং হাজীর পুকুর বলা হয়ে থাকে। নরসিং হাজী বংশালের ওহাবী আন্দোলনের খ্যতনামা নেতা ভূট্টো হাজীর ভাই, পুকুরের পাশেই এলাকার লোকজনেরা নিজেদের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৪০ সালে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে যা পরে পৌরসভার হস্তে ন্যাস্ত করা হয়। ১৯৪১ সালে জিন্নাহ্ ক্লাব নামে এখানে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এ ক্লাবের ভোলামিয়া ওরফে সামসুদ্দিনের ব্যাঙ্গচিত্র ঢাকাবাসী মুসলমানদের মনে উৎসাহ জাগরিত করতো এবং কংগ্রেসের মুখোস খুলে দিতো।

বর্তমানে দোলাই খালের উপর নুতন সড়ক নির্মিত হওয়ায় (নর্থ সাউথ রোড) সুরিটোলা দু'ভাগে পড়ে গেছে তবে প্রধান অংশ সড়কের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই সড়ক নির্মিত কালে উপরোক্ত স্কুলটি ভেঙ্গে ফেলতে হয়। পুকুরটিকেও ছোট করতে হয়। পুকুরটির একাংশে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আদেশে ঢাকা পৌর কর্পোরেশন নুতন স্কুল ভবন নির্মাণ করে দেন এবং স্কুলটি এখন প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়েছে। বেশ কিছুকাল পূর্বে সুরিটোলার নাম পরিবর্তন করে লুৎফর রহমান লেন নামকরণ করেন ঢাকা পৌরসভা। লুৎফর রহমান এক সময় ঢাকা পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সুরিটোলা মহল্লার পশ্চিমাংশ সুবেদার ঘাট নামে পরিচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে এখানে মুঘল আমলে সামরিক বাহিনীর লোকজনের বাসস্থান ছিলো, হয়তো এদের

মধ্যকার কোন মহানুভব সুবেদার খালের পারে একটি ঘাট নির্মাণ করে দিয়ে ছিলেন, নিজের বা এলাকাবাসীর সাহায্যে। সামরিক বাহিনীর পরিবার ও এলাকাবাসীর গোসল ও প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করার জন্য। সুবেদারের পূর্ণ পরিচয় কেউ বলতে পারেনা। উল্লেখ থাকে এ মহল্লার নিকটে দোলাই খাল প্রবাহিত ছিলো এবং তার শাখা-প্রশাখাও বিস্তৃত ছিলো। তৎকালের সব খাল-নালা নর্দমা ভরাট হলেও ঢাকা পৌর সভার রেকর্ডে সুবেদার ঘাটের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। সুবেদার ঘাট এলাকাটি পানগাও এর জমিদারদের বলে জানা যায়। আজ সুবেদার ঘাটের নাম মহল্লাবাসী ব্যতীত ঢাকার অন্যান্য এলাকার লোকজন ভুলেই গেছে। এ মহল্লার পার্শ্ববর্তী লোকেরা পরবর্তীতে এখানে মাটির ঘর অত্যাধিক থাকায় মহল্লাটিকে মাইটা দুয়ার বলে আখ্যায়িত করতো। এখন মাটির ঘরও নেই আর মাইটা দুয়ারের নাম পরিচয়ও নেই। সুরিটোলার উত্তরে পুরনো ডাম্পীং ডিপোর নিকট কতক চর্মকারের বাসস্থান ছিলো বলে ঐটুকু স্থানকে স্থানীয়ভাবে চামার টুলি বলা হয়। ঢাকায় চামার টুলি নামে বেশ কয়েকটি এলাকা অভিহিত হতো। এখনও হয়।

ওসমান গনী রোডটি কয়েকটি ঐতিহাসিক মহল্লার অংশ নিয়ে নামকরণ হয় বৃটিশ যুগের শেষ দিকে। এর পূর্ব নাম মনোয়ার খাঁন রোড। যখন হাজী ওসমান গনীর পুত্র হাজী শরীফ হোসেন ঢাকা পৌর সভার কমিশনার ছিলেন, তখন তারই আবেদন ক্রমে পৌর সভা এ সড়কটির নামকরণ করেন কিছু অর্থের বিনিময়ে হাজী ওসমান গনী রোড। ঢাকা পৌর সভা সে সময় ঐতিহাসিক মানোয়ার খাঁ রোড নাম পরিবর্তন করে ভুল করে ছিলো কিনা জানি না তবে আজও পৌরকর্পোরেশন মাঝে মধ্যে তুচ্ছ রাজনৈতিক কারণে আবেগের অতিশয্যে অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম পরিবর্তন করে ফেলেন– সমাজে অবদানহীন ব্যক্তি বিশেষের নামে। হাজী ওসমান গনী একজন চামড়া ও কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিলো বংশাল ও মালীটোলার সংযোগ স্থলে। তিনি ওহাবী মতবাদী ও এতদঞ্চলের একজন মাতবর ব্যক্তি ছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে কয়েকটি ঐতিহাসিক মহল্লা ও মহল্লার অংশ বিশেষ নিয়ে এ রোডটির নামকরণ হয়। তন্মধ্যে বাংলার বার ভুঁইয়াদের অন্যতম ঈশা খাঁর পৌত্রের প্রৌত্র বীর যোদ্ধা মুনাওয়ার খাঁর নামানুসারে মনর খাঁ বাজার, আল্লাইয়ার খাঁর নামানুসারে আল্লুর বাজার ও আজিরা বাজার এবং সিদ্দিক বাজারের একাংশ। এখানে এককালে মুনাওয়ার খাঁ ও আল্লাইয়ার খাঁ বাজার স্থাপন করেছিলেন যেগুলো পরবর্তীতে শঙ্খ নিধি বাজার নামে কিছু দিন পরিচিত ছিলো। জমিদার রজনী কান্ত পালের জিত্তর বাজার (রজনীকান্ত পাল নিঃসন্তান ছিলেন এবং

তাঁর বাসভবন ছিলো নবাবপুর রোডে আজ যেখানে আরজু হোটেল অবস্থিত) বর্তমানে ঢাকা হোটেল যেখানে স্থাপিত সেখানেই এসব বাজার ছিলো তবে আল্লাইয়ার খাঁন প্রতিষ্ঠিত বাজারটি আরো পশ্চিমে ছিলো বলে ধারণা করা হয়।

আল্লাইয়ার খাঁনের প্রতিষ্ঠিত বাজারটির নাম পরবর্তীকালে বিকৃত হয়ে আল্লুর বাজার নামে পরিচিত হয়। আর বাজারের আশ পাশের বসতি আল্লুর বাজার মহল্লা নামে অভিহিত হয়ে পড়ে। এ মহল্লায় বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে বাদক দলের আগমন ঘটে। এই বাদক দল ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীতে বহুকাল ধরে একক প্রধান্য বিস্তার করে রেখেছিলো। বাদক দলের প্রয়োজন হলে আল্লুর বাজার যেতেই হতো। আজ হয়তো অন্যান্য মহল্লায় বাদক দল দেখা যায়। তবে আল্লুর বাজার মহল্লার বাদক দলই ঢাকার আদি বাদক দল। এদের প্রথম আগমনকারী তথা পূর্ব পুরুষের নাম যতদূর জানা যায় রহতম খাঁ বাজাওয়ালা। এ মহল্লায় আজ যে মসজিদটিকে আল্লুর বাজার ছোট মসজিদ বলা হয় সেটা দুশো বছর পূর্বে মুঘল সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসার ফতে মহম্মদ খাঁ নির্মাণ করে গেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু শিলা লিপি অনুসারে শেখ জান মহম্মদ বিন জুনাইদ নাম রয়েছে। এখানকার বায়তুল বারী ভবনের মালিক মৌলভী আঃ বারী ফার্সীর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তৎপুত্র ডঃ আব্দুল আলিম প্রফেসার হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট হিস্ট্রি। তার কাছ থেকে শোনা গেছে একদা ঈদের জামায়াত মহল্লার বড় লোকদের জন্যে অপেক্ষা করা হয়নি বলে ১৯৫৩ সালে এ মহল্লার নুতন বড় মসজিদটি নির্মাণ করা হয়।

সিদ্দিক বাজার ও মনর খাঁ বাজারের সংযোগ স্থলে যে দ্বিতল মসজিদটি আজ সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ নামে পরিচিত সেটি মুনাওয়ার খাঁ প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে নির্মাণ করেছিলেন বিধায় মসজিদটি তার নামেই বহুকাল ধরে পরিচিত রয়েছে। আজও ঢাকাবাসী অনেকেই মনর খাঁ মসজিদ নামে অভিহিত করে। কি কারণে মহল্লাবাসী ঐতিহাসিক মুনাওয়ার খাঁ মসজিদের নাম পরিবর্তন করলেন জানিনা। তবে তা মুনাওয়ার খাঁন রোড-এর পরিবর্তে যেমন হাজী ওসমান গনী রোড হয়েছে তেমনি এটাও সাধারণভাবে মহল্লাবাসী করে নিয়েছে বলে ধারণা করছি। এখানেও ইতিহাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলেই মনে করি। যাই হোক মসজিদটি আজও মুনাওয়ার খাঁর শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইসলাম খাঁনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন নৌ-বাহিনীর সিপাহ শালার মাসুম খাঁ ও তৎপুত্র মুনাওয়ার খাঁন। পিতা পুত্রের মিলিত শক্তির পরিচয় পেয়ে ইসলাম খাঁ প্রীত হয়েছিলেন। সেই থেকে মুঘল সুবেদারের দরবারে পিতা-পুত্রের আধিপত্য চলতে

থাকে। পিতার মৃত্যুর পর নওয়ারার সিপাহশালার নিযুক্ত হন মুনাওয়ার খাঁন। মুনাওয়ার খাঁন শক্তিমান যুবা ও সুপুরুষ ছিলেন। মনোয়ার খাঁনের সঙ্গে তৎকালীন ঢাকার নবাব আমীর আলীর ছিলো এক মধুর সম্পর্ক। মনোয়ারের পিতা মাসুম খাঁন নবাব আমীর আলীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বহু দূর্বার অভিযানের যোগ্যতম সাথী। নবাব আমীর আলীর এক অপরূপ কন্যা ছিলো নাম তার সোনাই। কাঞ্চা সোনার মতই ছিলো তার রং সোনাইর অন্যতম ও প্রিয় বান্ধবী ছিলো চট্টগ্রামের মুঘল ফৌজদার মুকুট রায়ের কন্যালক্ষ্মী। মুকুট রায় সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ছিলেন।

নবাব আমীর আলীর পরিবারের সঙ্গে মনোয়ার খাঁনের যত ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলে অন্য দিকে সোনাই আর মনোয়ার খাঁর মধ্যে প্রেমের বন্ধনও বেড়ে চলে। দুজনার মধ্যে গড়ে ওঠে এক নিষ্পাপ ভালবাসা। একদিন তাদের গোপন মিলন ধরা পড়লো নবাব আমীর আলীর চোখে। বন্ধ করে দেওয়া হলো মনোয়ারের অবাধ আসা-যাওয়া আর মেলা-মেশা। মনোয়ার খাঁ মসনদে আলী ঈসা খাঁর বংশধর তাঁর ধমনিতে ঈশা খাঁর রক্ত প্রবাহিত। অত সহজে পিছটান দেওয়ার পাত্র সে নয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন স্বয়ং শাহজাদা সুজা। বিবাহের তারিখ ঠিক হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনোয়ার খাঁন সোনাইর অনুরোধে তুলে নিয়ে গেলেন জঙ্গল বাড়ীতে। শুরু হলো শাহ সুজার সঙ্গে প্রেম নিয়ে দ্বন্দ্ব, রেষারেষি। শাহজাদার প্রতিহিংসা আর রুদ্র রোষের কোপানলে পড়লেন মনোয়ার খাঁন। শাহজাদা সুজা নদীর বুকে বজরায় শায়ের কালে এক নজর দেখে ছিলেন সোনাইকে। তখনই শাহজাদার দিল যখম হয়ে ছিলো সোনাইর রূপে। তাঁকে পাবার আকাংখা সে সময় থেকেই তার মনে প্রকট হয়ে উঠেছিলো।

মুঘল সম্রাট একদিন মনোয়ার খাঁর বংশধর থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলো, আজ তাঁর হৃদয়ের সিংহাসন ছিনিয়ে নিতে এগিয়ে এসেছে শাহজাদা সুজা। একদিন মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ছিলো তারই বংশধর মসনদে আলী ঈশা খাঁ। আজ তাঁর হৃদয়ের সিংহাসন রক্ষা করতে প্রয়োজন বোধে সেও অস্ত্র ধারণ করবে মুঘল শাহজাদা সুজার বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। অভিযানে অংশ নিলেন স্বয়ং শাহ সুজা। রক্তক্ষয় এড়াবার উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে সোনাইকে জঙ্গল বাড়ী রেখে অজানার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করে চললেন মনোয়ার খাঁন। পিছু ধরলেন শাহ সুজা।

সোনাইর ভালবাসা মনোয়ার খাঁকে ভীরু ও কাপুরুষ বানিয়ে দিলো। পালিয়ে বেড়াতে লাগলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। যার ভয়ে মানুষ তটস্থ থাকতো শাহী

ফৌজ পথ ছেড়ে দাড়াতো। সোনাইর ভালবাসায় আজ তার এ দুরাবস্থা শাহজাদা কিছুতেই তার পিছু ছাড়লেন না। অবশেষে শ্যামল দ্বীপ-সন্দ্বীপের কুলে উঠে আশ্রয়ের সন্ধানে সামনে এগুতে লাগলেন। নিরুপায় হয়ে এক পুরোন মসজিদের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে মসজিদের দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন। শাহ সুজা দেখছিলেন তাঁর প্রেম প্রতিদ্বন্দ্বীর এই আত্মগোপন। তিনি খোদার ঘরে আক্রমন চালাতে রাজী হলেন না তবে ঘিরে ফেললেন মসজিদটিকে। ক'দিন থাকতে পারবে অনাহারে অনিদ্রায় বাহাদুর মনোয়ার খাঁ। একদিন তাকে বের হতেই হবে, আত্মসমর্পন করতেই হবে। কিন্তু দিন যেতে থাকে মনোয়ার খাঁ বের হচ্ছেন না দেখে শাহজাদা ভাবলেন হয়তো না খেয়ে মারা গেছেন অথবা গুপ্ত কোন পথ দিয়ে পালিয়ে গেছেন। শাহজাদা অবশেষে মসজিদের দরজায় করাঘাত করলেন। দরজা খুলে বের হলেন এক কংকাল সার মানুষ খোলা তলোয়ার হাতে। শাহজাদা মুগ্ধ হলেন মনোয়ার খাঁনের সৌর্য্যবীর্য আর প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা দেখে। হাতের তরবারি ফেলে দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন সত্যিকারের প্রেম পূজারীকে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আবার পরিণত হলো বন্ধুত্বে। প্রেমের জয় হলো, শান শওকত আর অহংকারের পরাজয় হলো। ফিরে এলো সবাই জঙ্গল বাড়ীতে। সোনাই পেলো তার প্রিয় জনকে। আর পর্দার অন্তরাল থেকে মনোয়ারের আরেক প্রেম পিয়াসী সোনাইর প্রিয় সখী লক্ষ্মী যে বিফল মনোরথ হয়ে প্রতি হিংসা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলো। তা ভেঙ্গে গেলো।

এখানে উল্লেখ্য সোনাইকে যখন তার পিতা গৃহবন্দী করে রেখেছিলো। তখন লক্ষ্মীর মাধ্যমেই মনোয়ার খাঁনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। সে সময় থেকেই লক্ষ্মী মনে মনে মনোয়ার খাঁনকে ভালবেসে ছিলো। মনোয়ার খাঁ জানতে পেরে তার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করায় সে মনে মনে প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে সোনাই ও মনোয়ার খাঁনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলো। ফৌজদার লালা রাজমলকে দিয়ে।

লালা রাজমল পূর্ব হতেই মনোয়ার খাঁনের প্রতি বিরুপ ছিলো। সোনাইর বার্তা বহন কালে একদিন শয়তান লালা রাজমলের হাত থেকে এই লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিলো মনোয়ার খাঁ। সে থেকেই লালা রাজমল প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। ওদের হত্যা করতে গিয়ে লালা রাজমল নিজেই নিহত হলো মনোয়ার খাঁনের এক বিশ্বস্ত নায়েব গুজরান আলীর হাতে। এ এক লম্বা কাহিনী এ কাহিনী বর্ণনা করলে এর কলেবর অনেক পরিবর্দ্ধিত হবে।

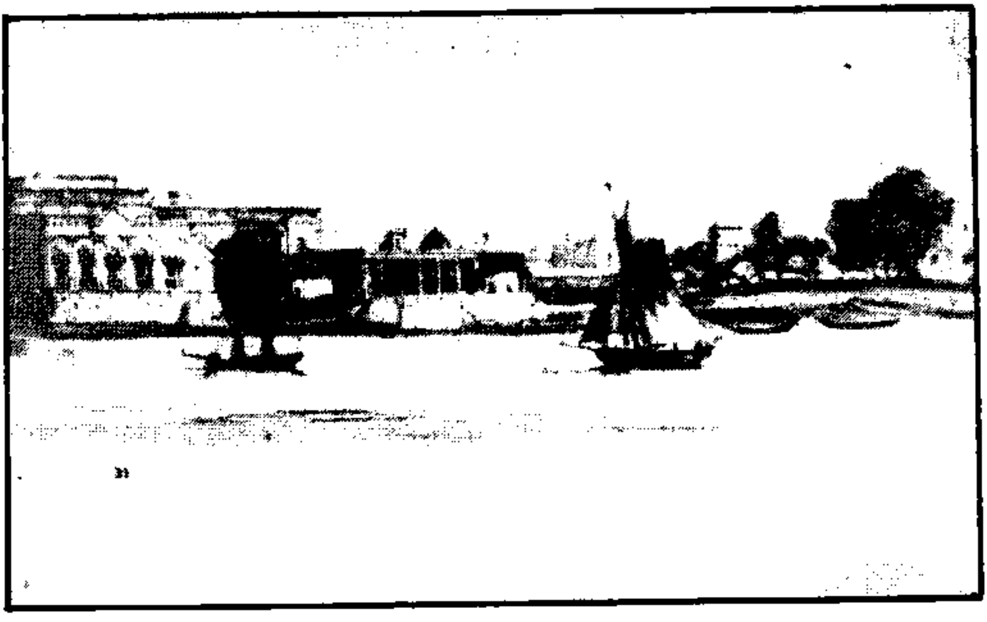
সর্বশেষে একথা বলতে চাই মনোয়ার খাঁন রোড এর নাম পরিবর্তন হলেও

ঢাকাবাসী আজও ঐ অঞ্চলটিকে মনর খাঁ বাজার এবং পশ্চিম অংশটুকুকে আল্লুর বাজার বলেই পরিচিত দান করে থাকে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শেষ আমলে জাফর খাঁর পৌত্র আল্লাইয়ার খাঁ লালবাগ দূর্গে অবস্থান করতেন। তার নামানুসারে আল্লাইয়ার বাজার স্থাপিত হয় এবং তিনিই এই বাজারের মালিক ছিলেন। পরবর্তীকালে নামটি বিকৃত হয়ে আল্লুর বাজার নামে পরিচিত হয়েছে।

বর্তমান কায়েতটুলির শুদ্ধ নাম কায়েস্থটুলি। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহের আমলে এখানে বহু কায়স্থ হিন্দু পরিবার বাস করতেন। তাদের অনেকেই ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। এ জন্যে তাঁরা রাজ কার্যে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তাদের অনেকে দেওয়ান পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কায়েস্থদের পারিবারিক পরিচয়ের নামানুসারে ঐ অঞ্চলটি কায়েস্থটুলি নামে পরিচিত ছিলো। পরবর্তীকালে কায়েস্থটুলি শব্দটি উচ্চারণের পরিবর্তন রূপ কায়েৎটুলি নামে এই অঞ্চলটি পরিচিত হয়ে আসছে। কায়েৎটুলিতে ডাঃ হর্ষনাথ সেনের বাসভবন ছিলো। তিনি পরোপকারী ও জনদরদী ছিলেন। তার ফি ছিলো মাত্র দু'টাকা, গরীব দুঃস্থ রোগীদের হতে সে ফিও নিতেন না। ডাক্তারের বাড়ীতে তার পিতার একটি সুন্দর স্মৃতি সৌধ ছিলো। যা আজও আছে। এ মহল্লার একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে দু'ভাই থাকতেন তন্মধ্যে একজন উইলিয়ম খাঁ বাজাওয়ালা নামে পরিচিত ছিলো। তখনকার ঢাকায় তিনি খ্যাতিমান ক্লারিওনেট বাদক ছিলেন।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঢাকা শহরে যে কজন বিত্তবান ব্যক্তি স্বনামধন্য হয়ে ওঠেন তাদের মধ্যে নবাব ইউসুফ জানের নাম সমধিক পরিচিত। তিনি দানশীল, পরোপকারী ও মানবদরদী ব্যক্তি ছিলেন। এজন্যে তিনি দু'দফা ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন এবং বেশ কয়েক বছর তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ঢাকা শহরের উন্নতির জন্যে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তারই চেষ্টায় ১৯১৩ সালে প্রথম পাবলিক মার্কেট বা সাধারণ বাজার নির্মিত হয়। এই বাজারটি নকশা তৈরী করেছিলেন ইংরেজ স্থাপত্য শিল্পী মিঃ মুলিংস। এই বাজার তৈরীর প্রাথমিক খরচ ধরা হয়েছিলো এক লাখ বিশ হাজার টাকা। সেটা আজ নবাব ইউসুফ মার্কেট নামে পরিচিত এবং এই মার্কেটটি তারই নামের মহিমা বহন করে আসছে। বর্তমানে সেখানে ঢাকা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট একটি আধুনিক দ্বিতল মার্কেট নির্মাণ করেছেন। ১৯১২ সালে ঢাকা শহরে নবাব ইউসুফই সর্বপ্রথম সুয়্যারেজ লাইন স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এজন্যে ঢাকার ইতিহাসে তার নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি যে এলাকায় বাজারটি স্থাপন করেন সেটি বর্তমানে নবাব ইউসুফ রোড নামে পরিচিত।

আরমানীটোলা বা আরমেনিয়ান স্ট্রীটটি মুসলিম শাসনামলে মহল্লা আলে আবু সাঈদ নামে পরিচিত ছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরমানীটোলায় আরমেনিয়ানদের চার্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পর্যটক তাভানিয়ার ধোলাইখালের সন্নিকটে যে গীর্জার কথা উল্লেখ করে গেছেন তা আরমানীটোলার গীর্জাটিকেই বলে মনে হয়। চলতি শতকের প্রথম দিকে আরমেনিয়ানগণ তেজগাঁও এলাকায় বসবাসের জন্যে একটি কলোনী স্থাপন করেন। আরমেনিয়ানদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জমিদার শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাছাড়া জি. সি পগোজ নামে এক বিশিষ্ট আরমেনিয়ান জমিদার ঢাকা পৌরসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর নামানুসারে তারই নিজস্ব খরচে পগোজ স্কুল স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ঢাকায় প্রধানতঃ ধনী ব্যক্তিদের সহায়তায় ২৯টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিলো। পরে ধীরে ধীরে কমে যায়। ষাটের দশকে যে তিনটি ইংরেজী স্কুলের নাম জানা যায় তন্মধ্যে নর্মাল স্কুল (এটি পরে ট্রেনিং কলেজ নামে পরিচিত) পগোজ স্কুল, খাজা আঃ গনীর ফ্রি স্কুল এটি আহসান মঞ্জিলের কাছেই ছিলো। আরমানিয়ানগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পাট ব্যবসায়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো। অবশ্যি ঢাকার সামাজিক জীবনেও তাদের খ্যাতি কোন অংশেই কম ছিলোনা। ১৮৩৮ সালে ঢাকা শহরে ৪০টি আরমেনিয় ও ৩১২টি গ্রীক পরিবার ছিলো। বিভিন্ন দেশের বংশোদ্ভূত খৃষ্টানাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ৩০৪ জন।



১৮৪০ সালে ঢাকার নদীতীরস্থ মিঃ পগোজের বাসগৃহ

সূত্রাপুরের ডাল বাজারে আরমেনিয়ান জমিদার আরাতুন বাস করতেন। ১৯৩৮ সালে তৎকালীন পৌর কমিশনার বীরেন্দ্র বোসের নামানুসারে আরমানীটোলার নাম পরিবর্তনের জোর চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু প্রতিবাদের মুখে টিকতে না পেরে পৌরসভা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং তৎপরিবর্তে মিটফোর্ড রোডের মোঘলটুলি এলাকাটির নাম পরিবর্তন করে বীরেন বোস স্ট্রীট নাম রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অথচ এই মোঘলটুলি এলাকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গা। সেখানে মোঘল শাসনামলে বাংলার প্রথম সুবেদার ইসলাম খাঁ বাদামতলি ঘাটের নিকটে অবতরণ করেন। তিনি এই এলাকায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এবং তারই পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে বেশ কিছু অঞ্চলে অন্যান্য মোঘল কর্মকর্তারা বসবাস করতেন। ধীরে ধীরে সেই এলাকাটির নাম মোঘলটুলি নামে সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠে।

মোঘলটুলির নাম পরিবর্তন করে বীরেন বোস স্ট্রীট নামকরণে জনগণ পৌরসভার নিকট সিদ্ধান্ত বাতিলের জোর দাবি জানিয়ে আসছিলো। অবশেষে জনগণের রায়ের কাছে নতিস্বীকার করে পৌরসভা ১৯৫৪ সালে মোঘলটুলি পূর্ব নাম বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় এ রোডের অনেক হোল্ডিং আজও বীরেন বোস স্ট্রীট নামে পৌর রেকর্ডে লিপিবদ্ধ।

নবাব ইসলাম খাঁ চিশতির নামানুসারে ইসলামপুর রাখা হয়। এই এলকায় ১৬১০ সালে নবাব ইসলাম খাঁ নদীপথে নৌকাযোগে অবতরণ করেছিলেন। সেখানে (আশেক লেনে) আজও ইসলাম খাঁর তৈরী একটা মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি সাদা সিধে। নির্মাণকালে স্থাপত্য কারু অপেক্ষা এর স্থায়িত্বের দিকেই বেশী নজর দেয়া হয়েছিলো। বর্তমানে মসজিদটির সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা হয়েছে। নবাব ইসলাম খাঁর শিকারে খুব ঝোঁক ছিলো। তিনি ভাওয়ালের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। নবাব ইসলাম খাঁ চিশতির ইন্তেকালের পর তার লাশ বর্তমান হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে দাফন করা হয় পরে তাঁর কফিন বাক্সে করে ফতেপুর সিক্রিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার সমাধির উপর সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে দেন।

ইসলামপুরে জিন্দাবাহারের কাছে গম্বুজওয়ালা একটা মোকাম রয়েছে। এ ধরনের মোকাম ঢাকায় আগে বেশ দেখা যেতো। এসব মোকামে মহররমের সময় হযরত ইমাম হোসেনের নামে বহু কিছু মানত মানা হতো এবং শিরনি বিতরণ করা হতো। এসব মোকামের মাথায় উড়তো লাল সবুজ ঝাণ্ডা। অবশ্যি বিহার থেকে

আগত মুসলমান বস্তিগুলোতেই এসব বেশী দেখা যেতো। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মাজার শরীফকে মোকাম বলা হয়। কিন্তু ঢাকার এসব মোকামে কোন কবর ছিলো না।

ইসলামপুর এলাকাটি পূর্বে ব্যবসা কেন্দ্র ছিলো। কিছুকাল পূর্বে ফলের প্রধান ব্যবসা ইসলামপুরেই ছিলো। তজ্জন্য ঐ অংশটিকে আজও প্রবীণ ব্যক্তিগণ আমপট্টি বলে অভিহিত করেন। বর্তমানে পুরো ইসলামপুর এলাকাটি পাইকারী কাপড়ের ব্যবসা কেন্দ্র হয়ে পড়েছে। এই পাইকারী কাপড় ব্যবসা সাধারণতঃ দালাল মাধ্যমে সমাধা হয়ে থাকে। বস্ত্র ব্যবসায়ে দালাল নিয়োগ কোম্পানী আমল তথা ১৭৭৩ সাল হতে শুরু হয়। যা আজও চলে আসছে। এখানে একটি ক্যাথলিক গির্জা রয়েছে। বর্তমানে এটিতে প্রার্থনা পর্বের সঙ্গে আর্থসামাজিক কর্মসূচী চালু রয়েছে। ফলে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এখানে সাধারণ মহিলারা আগমন করে থাকে।

ঢাকা নগরীর ইসলামপুর এলাকা একটি ঐতিহাসিক স্থান। এস্থানের বহু ব্যক্তি ঢাকা তথা বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ইতিহাস সৃষ্টিও করেছেন তাঁরা। আবার অনেকে কিংবদন্তীর সমাহারও দিয়ে গেছেন। এসব কথা এক সাথে লেখা যেমন সম্ভব নয় তেমনি বলাও অসম্ভব। ইসলামপুরের মধ্যবর্তী এলাকার ঐতিহাসিক পতুগীর্জ গীর্জা সংলগ্ন এক দন্ত-চিকিৎসকের কথা বলবো। "দন্ত-চিকিৎসক" নামটা শোনামাত্রই অনেকের বুকের ভিতরটায় হাতুড়ির ঘা মারলে যেমন শব্দ হয় তেমনি আওয়াজ ওঠে। তার উপর চিকিৎসক যদি পুরো মাত্রায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত না হয়ে থাকেন, তাহলে তো বুঝতেই পারছেন, রোগীর গানের সুর সা-রে-গা-মা.... আওয়াজ কতো উচ্চস্বরে হতে পারে। নাম ডেন্টিস্ট এম, আখতার। তবে, সাইনবোর্ডে মস্তবড় করে ইংরেজীতে নামের সঙ্গে আরো লিখা ছিলো। "এসিসটেণ্ড অফ ওয়ার্ল্ড রিনাউণ্ড ডেন্টিস্ট ডাঃ আর, আহমদ" তার প্রতিষ্ঠিত দন্ত-চিকিৎসাখানাটি এখনও তারই নামানুসারে চলছে। ডাঃ এম, আখতার ১ম মহাযুদ্ধে সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে দিল্লী থেকে দন্ত চিকিৎসার কাজ শিখেছিলেন তাছাড়া, ১৯৪৭ সালে বেঙ্গল ডেন্টাল বোর্ড থেকেও চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃতিপত্র পেয়েছিলেন।

তৎকালে ঢাকা শহরে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত দন্ত-চিকিৎসক খুব কম ছিলো। বিশেষ করে ইসলামপুর এলাকার আশেপাশে সবেধন নিলমণি আখতার মিয়া ছাড়া আর কেহ ছিলোই না। ডাঃ আখতার মিয়ার দন্ত তোলার মুহূর্তটিতে যখন রোগীর হাতদুটি পেছন দিকে নিয়ে শক্ত সামর্থ যুবক জাপটে ধরে রাখতো, আর কাকড়ার ঠ্যাং-এর মতো সাড়াশী দিয়ে ডাক্তার তার নিজের দাঁত খিচিয়ে রোগীর মাড়ির দাঁত ধরে

টানাটানি করে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করতো, রোগীর তখনকার বিকট চিৎকার আর সেই সঙ্গে ডাক্তারের বামা-কণ্ঠ পথচারিদের হতচকিত করে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দিতো। পেশার খাতিরে আশুরিক শক্তির প্রয়োগ বলেন, আর জল্লাদের ভূমিকা যাই বলেন-আখতার মিয়ার বুকটা ছিলো কোমলতায় ভরা, যদিও বুকটা অন্যদের তুলনায় অনেক প্রশস্থ ছিলো। মনটাও ছিলো বেশ উদার। বিপদে-আপদে পাড়া-পড়শীদের পাশে দাঁড়াতেন নিজের জীবন বিপন্ন করেও। এমনি একদিনের ঘটনা। তার দোকানের নিকটস্থ জাব্বু খানম মসজিদের নীচতলায় বাজিকর ঝুল্লু মিয়ার দোকান তুবড়িতে (ঢাকাইয়া কথায় তুমড়ি) বারুদ ঠাসার সময় আকস্মিকভাবে আগুন ধরে দোকানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। আশপাশের দোকান ও বাড়ীঘরের জানালা-কপাট এমনকি পুরু দেয়াল পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠে। পোড়া বারুদের উৎকট গন্ধ আর ভূষো-কালো ধোঁয়ায় আশপাশ ছেয়ে ফেলেছে। শুধু মসজিদের মিনারের সাদা গম্বুজটি দেখা যাচ্ছে। বাজিকর আহত হয়ে দোকানের ভেতরেই আটকা পড়েছিলো। আশপাশের লোকেরা বালতি বালতি পানি ঢেলেও আগুন কিম্বা বাজি বিস্ফোরণ লাঘব করতে পারছেনা। তৎকালে আজকের মতো আগুন নেভানোর ফায়ার সার্ভিস বা আটকেপড়া লোকদের উদ্ধার করার মতো রেসকিউ-পার্টি ছিলো না। এই ঘোরতর বিপদকালে আখতার মিয়া দোকান থেকে উল্কার মতো ছুটে এসে নিজের জীবনের কথা চিন্তা না করে হঠাৎ একলাফে জ্বলন্ত ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন দোকানের ভেতর প্রবেশ করে আহত ঝুল্লুর মিয়াকে দুহাতে ধরে বের করে এনে ঘোড়াগাড়ী করে তৎক্ষণাৎ মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরূপ দুঃসাহসিক কাণ্ডের আরো দু'একটি কাহিনী না বলে পারছি না।

আখতার মিয়ার শরীর অনুপাতে মাথাটা ছিলো অত্যাধিক ছোট। হয়তো তার বিশেষ ধরনের মাথার চুল ছাঁটাইয়ের জন্যেই এমন দেখাতো। চুলগুলো আবার কোকড়িয়ে রাখতো। চুলের বাহারে নাকি কিছু যুবতীর মনে প্রেমের হিল্লোল বয়েছিলো। যাক, তার মাথার চুলের স্বল্পতা পূরণ হয়েছিলো শরীরের লোমের অস্বাভাবিক ঘনত্ব ও বৃদ্ধি দ্বারা। কামিজের বোতাম খোলা থাকলে মনে হতো এর ভেতরটা জঙ্গলে পূর্ণ। আর এ জঙ্গল নিয়ে তিনি একবার বেশ বিপদে পড়েছিলেন। দোকান থেকে বাড়ী যাবার পথে তিনি প্রায়ই আরমানীটোলা ময়দানে বিশ্রাম দিতেন বিরাট বপুটিকে। তাছাড়া কুমার জীবন। তাড়াহুড়া করে বাড়ী ফিরেই বা লাভ কি? তখন জৈষ্ঠের অসহ্য ভ্যাপসা গরম। দোকান থেকে বাড়ী ফেরার পথে আখতার মিয়া ময়দানে থামলেন। দক্ষিণা শীতল সমীরণ আর সবুজ নরম ঘাস তাকে তন্দ্রায়

আচ্ছন্ন করে ফেললো। মিলিটারী ছাটে কাটা গায়ের হাফ-সার্টটি খুলে পোটলা করে সামনে রাখলেন। আর পরনের ধুতিটাকে কোমরের চারপাশে কিছুটা গুটিয়ে গা এলিয়ে দিলেন নরম ঘাসে। এরই মধ্যে ফিনফিনে হাওয়ায় তার নিদ্রা গভীর হয়ে এসেছে, পরক্ষণেই নাকডাকাও শুরু হয়ে গেছে। খালি গা ঘাসের সঙ্গে মিশে আছে। ওদিক সন্ধ্যা ঘনিয়ে অন্ধকারের রেশ এসে পড়েছে শহরের দিগন্ত জুড়ে। মাঠের ফুটবল খেলায় রত বালকেরা অনেকেই চলে গেছে। মাঠ প্রায় শূণ্য। কাছেই কয়েকটি গরু ঘাস খাচ্ছে। এরই মধ্যে দু'তিনটি বুভূক্ষু গরু ওখানটায় এসে উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা আখতার মিয়ার পিঠের ও বগলের বড় বড় কোকড়ানো লোমগুলোকে ঘাস মনে করে মুখে পুরে টানাটানি শুরু করে দেয়। এরূপ অচিন্তনীয় ঘটনায় মিয়া সাহেব ধড়ফড় করে ওঠে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা কজন বালক এ অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। এই নুতন ঘাস কেমন লাগলো তা গরুকে জিজ্ঞেস করবে– নাকি যার ঘাস খেয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস করবে। তাদের কৌতুহলী মন তা বুঝে উঠতে পারছিলো না। এদের মধ্যে ছিলো তৎকালীন বালক শিল্পী পরবর্তীতে লেখক পরিতোষ সেন। ইতিমধ্যে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আখতার মিয়া উচ্চ স্বরে হো-হো-হো করে হেসে উঠে রজনীর আগমনী আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিলেন। তারপর আপন মনে চলে গেলেন বাড়ীর দিকে।

তার বাড়ীটা ছিলো জেলখানার নিকটবর্তী বেগম বাজারে। তার শারিরীক গঠন ও চেহারায় তেমন কোন চমক ছিলোনা বলেই তার কুমার জীবন দীর্ঘতর হয়েছিলো। কিন্তু তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষের যে ছাপ ছিলো তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। প্রথম জীবনে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে প্রথম মহাযুদ্ধে মেসোপটেমিয়ায় জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে আখতার মিয়ার অসাধারণ ও চাঞ্চল্যকর বীরত্বপূর্ণ কাহিনী এবং নানারূপ আজব অভিজ্ঞতার কথা ঢাকা শহরের প্রায় সবাই শুনেছে। শুনেছে তার মোটা হওয়ার পেছনের রহস্যময় কাহিনী। সেসব কাহিনীর সব কটা বলতে গেলে গোটা একটা বই হয়ে যাবে। শুধু দু'একটি প্রধান ঘটনার কথাই এখানে উল্লেখ করবো। ১৯৩০ সালের টেররিষ্ট আন্দোলন দমনে নিযুক্ত বালুচ রেজিমেন্টের এক সেপাই বুজ দিলশাহ্ আখতার মিয়ার মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধের অসাধারণ গল্পের কথা বলে বেড়াতো ঢাকা শহরে। ফলে এ কাহিনী ঢাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

মেসোপটেমিয়ার মরুভূমিতে ভয়ংকর লড়াই চলছে। জার্মান পক্ষ সপ্তাহব্যাপী

অবিরাম তীব্র আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে। আখতার মিয়ার দলের প্রায় সব সেপাই একের পর এক শত্রু পক্ষের গুলি ও বেয়নেটের আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ করে। কিন্তু নানারূপ কৌশল ও ধোকাবাজি করে আখতার মিয়া জার্মানদের প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে এক জনশূণ্য ট্রেন্‌চের বালির তলায় লুকিয়ে থেকে নিজেকে রক্ষা করে। অমাবস্যার চেয়ে ঘনকালো অন্ধকার মরুভূমির রাত। চারদিক সুনসান। মাঝে মধ্যে বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ আবার থেমে যায়। একদিকে ভীষণ ক্লান্তি অন্যদিকে ত্রাস। তদুপরি সপ্তাহব্যাপী অনাহার আর তৃষ্ণায় আখতার মিয়ার অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। এমতাবস্থায় অনাহারে তৃষ্ণায় মরণছাড়া আর কি? আর এভাবে মরার পর শেষ পর্যন্ত শেয়াল শুকুনীদের আহার্য হবে সে। থাকতে হলে যে খাদ্য দরকার। কিন্তু এখন কি দিয়ে সে ক্ষুধা নিবারণ করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছেনা। সেই সঙ্গে দেশে ফেরার কথা বারবার মনে পড়ছে। দেশে ফিরতে হলেও তো কিছু না কিছু খেয়ে বাঁচতে হবে আগে। তাই, বাঁচার চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলেছে। এমতাবস্থায়, আল্লার নামও ভুলে গেছে সে। এমনিতর মুহূর্তে শত্রুপক্ষের তিনজন আহত সৈন্য অন্ধকারে জীবন বাঁচাতে গিয়ে ট্রেন্‌চের মধ্যে পড়ে গেঁথে গেলো। তা দেখে আখতার মিয়া মৃতের ভান করে পড়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরও তাদের সাড়াশব্দ না পেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে এগুলো সে। দেখতে পেলো তিনটি জার্মান সৈন্যেরই প্রাণপাখী ইতিমধ্যে উড়ে গেছে। এবার 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' দেশের প্রবাদ বাক্যটি মেসোপটেমিয়ায়, অবসাদ জড়িত মরুর বিনিদ্র রাতে আখতার মিয়ার মনে বারবার উদয় হতে লাগলো। যতই সে মন থেকে প্রবাদ বাক্যটি ভুলে থাকার চেষ্টা করছে, ততই জঠরের আগুন দাউ দাউ করে জলছে। এক দিকে জঠরের তীব্র জ্বালা, অন্যদিকে ধর্মীয় অনুশাসনের বাধা। এ দু'য়ের সংঘাতে মিয়া তখন দোদুল্যমান, সব চিন্তা-ভাবনা, পাপ-পূণ্য-ঘৃণা মন থেকে ছুড়ে ফেলে দিলো সে। জঠরের জ্বালার যন্ত্রণা কি যে অসহ্য, একে নিভাতে না পারলে শেষ পর্যন্ত হয়তো তাকেও জার্মান সৈন্যদের অনুরূপ এখানে মরে থাকতে হবে। এবার মৃত সৈন্যের সামনে হাটু গেড়ে বসলো সে। পরম করুণাময়ের কাছে সকল অপরাধ-মার্জনার মিনতি করে শত্রুপক্ষের মৃত সৈন্যদের একটিকে অশান্ত উদরে স্থান দিলো। এ স্বল্পাহারে তার জঠরাগ্নি আরো তেজী হয়ে উঠলো। অনন্তর আরেকটাকেও একই গতি করলো। যুদ্ধক্ষেত্রের এই অচিন্তনীয় নৈশভোজের পর থেকে আখতার মিয়া লম্বায় চওড়ায় হাতীর মতো বাড়তে লাগলো। লম্বায় সাড়ে ছ'ফুট আর বুকের ছাতি ষাট ইঞ্চিতে দাঁড়ালো। মহাযুদ্ধ শেষে ১৯১৮ সালের

নভেম্বর মাসে যখন সে ঢাকা ফিরলো তাকে কেউ চিন্‌তেই পারলো না। এমনকি তার মাও না। যুদ্ধ শেষ হলেও বন্দুকের সঙ্গে আখতার মিয়ার সম্পর্ক শেষ হলো না। কারণ একদিকে তার আশুরিক শক্তি ও অফুরন্ত সময় অন্যদিকে সাথীবিহীন ছন্নছাড়া জীবন-সংসার। তাই মাঝে মাঝে শহরের ইট-পাথর আর ধুলোবালির পরিবর্তে মুক্ত আকাশ আর বন-জঙ্গলে পাখী শিকার করতে ভালোই লাগে তার। ধীরে ধীরে পাখী শিকার তার নেশা হয়ে দাড়ালো। কখনও একা, কখনও বন্ধুদের সাথে কখনও বা নবাব পরিবারের লোকদের সাথে জলে-স্থলে শিকার অভিযানে বের হতো সে।

একবার শিকার করতে গিয়ে সব কার্তুজ শেষ করেও কোন পাখী বা হাঁস মারতে পারলোনা। পরাজয়ের গ্লাণি তার অভিধানে নেই। মাথায় এক উদ্ভট ভাবনা এসে গেলো তার। নিজেকে বিবস্ত্র করে, দুকাধে থলি ঝুলিয়ে ছোট ছোট গাছ-গাছড়ার মাঝে ডালপালার মতো হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দেখলে মনে হবে শীতের পাতা ঝরা ছোট্ট একটি বট গাছ। শিকারীও বন্দুক জঙ্গল থেকে উধাও পাখীগুলো তাই মনে করে আবার ফিরে আসতে শুরু করলো। হাঁসগুলো নিশ্চিন্তে গাছের ডালে বসতে লাগলো। আখতার মিয়া নিশ্চল, স্থবির, যেন তার পায়ে বটগাছের শেকড় গজিয়েছে। একটি খয়েরী হাঁস এসে তাঁর বাঁ কাধে বসলো। মিয়া তার ডান হাতটি নামিয়ে একটু থামলো। তারপর খুবই আস্তে করে হাতটি বাঁ কাধের কাছে নিয়ে হাঁসের লেজ ধরে হ্যাচঁকা টানে নামিয়ে থলের মধ্যে পুরলো। কয়েক মিনিট পর আরেকটা হাঁসকে একই অনুকরণে থলেতে রাখলো। এই অভাবনীয় উপায়ে সারা বিকেলে পাখী ধরার সংখ্যা তার চব্বিশে দাড়ালো। শিকারের কাহিনী এখানেই শেষ নয়। আরেকবার ভাওয়ালের জঙ্গলে শিকারে গিয়ে খরগোশ হরিণতো দূরের কথা, কোন পক্ষীরও সন্ধান পেলোনা। কিন্তু তার মতো টার্জানের পক্ষে খালি হাতে ফেরা লজ্জাস্কর ব্যাপার। কেননা, পাড়ার কিশোর-তরুণদের কাছে সে টার্জানের মতোই হিরো বলে বিবেচিত, তাদের কাছে যুদ্ধ ও শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রায়ই বর্ণনা করতো সে। তাছাড়া এসব কাহিনী অতিরঞ্জিত করে বলাতেও সে ছিলো ওস্তাদ।

যাক, খালি হাতে ফেরা যেহেতু তার পক্ষে সম্ভব নয় সেহেতু রাতটা জঙ্গলে কাটিয়ে পরদিনই কোন না কোন একটা কিছু শিকার করে ফিরবে.এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। বিরাট বপুধারী বিধায় গাছে উঠে রাত কাটানো তার সম্ভব নয়। তাই নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে ঘুমুবার একটা স্থানের খোঁজে বেরোলো সে। অল্পক্ষণের মধ্যে ঝোপের আড়ালে ঘাসের মধ্যে ঢাকা বেশ বড় একটা বাক্সের মতো দেখতে পেয়ে প্রথমে চমকে উঠলো। জন মানুষের বসতি নেই, অথচ এই পেকিং করা বিরাট বাক্স

এখানে কোথা থেকে এলো। কৌতুহলী হয়ে একটু এগুতেই দেখলো ইদুর মারার কলের মতো। খাঁচার দরজাটি একটু ফাক করে সুতলি দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা। খাঁচায় উঁকি ঝুকি দিতেই সন্দেহ হলো এর ভেতরে কি একটা প্রাণী আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের এককালের দুঃসাহসিক যোদ্ধাটি কি এত অল্পতেই ঘাবড়িয়ে যাবে? বন্দুকটা ঠিকঠাক করে একটা দেয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ধরতেই দেখতে পেলো একটা কালো ছাগল অন্ধকারে মিশে আছে। এবার আখতার মিয়ার নিকট খাঁচার রহস্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো। যাক, এবার খাঁচার দরজা নামিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে। ছাগলটি মিয়া সাহেবের গায়ের লোমসের সঙ্গে মিশে আরামে শুয়ে পড়লো। আর মিয়া সাহেবও অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলো।

অনেক্ষণ ঘুমুবার পর তার মনে হলো ছাগলটা কেমন যেনো উশ্‌খুশ্‌ করছে। তন্দ্রাবস্থায় হাত দিয়ে ছাগলটাকে আদর করতে গেলো। কিন্তু ছাগল তাকে গুতো দিতে লাগলো। এসময় দু'একটা পাখীর আওয়াজও শোনা গেলো কিন্তু বাইরে ঘুট ঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ খাঁচাটা ঝাকুনী দিয়ে উঠলো। মনে হলো সেটা যেন ভেঙ্গে পড়ছে। এবার আখতার মিয়ার তন্দ্রা কেটে গেলো। পরিস্কার অনুভব করলো, খাঁচার বাইরে একটা কিছু বিচরণ করছে। এমন সময় খাঁচার দরজাটা কে যেন টানাটানি শুরু করলো। এক সময় চিড়িয়াখানার দুর্গন্ধের মতো একটা দুর্গন্ধ তার নাকে ভেসে এলো। ব্যাপারটা দেখা দরকার মনে করে একটু এগিয়ে গিয়ে একটি দেয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ধরে খাঁচার দরজার শিকের ফাঁক দিয়ে তাকাতেই তার চক্ষুস্থির। টর্চের আলোর মত দুটি কি যেন জ্বলছে। ঠাহর করার পূর্বেই জন্তুটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। আখতার মিয়া বুঝতে পারলো এটা বেশবড় শিকার এ শিকার করার মতো বড় গুলি সে আনে নাই। কিন্তু তাতেই কি? সেই চক্ষু দুটির মধ্যে ছররা গুলি ঢুকিয়ে দিতে পারলেই চলবে বাকি কাজ হাতের। মিয়ার মনে পড়লো যুদ্ধক্ষেত্রের কথা। এ হাত দিয়ে কতো জার্মান সৈন্যকে শুন্যে উঠিয়ে আছড়ে মেরেছে। আর আজ কিনা এ জন্তুটাকে পারবেনা? পরক্ষণেই খাঁচাটা ভীষণ দুলে উঠলো। বন্দুকের ট্রিগারে হাত রাখলো সে। অনিশ্চয়তাপূর্ণ মুহুর্ত। খাঁচার ছাদে সাংঘাতিক আওয়াজে ঝাঁপিয়ে পড়লো জন্তুটা। সহসাই দৌড়ে এসে খাঁচার দরজায় একটা প্রচণ্ড থাবা মারলো। খাঁচা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবার উপক্রম। এবার বন্দুক চালালো সে। যতই গুলি করছে, ততই জন্তুটা ক্ষেপে গিয়ে আরো অধিক জোরে খাঁচায় ধাক্কা মারতে লাগলো। এক সময় কার্তুজ শেষ হয়ে গেলো। এখন? এখন করবে কি? বন্দুকটা নামিয়ে রেখে দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখলো। যেমনি জানোয়ারটা দরজার ভেতর

মাথা নোয়ালো অমনি তড়িৎ গতিতে দরজাটা জন্তুটার গর্দানে ফেলে দিয়ে চেপে ধরলো। তার নিজ শরীরের পুরো শক্তি ও ওজন দিয়ে দরজার উপর চেপে বসলো। কি ধস্তাধস্তি তুলকালাম কাণ্ড। কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করলো পূর্ণ বয়স্ক একটা রয়েলবেঙ্গল টাইগারকে গর্দান চেপে রাখতে তার বামহাতই যথেষ্ঠ। নিজের শক্তির পরিচয় পেয়ে নিজেই চমকে উঠলো সে। প্রায় আধঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর বাঘটি নিস্তেজ হয়ে পড়লো। আখতার মিয়ার সন্দেহ তখনও দূরীভূত হয়নি। কেননা ধূর্ততায় পশুদের মধ্যে বাঘের জুড়ি নেই। তাই চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো। এমন সময় ঘটে গেলো এক নাটকীয় ঘটনা যার জন্যে মিয়া সাহেব প্রস্তুত ছিলো না। একটা অদ্ভুত আওয়াজ দূর থেকে ভেসে এলো, একটা গোলমালের মতো শোনা গেলো। একই সঙ্গে ঢাক-ঢোল, ঢ্যাঁরা, নাকাড়া ইত্যাদির আওয়াজের সঙ্গে মানুষেরও চিৎকার। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের আবছা আলোয় শাল গুড়ির ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো জনতা বর্শা, লাঠি, কোঁচ, ট্যাটা এসব হাতে নিয়ে এগুচ্ছে। খাঁচার সামনে আসতেই তাদের বাদ্যের আওয়াজ ও চিৎকার থেমে গেলো। একে অপরের সঙ্গে কানাকানি, ফুসফাস করে আবার চুপ। তারপরই আবার বাদ্যের আওয়াজ যুদ্ধের দামামার মতো শুরু হলো, আর জনতা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র হাতে নিয়ে মারমার চিৎকার করে খাঁচার দিকে এগুতে লাগলো। দরজাবদ্ধ খাঁচার ভেতরে আখতার মিয়া। এবার তার মধ্যেও ভয়ের সঞ্চার হলো। তাই সে পা দিয়ে দরজা চেপে ধরে হাত দুটো উঁচিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, "আমি মানুষ, আরে আমি মানুষ" মিয়ার লোমশ কালো শরীরটা দেখে সবাইতো অবাক বাঘের খাঁচায় বনমানুষ কোথা থেকে এলো। ভূত নয় তো। ওদিকে আখতার মিয়া, "আমি মানুষ, আমি মানুষ" বলে চেচাচ্ছে আর ডান হাত দিয়ে নীচের দিকে জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে। নীচে বাঘটি নেতিয়ে ঘাসের নীচে পড়ে আছে। জনতা আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েও বুঝতে পারছেনা কিছুই। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় ঘাসগুলো নুয়ে পড়তেই বাঘের মাথাটা জনতা একনজর দেখলো। জনগণ ভাবলো বনমানুষটাই বাঘটাকে বিপদে ফেলেছে। তাই সন্তর্পনে আরেকটু এগুলো। আবার সব চুপচাপ। জনতার চক্ষুতো চড়ক গাছ। আখতার মিয়া মানুষ, মানুষ বলে আর্তনাদ করে যাচ্ছে। হঠাৎ আবার ঢোল-নাকাড়া বেজে উঠলো, সেই সঙ্গে জনগণ নৃত্য করতে শুরু করলো। আখতার মিয়াও খাঁচার ভেতর থেকে ছুটে এসে ধেই ধেই করে তাদের সাথে নাচতে লাগলো। সারা শালবনটা যেন তখন নৃত্যগীতের তালে তালে কেঁপে উঠলো।

এরপর আখতার মিয়ার মনে হলো-এ অসাধারণ কাহিনী ঢাকাবাসীর নিকট পৌঁছাতে হবে। মৃত বাঘটা দেখালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হতে পুরস্কারও পাওয়া যেতে পারে। তাই তেমন একটি ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। শিকার থেকে ফিরে আসার পরদিন দেখা গেলো তার বাসা থেকে বাবু বাজার ইসলামপুর কাচারী এলাকা পর্যন্ত এলাকাটি খুশীর উত্তেজনায় ভরপুর। বেলা তিনটের দিকে রাস্তার দুপাশে লোকজন সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে গেছে। পর্দানশীণ যুবতী ও মহিলারা নিজ নিজ সুবিধাজনক স্থান থেকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। সবাই আনন্দ আর উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছেন খোদ ঢাকার নবাব তাঁর নহবত খানার ফটকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো বাবুবাজারের পুলের উপর দিয়ে হুলুমসহ এক মিছিল। সামনে কাড়া-নাকাড়া বাদকের দল, পেছনে বন্দুক হাতে আখতার মিয়া। তাঁর গায়ে অতি পরিচিত মিলিটারী খাঁকি হাফ সার্ট, হাফ প্যান্ট মুখে তাঁর হাসি। পেছনে কুড়িটি লোকের কাঁধে দুখানা বাঁশে ঝুলানো প্রায় বারোফুট লম্বা "দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার"। বিকেলের সোনালী রোদে কুচকুচে কালো ডোরা কাটা প্রাণহীন বাঘটিকে তখন খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিলো। সৃষ্টিকর্তা যেন সৌন্দর্যের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন বাঘটির অবয়বে। মিছিলের অনেকস্থানেই তাদের উপর ফুল ছিটানো হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিছিল তার দোকান ও মসজিদের নিকট এসে গেলো। মসজিদের দোতলা আর তৎসংলগ্ন বেলকনী থেকে আখতার মিয়ার বন্ধু-বান্ধব, মৌলভী ও গুণগ্রাহীরা তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করলো। জনতার একটানা করতালিতে কান বন্ধ হবার উপক্রম। জনগণ সমস্বরে বলে উঠলো "জব্বর দেখাইলা মিয়া, জব্বর দেখাইলা"। মিছিল নবাব বাড়ি গেটের নিকট পৌঁছুলে নবাব সাহেব আখতার মিয়ার গলায় সুগন্ধি ফুলের মালা নিজ হাতে পড়িয়ে দিলেন এবং নোকরের হাতে রাখা রুপোর রেকাবী থেকে লাল রেশমী ফিতে লাগানো একটি স্বর্ণপদক আখতার মিয়ার গলায় পরিয়ে দিলেন। আর বললেন, "সাব্বাস মিয়া সাব্বাস ঢাকাকা নাম রাখলিয়া" তার পিতা ছিলেন মীর ফয়েজ বক্স। তিনি র‍্যালী ব্রাদার্স কোম্পানীতে চাকরী করতেন। আজ থেকে প্রায় দেড় শত বছর পূর্বে তিনিই প্রথমে র‍্যালী সাইকেলের দোকান করেছিলেন এখানটায়। পরবর্তীকালে আখতার সাহেব সে দোকানেই দন্ত চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। জনাব এম, আখতার আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি ১৯৫২ সালে ৮০ বছর বয়সে ইহজগৎ ত্যাগ করে গেছেন। কিন্তু তাঁর জীবনের বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে তিনি ঢাকার এক অন্যতম বিংবদন্তীর নায়ক হিসেবে বেঁচে থাকবেন।

ইমামগঞ্জে নবাবদের একটি বাজার বা গঞ্জ পূর্ব থেকেই চালু ছিলো। নবাব নসরত জঙ্গ বাহাদুর এই বাজারের আয় দিয়ে মুসলমানদের বৃহত্তর পর্ব মহররমের যাবতীয় খরচ বহন করতেন। যেহেতু বাজারের এই আয় হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেনের মর্মান্তিক শোক পালনের জন্যে ব্যয় হতো সেই হেতু এই বাজার বা গঞ্জের নাম আজও সকলের কাছে ইমামগঞ্জ নামে পরিচিত।

পুরাতন ঢাকার পূর্বাঞ্চলের একটি মহল্লার নাম কুলুটোল্য। এক সময় কুলু সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘানি চালিয়ে সরিষার তেল বিক্রয় করতো বলেই এ মহল্লার নাম হয়েছে কুলুটোলা। তখনকার দিনে আপামর সকলেই ঘানির তেল ব্যবহার করতো। দেশের অনেক স্থানে এখনও কুলুর প্রচলন আছে। যদিও সরিষা মাড়াই আধুনিক যন্ত্র বের হয়েছে। যে বলদ ঘানি ঘুরাতো তাদের কুলুর বলদ বলা হয়। আজও অনেক বোকা লোকদের ঠাট্টাচ্ছলে ব্যাঙ্গ করে বলা হয় তুমি একটা আস্ত কুলুর বলদ। কুলুটোলায় আজ আর কুলু সম্প্রদায়ের লোকেরা নেই, যদিও তাদের বংশধর থেকে থাকে তাহলে তারা অন্য পেশায় নিয়োজিত হয়ে কুলু উপাধি ঘুঁচিয়ে ফেলেছে।

লোহার পুলের উত্তর পশ্চিম কোণে যে সূত্রাপুর থানা রয়েছে তা পূর্বে কুলুটোলায় ছিলো। এ মহল্লায় বৃটিশ আমলে অল্প ক ঘর মুসলমানের বসবাস ছিলো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় স্থানীয় প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ঔষধ ব্যবসায়ী শিরিশ বাবু মুসলমানদের যাতে কোন রূপ ক্ষতি না হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে কালাচাঁন বাবুও সহযোগিতা করেছেন। তবে দেশ বিভক্ত হওয়ার কিছু পূর্বে ১৯৪৬ সালে সারা উপমহাদেশ ব্যপী যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তার লাভ করে তা থেকে এ মহল্লাটিও রক্ষা পায়নি। মুসলমানরা ভিটে মাটি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী মহল্লায় আশ্রয় নিয়েছিলো। সেখানকার ভূষামালের ব্যবসায়ী তোতা মিয়া কালের সাক্ষী হিসেবে শতবর্ষ বয়স নিয়ে বেঁচে ছিলেন পার্শ্ববর্তী মহল্লা কাগজি টোলায়। কিছু দিন হলো ইন্তেকাল করেছেন। কুলুটোলার মসজিদটি রেকর্ড অনুসারে ১৮১২ সালে স্থাপিত। বায়তুল মোকারম মসজিদের সাবেক পেশ ইমাম মুফতি আমিনুল ইসলাম ইন্তেকাল করলে তাকে এ মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে দাফন করা হয়।

বৃটিশ যুগে কুলুটোলা আখড়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ঝুলন উৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে চলতো। নাচ গানে মুখরিত থাকতো মহল্লাটি। কুলুটোলার মাথায় বৃটিশ যুগের শেষ দিকে শিংদ্বারা তৈরি ও ঝিনুকের বোতামের হাট বসতো প্রতি বৃহস্পতিবারে। প্রধান গ্রাহক ছিলেন অত্র এলাকার তৎকালীন নেতা শিরিশ বাবু। প্রথম ও দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধকালে সকল দেশের সামরিক বাহিনীর লোকজন শিং-এর বুতাম ব্যবহার করতো। তজ্জন্য ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানরা সাধারণতঃ শিং-এর বুতাম চিরুনী তৈরির কাজ ও ব্যবসা করতো। বুতামের চাহিদা অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় পূর্বাঞ্চলের অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকরাও বুতাম তৈরি পেশায় নিয়োজিত হয়। আর এসব তৈরি বুতামই কুলুটোলার হাটে বেচা-কেনা হতো বেশি। ঢাকা ও কলকাতার যে কজন বিদেশে বুতাম রপ্তানি করতো তাদের মধ্যে শিরিশ বাবু অন্যতম ছিলেন। একবার ঢাকার রায়টের সময় আমাদের মহল্লার বিশিষ্ট বুতাম ব্যবসায়ী হাফেজ মিয়া তৎ সঙ্গীগণ বুতাম বিক্রয়ের জন্য উক্ত হাটে গেলে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী গুণ্ডারা তাদের হত্যা করার পরিকল্পনা নেয়। এ সংবাদ শোনা মাত্র শিরিশ বাবু স্বয়ং তার দলবল নিয়ে হাফেজ মিয়া ও তৎ সঙ্গীদের ভৎর্সনা করে এবং নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দেয়। আজ এদের সবাই পরলোকবাসী হয়েছেন।

পাক আমলে এক বুজুর্গ ব্যক্তি কুলুটোলা এসে বসতি করেন, তিনি কুলুটোলা শাহ্ সাহেব নামে পরিচিত হন। তার নামানুসারে শাহ্ সাহেবের গলি পথটিকে কুলুটোলা মুফতি লেন বলা হয়ে থাকে। আমি যখন ১৯৬৩ সালে পবিত্র হজ্বপর্ব সমাধা করতে যাই তখন তিনিও যান। মক্কায় একটি গৃহে তাঁর মুরিদানদের নিয়ে অনুষ্ঠিত জিকির আজকার মাহফিলে যোগদান করেছিলাম।

এ মহল্লাটির নিকটেই রয়েছে কাগজীটোলা। এ অঞ্চলটিতে এক সময় কাগজ তৈরি করা হতো। যারা কাগজ শিল্পে নিয়োজিত ছিলো তাদের বলা হতো "কাগজী"। তাই কাগজীদের নামানুসারেই এ মহল্লাটির নামকরণ হয়েছে কাগজীটোলা। কাগজীরা প্রথমে সাদা মেস্তা দিয়ে কাগজ তৈরি করতো। পরবর্তীকালে পাট, চট, কম্বল ও পুরনো কাগজের টুকরো ব্যবহার করতো। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত কাগজ শিল্প এখানে চালু ছিলো। এ মহল্লার কিয়দংশ পরবর্তীতে ঢাকা পৌর সভার ভাইস চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র দাসের নামে দেবেন্দ্র দাস লেন নামকরণ হয়।

কুলুটোলার নিকটেই শিংটোলা, আজও এ নামের প্রচলন আছে। শিংটোলা নামটি হিন্দু সম্প্রদায়ের সিং পদবীধারী লোকদের এখানে বসবাস ছিলো বিধায় এলাকাটির নাম হয়েছে শিংটোলা। পরবর্তীতে শিংটোলার কতক অংশ প্যারিদাস রোডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ঢাকার পূর্বাঞ্চলের ব্যস্ততম এলাকা ফরাশগঞ্জের উত্তরে মদন সাহা লেন নামে একটি মহল্লা রয়েছে। মদন সাহা লেন এলাকাটি ফরাশগঞ্জেরই আওতাভূক্ত ছিলো এক সময়। মদন সাহা একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। তার

বাড়ী ছিলো শুকলাল দাস লেনে। তিনি তৎকালীন প্রভাবশালী উকিল ও হিন্দু নেতা পৌর সভার চেয়ারম্যান প্যারিদাসের আত্মীয় হন। এ মহল্লায় শত বর্ষ পূর্বের নির্মিত একটি মসজিদ রয়েছে। বৃটিশ শাসনামলে এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী আকমল খাঁন। আকমল খাঁন মসজিদ সংলগ্ন নিজস্ব কবরস্থানে সমাহিত হয়ে আছেন।

১৯৪৬ সালে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এখানে যে ক'ঘর মুসলমান ছিলো তারা নিকটস্থ মুসলিম বসতিগুলোতে চলে গিয়েছিলো। এই সুযোগে স্থানীয় হিন্দুগণ মসজিদে গণেশ মূর্তি স্থাপন করে ছিলেন। এ সংবাদ পেয়ে পার্শ্ববর্তী মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং দলবদ্ধভাবে এসে মসজিদ থেকে গণেশ মূর্তি সরিয়ে মসজিদটি পরিস্কার করে ফেলে।

এখানে হিন্দুদের মধ্যে দু'জন খ্যাতনামা বাদ্য শিল্পী ছিলেন। তন্মধ্যে সেতার বাদক ভগবান দাস সেতারী, অন্য জন শ্যাম দাস এস্রাজী। শ্যাম দাস ঢাকার বিখ্যাত এস্রাজ বাদ্যের ওস্তাদ ছিলেন। সেতার বাদ্যের ওস্তাদ ভগবান দাসের সুর মুর্ছনায় সকালের জাগা লোক পূনরায় ঘুমিয়ে পড়তো। আর তাদের ঘুম ভাঙ্গতো অনেক পরে। আগরতলার মহারাজ তাঁকে মাসোহারা পাঠাতেন। ভগবান দাস আগরতলা গিয়েও রাজ বাড়ীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেককে সেতার বাদ্য শিক্ষা দিতেন। সেখানেও তার নামের খ্যাতি ছড়িয়ে পরেছিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার বিশিষ্ট সরদার ও পৌর কমিশনার জনাব মাওলা বক্স সরদার এখানে বাস ভবন নির্মাণ করে বসবাস করে গেছেন।

এ মহল্লার দক্ষিণে বিবিকা রওজার সন্নিকটে নদী তীরবর্তী একটি এলাকার নাম উলটিগঞ্জ। পূর্বে ইহা শ্মশানঘাট নামে অভিহিত হতো। কেননা এখানে হিন্দুদের শবদাহ করার জন্য শ্মশান ঘাট ছিলো। পরবর্তী পর্যায়ে শ্মশান ঘাটটি পোস্তগোলায় স্থানান্তরিত হয়।

এই শ্মশান তথা ডোম ঘাট এলাকাটি বৃটিশ শাসনামলে ইংরেজ প্রদেশস্থ অফিসার মিঃ উলটিন সাহেবের নামানুসারে উলটিনগঞ্জ হয়। তিনি এখানে একটি বাজার স্থাপন করে ছিলেন বলে বাজারটি তাঁরই নামানুসারে হলেও নামটি কিছুটা বিকৃত হয়ে অর্থাৎ উলটিন নামের স্থলে এলাকাটি উলটিগঞ্জ নামেই পৌর সভায় রেকর্ডভুক্ত হয়। আজ অবধি এ নামেই এলাকাটি পরিচিত। পরবর্তীকালে বাজারটি অপসারিত হয়ে এখানে কাঠের গোলা অর্থাৎ কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের বাজার স্থাপিত হয়। তাছাড়া প্রখ্যাত ব্যবসায়ী যতিন দাস বাবুর ইটের ব্যবসাও এক সময় জমজমাট ছিলো।

বিত্তশালী জমিদার লালমোহন সাহার নামানুসারে মৈশণ্ডি এলাকার জোরপুল মহল্লার একটি লেনের নাম লালমোহন সাহা স্ট্রীট। জমিদার লালমোহন সাহার বাসভবন ছিলো টিপু সুলতান রোডের যে ভবনটিতে নবাব সলিমুল্লাহ্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটি। এ বাড়ী সংলগ্ন একটি আখড়া ছিলো যা লালমোহন সাহার আখড়া নামে অভিহিত হতো। এই আখড়ায় ঝুলন উৎসব খুব ধুম ধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো। বাংলার বাহির হতে বিশেষ করে বেনারসও মধ্যভারত হতে নর্তকীদের আগমন ঘটতো। নর্তকীদের নুপুরের ঝংকারে আর রসালো গানের সুরে মাতিয়ে রাখতো ঢাকার বিত্তশালী আমোদ প্রিয় লোকদের। অবশ্য বাদ পড়তোনা পাড়া প্রতিবেশীরাও। সেই ঝুমুরের আওয়াজ আর নেই। আছে ছাত্রদের পড়াশুনার আওয়াজ। আজও জমিদার লালমোহন সাহার স্মৃতি বয়ে চলেছে ঢাকা পৌরসভা কর্তৃক নামকরণকৃত লালমোহন সাহা স্ট্রীট। এ মহল্লায় ঢাকা পৌর সভার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সমাজসেবী মরহুম আঃ রহিমের বাস ভবন রয়েছে। তিনি একাধিকবার পৌর সভার কমিশনারও ছিলেন। এই স্ট্রীটের অনেকাংশই মৈশুণ্ডি নামে ঢাকাবাসীর নিকট পরিচিত।

সিদ্ধেশ্বরী এলাকাটি বহু পূর্বে মালীবাগ নামে পরিচিত ছিলো। বর্তমান সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের উত্তর পশ্চিম দিকে নিবিড় অরণ্যাদির মধ্যে একটি বাধান পুকুর ও কতক মন্দির আছে যা মালীবাগ আখড়া নামেই পরিচিত। এখানে নানা গাছ গাছড়া ও বৃক্ষরাজী থাকায় ইহা শান্তি কুঞ্জ নামেও অভিহিত হতো।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি বল্লাল সেনের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে ধারণা করা হয়। মন্দিরের কালিমূর্তি বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ রায় প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। মন্দির প্রাঙ্গন মধ্যে রক্ত চন্দন বৃক্ষ মস্তক উত্তোলন করে দণ্ডায়মান রয়েছে। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে চাঁদ রায়ের মৃত্যু হয় এর কিছুকাল পূর্বেই সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলে অনেকেরই ধারণা।

ভারতের এলাহাবাদ অঞ্চল হতে এক ব্যক্তি এসে বহুদিন পর্যন্ত এ মন্দিরে তপস্যা করেন। এ সময় এলাকাটি বৃক্ষরাজী দ্বারা তথা আম্রকুঞ্জ, কাঁঠাল বাগান, বাঁশ বাগান, ফলের বৃক্ষ ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলো তজ্জন্য লোকে এলাকাটিকে মনোরম তপ ভূমিও বলতো। আজও এলাকাটির পরিচয় অনেকে প্রদান করেন তপবন নামে। পরবর্তীতে এলাকাটি জনবহুল হয়ে পড়ায় ধীরে ধীরে বাগান ও বৃক্ষরাজী লোপ পায়। প্রবাদ আছে ভারতের পশ্চিম এলাকা হতে আগত সৌমার বন গোস্বামী বহু দিন তপস্যার পর দিব্য শক্তি, দিব্য দৃষ্টি সম্যক জ্ঞান ও কালিকাদেবীর

জ্যোতির্ময় মূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তার পর হতে তিনি মনি মহারাজ নামে সকলের নিকট পরিচিত হন। তিনি গৌরবর্ণ ও লম্বায় ছয়ফুট ছিলেন। এই মনোরম তপবন ভূমিস্থিত মন্দিরে সিদ্ধি লাভ করায় এই মন্দিরটির নাম হয় সিদ্ধেশ্বরী। সে সময় হতেই নাকি সারা দেশে মন্দিরটি সিদ্ধেশ্বরী নামে পরিচয় লাভ করে। এই মনি মহারাজ সে সময় মন্দিরের প্রধান সেবাইত ছিলেন।

কথিত আছে এই মন্দির সংলগ্ন প্রধান ইদারায় মনি মহারাজ একদিন লৌহ শৃঙ্খলাবস্থায় অবতরণ করেন। অবতরণের পূর্বে উপস্থিত সকলকে বল্লেন যে দিন ইদারার পানি স্ফীত হবে সেদিন জানবে আমার মৃত্যু হয়েছে। আর যত কাল পর্যন্ত ইহা জলমগ্ন না হবে ততকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত আছেন বলে বুঝতে হবে। সেই যে তিনি ইদারায় নামলেন আর উঠলেন না। শিষ্যগণের মনে বিশ্বাস আজও তিনি ইদারার মধ্যে জীবিত আছেন। বর্ষাকালে স্থানীয় কুপ সমূহে জলবৃদ্ধি পেলেও এই ইদারার জলরাশি কিঞ্চিৎ স্ফীতি অনুভূত হয়নি। সেই শৃঙ্খলটি একই অবস্থায় বহুকাল ছিলো বলে বর্তমান সেবাইত জানান, কিন্তু আমার পরিদর্শনকালে তা আছে বলে মনে হলো না। তার সম্পর্কে আরো কথিত আছে যে, আজিমপুর দায়রা শরীফের শাহ্ সাহেব ও মনি মহারাজের মধ্যে সখ্যতা ছিলো। তারা ব্যাঘ্র ও প্রাচীরের উপর উপবেশন করে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তৎকালে হিন্দু ও মুসলমানগণ তাদের নিজ নিজ ধর্মাবলম্বী সাধু পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্যে এরূপ নানা অদ্ভূত গল্পের অবতারণা করে থাকতেন। শারদীয় উৎসবের সময় এ মন্দিরে ঘটস্থাপন করে পূজো দেওয়ার প্রথা বহুকাল পূর্ব হতে চলে আসছে। পৌষ মাসব্যাপী এখানে মেলা বসতো। পূর্বে ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিত্তবান ও আমোদ প্রিয় লোকেরা পৌষ মাসে মন্দির প্রাঙ্গন আনন্দ কোলাহলে মুখরিত করে রাখতো।

বাংলা ১২৭২ সালের ৩রা অগ্রহায়ন তারিখে ৪র্থ সেবাইত সুমেরুবন গোস্বামী ঢাকার ফুলবাড়িয়া গোপাল লোচন মিত্র বরাবরে যে একখানা কবুলিয়ত সম্পাদন করেছিলেন তৎপাঠে জানা যায় যে খিলগাঁও মৌজার মধ্যে চারিশত চল্লিশ কাঠা দশ ধুম জমি "শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরানী ও শ্রী শ্রী মহাদেব ঠাকুর বিগ্রহের" দেবোত্তর লাখেরাজ সম্পত্তি ছিলো। এগুলো পরবর্তীতে স্বার্থবাদী লোকেরা সেবাইতদের সহায়তায় বেহাত করে ফেলে। মন্দিরে পূর্বের মত সেবাইত প্রথা চলে আসছে। পৌর রেকর্ডে সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, সিদ্ধেশ্বরী রোড ও সিদ্ধেশ্বরী লেন নামে ৩টি রাস্তার উল্লেখ রয়েছে।

নবদ্বীপ বসাক কিছু অর্থ পৌর সভায় দান করে ঢাকার এক পথের নামকরণ

করেছিলেন নবদ্বীপ বসাক লেন, নবদ্বীপ নামটি হয়েছে কোন এক সাধক ত্রিনদী বিধৌত ত্রিভুজ আকৃতি ভূখণ্ডে গভীর রাতে নয়টি প্রদ্বীপ জ্বেলে সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই নবদ্বীপের সাধনাকে কেন্দ্র করেই বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের একটি জেলার নাম। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নবদ্বীপের নামানুসারে নিজেদের নাম রাখার রেওয়াজ হয়েছে। আমাদের নবদ্বীপ বসাক বাবুও তাদের মধ্যে একজন।

মিটফোর্ড হাসপাতাল ও মোঘলটুলির মধ্যাংশে একটি বংশিবাজার আরেকটি অংশ মাদারঝাণ্ডা নামে পরিচিত ছিলো। বংশি বাজার সম্পর্কে অনেকের ধারণা এখানে মাছ ধরার বংশির পাইকারী বাজার ছিলো। আবার কেউ বলেন বংশী তথা বাঁশীর বাজার ছিলো। তা যাই হোক বংশি বাজারের নাম এখনও লোক মুখে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু মাদার ঝাণ্ডার নাম বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে এলাকাটি যাদব নারায়ণ দাস লেন নামকরণ করা হয়। যদিও এক সময় মাদার ঝাণ্ডা নাম বহুল পরিচিত ছিলো। কথিত আছে এলাহাবাদ থেকে আগত মাদার শাহ্ নামে কামেল ব্যক্তি ঢাকার নলগোলা ঘাটে অবতরণ করে শাহী সাত গম্বুজ মসজিদে নামাজ আদায় করেন। এ মসজিদটি শায়েস্তা খাঁর আমলে নির্মিত হয়েছিলো। মসজিদটি জাফরাবাদ সাত গম্বুজ মসজিদের অনুরূপ একই আঙ্গিকে একই রাজ মিস্ত্রি দ্বারা বুড়িগঙ্গার তীরে নির্মিত। মাদার শাহ্ নামাজ শেষে কিছু পথ যাওয়ার পরই দেখেন যায়গাটি নির্জন, নিস্তব্ধ ও ফাঁকা। ক্লান্তি নাশের জন্যে তিনি সেখানে এক বিরাট বৃক্ষের তলায় কিছু সময় বসার পর সেখানে একটি ঝাণ্ডা (পতাকা) উত্তোলন করেছিলেন। সে ঘটনার পর থেকেই ঐ এলাকাটি মাদার ঝাণ্ডা নামে পরিচিত হয়ে যায়। যে স্থানে মাদার শাহ্ বিশ্রাম নিতে বসে ছিলেন সেই স্থানে পরে কেবা কারা একটি ছোট্ট মোকাম নির্মাণ করেন, পূর্বে এখানে ভক্তজনেরা ফুলের অর্ঘ্য দিতো এবং মহরমের সময় সেহরা সিন্নি ও ঝাণ্ডা উত্তোলন করতো। পরবর্তীকালে এলাকাটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। হিন্দু ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সেখানে বড় বড় ইমারত তৈরী করেন। বৃটিশ আমলের একেবারে শেষ সময়ে দালান কোঠা নির্মাণকালে মোকামখানা ভেঙ্গে ফেলা হলেও শাহ্ মাদারের বসার স্থানটি পাকা চবুতরা করে রেখে দেওয়া হয়। এবং পথচারীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে পানি ভর্তি কলস রাখা হতো। জমিদার যাদব নারায়ণ দাস এ এলাকায় বাস ভবন নির্মাণ করলে জমিদারের প্রভাবে ঐতিহাসিক মাদার ঝাণ্ডা নামের বিলুপ্তি ঘটে।

এক সময় এলাকাটি নাকি নেওয়াজ মিয়া জমিদারদের ছিলো। বংশী বাজার এলাকার কিছু অংশের নাম ছিলো পাথর হাট্টা। এখানে পাথরের শিল পাটা ও অন্যান্য

দ্রব্য বিক্রি হতো। এ নামের কোন অস্তিত্বই আজ আর নেই। মানুষের স্মৃতিপট থেকে এ নাম সম্পূর্ণ মুছে গেছে। নবাবগঞ্জ বাজারের নিকট মাদার ঝাণ্ডা নামে যে মাজার রয়েছে, সেটি এই মাদার শাহ্‌র নয় বলে জানা যায়।

বিশিষ্ট আইনজীবি প্যারিদাস বৃটিশ যুগের শেষের দিকে ঢাকা পৌর সভার চেয়ারম্যান ছিলেন। সে সময় তাঁর পিতা শুকলাল দাসের নামানুসারে একটি লেনের নামকরণ হয় শুকলাল দাস লেন। তিনি স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবসা ব্যতিত বন্ধকী ব্যবসাও করতেন। তজ্জন্য শুকলাল পোদ্দার নামে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। এ অঞ্চলে আরো এক ধনাঢ্য প্রভাবশালী জমিদার ব্যক্তি এবং ইটখোলার মালিক আনন্দ মোহন দাসের নামানুসারে একটি লেনের নামকরণ হয়। আনন্দ মোহন দাস লেন।

বাবুবাজার ও মোঘলটুলির কিছু অংশ পাকুড়তলি নামে অভিহিত হতো। এককালে পাকুড়তলির পূর্ব অংশ জুড়ে একটি বাজার ছিলো। এ-বাজারটি নাকি ভূকৈলাশের হিন্দু জমিদারগণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ জন্যে এ এলাকাটি তাঁদের নামানুসারে বাবুবাজার নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এই জমিদারের বাড়ি ছিলো কোলকাতার ভূকৈলাশে।

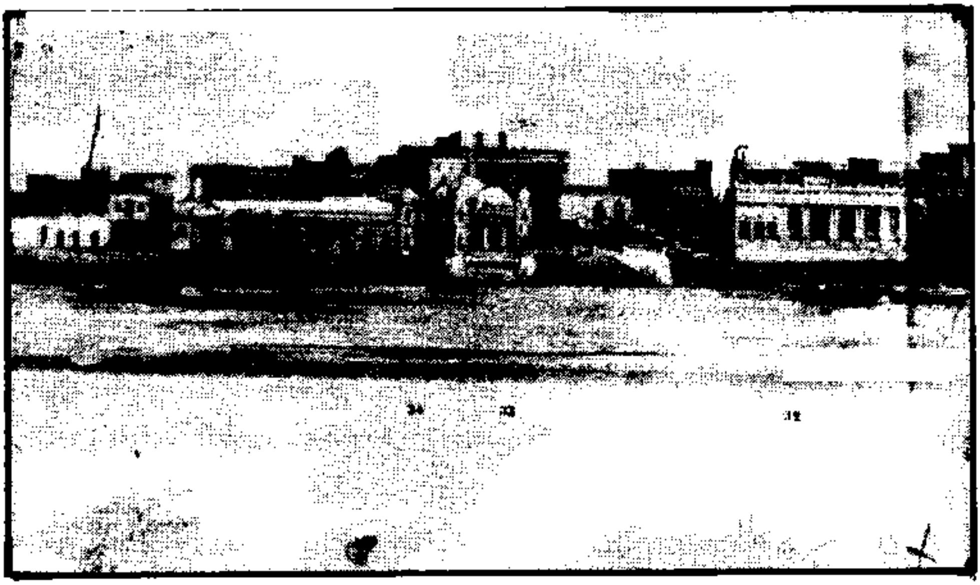
বাবুবাজার চৌরাস্তায় হযরত বাবা বাহার শাহের মাজার রয়েছে। শোনা যায়, তিনি পাঞ্জাবের অমৃতসরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বেশ লেখাপড়া জানতেন। তিনি যথেষ্ট জ্ঞান-গরিমারও অধিকারী ছিলেন। যে-স্থানে মাজার রয়েছে সেখানে পূর্বে একটা আস্তাবল ছিলো। এই আস্তাবলেই তিনি শিষ্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব ঋতুতেই একই অবস্থায় পড়ে থাকতেন। এই অবস্থাতেই তিনি ১৩৪২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এবং এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

বাবুবাজার মসজিদ সংলগ্ন গম্বুজের ভিতর একটা কবর রয়েছে। এটি হযরত আবু সাঈদের কবর বলে অনেকেই ধারণা করে থাকেন। অনেকে আবার আরমানীটোলা লঙ্গরখানা মসজিদের কাছে তাঁর কবর রয়েছে বলে উল্লেখ করে থাকেন। তাঁরই নামানুসারে আলে আবু সাঈদ মহল্লার নামকরণ হয়েছিলো বলে মনে হয়। বাবুবাজার ঘাট সংলগ্ন তিনগম্বুজ মসজিদটি আমিরুদ্দীন দারোগা নির্মাণ করেন। তাঁর আবাসস্থল এখানেই ছিলো। তিনি ঢাকার বিশিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর আদি বাড়ি ছিলো কুমিল্লার রতনপুরে।

বাবুবাজার চৌরাস্তায় কয়লা শাহ্ নামে এক ফকির শরীরে কম্বল পেঁচিয়ে একটা মোটা লাঠি হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো। মাঝে মাঝে সে সেই লাঠি দিয়ে লোকজনকে পেটাতো। কোন কোন লোককে আবার পিছু ধাওয়া করেও লাঠি দিয়ে

পিটিয়ে আসতো। লোকে তাঁর এ-লাঠির আঘাতকে শুভ লক্ষণ বলেই মনে করতো। অনেক সময় সে নদীর ধারে একটি কয়লার দোকানে পড়ে থাকতো বলে সে সবার কাছেই কয়লা শাহ্ নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলো। কারো কাছ থেকে পয়সা পেলেই সে শুধু কলা কিনে খেত। আজিমপুর এলাকার একটা ছোট্ট কবরস্থানে তাঁর কবর রয়েছে।

বাবুবাজারে ঢাকার বিশিষ্ট বিত্তশালী ব্যক্তি গোলাম পীরের বাসভবন ও মসজিদ রয়েছে। রেভারেণ্ড মিঃ লিও নাডস এর বাস ভবনও এ মহল্লায়ই ছিলো।



১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়ীগঙ্গা নদী তীরবর্তী বাবুবাজার এলাকায়
(১) গোলাম পীরের বাস ভবন; (২) গোলাম পীরের মসজিদ;
(৩) রেভারেন্ড মিঃ লিওনাডস—এর বাসভবন

ঢাকা কোর্টের পিছনে রয়েছে রাজার দেউরী নামে একটি মহল্লা। রাজার দেউরী এলাকাটি রোয়াইল এস্টেটের অধীনে ছিলো। রোয়াইলের এক জমিদার বৃটিশ সরকার হতে রাজ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি ঢাকার নিজস্ব জমিদারী ভুক্ত এলাকায় সদর রাস্তার ধারে একটি দেউরী বা ফটক নির্মাণ করেছিলেন তখন হতেই এলাকাটি রাজার দেউরী নামে পরিচিত। জমিদারী প্রথা লুপ্ত হওয়ার পর এখানে বসবাস করে গেছেন গাছা জমিদার পুত্র বীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী ও পূবাইল জমিদারের পুত্রগণ।

বৃটিশ যুগে মহল্লার সম্মুখ ভাগে কোর্ট-কাচারী, আদালত ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের

কার্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হলে এর পিছন দিকটির নামকরণ হয় কোর্ট হাউস স্ট্রীট। এ স্ট্রীটে রয়েছে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের তৈরী একটি মসজিদ যা পরে সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে তিন তলায় পরিণত হয়েছে। রয়েছে বার লাইব্রেরী হল। এ হলেই পাক আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত ঢাকার রাজনৈতিক আন্দোলনের সভা সমিতি হতো। এখানে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এসেছেন, বক্তব্য রেখেছেন তাদের স্মৃতি এ ভবনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। যদিও ভবনটি সম্প্রসারিত হয়েছে। এ রাস্তায় মোক্তার লাইব্রেরী বলেও অনুরূপ একটি ভবন রয়েছে। যা আজ ঢাকাবাসী ধীরে ধীরে বিস্মৃত হতে চলেছে। এক সময় যারা উকীল নিয়োগ করতে পারতেন না অর্থনৈতিক কারণে তারা মোক্তার দিয়েই কাজ সমাধা করতেন। মোক্তারদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। কিছু দিন পূর্বেও ঢাকাবাসীর কাছে সামশুল হক মোক্তারের নাম অতি পরিচিত ছিলো।

মিটফোর্ড হাসপাতাল যেখানে অবস্থিত সেখানে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয় ওলন্দাজদের কুঠি। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত কুঠি ওলন্দাজদের অধীনে ছিলো, এর পর কেমন করে কি ভাবে কুঠিটি বিলীন হয়ে যায় সে ইতিহাস জানা যায়নি। তবে ১৮২০ সালে যখন মিঃ রবার্ট মিটফোর্ড ঢাকার কালেক্টর ছিলেন সে সময় তিনি জনকল্যাণ মূলক কাজ করার জন্যে আট লক্ষ টাকা উইল করতঃ একটি ট্রাষ্ট গঠন করে যান। তিনি তার মহানুভবতার ফলশ্রুতি দেখে যেতে পারেননি। ১৮৩৬ সালে তিনি লণ্ডনে মারা যান। ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি শেষ দিকে প্রাদেশিক আপীল আদালতের জজ, তাছাড়া সিভিল সার্ভিস এর সদস্য পদেও আসীন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আত্মীয়গণ উইলের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন বিলেতের চেনসিরি কোর্টে। তারা বলেছিলেন এই দানপত্র ভূয়া ও সন্দেহ যুক্ত। শেষে ১৮৫০ সালে এ মামলার নিস্পত্তি হয়। এতে বঙ্গীয় গর্ভমেণ্ট আংশিক ডিক্রি পান। এই ডিক্রির ১,৬৬,০০০ রুপি পাইয়া ট্রাষ্টিগণ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটি হাসপাতাল নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন যা ১৮৫৪ সালে শেষ হয়। ১৮৫৮ সালের প্রথম দিকে ট্রাষ্টিগণ তারই নামানুরে হাসপাতালটির নাম "মিটফোর্ড হাসপাতাল" রেখে ১লা মে ১৮৫৮ সালে বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিপূর্বে হাসপাতালটির গোড়াপত্তন করা হয়েছিলো টিচার্স ট্রেনিং কলেজের পাশে আর্মানীটোলা গভঃ স্কুলে, পরবর্তীতে জগন্নাথ কলেজে হাসপাতালের কাজ চলতো। তার অর্থ দ্বারা হাসপাতাল নির্মাণ করে ট্রাস্টিগণ মিঃ রবার্ট মিটফোর্ডের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। কারণ তিনি যখন ঢাকার কালেক্টর ও আপীল আদালতের বিচারক ছিলেন সে সময়ে ঢাকার

কলেরা-বসন্তের মহামারী তাকে আতংকগ্রস্থ করে তুলেছিলো। তখন মহামারীতে ঢাকায় প্রতিদিন শ'খানেক লোক প্রাণ হারাতো। ঢাকাবাসী এরোগে আতঙ্কগ্রস্থ ছিলো। এক মহল্লা থেকে আরেক মহল্লায় যেন লাইন ধরে রোগের বিস্তৃতি ঘটতো। লোকদের চোখে মুখে ছেয়ে যেতো মৃত্যুর বিভিষিকা। শহরব্যাপী তখন এ নিয়েই আলোচিত হতো, লণ্ডনে মৃত্যু শয্যায় জনদরদী মিটফোর্ডের মনে ঢাকাবাসীর এই আতংক ও অসহায় অবস্থা দোলা দিতো। তাই মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দানকৃত অর্থদ্বারা একটি হাসপাতাল গড়ে তোলার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। মিঃ মিটফোর্ড ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাচেলার ছিলেন। এই মহৎ ব্যক্তিটির নামানুসারে বাবু বাজারের সাবেক পুল হতে চকবাজার পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তাটি নামকরণ হয় মিটফোর্ড রোড, অবশ্য এই রোডটির আওতায় অনেকগুলো মহল্লা রয়েছে।

পাক আমলে গভর্ণর মোনেম খাঁর সময় এই হাসপাতালটির সাথে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ নামে একটি মেডিক্যাল কলেজ সংযুক্ত করা হয় এবং এই নামে হাসপাতালটির নামও পরিবর্তন করা হয়। স্বাধীনতার পর নুতন নাম বাতিল করে আবার পূর্ব নাম বহাল রাখা হয়। হাসপাতালটি নির্মাণকালে ভবনটি গাড় লাল রং ছিলো।

মিটফোর্ড হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে স্থাপিত হওয়ায় দেশীয় হাসপাতালসমূহ এতদসঙ্গে একত্রীভূত হয়ে যায়। ঢাকায় দেশীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয় ১৮০৩ সালে কলিকাতা দেশীয় হাসপাতালের শাখা হিসেবে সে হাসপাতালে মাত্র ৪০ জন রোগীর সংকুলান হতো। অবশ্য এদেশের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বে প্রথম হাসপাতাল বা রুগ্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। পরবর্তীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর সকল শহরে হাসপাতাল খোলার নির্দেশ দিলে ঢাকায় "ঢাকা হাসপাতাল" ও অনাথ আশ্রম স্থাপন করা হয়।

মিটফোর্ড হাসপাতাল ১৮৫৮ সালে নবতর ভবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৮৬৬ সালেও মাত্র ৯২ জন রোগীর আসন ছিলো। জনস্বার্থে বাংলা সরকার হাসপাতালটি আরো সম্প্রসারণের জন্য বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালে ঢাকার নবাব আঃ গণীসহ হিন্দু মুসলমান জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে নবাব খাজা আঃ গণী অন্যতম। অতঃপর মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণের জন্যে ১৮৮২ সালে এগিয়ে আসেন ২৭,০০০/= টাকা নিয়ে নবাব আহসান উল্লাহ, ভাওয়াল পরগণার জমিদার রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ আসেন ২০,০০০/= টাকা নিয়ে।

মহিলা ওয়ার্ড পৃথক হলেও তৎকালীন মুসলিম মহিলা ও তাদের অভিভাবকরা

যেতে দিতনা পর্দার দারুণ বরখেলাপ হয়ে যায় বলে। তাই নবাব আহসান উল্লাহ ১৮৮৮ সালে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডাফরিনের ঢাকায় আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে লর্ড ডাফরিন-লেডি ডাফরিনসহ যখন মিটফোর্ড হাসপাতাল দেখার জন্য আসেন তখন লেডি ডাফরিন হাসপাতাল নামে একটি পৃথক জেনানা অর্থাৎ মহিলা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য ঐখানেই ৫০,০০০/= টাকা দান করেন। পরে ঐ টাকায় ১নং নলগোলাস্থিত ভবনে চার শয্যা বিশিষ্ট লেডি ডাফরিন হাসপাতাল স্থাপিত হয়। তবে এটা পূর্ণ হাসপাতাল রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি বলে মনে হয়। ঐ ভবনটির শীর্ষে এখনও ডাফরিন ডিসপেনসারী শব্দটি লিখা রয়েছে। বেশ কিছুকাল পর বিংশ শতাব্দীর চার দশকের প্রাক্কালে চাঁদার অভাবে লেডি ডাফরিন হাসপাতালটি মিটফোর্ড হাসতালের সঙ্গে একীভূত করা হয়। আর ঐ নলগোলাস্থ হাসপাতাল ভবনটিতে সিভিল সার্জনের দফতর স্থাপন করা হয়েছিলো।

অতঃপর আরো বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসেন মিটফোর্ড হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা কল্পে। তাদের মধ্যে নবাব সলিমুল্লাহ, পি. সি. রায়, লেবার ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা কল্পে রাজা রেবতী মোহন দাস, ল্যান্সসেলট্ হেয়ার ওয়ার্ডের জন্য টাঙ্গাইলের সন্তোষের রানী দিনমনি চৌধুরীনি ৫০,০০০/= টাকা, ১৮৮৯ সালে ভাগ্যকুলের জমিদার রাজা শ্রীনাথ রায় তার মাতা শুভদ্রমনি চৌধুরানীর স্মৃতিতে চক্ষু ওয়ার্ড নির্মাণে ৩০,০০০/= টাকা ১৯০৪ সালে ভাগ্যকুলের রাজা হরেন্দ্র লাল রায় বাহাদুর র‍্যাঙ্ককীন ওয়ার্ড নির্মাণে, হাসপাতালে পানিয় জল সরবরাহের জন্যে ১৮৮৬ সালে তৎপিতা স্বর্গীয় বাবু রায় চন্দ্র দাসের পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে। কিং এডওয়ার্ড ওয়ার্ডের জন্যে ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর। হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে আরও যারা দান করেছেন তারা হলেন রায় সাহেব গৌর নিতাই সাহা শঙ্খনিধি, সন্তোষের রাজা মন্মথ রায় চৌধুরী, রাজা জানকী রায় বাহাদুর (ভাগ্যকুল,) কুমার গোনিকা রমন রায় (সিলেট), বাবু প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ), মহারাজা স্যার গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর (দিনাজপুর), রাজা প্রমোথ নাথ রায় (দিঘপালিয়া), নওয়াব আব্দুল সোবান চৌধুরী (বগুড়া), রাজা সীতা নাথ রায় বাহাদুর (ভাগ্যকুল), রাজা মহেন্দ্র রায় চৌধুরী (কাকিনা), রাজা গোপাল রায় বাহাদুর, ত্রিপুরার মহারাজা, মহিগঞ্জের কুমার কামিনি বল্লভ সেন, ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম এর্ডওয়ার্ড প্রমুখ।

মিটফোর্ড হাসপাতাল সংলগ্ন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল নির্মাণের জন্য ঢাকার অধিবাসীরা ৬৪,০০০/= টাকা দান করেছিলেন। এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন

তদানীন্তন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ডাবলিউ, আর লারমিনি ১৮৮৭ সালের ২রা এপ্রিল, এর উদ্বোধন হয়েছিলো ১৮৮৯ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে, মেডিক্যাল স্কুলটির একতলা ভবন নির্মাণে আরো যারা হাজার বা তার চেয়ে কম টাকা দান করেছিলেন তারা হলেন রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর, বাবু রঘুনাথ দাস, রাজা সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুর, মীর মহম্মদ আলী, শ্রীমতি বিশ্বেশ্বরী দেবী চৌধুরানী, মহারাজা স্যার জতিন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাজা স্যার সুরেন্দ্র মোহন ঠাকুর, শ্রীমতি জাহ্নবী চৌধুরানী, শ্রী মতি বিন্দু বাসিনী চৌধুরানী, বাবু প্রাণ শংকর প্রমুখ।

মেডিক্যাল স্কুলে তখন বাংলায় ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। আজ ইহা আশ্চর্য বলে মনে হবে। তখন কয়েকজন শিক্ষক বাংলায় বই লিখে ছিলেন মুনতাসির মামুনের এক তথ্যে জানা যায়।

হাসপাতালের কেবিনগুলো পূর্বে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ড বলে পরিচিত ছিলো। এসব কেবিনে ইংরেজদের চিকিৎসা হতো, তখন এসব কেবিন এ দেশীয় লোক ভর্তি হতে পারতো না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ডি, সি, রায় রোডের একটি পরিত্যাক্ত বাড়ীতে বসন্ত রোগীদের ওয়ার্ডটিকে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে বাড়ীটি একটি ছাত্রাবাস।

মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পর প্রথমে ঢাকা পৌরসভার নিকট দায়বদ্ধ একটি গভর্নিং বডি এ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা করতেন। এ বৃহৎ গুরুদায়িত্ব তাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয় বিধায় সরকার ১৯১৭ সালে নিজেই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় হাসপাতালের মর্যাদা দান করেন। অতঃপর ১৯২৪ সালে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলটিকে এই হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেন। ১৯৬২ সালে এখানে মেডিক্যাল কলেজ চালু হয় এর নামকরণ হয় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ। এর প্রথম অধ্যক্ষ হন প্রফেসার মঃ ইব্রাহিম। হাসপাতালের আহসান উল্লাহ মহিলা ও শিশু ওয়ার্ডটি ভেঙ্গে বর্তমান এগার তলা ভবনে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ এলাকায় একটা ছোট্ট মসজিদ রয়েছে। সম্ভবতঃ নবাব শায়েস্তা খাঁর পরিবারদের নামাজের জন্য তৈরী হয়েছিলো। মসজিদটি এক সময় আগুন'এ পুড়ে গেলে পরবর্তীতে বর্তমান মসজিদ ভবন নির্মিত হয়। মসজিদের উত্তর পার্শেই নবাব শায়েস্তা খাঁর কন্যা শাহজাদী ওরফে লাভলী খানমের কবর রয়েছে। হাসপাতাল মেডিক্যাল স্কুলের নির্মাণ কাজ চলাকালে এ কবরটি ভেঙ্গে ফেলায় ঢাকার মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উত্তেজনা দেখা দিলে তৎকালীন ঢাকার নওয়াব ধর্মীয় নেতাদের ফতোয়া নিয়ে কবর যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পুনঃ স্থাপন

করে বিক্ষোভ নিরসন করেন।

মিটফোর্ড হাসপাতালটি ঐতিহাসিক ও স্মৃতি চিহ্ন বলে আখ্যায়িত করা যায়। কারণ এখানে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে, তেমনি অসংখ্য লোকের হাসি কান্না আর স্মৃতিতে বিজড়িত। হাসপাতাল ভবনটি স্মরণ করিয়ে দেয় বহু কালের বহু ঘটনার কথা। বুড়িগঙ্গার পানি যেমন যুগে যুগে অনেক গড়িয়েছে। এ হাসপাতালের ঘটনাপঞ্জীও অনেক গড়িয়েছে। যা বাংলাদেশের অন্য কোন হাসপাতালে ঘটেনি আর তেমন ঘটবেও না। স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৩০ সালের একটি ঘটনা। ২৯শে আগষ্ট তৎকালীন বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মিঃ এফ, জে, লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেনেডণ্ড মিঃ ই, হডসন অসুস্থ পুলিশ সুপারিন্টেনেডণ্ট মিঃ বাডকে দেখতে আসেন মিটফোর্ড হাসপাতালে। হঠাৎ একটি গাছের আড়াল থেকে গর্জে ওঠে পিস্তল ফটাস ফটাস করে ই, হডসন ঘটনা স্থলেই মারা গেলেন, আর মিঃ লোম্যান মারা যান হাসপাতালে দু'দিন পর। এ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব স্বীকার করে নিলো ঢাকার বিক্রমপুর নিবাসী মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বিনয় কৃষ্ণ বসু। যদিও এসব ঘটনা তৎকালীন সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত হতো, তবুও সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ছিলো বীরত্ব গাঁথা দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ। বিনয়কৃষ্ণ ও তার দু'সঙ্গী পরবর্তীতে কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ বাংলার কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেঃ কর্ণেল সিম্পসনকে গুলি করে। অনেকেই বলেন সেখানেই তাদের মহা প্রস্থান ঘটে। সঙ্গীদের পরে ফাসী হয়েছিলো। স্বাধীনতার পর কলিকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারের নামকরণ করা হয় বিনয় বাদল দীনেশবাগ তথা বি, বি, ডি, বাগ।

এই মিটফোর্ড হাসপাতালটি স্মরণ করিয়ে দেয় ঢাকার সেই সব মহামারীর কথা যখন বসন্ত কলেরায় হাজারে হাজার লোক আক্রান্ত হতো, মহল্লাকে মহল্লায় কোন পরিবারের একজনকে হাসপাতালে দিয়ে আসতে না আসতেই পরিবারের আরেকজন সেই রোগেই আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এক মৃত রোগীকে হাসপাতাল হতে এনে লাশ দাফন করতে না করতেই আরেকজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। কান্নার রোল পড়ে যেত হাসপাতাল কমপাউণ্ডে। অন্যান্য রুগী ও তার সেবক সাথীরা মৃত্যু ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতো। কোন কোন রুগী হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে যেতো বাড়ীতে সেখানেও আজরাইলের তাণ্ডব লীলা দেখে সেও পরপারে চলে যেতো। সে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হতো ঢাকার মহল্লাগুলোতে আর হাসপাতালে। মুসলমান পরিবারদের মধ্যেই এ রোগের বিস্তার ছিলো বেশী। কারণ তারা লেখা পড়া

জানতোনা, এ রোগের প্রতিকারেও এগিয়ে আসতো না, কুসংস্কারই ছিলো তাদের নিত্য সাথী। এ দৃশ্যই মিঃ রবার্ট মিটফোর্ডকে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করেছিলো। মহাখালী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত মিটফোর্ড হাসপাতালে বসন্ত, কলেরা, ধনুষ্টঙ্কার, জলাতংক, ডিপথেরিয়া, এমনকি যক্ষা রোগের চিকিৎসাও হতো, ঢাকায় পাক আমলে আরো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হলেও এসব রোগ ছোঁয়াচে বলে তারা গ্রহণ করতো না এমনকি তাদের এম্বুলেন্সগুলো পর্যন্ত এসব রুগী বহন করতো না।

আরো স্মরণ করিয়ে দেয় ইংরেজ আমলের ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোর কথা। রায়টের সময় আহত ব্যক্তিদের এটাই ছিলো শেষ আশ্রয় স্থল। কেউ বেঁচে যেতো আবার কেউ মরে যেতো। হাসি কান্নায় ভরে উঠতো হাসপাতাল প্রাঙ্গন। কত যসস্বী ডাক্তার, প্রফেসর, সার্জন এসেছেন বহু জটিল রুগীর চিকিৎসা অথবা অপারেশনের জন্যে। তারাও ঢাকাবাসী অনেকের মনে যুগে যুগে দাগ কেটে গেছেন। সুনাম ও যশ নিয়ে ফিরে গেছেন অনত্র। ঢাকার রায়টের শেষ পর্যায়ে মনে পড়ে শল্য চিকিৎসক ডাঃ আব্দুল্লাহর কথা, সেই ছিলো সে সময়ের মুসলমানদের আশার প্রদীপ। আজ তিনি বেঁচে নেই। ঢাকার প্রবীণরা আজও তাকে মনে করে। এমনিভাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ঢাকার অধিবাসীদের অনেকের অনেক স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে এই মিটফোর্ড হাসপাতাল। ঢাকা নগরীর মানুষকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রেখে গেছেন এবং রাখবেন এই হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ রবার্ট মিটফোর্ডের মহানুভবতা। যুগে যুগে মহান সৃষ্টিকর্তা এরূপ মহৎ হৃদয়ের মানুষ সৃষ্টি করেন বিভিন্ন জাতির মধ্য হতে। আর তারা পৃথিবীর বুকে রেখে যান সেবার এক উজ্জ্বল প্রদীপ শিক্ষা যা সহজে নেভেনা। নিভে গেলেও মানুষের মনে জ্বলতে থাকে অনেক কাল।

ঢাকার পথ ঘাটের নামের সঙ্গে আরেকটি নাম সংযোজিত হয়েছে সেটা হলো সোনার গাঁও রোড থেকে গ্রীন রোডের সংযোগ সড়ক। যাহার নামকরণ হয়েছে "পান্থ পথ" পান্থ মানে সরাই অর্থাৎ বর্তমান যুগের হোটেল। এখানে কাওরান বাজার এলাকায় মোঘল যুগে ছিলো সরাইখানা আর বর্তমানে রয়েছে সোনার গাঁও হোটেল। সেই পূর্ব যুগের সরাইখানা অথবা সোনার গাঁ হোটেলের স্মরণেই এর নামকরণ হয়েছে "পান্থ পথ"। ঢাকার রাস্তার নামের সঙ্গে আরও একটি সড়কের নাম যুক্ত হয়েছে "বিজয় স্মরণী" এটাও শেরে বাংলা নগরের পূর্বদিগস্থ রাস্তা থেকে পুরাতন এয়ারপোর্ট রোড তথা নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ রোড এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

এ নামটি মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানাদি তথা সামরিক কুচকাওয়াজ অথবা সমাবেশ এখানে হবে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে বিজয় স্মরণী।

হোসনী দালান সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে। ১৬৪২ সালে সুলতান সুজার শাসনামলে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক শিয়া দরবেশ বলে কথিত মীর মুরাদ নাকি স্বপ্নে দেখেন যে হযরত ইমাম হোসেন তাঁর কাছে এসে অভিলাষ প্রকাশ করেন যে তাঁর শাহাদতের স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখার জন্যে একটি মর্সিয়া গৃহ নির্মাণ করা হোক। তিনি প্রাতে ঘুম থেকে জেগেই বখসি বাজার এলাকায় একটি মর্সিয়া গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ হোসেনী দালান নির্মাণের কাজে হাত দেন। সেদিন থেকে অদ্যাবধি এই হোসেনী দালানে মহাসমারোহে পবিত্র মহররম পর্ব প্রতিপালিত হয়ে আসছে। কিছুকাল পূর্বেও মহাসমারোহেই এই পর্ব দশ দিনব্যাপী উদযাপিত হতো। শেষ তিন দিবসে এই নগরীর বুকে এক বিপুল প্রাণ-প্রবাহের সৃষ্টি হতো। মহররম দিবসের মিছিল দেখার জন্যে দূর-দূরান্তর থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দলে দলে লোক এসে যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে মিছিল অতিক্রম করতো, সেই সব রাস্তার পাশে সমবেত হতো। এছাড়া গৃহের জানালা, বারান্দা ও ছাদে মানুষের ভীড়ে তিল ধারণের জায়গা থাকতো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে উৎসুক জনতা মিছিল দেখার জন্যে অপেক্ষা করতো। মিছিলের সাথে হাতিঘোড়া সারি বেঁধে চলতো। আর বেহেস্তাদের বিভিন্ন বর্ণের নিশানের সমারোহে এই শহর এক নতুন রূপ ধারণ করতো। তাজিয়া আর মর্সিয়ার হৃদয়-বিদারী করুণ সুরে অনেকেরই চোখে পানির ধারা বইতো। কেউ বা শেহরা শিন্নি, কেউ বা কবুতর-মুরগি আল্লাহর রাহে বড় বড় তাজিয়ার উপর নিক্ষেপ করতো। সূর্যের প্রখর রোদ, কনকনে শীত, দুর্যোগপূর্ণ ঝড় ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি বাদল উপেক্ষা করে লোকজন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাজিয়া ও মিছিল দেখার জন্যে অপেক্ষা করতো। সে কি উত্তেজনা, আহাজারি আর হৃদয় বিদারক শোককুল মানুষের চোখেমুখে করুণ দৃশ্যের অবতারণা! সবাই যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তো। অবশেষে একের পর এক মিছিল চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যেতো। মিছিলের দিকে তাকালে শুধু দেখা যেতো মানুষের মাথা আর মাথা– অসংখ্য অগণিত যেন শোকাকুল মানুষের সমুদ্র! কিন্তু আজ আর তেমন নেই। নবাব শায়েস্তা খাঁর বংশধরদের লোপ পাওয়ার সাথে সাথে মহররম মিছিলের জৌলুসও দিনে দিনে কমে আসছে। যাঁরা এর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাঁরা আর ইহজগতে নেই– সেজন্যেও এর জৌলুসে ভাটা পড়ে আসছে। তবুও কিছু সংখ্যক লোক সেই পুরনো প্রথার সুত্র ধরে কোন রকমে পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করে চলেছে।

এখন আর আগের মত সহস্র প্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত এই হোসনী দালান প্রাঙ্গনে ভক্তদের তেমন ভীড় হয় না। এ উপলক্ষ্যে আজিমপুর কারবালা ময়দানেও তেমন বিপুল সমারোহে মেলা বসে না। তবুও ভীড় হয়, দূর-দূরান্ত থেকে বহু লোক এসে ভীড় জমায়, আহাজারি আর মর্সিয়ায় শরীক হয়। পাক আমলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ইমামবাড়া স্থাপিত হওয়ায় বিভিন্ন গোত্রের লোক নিজেদের পছন্দ মাফিক তাজিয়া মিছিল বের করে নতুন নতুন রাস্তা প্রদক্ষিণ করতো। বিরাট মিছিলের চেয়ে তখন খণ্ড মিছিলের সমারোহই ছিলো বেশি।

সমগ্র পৃথিবীতে মহর্‌রমের ন্যায় এমন শিক্ষাপ্রদ, নির্দোষ ও উৎসাহজনক উৎসব বোধ করি আর নেই। অধম আর অদূরদর্শী বলেই আমরা এ পর্বকে দূরে ঠেলে দিয়ে অনৈসলামিক রীতিনীতি আর অবহেলার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করে চলেছি। জীবন্ত ও বীর জাতির উৎসব অলস ও লক্ষ্যহীন মানুষের কাছে আদৃত হবে কেন? বীরকুলশ্রেষ্ঠ হযরত ইমাম হোসেনের অতুলনীয় আজাদী স্পৃহার জ্বলন্ত ও প্রাণপণ উপস্থাপন, প্রাণহীন স্বার্থান্ধদের ভালো লাগবেই বা কেন? কাপুরুষের কাছে বীরত্ব, বধিরের কাছে সঙ্গীত, অলসের কাছে উৎসাহ কোনদিনই সমাদৃত হয়নি। অথচ এই দশ দিন মুসলমানরা ইমাম হোসেনের অপূর্ব আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত হয়ে গগনে পবনে উল্লাস ছড়াতো। রোগী শয্যা থেকে উঠে বসতো, ভীরু সাহস পেতো, হতাশ ব্যক্তি আশায় মেতে উঠতো, উৎপীড়িত আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ হতো, সাহসী ও বীরদের মন শৌর্যেবীর্যে পূর্ণ হতো। সমগ্র মুসলিম জাহানে জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রভাব প্রকাশ পেতো। এই দিনগুলোর ভাব প্রকাশে মুসলমানরা বাহুতে শক্তি, মস্তিষ্কে তেজ, মনে আনন্দ আর অন্য দিকে আল্লাহর ইবাদতে হৃদয় পবিত্র করে সত্যের জন্যে শহীদ হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করতো।

এই হোসনী দালান প্রাঙ্গনে যে সমাধিগুলো অবস্থিত তাতে সমাহিত আছেন ঢাকার শেষ চারজন নায়েব নাজিম। এঁরা হলেন নওয়াব নসরত জঙ্গ (১৮২২), শামস্‌উদ্দৌলাহ্ (১৮৩১), কামারউদ্দৌলাহ্ (১৮৩৪) এবং গাজী উদ্দিন। ১৮৪৩ সালে গাজী উদ্দিন নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করলে, কোম্পানী নায়েব নাজিমের পদ বিলোপ করে পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে হোসেনী দালানটি ক্ষতিগ্রস্থ হলে নবাব সলিমউল্লাহ সংস্কার সাধন করেন। এছাড়া ঢাকার নবাব পরিবার এই মহররম পর্ব সমাধার জন্যে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতাও করে আসছিলেন। হোসেনী দালান নাম হতেই হোসেনী দালান রোড নামের উৎপত্তি। আজও এই রোডটি হোসেনী দালান রোড নামে সবার কাছে পরিচিত। হোসেনী দালান হিজরী

১০৫২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। হোসেনী দালানের নহবতখানায় উত্তর দিকের রাস্তার অপর পারে খাজা আব্দুল করিমের মাজার অবস্থিত। এর পার্শ্বস্থিত জায়গাটি বাগে বুজর্গ উমিদ খাঁ নামে পরিচিত ছিলো। যেটি আজ নবাব গার্ডেন বা নবাব বাগিচা নামে পরিচিত। উমিদ খাঁ নওয়াব শায়েস্তা খাঁর পুত্র। তিনিই চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন।

হোসেনী দালানের ব্যয় কমাবার জন্য বাৎসরিক বৃত্তি নবাব জেসারত খাঁ কমিয়ে দিতে চাহিলে ঢাকায় মুসলমানরা মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজের নিকট দরখাস্ত করলে নবাব সিরাজ পূর্বের ন্যায় ঢাকার নিজামত হতে খরচ করার জন্য নবাব জেসারত খঁকে নির্দেশ দান করেন। অতঃপর ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি মিঃ সোর ১৭৮৮ সালে ঢাকায় আগমন করে অন্যান্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে হোসেনী দালানের বৃত্তিরও উচ্ছেদ সাধন করেন। মিঃ সোরের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তদানীন্তন নায়েব নাজিম হাসমৎজঙ্গ বাহাদুর কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করলে গভঃমেণ্ট ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) সিক্কাটাকা বৃত্তি স্বরূপ নির্দ্ধারণ করে দেন। এবং জীর্ণ দালান সংস্কার কল্পে এককালীন ১৮০৭ সালে ৩০০০ ও ১৮১০ সালে ৪০০০ সিক্কাদান করেন। তৎপর জীর্ণ দালান সংস্কারের জন্য কোন অনুদান দেওয়া হবে না বলে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮৩৪ সালে ঢাকার শেষ নায়েব নাজিম মারা গেলে নতুন মুতওয়াল্লির জন্যে কালেক্টর সরকারের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু মহররম পর্ব নিকটবর্তী থাকায় সরকারের নিকট হতে বৃত্তি না পাওয়ায় খাজা আলিমউল্লা সে বৎসরে মহররম পর্বের সমূদয় খরচ বহন করে। অতঃপর সরকার তাকেই মোতয়াল্লি নিযুক্ত করেন এবং তাহা পুরুষানুক্রমে চলে। এরা সূন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও অজস্র টাকা প্রতিবছর এ ব্যাপারে ব্যয় করে গেছেন। তৎপর হতে ঢাকার আহসান মঞ্জিলের নবাবগণই এর পৃষ্ঠপোষকতা করে আসতেন। এই হোসেনী দাল্যনের ব্যয় নির্বাহের জন্য মীর মুরাদ বহু জমিজমা প্রদান করে ছিলেন। হিজরি ১১৩১ সালে তার মৃত্যুর পর তারই বংশধরগণ ধীরে ধীরে সমূদয় সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলেন। এ দালানে একজন দারোগা নিযুক্ত থাকতেন তিনি মুতয়াল্লির নির্দেশে সকল কাজ সমাধা করতেন। আজও দারোগা পদ অক্ষুণ্ন আছে। বর্তমানে এপদে আরমানি সাহেব অধিষ্ঠিত আছেন। পূর্বকালে রোজার দিনে শত শত লোককে এখানে ইফতার করানো হতো।

হোসেনী দালান রোডে ইয়াকুবের ইমামবাড়াটির এখনও অস্তিত্ব আছে। এখান হতে এখনও মহরর্মের মিছিলের সঙ্গে তাজিয়া ও পাঞ্জা আলম বের হয়। এটি ঢাকার প্রাচীন ইমামবাড়া গুলোর অন্যতম।

নিমতলী এলাকার সন্নিকটে রয়েছে নওয়াব কাটরা। এই নবাব কাটরায় মুর্শিদাবাদ

নওয়াবদের আমলে ঢাকার নবাব নাজিমদের আত্মীয় স্বজন ও পরিবার বর্গের জন্য বেশ কিছু দরদালান নির্মিত হয়েছিলো। দরদালানকে কাটরা বলা হতো সে সময়ে। যেহেতু নবাব পরিবারদের জন্য কাটরা নির্মিত হয়েছিলো তজ্জন্য উক্ত মহল্লাটিকে নওয়াব কাটরা বলা হয়ে থাকে। তৎকালের ২/১টি বাড়ী আজও বর্তমান রয়েছে বলে সেখানকার বাড়ী ঘরগুলো দেখলে মনে হয়। নিমতলীর বার দুয়ারীর আসে পাশে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ছাত্রাবাস প্রাঙ্গনে যে সব প্রকাণ্ড জলাশয় রয়েছে তা নবাব বেগমদের জন্য খনন করা হয়েছিলো। এ মহল্লায় নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলের একখানা মসজিদ রয়েছে। মহল্লাবাসী সে মসজিদটিকে ছাতাওয়ালা মসজিদ বলে থাকে।

ঢাকা শহরে প্রায় সব মহল্লায় কয়েক যুগ পূর্বেও কমবেশী নিমগাছ প্রতি বাড়ীতে ছিলো। নিমতলী এলাকায় নিমগাছের অধিক সমাহার থাকায় সেটি নিমতলী নামেই পরিচিত হয়ে পড়ে। পূর্বে মহল্লাটি বাগে মুসা এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

ঢাকার মোঘল শাসনামলে মুসলিম রাজনৈতিক নাট্যের শেষ দৃশ্যগুলো অভিনীত হয়েছিলো এই নিমতলী কুঠিতে। কোম্পানী প্রদেশের দেওয়ানী শাসনভার গ্রহণ করলে ১৭৬৫ সালে কেল্লাস্থ প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হয়ে বড় কাটরায় স্বল্পকালীন অবস্থানের পর নায়েব নাজিম নওয়াব জেসারত খাঁ নিমতলী কুঠিতে যেয়ে উঠেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তার বংশধরগণ এখানেই বসবাস করেন। শেষ নায়েব নাজিম অপুত্রক অবস্থায় মারা যাওয়ার সাথে সাথেই মুসলিম সার্বভৌমত্বের শেষ চিহ্নটুকু বিলীন হয়ে যায়। শতাব্দীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ কাল ধরে হৃত গৌরব হারিয়ে নায়েব নাজিমগণ তাদের দরবার বসাতেন। কিন্তু এ দরবার ছিলো প্রহসনের মত, প্রাচীন শান শওকত প্রদর্শনের নিষ্ফল প্রয়াস। অতীত মহিমায় নিরর্থক বহিঃপ্রকাশ এবং প্রাচীন ঐতিহ্য ও রীতিকে আকড়ে ধরে থাকার ব্যর্থ চেষ্টামাত্র। সকল মর্যাদা ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে এই কৃত্রিম দরবার বসিয়ে তার মধ্যে তারা সান্তনা খুঁজতেন। বিগত শাসনামলের শৌর্যবীর্য ও প্রতাপের কাছে এটি বড় করুণ ও মর্মান্তিক অধ্যায়ের সূচনা করতো। এ ছিলো অতীত গৌরবের কাছে একটা মূর্তিমান ব্যঙ্গ বিশেষ। সোনার বদলে জরি। পূর্ব দিকের ফটকের সম্মুখভাগে একটি গৃহে কোম্পানীর সিপাহী বাহিনী থাকতো। মোঘলদের শক্তি যে অতীতের বস্তু তাদের অবস্থিতি সর্বক্ষণই সে কথাই সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতো। একে একে তাদের শৌর্যবীর্য, শক্তি, লোকজন, সহায় সম্পদ যখন বিলুপ্তির পথে তখন তাদের প্রাসাদটিও নিলামে বিক্রি করা হয়। এই সময়ে তাদের নির্মিত ভবনগুলোও ধ্বংস করে দেয়া

হয়। বারদরওয়াজা বিশিষ্ট "বার দুয়ারী" নামে একটি সুন্দর কারুকার্য খচিত ভবন আজও জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় মাথা উঁচু করে নিমতলী কুঠির অস্তিত্ব ও ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এরই এক অংশে এশিয়াটিক সোসাইটি অন্য অংশে ১৯২১ সালে এন, কে ভট্টাশালীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ঢাকা যাদুঘর। বর্তমানে এ ভবনটি ইউনিভারসিটি কতৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে যাদুঘর স্থাপনের কাজ মিঃ ভট্টাশালীর উদ্যোগেই মেডিক্যাল কলেজের একটি কামরায় শুরু হয়। বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরের সংগৃহিত মূল্যবান দ্রব্যগুলো শাহবাগস্থিত জাতীয় যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। নিমতলীতে হজরত জরীপ শাহ্‌ের মাজার রয়েছে। তিনি বুজুর্গ ও কামেল ব্যক্তি ছিলেন। জরীপ শাহ্‌ বাদশাহ আলমগীরের সমসাময়িককালে ছিলেন।

কথিত আছে নবাব সিরাজউদ্দোল্লার মীর মুন্সী মহম্মদ দেওয়ান পাল্কীতে চড়ে মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পান নবাব সিরাজের খণ্ড বিখণ্ড দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত অবস্থায় পড়ে আছে। তা সন্দর্শনে দেওয়ানের মনে বৈরাগ্যের ভাবের উৎপত্তি হয়। ফলে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নানা ধর্মস্থান পর্যটন করে অবশেষে আজিমপুরার একস্থানে আল্লাহর এবাদতে মশগুল হন। তাঁর সাধনা সিদ্ধি হয়। মহম্মদ দেওয়ানের বংশধরের একটি শাখা বর্তমান বাবুপুরা স্থানে বসবাস করা আরম্ভ করেন। সেই বংশের বাবু খাঁ দেওয়ানের নামানুসারে বাবুপুরা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

১১১৮ হিজরীতে মোসাম্মৎ মরিয়ম বাবুপুরায় তিনগম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করান। ঐ একই বছর তিনি ইন্তেকাল করেন। মসজিদের পিছনে তার কবর রয়েছে। তিনি মগবাজারের শাহ্‌ সাহেব শাহনুরীর বোন ছিলেন। বাদশা আলমগীরের আমলে বাবুপুরা অঞ্চলটি খুব জনবহুল ছিলো। বাবুপুরা মসজিদের দক্ষিণে হজরত শেখ আব্দুল্লাহ ও হজরত শেখ গোলাম মুহম্মদের মাজার রয়েছে। শেখ গোলাম মুহম্মদ শাহ্‌ নূরীর দাদা ছিলেন। বাবুপুরা শাহ্‌ সাহেবদের নাম আজও লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে।

বখশীবাজার রোডে মোঘল শাসনামলে কর্তৃপক্ষের পে-মাষ্টারগণের (অর্থাৎ বখশীগণের) সরকারী বাসস্থান ছিলো বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া এখানে কয়েকজন বখশী মিলে একটি বাজার স্থাপন করেছিলেন বলে এ স্থানটি বখশীবাজার নামে পরিচিত। এখানে বিতর্কিত কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের একটি মসজিদ রয়েছে। এ মসজিদটি বাংলাদেশের কাদিয়ানীদের প্রধান কেন্দ্র। এখান হতেই কাদিয়ানী প্রচার

কার্য চলে থাকে। এই বখশীবাজার এবং গিরদে উর্দূ রোডের একটি অংশ ১৯৩৮ সালে ঢাকা পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার উমেশদত্তের নামানুসারে উমেশ দত্ত রোড নামে নামকরণ হয়।

এই উমেশ দত্ত রোডে বৃটিশ যুগে প্রতিষ্ঠিত নবকুমার ইনষ্টিটিউশন নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। এটি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বর্তমান সরকারী বদরুন্নেছা কলেজের স্থানটিতে। নবকুমার ইনিষ্টিটিউশনে বেশ ক বছর হলো স্থাপিত হয়েছে জ্ঞান তাপস বহু ভাষাবিদ ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র নামানুসারে ডঃ শহীদুল্লাহ্ কলেজ। ডঃ শহীদুল্লার স্মরণে দেশের বহু এলাকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আরো রয়েছে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহ্ হল। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৮৮৫ সালে চব্বিশ পরগনা জেলায় পেয়ারা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ছোট বেলায় তার ডাক নাম ছিলো সদানন্দ, আকিকার নাম ছিলো মুঃ ইব্রাহীম, মায়ের দেয়া নাম শহীদুল্লাহ্ ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এণ্ট্রাস পাশ করে কলকাতার কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি, এ পাশ করেন। অতঃপর এম, এ পাশ করে ১৯২৮ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ছোটবেলায় স্কুলে মৌলভী সাহেবের মারের ভয়ে পারসী না নিয়ে নিয়েছিলেন সংস্কৃত। বাড়ীতে আরবী পারসী ও উর্দুর চর্চা ছিলো সাধারণ ভাবেই। পাড়ায় ছিলো উড়িষ্যা ও বিহারের বাসিন্দা। তাদের ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলতে বলতে তিনি হিন্দি ও উড়িষ্যা ভাষাও শিখে ফেলেছিলেন। তিনি আঠারটি ভাষা বেশ ভালোভাবেই জানতেন অনেকের মতে আরো বেশী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন এক সাত্ত্বিক পুরুষ। ধীর-স্থির ও সংযমী। নীতির প্রশ্নে ছিলেন অটল। তিনি যেমন অনেক বই লিখে গেছেন, তেমনি পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। বছর চারেক তিনি আইন ব্যবসাও করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহবানে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা গবেষণা এবং এর উন্নয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রফেসর এমোরটাস নিযুক্ত করা হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপকের কাজ করেন। অতঃপর ১৯৩৭ সালে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন।

১৯৫৯ সালে করাচীতে উর্দু উন্নয়ন বোর্ডের উর্দু অভিধানের সম্পাদক, ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমীতে আঞ্চলিক ভাষার অন্যতম সম্পাদক রূপে যোগদেন। তিনি

এক সময় বশির হাট পৌর সভার চেয়ারম্যান ও চব্বিশ পরগনা জেলা বোর্ডের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সাথেও তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিলো। তার বিশ্ব ভারতীয় প্রথম ম্যানেজিং কমিটিতে ডঃ শহীদুল্লাহ্ অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৯২১ সালে সমগ্র ভারত বর্ষে যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জোয়ার উঠেছিলো তখন ভারতের সাধারণ ভাষা কি হবে তা নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হলো। অধিকাংশ লোকের মত হিন্দি। অনেকে উর্দুর পক্ষেও মত প্রকাশ করে। কিন্তু শান্তি নিকেতনের কবি গুরুর সভাপতিত্বে ভাষার উপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ডঃ শহীদুল্লাহ্ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন সাহিত্যের শক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতে একটি মাত্র ভাষা সাধারণ ভাষার দাবী করতে পারে তা বাংলা ভাষা। তিনি অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে সেদিন তার দাবীর পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন, পাক আমলের ভাষা আন্দোলনেও তিনি ছিলেন অগ্রদূত। ডঃ শহীদুল্লাহ্ ১৯৪৮ সালে বগুড়া থাকাকালেই রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে তা অকুতোভয়ে বলেছিলেন।

১৯৪৮ সালে মিঃ জিন্নাহ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হবে ঘোষণা দিলে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিলো তার সমাধান কল্পে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য পাকিস্তান সরকার একটি কমিটি গঠন করে সে কমিটির একজন অন্যতম সদস্য হিসেবে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু এই কার্য্যক্রমকে "বাতুল প্রচেষ্টা" আখ্যায়িত করে সে কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় তদানীন্তন পূর্ব বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের যে মহা সম্মেলন হয় সে সম্মেলনের সভাপতির ভাষনে তিনি বলেছিলেন বাংলা ব্যতিত অন্য কোন ভাষা পূর্ব বঙ্গের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রয়োজনে বিদ্রোহ করতে হবে। কেননা এটা পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্য গণহত্যার সামিল।

বই ছিলো ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র খুব সখের জিনিস। বই কেনার জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁর স্মরণ শক্তি এত প্রখর ছিলো যে কোন বিষয় দু'তিনবার পরে মুখস্ত বলতে পারতেন। তিনি বলতেন কেউ আমাকে শাস্তি দিতে চাইলে আমাকে বই এর রাজ্য থেকে সরিয়ে রাখতে হবে। কারণ বই না পড়তে পারলে আমি মরে যাবো। যৌবনে ভাষা শেখা অনুশীলনের একটি খাতা সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরম যত্নে নিজের কাছে রেখে ছিলেন।

তিনি ঢাকায় এসে পুরনো ঢাকায় বেগম বাজারে বাড়ী করে ছিলেন। বহু সরকারী কর্মকর্তা ও গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁর এ বাড়ীতে এসে সাক্ষাৎ করতেন। শেরে বাংলা গভর্ণর পদে আসীন থাকাকালে একদিন ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র বাসায় আসার পথে বেগম বাজারের সরু রাস্তায় গাড়ী আটকে গেলে ডঃ সাহেব খবর পেয়ে হেটে গিয়ে গাড়ীতে বসেই দু'জনে অনেক কথা বলেছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি গণচীন সফর করেন, মাওসেতুং এর নেতৃত্বে গণচীন জাতীয় জীবনে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে তিনি তার ভূয়সী প্রসংশা করতেন।

ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র কাছে ঢাকার এক আদি ব্যক্তি এসেছিলেন রোগের চিকিৎসার জন্যে। সে যখন জানতে পারলো তিনি রোগের ডাক্তার নন ভাষার ডক্টর তখন অবাক না হয়ে পারলো না। ঢাকার অনেক অধিবাসী ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌কে লফ্‌সের ডাক্তার বলতেন। "লফ্‌স" শব্দের অর্থ ভাষা।

স্বদেশের প্রতি ডক্টর সাহেবের ছিলো গভীর মমত্ববোধ। স্বদেশের কাপড় চোপড় পরিবারের সকলকে পড়তে দিতেন। নিজেও খদ্দরের তৈরী আচকান পরতেন। ১৯৫৮ সালে ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহিত্য সাধনার জন্য স্বীকৃতি গৌরব পদক লাভ করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই সম্মানের অধিকারী হন।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ দেখতে ছিলেন একজন দরবেশের মত। জীবনে ধুমপান করেননি, বেটে-খাটো গোলগাল চেহারা। মাথায় সব সময় টুপি এবং হাতে ছাতা বা লাঠি, আর বই কাগজ ভর্তি একটা ব্যাগ নিয়ে নিরহংকার সাদাসিধেভাবে নিজস্ব একটা বিশিষ্টতা নিয়ে চলতেন। জীবনে নানা উত্থান-পতনের এই বিশিষ্টতার কোন পরিবর্তন করেননি।

১৯৩৯-৪০ সালে ঢাকার মুসলিম মহিলাদের ঈদের জামাত হয়েছিলো কার্জন হলে। এ নামাজে ইমামতি করেছিলেন ডঃ শহীদুল্লাহ্। তজ্জন্য ঢাকার বেশ কিছু লোক ও উলেমা ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলো। তারা একদল লাঠিয়াল বাহিনীও পাঠিয়েছিলো জামাত যাতে না হয়। কিন্তু ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র শান্ত কথায় তারা ফিরে যায়। কোন একটি মহল থেকে ফতোয়াও বের হয়েছিলো এই মর্মে যে, এই ইমামুন নেসাকে (মহিলাদের ইমাম) কতল করা উচিত। অবশ্য পরবর্তীতে সুন্নি মুসলমান মহিলাদের ঈদের জামাত আর হয়নি। তবে ইউনির্ভাসিটি মাঠে ওহাবী মতবাদী মহিলা ও পুরুষদের জামাত আজ অবধি হয়ে আসছে।

১৯৬৭ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর ডঃ শহীদুল্লাহ্ ষ্ট্রোক হয়ে পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয়ে পরেন। বাক শক্তি অনেকটা রহিত হয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালের ১৩ই জুলাই সকাল

বেলা অগণিত মানুষকে শোকাভিভূত করে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না---- রাজেউন)। কার্জন হলের ঐতিহাসিক মুসা খান মসজিদের পশ্চিম পাশে তাঁর দাফন করা হয়।

জীবনের শেষ দিকে তিনি আমাদের আজাদ মুসলিম ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। এবং আমাদের জনহিতকর কার্যাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহ ভরে অবহিত হন।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ কলেজের কিছু ছাত্র শহীদ মিনারের পাদদেশে ঐ এলাকার আশে পাশে যে সব বাড়ীতে চাকর চাকরানীর কাজে ছেলে-মেয়েরা নিয়োজিত তাদেরকে লেখা পড়া শেখাতেন। এই কর্মসূচীর প্রতি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হোসেন আখতার বেশ আগ্রহী হয়ে একদিন আমাকে এদের কর্মকাণ্ডে সহায়তার জন্য বলে। আমি নিজেও দেখে খুব আনন্দিত হই। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে শহীদদের আত্মার শান্তির জন্য এটাই সর্বত্তোম কাজ। তাই শহীদ বেদীতে একদিন তৎকালীন সমাজ কল্যাণ বিভাগের পরিচালক মহোদয়কে সঙ্গে নিয়ে কলেজ ছাত্রদের উপস্থিতিতে আমাদের পারিবারিক ও আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স এর পক্ষ হতে তাদের বই পত্র এবং ভাল কাপড়-চোপর কেনার জন্য আর্থিক সহযোগিতা দান করি। কলেজ ছাত্রদের এই মহান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ রেখে ভবিষ্যতে আরো সহযোগিতার আশ্বাস দেই। অন্য দিকে কলেজ ছাত্রগণও আমাদের আশ্বাস দেন তাদের এ প্রচেষ্টার আরো প্রসার ঘটাবেন বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু দিন যেতে না যেতেই সেই নিরক্ষর ছেলে-মেয়েদের পাঠদানের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, এতে শুধু আমরা মর্মাহত হইনি। ভাষার জন্য শহীদের আত্মাও কষ্ট পেয়েছেন বলে মনে করি।

মোঘল আমলে বখশী বাজারের কাছে চূহার বাজার নামে একটি যায়গা ছিলো। চূহা শব্দের অর্থ ইদুর। উর্দু ভাষি লোকেরা ইদুরকে চূহা বলে থাকে। আমরাও ছোট বেলায় দেখেছি অনেক বাড়িতে সাদা ইদুঁর প্রতিপালন করতো এবং এর বেচা কেনাও চলতো। মনে হয় এখানে সে ধরনের ইদুঁরের বাজার বসতো। সে জন্যেই এ ছোট্ট এলাকাটি চূহার বাজার নামে পরিচিতি লাভ করে। পূর্বে এখানে কবরস্থান ছিলো। ১৯২১ সালে মাত্র তিনশ টাকার বিনিময়ে ঢাকা পৌর সভা সে মহল্লাটির নাম জয়নাগ লেন রাখেন। লেনটি আজ জয়চাঁদ নাগ রোড নামে পরিচিত। জয়নাগ বাবু বিক্রমপুর এলাকার জমিদার ছিলেন। চূহার বাজারের সঙ্গে বানরটুলী নামেও একটি ছোট্ট এলাকা ছিলো। এটিও জয়নাগ ও কমলদহ রোডের সঙ্গে একত্রিভূত হয়ে গেছে।

আজ আর এ নামের কোন অস্তিত্ব নেই। এ নামটি কখন কে রেখেছিলেন বা কেন রাখা হয়েছিলো আর তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন, এখানে বানরদের আস্তানা ছিলো বলেই এ এলাকাটি বানরটুলী নামে পরিচিত হয়। ঢাকা শহরে চার দশক পূর্বেও বিশেষ করে ঢাকা শহরের পশ্চিমাঞ্চলে বানরের উৎপাত ছিলো খুব বেশী। অবশ্য শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও ছিলো, যেমন সিদ্দিক বাজারে বান্দরটুলী নামে একটি স্থানীয় নামে স্থান ছিলো। এসব বানর গাছ-গাছালি ও বাড়ির ছাদে লাফালাফি করতো। তাদের উৎপাতে গাছের লাউ-কুমড়া থেকে আরম্ভ করে ফল ফলাদি কিছুই থাকতো না। এমনকি ভোর বেলা শত শত বানর দল বেঁধে রাস্তার মাঝখানে এমন বেপরোয়াভাবে বসে থাকতো যে পথচারীদের প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই থাকতো না। এরূপভাবে তাদের বসে থাকতে দেখে অনেকেই পথ চলতে ভয় পেতো। ভয়ে একা তাদের সামনে দিয়ে যেতে কেহ সাহস পেতো না। চার-পাঁচ জন একত্রিত হলে তবে বুকে সাহস সঞ্চার করে ধীর পদক্ষেপে পথ করে বানর দলকে অতিক্রম করে যেতো। অন্যদিকে তারা পথে বসে মনের সুখে একে অপরের উকুন মারতো। বানররা স্বভাবতই উচ্ছৃঙ্খল প্রাণী। কিন্তু তাদের যেমন ছিলো বুদ্ধি, তেমনি ছিলো সাহস, তারা সুযোগ বুঝে মানুষের মত ঘরের শিকল খুলে ঘরে ঢুকে খাবার-দাবারগুলো সাবাড় করে দিতো। রান্না করা ভাতের হাঁড়ি পাতিল নিয়ে গিয়ে উঠতো ঘরের ছাদে, গাছের ডালে, খাবার না পেলে অনেক সময় কাপড়-চোপড় নিয়ে গিয়ে গাছে বা ছাদে উঠতো, গৃহিনীরা আদর করে খাবার-দাবার দিলে তবেই তারা সেগুলো ফেরৎ দিতো, নতুবা ছিঁড়ে-খুড়ে একাকার করে দিতো। তারা ছেলে পুলের হাত থেকেও খাবার ছিনিয়ে নিতো। বানরের ঘ্রাণ শক্তি খুবই প্রখর, তাই তারা বাজারের ঝাকা থেকে কেবল মাত্র খাবারের ঠোঙ্গাটি একহাতে খালই খানা ধরে অন্য হাতে ঠোঙ্গাটি বের করে নিতো। এতে বাধা দেবার সাহস কারও হতোনা। বাধা দানের চেষ্টা করলেই বত্রিশখানা দাঁত খিঁচিয়ে তেরে আসতো। এক কথায় বানরের উৎপাতে তখন এসব এলাকার মানুষ সব সময়ই সন্ত্রস্ত থাকতো। অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ অনেক সময় গুলি করে বানর মেরে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। তাদের মধ্যে ঝগড়া লাগলে বিরাট দলবেঁধে দু'দলে ঝগড়ায় সামিল হতো। মাদি বানরদের বুকে পিঠে ছোট্ট বাচ্চারা চিমটি কেটে মাকে তখন জড়িয়ে থাকতো। বানর এখন ঢাকায় দেখা যায় না বল্লেই চলে। তবে কোন কোন মহল্লায় দেখা যায়। ঢাকার গাছ পালা কমে আসায় বানরদের সংখ্যা খুবই কমে এসেছে। কালে হয়তো শহরে বানরের অস্তিত্ব দেখা যাবে না। লোকালয় ছেড়ে

অন্যত্র চলে যাবে। আর ঢাকাবাসীরা তখন চিড়িয়াখানায় বানর দেখে উল্লাসিত হবে।

ঢাকা থেকে টঙ্গী তৎকালীন টোক পর্যন্ত যে বৃহৎ রাস্তা রয়েছে তা প্রথমে ডিস্ট্রিক ফেরী ফাণ্ডের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। এটাই ঢাকা জেলার সর্ব প্রধান পথ। এ রাস্তায় ঐতিহাসিক টঙ্গীপুল রয়েছে। অনেকগুলো পুলের মধ্যে টঙ্গীর পুলও মীর জুমলা ওরফে খাঁন খানান মোয়াজ্জেম খাঁ তৈরী করেন। মতান্তরে অন্যেরা বলে থাকেন শাহ টঙ্গী নামক জনৈক ফকির নবাব ইব্রাহীম খাঁর সময়ে তৈরী করে ছিলেন। মীর জুমলার তৈরী পাগলার পুলের গঠন প্রণালীর অনুরূপ বলে অধিকাংশ ব্যক্তি টঙ্গী পুলের নির্মাতা মীর জুমলা বলে বিশ্বাস করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঢাকার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কার্নাকেলের আদেশানুসারে এই পুলের কতকাংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়। এখানেও অন্যদের মতে একটি খিলান বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় পরে এই লৌহ নির্মিত সেতু এস্থানে নির্মিত হয়। তাহাও ১৮৯০ সালে প্রবল বন্যার স্রোতে বিনষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে পুলটি নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে তৈরী হয়েছে।



বৃটিশ যুগের টঙ্গি পুলের ভগ্নাবশেষ

ঢাকা মহানগরীর পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত কালুনগর এলাকাটিতে কালা মিয়া সরদার নামে বহু পূর্বে একজন প্রভাবশালী সরদার বসবাস করতেন। তারই

নামানুসারে মহল্লাটির কালুনগর নামকরণ হয়। এ নামটি বৃটিশ যুগে বিকৃত হয়ে কিছু দিন কালিনগর বলে উল্লেখিত হতো। পরবর্তীতে আবার কালুনগর বলেই পরিচিত হয়ে আসছে।

গেণ্ডারিয়া কদম রসুলের নিকটবর্তী একটি রেলক্রসিং ছিলো এবং ক্রসিং সংলগ্ন একটি কাঠের ঘর ছিলো। যা থেকে রেল আগমনের সময় ঘণ্টাধ্বনি করা হতো। ঘরটি থেকে ঘণ্টাধ্বনি করা হতো বলে লোকে এটিকে ঘণ্টাঘর এর পরিবর্তে ঘুণ্টিঘর বলতো। আর এই ঘুণ্টিঘরের নামানুসারে পার্শ্ববর্তী এলাকাটি ঘুণ্টিঘর নামেই পরিচিতি লাভ করে। অনেকে আবার গুমটি ঘরও বলতো। এখানে ঘুণ্টিঘর মসজিদ নামে একটি মসজিদ রয়েছে।

অত্র এলাকায় সরাফত উল্লাহ্ নামে এক বিত্তশালী ব্যক্তি বহুকাল পূর্বে এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন হতেই এলাকাটি সরাফতগঞ্জ নামে পরিচিত। গেণ্ডারিয়া এলাকাটি এককালে আঁখক্ষেত দ্বারা পরিপূর্ণ থাকলেও সরাফতগঞ্জ এলাকায় মানুষের বসতি ছিলো। বাজারটি যদিও অনেককাল পূর্বেই উঠে গেছে তবুও পৌর রেকর্ডপত্রে সরাফতগঞ্জ নামটিই বহাল রয়েছে।

ঢাকার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উত্তরে একটি নতুন সড়কের নামকরণ করা হয়েছে 'রবীন্দ্র স্মরণী'। বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথের নামানুসারে। কবিগুরুর জন্ম ১৮৬১ সালে কোলকাতার জোড়া সাঁকোতে। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। পিতামহ প্রিন্স দ্বারাকা নাথ ঠাকুর। প্রচুর জমিদারী ছিলো তাঁদের বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। জমিদার হলেও রবীন্দ্র নাথ রাজার হালে মানুষ হননি। চৌদ্দজন ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। মা রুগ্ন থাকায় তার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ মুনির মতো দেশের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতেন। মাতা ও পিতা, ছেলে – রবীন্দ্র নাথের প্রতি খোঁজ খবর তেমন রাখতেন না। দাস-দাসীদের স্নেহ আর তিরস্কারে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। এহেন অবস্থার মধ্যেও পড়ালেখায় তার প্রখর জ্ঞান ছিলো। কিন্তু কোন একাডেমিক শিক্ষা তাঁর ছিলো না।

রবীন্দ্র নাথের জন্মের পর বছর বোলপুরের ভূবনডাংগা গ্রামে কুড়ি বিঘে জমি খরিদ করে সেখানে গাছপালা লাগানো হলো, বাড়ী-ঘরও তৈরী হলো। পিতা দেবেন্দ্র নাথ এখানে ধ্যান করতেন। জায়গাটি তার ভালো লাগায় তিনি এই উদ্যান-বাটির নাম রাখেন "শান্তি নিকেতন" পরবর্তীতে এই বাড়ীটির নামানুসারেই এলাকাটির নাম হয়ে যায় শান্তি নিকেতন। যেখানে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ গড়ে তুলেছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যা আজ "বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়" নামে খ্যাত।

রবীন্দ্র নাথ বাল্যকাল থেকেই কাব্য, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করেন। তাঁদের বাড়ী থেকেই "ভারতী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হতো। মাত্র তের বছর বয়স কালেই তাঁর লেখা কবিতা ও গল্প উপরোক্ত ভারতীয় ও অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা হয়। আর সেটা চলতে থাকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দূর্বার গতিতে। তরুণ বয়সে তাকে লণ্ডন পাঠানো হয়েছিলো লেখাপড়ার জন্যে। কিছু দিন তিনি পড়া-শুনা করেও ছিলেন বিলেতে। কিন্তু কোন ডিগ্রী না নিয়েই পিতার আদেশে তাকে ফিরে আসতে হয় দেশে। ফিরে আসার পর তিনি কাব্য, গান, গল্প ও নাটক রচনার সাথে সাথে অভিনয়ও করতে লাগলেন। পরবর্তীতে তিনি চিত্রাংকনও করতেন। একই অংগে কতরূপ, ঠিক তেমনি বলা যায় কবি গুরুর ক্ষেত্রেও। মাত্র বাইশ বছর বয়সে রবীন্দ্র নাথ বিয়ে করলেন যশোরের এগারো বছরের কিশোরী ভবতারিণীকে, পরবর্তীতে তার নাম পাল্টিয়ে রাখা হয় মৃণালিণী দেবী। বাবা দেবেন্দ্র নাথ বুড়ো হয়েছেন। পৈত্রিক বিরাট জমিদারী দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। অন্যান্য ছেলেরা জমিদারীর বিষয়কর্ম বুঝবে না। অগত্যা রবীন্দ্র নাথের উপরই বিরাট জমিদারী দেখার দায়িত্ব পড়ে। আর সে দায়িত্ব নিয়ে জমিদারী দেখাশুনার জন্যে তিনি বেরিয়ে পড়েন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। পূর্ববাংলার প্রাকৃতিক রূপ শোভা তাঁকে আকর্ষণ করলো। ফলে, পাবনার শাহজাদপুর এলাকায় থেকেই তিনি "বিসর্জন" নাটকটি রচনা করেছিলেন। কিশোর রবীন্দ্র নাথ তৎকালীন কবি বিহারী লালকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে তিনি কুষ্টিয়ায় এসে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের কথা। ভারতবাসীর মধ্যে তখন রাজনৈতিক চেতনা দানা বেঁধে উঠেছে। সকলেই চাইছেন পরাধীন ভারত মুক্ত হোক। রবীন্দ্র নাথও বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করে চললেন।

ওদিকে মেয়েরা বিবাহযোগ্য হয়ে এলো। তাই জোড়াসাঁকোর বাড়ী ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন তিনি। নতুন বাড়ী তৈরী করা হলো। মেয়েদের বিয়ের পাট চুকে গেলে শান্তিনিকেতনের তিনটা বাড়ীতে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হলো। সেটাই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এখানে ঘর-সংসার পাতবেন বলেই স্ত্রী মৃণালিনী দেবী এসেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতি তার সুখ সইলো না। অসুস্থ হয়ে পড়লেন আবার তাঁকে নিয়ে আসা হলো পুরোণ বাড়ী কোলকাতায় কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও তাঁকে বাঁচান গেলো না।

১৯০৫ সালে রবীন্দ্র নাথের বাবার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে মুসলিম নেতৃবৃন্দের

দাবীর প্রতি দৃষ্টিদান করে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ তথা পূর্ববাংলা ও আসামকে নিয়ে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করে। এ আদেশ তথা "বঙ্গভঙ্গ" কে হিন্দু সমাজ গ্রহণ করলেন না। হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গকে রদ করার জন্যে প্রবল সহিংস আন্দোলন গড়ে তুললেন। ফলে, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেলো। রবীন্দ্র নাথ পিতৃ শোকের মধ্যেও এ দিকটায় সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। নানা প্রবন্ধে তিনি বলতে লাগলেন – হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ভঙ্গ হওয়ার জন্য হিন্দু সমাজই দায়ী। বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করায় মুসলিম সমাজ কোন অন্যায় করেনি। বরং হিন্দু সমাজের অভ্রাতৃসুলভ মনোভাবই মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করতে বাধ্য করেছে। হিন্দু সমাজ যদি মুসলমানদের প্রতি ভ্রাতৃমনোভাবাপন্ন না হয় তবে কারো মঙ্গল নেই একথাও তিনি ঘোষণা করেন। কিন্তু কবির কথায় হিন্দু সমাজ কর্ণপাত করেনি। রবীন্দ্র নাথের এসব প্রবন্ধ তাঁর কালান্তর গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তিনি ভাবতেন না যে তিনি বাঙ্গালী না ভারতীয়। সর্বদাই মনে করতেন তিনি মানুষ। এবং পৃথিবীর অধিবাসী। কোন আঞ্চলিকতা প্রশ্রয় দিতেন না তিনি। স্বাধীনতার অগ্নিযোদ্ধাদের গান তিনি রচনা করেছেন কিন্তু সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে তিনি কখনও যোগ দেননি। নিজ ঠাকুর পরিবারে বিদ্রোহ ঘটিয়ে তাঁর পুত্রকে এক বাল্য-বিধবার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে শুধু সৎ-সাহসেরই পরিচয় দেননি তাঁর মুক্তমনের পরিচয় দিয়েছিলেন। কেননা, সে সময়ে ঠাকুর পরিবারে বিধবা বিবাহ কল্পনাও করা হতো না। এমন মুক্তমনের মানুষ রবীন্দ্র নাথও শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক অক্টোপাশের কবল থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন যখন তুঙ্গে, আন্দোলনের স্রোতধারা হিন্দুদের পক্ষে ধাবিত হতে চলেছে, সে সময় বিশ্ব কবি হিন্দু জাতীয়তাবাদেরর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদী হোতাদের সভায় যোগদান করেছেন। এমনকি ভারতের চরম মুসলিম বিদ্বেষী মহারাষ্ট্র নেতা তিলকের গো-রক্ষা আন্দোলন ও শিবাজী প্রবর্তিত গণপতি উৎসবকে যখন বঙ্গভঙ্গ রদ কারীরা আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করলো সেই সব সভায়ও আসন গ্রহণ করে তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন– কাব্য আবৃতি করে আন্দোলনকারীদের উৎসাহিত করেছেন।

যাক সে কথা। কবি গুরু পুণরায় বিলেত গমন করে বহু বিশ্ব-বিখ্যাত মনীষীর সঙ্গলাভ করেন। তিনি আমেরিকা, রাশিয়া ও ইউরোপ-এশিয়া মধ্যপ্রাচ্যসহ বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, সংবর্ধনা পেয়েছেন। এমনিভাবে পারস্যের শাহানশাহ রেজাশাহ পাহলভীর নিকট হতে আমন্ত্রন

পেয়ে তিনি পারস্য সফর করলেন। সর্বত্রই তার কদর ও গুণগান, কোথাও কমতি নেই। এমনিভাবে বৃদ্ধ বয়সে ১৯২৬ সালে তিনি ঢাকা সফরেও এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিভাষণ দিতে। ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীবক্ষে ভাসমান-ঢাকার নবাবের হাউসবোট "তুরাগ"-এ তার রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করা হলো। যে কদিন ঢাকায় ছিলেন অতি ব্যস্ততার মধ্যেই কাটালেন। প্রত্যেকদিন মুসলিম হল সহ বিভিন্ন শিক্ষাপিঠ, সংস্থা ও সমাজে বক্তৃতা দিতে হতো তাঁকে। অবশ্য যৌবনেও একবার ১৮৯৮ সালে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন এক সম্মেলনে।

কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ১৯১৩ সনে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১৬ সালে সম্রাট পঞ্চমজর্জের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে স্যার খেতাব প্রদান করা হয়েছিলো। ১৯১৯ সালের জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি বৃটিশের শ্রেষ্ঠ সম্মানজনক খেতাব স্যার উপাধি বর্জন করেন। কিন্তু তিনি এর স্বীকৃতি পেলেন না ১৯১৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পিতা মতিলাল নেহেরুর জন্যে মিঃ অমল হোরের এর কথা থেকে এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে যখন অমল হোর মিঃ জিন্নাহ্‌কে একথা জানিয়েছিলেন তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে সে কথা আগে না জানানোর জন্যে। অবশ্য পরবর্তী বছর ১৯২০ সালে জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে অধিনায়ক মিঃ জিন্নাহ্‌ কবিগুরুর বাণী চেয়ে সেটা পাঠ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রিন্স দ্বারাকানাথ ঠাকুরের নাতি আর মহর্ষি জমিদার দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পুত্র হলেও বিলাসী হবার সুযোগ পান নি। পিতা দেবেন্দ্র নাথ ব্রহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তারিখটি ছিলো ৭ই পৌষ। পরবর্তীতে পিতার জীবনের পূণ্যদিবসকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে প্রতিবছর ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে উৎসব হতো। আজও সে প্রথা চালু রয়েছে।

দীর্ঘ আশি বছর বয়সে সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালের ২২শে শ্রাবণ পরলোক গমন করেন। বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে একজন অমুসলিম কবির গীতকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করে অসাম্প্রদায়িকতার যে মহান দৃষ্টান্ত রেখেছে, সারাবিশ্বে তা বিরল।

এ উপশহরে কবি নজরুল ইসলামের নামেও একটি সড়ক রয়েছে। অবশ্য তার নামানুসারে বর্তমান এয়ার পোর্ট রোডটিকে নজরুল ইসলাম এভিনিউ রাখা হয়েছে

বিধায় তাঁর সম্পর্কে পুনরুল্লেখ করা হলো না।

বাংলাবাজার এলাকার বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন হেমেন্দ্র চন্দ্র দাস। তিনি ঢাকা পৌর সভার কমিশনার পদেও আসীন হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তারই নামানুসারে বাংলাবাজার এলাকায় একটি সড়ক পথের নামকরণ হয় হেমেন্দ্র চন্দ্র দাস রোড। মগবাজারস্থ ওয়ারলেস অফিস সংলগ্ন রাস্তাটি ওয়ারলেস রোড নামে আখ্যায়িত হয়ে আসছে।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় তুরস্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ৩০.১.১৯৮২ ইং তারিখে নব্য তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক-এর স্মরণে মহাখালী থেকে গুলশান যাওয়ার সড়ক পথটির (তেজকুনি পাড়ার একটি অংশ) নামকরণ করা হয় কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ। তুরস্ক সরকারও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামানুসারে একটি সড়ক পথের নামকরণ করেন জিয়াউর রহমান রোড।

কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারটি ঢাকার প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিহার। এর নিকটস্থ মুগদা পাড়ার পশ্চিম দিগস্থ সড়কটি পূর্বে প্যারিফিরিয়াল রোড নামে পরিচিত ছিলো। বৌদ্ধ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী দ্বীপঙ্কর শ্রী জ্ঞান তুষিতের মহা প্রয়ানের বহু শতাব্দী পর মহাজ্ঞানী পরম পুরুষ অতীশ দ্বীপঙ্করের দেহ ভস্ম সুদুর চীন থেকে আনীত হয়ে ঢাকার কমলাপুরে অবস্থিত ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত হয়। দ্বীপঙ্কর শ্রী জ্ঞান অতীশের জন্ম বাংলাদেশের বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রজ যোগিনী গ্রামে।তিনি ৯৮২ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর পরগনার রাজা কল্যাণ শ্রী ও রানী প্রভাবতীর মধ্যমপুত্র। শিশুকালে তার নাম ছিলো চন্দ্রগর্ভ। প্রথম জীবনে তান্ত্রিক অভিষেকে গ্রহণ করায় তার নামকরণ হয় জ্ঞান গুহ্য বজ্র। তখন বাংলাদেশ ছিলো বৌদ্ধ প্রধান। শিক্ষাও ছিলো বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা। চন্দ্র গর্ভ পরবর্তীতে ভিক্ষু দীক্ষা গ্রহণ করলে তাঁর নাম হয় দ্বীপঙ্কর শ্রী জ্ঞান। ভারত বর্ষের বিভিন্ন বিহারে অধ্যায়ন শেষে ৩১ বছর বয়সে মালয় দেশের সুবর্ণ দ্বীপে গমন করেন। সেখানে ১২ বছর অধ্যায়ন করে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন শেষে ৪৪ বছর বয়সে ভারত বর্ষে প্রত্যাগমন করেন। এবং প্রখ্যাত বৌদ্ধ বিহার যথা ওদন্ত পুরী, সোমপুরী বিশেষ করে বিক্রম শীল বিহারে অধ্যাপনা ও পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থেকে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তিব্বত রাজার আমন্ত্রনে ৫৮ বছর বয়সে বিক্রম শীল বিহার থেকে পদব্রজে নেপাল হয়ে তিব্বত গমন করে রাজার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও ভক্তশিষ্যদের সাহায্যে তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু মঠ-মন্দির

বিহার প্রতিষ্ঠা ব্যাতিত দ্বিশতাধিক গ্রন্থ রচনা অনুবাদ ও সম্পাদনা করে বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। তার বিপুল কর্মরাজীর সব কিছুই তিব্বতে আজও স্ব-যত্নে রক্ষিত আছে। তিব্বত বাসীরা তাকে মহাপ্রভু রূপে মান্য করতেন। তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায় সংক্ষেপে অতীশ বা অতীশা নামে কখনও কখনও অভিহিত হতেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মহা প্রস্থানের পর তার শিষ্য ব্রোম তোনপা-র নেতৃত্বে যে তান্ত্রিক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে সেই সম্প্রদায়ের চোঙ-খ-নোর অনুগামী "হলুদ টুপিধারী" সোমারাই পরবর্তী তিব্বতের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ক্ষমতার একছত্র অধিকারী হয়ে নিজেদের অতীশের শিষ্য এবং তার উত্তরাধিকারী বলে পরিচয় দিতেন। বর্তমানে তিব্বত চীনের অধীনে চলে গেলেও অতীশের প্রভাব এখনও তিব্বতের ধর্ম-সংস্কৃতির জীবনে রয়েছে। ১৩ বছর তিব্বতে বাস করে ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে ৭২ বছর বয়সে লামার নিকট ক্রেথাং বিহারে অতীশ দ্বীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পরলোক গমন করেন।

অতীশ দ্বীপঙ্করের জন্মস্থান নিয়ে কতিপয় পণ্ডিত ও ইতিহাস বেত্তাগণের মতভেদ রয়েছে। তাঁদের মতে তার জন্ম স্থান বিহারের ভাগলপুরে। ভিক্ষু দ্বীপঙ্করকে অনেকে রাজ পুত্র ছিলেন বলেও মত প্রকাশ করেছেন। তার নাম পরিবর্তন নিয়েও কথা আছে যে তৎকালীন বৌদ্ধ সমাজে গৃহ ত্যাগ করে শ্রমণ হওয়ার পর গৃহী নাম বর্জণ করাই রীতি ছিলো। তিনি গৌতম বুদ্ধের মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা ধ্যানে মগ্ন হতেন।

এই মহান জ্ঞান তাপস দ্বীপঙ্কর অতীশ এর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের নিকটস্থ প্যারিফিরিয়াল রোডটির নামকরণ করা হয়েছে অতীশ দ্বীপঙ্কর সড়ক। কমলাপুর বৌদ্ধ বিহারে শুধু শ্রী জ্ঞান অতীশ দ্বীপঙ্করের দেহ ভস্মই রক্ষিত করা হয়নি। এখানে চীন থেকে অতীশের নিজের নাকের রক্ত দিয়ে আঁকা আত্ম প্রতিকৃতি ও ব্রোঞ্জ মূর্তিও রক্ষিত আছে।

আগা সাদেক রোড। যাহা পূর্বে আগা সাদেক বাজার নামে পরিচিত ছিলো। আগা সাদেক নবাবী আমলের শেষ দিকের একজন সাহসী যোদ্ধা ও প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্য জয় করায় বাংলার নবাব তাঁকে শুধু ত্রিপুরার ফৌজদার পদেই অলঙ্কৃত করেননি। নবাব তাঁকে "সাদাকাত মুহাম্মদ খাঁন" উপাধিতেও ভূষিত করেছিলেন। তাঁরই নামানুসারে আগা সাদেক রোড নামকরণ হয়েছে।

স্বাধীন বঙ্গের শেষ অধ্যায়ে চক্রান্তের বিষবাষ্প যখন চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ষড়যন্ত্রের দাবাগ্নিতে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায় আগা সাদেক তখন নবাব সিরাজ

উদ্দৌল্লার সাথী ও হিতাকাঙ্খী। নবাব আলীবর্দি খাঁনের জীবিত কালেই সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে শক্তি গড়ে উঠেছিলো তা প্রতিহত করার জন্য আগা সাদেক সবদিক দিয়েই সিরাজকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। এজন্য নওয়ারিস খাঁন, রাজ বল্লভ ও ঘসেটি বেগমের সঙ্গে আগা সাদেক ও তার পিতার বিরোধ চলে আসছিলো। এই বিরোধের ফলে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সশস্ত্র বাহিনীতেও দু'দলের সমর্থন দানা বেধে ওঠে।

নওয়ারিশ কুলিখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নবাব হোসেন উদ্দিন খাঁনকে ঢাকায় তার সহকারী নিয়োগ করলে বিরোধ আরও চরম আকার ধারণ করে। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষও বাঁধে। হোসেন কুলি খাঁর এক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আগা সাদেক নওয়ারিশ মহম্মদের কাছে আপীল করার জন্যে মুর্শিদাবাদ যান। এই সুযোগে নওয়ারিশ আগা সাদেকের নিকট বহুরাজস্ব বাকী পড়েছে বলে অভিযোগ এনে তাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত সহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ খবর পেয়ে আগা সাদেক সিরাজের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে রাজবল্লভের পরামর্শ মতে নওয়ারিশ-উজির কুলি খাঁর দ্বারা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এরূপ ব্যবহারে আগা সাদেক অত্যন্ত রুষ্ঠ হলেন অবশেষে নবাব সিরাজের হস্তক্ষেপ ও সাহায্যে বন্দিসালা থেকে পালিয়ে পিতা আগা বাকেরকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। সে সময়ই নবাব সিরাজ আগা সাদেককে আশ্বাস দিয়েছিলেন নবাব হোসেন উদ্দিন খাঁনের স্থলে তাঁকে ঢাকার নায়েব নিযুক্ত করবেন। ঢাকায় এসে আগা সাদেক তাঁর ময়দান সংলগ্ন কুঠিতে অবস্থানকালে হোসেন উদ্দিন খাঁকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে কোন এক গভীর রাত্রে একদল সশস্ত্র লোক নিয়ে নদীর দিক দিয়ে গোপনে নবাবগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত নবাব হোসেন উদ্দিন খাঁর প্রাসাদে ঢুকে পড়েন। এবং ঘুমন্ত অবস্থায় নবাব হোসেন উদ্দিন খাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর অনুগতগণ তাঁর স্মৃতি অক্ষয় রাখার মানসে তাঁর খণ্ড বিখণ্ড দেহ নবাব বাগিচা বড় মসজিদের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে সমাহিত করে রাখেন। আজও এই সমাধি কালের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

হোসেন উদ্দিন খাঁর হত্যার খবর সকাল বেলা ছড়িয়ে পড়লে ঢাকাবাসী খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আলী নকি নামে হোসেন উদ্দিনের এক আত্মীয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। তারই নামানুসারে ঢাকার একটি মহল্লার নাম আলী নকি দেউড়ি। আলী নকীর বাড়ীর সদরে একটি বিরাট দেউরী বা ফটক ছিলো। আগা সাদেক ও তাঁর পিতা ঢাকার শাসন কর্তৃত্ব দখল করার যে অভিসন্ধি করে

আসছিলেন ঢাকাবাসী সেটা ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলো। তাঁদের সে অভিসন্ধি বানচাল করার জন্যে আলী নকির নেতৃত্বে ঢাকাবাসী আগা সাদেকের প্রাসাদ ঘেরাও করে। সমবেত জনতা আগা সাদেকের কাছে তাঁর নায়েব নাজিম পদে নিযুক্তির সনদ দাবী করে। জবাবে আগা সাদেক হোসেন উদ্দিনের রক্তে রঞ্জিত ঝুলন্ত তরবারির দিকে আংগুলী নির্দেশ করেন। তাঁর এরূপ আচরণে বিপুল জনতা প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ে। জনতা মারমুখী হয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে গিয়ে নাগালের মধ্যে আগা সাদেকের বৃদ্ধ পিতা আগা মুহম্মদ বাকেরকে পেয়ে তাঁকেই হত্যা করলো। ইত্যবসরে আগা সাদেক পরিস্থিতির ভয়াবহতা অবলোকন করে পেছন দরজা দিয়ে পলায়ন করে জীবন রক্ষা করেন। শক্তি প্রয়োগে ঢাকার শাসন ক্ষমতা দখলের এই প্রচেষ্টা ঢাকাবাসীর সমবেত সহযোগিতা ও প্রতিবাদে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশ্য শেষ অবধি মীর জাফরের নির্দেশে আগা সাদেককে হত্যা করা হয়েছিলো। আগা সাদেক নিহত হওয়ার পর তাঁকে আগা সাদেক ময়দানে সমাহিত করা হয়। তাঁর বংশধরদের অনেকেই এই ময়দানে সমাধিস্ত হয়ে আছেন।

আগা সাদেকের যেমন গুণ ছিলো তেমনি অন্যদিকে তাঁর চরিত্র দোষও ছিলো। কথিত আছে তিনি যখন বাকরগঞ্জ আসতেন স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার দয়াল চৌধুরী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আগা সাদেক যতদিন বাকরগঞ্জ অবস্থান করতেন ততদিন দয়াল চৌধুরী সুন্দরীদের অনেককেই জোর করে ধরে এনে আগা সাদেকের হেরেমে পাঠাতেন, এমনিভাবে আগা সাদেকের অনুগ্রহ লাভের জন্য দয়াল চৌধুরী অনেক সতী নারীর সর্বনাশ করেছে। অনেকের সুখের সংসার ভেঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়েছে। শেষে দুষ্ট কর্মচারীদের মুখে দয়াল চৌধুরীর অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের কথা শুনে শিকারের ছলনা করে গোপনে দয়াল চৌধুরীর কন্যাকে দেখে ফেলেন আগা স্যাদেক। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার জন্যে প্রথমে দয়াল চৌধুরীকে আদেশ দিলেন মেয়েকে তার হস্তে সমর্পন করতে। দয়াল চৌধুরী এ আদেশ মেনে নিলেন না। নিয়তির খেলায় উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ চললো। শেষ পরিণতি হলো দয়াল চৌধুরী ও স্ত্রী কন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু। নৌকা ডুবিয়ে আত্মহত্যা। যে ব্যক্তি পরের ক্ষতি করে আসছিলো। শেষ পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজন স্ত্রী কন্যার প্রাণ দিয়ে ক্ষতি পূরণ করতে হলো তাঁকে। সেদিনের পর থেকে স্থানীয় লোকেরা দয়াল চৌধুরীকে নিয়ে একটি ছড়া রচনা করে যা ঐ এলাকার নলছিটির অনেকে বলে থাকে।

"পরের ক্ষতি আপন নাশ,
তার সাক্ষী দয়াল দাস"

শহরের মধ্যে এক সময় আগা সাদেক ময়দানটি গোরস্থান হিসেবে অতিপরিচিত ছিলো। এ ময়দান তথা কবর গাহের উত্তর পার্শ্বে ঢাকা-পৌর সভার তৎকালিন চেয়ারম্যান নবাব ইউসুফ জানের বাড়ী ও বাগিচা ছিলো। একটি পুকুরও ছিলো। পুকুরে মাছ চাষ হতো। কবর স্থানের গন্ধে তার পুকুরের মাছ মারা যাবে বিধায় এ ময়দানে কবর দেওয়া তার আদেশে বন্ধ হয়ে যায়। পুকুরটি ময়দানের উত্তরে বর্তমান আব্দুল হাদী লেনের দক্ষিণ মাথায় ছিলো। কবর দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে মাঠটি বিরান অবস্থায় পড়ে থাকে। ফলে লোকজন রাত বিরাত ভয় পেতো। বৃটিশ শাসনামলের শেষ দিকে এ ময়দানের মাঝখানের কবরগুলো ভেঙ্গে সমান করে একটি ফুটবল খেলার মাঠ করার মনস্থ করে কয়েকজন ক্রীড়ামোদী। মহল্লার ক্রীড়াবিদ যুবক তরুণরা সহযোগিতা করায় কবর স্থানটি মাঠে রূপান্তরিত হয়। তবে পূর্ব-পশ্চিমে কয়েকটি কবর এখনও রয়েছে, যা আগা সাদেক ও আগা বাকেরের বলেই অনুমান করা হয়। খেলার মাঠ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরই এখানে রয়েল স্পোর্টিং ক্লাব নামে একটি ক্রীড়া সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হলে সে বছরই এ ক্লাবের নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব রাখা হয়। সেই ১৯৪০ সাল হতেই ধীরে ধীরে আগা সাদেক ময়দানটি পাকিস্তান ময়দান নামে পরিচিত হয়ে পরে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে পুনরায় ক্রীড়া সংস্থার নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ স্পোর্টিং ক্লাব রাখা হয়। সেই সাথে মাঠটিও বাংলাদেশ ময়দান নামে পরিচিত হয়ে আসছে। ভারত বিভাগের পূর্ব হতে মাঠটিতে বহু আকর্ষণীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছে। তন্মধ্যে চ্যারিটি খেলার ব্যবস্থা করে কাশ্মীর মুসলিম ফাণ্ড ও বিহার মুসলিম ফাণ্ডে অর্থ দান করা হয়েছিলো। এ মহল্লায় আরো যারা বসবাস করে গেছেন তাদের মধ্যে স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসায়ী আকবর আলী তিনি লর্ড কার্জনের আগমন উপলক্ষ্যে কালো ঘোড়ায় চরে সংবর্দ্ধনা জানাতে গিয়ে ছিলেন বলে মহল্লাবাসী তার পরিচয় দিতো কালো ঘোড়া নামে। দিলকুশার নবাব খাজা আজম সাহেবের ম্যানেজার মঃ ইউসুফ মিয়া, ঢাকার সর্দারদের মধ্যে অন্যতম সরদার আব্দুল মাজেদ, সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার সাহেবের বাস ভবন ও এ মহল্লায় ছিলো। পরবর্তীতে তিনি বাড়ীটি তার এক বোনকে দিয়ে ছিলেন। তাছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনকালে পাকিস্তান হতে প্রথম যিনি একটি বিমান অপহরণ করে ভারতে নিয়ে আসার সময় বিমার দুর্ঘটনায় নিহত হন সেই শহীদ মতিউর রহমানের বাসস্থানও এ মহল্লায়। লুলু ভাই নামে ঢাকার প্রসিদ্ধ আতসবাজী তৈরীকারকের বাস ভবন এ মহল্লায় ছিলো। একবার আতস বাজী তৈরির সময় তার হাত ঝলসে

গিয়েছিলো। সে হাত নিয়েই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আতস বাজী তৈরি করে গেছেন নানা রূপ ও রঙ্গের। ঢাকার বড় বড় বিয়ে শাদীতে তার আতস বাজীর দ্বারাই বরযাত্রীরা কন্যাপক্ষ ও উপস্থিত মেহমানদের মুগ্ধ করতেন। মুঘল আমল হতে টুপি ও হাত পাখাতে যারা চুমকি বসাতো তাদেরই এক অধস্তন পুরুষ ইউসুফ চাটকার এখানেই বাস করতেন। যারা টুপি ও পাখায় চুমকির কাজ করতো চাটকা পরিবার বলে সমাজে পরিচিত হতো। ভারত বিভাগের পূর্বে হিন্দুদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানে বসবাস করতেন। এ মহল্লায় শুশীলা কটেজ নামে একটি সুন্দর কারুকার্য করা পুরাতন বাড়ী রয়েছে। যা আজ কাল ঢাকা শহরে বিরল। মাজেদ সর্দারের বাড়ীর নিকটস্থ মসজিদটি চাঁদ খাঁ মসজিদ নামে পরিচিত। চাঁদ খাঁ ঢাকায় অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন, যেমন চাঁদ খাঁর পুল তৈরি করেছেন।

আগা সাদেকের পিতা বাকেরের পূর্ব পরিচয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। জানা যায় তিনি তুর্কিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যখন ভাগ্যের অন্বেষণে ভারতে আগমন করেন তখন সুদর্শন আগা বাকেরকে ক্রয় করে মুর্শিদকুলি খাঁ নিজ সন্তানের মত প্রতিপালন এবং সুশিক্ষা ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনেও সক্ষম হয়েছিলেন। আগা বাকের দীর্ঘদেহী শক্তিমান যুবক ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে বিখ্যাত যোদ্ধা হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। কেহ তাঁকে মুর্শিদ কুলির পুত্র কেহ বা তাকে ভৃত্য বলেও উল্লেখ করেছেন। আবার কোন কোন ইতিহাসবেত্তা আগা বাকেরকে ইরানের এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক বলেও পরিচয় দিয়েছেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭০০ খৃঃ দিল্লীর সুলতান হতে পূর্ব বাংলার দেওয়ানীপদ লাভ করে ঢাকায় আগমনকালে আগা বাকেরকে সঙ্গে এনেছিলেন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার আজিমুশ শানের সঙ্গে মুর্শিদ কুলি খাঁর বিবাদ শুরু হলে মুর্শিদ কুলি খাঁ ঢাকা ত্যাগ করে মকসুদাবাদে চলে যান, আগা বাকেরও তার সঙ্গী ছিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ মকসুদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তারই নামানুসারে রাজধানীর নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ।

আগা মুহম্মদ বাকের খাঁন আঠার শতকের মধ্য ভাগে বাংলার বহু আলোচ্য ও বিতর্কিত ব্যক্তি। নবাবী আমলে এ মহান ব্যক্তি বাংলার রাজনীতিতে এক বিশেষ স্থান দখল করে ছিলেন। তিনি সৈন্য বাহিনীর উচ্চ পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে এক দিকে রাজা রাজ বল্লভ অন্যদিকে আগা বাকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। নবাবী আমলে প্রথমেই তিনি চট্টগ্রামের ফৌজদার নিযুক্ত

হন। তাঁর প্রেয়সী ছিলো আরামবাগের নর্তকী খনি বেগম। তাঁদের প্রেম ছিলো গভীর এবং খাটী। বাকেরের প্রেম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন উজীরে আলা জাহান্দার খাঁর দুশ্চরিত্র পুত্র কোতয়াল জয়নুল খাঁ। এ সব ব্যাপার মুর্শিদ কুলি খাঁ জানতেন না।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে খনি বেগমের সতীত্ব নষ্ট করতে চেষ্টা করলো কোতোয়াল জয়নুল খাঁ। সংবাদ পেয়ে আগা বাকের বাধা দিলেন, উভয়ে মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে জয়নুল পালিয়ে যায়। জয়নুলের বন্ধুগণ এটাকে অন্য রূপ দিয়ে গুজব ছড়িয়ে দিলো যে, বাকের জয়নুলকে হত্যা করে মৃত দেহ গুম করে দিয়েছে। পিতা উজিরে আলা জাহান্দার খাঁন পুত্রের মৃত্যু সংবাদকে সত্য বলে গ্রহণ করে আগা বাকের ও খনি বেগমকে গ্রেফতার করে নবাব দরবারে হাজির করেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ সৎ চরিত্র ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি রুষ্ঠ হয়ে পুত্রবৎ বাকেরকে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে বাঘের বদ্ধ খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দেন। বাঘের সঙ্গে ভীষণ লড়াই করে বাঘটিকে হত্যা করে বিজয়ী বেশে খাঁচা হতে বেরিয়ে আসেন আগা বাকের।

ওদিকে জয়নুল সুযোগ বুঝে জোর পূর্বক খনি বেগমকে নিয়ে উধাও হয়ে যায় দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ভাটি অঞ্চলের এক গভীর অরণ্যে। খনি বেগমকে বশে আনতে না পেরে এক স্থানে বন্দী করে তার উপর ভীষণ যন্ত্রণা করছিলেন। খনি বেগমকে নিয়ে পালাবার সংবাদ পেয়ে আগা বাকের সেনাপতি কালা গাজীকে নিয়ে ছুটলেন সুদুর চন্দ্রদীপ রাজ্যে। জয়নুলের পিতা জাহান্দার খাঁও দুশ্চরিত্র পুত্রের বিরুদ্ধে এক বাহিনী নিয়ে চন্দ্রদীপ গমন করে যেখানে জয়নুল খনি বেগমকে বন্দী করে রেখেছিলেন সে জায়গা ঘিরে ফেলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পুত্রকে নিজ হাতে শাস্তি দানের জন্য শানিত তরবারী দিয়ে আঘাত করলেন। ওদিকে যে বিষাক্ত শাপ দেখিয়ে খনিকে বসে আনতে চেষ্টা করছিলো সে শাপও ছোবল দিলো জয়নুলকে। জয়নুল দেখলো সে আর বাঁচবে না, খনিকেও পাবে না– তাই নিজের অশি খনি বেগমের বুকে বসিয়ে দিলো। আগা বাকের সেখানে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যে মৃত্যু পথযাত্রী খনি বেগমের দেখা পান। আহত খনিকে বুকে তুলে নিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। খনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। খনির মৃত্যুতে বাকের উন্মাদ প্রায় হয়ে গেলেন। রাজ্য ও নবাবী মসনদের সকল আকর্ষণ পরিত্যাগ করে সে অঞ্চলেই থেকে যান। তিনি বুজুর্গ উমেদপুরের জমিদারী লাভ করার পর সেলিমাবাদ ও চন্দ্রদীপ পরগনা দখল করে নেন। এই দ্বীপ নিয়ে গঠিত বাকলা চন্দ্র দ্বীপের বৃহত্তর জমিদারীর মালিক হয়ে গেলেন আগা বাকের। চন্দ্র দ্বীপের রাজপরিবার ও রায় কাঠির প্রভাবশালী রায়দের সাথে প্রতিযোগিতা করে তিনি জমিদারী পরিচালনা

করেছেন। এবং রাজস্ব বিভাগের অপূর্ব সংস্কার সাধন করে ঐ অঞ্চলের মানুষের হৃদয় জয় করে নেন। দ্বীপগুলোর আকৃতি চাঁদের মত ছিলো বলে চন্দ্রদ্বীপ নাম ধারণ করে ছিলো এ অঞ্চলটি। পরবর্তীতে বাকলা চন্দ্রদ্বীপকে নিয়ে ১৭৯৭ সালে ইংরেজ সরকার যখন পৃথক জেলা গঠন করেন তখন এই জনপ্রিয় ব্যক্তির নামটিকে অস্বীকার না করে তারই স্মরণে নামকরণ করা হয় বাকরগঞ্জ জেলা। অবশ্য জেলা গঠনের পূর্বে নবাব আলীবর্দি খাঁর সময়েও তিনি বাকলা চন্দ্রদ্বীপের সবচেয়ে শক্তিশালী জমিদার ছিলেন। ফলে আসে পাশের জমিদারগণ আগা বাকেরের নেতৃত্ব মেনে নেন। তিনি জেলার দক্ষিণাঞ্চল হতে জলদস্যুদের দমন করে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারায় হাজার হাজার মানুষ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে তার পরগনায় গিয়ে জনবসতি গড়ে তোলে। তিনি জন সাধারণের জন্য খয়রাবাদ ও শ্রীমন্তপুর নদীর তীরে এক বন্দর প্রতিষ্ঠা করে তার নাম করেছিলেন বাকরগঞ্জ। সে নামটিই ইংরেজ সরকার জেলার নামকরণ করেছিলেন। অন্যদিকে মুর্শিদকুলি খাঁর আদেশে আগা বাকের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেন। তারই গর্ভে আগা সাদেক ও মির্জা মেহেদীর জন্ম। তারা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন।

বাংলার স্বাধীনতা যখন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন। তখন এ ষড়যন্ত্রকে নসাৎ করার জন্যে নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লার সাথে এগিয়ে আসেন আগা বাকের। তিনি ছিলেন স্বাধীন চেতা ও তেজস্বী পুরুষ। বাংলার স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্যেই তিনি রাজ বল্লভ ও ঘষেটি বেগমের বিরোধীতা করেন। বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। আগা বাকের একজন বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব ও প্রতিবাদীকণ্ঠ ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের নবাব প্রসাদের ষড়যন্ত্রের হোতা নওয়ারা মহলের পেশকার রাজ বল্লভ ও ঘষেটি বেগমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর ছিলেন।

অনেক অঘটনের নায়িকা ঘষেটি বেগম সিরাজ উদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেন তার ফলশ্রুতি হিসেবে মুর্শিদাবাদ ও ঢাকায় দুটো বিবদমান দলের সৃষ্টি হয়। ঢাকায় নবাব সিরাজের পক্ষে নেতৃত্ব দিতেন আগা বাকের ও তৎপুত্র আগা সাদেক। কেননা ঢাকা তথা পূর্ব বঙ্গের নেতৃত্ব নিয়ে আগা বাকেরের সঙ্গে রাজ বল্লভের বিবাদ ছিলো। অপর পক্ষে রাজা রাজ বল্লভ তৎপুত্র কৃষ্ণদাস ও ঢাকার নায়েব নাজিম হোসেন আবেদীন ঘষেটি বেগমের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ঢাকায় উভয় দলেই সশস্ত্র বাহিনীর লোক ছিলো।

নওয়াজিশ খাঁন ও রাজ বল্লভ উমেদ আলীকে ত্রিপুরার প্রশাসক নিযুক্ত করে আগা

সাদেককে ত্রিপুরার ফৌজদার পদ থেকে সরাবার ষড়যন্ত্র এবং আগা বাকেরকে স্ব-পরিবারে নির্মূল করার জন্যেও উমেদকে পরামর্শ দেন। ফলে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে উমেদ তার বাহিনী নিয়ে ঢাকা পৌঁছে অতর্কিতে আগা বাকেরকে আক্রমন করেন। শহরের নিকটে উভয় দলে তীব্র যুদ্ধ হয়। রাজ বল্লভের হঠকারিতার ফলে আগাবাকের যুদ্ধে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটে যান। সেই সংকট মুহূর্তে বন্ধু আরাকান রাজার সাহায্য চেয়ে পাঠালেন আগা বাকের। রাজা সর্দার লেয়া মুরারীর নেতৃত্বে এক হাজার যুদ্ধ জাহাজ পাঠালেন। এবার ঐক্যবদ্ধভাবে আগা বাকের নৌসেনা সর্দার মুরারীর সহযোগিতায় উমেদ আলী ও তার বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। তীব্র সংঘর্ষের পর উমেদ পরাজয় বরণ করে, শত শত মৃত দেহ রেখে ত্রিপুরার অরণ্যে পালিয়ে যান। আগা বাকেরের ক্ষমতা দেখে অনেক বিদেশী পর্যটক তাঁকেই পূর্ববঙ্গের নবাব বলে জানতেন।

পরবর্তীতে নবাব হোসেন উদ্দিন খাঁনের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে আগা বাকের নিহত হলে রাজ বল্লভের দল উল্লাসে ফেটে পড়েন। তার দেহকে টুকরো টুকরো করা হলো। আগা বাকের-এর খণ্ডিত দেহ পরে আগা সাদেক ময়দানে সমাহিত করলো তার আত্মীয়গণ। এর পরপরই নওয়ারা মহলের পেশকার রাজ ভল্লবকে নবাব হোসেন উদ্দিন খাঁনের স্থলে ঢাকার নায়েব নাজিম পদে নিয়োগ করা হলে ঢাকার শাসন ক্ষমতা পুরো পুরিভাবে রাজবল্লভের হাতে এসে যায়। তিনি প্রথমেই আগা বাকেরের সকল জমিদারী ও সম্পদ শক্তিবলে কেড়ে নেন। তার সহায়তাকারীদের সম্পদও বাজেয়াপ্ত করে অধিকাংশ নিজে আত্মসাৎ করেন, যা পরবর্তীতে রাজ নগরের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তার শাসনের অল্পকালের মধ্যেই দুই কোটি টাকা হস্তগত করে অধিকাংশই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দাস কলিকাতায় পাচার করে দেয়, প্রকাশ থাকতে পারে এ কারণেই নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লা ফোর্ট উইলিয়ামে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ করেন। এদিকে নবাব সিরাজের বিরোধী চক্রের কেন্দ্র ভূমি হয়ে দাড়ায় ঐতিহ্যবাহী ঢাকা নগরী।

এদিকে রাজা রাজ বল্লভ ঢাকা হতে ২৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বিলদাওনিয়াতে এক রাজ প্রসাদ নির্মাণ করে তার নামকরণ করেন রাজ নগর। তিনি ওখানে রাজমহল নবরত্ন, পঞ্চরত্ন, সপ্তদশরত্ন, একুশরত্ন প্রভৃতি সুরম্য অট্টালিকা বা হর্মরাজী নির্মাণ এবং ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে চমৎকার দুটি সুউচ্চ চূড়াসহ মঠ তৈরি করে বঙ্গ দেশের শীর্ষস্থান অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে পৈতাদানের অধিকার লাভ করেন। রাজ বল্লভ কতৃক

আগা বাকেরের সম্পত্তি জোর পূর্বক নিয়ে নেওয়ায় মরহুম আগা বাকেরের ২য় পুত্র মির্জা মেহেদী ১৭৭৪ সালে জমিদারী পুনরুদ্ধারের জন্য কলিকাতা কাউন্সিলের নিকট আবেদন করেন। এই আবেদনে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের অনেক অলিখিত ঘটনাবলী উল্লেখ ছিলো।



মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের রাজা রাজ বল্লভ কর্তৃক রাজ নগরে প্রতিষ্ঠিত একুশরত্ন মন্দিরের দৃশ্য

পরবর্তীকালে বাংলার এই বিশ্বাস ঘাতক রাজ বল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাস এবং তাদের আরো কতিপয় সাথীকে মীর কাসেম ক্ষমতায় এসে মুঙ্গের দূর্গে আটক করে দূর্গের চূড়া থেকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে হত্যার মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

আগা বাকেরের আমলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মসজিদ নির্মিত হয়। সেগুলো আলী-ফাতেমার জোর মসজিদ বলে আখ্যায়িত হতো। আগাবাকের আজও বরিশাল তথা দক্ষিণ বাংলার লোকজনের নিকট রূপকথার নায়ক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

আগা বাকের ২য় মুর্শিদ কুলি খাঁর কন্যাকে বিবাহ করলেও তার মন থেকে খনি বেগমের স্মৃতি শেষ দিন পর্যন্ত মুছে যায়নি। তাঁর প্রমাণ, তার আবিস্কৃত এবং প্রিয় খাদ্য বিশেষভাবে তৈরি রুটির নাম তার প্রেম কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই নামকরণ করা হয়েছিলো "বাকের-খনি রুটি" যা কিছুটা অপভ্রংশ হয়ে "বাকর খানি" নাম নিয়ে আজও সকলের প্রশংসা অর্জন করে চলেছে। আগা বাকের আজ ইহ জগতে নেই কিন্তু তার প্রেম কাহিনীর স্মৃতি বিজড়িত "বাকর খানি রুটি" আজও পুরাতন ঢাকাবাসীর নিকট প্রিয়।

সুবে বাংলার দেওয়ান করতালেব খাঁ ওরফে মুরশিদ কুলি খাঁ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মোঘল স্থাপত্যকলার আঙ্গিকে বেগম বাজারস্থিত মসজিদটি নির্মাণ করেন। এর সংলগ্ন একটা মেছোবাজারও প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বাজারের আয় দিয়ে মসজিদের খরচপত্র বহনের জন্যে তিনি বাজারটি মসজিদের নামে ওয়াকফ্ করে যান। নায়েব নাজিম নওয়াব শরফরাজ খাঁর কন্যা লাভলী বেগম ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদ ও বাজারের কর্তৃত্ব নিজ দখলে নেন। এই সালেই বিবাদ বিসংবাদের ফলে বাজারটিতে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। অগ্নিকান্ডের ফলে বহু টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। তারপর বাজারটি সরকারের তত্ত্বাবধানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং লাভলী বেগম এর কন্যা পান্নি বেগম ও হাজী বেগমকে বাজারের আয় থেকে কিছু ভাতা দেবার ব্যবস্থা হয়। এই মসজিদের শেষ মুতওয়াল্লি ছিলেন হাজী বেগম। লাভলী বেগমের নামানুসারেই এ এলাকার নাম হয় বেগমবাজার।

বেগমবাজারের মসজিদের উত্তর দিকে শাহ হোসেনের মাজার অবস্থিত। তিনি এদেশের অধিবাসী ছিলেন না। পবিত্র মহররমের সময় এ মাজারে লাল-সবুজ নিশান ওড়ানো হয়। মসজিদের উত্তর পূর্ব কোণে একটি অদ্ভুত ইঁদারা ছিলো। একটি পাকা সিঁড়ির সাহায্যে ইঁদারা থেকে পানি পাওয়া যেতো। কাল ক্রমে আবর্জনা ফেলে এবং

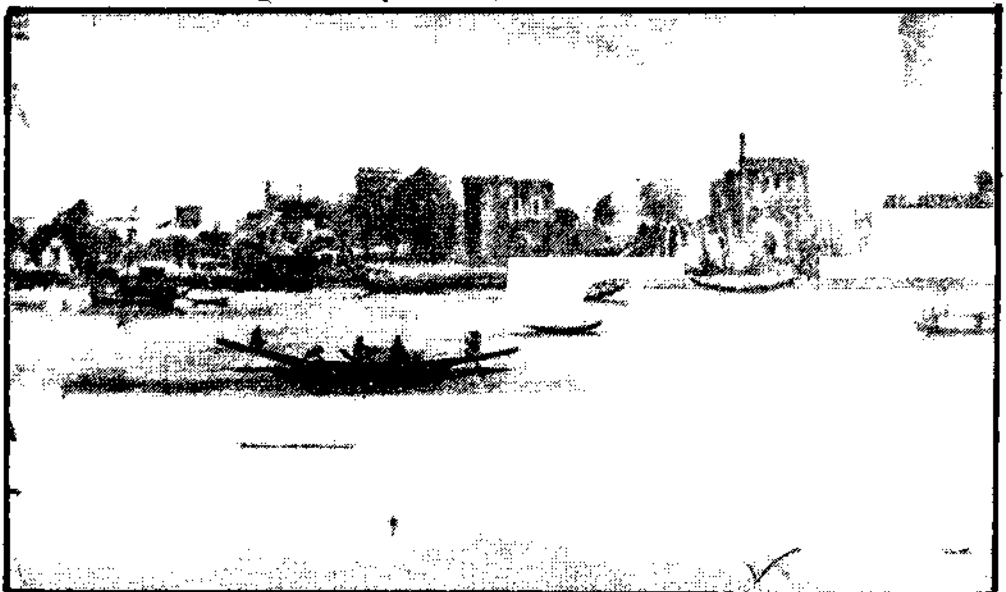
দোকানপসার বসিয়ে ইঁদারাটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নওয়াব মুরশিদ কুলি খাঁর গৌরবময় জীবনের একক নিদর্শন এই বেগম বাজার মসজিদ। সে সময় এই মসজিদটি ঢাকায় বৃহত্তম মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হতো। হাজী বেগমের পিতা গজনফর হোসেন ছিলেন নওয়াব মুরশিদ কুলি খাঁর বংশধর। তিনিও এই মসজিদের মুতওয়াল্লি ছিলেন। পরবর্তিতে মসজিদটির মেরামত বা সংস্কার করেছিলেন ঢাকার বিশিষ্ট ব্যাক্তি ও জমিদার মির্জা গোলাম পীর।

১৭৩০-৪০ খৃীষ্টাব্দের দিকে ঢাকার নায়েব নাজিম নওয়াব শরফরাজ খাঁ তার হেরেমে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় দেড় হাজার নারীকে রক্ষিতা হিসেবে রেখেছিলেন। এক কথায় তিনি অত্যন্ত কদর্য্য জীবনযাপন করে গেছেন। ১৭৩৯ সালে সরফরাজ খাঁ সুবে বাংলার নাজিম পদ দখল করেন। এ সময় ইরানের নাদির শাহ ভারত অভিযান করে দিল্লির সিংহাসন বিপন্ন করে তোলেন। নাদির শাহ বাংলার রাজস্ব দাবী করলে সরফরাজ খাঁ কেবল মাত্র রাজস্ব প্রেরণ করেই ক্ষান্ত হননি তার নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ ও মসজিদে খুৎবা পাঠের নির্দেশও দিয়েছিলেন। পরে এই নায়েব নাজিমকে ১৭৪০ সালে গিরিয়ার যুদ্ধে হত্যা করে নওয়াব আলীবর্দি খাঁ নায়েব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে জগৎ শেঠের কন্যাকে সরফরাজ খাঁ জোর পূর্বক হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যই জগৎ শেঠ আলীবর্দিখাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

১৬৬০ থেকে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত স্থায়ী নওয়াব মীর জুমলার শাসনামলে নৌবাহিনীর মুসারেফী (সুপারিনটেনডেণ্ট) মির্জা মুকিম ১৬৬২ সালে চকবাজার ও মৌলভী বাজারের মাঝামাঝি স্থানে একটা কাটরা নির্মাণ করেন। মির্জা মুকিম দিশকুশায় অবস্থান করতেন, বর্তমানে সেখানে ন্যাশনাল চিলড্রেন পার্ক নির্মিত হয়েছে। এই পার্কের ভিতরে যে পুকুর দেখা যায় তা মির্জা মুকিমই খনন করিয়েছিলেন। তার কবর হোসেনী দালানে রয়েছে। তার মৃত্যুর পর মৌলভী বাজার ও চকবাজারের কিছু অংশ মুকিম কাটরা নামে অভিহিত হয়। এই মুকিম কাটরায় গ্রীকরা একটা চার্চ নির্মাণ করেছিলেন। গ্রীকদের কবর স্থান ছিলো তৎকালে সুজাত নগরে। এখনও নতুন ঢাকায় গ্রীকদের কছিু নিদর্শন দেখা যায়। ঢাকার অন্যতম বিশিষ্ট জমিদার মৌলভী আঃ আলী চক বাজারের নিকটস্থ এক গলিতে বসবাস করতেন। তিনি বাজারটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাই তারই নামানুসারে আজও বাজারটি মৌলভী বাজার নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে যথাযথ

উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও নওয়াব শায়েস্তা খাঁর সুবেদারীর আমলের পূর্বে এই শহর মসজিদ ও প্রাসাদ নগরী বলে খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি। তিনি স্বয়ং ছিলেন একজন নির্মাতা। নগরীর স্থাপত্য কর্মে তিনি এক বৈশিষ্ট্য রেখে গেছেন। যা শায়েস্তা খাঁনি রীতি (আর্কিটেকট্) বলে অভিহিত হয়ে থাকে। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তাঁর ঢাকা আগমনের সাথে সাথেই তিনি ছোট কাটরা নির্মাণের কাজ হাতে নেন। বুড়িগঙ্গা নদীর পারে ছোটকাটরা অট্টালিকাটি অবস্থিত। সেকালে এই ইমারতটিকে খুবই চমৎকার ও মনোরম দেখাতো। এর অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং সুদৃঢ় দেওয়ালগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কালের সর্বধ্বংসী আক্রমন প্রতিহত করে আজও সেটি মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

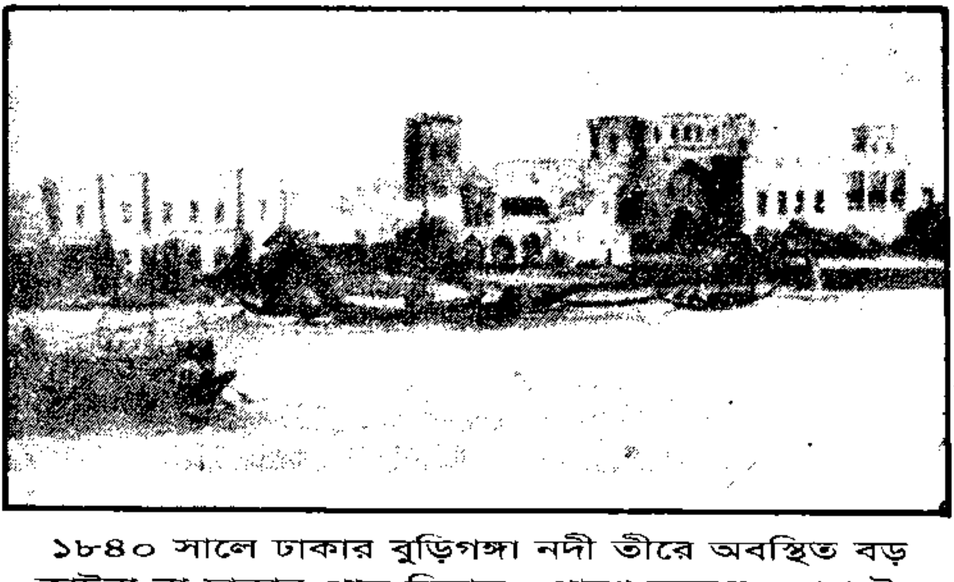


১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী ছোট কাটরা বা ঢাকানগরীর পান্থ নিবাশ

কিছু কাল থেকে এই ঐতিহাসিক ইমারতটিকে বিভিন্ন মহল থেকে যথেষ্ঠ অবহেলা করা হচ্ছে। এটি এখন ঐতিহাসিক নিদর্শনের স্থলে চুন কয়লা ও বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের গুদামরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই কাটরা নির্মাণ কালে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং নদীর পাড় ধরে মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে লালবাগ পর্যন্ত (পোস্তা) বাঁধ তৈরি করা হয়েছিলো। এ জন্যে লালবাগের পূর্ব-দক্ষিণ এলাকাটি পোস্তা নামে অভিহিত হয়ে আসছে। এই কাটরা সংলগ্ন স্থানে একটি সমাধি সৌধের মধ্যে চম্পা বিবির কবর অবস্থিত। তার নামানুসারে এই এলাকার নাম হয়েছে চম্পাতলি। চম্পা বিবি কে ছিলেন সে ইতিহাস সঠিক জানা যায়নি। তবে

জনশ্রুতি আছে, তিনি নাকি নওয়াব শায়েস্তা খাঁর কন্যা। আবার কারো কারো মতে নওয়াব সাহেবের পত্নী বা উপপত্নী। এরই গর্ভে খুদাবান্দা খাঁ ওরফে মির্জা বাঙ্গালী খাঁ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক চম্পা বিবি সম্পর্কিত রহস্য উদঘাটন করা যায়নি। সবই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। শুধু স্মৃতি হয়ে আছে চম্পা নাম ও তার নামানুসারে হয়েছে চম্পাতলি লেন।

শায়েস্তা খাঁর শাসনামলের পর এখানকার শাসনভার অর্পিত হয় সম্রাট শাহাজাহানের আমোদপ্রিয় ও হাস্য কৌতুক প্রিয় পুত্র শাহ্ সুজার উপর। সম্রাট শাহাজাহান নির্মাণ করেছিলেন তাজমহল। তার পুত্রের মধ্যেও যে এই শিল্প চেতনার সমাবেশ ঘটবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তিনি এখানকার শাসনভার গ্রহণ করার পর ঢাকা নগরীকে সৌন্দর্য সুষমায় ভরপুর করে তুলতে প্রয়াসী হন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ সুজার মীর-ই-ইমারত (প্রধান স্থাপত্য শিল্পী) দেওয়ান মীর মহম্মদ আবুল কাশেম সামনানী নদীর ভাটির দিকে নির্মাণ করেন বড় কাটরা। বড় কাটরা প্রাসাদটিকে প্রথমে শাহ্ সুজার প্রাসাদ করার পরিকল্পনা ছিলো। ইতিপূর্বে শাহ্ সুজা নিমতলি কুঠিতে অবস্থান করতেন।

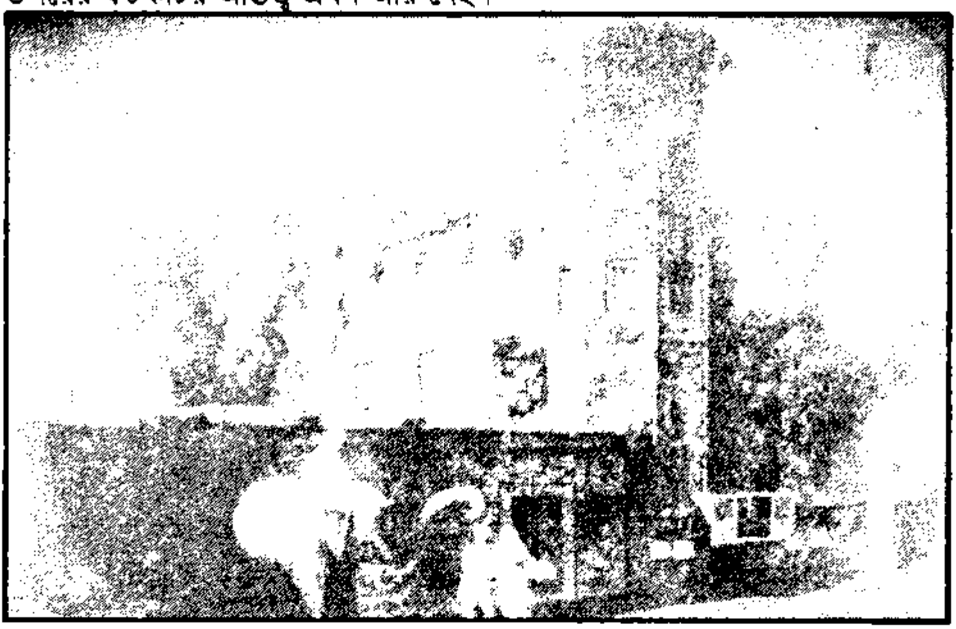


১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী তীরে অবস্থিত বড় কাটরা বা ঢাকার পান্থ নিবাস। পাশে রয়েছে ক্যাপটেন সোয়েট ম্যানের বাসভবন ও সৈন্যদের রসদ যোগাবার দফতর এবং মৌঃ হাপিজ উল্লাহর বাসভবন

সুবেদার মীর জুমলাও বড় কাটরাকে স্বীয় বাসস্থান রূপে মনোনীত করেছিলেন। এবং এর তোরণ দ্বারে দুটি প্রকাণ্ড কামান সজ্জিত রাখতেন। এই বড় কাটরাতে

সুবেদার নওয়াব শায়েস্তা খাঁ ও সুবেদার মীর জুমলা রাজকার্য পরিচালনার জন্যে কিছুকাল দরবার বসিয়েছিলেন। সর্বশেষে নওয়াব জেসারত খাঁ তার দরবার উঠিয়ে আনায় বড় কাটরার সান-শওকত কালের অতল তলে হারিয়ে যায়।

বড় কাটরার মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রধান ফটকটি আকারে বিরাট এবং সুউচ্চ। ফটকটির উপর একটি অর্ধ গোলাকার ছাদ এবং দু'পাশে কতকগুলো ক্ষুদ্র প্রবেশ পথ। আট কোণা দু'টি বুরুজ যেন অট্টালিকার মাথায় মুকুটরূপে বিরাজ করছে। তার ভেতরে অসংখ্য কক্ষ, বারান্দা ও দরদালান। এটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে এটি খুবই মনোরম দেখাতো। এই ইমারতের উপর উৎকীর্ণ লিপিতে লেখা ছিলো ঃ 'এর রূপের কাছে বেহেশতের সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে যায়। এবং বেহেশতি সুখের পূর্ণ স্বাদ এখানে আস্বাদন করা যায়।' কোন এক অজ্ঞাত কারণে শাহ সুজা এটিকে শাহী মহলরূপে ব্যবহার করেননি। হয়ত এই ইমারতের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের গর্ব ও অহংকার আল্লাহর পছন্দ হয়নি। স্বপ্নে বা অন্তরে অনুভব করে তিনি ভবিষ্যৎ দুর্যোগের ঘনঘটার ইঙ্গিত ও অমঙ্গলের আশঙ্কায় এই ইমারত ব্যবহার করতে সাহসী হননি। তিনি এটিকে মুসাফির ও দীন-দুঃখীদের আশ্রয় লাভের জন্যে সরাইখানা করে দিয়েছিলেন। এই ইমারতের সংলগ্ন ২২টি দোকানও আল্লাহর রাহে ওয়াকফ্ করে দেন এবং তাঁর নির্দেশ ছিলো যে কর্মচারীর উপর এর পরিচালন ভার থাকবে তিনি এই সব দোকানের আয় থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে ইমারতের সংস্কার করবেন এবং বাকি অর্থ গরিব মিসকিনদের কল্যাণে ব্যয় করবেন। এছাড়া কোন দুস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে কোন ভাড়া আদায় করতে পারবে না। এই গৌরবময় অট্টালিকাটির সেই ঐতিহ্য এখন আর বজায় নেই। কোন কোন প্রাচীর ও দেওয়াল ভেঙ্গে গেছে। উপরের ফটকটির অস্তিত্ব এখন আর নেই।



বৃটিশ যুগে আগাছায় ভরা বড় কাটরা

কিছুদিন পূর্বেও দেখা গেছে বহুদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে ইমারতটিতে আগাছা, বাদুড়, পেঁচা আর সরীসৃপের রাজত্ব ছিলো। বহুদিন থেকে এখানে একটি দারুল উলম মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে। এ মাদ্রাসায় শিক্ষালাভের জন্যে দেশের দূর-দূরান্তর থেকে বহু ছাত্র এসে ধর্মশিক্ষা লাভ করে জ্ঞানের মশাল হাতে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। মজবুত মনোরম অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ এই অট্টালিকাটি আজও নদীর দিকে সমুন্নত শিরে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হৃত গৌরবের কথা সকলের স্মরণপটে উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে। আর এরই নিচ দিয়ে চলে গেছে আজকের সোয়ারী ঘাট রোড। মানুষের অবহেলায় আজ তার সে পূর্ব সৌন্দর্য হারাতে বসেছে। এর সংস্কারের ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন।

বর্তমানে ওসমানী উদ্যানে যে কামানটি স্থাপিত হয়েছে সেটি সর্বপ্রথম বড় কাটরার সম্মুখে সোয়ারীঘাটেই স্থাপিত করেছিলেন সুবেদার মীর জুমলা। তিনি আর একটি কামান স্থাপন করেছিলেন বড় কাটরা বরাবর চর মোঘলানীতে। এর একটি বিবি মরিয়ম নামে পরিচিত। পল্লী অঞ্চল থেকে আগত এবং শহর থেকে গ্রামে যাওয়ার সকল প্রকার সোয়ারী এই ঘাট দিয়ে আসা-যাওয়া করতো বলেই এই রাস্তাটির নাম সোয়ারীঘাট রাখা হয়েছে। বড় কাটরার সম্মুখ দিয়ে কুলকুল রবে বয়ে যেতো বুড়ি গঙ্গা নদী। এই নদীর অপর পারেই জিনজিরা। এ শুদ্ধ নাম ছিলো জাজিরা অর্থাৎ আইল্যাণ্ড। এখানে নওয়াব ইব্রাহীম খাঁ ১৬২০-২১ খ্রীস্টাব্দে জিনজিরা প্রাসাদ 'নওঘরা' নির্মাণ করেছিলেন। সে সময় তিনি বাংলার সুবেদার পদে আসীন ছিলেন। এই প্রাসাদে প্রবেশের প্রাক্কালে প্রথমেই মোঘল আমলে তৈরি ফটক অতিক্রম করতে হয়। ফটকের অনতি দূরেই পৃথক দুটি স্থানে দুটি প্রাসাদ রয়েছে। দেখলে মনে হয় হয়ত এটা ফাঁসির মঞ্চ ছিলো। অন্যটিকে দেখে মনে হয় প্রমোদাগার। যাহোক, জিনজিরা প্রাসাদের নৃত্যাশালায় আজ আর ঝলমলে বেশভূষা পরিহিতা নর্তকীরা নেই। প্রমোদাগারে নেই পেয়ালার টুংটাং শব্দ। নেই বাঈজীদের নূপুরের নিক্কন ধ্বনি। আজ শুধু জমাটবাঁধা শেওলা আর আগাছার আস্তরণে জিনজিরা প্রাসাদ ক্রমেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে।

সে সময় শহর ও জিনজিরার (আইল্যাণ্ড) মধ্যে লোক চলাচলের জন্যে একটি কাঠের পুল ছিলো। বৃটিশ শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু পূর্বে মুসলিম সাম্রাজ্যের শোকাবহ নাটকের শেষ অঙ্কটি ঢাকার এই জিনজিরা প্রাসাদেই অনুষ্ঠিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর সর্বস্বান্ত সিরাজদ্দৌলার পরিবার-পরিজনকে এই জরাজীর্ণ জিনজিরা প্রাসাদে প্রেরণ করা হয়েছিলো। আর সেই সঙ্গে নওয়াব আলীবর্দির দুই

কন্যা ঘষেটি বেগম ও আমিনা বেগমকেও আনা হয়। উভয়েই পিতার রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সিরাজদ্দৌলার সুবেদারি লাভের পথে ঘষেটি বেগম প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন। অবশেষে একদিন পরিচারিকাদের সাথে একই নৌকায় তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়। যেদিন বুড়িগঙ্গার তীরস্থ জিনজিরা প্রাসাদে বন্দিনীদের নিয়ে রক্ষীদল উপস্থিত হয়েছিলো, সেদিন নদীর উভয় তীরে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো। উপস্থিত হাজারো জনতার কেউই সেদিন অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি। শোকার্ত নর-নারী অশ্রুসিক্ত নয়নে দেখলেন, নওয়াব আলী বর্দি খাঁর বৃদ্ধা মহিষী, বীরদর্পী কন্যা ঘষেটি বেগম, শেষ নওয়াব সিরাজ-মাতা আমিনা বেগম এবং সিরাজের প্রাণপ্রিয় পত্নী লুৎফুন্নেসা শিশুকন্যাকে বুকে চেপে ধরে অতি সাধারণ বন্দিনীর মত পদব্রজে জিনজিরা প্রাসাদে প্রবেশ করছেন। সঙ্গে কোন সেবিকা নেই, অঙ্গে ছিলো না পরিধানের বস্ত্রখণ্ড ছাড়া অন্য কোন আভরণ। সেদিন নওয়াব মহিষী ও বন্দিনীগণকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আপন হেরেম থেকে বিতাড়িত হয়ে ভীরু শঙ্কিত দুরু-দুরু পায়ে অবহেলা ও অবমাননার বোঝা মাথায় নিয়ে জিনজিরা প্রাসাদে শরফরাজ খাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে হয়েছিলো।

আলী বর্দি খাঁর অনুগ্রহে নওয়াব শরফরাজ খাঁর বেগম ও সন্তান-সন্ততিগণ পূর্বেই এখানে স্থানলাভ করেছিলেন। এই ভাবে পরাজিত নওয়াবের পরিবার-পরিজন জিনজিরা প্রাসাদের প্রাচীরের অভ্যন্তরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহানগরী ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ে অবস্থিত জিনজিরা প্রাসাদের দিকে লোকে যখন তাকাতো- হয়ত বিস্ময় আর করুণায় তাদের দুচোখ সজল হয়ে উঠতো। এখানকার সকল পরিবারের মধ্যে পূর্ব থেকেই হিংসা-বিদ্বেষ বিরাজ করছিলো। তাঁরা একে অপরের দুঃখদুর্দশা দেখে প্রতিহিংসাপরায়ণ আনন্দ উপভোগ করতেন। অবশেষে মীরনের চক্রান্তে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে কোন এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সিরাজ পরিবার জিনজিরা প্রাসাদ থেকে অবতরণ করে বুড়িগঙ্গা নদীর বুকে এক নৌকায় আরোহণ করে। তাঁরা তখনও বুঝতে পারেননি ভাগ্য তাঁদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা নগরী দৃষ্টি আড়ালে যেতে না যেতেই বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরীর সংগমস্থলে মীরন-নিযুক্ত ঘাতক বাকির খান নৌকার ছিদ্র স্থান খুলে দিয়ে নৌকাটি ডুবিয়ে দেয়। তারপর যা অনিবার্য, যা অবধারিত, তাই ঘটে এই পরিবারটির ভাগ্যে। কিন্তু নিয়তির প্রতিহিংসার কবল থেকে ঘাতকটিও নিস্তার পায়নি। তাকেও গ্রাস করেছিলো নদী। আর চক্রান্তকারী মীরন রেহাই পায়নি আল্লাহ তায়লার শাস্তি থেকে। ১৭৬০ সালের ২রা জুলাই পাটনার উপকণ্ঠে সৈন্যদের ছাউনির মধ্যে এক তাঁবুতে শুয়ে বিশ্রাম করার সময়

অকস্মাৎ বজ্রপাত হয় মীর জাফরের পুত্র মীরনের উপর। সিরাজ পরিবারের মৃত্যুর কদিন পরই তারও অকাল মৃত্যু হয়। বজ্রাহত মীরন শেষ শয্যায় শুয়ে আছেন রাজমহলের গঙ্গানদীর তীরে। আজও জিনজিরা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মানুষের মনে স্মরণ করিয়ে দেয় এই করুণ ঘটনাবলীর মর্মান্তিক পরিণতির কথা।

বুড়িগঙ্গা নদী জিনজিরা এলাকাসহ ২৬ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ৬ মাইল প্রস্থ ভূখণ্ডকে একটি দ্বীপাকারে পরিণত করিয়েছে। এই দ্বীপাকার ভূভাগই পার জোয়ার নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

ছোট কাটরা মহল্লার একটি অংশের নাম স্থানীয় বিশিষ্ট ইউনানী চিকিৎসাবিদ প্রথিত যশা ইতিহাস রচয়িতা, সাংবাদিক, উর্দূ সাহিত্যিক, রাজনীতিক, পুরাকীর্তির সংরক্ষক হেকিম হাবিবুর রহমান আখুনজাদার নামানুসারে ঢাকা পৌর সভা তার জীবদ্দশাতেই নামকরণ করেন হেকিম হাবিবুর রহমান রোড।

ঢাকার অধিবাসীদের কাছে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হেকিম সাহেব সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইয়াগিস্তানের ইউসুফ জায়ী পরিবারের বংশধর। তার পিতা হাজী মুহম্মদ শাহ আখুনজাদা ছিলেন একজন মশহুর আলেম। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি ঢাকার ছোট কাটরা এলাকায় এসে স্থানীয়ভাবে বসতি স্থাপন করেন। ১৮৮১ সালে হেকিম সাহেব এখানেই জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছোট বেলা থেকেই খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন শহরে লেখাপড়া, ধর্মশিক্ষা, বিশেষ করে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করে দীর্ঘ এগার বছর পর ঢাকায় ফিরে আসেন। এবং ১৯০৪ সাল হতে তিনি হেকিমি ব্যবসা আরম্ভ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে তার খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর নেক নজর তাঁর উপর নিপতিত হওয়ায় তিনি নবাব পরিবারের পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এ সময় থেকেই নবাব পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিভিন্ন জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিকটও আকৃষ্ট হয়ে তাদের গৃহ চিকিৎসক মনোনীত হন। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে হেকিম সাহেবের বহু কিংবদন্তি জড়িয়ে আছে। তিনি হাতের শির ধরে, অনেক ক্ষেত্রে দূর থেকে কণ্ঠস্বর শুনেও রোগ নির্ণয় করে ফেলতেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর তাকে মাসিক দশ হাজার টাকা মাহিনা দিয়ে গৃহ চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত করার বাসনা জানালেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, অপরদিকে ঢাকা প্রিয় মানুষ। তাই ঢাকাবাসীও তাকে খুব ভালবাসতো শ্রদ্ধা করতো। ফলে তিনি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে কয়েক বছর ঢাকা

পৌর সভার কমিশনার পদে বহাল ছিলেন। তিনি শুধু নবাব-জমিদারদের চিকিৎসক ছিলেন না। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ গরীব মানুষের চিকিৎসাও করে গেছেন। এমনকি গরীব রোগীদের পথ্য কেনার জন্যে অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছেন। তার রোগীদের মধ্যে ইংরেজ রাজকর্মচারীও অনেক ছিলেন।

ইউনানী চিকিৎসার উন্নয়নের জন্যে হেকিম সাহেব আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি দু'টি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে "সবার জন্যে স্বাস্থ্য" হাতে নিয়ে ঢাকা ও কলিকাতায় দু'টি তিব্বিয়া কলেজ স্থাপন করার চেষ্টা করেন। ১৯২২ সালে সরকারীভাবে পরিকল্পনাটির জন্যে কমিটি গঠিত হলেও অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে সরকার তা কার্যকরী করেননি। অবশেষে হেকিম সাহেব নিজেই ঢাকায় তার বাসভবনের নিকট ১৯৩০ সালে তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে বাংলাদেশে এটাই ছিলো এ ধরনের প্রথম কলেজ। চিকিৎসা শাস্ত্রে তার অবদানের জন্য বৃটিশ সরকার ১৯৩১ সালে তাকে 'শেফাউল মূলক' উপাধি প্রদান করেন।

কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ ও দরদীমনা হেকিম সাহেব চেয়ে ছিলেন তৎকালীন সমাজে অধিকাংশ আলেম ও ইমাম যেভাবে দিনদিন কর্মবিমুখ হয়ে সাধারণ মানুষের কাছ হতে হাদীয়ার বিনিময়ে ওয়াজ তথা ধর্ম সভা অথবা জাকাতের অর্থ দ্বারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতঃ তা থেকে বেতন গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা থেকে বিরত করা। কারণ এতে ভবিষ্যতে তাদের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার কোন পথই খোলা থাকবে না। যে আলেম ও ইমামরা একদিন জেহাদী আন্দোলন গুলোতে নেতৃত্ব দিয়েছে সে ইমাম আলেমরা দয়ার পাত্র না হয়ে সম্মানজনক ইউনানী পেশায় নিয়োজিত হয়ে গর্ভভরে বুক ফুলিয়ে নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসুক, অন্য দিকে দেশের আর্ত্ত-পীড়িত জনগণ স্থানীয় উপকরণ ও গাছ গাছরা দ্বারা স্বল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার সুবিধে থেকে বঞ্চিত না হয়। দেশী বিদেশী অধিক মূল্যের ঔষধের প্রতি আকৃষ্ট ও নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি সরকারী অনুদানও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দূরদর্শী হেকিম হাবিবুর রহমানের সে উদ্দেশ্য আজও পূর্ণ হয়নি। অথচ আমরা দেখতে পাই নিকটতম দেশ ভারত, পাকিস্তান, চীন, সিংহল প্রভৃতি দেশগুলোতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইউনানী তথা আয়ূর্বেদীক চিকিৎসা শাস্ত্র দিন দিন উন্নতি ও নতুন নতুন মহাপোকারী ঔষধ আবিস্কার করে চলেছে। হেকিম সাহেবের মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলে হাজার হাজার শ্রদ্ধাভাজন আলেম ও মসজিদের ইমামগণ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে ধর্ম প্রসারে সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারতেন।

পুরাকীর্তির সংরক্ষক হিসেবেও হেকিম সাহেব বহু মুদ্রণ, শিলালিপি, দুস্প্রাপ্য স্বর্ণ,

রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা সংগ্রহ করেছিলেন তন্মধ্যে শাহানামা ফেরদৌস, শাহানামা ওমর খসরু, বাদশা আলমগীরের স্বহস্তে লেখা কোরান শরীফ (যাতে বাদশার সীল মোহর অঙ্কিত রয়েছে) উল্লেখযোগ্য। এসব অমূল্য সম্পদ তিনি ঢাকা যাদুঘরে এবং প্রায় তিন হাজার দুস্প্রাপ্য বই পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এইচ, আর সি কালেকশনে রক্ষিত আছে। সাংবাদিক হিসেবে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। তিনি আল মাশরেক ও জাদু নামে দুটি উর্দূ পত্রিকার সম্পাদনা করে গেছেন। তৎকালীন ভারতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতাগণের এক জাতি তত্ত্বের দুভিসন্ধিমূলক বক্তব্যের উপযুক্ত জবাব এসব পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ঐতিহাসিক ও সুসাহিত্যিক হিসেবে তিনি বহু উর্দূ পুস্তক-পুস্তিকা ও নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে "আসূদ গানে ঢাকা" "ঢাকা পাচাশ শাল পাহলে" আল ফারিক, হায়াতে এ শুকরাত, তাজ কিরাতুল ফুজালা উল্লেখযোগ্য। অপ্রকাশিত রচনাগুলোর মধ্যে 'মাসজিদে ঢাকা' কুচ পুরানিবাতে, ঢাকেকী তারীখী ইমারাত অন্যতম।

তিনি কবি ও গাজালকার হিসেবে বাংলা ও ভারতের মধ্য প্রদেশে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তার ঘাসভবনে কাব্যের আসর বসিয়ে উপস্থিত শ্রোতা ও বন্ধুদের নানারূপ মুখরোচক খাদ্য খাওয়াতেন। তিনি লৌখনো, আগ্রা ও ভারতের অন্যান্য শহরে তার কাব্য, গজল পেশ করে সুনাম অর্জন করেছিলেন।



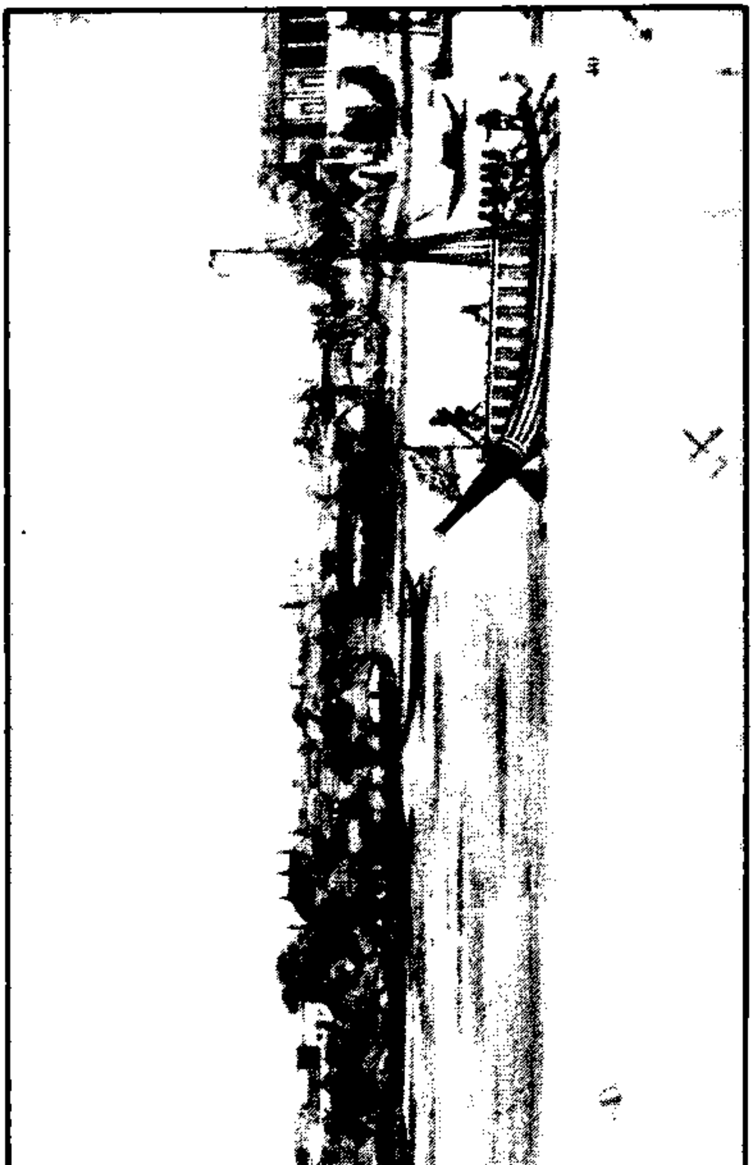
বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর আয়োজিত স্মরণীয় আলোচনা অনুষ্ঠানে হেকিম হাবিবুর রহমানের জীবনী আলোচনা করছেন লেখক জনাব নাজির হোসেন

রাজনীতিক ও শিক্ষাব্রতী জাতীয় সেবক হিসেবেও তিনি সারা ভারতে পরিচিত ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি নবাব স্যার সলিমুল্লাহর দক্ষিণ হস্ত ও সক্রিয় সহযোগী ছিলেন ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লগ্নে তার অবদান যথেষ্ট ছিলো। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রথম জয়েন্ট সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি সমসাময়িক কালে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা কনফারেন্সেও যথেষ্ট ভূমিকা রেখে গেছেন। বিভিন্ন সময় মুসলিম শিক্ষা কমিটিসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সরকারী-বেসরকারী বহু চিকিৎসা সংক্রান্ত সমিতির সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি আঞ্জুমানে আতিব্বায়ে মাশরেকী বাংলা ও আসামের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এসব বহুমুখী প্রতিভার জন্যে তিনি রাজকীয় উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নিকটও বরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তার বাসায় আমন্ত্রণে তাদের অনেকেই এসেছেন। তৎকালে খাদ্যে বিষ প্রদান করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হত্যা করা হতো। তজন্য তার নিকট একখানা "পয়েজন প্রুফ" বাসন (প্লেট) ছিলো। কোন খাদ্যে বিষ মিশ্রিত থাকলে পাত্রটি আপনা-আপনি ফেটে চৌচির হয়ে যেতো। এ পাত্রটিও তিনি ঢাকা যাদুঘরে দান করে গেছেন। এরূপ প্লেট বিশ্বের মাত্র তিনটি যাদুঘরে রক্ষিত আছে তন্মধ্যে ঢাকায় একটি।

তিনি মুসলিম লীগের আহবানে ১৯৪৬ সালে বৃটিশ রাজ প্রদত্ত "শেফাউল মূলক" উপাধি পরিত্যাগ করেন। তার পরিবার সূত্রে জানা যায় তিনি "গারিব হিন্দুস্থান" নামে একটি নাটকাকারে বই লিখে ছিলেন যা বানারস হতে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে বৃটিশ সরকার তা বাজেয়াপ্ত করে নেন। তিনি ১৯৪৭ সালে ঢাকায় জান্নাতবাসী হন।

ঢাকা শহরের একটি মহল্লার নাম রহমতগঞ্জ। নওয়াব রহমত উল্লাহ ওরফে নওয়াব রহমত খাঁ নওয়াব শায়েস্তা খাঁর আমলে বখসি (পে-মাষ্টার) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বাসভবন ছিলো কাঁসার হাট্টায়। তিনি কিছু দিনের জন্যে বাংলার সুবেদারের দায়িত্ব ও অস্থায়ীভাবে পালন করেছিলেন নওয়াব ইব্রাহিম খাঁর পর ও প্রিন্স আজিমুশশানের কাল পর্যন্ত এখানে একটি গঞ্জ অর্থাৎ মার্কেট ছিলো। অনুমান করা যায় নওয়াব রহতম খাঁ এ গঞ্জটি বসিয়ে ছিলেন বা এর উন্নয়ন কিংবা সম্প্রসারণ করেছিলেন। তজ্জন্য এ মহল্লাটি তারই নামানুসারে রহমতগঞ্জ নামকরণ হয়েছে। যদিও সেখানকার কিছু লোক বৃটিশ যুগে বলে থাকতেন এখানে বেশ কিছু সুফী দরবেশ ছিলেন। তারা ছিলেন আল্লাহর রহমত। তাই রহমগঞ্জ নামকরণ হয়েছে এ

ধারণা সঠিক নয়। নবাব রহতম খাঁর নামানুসারেই হয়েছে রহমতগঞ্জ। কিছু কাল রহমতগঞ্জ ঘাট রোড বলেও রাস্তাটি পরিচিত ছিলো।

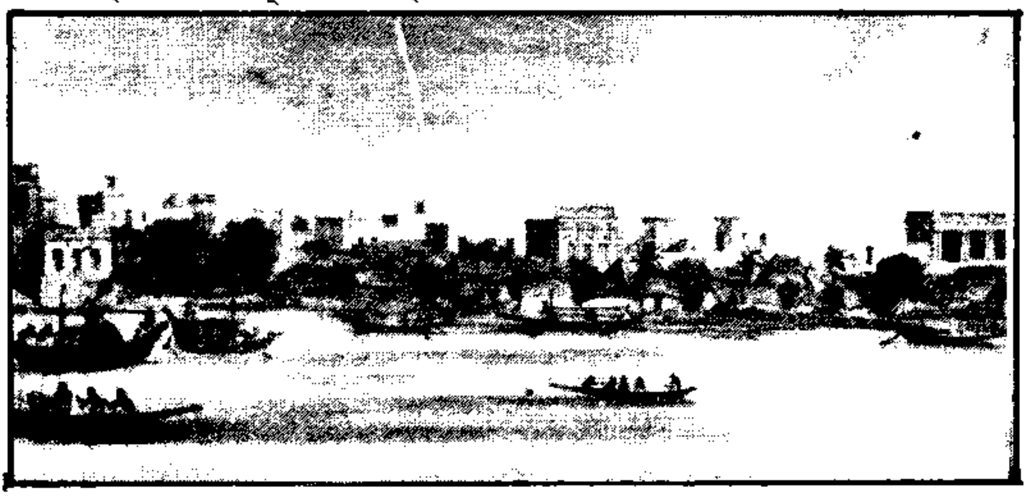


১৮৪০ সালে ঢাকার নদী তীরবর্তী রহমত গঞ্জ এলাকার দৃশ্য

১৯৩৮ সালে পৌরসভা স্থানীয় বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ও পৌর কমিশনার

মরহুম হাজী বাল্লু সাহেবের নামানুসারে রহমতগঞ্জের প্রধান অংশ ও সড়কটির নামকরণ করে হাজী বাল্লু রোড। হাজী বাল্লুর সুযোগ্য ও প্রভাবশালী পুত্র সোবান সাহেবও ঢাকা পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি একবার নবাব হাবিব উল্লাহর আমলে পোস্তাস্থিত তাদের নির্মিত বারোদুয়ারী ভবনটি এবং চামড়ার ব্যবসা ও কাজকর্ম কিভাবে চলে সেটা দেখাবার জন্য বাংলার লাট সাহেব তথা ছোট লাট বাহাদুরকে এনেছিলেন বলে জানা যায়। হাজী বাল্লু রোডের দক্ষিণে রাস্তার আবর্জনা দ্বারা বেশ কিছু যায়গা ভরাট হলে তা কুড়াপট্টি নামে পরিচিত হয়। অবশ্য পরে তা হাজী বাল্লু রোডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়।

রহমতগঞ্জ মহল্লায় বড় মসজিদে ক্বারী আব্দুর রহমান জৌনপুরীর মাজার রয়েছে। তজ্জন্য আজও মসজিদটিকে ক্বারী সাহেবের মসজিদ বলা হয়ে তাকে। ক্বারী সাহেব মওলানা কেরামত আলী সাহেবের সহায়তায় জৌনপুর থেকে ঢাকায় এসেছিলেন, চকবাজারের বড় মসজিদে যখন মাদ্রাসা ইসলামিয়া খোলা হয় তখন। ক্বারী সাহেবের দায়িত্বে হেফজখানা ও নাজরাখানা দেয়া হয়। তাছাড়া গনি মিয়া হাটের নিকট খাজা আব্দুল গাফফার আখতারের নির্মিত একটি মসজিদ রয়েছে যা সাধারণতঃ গনি মিয়া হাট মসজিদ নামে পরিচিত। এর সন্নিকটেই বৃটিশ আমলে ঢাকার নওয়াব আব্দুল গনি সাহেব এখানে একটি হাট বসিয়ে ছিলেন। সে জন্য হাটটি গনি মিয়ার হাট নামেই বহুল পরিচিত ছিলো। হাটের ঢোলিয়ারা ঢোল বাজিয়ে চিৎকার করে বলতো ধার করো, কর্জ করো, গনি মিয়ার হাট করো। এ ভাবেই গনি মিয়ার হাটের নাম বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। গনি মিয়া হাটের নিকটস্থ মসজিদের পূর্ব দিকে শাহ্ মোমেনের মাজার রয়েছে।



১৮৪০ সালে ঢাকার রহমতগঞ্জ এলাকায় নদীতীরবর্তী মির্জা আনো আলী ও মির্জা মোহাম্মদ আলীর বাড়ীর দৃশ্য

অবশ্য রহমতগঞ্জ অঞ্চলটির পূর্ব নাম ছিলো বাগে মীর মোমেনা। মোমেন

থেকেই এনামের উৎপত্তি এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে মোমেন শব্দটি ইরানী ভাষা, ইরানী শব্দ থেকেই এনামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন, কারণ পূর্বে রহমতগঞ্জে ইরানীদের বসবাস ছিলো।

রহমতগঞ্জ ফুটবল মাঠটি প্রথমে সমতল ছিল না উৎসাহী খেলোয়াড় এবং সমর্থক নিজেরাই মাটি কেটে ম্যঠটি সমতল করার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীতে পাক-আমলে পৌর সভার চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক জনাব মাঈনুদ্দিন চৌধুরী মাঠটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করেন। মাঠের একপাশে একটি জিমনাসিয়ামও প্রতিষ্ঠা করে দেন। মহল্লাবাসী এ জিমনাসিয়ামটির নামকরণ তারই নামানুসারে "মঈনুদ্দিন চৌধুরী জিমনাসিয়াম" নাম রাখেন। এক সময় রহমতগঞ্জে কুস্তি ও লাঠি খেলার খুবই প্রচলন ছিলো। কুস্তিগীরদের মধ্যে ইব্রাহীম পালোয়ানের খ্যাতি ছিলো। তিনি একবার আগরতলা মহারাজার কুস্তিগীরকে পরাজিত করলে মহারাজা ইব্রাহীম পালোয়ানকে এক ছড়া স্বর্ণের গলার হার উপহার দেন।

এ মহল্লার পূর্বে রয়েছে দেবীদাস ঘাট রোড। দেবীদাস বোস ঢাকার মালাকার নগরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। তিনি দেওয়ান হাজী সফি ইস্পাহানীর অধীনে নাওয়ারা মহলের কানুনগো ছিলেন ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের দিকে তিনি এখানেই বসবাস করতেন। তারই নামানুসারে এলাকাটির নাম দেবীদাস ঘাট হয়েছে। যদিও কিছু কিছু লোক বলে থাকেন ডেভিড নামে এক ইংরেজ চামড়া ব্যবসায়ী ছিলেন তার নামানুসারে ডেভিড ঘাট ছিলো পরে তা বিকৃত হয়ে দেবীদাস ঘাট নাম হয়েছে। একথা সঠিক নহে, কারণ ইংরেজ ব্যবসায়ীর বহু পূর্ব হতেই দেবীদাসের নামানুসারে দেবীদাস ঘাট সরকারী রেকর্ড পত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এখানে শ্রীফলতালির জমিদারদের একটি বাড়ী ছিলো কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত। জমিদার ঢাকা শহরে আসলে এখানেই অবস্থান করতেন। মুসলিম শাসনামলের এক সময় নাকি এখান দিয়েই একটি কাঠের পুল ছিলো, যা বুড়িগঙ্গা নদীর উপর দিয়ে জিনজিরার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো। পরে পুলটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়।

বর্তমানে যেখানে সেন্ট্রাল জেল ও পাগলাগারদ অবস্থিত। সেখানে ঢাকার তৃতীয় মোঘল নওয়াব সুবেদার ইব্রাহীম খাঁ নির্মিত কেল্লার কোন চিহ্নই এখন আর নেই। কোন কোন ঐতিহাসিক এ স্থানটি নওয়াব ইসলাম খাঁ পুনর্নির্মাণ করেছেন বলে মত পোষণ করেন। এই কেল্লার মধ্যেই ছিলো একজিন মহল, বিচারালয়, টাকশাল ইত্যাদি। অবশ্যি এখানে পাঠান রাজত্বকালে অর্থাৎ শের শাহের আমলে প্রথম কেল্লা তৈরি হয়। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে ইংরেজ এজেন্ট লেফটেন্যান্ট সুইলটন যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর পক্ষ থেকে দেওয়ানী কার্যভার গ্রহণ করতে আসেন, তখন তৎকালীন নায়েব নাজিম এই প্রাসাদেই বাস করছিলেন। তারপর তাঁকে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। বৃটিশ সরকার এই দুর্গ প্রাসাদগুলোতে তাদের সদর দফতর স্থাপন করেছিলো এবং এখানেই বহু দিন যাবৎ রাজকার্যও পরিচালনা করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরেজ সৈন্যগণ প্রথমেই এখানকার সিপাহীদের নিরস্ত্র করে তৎপর লালবাগ দুর্গাভিমুখে ধাবিত হয়।

১৮১০ সালের কথা। ঢাকা নগরীতে গৃহকর ধার্য করা হলে ঢাকার অধিবাসীরা তা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তারা সমবেতভাবে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে বর্তমান জেলখানার অভ্যন্তরে পুরনো দুর্গে অবস্থিত কাছারিতে সম্মিলিতভাবে কালেক্টরের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করে। কালেক্টর বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত জনতার কাছ থেকে দরখাস্ত গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক কালেক্টরী লুটের আশঙ্কা দেখা দেয়। কর্তৃপক্ষ উপায়ন্তর না দেখে সৈন্যবাহিনী তলব করেন। এই দরখাস্তে ঢাকার বহু বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তি স্বাক্ষর করেন। অবশ্যি পর দিবস শান্ত পরিবেশের মধ্যে জনগণের প্রতিনিধিগণ দরখাস্তটি পেশ করেছিলেন। আজ সেই শাহী মহলের রূপ একেবারে পাল্টে গেছে। এখন আর সে কাছারিখানাও নেই। এককালের সেই শাহী মহল, বিচারালয় ও টাকশালে অপরাধীদের শাস্তি গ্রহণের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। এরা হয়ত ভাবতেও পারে না যে এককালে এখানে বাংলার শাহী মহল ছিলো, ছিলো আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল।

মোঘল আমলে ইসলাম খাঁর এ দুর্গের মধ্যে যে টাকশাল ছিলো তাতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তথা কোম্পানী আমল পর্যন্ত মুদ্রাদি প্রস্তুত হতো। বর্তমানে এই টাকশাল ভবনটিতেই জেল হাসপাতাল অবস্থিত। এই পুরোনো দুর্গটি নবাব ইব্রাহিম খাঁ ফতেহ জঙ্গ ও ইসলাম খাঁ মেহেদী সংস্কার সাধন করেছিলেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ এ স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।

বর্তমান জেলখানা সংলগ্ন পাগলা গারদ ১৮১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৬ সালে পাগলা গারদে অবস্থানযোগী সাতটি কক্ষ ও নির্জন বসবাস উপযোগী ৩২টি কক্ষ ছিলো। এখানে বাংলা, ত্রিপুরা ও আসামের রোগীও আসত। ১৮৫৭-১৮৬৬ এই দশ বৎসরের জরীপে দেখা যায় ৯৫ জন রোগী গড়ে প্রতি বৎসর এখানে আসত। সিভিল সার্জনের অধীনেই এ পাগলা গারদটি ছিলো। গাঁজা খাওয়ার দরুনই পাগল হতো বেশী। জেল খানার উঁচু দেয়াল নির্মিত হয় ১৯০১ সালে।

১৭৭৫ সালে ঢাকা জেলে ১১০ জন কয়েদি ছিলো। তন্মধ্যে ৮৭ জন ডাকাত,

১৫ জন হত্যাকাণ্ডে জড়িত এবং ৮ জন চুরির সাথে জড়িত ছিলো। এদের মধ্যে ৯৫ জন সড়ক মেরামত ও নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিলো। ১৭৯০ সালে কয়েদীদের প্রতিদিনের খাদ্যের জন্যে বরাদ্দ ছিলো এক আনা। এর পূর্বে দুই পয়সা ছিলো।

কেল্লার নিকটবর্তী স্থানকে "গড় কেল্লা" তথা গীরদে কেল্লা বলা হতো। এ সব স্থানের কোন কোনটি কোনা নিকাশ, চক নিকাশ ও উর্দূ বাজার বলে কথিত ছিলো গীরদে কেল্লার (জেলখানার) নিকট ১৪৫৮ খৃস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিলো যা গির্দে কেল্লা নামে পরিচিত ছিলো। এই প্রাচীন মসজিদটিই ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে ভূমিস্যাত হয়ে যায়।

এই জেলখানার দক্ষিণে রয়েছে পাদশাহী বাজার অর্থাৎ আজকের চকবাজার। এই চকবাজারকে আগে গ্রামাঞ্চলের বহু লোক চৌক বন্দর বলে আখ্যায়িত করতো। মোঘল আমল থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এটা একটি প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত ছিলো। এবং এটি সবার কাছেই পাদশাহী বাজার বলে পরিচিত ছিলো। ১৭০২ খৃস্টাব্দে নওয়াব মুর্শিদ কুলি খাঁ এই পাদশাহী বাজারটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক বাজারে পরিণত করেন। এই বাজারের ভিত্তি-প্রস্তরটি কলিকাতা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অর্থাৎ ১৬০২ খ্রীস্টাব্দে রাজা মানসিংহ যখন তাঁর সদর দফতর ভাওয়ালগড় থেকে স্থানান্তর করে এর আশপাশে কোথাও স্থাপন করেছিলেন, সে সময় থেকেই ধীরে ধীরে এখানে একটা বাজার গড়ে উঠতে থাকে। ১৭৩৩-৩৪ সালে নওয়াব লুৎফুল্লাহ ওরফে মুরশিদ কুলি খাঁ (দ্বিতীয়) বাজারটি উন্নয়নের জন্যে এটিকে অনেকখানি সম্প্রসারিত করেন। তৎকালে এটি ছিলো ঢাকার অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিদের প্রধান বাজার। তখনকার গভর্ণর ভবন ছিলো বর্তমান সেণ্ট্রাল জেলের ভিতর। এতেই অনুমান করা যায় যে এ বাজারের গুরুত্ব কতখানি ছিলো। চৌকো (স্কয়ার) বাজারটির চতুর্দিকে আজকের মত সেদিনও রাস্তা ছিলো। এবাজারে বিভিন্ন জাতির লোকেরা বাজার সওদা করতে আসতো। যখন কোন প্রিন্স বা রাজকীয় লোক এ বাজারে আসতেন, তখন নকিব হাঁক দিতো আর চোপদারগণ রাস্তার ভীড় সরিয়ে দিতো। জনসাধারণ রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতো। ইতিহাস রচয়িতাগণের অনেকেই এ বাজারটিকে লণ্ডন নগরীর হাইড পার্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মুরশিদ কুলি খাঁর (দ্বিতীয়) পরে ওয়াল্টার সাহেব নতুন করে চকবাজার তৈরি করেন। তিনি সে সময়ে কোমর পর্যন্ত উঁচু দেওয়াল দিয়ে চকবাজার ঘিড়ে

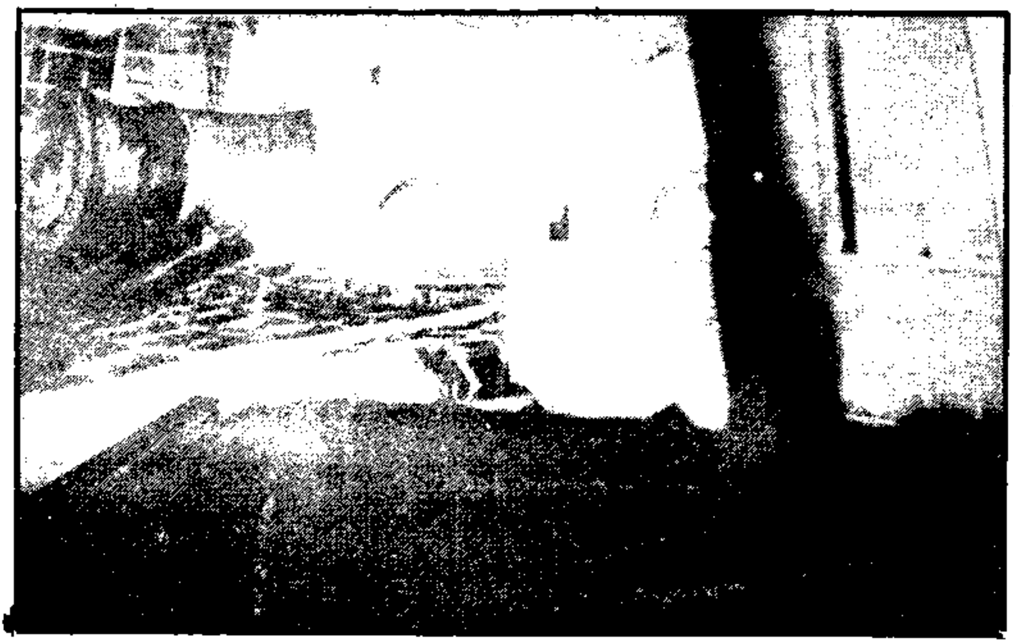
দিয়েছিলেন এবং বাজারে প্রবেশের জন্যে ১৬টি গেট তৈরি করে দিয়েছিলেন। প্রথমে এই বাজারে দোকান-পসার বসতো বিকেলের দিকে। চকবাজারের ভিতরে একটা মাজার রয়েছে। মহর্‌রমের সময় এই মাজারে মর্সিয়া পাঠ করা হতো। মাজারটিকে সবাই খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। মাজারটি শাহ্ নূরী গোলাহ্‌র বলে পরিচিত। মাজারটি চকবাজারের মধ্যে অবস্থিত বলে খুব অসুন্দর দেখাতো। তাই ওয়ালটার সাহেব কবর খুঁড়ে কফিন উঠিয়ে মির্জা মান্নার দেউড়িস্থ মসজিদের সামনে পুনরায় দাফনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ভক্তবৃন্দ সেখানে কৃত্রিম কবর স্থাপন করে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে থাকে। কেউ কেউ গান-বাজনা, কাওয়ালী ও অন্যান্য আসরের ব্যবস্থা করে থাকে। শাহ্ নূরী গোলাহ্‌কে অনেকেই ফৌজী অফিসার বলে ধারণা করে থাকেন।

এই বাজার সংলগ্ন চকবাজার মসজিদটি ১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে নওয়াব শায়েস্তা খাঁ তাঁর নিজস্ব স্থাপত্য আঙ্গিকে তৈরি করেছিলেন। তিনি এ মসজিদে সাধারণতঃ নামাজ পরতেন। ঈদ ও মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে মসজিদটিকে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হতো। মসজিদের সম্মুখ দিকে কতিপয় দোকানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে এইসব দোকানের আয় থেকে মসজিদটি সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। বড় বড় উৎসবাদিতে আগের দিনে নায়েব নাজিমগণ এসে নামাজ পড়তেন। মসজিদটিতে আগের দিনের শান-শওকত না থাকলেও আজও চক মসজিদটিতে বহু মুসল্লি নামাজ আদায় করতে আসেন। তবে বর্তমানে আধুনিক স্থাপত্যকলার সঙ্গে মিল রেখে আজও কর্তৃপক্ষ মসজিদটিকে সুন্দরভাবে সম্প্রসারিত করেই চলেছেন। এ মসজিদে নামাজ আদায় ছাড়াও উলেমাগণ বহুকাল যাবৎ পাক কোরানের তফসির বর্ণনা করে আসছেন। তন্মধ্যে হজরত মাওলানা দীন মুহম্মদ সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। মসজিদের দক্ষিণ দিকে বুজর্গানেদীন সুফী হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের পুত্র মাওলানা হাফেজ আহমদ (রাঃ)-এর মাজার রয়েছে। বহু দূর-দূরান্তর থেকে ভক্তগণ এখানে এসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে থাকেন।

মাওলানা হাফেজ আহমদ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলে তাঁকে চিকিৎসার জন্যে ঢাকা আনার পথে তিনি বজরাতেই ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাকে গোসল করানো হয়। তাঁর এক বিশিষ্ট শিষ্য শেখ ফয়েজ বখশ কানপুরীর প্রস্তাবে চকবাজারে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর জানাজায় শহরের বহু লোক শরিক হয়েছিলেন। এমন কি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকরাও তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে শব-মিছিলে শরিক হয়েছিলেন। এতেই বোঝা যায় তিনি জীবিতকালে ধর্ম-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সবারই

প্রিয়পাত্র ছিলেন। চকবাজার মসজিদের সংশ্লিষ্ট জায়গায় তাঁকে দাফন করা হয়। দাফন শেষে শব-দেহের চাদরখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তাবিজ বানিয়ে বহু লোককে দেয়া হয়েছিলো। মৃত্যুর এক বছর পর তাঁর কবরটি পাকা করে দেয়া হয়।

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার তৎকালীন কালেক্টর মিঃ ওয়াল্টার সিপাহসালার ও সুবেদার মীর জুমলা কর্তৃক সোয়ারীঘাটে প্রতিষ্ঠিত বিরাট কামানটি যাহার ওজন ছিলো ৬৪৮১৪ পাউণ্ড তা উঠিয়ে চকবাজারের অসংখ্য দোকানের মাঝখানে স্থাপন করেন।



বৃটিশ যুগে চকবাজারের অসংখ্য কাঁচা দোকানের মাঝখানে স্থাপিত মীর জুমলার কামান

অবশ্যি ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা যাদুঘরের পরিচালক ডঃ ভট্টশালীর প্রচেষ্টায় এই কামানখানা চকবাজার থেকে সদরঘাটে স্থানান্তর করা হয়। এরপর ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে ডি. আই. টির চেয়ারম্যান জনাব জি, এ, মাদানী তৎকালীন পাকিস্তান মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ারদের সহযোগিতায় পুনরায় সদরঘাট থেকে বঙ্গবন্ধু এভেন্যুতে (জিন্নাহ এভেন্যু) কামানটি স্থাপন করেন। এই ঐতিহাসিক কামানটি বিবি মরিয়ম নামে পরিচিত। এটি সিপাহসালার মীর জুমলা আসাম অধিকারকালে ছোট-বড় বহু কামানের সঙ্গে মীর মর্তুজা খাঁ ওরফে মুজাহিদ খাঁর মাধ্যমে ঢাকায় পাঠিয়ে ছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা দিয়েছেন। মীর জুমলা প্রেরিত কালু জমজম নামে অপর একটি বৃহৎ কামান এখানে আনা হয়েছিলো। এই কামানটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, ইসলাম খাঁ রাজধানীর অন্বেষণে এখানে

আগমনকালে যে দুটি বৃহৎ কামান এনেছিলেন এটি তারই অন্যতম। তবে এই কামান দুটির প্রকৃত ইতিহাস আজও অজানা রয়েছে। জনশ্রুতি আছে, কিছুকাল পূর্বেও শহর থেকে দূরাগত গর্জনের যে শব্দ ভেসে আসতো তা নদীগর্ভস্থ কামান থেকেই আসতো বলে কুসংস্কারচ্ছন্ন লোকেরা মনে করতেন। তবে কামানের মত গুরুগম্ভীর ধ্বনি কোথা থেকে বা কেন আসতো আজও তার কোন হদিস মেলেনি। এই গুরুগম্ভীর ও চতুর্দিক প্রকম্পিত করা আওয়াজ মাত্র কয়েক যুগ পূর্বেও স্পষ্ট শোনা যেতো। এই শব্দের রহস্য অনুদঘাটিত থাকায় স্থানীয় লোকেরা নদীগর্ভস্থিত কামানটিই এই শব্দের উৎস বলে মনে করতো, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যা হোক, এসব কারণেই চকবাজার ও পরে সদরঘাটে অবস্থিত থাকাকালে কামানটি এখানকার লোকজনদের বিশেষ করে হিন্দু মহিলাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে পড়েছিলো। অনেকেই দোকান খোলার পূর্বে এই কামানকে প্রাণঢালা অর্ঘ্য প্রদান করতো। হিন্দু রমণীরা এটিকে শক্তির পরিচায়ক বলে দুধ, ফুল ও সিঁদুর প্রদান করে মনের কামনা ও বাসনার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্যে প্রার্থনা করতো। বর্তমানে ওসমানী উদ্যানে অবস্থিত কামানটিকে মাঝে মাঝে কোন কোন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। চকবাজারের মধ্যখানে একটা চত্বর ছিলো। সেখানে পূর্বকালে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিরশ্ছেদ করা হতো বা শূলে দেয়া হতো। বৃটিশ শাসনামলে সেখানে কাষ্ঠ নির্মিত ফাঁসি-কাষ্ঠ লাগানো হয়। বেশ কিছু কাল পর্যন্ত সেখানে অপরাধীদের ফাঁসি দেয়া হতো। অবশ্যি আজ থেকে বহু বৎসর পূর্বে এখান থেকে ফাঁসি-কাষ্ঠটি সরিয়ে নিয়ে জেলখানার অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয়।

চকবাজার মসজিদের সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গণে একটি বিরাট কূপ (ইদারা) ছিলো। কয়েক বছর আগে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্যে এটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এই প্রাঙ্গণে আজাদী পূর্বকালে ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহাম উপলক্ষে বিভিন্ন মহল্লা থেকে বহু লোক মওলুদ পড়ার জন্যে সমবেত হতেন। অপরাহ্নে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হতো। এই মওলুদ অনুষ্ঠানে প্রৌঢ় ও যুবকরা অংশ গ্রহণ করতেন এবং এদৃশ্য দেখার জন্যে বহুলোক রাস্তা ও মসজিদের বারান্দায় সমবেত হতো। তাছাড়া এখানকার পানও শরবত ছিলো অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ধরনের। এজন্যেও বহুদূর দূরান্তর থেকে লোক এখানে এসে পান-শরবত খেয়ে তৃপ্ত হতো। এককালে শহরের খোশবাশ বলে পরিচিত দানকারিগণ পান-শরবতের পশরা নিয়ে এখানে জলসার মত আড্ডা জমিয়ে রাখতো। তাছাড়া মসজিদের পূর্ব দিকের রাস্তায় বহুকাল থেকে পবিত্র রমজান মাসে ইফতারের একটি জমকালো বাজার বসে থাকে। এই

বাজারটি পূর্বকালের মতই তেমনি জমকালো ভাবে আজও পবিত্র রমজান মাসব্যাপী চলে। ইফতারের জন্যে এই বাজারে যেসব খাদ্য-সামগ্রী আমদানী হয়, সেগুলো বরাবরই খুব উৎকৃষ্ট মানের। রমজান মাসে এরূপ জমকালো বাজার ঢাকায় বা দেশের অন্য কোন স্থানে বসে বলে আমাদের জানা নেই। পৃথিবীর অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রেও এমন কোন ইফতারের বাজার জাঁকজমকের সাথে বসে বলে শোনা যায় না। বাজার বসে বলে রমজান মাসে এ রাস্তাটিতে যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ থাকে। রমজান মাসে গাড়ী ঘোড়া সবই অন্য রাস্তায় চলাচল করে। আবহমান কাল থেকে বিবাহের সময় নতুন বর চকবাজারের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করে তারপর বিবাহ মজলিশে ফিরে যেতো। কেহ এক চক্কর, কেহবা দু চক্কর, আবার অনেকে সাত চক্করও দিতো। এই চক্করকালে বরযাত্রীদের আনন্দ-উল্লাসে সমগ্র চকবাজার গমগম করে উঠতো। চকবাজারের চতুর্দিকে ঘুরে সালাম না জানালে যেন বিবাহের রীতি অসমাপ্ত থেকে যেতো। আজও ঢাকার পুরনো অধিবাসীদের অনেকেই বর নিয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে চক্কর দেয়। কালে হয়ত এ প্রথা বিলুপ্তির অতলে তলিয়ে যাবে। চকবাজারের চতুর্দিকস্থ রাস্তাটিকে চক সার্কুলার রোড বলা হয়। এ রোডের কোন থেকে পূর্বে মীরপুর সাভার অঞ্চলে বাস ও ট্রাক সার্ভিস ছিলো।

চকবাজারের সন্নিকটেই রয়েছে চুড়িহাট্টা। এক সময় এখানকার মুসলমানরা কাচেঁর চুড়ি নির্মাণ করতো। উপমহাদেশে ঢাকার চুড়ির বেশ খ্যাতিও ছিলো। চুড়ি হাট্টাতেই ঢাকার চুড়ির কারখানা অধিক ছিলো। পরবর্তীতে ফিরোজাবাদের চুড়ি অধিক সমাদর হওয়ায় ঢাকার চুড়ির বাজার মন্দিভূত হয়ে পরে। ফলে অনেক কারিগর ঢাকা থেকে মধ্য ভারতে চলে যায়। চুড়ি হাট্টা মহল্লায় চুড়ি প্রস্তুত হতো বলে এ এলাকাটি চুড়িহাট্টা বলে আজও পরিচিত। এই চুড়িহাট্টায় একটি ঐতিহাসিক মসজিদ আছে। এ মসজিদ সম্পর্কে একটি অদ্ভূত কাহিনীও বৃদ্ধদের মাঝে প্রচলিত আছে। শাহ সুজার আমলে মোঘল সরকারে জনৈক হিন্দু আমলাকে একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেয়া হয়। যে সময় অন্তবর্তীকালীন রাজধানী এখান থেকে স্থানান্তর করা হয়। এটি তখনকার ঘটনা। নওয়াব নাজিম ও উচ্চ পদস্থ মুসলমান আমলাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে উক্ত হিন্দু রাজ কর্মচারীটি মসজিদের পরিবর্তে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে প্রতিমা বিগ্রহ স্থাপন করে ফেলেন। ইতিমধ্যে ঘটনাটি সুবেদারের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি সেখান থেকে প্রতিমা বিগ্রহটি সরিয়ে ফেলে ইমারতকে প্যাকসাফ করে মসজিদে পরিণত করার হুকুম জারি করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও মসজিদটির চূড়া ও আকৃতি দেখলে মন্দিরের মতই মনে

হতো। একদা এই মসজিদ প্রাঙ্গনে খনন কার্য চালালে সেখানে বাসুদেবের একটা বিগ্রহ পাওয়া যায়, তা সংগ্রহ করে তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে, টি র‍্যাঙ্কিন কালেকটরীর সন্মুখে রেখে ছিলেন। সম্ভবতঃ সুলতান সুজার আদেশে যে সব মূর্তি অপসারণ করা হয়েছিলো এটি তাদেরই একটি। এই ঘটনাটি তখনকার দিনের স্বাভাবিক ঘটনার ব্যতিক্রম মাত্র। কেননা বাংলাদেশ জয় করার পর থেকে মুসলমান শাসকগণ কখনও হিন্দুদের পূজা পার্বন বা ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেননি। বরং বহু ক্ষেত্রে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার যথেষ্ঠ নজীর রয়েছে। মুসলিম আমলে মসজিদের পাশাপাশি হিন্দুদের মন্দির থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা হয়নি বা তাদের ধর্মানুষ্ঠানে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়নি। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলিম আমলে সবাই বেশ সুখে-শান্তিতে আপন আপন ধর্মাচার পালন করে পাশাপাশি বসবাস করতো।

চুড়িহাট্টার কিছু অংশের নাম অবশ্যি বহু আগেই বদলে গেছে। ঢাকা পৌর সভার প্রথম মুসলমান চেয়ারম্যান (১৮৯১-৯৪) খাজা মোহাম্মদ আজগরের নামানুসারে এক অংশের নাম খাজা মোহাম্মদ আজগর লেন রাখা হয়েছে। খাজা মোঃ আজগর ঢাকা পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান খাজা খয়ের উদ্দীনের দাদা। এর আর একটি অংশ জমিদার শেখ হায়দার বক্স এর নামানুসারে হায়দার বখশ লেন নামে পরিচিত। তার বাড়ী ছিলো বর্তমান উমেশ দত্ত রোডে।

ঢাকার পুরনো রাস্তাঘাটের ঐতিহ্য বজায় থাকলেও প্রভাবশালী পৌর কর্তারা বিভিন্ন সময়ে তাদের সুবিধেমত এগুলোর নাম পাল্টিয়ে নিজেদের বা নিজ আত্মীয় স্বজন বা অন্য কোন প্রভাবশালী লোকের নামানুসারে নুতন নামকরণ করেছেন। এইভাবে চুড়িহাট্টার নাম লোকের মুখে প্রচলিত থাকলেও প্রভাবশালী জমিদার অশ্বিনী কুমার দত্ত চুড়িহাট্টা ও কাঁসার হাট্টার কিছু অংশে বিজলী বাতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পৌর সভাকে মাত্র দু'হাজার টাকা দান করায় তৎকালীন ঢাকা পৌর কর্তারা এর নাম বদলিয়ে অশ্বিনী বাবুর পিতার নামানুসারে নন্দকুমার দত্ত রোড রেখেছেন। তবে চুড়িহাট্টা নামটি এত মশহুর যে নন্দকুমার দত্ত রোড বললে অনেকেরই চিনতে কষ্ট হবে, কিন্তু চুড়িহাট্টা বললে এক ডাকে সবাই চিনে ফেলবে।

চুড়িহাট্টা এলাকার উত্তরে উর্দূ রোড। এখানে মোগল সৈন্যদের ঘাঁটি ছিলো। তুর্কি ভাষায় ক্যাম্প বা ঘাঁটিকে উর্দূ বলে। উর্দূ রোডের আশ-পাশে উর্দূ ভাষাভাষী লোকজনের বসবাস ছিলো– তাই এ এলাকার নাম উর্দূ রোড রাখা হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। কিন্তু আসলে এখানে আর্মিদের ব্যারাক ছিলো বলেই এটি

প্রথমে উর্দূ বাজার পরে উর্দূ রোড নামে পরিচিত হয়। উর্দূ রোডে বিজলী বাতির খরচ বহন করার জন্যে চাঁদনী ঘাট জংশন থেকে লালবাগ চৌরাস্তা পর্যন্ত উর্দূ রোডের বিরাট অংশটির নাম ঢাকা পৌরসভা বিক্রমপুরের শ্রীনগর এলাকার জমিদার, বই প্রকাশক ও বিশিষ্ট সমাজপতি হরনাথ ঘোষের নামানুসারে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে হরনাথ ঘোষ রোড রাখেন। হরনাথ ঘোষ রোড হিন্দু সম্প্রদায়ের আখড়াটি রামানুক সম্প্রদায়ের ছিলো। এরা অনেক উঁচু জাত ছিলো। এ মন্দিরে যাত্রা, গান বাজনা এবং হিন্দুদের বিবাহ অনুষ্ঠান হতো। এবং মন্দিরটি রমনার কালি মন্দিরের আওতাধীন ছিলো। এ মহল্লায় মরহুম কমুরুদ্দিনের বাড়ীতে পূর্বে একটি পাঠশালা ছিলো। পরবর্তীতে স্কুলটি খাজে দেওয়ান ২য় লেনে স্থানান্তরিত হয়।

উর্দূ রোডে পিঠাওয়ালীর কবর নামে পরিচিত একটি কবর ছিলো। কবরটিকে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। সে সময়ে উর্দূ এলাকায় দোলাই খালের একটি শাখা ছিলো। জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্যে পিঠাওয়ালী নিজ খরচে এই খালের উপর একটি পুল নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। শীত মৌসুমে খালটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যেতো। একবার এই খাল সংস্কার করতে গিয়ে বিরাট একটা নৌকা পাওয়া যায়। নৌকার ভিতরে পাওয়া যায় বিরাট দুটো মটকা (বিরাট আকারের মাটির হাঁড়ি বিশেষ)। সে সময়ে চুড়িহাট্টা মসজিদে পানির হাউজ না থাকায় ওজুর পানি রাখার জন্যে মটকা স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়টি শাহজিয়াল মসজিদে স্থাপন করা হয়েছিলো।

উর্দূ রোডের আর একটি অংশ যেটি সেণ্ট্রাল জেলের পশ্চিম পাশ দিয়ে চলে গেছে তারই কিছু অংশ গিরদে উর্দূ বলে পরিচিত ছিলো। অবশ্যি বর্তমানে এটি কমলদহ রোড নাম পরিচিত। জেলখানার অভ্যন্তরে ছিলো কমলদহ নামে একটি পুষ্করিনী। পরবর্তীকালে সেই পুষ্করিনীর নামানুসারে ঐ এলাকার নাম হয়ে যায় কমলদহ রোড। উর্দূ বা আর্মি ব্যারাকের আশ পাশের মহল্লাগুলোকে গিরদে উর্দূ বলা হতো। অবশ্যি এগুলোর কিছু অংশ আজও গিরদে উর্দূ বলে পরিচিত।

আর পুরনো কেল্লার পূর্বদিকের মহল্লা পুরাব দরওয়জা নামে পরিচিত ছিলো, তার একটি অংশে নওয়াব নসরত জঙ্গ এর আমলে (১৭৯৬-১৮২৩) একজন মাস্তান মাযযুব বাস করতেন। তিনি শাহতুজা বা শাহ মরতুজা নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। তার নামের স্মৃতি বহন করেই ঐ স্থানটির নাম সাতরওজা হয়েছে। সেখানে সদর রাস্তার ধারেই তার মাজার রয়েছে আজও লোকজন শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি প্রদান করে।

সাতরওজার একটি গলি পথের স্থানীয় নাম সাকরু মিয়ার গলি। সাকরু মিয়া খাজা পরিবারের লোক। তার বাসভবন সেখানে ছিলো বিধায় তার ডাকনাম অনুসারে ঐ পথটিকে আজো ঢাকাবাসী অনেকে সাকরু মিয়ার গলি বলেই পরিচয় দিয়ে থাকে। এখানে "প্যারাডাইস সিনেমা" নামে ঢাকার সবচেয়ে ছোট্ট সিনেমা হল ছিলো। হল ঘড়টি একটি গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আজ আর তার চিহ্ন নেই বল্লেই চলে।

ঢাকা পৌরসভার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি যে কজন জাঁদরেল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ভাইস চেয়ারম্যান পদ বরণ করেছেন তন্মধ্যে খান সাহেব আবুল হাসনাত অন্যতম। খান সাহেব উপাধি ঢাকা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালেই বৃটিশ সরকার তাঁকে প্রদান করেছিলেন। তিনি দু'দফা ভাইস চেয়ারম্যান ও কয়েকবারই পৌর কমিশনার পদে নির্বাচিত হন। তিনি পৌর সভায় ক্ষমতাসীন থাকাকালেই ঢাকার পুরনো কেল্লার (পরবর্তীতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার) পূর্ব দিগস্থ মহল্লা পুরাব দরওয়াজা যা বৃটিশ যুগে সাতরওজা নামকরণ হয়, সেখান হতে মাহুতটুলির উত্তর কোন পর্যন্ত সড়কটি ১৯৩০ সালে ঢাকা পৌরসভা আবুল হাসনাত রোর্ড নামকরণ করেন। তাঁর পিতা আবুল খয়রাত ও দাদা নূর বক্স এর নামেও সড়ক ও গলির নামকরণ করা হয় যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৯২৯ সালে।

আবুল হাসনাতের দাদা মুন্সী নূর বক্স নোয়াখালী হতে ঢাকায় আগমন করেন। তাদের পূর্ব পুরুষেরা নাকি সুদুর আরব দেশ থেকে বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। পরবর্তীতে ধন সম্পদের মালিক হয়ে আবুল হাসনাত এর পিতা আবুল খায়রাত সোনারগাঁও এলাকায় জমিদার হয়েছিলেন এবং বর্তমান নূর বক্স লেন যাহা পূর্বে ঢোলকওয়ালা গলি নামে পরিচিত ছিলো, সেখানে বিরাট ফটকসহ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। আজ আর সে সৌন্দর্য্য নেই। প্রাসাদটির অনেক কিছুই পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। বাইরে থেকে দেখতে জীর্ণ-শীর্ণ মনে হয়। তবে হাসনাত সাহেবের পুত্র-কন্যা ও ভাইপোগণ নতুন আঙ্গিকে কিছু বাড়িঘর নির্মাণ করেছেন। এই অগোছালো নির্মাণের ফলে এবং অনেক ভাড়াটিয়া বসানোর কারণে প্রাসাদটির গৌরব বিলীন হয়ে গেছে। তবুও ঢাকাবাসী ভবনটির পাশ দিয়ে যাবার সময় জমিদার আবুল খায়রাতের প্রভাব প্রতিপত্তি ও খান সাহেব আবুল হাসনাতের দাপটের কথা স্মরণ করে। স্মরণ করে আল্লাহর চিরন্তন বাণী আল-কোরআনের কথাঃ ধন-দৌলত, মান-মর্যাদা, শান-শওকত প্রভাব প্রতিপত্তি সবই আল্লাহ্র হাতে। তিনি যাকে যখন ইচ্ছে তা দান করেন, আবার যখন ইচ্ছে ফিরিয়ে নেন।

জনাব আবুল হাসনাত দেশের অন্যান্য জমিদারদের ন্যায় উদ্ধত স্বভাবের ছিলেন।

ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীতে মহল্লাবাসীদের কাঁধে হাত রেখে কথা বলতে বলতে বাড়িতে যেতেন। তবুও মহল্লাবাসীরা তাকে সমীহ করে চলতেন। তিনি নিজ এলাকাসহ অন্যান্য এল্যাকায় অনেক ভাল কাজ করে গেছেন। তজ্জন্য ঢাকাবাসী এখনও তাকে স্মরণ করে থাকে। পিতার অমতে বিবাহ করায় জমিদার পিতা আবুল খায়রাতের সঙ্গে তার ভীষণ বিবাদ বাধে। ফলে, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ বাহাদুর তাদের মধ্যে মিলমিশ করিয়ে দেন। নবাব সলিমুল্লাহ্‌র চেষ্টায় কিছুদিন তিনি সাব-রেজিষ্ট্রার পদে চাকুরীও করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত পিতার চাপে পড়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হন। অতঃপর এক খান্দানী পরিবারে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিছুকাল পর দ্বিতীয় স্ত্রী রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার মেয়ে খুরশিদা বিবির বিয়ে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের আত্মীয়ের সঙ্গে হওয়ায় ফজলুল হক সাহেবও এ বাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন।

আবুল হাসনাত রোডে সাত রওজা মাজার শরীফ থেকে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলে যে মসজিদটি দেখা যায় তা খাজে নেহাল তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়। তজ্জন্য এলাকাবাসী মসজিদটিকে খাজে নেহালের মসজিদ নাম আজো অভিহিত করে। মসজিদের উত্তর পাশে রয়েছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফজলুল করিমের বাসভবন। বৃটিশ সরকার হতে তিনি ডেপুটি উপাধিও পেয়েছিলেন। তার শিকার করার খুব শখ ছিলো। জীবনে তিনি অনেক বাঘ, হরিণ ও অন্যান্য জীব-জন্তু শিকার করেছেন। তার আরেকটি শখ ছিলো জীবজন্তু-পশুপাখী প্রতিপালন করার। তাই তিনি বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটি চিড়িয়াখানার মতো তৈরি করেছিলেন। তাতে বাঘসহ নানারকম জীবজন্তু ও পশুপাখী ছিলো। ঢাকা ও অন্যান্য এলাকা হতে লোকজন সেসব দেখতে আসতেন। তৎপুত্র ডেপুটি ফজলুল করিমের বাসায় পেশোয়ারের এক খ্যাতনামা পীর সাহেব আসতেন। তিনি এবং তৎপুত্র ঢাকার খ্যাতনামা আইনজীবি রেজায় করিম পীর সাহেবের মুরিদ হয়েছিলেন। ঢাকায় আরো কিছু লোক অবশ্য সেই পীর সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জনাব রেজায় করিম যেমন তুখোর আইনজীবি ছিলেন তেমনি ছিলেন একজন ঝানু রাজনীতিবিদ। পিতার মৃত্যুর পর এ বাড়িতে রেজায় করিম সাহেবের বিশেষ আগ্রহে জিকির আজকার খুব বেশী হতো, ঢাকার অনেক লোক এতে অংশ নিতেন। বর্তমানে এ বাড়িতে সেই চিড়িয়াখানা আর নেই। তাঁর বংশধরদের অনেকেই নামকরা শিকারী এবং শুটিং ক্রীড়ার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ডেপুটি ফজলুল করিম কর্তৃক বাড়িটি

পুনঃ নির্মিত হওয়ার অনেক পূর্বে এখানে গোলাম পীরের লঙ্গরখানা ছিলো। ঢাকার সাধারণ লোক একে মির্জা সাহেবের লঙ্গরখানা বলতো। অসংখ্য গরীব মিসকিন ভূখা ব্যক্তি ঐ লঙ্গরখানা থেকে বিনামূল্যে আহার্য্য পেতো। এ ধরনের লঙ্গরখানা তৎকালে ঢাকায় আরো ছিলো।

আবুল হাসনাত রোড তথা জেলখানার পূর্ব দিকের বাড়িটিতে শহর কোতয়াল বসবাস করতেন। তজ্জন্য ঢাকাবাসী সে বাড়িটিকে কোতয়াল সাহেবের বাড়ি বলে আখ্যায়িত করতো। পাক আমলে গণতন্ত্রের প্রহরী পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ও পরবর্তীতে স্পীকার মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান ঢাকায় অবস্থানকালে এ বাড়ীতে থাকতেন। এ মহল্লার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজনৈতিক কর্মী ডাক্তার নূরুর রহমান ঢাকা সেণ্ট্রাল ক্লাব কমিটির একজন কর্মকর্তা ছিলেন। বৃটিশ যুগের শেষ সময়ে ঢাকার মুসলমানদের ক্লাব ও সমিতিগুলোকে নিয়ে একটি সেণ্ট্রাল ক্লাব কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। এ রোডে সৈয়দ জান মিয়া নামেও এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তার বাড়িতে ইমামবাড়া ছিলো। বর্তমানেও উক্ত বাড়িতে তার নিদর্শন রয়েছে।

এ রোডের নিকটেই রয়েছে জেলরোড। এ রোডটির নামকরণ হয়েছে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলের নামানুসারে। সড়কটির উত্তর-পশ্চিম জুড়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় কারাগার, পূর্ব পাশে রয়েছে জেলখানার অফিসার্স কোয়ার্টার এবং জেল পুলিশের ফাঁড়ি। রোডের উত্তর মাথায় জেলখানার প্রধান ফটক আর পশ্চিমে রয়েছে ঢাকার বাইশ পঞ্চায়েতের বিশিষ্ট সদস্য, নামকরা ব্যবসায়ী মহল্লা সরদার মরহুম আহসান মুহাম্মদ নবীর বাড়ি।

আহসান মোহাম্মদ নবী ঢাকাবাসীর গুরুত্বপূর্ণ বিচার অনুষ্ঠানসমূহে অংশ নিতেন। তিনি তৎকালীন ৫ নং ওয়ার্ড থেকে পৌর কমিশনারও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঢাকার রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতাদের তার বাড়িতে নিয়মিত আগমণ ছিলো। তার ডাক নাম ছিলো জুম্মন বেপারী। এ নামেই ঢাকাবাসী তাকে চিনতো তিনি তুর্কি টুপি পরিধান করে চলতেন বিধায় তাকে চিনতে ভুল হতো না। দেখতে বেটে পাতলা গড়ন চেহারা তেমন উজ্জ্বল না থাকলেও দাপট ছিলো তার প্রচুর। তাঁর এবং মমিন মোটর কোম্পানীর মালিক দানবীর আবদুল আজিজ এর উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় ঢাকায় তৎকালে ঈদের পরদিবস এক বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন হতো। ঐ মিছিলে বৃটিশ আমলের শেষ অধ্যায় থেকে চালু ছিলো। প্রথমে সাদাসিদা কাসীদা পার্টীর দলসমূহ আর মমিন মটর কোম্পানীর মটরযানগুলোকে জাহাজ, প্লেন, ময়ুর এবং নৌকার মত সাজিয়ে মিছিলে

বের করা হতো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে ঐ মিছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পড়ে। তবে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে ফুটিয়ে তোলাই ছিলো ঐ মিছিলের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দিনের গতিধারায় ঐ মিছিল ব্যক্তি সমালোচনাকর বিষয়ে পরিণত হয়। তাছাড়া মিছিলে দলাদলি মারামারি দেখা দেওয়ায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ ঐ মিছিল বন্ধ করে দেন।

ঐ মিছিল যাঁরা উপভোগ করেছেন তাঁদের স্মৃতিপটে আজও সব কিছু জ্বলজ্বল করছে। মিছিলে হাস্য-কৌতুক আমোদ-প্রমোদের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকতো। ঈদ উৎসব পালনের পর গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোকসমাগম হতো ঢাকা শহরে। আজাদ মুসলিম ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরাও মুসলিম গোত্রের বিভিন্ন সমস্যার চিত্র তুলে ধরে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরে ঐ মিছিলে অংশগ্রহণ করতাম। আমাদের ঐ মিছিলে যেরূপ জৌলুসের ব্যবস্থা থাকতো, তেমনি থাকতো অর্থবহ দিকের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। মিছিলটি জুম্মন বেপারীর বাড়ির নিকট হতে আরম্ভ হয়ে চক-মোগলটুলি, ইসলামপুর সদরঘাট হয়ে কাচারী, নবাবপুর বংশাল হয়ে পুনঃ চক বাজরে এসে শেষ হতো। ভারত বিভাগের পূর্বে পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখনকার একটি ঈদের মিছিল যখন নবাবপুর রোডের ভিতর প্রবেশ করে তখন নবাবপুরের রাস্তায় দু'দিকের হিন্দু ভবনগুলো থেকে ইস্টক বৃষ্টি, পাটা-পুতা, চৌকি, বাড়ির ভারী আসবাবপত্র মিছিলে অংশ গ্রহণকারীদের উপর বর্ষিত হওয়ার ফলে বহু মুসলমান যুব বৃদ্ধা আহত হয়েছিলো। সে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো। নবাবপুরে তখন প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের একক বাসস্থান ছিলো। এ ঘটনার পরও অনেক বছর ঈদের মিছিল বের হয়েছিলো।

আবুল খায়রাত রোড। পুরাতন ঢাকার মধ্যস্থলে অবস্থিত। জমিদার আবুল খায়রাত ঢাকা পৌরসভার এককালের জাঁদরেল ভাইস-চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের পিতা। প্রথমদিকে আবুল খায়রাত সাহেবের দাপটে স্থানীয় মহল্লাবাসীরা তাদের কাছে নিম্ন শ্রেণীর মতো গণ্য হতো। অবশ্য পরবর্তীতে মহল্লাবাসীদের সঙ্গে সদ্ভাব ও সৎ প্রতিবেশী হিসেবে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের বাড়িটি মুন্সী নূর বক্স লেনে অবস্থিত। যাহা খান সাহেব আবুল হাসনাতের বাড়ি বলে ঢাকাবাসীর নিকট পরিচিত। মুন্সী নূর বক্স জমিদার আবুল খায়রাতের পিতা ছিলেন। আবুল হাসনাত ঢাকা পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান থাকাকালে তাদের বাসভবন সংলগ্ন রাস্তাটি স্বীয় দাদার নামানুসারে নূর বক্স লেন এবং সে রাস্তার শেষ

দক্ষিণের রাস্তাটির নামকরণ করেন তার পিতার নামানুসারে আবুল খায়রাত রোড। ইতিপূর্বে এ রোডটির কিছু কিছু অংশ বেচারাম দেউরী, মাহুতটুলী ও মহল্লা আলে আবু সাঈদের অংশ ছিলো।

এ রাস্তায় একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে– ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ। যা পূর্বে মীর্জা সাহেবের মসজিদ নামে পরিচিত ছিলো। তৎকালে মীর্জা গোলাম পীর নামে এক ধণাঢ্য ব্যক্তির বাসভবন ছিলো এখানে। তিনি বহু দান-খয়রাত করে গেছেন। এবং ঢাকার বহু মসজিদ মাদ্রাসা লঙ্গরখানার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ঢাকার প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি পীর ও আল্লাহ্‌র ওলীদের খুব ভক্ত ছিলেন। বহু ঘটনাবলীতে তার নাম ঢাকার ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়। তারা মসজিদটি অন্যান্য মসজিদের মতই সাদাসিধে ভাবে নির্মাণ করেছিলেন মীর্জা গোলাম পীর। তজ্জন্য এটি মীর্জা সাহেবের মসজিদ নামে পরিচিত হয়। কিন্তু এর সত্যতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান। তাদের মতে আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে এ এলাকায় মীর আবু সাঈদ নামে এক বিশিষ্ট দানশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি সুদুর তুরস্ক থেকে শূণ্য হাতে ঢাকায় এসে নিজ যোগ্যতা বলে নিমতলীর ঢাকার সবচেয়ে ধনী ও বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক মীর আশ্রাফ সাহেবের জামাতা হয়েছিলেন। এবং তৎকালীন ঢাকার একজন বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। পুরো আরমানিটোলা অঞ্চলটি সে সময় মহল্লা আলে আবু সাঈদ নামে নামকরণ হয়েছিলো। এই মীর আবু সাঈদ সাহেবেই এই মসজিদটির গোড়াপত্তন করেছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসও অমূলক নয়। হয়তো পরবর্তীতে মীর্জা গোলাম পীর মসজিদটির সম্প্রসারণ বা পূনঃনির্মাণ করেছিলেন। যেমন মহল্লা আলে আবু সাঈদ নামটি ঢাকার মহল্লার নামগুলো থেকে মুছে গেছে, তেমনি মসজিদটির নামও বদল হতে পারে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

যা হোক, এ মসজিদটি মাহুতটুলির বিশিষ্ট তামাক ও সাবান ব্যবসায়ী আলীজান বেপারী ১৯২৫-২৬ সালের দিকে সৌন্দর্য্যায়নের কাজে হাত দেন। কাজটিতে হাত দিয়ে তিনি প্রথমে সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। পরিবাগের শাহ সাহেব আলীজান বেপারীর মনের দোদুল্যমান অবস্থার কথা শুনতে পেয়ে তাকে ডেকে অভয় দিয়ে বললেন– তুমি আল্লাহ্‌র ঘরের কাজ করে যাও সমাপ্তির ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ পাকই করবেন। তারপর তিনি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন মসজিদটির সৌন্দর্যায়নের কাজ। আজ এ মসজিদটি দেশের একটি অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক নিদর্শন

হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এর প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন কাগজী নোটে। পর্যটন করপোরেশনের তালিকাভূক্ত হওয়ায় এ মসজিদটি পরিদর্শনে দেশী-বিদেশী বহু ব্যক্তির সমাগম ঘটে থাকে এখানে।

আলীজান বেপারী মসজিদটিকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করতে গিয়ে জাপান, বিলেত ও অন্যান্য দেশ হতে নকশা করা চীনে মাটির সবুজ ও ক্রীমকালারের টালী আনিয়ে মসজিদটির অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত মনোরম সাজে সুসজ্জিত করেন। মসজিদটির বাহির গাত্রে চীনে মাটির বাসন কোসন ভাঙ্গা অত্যন্ত সুক্ষভাবে লাগিয়ে এর সারা গায়ে রাশি রাশি তারায় ভরে দেওয়া হয়। যে জন্য এটি প্রথমে সিতারা মসজিদ নামেই পরিচিত ছিলো। মুসলমানরা তৎকালে তারাকে সিতারা বলতো। পরবর্তীকালে নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে শুধু তারা মসজিদ নামেই খ্যাতি লাভ করে। আলীজান বেপারী মসজিদটিকে অলংকৃত করতে গিয়ে এমনই চমৎকারভাবে তা সম্পন্ন করলেন যা, সারা বাংলাদেশে এমনটি আর কোথাও নেই। অনেকে নিয়মিত নামাজ না পড়লেও মসজিদটির অন্যান্য শোভা অবলোকনের জন্যই নামাজ পড়তে গিয়ে বিমুগ্ধ নয়নে এর সৌন্দর্য উপভোগ করেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। মসজিদটির সম্মুখস্থ চত্বরে একটি সুন্দর হাউজ ছিলো। বর্তমানে সেটি অবলুপ্ত। এ হাউজে ছাড়া হয়েছিলো সুন্দর সুন্দর নানা ধরনের বিদেশী রঙ্গীন মাছ। তৎকালে খুব কম সমজিদ ও লোকের বাড়িতেই রঙ্গীন মাছ পোষা হতো। আলীজান বেপারীর মনোবাসনা ও মেহনত বিফলে যায়নি। মসজিদটি আজ এক অনন্য সাধারণ অলংকরণকৃত ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে ঢাকাবাসী তথা দেশবাসীর কাছে পরিচিত।

১৯৮৪-৮৬ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ বেশ কয়েকবার এ মসজিদে আগমন করেন। মসজিদটির সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য্যায়নের জন্যে তিনি আশি লক্ষাধিক টাকাও বরাদ্দ করেন। সে মতেই এর সম্প্রসারণের কাজ হয়েছে। মসজিদটির ইতিহাস জানতে গিয়ে এটাই জানা যায় যে, এর প্রথম মোতাওয়াল্লী ছিলেন মীর আবু সাঈদ। পরবর্তীকালে ১৮৭০ সালের দিকে মীর্জা গোলাম পীর এর মোতাওয়াল্লী হন। কয়েকযুগ পর তারই উত্তরাধীকারী হন আহমদ মীর্জা। এই মসজিদটির মোতওয়াল্লী স্বত্ব এর নতুন রূপদানকারী আলীজান বেপারীর হস্তে ন্যস্ত হয়। তৎপুত্র হাজী আলী আকবরও কিছুদিন এ দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ঢাকার মুসলিম সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইসলামিয়া লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী আলহাজ্ব এ, এম, শারফুদ্দিন আহমদ এর উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়।

জনাব শারফুদ্দিন সাহেব ঢাকার প্রকাশনা মহলে এক বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। তার সহযোগিতায় মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসাটিও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেছে। সাবেক রাষ্ট্রপতির অনুদানের অর্থে মাদ্রাসাটি মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে সুন্দর ছয়তলা ভবনে রূপান্তরিত হয়েছে।

জনাব শারফুদ্দিন সাহেবের পিতা মাওলানা আবদুস সোবহান ১৮৯৮ সালে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় আগমন করে আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। মাওলানা আবদুস সোবহান আবুল খায়রাত রোডের বর্তমান বাড়িটি জমিদার আবুল খায়রাত হতে ক্রয় করে এ বাড়িতে চলে আসেন। পরবর্তীতে বাড়িটির নাম পুত্রের নামানুসারে শারফুদ্দিন হাউস নামকরণ করেন। এবং ঢাকার একটি বিশিষ্ট পরিবারে পরিগণিত হন।

এ মহল্লায় আরেকটি বুনিয়াদি পরিবার বসবাস করতেন। সে বাড়িটি সোবহান মঞ্জিল নামে পরিচিত। হয়তো এ কারণেই পুস্তক রচয়িতা ও প্রকাশনা সোবহান সাহেব তাদের বাড়িটি সোবহান মঞ্জিল নামকরণ না করে শারফুদ্দিন হাউস রাখেন।

বিখ্যাত তারা মসজিদের সংস্কারক ও নব রূপদানকারী আলীজান বেপারীর আরো কিছু পরিচয় এখানে উল্লেখের প্রয়োজন বলে মনে করি। আলীজান ছিলেন মাহুতটুলির এক দরিদ্র ঘরের সন্তান। দারিদ্রের কারণে শৈশবে তাকে এক আত্মীয়ের দর্জি দোকানে চাকুরীতে নিয়োজিত হতে হয়। এক ব্যক্তির পরামর্শে তিনি প্রথমে খাম্বিরা অর্থাৎ সুগন্ধি তামাকের ব্যবসা আরম্ভ করেন। সামান্য ক'টাকা পুঁজি নিয়ে বাবুবাজার পুলের কাছে তিনি এ ব্যবসার সূচনা করেন। পরবর্তীতে তার তামাক ক্রেতাদেরকে লাইন ধরে নিতে হতো। এমনকি ঢাকার বাইরে থেকে এসেও পাইকাররা তার তামাক নিতো। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে করেন তাকে এভাবেই সফলতা দান করেন। পরবর্তীতে তার সাবান ব্যবসাও বেশ জমজমাট হয়। তৎকালে ঢাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনিও একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন– লেখাপড়া না জেনেও অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের বদৌলতে। তিনি মহল্লার সরদারও হয়েছিলেন। তার দাপটে মাহুতটুলি এলাকা এক সময় কাঁপতো। তিনি যখন পাম্পসু জুতা পরে রাত্রি বেলা মচ মচ শব্দ করে বাসায় ফিরতেন মহল্লাবাসী সে আওয়াজ সহজেই চিনতে পারতো এই সেই আলীজান বেপারী ঘরে ফিরছেন। তারা মসজিদের পশ্চিমে রয়েছে মাহুতটুলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় গৃহটিতে প্রথমে মীর্জা গোলাম পীরের লঙ্গরখানা ছিলো। স্যার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম এতিখানা এখানেই নাকি এক সময়

ছিলো। এতিমখানার এ বাড়িটিতে একদা মহত্মা গান্ধী পদার্পন করেছিলেন।

এর দক্ষিণে রয়েছে আগা নওয়াব দেউরী। মুসলিম শাসনামলে এই আগা নওয়াব দেউরী, আলী নকী দেউরী ও আগা সাদেক রোড অঞ্চলটি ছিলো শিয়া প্রধান। তৎকালে ঢাকার রাজনৈতিক মঞ্চে প্রথম কাতারের নায়ক ছিলেন জনাব আগা সাদেক, মীর্জা আলী নকী ও আগা নওয়াব। তাঁদের বাসস্থান ঐ সব এলাকায় ছিলো বলে তাদের নামানুসারেই ঐ এলাকার নামকরণ করা হয়েছে। কারণ তাঁরা ঐ এলাকায় বিশেষত ঢাকা শহরে খুব মশহুর ব্যক্তি ছিলেন। তন্মধ্যে আলী নকী নওয়াব হোসেন উদ্দিন খাঁর আত্মীয় ছিলেন।

ঢাকার বিখ্যাত মন্দির ঢাকেশ্বরীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে খাজে দেওয়ান মহল্লা। মহল্লাটি ১ম ও ২য় লেন দু'ভাগে বিভক্ত। মহল্লায় দু'টি পঞ্চায়েত ঘর রয়েছে। ২য় লেনস্থিত পঞ্চায়েত ঘরে একটি নৈশ বিদ্যালয় এবং "যুব ক্রীড়া ও সমাজ কল্যাণ সমিতি" নামে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে। ২য় লেনের পঞ্চায়েত ঘরটি শতবর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। প্রথমে ঘরটি মাটির ছিলো। মহল্লাবাসীর চাঁদায় প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে এ ঘরটিকে পাকা দালানে পরিণত করা হয়। পঞ্চায়েত ঘর হওয়ার পর মহল্লাবাসীগণ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে খাজে দেওয়ান স্কুল নামে। এই পঞ্চায়েত ঘরে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে মহল্লার ক্রীড়া মোদীরা কামাল স্পোর্টিং ক্লাব নামে একটি ফুটবল টীম পরিচালনা করেছিলো অনেক দিন যাবত।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সিরকো সোপ এণ্ড ক্যামিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা পরবর্তীতে মধুমিতা সিনেমা হলের মালিক মোঃ সিরাজ উদ্দিন তৎকালিন ৬নং ওয়ার্ড হতে পৌর কমিশনার নির্বাচিত হন। ঢাকা পৌরসভায় তার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো। তিনি ঢাকা পৌর সভার চেয়ারম্যান পদে বরিত না হলেও কমিশনারদের আন অফিসিয়াল পার্টি লীডার ছিলেন। তার বদান্যতা ও ব্যবহারে সবাই সন্তুষ্ট ছিলো। তারই প্রচেষ্টায় এখানে সিরাজ উদ্দিন গালর্স স্কুল নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

খাজে দেওয়ান মহল্লায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বসবাস করে গেছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত ফুটবল ক্রীড়াবিদ বজলুর রহমান, ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আব্দুল জলিল, বিশিষ্ট মহিলা রাজনীতিবিদ মিসেস আনোয়ারা খাতুন, জমিদার গওহর উল্লাহ্ কুদরত উল্লাহ (এ মহল্লায় তাদের অনেক ভূসম্পত্তি ছিলো) বিশিষ্ট বন্দুক ব্যবসায়ী মুহিউদ্দিন খাঁন। তিনি হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

তার এক ভাই বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, সে শেষ পর্যন্ত নিজ ধর্মে অটল ছিলেন। আজকের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার খাঁন আতাউর রহমান, জনাব এহতেশাম, তৎভ্রাতা মুস্তাফিজ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া শাহাবুদ্দিনের নাম বলা যেতে পারে। শাহাবুদ্দিন প্রথম জীবনে চৌর্যবৃত্তি করতো যার ফলে তার উপর পুলিশপেয়ার হয়। অর্থাৎ প্রতি গভীর রাতে পুলিশ একবার তার বাড়িতে এসে দেখে যেতো ঘরে আছে কিনা। এক দিন সে মুসলিম হলের নিকটে ঘোড়া গাড়ী থেকে দু'জন নাম করা ডাকাতকে ডাকাতির মালামালসহ পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়, পুরস্কার স্বরূপ পুলিশ তার উপর থেকে পুলিশপেয়ার উঠিয়ে নেয়। বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ার ইউনিভার্সিটির কলোনীতে এলাকার অবস্থানকারী অফিসার ও বাসিন্দাদের সহযোগিতায় যে মসজিদটি সম্প্রসারণ হচ্ছে এবং সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করা হচ্ছে এখানে মসজিদ স্থাপিত হওয়ার পূর্বে গাজা খোরদের আড্ডা ছিলো। তখন জনবসতি এরূপ ছিলো না। আল্লাহর মহিমায় এই শাহাবুদ্দিনই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন।

খাজে দেওয়ান মহল্লার সর্ব উত্তরে শিক্ষা বোর্ড অফিসের নিকটে একটি ছোট্ট মসজিদ রয়েছে। সেটাই এ মহল্লার প্রথম মসজিদ। সেটা পরবর্তীতে টুটা মসজিদ নামে পরিচিত হয়। মসজিদটি ভগ্নাবস্থায় থাকার জন্যই এ নাম হয়। এ মসজিদ ও আশে পাশের জমি জমা গওহর উল্লা ও কুদরত উল্লাহ্‌দের ছিলো। এদের এবং এদের বংশধরদের কবর মসজিদ সংলগ্ন রয়েছে। এখানে একটি উঁচু কবর রয়েছে। এ কবরটি লুৎফুল্লাহর কবর বলে পরিচিত। তিনি শাহ্ আলমগীরের কোন এক মুনসেফদার ছিলেন। মনে করা হয় মুনসেফদার লুৎফুল্লাহ-গওহর উল্লা, কুদরত উল্লাদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন। জানা যায় এরা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলো। এ মসজিদের একটি বড় ইদারা ছিলো ইদারা হতে পানি উঠানোর জন্য লোহার মোটা জিঞ্জির ছিলো।

খাজে দেওয়ান মহল্লার একটি অংশের লোক কাগজ ও পুরাণ কাপড় দিয়ে টুপি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। তজ্জন্য সে অংশটিকে স্থানীয়ভাবে টুপি পট্টি বলে অভিহিত হতো। তাছাড়া খাজে দেওয়ান ১ম লেন এর মসজিদ ও টুটা মসজিদের মধ্যবর্তী অংশের লোকেরা হুক্কার নৈচা তৈরি করতো বলে সে অংশটিকে নৈচাবন্দ পট্টি বলা হতো। আজ এ সব পেশাজীবিও নেই আর সে নামের পরিচিতিও নেই।

এ মহল্লায় হাবিব বোডিং নামে একটি বোডিং ছিলো তাতে সাধারণতঃ ছাত্রগণই খাওয়া দাওয়া করতো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছাত্র অবস্থায় এ বোডিং এ

অনেক সময় খাওয়া-দাওয়া করতেন। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা লাভের পর বোর্ডিং-এর মালিক হাবিব কে ডেকে তার কোন আব্দার আছে কিনা ? জিজ্ঞাসা করে ছিলেন। প্রত্যুত্তরে সে কোন রূপ সুযোগ সুবিধে চায়নি। কিছু দিন পরই তিনি মারা যান। এ ধরনের নিঃস্বার্থ ব্যক্তি দেশে খুব কম।

খাজে দেওয়ান মহল্লাটি অনেক পুরনো এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত। মুঘল আমলে এ নাম হয়। এর পূর্বে এ এলাকাটি ভাট্টিখানা নামে পরিচিত ছিলো। এ নামটি শুনে মনে হয় যেহেতু মুঘল আমলে এ নাম হয়েছে সেহেতু এটা কোন মুসলমান খাজা সাহেবের নামে হয়েছে কিন্তু আসলে তা নয়। তিনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন এবং নওয়াব শায়েস্তা খাঁর আমলে দেওয়ান-ই-বুউতাত (অর্থাৎ মিনিষ্টার অফ ইনটেরিওর) ছিলেন মুরালীধর বাহাদুর। তিনি খুব দক্ষ রাজ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর কর্ম-কুশলতার গুণে মোঘল সম্রাট তাঁকে খাজা উপাধি প্রদান করেন। তৎকালে রাজ কর্ম্যে পারদর্শী, জ্ঞানী-গুণী ও বিশিষ্ট পরিবারবর্গের ব্যক্তিগণকে খাজা উপাধি প্রদান করা হতো। এ ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম বা গোত্র বিচার ছিলোনা। দেওয়ান-ই-বুউতাত খাজা মুরালী ধর বাহাদুর তৎকালে এ এলাকায় বসবাস করতেন। তজ্জন্য তারই নামানুসারেই খাজে দেওয়ান মহল্লার নামকরণ হয়েছে।

এ মহল্লার পূর্ব দিকে খাজে দল সিং নামেও একটি লেন রয়েছে। নামটি হয়েছে খাজে দয়াল সিং-এর নামানুসারে। তিনি বাকরগঞ্জের একজন বিশিষ্ট হিন্দু জমিদার ছিলেন। এছাড়া খাজা বাগডাসা নামেও ঢাকায় একটি বস্তি রয়েছে। খাজা বাগডাসা ছিলেন একজন গ্রীক ব্যবসায়ী। এই সব খাজা নাম ধারী ব্যক্তিদের নামানুসারেই এই সব এলাকার ঐ রূপ নামকরণ করা হয়। এবং ও গুলো এই সব নামে সবার কাছে পরিচিত হয়ে আসছে। এর নিকটেই রয়েছে জয়চাঁদ নাগ রোড। জয়চাঁদ নাগ একজন জমিদার শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি একটি পুকুর খনন করে ছিলেন, পুকুর পাড়ে গরীব হিন্দুগণ ছনের ঘড় বানিয়ে বাস করতো। জয় চাঁদের বাড়ীটি নাগ বাড়ী নামে ঢাকায় খ্যাতি ছিলো।

খাজা মোহাম্মদ আজম রোড তথা কে, এম, আজম লেন। ১৯০৭ সালে খাজা মোহাম্মদ আজম ঢাকা বাইশ পঞ্চায়েতের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি ঢাকা পঞ্চায়েত সম্পর্কে পঞ্চায়েত-এ-ইসলাম নামে পুস্তক রচনা করে গেছেন। তাঁরই নামানুসারে উক্ত রাস্তার নাম খাজা মোহাম্মদ আজম রোড রাখা হয়েছে। এখানে ঢাকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

মোঘল আমল থেকেই ঢাকায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিলো। দেশে রাজনৈতিক,

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসেছে বার বার, আইন-কানুন হয়েছে নতুন নতুন, শাসন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা হয়েছে আধুনিক ও যুগোপযোগী উত্থান-পতন ও ভাঙ্গা-গড়ায় ঢাকার নাগরিক জীবন বার বার বিপর্যস্ত হয়েছে, কিন্তু ঢাকার সনাতন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আসেনি। যার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু দেশ বিভাগের পর থেকে ঢাকা শহরের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা নানা কারণে বিলুপ্তির পথে দ্রুত এগিয়ে যায়।

পঞ্চায়েত সাধারণতঃ মহল্লার আপামর জনগণের রুটিরুজির সংস্থান, কাজকর্মে উৎসাহ দান, বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা, গোলযোগের মোকাবিলা, জটিল মামলা মোকদ্দমা থেকে বিরত রাখা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুঃস্থদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা, পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি করা, গরিব বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করা, মৃত ব্যক্তির সৎকার করা ইত্যাদি জনহিতকর কার্য সম্পাদন করতো। এ জন্যে পঞ্চায়েত সদস্যদের সৎ, জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ এবং নিঃস্বার্থ ও নিরলস কর্মী হতে হতো। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সে সময় বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই চালু ছিলো।

ঢাকায় কখন কোন সালে প্রথম পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা চালু হয়েছিলো, তার সঠিক দিন তারিখ আজও অনুদঘাটিতই রয়ে গেছে। তবে এব্যবস্থা সভ্যতার আদিকাল থেকেই মানব সমাজে চালু ছিলো সে রকম বহু তথ্য বহু পত্র পত্রিকা ও পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে। তবে এই ঢাকা নগরীতে মুসলমান শাসনামলের প্রথম থেকেই যে এ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি ঘটেছিলো তা বলাই বাহুল্য। আজও পঞ্চায়েত সদস্যগণ সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে নবাব আবদুল গণির প্রচেষ্টায় নতুন করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে জোরদার করা হয়েছিলো। তাঁর আমলে ঢাকার ২২টি প্রধান প্রধান মুসলিম মহল্লার পঞ্চায়েত ও লোক নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত গঠিত হয় যা বাইশ পঞ্চায়েত নামে অভিহিত করা হতো। পঞ্চায়েতের স্থিতিকাল নির্ধারিত না থাকলেও মাঝে মাঝে নতুন পঞ্চায়েত গঠন করা হতো। নব নির্বাচিত পঞ্চায়েত সর্দার, নায়েব সর্দারদের খুব আড়ম্বর সহকারে সংবর্ধনা জানানোর রেওয়াজ ছিলো। সংবর্ধনা জানাবার জন্যে মহল্লাবাসী বা গ্রামবাসী চাঁদা তুলে এক বিরাট প্রীতিভোজের আয়োজন করতো।

পূর্বে পঞ্চায়েতের আর্থিক সচ্ছলতা ছিলো। প্রচুর টাকা জমা থাকতো পঞ্চায়েতের তহবিলে। এসব টাকা নিজেদের বা অন্যের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে কিংবা এককালীন দানের মাধ্যমে জমা রাখা হতো। পঞ্চায়েতের টাকা কেউ

ব্যক্তিগতভাবে বা অন্যায়ভাবে ব্যয় করতে পারতেন না। একমাত্র সমাজকল্যাণমূলক কাজেই এ টাকা ব্যয় করা হতো। সাধারণত সরদারের কাছেই পঞ্চায়েতের টাকা জমা থাকতো। এবং হিসাবপত্র রাখার সব ব্যবস্থা তিনিই করে থাকতেন। সরদারদের সহযোগিতা করার জন্য লায়েক বেরাদর তথা বিশিষ্ট মহল্লাবাসীদের নিয়ে কমিটি থাকতো।

পঞ্চায়েতের সব কাজ পরিচালনা, সভাসমিতি, আচার-বিচার করার জন্যে মহল্লার মধ্যে একটি সরকারী বাংলা ঘর থাকতো। এই বাংলাঘর মহল্লার অধিবাসীদের প্রচেষ্টায়ই করা হতো। এখনও অনেক স্থানে এ বাংলাঘর রয়েছে। এসব বাংলা ঘরে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে থাকে। তাছাড়া বাংলাঘর মহল্লাবাসীর একটা মহা-মিলনের স্থান। সবাই এখানে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, সংবাদ বিনিময়, কুশল আদান-প্রদান, অবসর বিনোদন তথা পান-তামাকের আড্ডা বসিয়ে থাকেন এর ফলে মহল্লাবাসীর মধ্যে গড়ে ওঠে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সখ্যতা।

পঞ্চায়েত বারোয়ারী কাজে ব্যবহারোপযোগী আসবাবপত্র যথা– হ্যাচাক, সামিয়ানা, বিছানাপত্র, বাসন-কোসন, বড় বড় ডেকচি, গোলাপদান, আতরদান বর সাজাবার পোশাক-পরিচ্ছদ, মৃত ব্যক্তিদের সৎকারের সব রকম সরঞ্জাম যত্নসহকারে মজুত থাকতো। এসব জিনিস পঞ্চায়েত তহবিল থেকে ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হতো।

বর্তমানে অধিকাংশ মহল্লার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অনেক দূর্বল হয়ে পড়েছে। নিভূ নিভূ প্রদীপের মত কোথাও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু থাকলেও পূর্বের মত জনহিতকর কাজ করা সাধ্যাতীত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মূল কারণ সমাজের অগ্রগতি হয়েছে, অনেক বিবর্তন এসেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে নতুনভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। কারণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সাধন করতে না পারলে একে যুগোপযোগী করা যাবে না। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা জনকল্যাণকর একটা সামাজিক সংস্থা। সমাজ কল্যাণের সর্বস্তরে উন্নতির বিধান করতে হলে এসংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আজকের সমাজে মানুষে মানুষে ভালবাসা, প্রীতি, মায়া-মমতা, শান্তি, সৌহার্দ্য ও জানা-শোনাকে গতিশীল ও স্থিতিশীল করে সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সমাজের উন্নয়ন সাধনই যে সংস্থার একমাত্র লক্ষ্য, তাকে সামাজিক ভাবেই পুনর্গঠিত করতে হবে।

এসব মহল্লা পঞ্চায়েতে বহু সরদার এসেছেন। অনেককে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আজীবন সরদার থাকতে হয়েছে আবার বহুজনকে সরদারী হতে পদত্যাগ করতে হয়েছে। প্রথম পঞ্চায়েত গঠনের সঠিক তারিখ বলা যেমন মুশকিল, তেমনি সরদারদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ অজানাই রয়ে যাবে। এই সব সরদারদের মধ্যে যাঁরা নেতৃত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন এবং সমাজের একনিষ্ঠ দরদী সেজে অনুন্নত অবহেলিত মানুষের সেবা করে গেছেন অথবা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে বিবাদমান পরিবারবর্গের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, কোর্ট কাছারি আর আদালতের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তাঁদের অনেকের কথাই ঢাকাবাসীর মুখে মুখে রয়েছে। এমনি কয়েক জন স্বনামধন্য সরদারের কথা আমার মনে পড়ে। তাঁরা হচ্ছেন– সরদারদের সরদার তথা ২২ পঞ্চায়েতের সরদার মীর্জা আবদুল কাদের সরদার ; নাজিরা বাজারের মতি সরদার ; আবদুল মাজেদ সরদার ও চাঁন সরদার ; আমলী গোলার নির্ভীক ও সমাজ দরদী আবদুর রহিম সরদার ; লক্ষ্মী বাজারের রহমত উল্লাহ সরদার ; আলী আহ্‌মদ সরদার ও মওলা বখশ সরদার ; চানখাঁর পুলের মিয়া সরদার ও পেয়ারু সরদার ; মগবাজারের ওসমান সরদার (তিনি বাইশ পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন) ; কলতা বাজারের নাসিরউদ্দীন সরদার ও সিদ্দিক সরদার ; গেণ্ডারিয়ার কোব্বাদ সরদার ; রায়বাহেব বাজারের ইলিয়াস সরদার ও সবুর বেপারী সরদার ; লোহার পুলের আহসান উল্লাহ সরদার (ইনি বাইশ পঞ্চায়েতের এক সময় সেক্রেটারী ছিলেন) ; চকবাজারের জুম্মন বেপারী ওরফে আহসান মহম্মদ নবী (ইনি বাইশ পঞ্চায়েত শেষ জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন) ; বাবু বাজারের চুন্নু সরদার ও গনি মিয়া সরদার ; পোস্তগোলার নওলাক সরদার, বেলাত আলী সরদার ; ফরিদাবাদের গোলাম আলী সরদার ; আলমগঞ্জের কাদের সরদার ; রহমতগঞ্জের বসুরুদ্দিন সরদার ; আরেফ সরদার ; বাসাবোর পাণ্ডব আলী সরদার ; গোয়াল ঘাটের হাজী ইউসুফ সরদার ; সাতরওজার সালাম সরদার ; ইসলামপুরের আলী মিয়া সরদার ; দয়াগঞ্জের আবদুল আলী সরদার ; ইমামগঞ্জের সাহাবুদ্দিন সরদার ; জিন্দাবাহারের সাত্তার সরদার ; বংশালের আনিসুর রহমান সরদার ; লালবাগের আবদুল বারেক সরদার ; খাজে দেওয়ানের নওয়াব মিয়া সরদার ; নবাবগঞ্জের চাঁনমাল সরদার ; হাজারীবাগের এনায়েতউল্লা সরদার ও জামাল খাঁ সরদার এবং আল্লুর বাজারের আবদুল হাই সরদার।

সমাজ গঠনে ও সমাজ কল্যাণে এঁরা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। সমাজে এঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো অপরিসীম। মানুষকে এঁরা কোদিনই তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না।

ধনী-নির্ধন সবার প্রতিই এঁরা সমান সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁরা সমাজ উন্নয়ন তথা জনগণের কল্যাণকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতেন। তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বহু বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করে এঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

এই সব সরদাররা ছিলেন বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও ছিলো স্মরণযোগ্য। ঢাকার বহু সরদার অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন ও আজাদী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাছাড়া এই সব আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্যে জনগণকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। বলতে গেলে, তাঁরা মহল্লার উন্নয়ন, সমাজের উন্নয়ন তথা জনগণের উন্নয়নে ব্যপৃত থাকতেন। এই সব সরদার ছাড়াও বহু সরদার জনহিতকর কাজে নিজেদের উৎসর্গ করে গেছেন। কালের করাল স্রোতে তাঁদের নাম সবার মন থেকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। এর মধ্যেও যাঁদের নাম মনে পড়ে তাঁরা হচ্ছেন ঃ চৌধুরী বাজারের আবু তাহের সরদার ; লালবাগের হাজী গনি সরদার ও কুদ্দুস সরদার ; হাজারীবাগের খলিল সরদার, মাইনুদ্দিন সরদার, সালাম সরদার ও মুহম্মদ হোসেন সরদার ; রহমতগঞ্জের মিয়া সরদার, রহমান সরদার, আবু সরদার ও হামিদ সরদার ; আমলীগোলার কোব্বাদ সরদার ও ইয়াদ আলী সরদার ; দলভী বাজারের ওবেদউল্লা সরদার ; নবাবগঞ্জের লালমিয়া সরদার ও বেল্লাল সরদার ; গজমহলের সিদ্দিক সরদার ; কালুনগরের এসাক সরদার ; বলদাটুলির একলাল সরদার ; চৌকদারটুলির মমিন খাঁ সরদার ; রায়ের বাজারের ওসমান সরদার ; সিদ্দিক বাজারের হায়াত বখশ সরদার ; সুরিটোলার হাবিবুল্লা সরদার ; কমল্যাপুরের আফুরুদ্দীন সরদার ও মোবারক সরদার, সুত্রাপুরের জানু সরদার ; সিদ্দিক বাজারের করিম সরদার ; আগাসাদেক রোডের হেলাল উদ্দিন সরদার ; চম্পাতলির আলা বখ্শ সরদার ; দেবীদাস ঘাটের সৈয়দ আলী সরদার ও বন্ধু সরদার ; সোয়ারী ঘাটের সামিউল্লা সরদার ; মাহুতটুলির মালেক সরদার ; খাজে দেওয়ানের মনসুর সরদার ও খালেক সরদার ; নয়াবাজারের লাট মিয়া সরদার ; বেচারাম-দেউড়ীর চাঁন সরদার, সুরুজ সরদার ও সালাম সরদার ; মীর্জা মান্না দেউড়ীর ইসলাম সরদার ; রাজনারায়ণ ধর রোডের হাকিম মাঝি সরদার, মহম্মদ সরদার ও সাধুবেপারী সরদার ; বদ্দু পাড়ার সেরাজুদ্দিন সরদার ; খালেক বখ্শ সরদার ; কাজী রেয়াজুদ্দিন রোডের নূর মহম্মদ সরদার ও কালু সরদার ; ছোট কাটরার শরীফ খাঁ সরদার ; বংশিবাজারের ইয়াকুব সরদার ; আগানওয়াব দেউড়ীর বোচন সরদার ; দক্ষিণ মৈসুণ্ডির হায়দর ওস্তাগার সরদার, খলিল ওস্তাগার সরদার ও ইস্‌মাইল সরদার ; নারিন্দার মকসু খলিফা সরদার ; জোড়পুলের নান্না মিয়া সরদার ;

দয়াগঞ্জের গফুরুল্লা সরদার ; কোম্পানীগঞ্জের মুসলেহ উদ্দিন সরদার ; করাতী টোলার চান মিয়া সরদার ; রোকনপুরের গোলাম হোসেন সরদার ; কলতা বাজারের মোন্নাফ সরদার ; মীর্জা মান্না দেউড়ীর দুলু সরদার ; আমলীগোলার আহম্মদ উল্লা সরদার এঁদের মধ্যে কেহ কেহ নায়েব তথা সহকারী সরদার ছিলেন। আজ এদের অধিকাংশই ইহজগতে নেই আল্লাহ তাঁদের সেবার বিনিময়ে তাঁদেরকে জান্নাতবাসী করুন। ঢাকার সরদারদের অনেকেই ঢাকা পৌরসভার কমিশনার হয়েছিলেন। তাঁদের ভূমিকায় মহল্লার উন্নয়ন তথা ঢাকার বহু উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এই সমাজ-দরদীদের নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে ঢকা পৌরসভা তাঁদের নামানুসারে বহু রাস্তার নামকরণ করেছেন।

বাইশ পঞ্চায়েতের প্রধান সরদার মীর্জা আবদুল কাদের ঢাকার নওয়াব পরিবারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি তাঁদের বিরাগভাজন হন। যার ফলে ঢাকাবাসীরা দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সময় তৎকালীন ঢাকার জনগণের মধ্যে মুসলিম লীগ বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক এই টানাপোড়েনে ঢাকার মুসলমানরা বিশেষ করে পঞ্চায়েত সরদারগণ দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটা শিবিরের নেতৃত্ব দেন আহসান মন্‌জিলের খাজা পরিবার এবং অন্যটিতে নেতৃত্ব দেন মীর্জা আবদুল কাদের সরদার ও মতি সরদার। মীর্জা আবদুল কাদের সরদার পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম লীগ বিরোধী শিবিরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

কে, এম, আজম লেনে হযরত বাবা আবদুর রহমানের মাজার রয়েছে। তাছাড়া এখানে বহু আগে থেকেই নবাব পরিবারের দু'টি কবরস্থান রয়েছে। এই কবরস্থান দু'টির একটিতে সাধারণ লোকদের এবং অপরটিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাফন করা হতো। এখানেই নওয়াব স্যার আবদুল গণি, নওয়াব আহসান উল্লাহ ও নওয়াব স্যার সলিমউল্লাহ বাহাদুরের কবর রয়েছে।

পুরাব দরওজার কাছ দিয়ে যে রাস্তাটি উত্তর দিকে চলে গেছে ইতিপূর্বে তার নাম ছিলো দেওয়ান বাজার। ঢাকা পৌরসভা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ খাজা নাজিমুদ্দিনের নামানুসারে রাস্তাটির নাম স্যার নাজিমুদ্দিন রোড নামকরণ করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন আজাদী পূর্ব আমলে ঢাকা পৌরসভা ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পাকিস্তান হাসিলের পর তিনি প্রধান মন্ত্রী ও পরে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। দেশে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর কাউন্সিলপন্থী মুসলিম লীগ গঠন করে তিনি জেনারেল আইয়ুব খানের বিরোধিতা করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তান

আন্দোলনের প্রথম কাতারের সৈনিক ছিলেন। এই রোডে মস্তান মাক্কু শাহের মাজার রয়েছে। এই মাজারটি পূর্বে জেলখানার উঁচু দেওয়ালের অভ্যন্তরে ছিলো। এ রোডের উত্তর ভাগে ছিলো ঢাকা বেতার কেন্দ্র। ঢাকার এই প্রথম বেতার কেন্দ্রটি যে বাড়ীটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সেটা ছিলো ঢাকা ইউনিভার্সিটির রেজিষ্টার মরহুম নাসিরুদ্দিন সাহেবের বাড়ী। এ বাড়ীতে একটা লম্বা টেলিস্কোপ ছিলো। সেটা দিয়ে গ্রহগুলোর বলয় দেখা যেতো। ঢাকায় রেডিও অফিস খোলার প্রাক্কালে গুটিকতক শিল্পী ছিলেন। তন্মধ্যে উৎপলা ঘোষ, লিলি ঘোষ, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, মস্তাজ আলী মিয়া প্রমুখ।

মোঘল শাসনামলে পুরনো কেল্লার পুরাব দরওজা ও পশ্চিম দরওজা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। বৃদ্ধ বয়েসে অপরিসীম মর্যাদা নিয়ে শায়েস্তা খাঁ সুবেদারী ত্যাগ করেন। যে নগরীতে বসে তিনি দীর্ঘকাল বাংলা শাসন করেছিলেন সেখান থেকে তাঁর বিদায়ের দৃশ্যটিও ছিলো অত্যন্ত গৌরবদীপ্ত। তাঁর বিদায় যাত্রার মিছিলে শহরের অধিবাসীরা ভেঙ্গে পড়েছিলেন শেষবারের মত তাঁদের প্রিয় সুবেদারকে এক নজর দেখার জন্যে। পদমর্যাদানুসারে তাঁকে সব রকম রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করা হয়। পশ্চিম ফটক পর্যন্ত তিনি সদলবলে অগ্রসর হন। ফটকের কাছে এসে বিপুল জনতা থেমে গেলো। বৃদ্ধ সুবেদার তাঁর প্রিয় নগরী ও নগরবাসীর কাছ থেকে শেষবারে মত বিদায় নিলেন। তাঁর আমলে এদেশ সুখ-সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহন করেছিলো। সে সময় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক রকম কম ছিলো। টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেতো। বিদায়কালে তিনি শেষ নির্দেশ দিলেন, তিনি যে পশ্চিম দরজা দিয়ে নিস্ক্রান্ত হলেন, তা যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। তৎপর দরজার শিলাখণ্ডে লিখে রাখা হয়, পুনরায় চালের মূল্য ঐ স্তরে না নামা পর্যন্ত কোন শাসনকর্তা যেন এই দরজাটি না খোলেন। অবশ্যি তার এই শেষ নির্দেশটি আজও কেউ অমান্য করেননি। ষাট বছর পর সরফরাজ খাঁর শাসনামলে ঢাকার প্রতিনিধি সৈয়দ গালিব আলী ও যাশোবন্ত রাওয়ের যুগ্ম শাসনে কিছু দিনের জন্যে ঢাকায় আবার শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিলো। তখন চালের দাম ঐ স্তরে নেমে আসায় অনেক ধুমধাম ও আনন্দ উৎসব সহকারে পুনরায় পশ্চিম দরজাটি খোলা হয়েছিলো। কিন্তু কিছু কাল পরই পুনরায় বন্ধ করে দেওয়া হয়ে।

মুঘল আমলে মহল্লা চিশতিয়ানের আওতাভুক্ত কোম্পানী আমলে নীলক্ষেত এলাকা ভুক্ত ইংরেজ রাজত্বের শেষ অধ্যায়ে অরফ্যানেজ রোড এর একটি অংশ যা, পলাশীর সাবেক রেল ক্রসিং হতে সোজা পূর্ব দিকে ওল্ড সেক্রেটারীয়েট যা আজ

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত সড়ক পথটি বহু বছর অরফ্যানেজ রোড হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছিলো। এ রোডটি বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের পশ্চিম পাশ দিয়ে বকসী বাজার হয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দির পর্যন্ত ঐ নামেই পরিচিত ছিলো।

ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিকে বর্তমান আলীয়া মাদ্রাসার নিকট হিন্দু সম্প্রদায়ের মাতা-পিতাহীন ছেলে মেয়েদের প্রতিপালন কল্পে একটি অরফ্যানেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বেশ কিছু দিন চলার পর অরফ্যানেজ তথা এতিমখানাটি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও সড়ক পথটির নাম অরফ্যানেজ রোড নামেই বৃটিশ যুগ থেকে আজ অবদি পরিচিত হয়ে আসছে।

অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, আজিমপুরস্থ স্যার সলিমউল্লাহ্ এতিমখানার নামানুসারেই এই সড়ক পথের নাম অরফ্যানেজ রোড নামকরণ হয়েছে। এ কথা সঠিক নয়। বৃটিশ যুগেই অবলুপ্ত হিন্দু ছেলে-মেয়েদের এতিমখানার নামানুসারেই ঐ নামের উৎপত্তি। তবে পলাশী রেলগেট হতে বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত সড়কের পাশে সলিমুল্লাহ হল, জগন্নাথ হল প্রভৃতি হল নির্মিত হওয়ার পর সড়ক পথের এ অংশটিও যে অরফ্যানেজ রোডের অংশ তা লোকজন ভুলে যেতে থাকে। এটি হল এলাকা বলেই সাধারণ লোক অভিহিত করতো।

১৯৫২ স্যালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাষা আন্দোলনে পাকিস্তান সরকারের গুলি বর্ষণে কয়েকজন প্রাণ হারান। এই সব শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদানের জন্য অরফ্যানেজ রোডের এ অংশটির নাম ঢাকা পৌর করপোরেশনের প্রথম মেয়র আবুল হাসনাতের আমলে শহীদ স্মরণী নামকরণ করা হয়। এ মহল্লার নিকটে রয়েছে নূর ফাত্তাহ লেন। পূর্বে এর পরিধি আরও বিস্তৃতি ছিলো। নূর ফাত্তাহ'র পূর্ণ পরিচয় জানা না গেলেও অনেকেই ধারণা পোষণ করেন যে তিনি মুঘল আমলে সামরিক বাহিনীর কোন পদস্থ পদে ছিলেন। এ মহল্লাটির নিকটেই ঢাকার নবাবদের হাতীর পীলখানা ছিলো এবং সেই সব হাতীর মাহুতগণ এখানে বসবাস করতো। মাহুতদের মধ্যে মান্নান মাহুত ও মগা মাহুতদের নাম জানা গেছে। এ মহল্লার নরশিং মুন্সি ঢাকার নবাব আহ্সান উল্লাহর হাতীর খাদ্য গুদামের জমাদার ছিলেন।

এক সময় মহল্লার গরীব লোকেরা গরু মহিষের পেটের নারী ভুরী শুকিয়ে তদ্দারা ছোটদের ঢোলক গাড়ী তৈরি করতো (আজ কালও মেলায় এ ধরনের ঢোলক ওয়ালা টানা গাড়ী দেখা যায়) তজ্জন্য এ মহল্লাটিকে এক সময় আশে পাশের মহল্লাবাসীরা ঝিল্লি পট্টি বলতো। সাধারণ লোকজনও এ নামেই মহল্লাটি চিনতো। আরেকটি মহল্লা ও পার্শ্ববর্তি খাজে দেওয়ান মহল্লার একাংশকে ভাট্টিখানা বলা হতো।

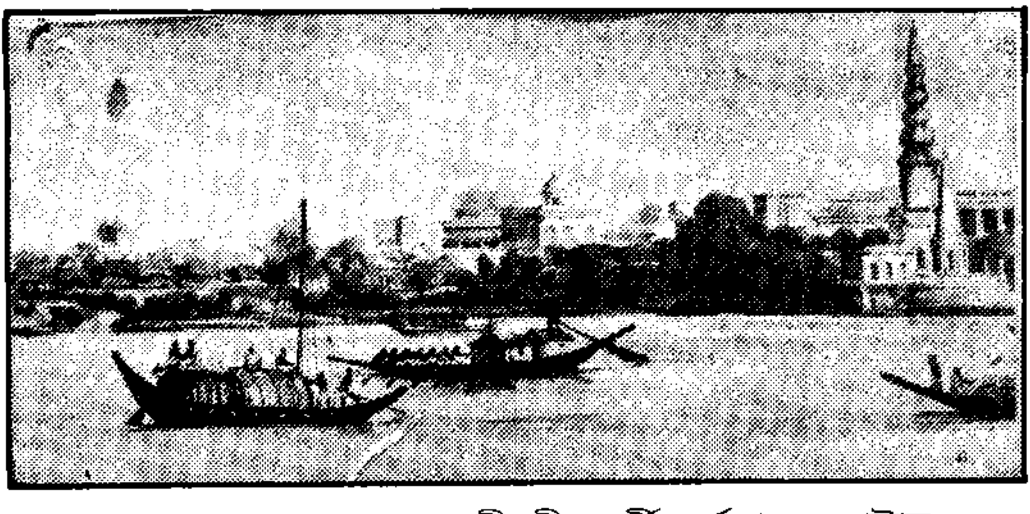
ভাট্টিখানা নাম কোন সূত্র থেকে হলো তা সঠিক জানা যায়না। পানী বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতিকেও ভাট্টি বলা হতো, আবার মদের ভাট্টি, তাড়ির ভাট্টি ইত্যাদির জন্যও অনেক এলাকাকে ভাট্টিখানা বলা হয়ে থাকে। তবে অনেকেই মদের ভাট্টি এখানে ছিলো বলে মত প্রকাশ করেছেন। মহল্লাটি পূর্বে বর্তমান শায়েস্তাখান কল্যাণ কেন্দ্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিলো।

চুড়িহাট্টার নিকট এলাকায় রয়েছে কামিনী ভূষণ রুদ্র রোড। এর পূর্ব নাম ছিলো চাঁদনী ঘাট রোড। ১৯২০ সালে ঢাকা পৌরসভা এ রোডের নাম পরিবর্তন করে কামিনী ভূষণ রুদ্র রোড রাখেন। ইনি ঐ এলাকায় একজন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিলো যথেষ্ট। এককালে চাঁদনী ঘাটের অনেক নাম-ডাক ছিলো। বর্তমান ওয়াটার ওয়ার্কসের দক্ষিণে যে ছোট্ট বিলুপ্ত প্রায় বসিরুদ্দিন সরদার পার্ক ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে, সে এলাকা জুড়েই ছিলো চাঁদনী ঘাট অঞ্চল। এ ঘাটে থাকতো নওয়াব ইসলাম খাঁর চাঁদনী নামে এক বিরাট শাহী বজরা বা প্রমোদ তরী। তাছাড়া ফতেহ দরিয়া নামে একটি তরী ছিলো। নওয়াব ইসলাম খাঁর আদেশে এ ঘাটের কয়েক মাইলের মধ্যে সাধারণের চলাচলের উপযোগী কোন নৌকা প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। চাঁদনী ঘাটের বালাখানা ছিলো নওয়াব ইসলাম খাঁর প্রিয় স্থান। আজ তাঁর সে রূপও নেই, জৌলুসও নেই। নেই তার সাধারণ নৌকার পথ রোধ করার ক্ষমতা। এই ঘাটের নামানুসারেই বর্তমান ওয়াটার ওয়ার্কস থেকে উর্দূ রোড পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে যে রাস্তাটি চলে গেছে তাঁরই নাম হয়েছিলো চাঁদনী ঘাট রোড। অপর এক সূত্রে যানা যায় সুবেদারের পরিবারের বসবাসকারী বজরাটির নাম ছিলো চাঁদনী। সেই বজরাটি যেস্থানে থাকতো বা প্রথম আগমন করেছিলো সে স্থানটি তা থেকেই চাঁদনী ঘাট নাম হয়। যুগের বিবর্তনে আর কালের অববাহিকায় তার নাম পরিবর্তন করে কামিনী ভূষণ রুদ্র রোড রাখা হয়। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও বর্ষাকালে এই চাঁদনী ঘাট এলাকা জুড়ে থাকতো বেদে নৌকার বহর, পয়গম্বরের অনুসারী বলে পরিচয় দিলেও এরা নদীর দেবতা বদরকে পূজা করে। এ এলাকায় বিশিষ্ট হিন্দু নেতা নলিনী বাবু উকিলের বাসস্থানের নিকট একটি শাহী মসজিদ ছিলো। এখন আর এই মসজিদের কোন অস্তিত্ব নেই। চাঁদনী ঘাটে শাহ মখদুমের মাজার রয়েছে। ১৯১৫ সালে বাবু এস, কে, দাস মাজারটি নতুন করে নির্মাণ করিয়ে দেন।

বর্তমান ওয়াটার ওয়ার্কস রোড এবং কামিনী ভূষণ রুদ্র রোডের এলাকা নিয়ে ছিলো কাঁসার হাট। এ এলাকার কিছু অংশ এখনও কাঁসার হাট্টা নামে পরিচিত। এখানেও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের জন্যে একটি জমজমাট বাজার ছিলো। এ বাজারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লালবাগ দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা শাহজাদা মোহাম্মদ আজম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের দলিল-দস্তাবেজে কেল্লা বাজার নামে লালবাগ দুর্গের নিকটবর্তী যে বাজারের উল্লেখ রয়েছে কোন কোন ঐতিহাসিক এই কাঁসার হাট নামক বাজারটিকেই সেই কেল্লা বাজার বলে উল্লেখ করে থাকেন।

খাজা আবদুল গণির দানে ঢাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে ১৮৭৪ সালে লর্ড নর্থ ব্রুক আজকের এই ওয়াটার ওয়ার্কসের ভিত্তি স্থাপন করেন। ওয়াটার ওয়ার্ক্সের কাজে খাজা আব্দুল গণি তৎকালে জনগণের উপর যাতে পানীকর ধার্য্য করা না হয় তৎশর্তে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত নদী হতে উত্তোলিত পানি ফিল্টার না করেই সরবরাহ করা হতো। অতঃপর কিছু কিছু অংশে ফিল্টার করে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৮৮৪ সালে ঢাকা পৌরসভা পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণকরে পানি সরবরাহ এলাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেন। উক্ত সময়ে "ডিউক অব কনট" কলকাতায় আগমন করেন। তাঁর শুভাগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে ঢাকার নবাব আহসান উল্লাহ এগার হাজার টাকা পৌর কর্তৃপক্ষকে দান করে ঢাকা নগরের উত্তরাংশে তথা নবাবপুর, ঠাটারী বাজার ও দিলকুশা (যার পূর্বনাম দেলখোস বাগ) পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত লাইনটি "কনট" এক্সটেনসন নামে অভিহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে ১৮৯১ সালে ঢাকা পৌরসভা সোয়া লক্ষা টাকা ঋণ গ্রহণ করে শহরের সকল এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এই ওয়াটার ওয়াকর্সের নামানুসারেই পোস্তা, কাঁসার হাট্টা, চাঁদনী ঘাট, রহমতগঞ্জ ও চুড়ি হাট্টার অংশ বিশেষ নিয়ে রাস্তাটির নাম ওয়াটার ওয়ার্কস রোড রাখা হয়।



১৮৪০ সালে ঢাকার নদী তীরবর্তী বর্তমান ওয়াটার ওয়ার্কস রোড (চাদনী ঘাট) এলাকায় অবস্থিত নাজির নাটোসিং ও তার মাতার দেহবাশেষের উপর তৈরী মঠ

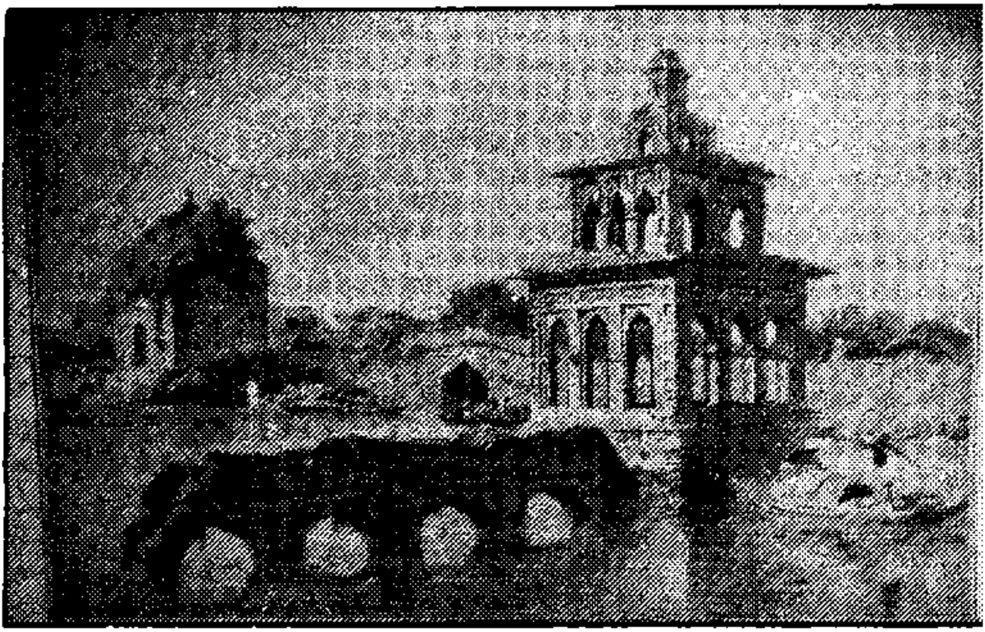
কাঁসার হাট্টার উত্তরের অংশের নাম মীর্জা মান্না দেউড়ি। ঢাকার নায়েব নাজিম নওয়াব ইব্রাহীম খাঁর (১৬৮৯-৯৭) আমলে মীর্জা মান্না নামে একজন অভিজাত শ্রেণীর লোক এ এলাকায় বাস করতেন। এখানে তাঁর একটি প্রাসাদও ছিলো। তিনি শরীরচর্চা বিশেষ করে কুস্তির অনুশীলন খুবই পছন্দ করতেন। তিনি নিজেও একজন স্বনামধন্য কুস্তিগীর ছিলেন। তাওয়ারিক-ই-নসরত জঙ্গ এ কথিত আছে ঃ তিনি একদা বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পারে জিনজিরা প্রাসাদের ছাদে নায়েব নাজিমসহ অপরাপর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করছিলেন, এমন সময় প্রাসাদের নিকটস্থ নদীতে একটি কুমির ভেসে ওঠে। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন ঠাট্টাচ্ছলে মীর্জা মান্নাকে বললেন, 'তুমি একজন মস্ত বড় কুস্তিগীর আর নিয়মিত শরীর চর্চা করে থাকো। তুমি কি এই কুমিরটার সাথে লড়তে পারবে? তক্ষুণি মীর্জা মান্না তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং একটা ছোরা হাতে তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। ঝাঁপ দেয়ার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে আর দেখা গেলো না। উপস্থিত সকলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ভেবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আফসোস করতে লাগলেন। তাঁরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন, আমরা যদি ঠাট্টাচ্ছলে এভাবে তাঁকে চ্যালেঞ্জ না করতাম, তাহলে অকালে তাঁকে কুমিরের পেটে যেতে হতো না। অনেকক্ষণ পর দেখা গেলো মীর্জা মান্না বহু কষ্টে সাঁতার কেটে নদী তীরের দিকে আসছেন। তীরে উঠে তিনি জানালের, নদীতে ঝাঁপ দেয়ার সাথে সাথে কুমিরটি তাঁকে আস্ত গিলে ফেলে। তিনি পেটের ভিতর অন্ধকারের মধ্যে বহু কষ্টে তাঁর হাতের ছোরা দ্বারা কুমিরের পেট কেটে বের হয়ে এসেছেন। একথা শুনে অনেকেই তার কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেলো কুমিরটি মৃত অবস্থায় নদীতে ভেসে উঠেছে। কুমিরটি ডাঙ্গায় ওঠানো হলে দেখা গেলো সত্যই কুমিরটির পেট ফাড়া। এ দৃশ্য দেখে সকলেই নির্বাক ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন এবং তাঁর সাহসিকতার জন্যে তাঁকে অসংখ্য বাহবা দিতে লাগলেন। তৎকালে তাঁর প্রচেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার বিভিন্ন মহল্লায় শরীর-চর্চা কেন্দ্র বা ডনখানা অর্থাৎ কুস্তির আখড়া গড়ে উঠেছিলো। অবশ্যি তৎকালে আমীর ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ খেলা ধুলার এই সব প্রতিষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং সেগুলোর শ্রীবৃদ্ধির জন্যে মুক্ত হস্তে দান করতেন। এককালে ঢাকা প্রাচ্যের অন্যতম কুস্তি কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত ছিলো। এখানে বিভিন্ন দেশের কুস্তিগীররা শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতেন। দেশে-বিদেশে শ্রেষ্ঠ কুস্তি কেন্দ্র হিসেবে এর সুনাম বহু দিন পর্যন্ত বজায় ছিলো। সে সময় অবশ্যি ব্যায়ামোপযোগী আধুনিক

সাজসরঞ্জাম ছিলো না। সাধারণত লাল মাটি আর কাঠের তৈরি সরঞ্জামাদি দিয়েই তাঁরা ব্যায়াম চর্চা করতেন। মীর্জা সাহেব যেমন ছিলেন সাহসী, তেমনি তাঁর শক্তিও ছিলো অসাধারণ। একবার তিনি দুহাতের তালু দিয়ে হাতীর দাঁতের একটি বল পিষে ফেলেছিলেন। কিন্তু অত্যধিক শক্তি প্রয়োগের ফলে তাঁর শরীরের শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। এই রক্ত-ক্ষরণের ফলেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই অসীম সাহসী জনাব মীর্জা মান্নার নামানুসারে মীর্জা মান্না দেউড়ির নামকরণ হয়।

বুড়িগঙ্গা নদীর পারে যে মহল্লায় অনুষ্ঠিত একটি মাত্র ঘটনা ঢাকার ইতিহাসের মোড় বদলে দিয়ে অশুভ চক্রের সূচনা করেছিলো, যা সংঘটনের ফলেই সমৃদ্ধিশালী ঢাকা নগরীর আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্য আর দুর্দশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিলো এবং যার ফলে ঢাকার সৌভাগ্য সূর্য হয়েছিলো অস্তমিত – বহু অশুভ চক্রের পাঁয়তারা ও ষড়যন্ত্রের ফলে ঢাকা নগরী আর বাংলার রাজধানী থাকতে পারেনি, সেই পোস্তা নামক এলাকাটির নাম কারো নামানুসারে বা কোন আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তিতে বা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে রাখা হয়নি। সুবেদার শায়েস্তা খাঁ যে পাকা বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন লালবাগ দুর্গের কাছ থেকে বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতাল পর্যন্ত, সে বাঁধকে অনেকে পোস্তা বলে অভিহিত করে থাকেন। তাই পরবর্তীকালে ওয়াটার ওয়ার্কস নামে পরিচিত হলেও সবার কাছেই এলাকাটি পোস্তা নামে অভিহিত হয়। দেশ-বিদেশের বহু ব্যবসায়ীও পোস্তা নামের সাথে পরিচিত। কেন না এখানে একটি বৃহত্তম চামড়া ব্যবসা-কেন্দ্র অবস্থিত। এই চামড়ার ব্যবসাতেই যাচনদারী প্রথা চালু রয়েছে তা ইংরেজ কুঠিতে মাল বেচা-কেনার সময় হতেই চলে আসছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মাত্র তিনশ গজ দূরে নদীর ধারে ঢাকার নাজিম প্রিন্স আজিম-উশ-শানের দরবার ছিলো। (১৬৯৭-১৭০৩) এ প্রাসাদ তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। সুবেদার যখন দরবারে বসতেন তৎকালীন দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খাঁ সরকারী পালকিতে চড়ে সেখানে যেতেন। সুবেদারের দরবারে মুর্শিদ কুলি খাঁ অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন সুবেদারের ব্যয়সংকোচের ফলে। সুবেদার আজিম-উশ-শান ১৬৯৭ সালে বাংলাদেশে পদার্পণ করে প্রথম তিন বছর বর্ধমানে দফতর স্থাপন করে বিদ্রোহীদের দমনে ব্যস্ত থাকেন। শান্তি ফিরে এলে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি শাহী নৌবহরে বিজয়ীর বেশে ঢাকায় অবতরণ করেন। সুবেদারি লাভের পর বিশেষ করে সমৃদ্ধিশালী ঢাকা নগরীর বুকে

অবস্থান করার পর তিনি খুবই অর্থলোভী হয়ে পড়েন। অর্থ লাভের জন্যে তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত হয়ে উঠতেন। তিনি আত্মঘাতী ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। এই ব্যবসাকে সওদায়ে খাস ও সওদায়ে আম বলে ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর আত্মঘাতী কার্যকলাপ ও অর্থ আহরণের ঘৃণিত কাহিনী সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁর পিতা আওরঙ্গজেব জানতে পেরে কঠোর ভাষায় তাঁকে পত্র লিখেছিলেন এবং তাঁর অর্থাগমের পথ অনেকটা সংকুচিত করে দিয়েছিলেন।



পোস্তায় অবস্থিত শাহজাদা আজিমুশ শান নির্মিত প্রসাদের ভগ্নাবশেষ

অনন্যোপায় হয়ে সুবেদার তৎকালীন ঢাকার ধনাঢ্য হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে হলদে ও গোলাপী রংয়ের বস্ত্র পরিধান করে তাঁদের পূজা-মণ্ডপে প্রবেশ করে তাঁদের খুশি ও অনুগৃহীত করতেন। এটা ধর্মভিত্তিক উদারতার পরিচায়ক হলেও তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিলো অর্থ লাভ। এ সংবাদও সম্রাট আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হলো। তিনি ভৎর্সণা বাণী পাঠালেন। আর পুত্রের নির্বুদ্ধিতার দরুণ বাংলার দেওয়ানি ও রাজ্যশাসনের ভার ১৭০১ সালে মুরশিদ কুলি খাঁ নামক তাঁর এক প্রিয়পাত্রের হাতে অর্পণ করেন। মুরশিদ কুলি খাঁ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হাজী শফী নামে জনৈক ইরানবাসী তাঁকে ক্রয় করে ইস্পাহানে নিয়ে সেখানে ইসলামী মতে শিক্ষা প্রদান করেন। বণিক হাজী শফীর মৃত্যুর পর তিনি মুক্তি পেলেন। এবার ভাগ্য তাঁর সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো।

বেরারের দেওয়ানের অধীনে তিনি চাকরি পেলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দক্ষতা ও যোগ্যতার জন্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ বিপুল উদ্যম নিয়ে দুর্নীতির মূলোৎপাটন এবং শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে হাত দিলেন। তিনি খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমীর ওমরাহদের দুর্নীতির পথও বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কি সুবেদার আজিম-উশ-শানের ধন-সঞ্চয় লিপ্সা ও অপরিসীম ব্যয় বাহুল্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন। এই ব্যবস্থায় সুবেদার খুবই মুশকিলে পড়লেন। এর আগে একটা চিরকুট লিখে পাঠালেই টাকা এসে হাজির হতো– আদেশ পাওয়া মাত্রই দেওয়ান তা তামিল করতেন। কিন্তু মুরশিদ কুলি খাঁ আর্থিক ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দাবি করলেন এবং সেটা প্রয়োগ করতেও সক্ষম হলেন। এমন কি সুবেদারের জন্যে যে পাঁচ অশ্বারোহী বিশিষ্ট একটি দেহরক্ষী বাহিনীর ব্যবস্থা ছিলো ; নদী-মাতৃক ঢাকার মত স্থানে এরূপ অশ্বারোহী রক্ষীদল রাখা নিরর্থক – এই অজুহাতে তা বিলোপ করেছিলেন। তাঁর প্রতি সম্রাটের অবিচল আস্থা থাকায় কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচারণের সাহস পেলেন না। রোষে ক্ষোভে সুবেদার আজিম-উশ-শান তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। উপায়ন্তর না দেখে তিনি বল প্রয়োগ ও চক্রান্তের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ১৭০২ সালের পূর্বভাগে পোস্তার রাজপথে এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো।

অশ্বারোহী দলের নায়ক আবদুল ওয়াহিদ সুবেদারের খুবই খয়ের খাঁ ছিলেন। সুবেদার তাঁর বিরক্তিভাজন দেওয়ানের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে এবার ফন্দি আঁটলেন। তিনি আবদুল ওয়াহিদকে তাঁর অভিসন্ধি অনুযায়ী কাজ করতে রাজী করালেন। মুরশিদ কুলি খাঁ যেমন দক্ষ তেমনি সুচতুর ছিলেন, তাই এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি সদা সতর্ক ছিলেন। প্রকাশ্যে তিনি কখনও সুবেদারের বিরুদ্ধাচারণ করতেন না, বরং তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে চলতেন। একদিন মুরশিদ কুলি খাঁ পালকিতে চড়ে পোস্তার নদী তীর সংলগ্ন সুবেদার আজিম-উশ-শানের দরবারে চলেছেন। চারদিকে রয়েছে দেহরক্ষীরা। কাঁসার হাট্টা বাজারের জনবহুল রাস্তায় আবদুল ওয়াহিদ পরিকল্পনা মত দেওয়ানকে পাকড়াও ও নাজেহাল করার অভিসন্ধি করলেন। সুবেদারের প্রাসাদের অনতিদূরে একটি সরু গলির মুখে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যগণ ওঁৎ পেতে রইলেন। দেওয়ানের পালকি নিকটবর্তী হলে তাঁরা সেটি ঘেরাও করার চেষ্টা করে হৈ চৈ শুরু করলেন। তাঁদের নাকি অনেক বেতন বাকি পড়েছে। সেই বকেয়া মাইনা দাবী করে তাঁরা হৈ চৈ করতে লাগলেন। মুরশিদ কুলি খাঁর দেহরক্ষীরা রীতিমত অস্ত্র সজ্জিত ছিলো। তিনি দেহরক্ষীদের দ্বারা

বেষ্টিত হয়ে শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে নিরাপদে প্রাসাদে পৌঁছে গেলেন। তিনি ভাবলেন সুবেদারের সাথে আর কোন শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব নয়। আবদুল ওয়াহিদের চক্রান্তের সাথে সুবেদার লিপ্ত আছেন বলে প্রকাশ্যে অভিযোগ করলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে সুবেদারকে তিনি তিরস্কার করলেন। নিজ তরবারির উপর হাত রেখে মুরশিদ কুলি খাঁ আজিম-উশ-শানকে বললেন, 'আপনি যদি আমার প্রাণ নেয়ার জন্যে এতই উদগ্রীব হয়ে থাকেন, তবে আসুন এখানেই শক্তি পরীক্ষা হোক।' আজিম-উশ-শান যোদ্ধা ছিলেন না বলে সুবেদার পদের সম্ভ্রম ও মর্যাদার অজুহাত তুলে দেওয়ানের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে অস্বীকার করলেন। যা হোক, মুরশিদ কুলি খাঁ আম-দরবারে গিয়ে আবদুল ওয়াহিদকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করে দিয়ে তাঁকে এবং তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদেরকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করলেন। সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় দুর্বলচেতা সুবেদার ভীত হয়ে পড়লেন। পিতা সম্রাট আওরঙ্গজেবের রোষবহ্নি থেকে এবার নিস্তার নেই ভেবে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

মুরশিদ কুলি খাঁ বুঝতে পারলেন এই শহরে তাঁর জীবন মোটেই নিরাপদ নয়। তাই তিনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিখে সম্রাটের কাছে প্রেরণ করলেন এবং সেদিনই তাঁর সকল ভক্ত-সহচর সমভিব্যাহারে সমগ্র রাজস্ব ও দেওয়ানী দফতর সাথে নিয়ে বিরাট নৌবহরে পাড়ি দিলেন মুরশিদাবাদের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় সুবেদারের প্রতি সাধারণ সম্মানটুকু পর্যন্ত প্রদর্শন করলেন না। আজিম-উশ-শান নদী তীরস্থ পোস্তার প্রাসাদ থেকে দেখতে লাগলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর ঢাকা ত্যাগের দৃশ্য। আর ঢাকাবাসী দেখতে লাগলো তাঁদের সৌভাগ্য সূর্যের অস্ত যাওয়ার দৃশ্য। এই মর্মান্তিক ঘটনার ফলেই ঢাকা নগরী মুসলিম বাংলার রাজধানীর মর্যাদা হারালো।

সম্রাটের সাথে রক্তের সম্পর্কও আজিম-উশ-শানকে বাঁচাতে পারলো না। আওরঙ্গজেবের রোষ তাঁর উপর নিপতিত হলো। তাঁর প্রতি ঢাকা ছেড়ে বিহার যাওয়ার নির্দেশ এসে গেলো। যাওয়ার সময় পুত্র ফররুখ শিয়রকে উপ-শাসক মনোনীত করে শাসনভার তাঁর উপর ন্যস্ত করে গেলেন বটে কিন্তু তা সম্রাটের অনুমোদন লাভ করলো না। ফররুখ শিয়র ঢাকা নগরীতে অবস্থানকালে এ প্রাসাদেই বাস করতেন। বিখ্যাত পর্যটক বিশপ হেবার ইহার গঠন প্রণালীর ভূয়সী প্রসংশা করে একে মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন।

যুবরাজ ফররুখ শিয়র শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে শের বুলন্দ খাঁনের শলাপরামর্শে প্রদেশের শাসন কার্য্য পরিচালনা করতেন। তার মহানুভবতা ও ন্যায় বিচার দ্বারা

ঢাকাবাসীদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হতে পেরেছিলেন।

যদিও আজিম-উশ-শান অবমাননাকর অবস্থার মধ্য দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। তবু তাঁকে বাদশাহের প্রতিনিধি হিস্যেবে যাবার সময় যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিলো। তাঁর প্রাসাদের সন্নিকটে পোস্তার ঘাটে তোপধ্বনি ও ঢক্কানিনাদের মধ্য দিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় প্রমোদ-তরী বহরের নির্দিস্ট বজরায় আরোহণ করলেন, নিলেন অবৈধ উপায়ে অর্জিত আট কোটি টাকা। কয়েক বছর পূর্বে শাহ সুজা নির্মিত এই বিরাট প্রমোদ বহর নদীতে কয়েক মাইল জুড়ে অবস্থান করতো। তাঁর সাথে সকল সরকারী দফতর, অসংখ্য আমীর-ওমরাহ এবং আমলা-পাইকও বিদায় হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে এই বিরাট প্রমোদ-তরীর বহর দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলো। আর এই কোলাহল মুখর, কর্মচঞ্চল ঢাকা নগরী অকস্মাৎ দুই শতাব্দীর জন্যে নির্বাক ও স্তব্দ হয়ে গেলো। মহানগরী যেনো প্রাণহীন হয়ে ক্রমে তার সকল আকর্ষণ হারিয়ে ফেলতে শুরু করলো।

বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণকারী এই মহানগরী একটি সাধারণ শহরে পরিণত হয়ে গেলো। শতাব্দীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের যবনিকা যেন হঠাৎ করেই নেমে গেলো। আরও এক শতাব্দীর বহু পরে ঢাকা নগরী যদিও পুনরায় পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে, তাও আবার অন্য এক জাতির প্রবল আন্দোলন ও প্রতিবন্ধকতায় সে মর্যাদা অচিরেই ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়।

ঢাকাবাসী তখন কি বুঝতে পেরেছিলো পোস্তার এই সামান্য ঘটনা তাদের দুর্দিন ডেকে আনবে? সেদিনের সুবেদারের বিদায়কালীন তোপধ্বনিই কি ঢাকার বুকে দুর্যোগের ঘনঘটার নিনাদ তুলেছিলো। আজ আর পোস্তার দরবার প্রাসাদের কোন অস্তিত্ব নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেই দরবার প্রাসাদের কিছু অংশ জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে ঢাকাবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতো তাদের হারিয়ে যাওয়া সম্ভ্রম ও গৌরবের কথা।

পোস্তার একটি অংশ বর্তমানে হাজী রহিম বক্স লেন। রহিম বক্স একজন বিশিষ্ঠ কাঠ খড়ির এবং পরে চামড়ার ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ঢাকা পৌরসভাকে তার বাড়ী সংলগ্ন কাচা রাস্তাটি ইটের খোয়া দ্বারা উন্নয়ন করার জন্য ৫০০/= টাকা দান করায় উক্ত গলি পথ হাজী রহিম বক্স লেন নামকরণ করে। হাজী রহিম বক্স দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভাওয়াল গড় এলাকাবাসীদের খাবার পানীর কষ্ট দেখে দু'টি ইদারা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। হাজী রহিম বক্স এবং তার ছেলে মীর্জা মান্না দেউরী মসজিদে শ্বেত পাথর প্রদান করেছিলেন। হাজী রহিম বক্সের কবর লালবাগ

মসজিদে রয়েছে।

পূর্বে এ এলাকাটি দুলিবাগের গলি নামে পরিচিত ছিলো। এ নাম নিয়ে একাধিক কিংবদন্তী বা কাহিনী রয়েছে। কথিত দুলিবাগ নামটি দুলাবাগ থেকে হয়েছে। পূর্বে এ গলিতে নাকি কতিপয় বারাংগনার বাস ছিলো। তাদের নিকট যে সব যুবক আসতো পার্শ্ববর্তী লোকেরা ওদেরকে দুলা বলে আখ্যায়িত করতো। তা থেকেই এ নামের উৎপত্তি বলে প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ হতে শুনেছি।

অপর দিকে কথিত আছে যে এখানে ঢুলীরা বসবাস করতো অর্থাৎ যারা ঢোলক বাদক নবাব বা শহর কর্তাদের আদেশ নির্দেশে ঢোল শহরত করতো তাদেরকে ঢুলি বলা হতো তাদের নামানুসারে অপরদিকে একথার সঙ্গে অনেকে এক মত নয়, তাদের মত হলো যারা ডুলী (পাল্কীর ন্যায় কাপড় ঘেরা দিয়ে দুই বাহক দ্বারা বহন হতো) সেই ডুলীর বাহকরা এখানে বাস করতো বলে ডুলিবাগ, এনাম অপভ্রংশ হয়ে দুলিবাগ নাম ধারণ করে। যদিও পৌরসভার রেকর্ড পত্রে হাজী রহিম বক্স নামটি অনেক পূর্বেই বহাল হয়েছে। আজও ঢাকাবাসীর অনেকেই এ অঞ্চলটিকে দুলিবাগের গলি বলে থাকে। এ মহল্লায় কাওসার নামে এক সাপুড়ে ছিলেন। কাওসার সাপুড়ে বহু সাপ ধরেছে। ঢাকা শহরে যে কোন বিষাক্ত সাপ ধরার ব্যাপারে তাঁর খুব নাম ডাক ছিলো। শেষ পর্যন্ত সাপের দংশনেই সে মৃত্যু বরণ করে। আজও এলাকাবাসী তার সাপ ধরার কাহিনী বর্ণনা করে।

তাছাড়া মৌলভী আঃ রহিম নামে এক জন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। পৌরসভায় তিনি স্যানিটারী ইন্সপেক্টর পদে চাকুরী করতেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু শিক্ষার প্রতি তার খুবই অনুরাগ ছিলো বিশেষ করে মুসলমানদের ব্যাপারে। তৎকালীন মুসলমান ছেলে-মেয়েরা লেখা পড়ায় উৎসাহী ছিলো না। তিনি নিজ ব্যয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করে জীবন ধারণ করতো। যেমন এক আনার মধ্যে বাজার করতেন, গাছের লেবুর এক অংশ কেটে ভিজে কাপড় দিয়ে কাটা লেবুটিকে গাছেই মুড়ে রাখতেন যেন নষ্ট না হয়, পরে প্রয়োজন হলে সেটাকে ব্যবহার করতেন। এভাবে অর্থ সঞ্চয় করে তিনি ঢাকায় তিনটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন তন্মধ্যে লালবাগ ইসলামিয়া মক্তব যা বর্তমানে লালবাগ সরকারী বালক বিদ্যালয়-২ অপরটি বংশাল মক্তব যা বর্তমানে বংশাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অপর আরেকটি হরনাথ ঘোষ রোডে একটি বালিকা স্কুল যাহা পরবর্তীতে খাজে দেওয়ান মহল্লার অভ্যন্তরে স্থানান্তর করে সিরাজ উদ্দিন সরকারী গালর্স প্রাইমারী স্কুল নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের লোকের নিকট ঢাকার শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত আদি মুসলিম অধিবাসীগণ ঋণী।

হাজী রহিম বক্স লেনের পূর্ব দিকে আরেকটি গলি পথ আছে যাহা এলাকাবাসী হাজী ইয়াসিন বেপারী লেন বলে অভিহিত করতো। যদিও উহা ওয়াটার ওয়ার্কস রোডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে বহু পূর্ব থেকে। হাজী ইয়াসিন বেপারী প্রায় ১৩৫ বছর পূর্বে কেরানীগঞ্জ এলাকা হতে আগমণ করে এ গলিতে বাসস্থান করেছিলেন। তিনি চাউলের বিরাট ব্যবসা করতেন। বিহার হতে বড় বড় নৌকায় চাউল আমদানী করে পোস্তা ঘাট দিয়ে গুদামে উঠাতেন। তা ছাড়া তিনি এখানে এসে চামড়া ব্যবসা আরম্ভ করে ভারতবর্ষ ও বর্হিবিশ্বে সুনাম অর্জন করেছিলেন। হাজী ইয়াসীন বেপারীর কবরগাহ্ও লালবাগ শাহী মসজিদে রয়েছে।

এ গলি পথের পূর্ব দিকে আরেকটি ছোট্ট গলিপথ রয়েছে যা বর্তমানে পোষ্ট অফিস গলি বলে থাকে। ইহা পূর্বে নাজির বাবুর গলি বলে পরিচিত ছিলো। এ গলি পথটিও ওয়াটার ওয়ার্কস্ রোডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বহু পূর্বেই। নাজির বাবুর মাতা পরলোক গমণ করলে পোস্তার তথা চাঁদনী ঘাটের নিকট নদী তীরে একটি মঠ তৈরি করেন যা নাজিরার মার মঠ বলে ঢাকাবাসী উল্লেখ করতো। এই মঠের ছবি ১৮৪০ সালের এক জার্মান শিল্পীর ছবিতেও দেখা যায়।

মুঘল শাহজাদা মঃ আজম নির্মিত লালবাগ দূর্গের পূর্ব পার্শ্বস্থ রাস্তাটি যাহা পোস্তা থেকে লালবাগ চৌরাস্তার সঙ্গে মিশেছে তারই নাম শায়েস্তা খাঁন রোড। ঢাকার ইতিহাসে বাংলার সুবেদার নওয়াব শায়েস্তা খাঁনের নাম যে রূপ উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, আর কোন শাসন কর্তা এমনকি এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব ইসলাম খাঁর নামও সে রূপ উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ নেই। যে সময়ে মোঘল সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে এই প্রদেশটি শাহজাদাদের মল্লভূমি হয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলো। তাদের উচ্চাভিলাষ বাস্তবায়নের ক্ষেত্র ভূমি বলে পরিগণিত হয়ে আসছিলো এবং যে সময়ে চারদিকে অশান্তি, বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো, সে সময়েই এই মহান সুবেদার দীর্ঘকাল যাবৎ নিরুপদ্রবে এ অঞ্চল শাসন করে গেছেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থায় দক্ষতা ছিলো অপরিসীম এবং এর প্রভাব তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অম্লান ছিলো। দীর্ঘ একাশি বছর বয়সে পূর্ণ সম্ভ্রম নিয়ে রাজ কার্য্য থেকে অবসর নিয়েছিলেন। সম্ভ্রমশীল ও উচ্চ বংশজাত আমীর-উল-উমরাহ নওয়াব শায়েস্তা খাঁর দিল্লীর দরবারে অপ্রতিহত প্রভাবের দরুনই তা সম্ভব হয়েছিলো। তিনি ছিলেন একদিকে সম্রাটের শ্যালক এবং অন্যদিকে আরেক সম্রাটের মাতুল। তাঁর পরিবারের সাথে জড়িত রয়েছে এমন এক অমর প্রেমের কাহিনী যা সব দিক দিয়ে অতুলনীয়।

এই প্রেম কাহিনীই সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ও সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলকে বিশ্বের ইতিহাসে চির স্মরণীয় করে গেছেন। শায়েস্তা খাঁ ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান-এর ভ্রাতুস্পুত্র। আর সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের সহোদর। তাঁর পিতা আসফ খাঁ সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সম্রাট শাজাহানের আমলেও তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে আসফ খাঁর মৃত্যু হলে পুত্র শায়েস্তা খাঁ মাত্র ৩৩ বছর বয়সে সেই পদে অভিষিক্ত হন। অবশ্য পিতা আসফ খাঁ জীবিত থাকাকালেই তিনি বহু দায়ীত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল পদে কাজ করেছিলেন। তন্মধ্যে বিহারের শাসন কর্তা, গুজরাটের সুবেদার, গোলকুণ্ডা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এবং দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী উল্লেখযোগ্য। অবশেষে তিনি বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন ১৬৬৩ সালে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের সময় শিবাজি প্রেরিত এক আততায়ীর অস্ত্রের আঘাতে আহত হওয়ায় সে বৎসর তাঁর বাংলায় আগমণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অবশ্য পরের বছর তিনি ঢাকা আগমণ করে সুবেদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ পদে সুদীর্ঘ দিন অধিষ্ঠিত থাকেন।

সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে ঢাকা শহরের সীমানা ছিলো দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা উত্তরে টঙ্গী নদী পর্যন্ত দীর্ঘ পনর মাইল। প্রস্থ্যে পশ্চিমে জাফরাবাদ হতে পূর্বে পোস্তগোলা পর্যন্ত। এর সীমানার মধ্যে ছিলো অসংখ্য রাজ পথ, জনপদ ও সেনাশিবির। শহরের নিকটতম নদীতে থাকতো শাহী বজরা ও সাত'শ রনতরী নওয়ারা বা নৌবহর। সে সময় ঢাকার উন্নতি হয়েছিলো অপরিসীম। লোক সংখ্যা হয়েছিলো প্রায় দশ লক্ষ। ঊনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে বৃটেনবাসী যেমন গ্রামীণ জীবন পরিত্যাগ করে শহর জীবন যাপন করার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিলো, তেমনি তিন শতাব্দী পূর্বে ঢাকাতে অনুরূপ অবস্থা দেখা দিয়েছিলো। মানুষ শহর জীবনে অভ্যস্থ হয়ে ওঠায় শহরের বাইরে বহু আবাদী জমি অনাবাদি হয়ে গড়েছিলো। দীর্ঘ দিন পতিত থাকার ফলে সে সব স্থান বন জঙ্গলে পরিণত হয়েছিলো।

আমীর-উল-উমরা নবাব শায়েস্তা খাঁন তার শাসনামলে শাসনকার্যে, শত্রু ও দস্যু দমনে যেমন কৃতিত্ব রেখে গেছেন তেমনি ইট পাথরের মধ্যে তাঁর শাসনামলের বহু কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যেমন ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরস্থ স্বীয় কন্যা পরি বিবির স্মৃতিসৌধ, সাত গম্বুজ মসজিদ প্রভৃতি। কিন্তু তার সুদীর্ঘ সুবেদারীর আমলে তিনি কোন প্রাসাদে বাস করতেন বা কোথায় দরবার বসাতেন তার সঠিক নির্দেশ পাওয়ার মত নিদর্শন তিনি রেখে যাননি। তাঁর আমলে এ দেশের যে প্রাচুর্য্য ছিলো, তা আর কোন শাসন কর্তার আমলে ছিলোনা। খাদ্য ও বিভিন্ন পণ্য

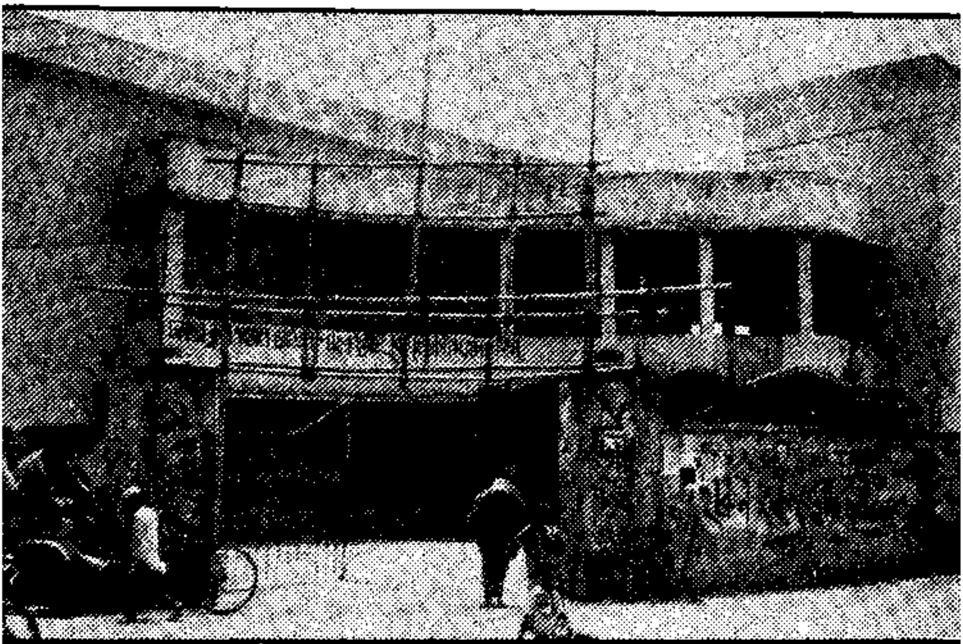
এত সস্তায় পাওয়া যেত যা আজকের দিনে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। সে সময়ের একজন পর্যটক ফ্রানসিস বার্নিয়ার এদেশে পর্যটনকালে লিখেছেন চালের সাথে ঘিও চার পাঁচ রকমের মটর শুটি দিয়ে এক রকম খাদ্য তৈরি হয়। এটি অতি সাধারণ লোকের সাধারণ খাদ্য। বলতে গেলে এক রকম বিনে পয়সায় এরকম খাবার পাওয়া যায়। এক টাকায় বিশটি অথবা তারও বেশী মুরগী বা হাঁস পাওয়া যায়। টাকায় আট মন চালও পাওয়া যায় এক কথায় এখানে সব কিছুরই প্রাচুর্য্য ছিলো। সে কালে পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে এরূপ একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিলো যে, "বাংলাদেশে প্রবেশের শত পথ খোলা আছে, কিন্তু একবার প্রবেশ করলে বের হবার একটি পথও নেই" ঢাকার সাধারণ লোক এই প্রাচুর্য্য এবং খাদ্য ও পণ্য দ্রব্যের সস্তা মূল্যের জন্য তাদের প্রিয় সুবেদারকে "সস্তা খাঁন" বলে অভিহিত করতেন।

শায়েস্তা খাঁনের দীর্ঘ সুবেদারী আমলের সকল ইতিহাস, কথা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও যতদুর সম্ভব পরবর্তীতে বিভিন্ন মহল্লা ও স্থানের ইতিহাস বর্ণনা কালে আরও কিছু বলার আশা রাখি এখানে উল্লেখ থাকে যে নবাব শায়েস্তা খাঁনই বাড়ী ঘরে চুনকাম করার প্রচলন করেন।

১৯৬৬-৬৭ সালে আয়ুব আমলে শায়েস্তা খাঁন রোডে একটি সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে যা আজ শায়েস্তা খাঁন কল্যাণ কেন্দ্র নামে সকলের নিকট পরিচিত। এ কেন্দ্রটির নির্মাণ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা অনেকেরই স্মরণ পটে অঙ্কিত আছে। এ প্রকল্পটি "পাইলট স্কীম ফর সোস্যাল সার্ভিস ডেমনেস্ট্রেশন কাম ট্রেনিং সেন্টার" নামে অভিহিত ছিলো। তজ্জন্য আমাদের লালবাগ ইউনিয়ন এর রাজনারায়ণ ধর রোডে এক খণ্ড জমিও খরিদ করা হয়ে ছিলো। (যা আজ খেলার মাঠ কাম শিশু পার্ক) এই মহা পরিকল্পনাটির জন্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সমাজ কল্যাণ দফতর এর সহযোগিতায় সরকার হতে পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়েছিলাম। জাতি সংঘের সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা ডঃ মিলটন রোজনার এর মাধ্যমে আজাদ মুসলিম ক্লাব লালবাগ ইউনিয়ন কমিটি এবং অত্র এলাকার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় যখন আমাদের খরিদকৃত জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার সব রকম ব্যবস্থা সম্পন্ন করি, তখন ঢাকা পৌরসভার তদানীন্তন চেয়ারম্যান জনাব মঈনুদ্দিন 'চৌধুরী ও পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের অনুরোধে ঢাকার অন্যান্য ইউনিয়নের অধিবাসীদের সুবিধার্থে প্রকল্পটি শায়েস্তা খাঁন রোডে পৌরসভার জমিতে (সে সময় এখানে

পৌরসভার বলদের আস্তাবল ছিলো) স্থাপন করা হয়। অধিকাংশ মানুষের কল্যাণ সাধন ও দেশী-বিদেশী পরিদর্শকদের সুবিধার্থে আমাদের লালবাগ ইউনিয়ন এলাকায় এবং আমার তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি স্থাপন ও পরিচালনার নির্দেশ থাকলেও শায়েস্তা খাঁন রোডে কেন্দ্রটি স্থাপনে আমাদের তরফ থেকে কোন বাধার সৃষ্টি করা হয়নি। পৌর চেয়ারম্যান প্রকল্পটির কিছু রদবদল করে তার সঙ্গে একটি মঞ্চ ও মিলনায়তন সংযোজন করেছিলেন। ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান মঈনুদ্দিন চৌধুরী কেন্দ্রটি উদ্বোধন করার জন্যে তৎকালীন গভর্ণর জনাব মোনেম খাঁনকে আমন্ত্রণ জানান এবং আমার বিরোধিতা সত্ত্বেও পৌরসভায় এক সিদ্ধান্ত মতে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে মোনেম খাঁন কল্যাণ কেন্দ্র রাখার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু উদ্বোধন কালে গভর্ণর তাঁর নিজের নামের পরিবর্তে নওয়াব শায়েস্তা খাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এ কেন্দ্রের নাম "শায়েস্তা খাঁন কল্যাণ কেন্দ্র" বলে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় বহন করে। চেয়ারম্যান জনাব মঈনুদ্দিন চৌধুরী আমার সক্রিয় সহযোগিতায় কেন্দ্রটিকে একটি আদর্শ সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যাবতীয় ব্যবস্থা প্রায় সুসম্পন্ন করে এনেছিলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সে ব্যবস্থা আজও সম্পন্ন হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর পৌর সভায় সর্বময় কর্তা পদে অনেকজন বরিত হলেও কেউই তাঁর সেই ব্যবস্থাবলী তথা কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য কার্যকর করতে তেমন কোন আগ্রহই প্রকাশ করেননি। এ ব্যাপারে সরকারের ঔদাসীন্যও লক্ষণীয়। সরকার প্রকল্প গ্রহণ করে তদানুসারে দালান তৈরি করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করে থাকেন। এরপর আর কোন খোঁজ খবর রাখেন না। এর ফলে বহু কল্যাণকর প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই কেন্দ্রটিকে এখন বিবাহ কল্যাণ কেন্দ্র বললে অত্যুক্তি হবে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা এবং যার স্মৃতি নিয়ে শায়েস্তা খাঁন কল্যাণ কেন্দ্র রাখা হয়েছিলো তা যদি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হতো তাহলে সেই মহান সুবেদারের প্রতি সত্যিকার ভাবেই শ্রদ্ধা জানানো হতো।

যা হোক যতদিন ঢাকা নগরী পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে, ততদিনই তার নাম ঢাকাবাসীর মনে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেননা তাঁর আমলে ঢাকা সমৃদ্ধির চরম শিখরে উঠেছিলো, আর যিনি দেশের জনগণের জন্যে আশীর্বাদ বয়ে এনেছিলেন সেই মহান সুবেদার আমীর-উল-উমরাহ নওয়াব শায়েস্তা খাঁনের প্রতি বর্ষিত হোক আল্লার অশেষ করুণা।

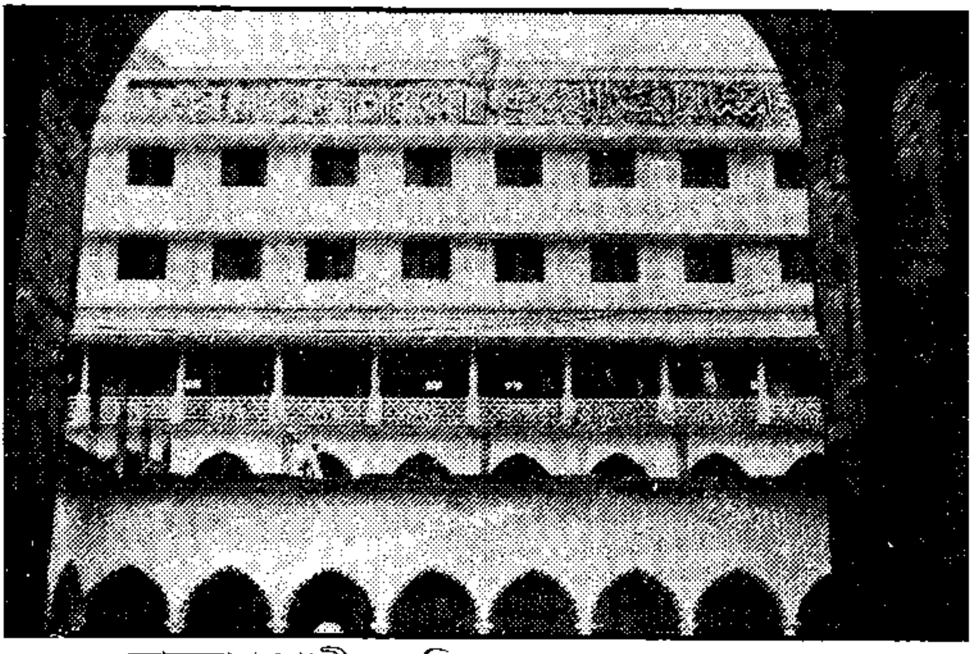


শায়েস্তা খাঁন কল্যাণকেন্দ্রের বর্তমান দৃশ্য

এই রোডে খুব বেশি জন বসতি নেই কেননা রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে লালবাগ দুর্গের প্রাচীর, লালবাগ শাহী মসজিদ ও মাদ্রাসা জামেয়া ক্বোরআআনিয়া আরাবিয়া। এ মাদ্রাসা হতে প্রতি বছর বহু ধর্মজ্ঞান পিপাসী ছাত্র ধর্মীয় শিক্ষা ও তথ্য লাভ করে বাংলার আনাচে কানাচে ধর্মের অমর বাণী প্রচার করে চলেছে। বহু কাল হতেই আশে পাশের মহল্লার মসজিদগুলো এই শাহী মসজিদকেই অনুসরণ করে আসছে নানারূপ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে। শায়েস্তা খাঁন রোডস্থ লালবাগ শাহী মসজিদটি আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ-শানের পুত্র ফররুখ শিয়রের সুবেদারী আমলে এই বিরাট মসজিদটি নির্মিত হয়েছিলো। সে কালে এ মসজিদটির অভ্যন্তরস্থ শুধু মাত্র তিন কাতারেই এক সঙ্গে দেড় হাজার লোক নামাজ আদায় করতে পারতেন। এই মসজিদটির জন্যে ১৭১৭ সালে মুরশিদ কুলি খাঁ কিছু জমি ও মাসিক সাড়ে বাইশ টাকা মসজিদ রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এ মসজিদটি মোগল শিল্পের ঐতিহ্যমণ্ডিত করে তৈরি না হয়ে সাদাসিদে আঙ্গিকে তৈরি হয়েছিলো। সুবেদার মসজিদের নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করতে পারেন নি। তজ্জন্য মসজিদের ছাদ কাঠ দিয়ে তৈরি ছিলো। ১৮৭০ সালে নবাব স্যার আব্দুল গনি তার ওয়াকফ তহবিল হইতে বহু অর্থ ব্যয় করে ছাদটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মসজিদের মিনারটি অবশ্য পরে তৈরি করা হয়। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলে পুনরায় মসজিদটি সম্প্রসারিত করা হয়েছে, সেই সঙ্গে মিনারটিকেও ভেঙ্গে

নতুনকরে সু-উচ্চ ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত মিনার করা হয়েছে।

মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ মৌলানা শামসুল হক সাহেব খুব সৎ সাহসী আলেম ছিলেন। অনেক সময় সরকারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার মতানৈক্য হতো। কিন্তু তার সিদ্ধান্তে তিনি অটল থাকতেন। এরূপ একবার ঈদের চাঁদ দেখা নিয়ে মতানৈক্য হওয়ায় ঢাকা শহরে প্রায় মহল্লাতেই দুই দিন ঈদের জামাত হয়েছিলো। তিনি ধর্ম বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করে গেছেন। সে সব গ্রন্থ ধর্মপ্রাণ মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেবে। তিনি বড় কাটরায় আশ্রাফুল উলুম মাদ্রাসার ও সদরে মোহতামেম ছিলেন। তাছাড়া এ মাদ্রাসার জন্য মৌলানা আঃ রহমান বেখুদ, মৌলানা হেদায়েত উল্লাহ, মুফতি মৌলানা আব্দুল ময়েজ যথেষ্ট পরিশ্রম করে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।



লালবাগ শাহী মসজিদের অভ্যন্তরে জামেয়া কোরানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার দৃশ্য

মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিদর্শনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি, গভর্ণর, মন্ত্রী পরিষদ সদস্য বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের বহু নেতৃ স্থানীয় আলেম ও রাষ্ট্রদূতগণ আগমণ করেছেন। কেহ কেহ অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতাও করেছেন। এক কথায় বাংলাদেশের বৃহত্তম মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এখানে উল্লেখ থাকতে পারে যে, কোম্পানী আমলে ইসলামী উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন সরকারী বিদ্যালয় ছিলো না। শেষ অধ্যাপক হিসেবে মৌলভী আসাদুল্লাহ মুঘল সরকার থেকে ষাট

টাকা বেতন নিয়ে লালবাগ শাহী মসজিদে একটি বিদ্যালয় বসাতো, তাতে আরবী ভাষা, যুক্তি শাস্ত্র, সাধারণ দর্শন শাস্ত্র ও আইন সম্পর্কে শিক্ষাদান করতেন। ১৭৫০ সালের দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। তারপর আর কোন সরকারী শিক্ষক লালবাগ শাহী মসজিদ বা মাদ্রাসায় নিযুক্ত হয়নি।

মসজিদের বহিপ্রাঙ্গনে যাঁরা সমাহিত আছেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা শহরের প্রখ্যাত আলেম মুফতি মৌলানা দীন মহম্মদ খাঁন ঢাকার আদি বাসিন্দা হলেও তিনি রেঙ্গুনে চলে যান। সেখানকার ধর্মভীরু মুসলমানদের অনুরোধে শহরের একটি বৃহৎ মসজিদে নিয়মিত ক্বোরআনের তফসীর আরম্ভ করেন। তার তফসীরের গুণগান, তফসীরের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের খবর ঢাকা শহরে আসতে থাকে। যতই খবর আসতে থাকে ঢাকার লোক মৌলানা দীন মহম্মদের প্রতি তার অনুপস্থিতিতেই শ্রদ্ধাশীল হতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শত্রুপক্ষ কর্তৃক বার্মা আক্রান্ত হলে রেঙ্গুন শহরে ব্যাপক বোমা বর্ষণ হয়। ফলে বিদেশীসহ বর্মী লোকজনও বাংলা তথা ভারত বর্ষে আশ্রয় লাভের জন্য আগমণ করে। সেই সময়ে মৌলানা মুফতি দীন মহম্মদ খাঁনও ধন সম্পদ বিসর্জন দিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। এবং মৌলভী বাজারের অতি নিকটে ব্যবসা ও বসবাস করতে থাকেন। ঢাকার লোক তাঁর ওয়াজ বিশেষ করে রেঙ্গুনের তফসীরের সাফল্যতা সম্পর্কে খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন। অবশেষে ঢাকাবাসী ধর্মভীরু মুসলমানদের অনুরোধে তিনি চকবাজারের শাহী মসজিদে প্রতিদিন এশার নামাজ শেষে ক্বোরআন পাকের তফসীর আরম্ভ করেন। তখন ঢাকায় তফসীরের খুব বেশী প্রচলন ছিলো না। কোন কোন মসজিদে বিভিন্ন আলেম জুমাহ্‌র দিন তফসীর করতেন। মৌলানা দীন মহম্মদের বলার ভংগী, যুক্তি ও আধুনিক চালচলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্বোরআনের তফসীর তার নিজ ভংগিমায় প্রকাশ করতে লাগলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। তফসীরের প্রতি ঢাকাবাসী মুসলমানদের আকর্ষণ বাড়তে লাগলো। এমনকি পর্দানশীন মহিলা-যুবতীগণ ও আল্লাহর কালামের মর্মবাণী নিজ ভাষায় জানার আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। ফলে তফসীর কমিটি মসজিদের পিছনের বাড়ীতে মহিলা শ্রোতাদের জন্য তফসীর শ্রবণের ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে পুরুষ এর দলকে মসজিদের সীমানা অতিক্রম করে চকবাজারের প্রধান রাস্তাগুলোতে বসতে হতো। সে সময় মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঢাকায় বেধে যেতো বলে ঢাকার পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ নবাব বাড়ী প্রাঙ্গনে চকবাজার হতে মাইক্রোফেনের ইলেক্ট্রিক লাইন নিয়ে সেখানে বসে শোনার ব্যবস্থা করেন। তার তফসীর ঢাকাবাসীকে প্রবলভাবে

আকৃষ্ট করে। আইন, থানা-পুলিশ এতদিন যা পারে নি, মৌলানার মুখে ক্বোরআনের শ্বাশত বাণী নিজ মাতৃ ভাষায় শুনে তড়িৎ গতিতে নিজেদের চরিত্র বদলে ফেললো। সৎ ব্যবসায় আকৃষ্ট হলো অনেকেই। ওজন যারা কম দিতো তারা তাদের পাল্লা-বাটখারা বদলিয়ে ফেললো। মদখোর, দুর্নীতিবাজ, জুয়ারী অনেকাংশে কমে গেলো অনেক তরুণ যুবারা দাড়ি রাখা আরম্ভ করলো। সকাল বেলা ঢাকার বিভিন্ন কাজের বাংলা বা কারখানা, কলপারে, বৈঠকখানায় তথা বিভিন্ন আড্ডাখানায় যেখানে শুধু ঘোড় দৌড়ের আলোচনা হতো সেখানে গত রাত্রে মৌলানা সাহেব তফসীরে কি কি আলোচনা করলেন তা নিয়ে আলাপ হতো। একদিকে তিনি ঢাকার মুসলিম নারী পুরুষের হৃদয় জয় করে নিলেন এবং ঢাকার একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। তাঁর প্রতি ঢাকার অধিকাংশ মুসলমানদের শ্রদ্ধার সীমা-পরিসীমা ছিলোনা। ঢাকার জনগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আন্দোলন করে যে ঘোড় দৌড় বন্ধ করতে পারেনি তা তিনি শহরের লোকজন নিয়ে বিভিন্ন মহল্লায় যারা রেসের ঘোড়া রাখতেন তাদের কাছে গিয়ে সে ঘোড়া অন্যত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেন। আর এ ভাবেই একদিন সরকারও বাধ্য হলেন ঢাকার দীর্ঘ দিনের প্রচলিত ঘোড় দৌড় বন্ধ করতে। মুফতি দীন মহম্মদ গোরা মতবাদে বিশ্বাস করতেন না। আল্লাহ আর তাঁর প্রিয় রসুলের আদেশকে সামনে রেখে আধুনিক পৃথিবীর মানুষের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে যাচাই করে অত্যন্ত সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করে ফতোয়া দিতেন। তার ফতোয়াকে চ্যালেঞ্জ করার মত তখন সহজে কেহ এগিয়ে আসতো না। এভাবে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঢাকাবাসীর পরম শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বিশ্বাস, আর সম্মান নিয়ে ইহকাল ত্যাগ করে এই মসজিদের প্রাঙ্গনে শায়িত আছেন।

এখানে শায়িত আছেন, ডাঃ হাসান সোহরাওয়ার্দীর পিতা মেদিনীপুরের অভিজাত বংশোদ্ভূত মৌলভি ওবেদ উল্লাহ্ আল ওবেদী সোহরাওয়ার্দী তিনি হুগলি কলেজের আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্বেল সাহেবের প্রচেষ্টায় ১৮৭৪ সালে মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে মাদ্রাসার প্রথম সুপারিণ্টেনডেণ্ট নিযুক্ত হয়ে আসেন মৌলভী ওবেদী সাহেব। তিনি আরবী, ফার্সী ও ইংরেজি ভাষায় ভালো যোগ্যতা রাখতেন, বাংলা ও সংস্কৃতি ভাষাও জানতেন। ফার্সী ও উর্দুতে তিনি সেরা সাহিত্যিক ও অতুলনীয় কবি ছিলেন। তাঁর আরবী, ফার্সী বই অধিকাংশ মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। তিনি ঢাকা মাদ্রাসায় এ পদে দীর্ঘ এগার বৎসর ছিলেন। তিনি খুবই উদার ও চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও নওয়াব আব্দুল গণীর নিকট তাঁর খুব মর্যাদা

ছিলো। সমকালীন শাসকেরাও তাঁকে খুব সম্মান দেখাতেন ১৮৮৫ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি ইন্তেকাল করলে তাঁকে এই লালবাগ শাহী মসজিদের চত্বরে সমাহিত করা হয়। আরো শায়িত আছেন মসজিদের নিকটস্থ পোস্তার বিখ্যাত চামড়া ব্যবসায়ী এবং জনদরদী নাজির পাঞ্জাবী যিনি দানশীলতায় এলাকার মানুষের মন জয় করেছিলেন, ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি ১১৩ বৎসর বয়স্ক স্বনামধন্য পাঞ্চু খলিফা, মাওলানা আব্দুল হাই ফারিঙ্গি মাহিল্লির সাগরেদ মৌলানা নোমান এবং মৌলানা কেরামত আলী জৌন পুরীর খলিফা মৌলভি কুদরত উল্লাহ। এদের সবার জন্য রহমত কামনা করি পরম করুণাময়ের নিকট। রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে ১৮৫৭ সালে বর্তমান শায়েস্তা খাঁন কল্যাণ কেন্দ্রের নিকট কেল্লার দেশী সিপাহীদের সুবাদার আমীর হাবিব উল্লাহ খাঁন সস্ত্রীক বসবাস করতেন।

ঢাকার নামকরণের সঙ্গে সংযুক্ত ঐতিহাসিক ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নামানুসারে একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছে ঢাকেশ্বরী রোড, এ রোডের পাশেই রয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দির। ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নানারূপ প্রবাদ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে দক্ষ যজ্ঞের সতী যখন পতি নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহ ত্যাগ করেছিলেন তৎপর সে খবর পেয়ে মহাদেব এসে প্রাণহীন সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছিলেন, সে তাণ্ডব নৃত্য বন্ধ করার জন্যে বিষ্ণু তার চক্র দ্বারা সতীর দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। ফলে সতীর দেহ একান্নটি খণ্ডে ছিন্ন হয়ে যে যে স্থানে পড়েছিলো, সে স্থানগুলো এক একটি পীঠ স্থানে পরিণত হয়। উক্ত সতীদেহ ছিন্ন হয়ে কিরিটের জিল্লাদার ডাক অর্থাৎ উজ্জল গহনার অংশ বিশেষ এ স্থানে পতিত হলে এ স্থানের নাম হয় ঢাকা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবীটি ঢাকেশ্বরী নামে পরিচিত হন। ঢাকেশ্বরী কোন বিশেষ দেবতা বা দেবীর নাম নহে তিনি হলেন ঢাকার ঈশ্বরী, ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তথা ঢাকার দেব দেবীর সভানেত্রী, নগরের অভিভাবক।

অন্য একটি প্রবাদে আছে যে, মহারাজ মানসিং বিক্রম পুরাধিপতি বীরাগ্র গণ্য কেদার রায়কে পরাজিত করে গৃহ দেবী শিলাময়ীকে নিয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। পরে কর্মকারগণকে ঠিক ঐ মূর্তির অনুরূপ হিরন্ময় মূর্তি নির্মাণের জন্য নিয়োগ করেন। তাহারা যাতে কোন রূপে মূল্যবান দ্রব্য অপহরণ বা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে তজ্জন্য সর্বদা রক্ষীগণকে তত্ত্ব তালাশ নেয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। কর্মকারেরা শিলাময়ীর মত অন্য একটি প্রতিমা নির্মাণ কার্য যে দিবস শেষ করে, সে দিবস তারা রাজ সদনে উপস্থিত হয়ে বলেন মহারাজ আমরা একবার এই নব নির্মিত

দেবী মূর্তিকে পুকুর হতে স্নান করিয়ে আনতে ইচ্ছে পোষণ করি। রাজা তাদের কথায় স্বীকৃত হলে, নির্মাতারা অলক্ষ্যে তাদের নির্মিত মূর্তিটিকে দেবীর আসনোপরি রেখে যথার্থ দেবী মূর্তিকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসে। পরে উভয় মূর্তি একত্রে হলে কোনটা পূর্ব নির্মিত আর কোনটা নতুন নির্মিত কেউই তা সনাক্ত করতে পারলেন না। পরে কারিগররা এ রহস্য প্রকাশ করে দিলে রাজা মানসিংহ তাদের যথাযোগ্য পুরস্কার দান করে চাঁদ রায়ের দেবীকে ভারতের জয়পুরে নিয়ে যান। অপরটিকে ঢাকায় সংস্থাপিত করেন। উহাই ঢাকেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ।

কিন্তু এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান রয়েছে, কেননা হিন্দুদের কল্প কাহিনীতে এ মন্দিরের দেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বল্লাল সেন। ঐতিহাসিকদের মতে বিখ্যাত রাজপুত সেনা নায়ক মানসিংহ এ শহরে অবস্থানকালে সেটির নাকি সংস্কার করেছিলেন। মুসলমান আমলে এখানে বহু সংখ্যক মসজিদের মাঝে এ মন্দিরটি দেখে বড়ই প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়ে সংস্কার সাধন করেছিলেন।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে হিন্দু কল্প কাহিনীতে ব্রহ্মপুত্র নদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। একটা কাহিনীতে দেখা যায় তিনি আদি দেব ব্রহ্মার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিক্রমপুরের সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আদিসুরের পুত্র ছিলেন বল্লাল সেন। আদিসুরের পত্নীদের মধ্যে বল্লাল সেনের মাকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। এর পিছনে নাকি ছিলো দৈব নির্দেশ। রাজা তা বুঝতে পারেনি। তিনি এক সময় ক্রুদ্ধ হয়ে রাণীকে রাজ প্রসাদ থেকে বহিস্কার করে দেন। রাণী তখন গর্ভবতী, বল্লাল সেনই তার গর্ভে। রাণী রাজার বহিস্কারাদেশে উপায়ন্তর না দেখে ব্রহ্মপুত্রের পানিতে ঝাঁপ দেন। কিন্তু এই পূণ্য সলিলা নদ তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে ত্বরিত গতিতে এবং নিরাপদে অপর পারে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাঁকে দেবী দূর্গার কাছে সঁপে দেয়। নিকটেই বুড়িগঙ্গার তীরে ছিলো তাঁর গৃহ। সেখানে নদীর কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং দেবী দূর্গার রক্ষণাবেক্ষণে নবজাতকটি বড় হতে থাকে। বনে লালিত হয়েছিলো বলে তাঁর মাতা নাম রেখেছিলো বনলাল সেন। পরবর্তীতে বল্লাল নাম ধারণ করেন। সেখানে সে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং জ্ঞান গরিমায় শৌর্যে-বীর্যে অত্যাধিক বুৎপত্তি লাভ করে। একদিন সে বেড়াতে বেড়াতে তার রক্ষাকর্ত্রী দূর্গার মূর্তিটিকে জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় দেখতে পায়। পরম শ্রদ্ধাভরে সে সেখানে "ঢাকা ঈশ্বর" বা লুক্কায়িত দেবীর মন্দির নির্মাণ করে। সেই থেকে মন্দিরের নাম হয় "ঢাকেশ্বরী"।

তৎকালে এরূপ একটি মন্দিরের অস্তিত্ব থাকলেও পরবর্তীকালে এর কোন চিহ্ন

পাওয়া যায়না। হতে পারে সেই পুরাতন মন্দিরটির সংস্কার বা পুনঃ নির্মাণ করেছিলেন সেনাপতি মানসিংহ। তবে বর্তমান মন্দিরটির বয়স দুশো বছরের অধিক বলে জানা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক হিন্দু এজেন্ট বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন বলে জানা যায়। ঢাকেশ্বরী মন্দিরখানা পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে বর্তমান আকারে পরিণত হলেও তাঁর গঠন প্রণালী পর্যবেক্ষণ করে অনেকেই বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

মন্দিরের জলাশয় ও বিশ্রামাগারের পূর্ব পার্শ্বে সাধুদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কয়েকটি সমাধি রয়েছে। বহিরস্থ বাটীর পুকুরের পূর্ব পারের পাকা ঘাটে যাওয়ার ডান পাশে চারটি সুক্ষ্মাগ্র চূড়া বিশিষ্ট মন্দির রয়েছে। উহাতে শিব লিংগ প্রতিষ্ঠিত আছে। এ মন্দির বা দেউলের মধ্যে একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু হলো শিব লিংগ, যার উদ্দেশ্যে মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রাত্যাহিত জীবনে অর্ঘ নিবেদন করতেন।



চারটি সুক্ষ্মাগ্র চূড়া বিশিষ্ট ঢাকেশ্বরী মন্দির

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের শ্রী শ্রী দূর্গাদেবী বা দশ ভূজা মাতা স্বর্ণ নির্মিত বলে, উপমহাদেশে বিখ্যাত ছিলো। সম্ভবতঃ স্বর্ণ নির্মিত মূর্তি বলেই আকারে মাত্র এক ফুটের মত উচ্চ ছিলো। দেবী মাতার সিংহাসন কাঠের উপর রৌপ্য বসানো কারুকার্য্য খচিত ছিলো। ১৯৭৫ সালের ২৫শে নভেম্বর রাতের বেলায় কতিপয় মুখোস পরিহিত দুস্কৃতিকারী আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নাকি মন্দিরে প্রবেশ করে তৎকালিন সেবাইত অশিতপর বৃদ্ধ শ্রী হেমচন্দ্র চক্রবর্তী ও তৎপুত্রকে হাত পা

বেঁধে স্বর্ণ মূতিসহ অন্যান্য মূর্তি স্বর্ণালংকার এবং সিংহাসনের রৌপ্যের কারুকার্য্য খচিত অংশগুলি উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে মন্দিরটি শ্রী হীন হয়ে পড়ে। সরকার বহু চেষ্টা করেও নাকি লুণ্ঠিত মূর্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি উদ্ধার করতে পরেনি। তবে সরকারের পক্ষ হতে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত পুলিশ মোতায়েন ছিলো।

মূর্তি চুরি হওয়ার পর মূর্তির ফটো দিয়েই নিত্য সেবা পূজা চলতো, এতে ভক্তদের হৃদয় ব্যথিত হওয়ায় তারা ঢাকেশ্বরী মাতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন, এতে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, আইনজীবিসহ সকল স্তরের বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে বাংলা ১৩৭৮ সনে নানারূপ বাদ্যযন্ত্রসহ নগর পরিভ্রমণ করতঃ দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সহায়তায় যজ্ঞাদি ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকেশ্বরী মাতার নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৮ সালে ভাওয়ালের রাজাগণ বিশ বিঘা সম্পত্তি ঢাকেশ্বরী মায়ের নামে উৎসর্গ করেন। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের যে সব সম্পত্তি ছিল তা কিছু কাল যাবত নানারূপ দুর্লোভী কালো হস্তের ছোবলে পড়ে ক্রমশঃ বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে বলে জানা যায়। আরো জানা যায় এক শ্রেণীর স্বার্থন্বেষী হিন্দু মিথ্যা ও ভূয়া কাগজ পত্র বের করে দেবত্তর সম্পত্তি গ্রাসের উল্লাসে ব্যস্ত। এ সব কালো হস্তধারীদের দ্বারাই স্বর্ণ মূর্তি অন্তর্ধান হয়েছে কিনা কে জানে?

আজও চৈত্রের শেষ দিবসে বহু হিন্দু নর-নারীর আগমণ ঘটে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। আগমন ঘটে ১লা বৈশাখ, হিন্দু ব্যবসায়ীগণ নুতন হিসেবের খাতা নিয়ে আসে মায়ের মন্দিরে ব্যবসায়ের শুভ মহরৎ তথা সাফল্য কামনায়। তবে আগের দিনে চৈত্র মাসে এই ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসতো। বহু রং বেরং-এর দোকানে এ স্থান সরগরম হয়ে উঠতো। অগণন, পূণ্যার্থী এখানে এসে মন্দির দর্শন করে পূণ্য সঞ্চয় করে বাড়ি ফিরে যেতো। হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসী লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ ব্রহ্মার পদতলে আশ্রয় লাভ ও পাপ স্খালনের আশায় চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে ল্যাংগল বন্দে মিলিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করে চির মোক্ষ লাভ করতো, আর একই প্রেরণায় দেবী দুর্গার আর্শীবাদ লাভ কল্পে পূণ্যর্থীরা সারা দিন পিপিলীকার সারির মত বিভিন্ন পথ ধরে নানা দিক থেকে ত্রস্তপদে এগিয়ে আসতো ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দিকে। এটি ছিলো তাদের কাছে সারা বছরের সেরা পর্ব। বহু আশা বহু প্রত্যাশা নিয়ে ঘর থেকে বের হতো পূণ্যার্থীরা। চোখে মুখে ফুটে উঠতো তাদের প্রানের ব্যাকুলতা পাপ মোচন করে ফেলার ঐকান্তিক আগ্রহ। অবনত মস্তকে তারা ভগবানের ধ্যান করতে করতে নীরবে এগিয়ে চলতো মন্দিরের দিকে। কোন দিকে তাদের মন নেই–

আহার নিদ্রা পথের ক্লান্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই। মনে তাদের প্রবল বিশ্বাস সিদ্ধিলাভ হবেই। এই সব তীর্থ যাত্রী এক একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত, প্রতি দলে দশ থেকে বিশ জন। দলে সবাই স্ত্রী লোক। তাদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য এক একজন মাত্র পুরুষ। গ্রামের মুরুব্বী ধরনের লোক। বহু দূর-দূরান্ত থেকে এমনিভাবে দল বেঁধে আসতো তারা। অতি বৃদ্ধ, দুর্বল, লোলচর্ম ও বয়সের ভারে নূজ এ রকম বৃদ্ধারও সমাবেশ ঘটতো। মন্দিরের নিকটতম ও শহরের বিভিন্ন মহল্লা থেকে যুবকরা আসতো স্বেচ্ছা সেবক রূপে কাজ করার জন্য। দূরে নাগর দোলা বাদ্য ও নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদে অনেকে যোগদান করলেও পূণ্যার্থীর অধিকাংশই সেখানে যেতো না। তারা মন্দিরের দেবী মূর্তির কাছে গিয়ে পয়সা, ফল-মূল ও অর্ঘদান করতো একান্ত, নিবিষ্ট মনে স্ব স্ব আকুতি ও প্রার্থনা নিবেদন করতো এবং মাঝে মাঝে ওম ঢাকা ঈশ্বরী বলে প্রণাম জানাতো। আস্তে আস্তে দিন শেষ হলে তীর্থ যাত্রীরা গৃহাভিমুখে রওয়ানা দিতো।

এছাড়া এখানে দূর্গা পূজায় ভীড় হতো অনেক। এ সকল পূজোয় মহা উল্লাসে পাঠা বলি দেয়া হতো। এই দৃশ্য দেখার জন্য মুসলমান ছেলে-ছোকরারা মাঝে মাঝে যেতো। আজও এ সকল পূজো পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বহু হিন্দু ভারতে চলে যাওয়ায় তেমন আকর্ষণীয় হয়না। তেমন ভীড়ও হয়না। আর তেমন জাক জমকের মেলাও বসেনা। এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরের খ্যাতি দেশ-বিদেশে আজও অম্লান রয়েছে।

ঢাকেশ্বরী রোডের দক্ষিণ কোণে রয়েছে লালবাগ মহল্লাবাসীদের পঞ্চায়েত বাংলা। যা বর্তমানে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে আছে। ঝুলে আছে সাইনবোর্ড "লালবাগ সমাজ কল্যাণ সমিতি" নামে যা স্থাপিত হয়েছিলো ১৯৫৫ সালে মহল্লা সরদার ও আজিমপুর ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান (মরহুম) হাজী আঃ গনীর উদ্যোগে। তাকে এ ব্যাপারে যারা সক্রিয় সহায়তা করেছিলো এবং সমিতি পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো তাদের মধ্যে যাদের নাম স্মরণ আছে তাঁরা হলেন, মরহুম আব্দুল কুদ্দুস সরদার, মোঃ ইব্রাহিম, ডাঃ আইয়ুব, বোরহান উদ্দিন ও নিজাম উদ্দিন। এ সমিতির সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য পরবর্তীতে ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে জনাব হাজী আঃ গনী তমঘা-ই-খেদমত উপাধি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পেয়েছিলেন। সমিতি যখন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তখনও ছোট্ট লাইব্রেরীটিকে আগলিয়ে বসে থাকতেন জনাব নিজাম উদ্দিন। বয়সে প্রৌঢ় হলেও যুবকদের চেয়ে তার উৎসাহ ছিলো প্রচুর। তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মিটমিটে বাতির ন্যায় সমিতির

ঘরে বসে তিনি জ্ঞানের আলো বিকিরণের চেষ্টা করে গেছেন।

এ মহল্লার ছাতরীওয়ালা মসজিদের নিকট দিয়ে ৫০/৫৫ বছর পূর্বে ঢাকেশ্বরী মন্দির হতে প্রায় অর্ধ শতাধিক সন্যাসী ত্রিফলা ও বড় বড় চিমটা নিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে মিছিল করে যাচ্ছিল কামরাংগীর চর শ্মশান ঘাটে। মসজিদে তখন নামাজ হচ্ছিলো। এমতাবস্থায় মহল্লার লালমিয়া লাঠি হাতে একাই রুখে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত বাদ্য বাজনা বন্ধ করে তারা মসজিদ অতিক্রম করে যায়।

পাক আমলে যে বাড়িটি খরিদ করে সাবেক মন্ত্রী লুৎফর রহমান সাহেব বসবাস করতেন, সে বাড়িটি প্রথমে মুসলমানদের (টোকন মিয়াদের) থাকলেও বৃটিশযুগে শিলং হতে আগত ঈশ্বর মজুমদার, তৎপুত্র শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার ও প্রভাত চন্দ্র মজুমদার গং বসবাস করে গেছেন। তারাও খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। বর্তমান দৈনিক আজাদ পত্রিকা অফিসের জায়গাটি সেকালে পতিত ছিলো। এর দক্ষিণে এক সময় ছিলো একটি পুলিশ ফাঁড়ি এবং এর পাশেই ইংরেজদের কবর স্থান ছিলো। চতুর্দিকে দেওয়াল দ্বারা ঘেরা ছিলো-দক্ষিণের আজিমপুর রাস্তা পর্যন্ত।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটা বিরাট পুকুরের মতো ডিচ ছিলো। তাতে নবাবদের হাতীগুলোকে স্নান করানো হতো এবং হাতীর মলমূত্র ফেলা হতো। উল্লেখ থাকে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পশ্চিমে হাতীর রসদের গুদাম ছিলো এবং বর্তমান আজাদ অফিস সহ পার্শ্ববর্তী আরো কিছু এলাকায় নবাবদের হাতী রাখা হতো। পরবর্তীতে এ এলাকাটিকেও আমলা পাড়া নামে আখ্যায়িত করা হতো। ১৯০৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহ ডিচটি খনন করে একটি পুকুরে পরিণত করেন। পুকুরটি পুনরায় একটা মজা পুকুরে পরিণত হয়। এবং ধীরে ধীরে চতুর্দিক হতে ভরাট হতে থাকে। পুকুরটির দক্ষিণ দিকে গেণ্ডারীর চাষ করতো ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ভোমবলা ঠাকুর। বর্তমানে সেখানে বড় বড় দালান-কোঠা দেখা যায়। সেগুলোও বৃটিশ যুগে নির্মিত হয়েছে। এখানকার একটি বাড়িতে পাক আমলের প্রথম দিকে ফ্রেণ্ড সেণ্টার নামে একটি সংস্থা বিদেশী সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরিচালক ছিলেন বেশ কিছুদিন মিঃ আলবার্ট টুর্ক। তিনি পশ্চিম জার্মানীর অধিবাসী ছিলেন। তারা শহরের পশ্চিম এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সহায়তায় সমাজ কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড করতেন। তারা নেবারহুড কাউন্সিল নামে লালবাগ এলাকায় কতক সংস্থা গড়ে তোলেন। এ সংস্থাটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সরকারীভাবে সমাজ কল্যাণ কাউন্সিল গঠিত হওয়া পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। ফ্রেন্ডস সেণ্টারের নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশিষ্ট কর্মী মিঃ কেরামত আলী তালুকদার প্রথম পূর্ব পাকিস্তান এর সমাজ

কল্যাণ পরিষদের অর্গানাইজার পদে নিয়োজিত হন। বর্তমানে যেখানে সৈয়দ শাহ মসজিদ নামে একটি নূতন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার পাশেই যে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন রয়েছে সেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মহিষের থান অর্থাৎ মহিষ থাকার জায়গা ছিলো। এ মহিষগুলো সেই মজা পুকুরটিতে পড়ে থাকতো। মসজিদের পাশেই যে একটি পাকা কবর দেখা যায়, তখন সেটা কাঁচা টিলার মতো ছিলো। বৃটিশযুগে পি, ডব্লিউ, ডি প্রধান লেংলি সাহেব যখন এতদঞ্চলের উন্নয়ন কাজে হাত দেন তখন তার নির্দেশে এ মাজারটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। অন্যদিকে মহিষগুলোও যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করতো। এ সময় লেংলি সাহেবের একজন শ্রমিক মারা যান এবং মহিষগুলোরও ক্ষতি হতে থাকে। এ অবস্থা দেখে পার্শ্ববর্তী আর্মী ক্যাম্পের পাঞ্জাবী সৈন্যরা মাজারটিকে সম্মানের সাথে ইট দ্বারা ঘেরাও করে দেন। পরবর্তীতে সেটাকে পাকা করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণ মাজারটিকে "সৈয়দ শাহ্‌র মাজার" বলে থাকেন। তবে অনেকেই এ নামের সাথে একমত নন। মজা পুকুরটি ঢাকা পৌরসভা আবর্জনা ও মাটি ফেলে স্থানটিকে একটি মাঠে পরিণত করেছে। মাঠটির পশ্চিম দিকের জমিটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলার মুসলমানদের নেতা, নির্ভীক সাংবাদিক, দৈনিক আজাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাওলানা মোঃ আকরাম খাঁ সরকার হতে ৯৯ বছরের জন্য লীজ নিয়ে বাসভবন ও দৈনিক আজাদ প্রকাশনার উদ্দেশ্যে আজাদ প্রেস প্রতিষ্ঠিত করেন। কতকদিন পূর্বেও দৈনিক আজাদ এখান থেকেই প্রকাশিত হতো। তবে মৌলানা আকরাম খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পর পারিবারিক বিরোধ দেখা দেওয়ায় অর্থনৈতিক কারণে মাঝে মাঝে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ থাকে। দৈনিক আজাদ এক সময় বাংলার অবহেলিত ও ঘুমন্ত মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে প্রভাব ও প্রধান ভূমিকা পালন করে গেছেন। মাসিক মোহম্মদিও এখান হতেই প্রকাশিত হতো।

১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর প্রাতঃকালীন সকল নীরবতা নিস্তব্ধতা ভংগ করে যখন কলিকাতা শহরের অলিগলিতে হকারদের হাঁক ডাকে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা চমকিত হলো "দৈনিক আজাদ" নামে একটি পত্রিকার প্রকাশ দেখে। বাংলায় ভীষণ প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে একটি মুসলিম দৈনিক পত্রিকা সংযোজন হওয়ায় সেদিন বাংলা ও আসামের মুসলমান সমাজ সত্যি আনন্দিত ও উৎফুল্লিত হয়েছিলো। প্রকাশনার পর হতেই মুসলিম জাগরণের ঝাণ্ডা নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো। প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা আনন্দ বাজার, যুগান্তর আরও অন্যান্য হিন্দু প্রভাবিত পত্রিকাগুলোর সমালোচনা উপেক্ষা করে অকুতোভয়ে মুসলিম জাতির সকল ন্যায় ও

দাবী দাওয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে লাগলো দিনের পর দিন। অন্যদিকে পশ্চাদপদ ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে "দৈনিক আজাদ" স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসকদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, হিন্দু কট্টর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, তথা কথিত মুসলিম বুদ্ধিজীবী হিন্দু ঘেষা ও তাদের তল্পি বাহকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ভারতের বিশেষ করে বাংলা আসামের মুসলমানদের সার্বিক আজাদির প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলো। এক কথায় ভারতের মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলনের অগ্রপথিক ছিলো তৎকালীন ভারতের একমাত্র "দৈনিক আজাদ"। মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, কুসংস্কার, সকল ক্ষেত্রে আজাদী হাসিলের জন্যেই "দৈনিক আজাদ" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর সেই উদ্দেশ্যকে সফল করে তার "আজাদ" নামকে সার্থক করেছিলো। পরবর্তী দিনগুলোতে স্বাধিকার আন্দোলনে "দৈনিকে আজাদ" অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছিলো।

আজাদ তার ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে ছাত্র শিক্ষকসহ আপামর জনগণকে দেশের আজাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, প্যান ইসলামী ধ্যান ধারণার গুরুত্ব প্রকাশ করে ধর্মীয় বন্ধন ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলো। পরবর্তীতে মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জোরালো ভাষাতে মুসলিম জনগণের কাছে তুলে ধরে ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ করে বাংলা আসাম প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের গমণ সহজতর করেছিলো যার ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ১১৯ আসনের মধ্যে ১১৩টি আসামের ৩৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩১টি আসন বিপুল ভোটাধিক্যে অধিকার করেছিলো। এর প্রতিক্রিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রতিফলিত হয়েছিলো। আর সে কারণেই ভারতীয় আইন পরিষদের ৩০টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩০টি আসনই অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলো। এসবের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান আন্দোলন আরো জোরদার হয়েছিলো। ভারতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্রে কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের একটানা বিজয়কে আকর্ষণীয়ভাবে প্রচার করে মুসলিম তরুণ যুবকদের মনে এক নুতন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলো দৈনিক আজাদ।

সাম্প্রদায়িক দাংগা পীড়িত অঞ্চলের মুসলমানদের দুঃখ দৈন্য প্রকাশ করে অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের মনে ভ্রাতৃত্ববোধ সঞ্চার করে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছিল, অন্যদিকে সংখ্যা লঘিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোর মুসলমানদের বীরত্বপূর্ণ আত্ম রক্ষার ঘটনাবলী প্রকাশ করে আশাহত মুসলমানদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলো। এমনি একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছিনা। ঢাকায়

সব চেয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম বসতি ছিলো মাত্র দুটি। একটি আমলীগোলা আরেকটি কাগজীটোলা। ঢাকার অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানরা সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতেন, এদুটো মহল্লার মুসলমানরা হয়তো আর নেই। সত্যি এবসতি দুটি খুবই অসুবিধার মধ্যে পতিত ছিলো, চতুর্দিকে ঘেরা বিশাল হিন্দু বসতি। আমলীগোলার মুসলিম পুরুষদের সংখ্যা ১৪ বছর থেকে একেবারে বৃদ্ধ পর্যন্ত সংখ্যা ছিলো মাত্র ১৭৬ জন, অপর দিকে প্রায় ১২/১৪ হাজার হিন্দু অধিবাসীর বসবাস মহল্লাটির তিন দিকে। দক্ষিণ দিকে নদী। এখানকার মুসলমানরা ছিলো অশিক্ষিত ও গরীব ঘর শতকরা ৯৫% কাঁচা। অন্যদিকে শতকরা ৯০%টা বাড়ী হিন্দুদের ছিলো প্যাকা দোতলা ভবন। তাদের দোতলা ভবন থেকে ইট পাথর মারা আরম্ভ করলে আমলীগোলার মুসলমানদের বাড়ী থেকে বের হওয়াই দায় হয়ে পড়তো। অবশেষে আমলীগোলার তরুণ-যুবা-প্রৌঢ়রা ঠিক করলো বাঁশ দিয়ে ধনুকের মত করে গুলাল বাঁশ তৈরি করে আর বাঁশ চিরে আগাটা চোখা করে তীরের মত করে সেগুলো ছুড়ে মারতে হবে দোতলা থেকে যারা ইট পাটকেল মারে তাদেরকে, যেমন কথা তেমন কাজ। সত্যিই যেদিন প্রতিপক্ষকে পিছু হটাতে পেরেছিলাম, আমরা গুটি কতক মুসলিম তরুণ, যুবা এবং প্রৌঢ়। তখন আমাদের আজাদ মুসলিম ক্লাবের নাম ছিলো "মাওলানা আকরাম খাঁ ক্লাব" পর দিবস প্রথম পাতায় ব্যানার হেডিং-এ প্রকাশিত হয়েছিলো "দৈনিক আজাদ"-এ আমলীগোলায় তীর ধনুকের যুদ্ধ শিরোনামে পূর্ব দিনের দাংগার খবর। অন্য মুসলিম মহল্লা থেকে "দৈনিক আজাদ" পেয়ে আমরা মহা খুশি আমাদের রক্তে যেন নুতন জোয়ার এলো। যারা বাড়ী বিক্রয় করে অন্য মুসলিম মহল্লায় যাবার মনস্থ করে ফেলেছিলো তাদের মনেও সাহসের সঞ্চার হলো নব উদ্যমে। সেদিনের আজাদের হেডিং শিরোনাম সত্যি আমাদেরকে অনেকদিন প্রতি পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলো। সে উদ্দীপনার রেশ ধরে আজাদ মুসলিম ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্যগণ আজ আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স নাম ধারণ করে জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশ ও দশের সেবায় নিজেদের উৎসর্গিত করে রেখেছে।

আজকের তরুণ যুবাগণ সে দৃশ্য দেখতে পায়নি। দেখতে পায়নি "দৈনিক আজাদ"-এর ভূমিকা। তাই আজ অনুভব করতে পারেনা সেদিনের মুসলিম সমাজের দুর্দশার কথা। আজ তারা নুতন যুগের মানুষ নিত্য নতুন লেখনী তাদের চাহিদা। তাদের সে চাহিদা মিটাবার জন্য আজ বাংলাদেশে বহু দৈনিক আত্মপ্রকাশ করেছে। নতুন নতুন চিন্তাধারায় কথা বলছে। লেখনী বের হচ্ছে। কিন্তু সেদিনের আজাদের

কথা আজ অর্ধ শতাব্দী পরও অনেকের মনে দাগ কেটে রেখেছে। তাইতো সেদিন "দৈনিক আজাদ"-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বহু খ্যাতনামা সকল মত ও পথের বুদ্ধিজীবিগণ তাদের মূল্যবান নিবন্ধে "দৈনিক আজাদ"-এর ভূমিকা নিজস্ব আঙ্গিকে লিখেছেন।

কিন্তু আজ আর আজাদের জায়গাটি সে অবস্থায় নেই। বর্তমানে আজাদের প্রকাশনায় যারা লিপ্ত তারা আজাদের জায়গাটি অন্যদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছেন। দেখা যায় অতি সামান্য জায়গাই তাদের দখলে আছে। অন্য স্থান থেকে মিট মিট করে আজাদ প্রকাশিত হতো-তাও এখন বন্ধ। কে জানে এ জলন্ত প্রদীপ একেবারে নিভে যাবে কিনা?

প্রখ্যাত আলেম, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব মৌলানা আকরাম খাঁ ১৮৬৮ সালে ২৪ পরগণার হাকিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ্ব গাজী মাওলানা আব্দুল বারী। আকরাম খাঁ স্যাহেব স্থানীয় মক্তবে বাল্য শিক্ষা শেষে কলিকাতা ও পাটনায় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। কলেরায় একই সঙ্গে মাতা-পিতা ইন্তেকাল ফরমাইলে মাতামহের আশ্রয়ে আসেন। তাঁর বংশ নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। কথিত আছে, বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের পিঠাভোগ এলাকার রায় চৌধুরী বংশের পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে রবি ঠাকুরের যেরূপ রক্ত সম্পর্ক, মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবেরও ঠিক ততটুকু। এ সম্পর্কে বিভাগ পূর্বে কলিকাতার একটি পত্রিকায় বলা হয়েছিল এ দু'জন একই বংশোদ্ভূত। কিন্তু অনেকের মতে তা ঠিক নহে। অন্যদিকে ঐ এলাকার অনেকেই মাওলানা আকরাম খাঁকে পীরালী বংশের কৃতি সন্তান বলে জেনে এসেছেন। তাঁর আত্মীয় স্বজনরা পীরালী খাঁ বলে পরিচিত।

পীরালী বংশের পরিচয় পাওয়া যায় খান জাহান আলীর নিকট এক ব্রাহ্মণ ইসলাম ধর্ম কবুল করে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে তার নাম হয় মঃ তাহের তিনি স্বনাম ধন্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হন। তার পূর্ণ নাম হয় পীর আলী মহম্মদ তাহের। তিনি অনেককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। মঃ তাহের খান জাহানের প্রিয় পাত্র ও আমাত্য ছিলেন। পরবর্তীতে তার মন্ত্রী ও বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন। এ ব্রাহ্মণ বংশই তুর্ক আফগান আমলে সম্মানসূচক উপাধি রায় চৌধুরী লাভ করেন। কিন্তু মাওলানা আকরাম খাঁ তার বংশ পীরালী নয় বলে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন গৌড়ের সুলতান যদু বা জালাল উদ্দিনের সময় হতে তারা মুসলমান এবং জনৈক আলী খানের বংশধর। ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব বলেছেন, "সমস্ত রায় চৌধুরীগণ খান চৌধুরীতে পরিণত হয়"। মাওলানা সাহেবের বংশ কিন্তু খাঁন

চৌধুরী নহে, শুধু খাঁ উপাধিধারী।

১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নবাব সলিমুল্লাহ আয়োজিত সর্ব ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে মাওলানা আকরাম খাঁকে প্রথম রাজনৈতিক চেতনায় অবিষ্ট হতে দেখা যায়। এর পূর্বে বঙ্গ ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ নিলেও পর বছরই তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এবং আজীবন মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ নেতা ছিলেন। বহু বছর তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। অবশ্য তিনি ইতিপূর্বে ক্যালকাটা মোহামেডান ইউনিয়নের মতো প্রতিষ্ঠানে এবং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে গেছেন। এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়। তিনি কলিকাতা অবস্থান কাল থেকেই নানা পত্র-পত্রিকা প্রতিষ্ঠা, সম্পাদনা করে গেছেন। ঢাকায় আগমণ করেও তিনি সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনৈতিক অঙ্গনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। সাংবাদিক রূপে মাওলানার আত্মপ্রকাশ ১৯০৩ সালে মাসিক মোহম্মদীর সম্পাদক রূপে। পরে আল ইসলাম, উর্দূ দৈনিক জামানা, এবং বাংলায় সেবক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেবক পত্রিকায় মতামতের জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে তিনি শুধু দৈনিক আজাদ প্রকাশই করেননি তাদ্বারা তিনি বাংলার তথা সারা ভারতের ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেন, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে আজাদীর নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তারই ফলশ্রুতিতে বলা যেতে পারে বৃটিশ ভারতের বুকে মুসলিম রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা কালটা ছিলো বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কাল। ওহাবী ফরায়েজী আন্দোলনের অগ্নিশিখা নির্বাপিত হলেও কুসংস্কার বিরোধী ভূমিকা অনেকের চিত্তে স্থায়ী আঁচড় কেটে যায়। এ চিত্তের অধিকারীদের মধ্যে মৌলানা আকরাম খাঁ ছিলেন অন্যতম। মাওলানা শিক্ষা জীবনে প্রাচীন পন্থী ধর্ম শিক্ষার অধিকারী হলেও উত্তর জীবনে তিনি মোহাম্মদী বা আহলে হাদীস রূপে নিজেকে পরিচিত করেছেন। তাই দেখা যায় ইংরেজ শাসন বিরোধী মনোভাব তাঁর মধ্যে অল্প বয়সে জেগেছিলো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে তিনি বঙ্গ বিভাগের বিরোধীতা করে কিছুকালের জন্যে সোহরাওয়ার্দী শরৎবসুর যুক্ত বাংলার পরিকল্পনা সমর্থন করেছিলেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই অধিকাংশ মুসলিম লীগ নেতার সঙ্গে এক মত হয়ে সে সমর্থন প্রত্যাহার করেন। এবং কিছু দেরীতে হলেও স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য ঢাকায় আগমণ করেন। এবং ঢাকেশ্বরী রোডস্থিত বর্তমান স্থানটি সরকার হতে বন্দোবস্ত

নিয়ে বাস স্থান ও প্রেস স্থাপন করে মাসিক মোহম্মদী ও দৈনিক আজাদ প্রকাশ করেন। তিনি জীবনে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। তন্মধ্যে মোস্তফা চরিত্র ও পাক ক্বোরআনের বঙ্গানুবাদ অন্যতম। ধর্ম বিষয়ে তিনি মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বাস্তব বুদ্ধি দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন। তজ্জন্য প্রাচীন পন্থী তথা সমাজের গোড়া আলেমদের সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ ছিলো। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো লোকহিত প্রগতির পক্ষে।

মাওলানা আকরাম খাঁর বৈচিত্রময় ও বহুমূখী জীবনকাহিনী লিখতে বেশ কয়েকটি বই রচনা করা যাবে। আমাদের এ পরিসরে তার কথা বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। তাই সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতে গেলে শুধু এটাই বলা যায় যে তিনি শতাব্দীর এক উজ্জ্বল সূর্য ছিলেন। অবিভক্ত ভারতের মুসলিম জাগরণের পুরোধা ছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনই ছিলো ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ন্যায়ের সংগ্রামে এক জীবন্ত ইতিহাস। এহেন ব্যক্তির নামে ঢাকায় আজও কোন রাস্তার, কোন মিলনায়তন বা সামাজিক, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নামকরণ করা হয়নি। হয়েছে কত আথ্‌খু খা নাথ্‌থু খার নামে। বৃটিশ যুগের শেষ লগ্নে আমাদের আমলীগোলার আজাদ মুসলিম ক্লাবের গোড়া পত্তনেও একটা যোগাযোগ ছিলো। প্রথম দিকে মুসলিম এসোসিয়েশন এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল মৌলানা আকরাম খাঁ ক্লাব। কিছু দিন অতিবাহিত হবার পর ১৯৪৫ সালে আজাদ মুসলিম ক্লাব নামকরণ করা হয়। এই ঐতিহ্যবাহী আজাদ মুসলিম ক্লাব দীর্ঘ ৪০ বছর পর পুনরায় নাম পরিবর্তন হয়ে "আজাদ মুসলিম ওয়েল ফেয়ার কমপ্লেক্স-বাংলাদেশ" নাম ধারণ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানে মাওলানার শুভ পদার্পন হয়েছিলো। সদস্যরা ক্লাবের পূর্ববর্তী নাম ও উপরোক্ত কারণে আজও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ঢাকেশ্বরী রোডের মধ্যভাগে পূর্ব দিকে রয়েছে চীনা মাটি ইটের তৈরি সুন্দর ঐতিহাসিক হাজী বেগের মসজিদ। হাজী বেগ শাহ আলমগীরের মুনসেফদার ছিলেন। তিনি ঢাকায় আগমণ করে এ মসজিদটি নির্মাণ করে ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় ১১০৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মসজিদের উত্তর পূর্ব দিকে তাঁর কবর রয়েছে। মসজিদের আশে পাশে বেশ কিছু জমিজমা রেখে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মসজিদটি বিরানে পরিণত হয়। আশ পাশ জংগলাকীর্ণ বাঁশ ঝোপে পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে। মসজিদের পাশে একটি পুকুরও ছিলো। মসজিদের শিলালিপি অদ্যাবধি পাঠোদ্ধার হয়নি বিধায় মসজিদের নির্মাণ কাল এবং কার অর্থে ও প্রচেষ্টায় মসজিদ নির্মিত হয়েছে তা জানা যায়নি। এর উত্তরাংশকে সাধারণতঃ

পলাশী ব্যারাক নামে অভিহিত করা হয়। এখানে রয়েছে ছোট্ট একটি বাজার। এ বাজারের নিকটেই ছিল পলাশী রেইল গেইট। রেল গেটের আজ কোন চিহ্ন না থাকলেও অনেকেই ঐ চৌরাস্তাটিকে এখনও পলাশী রেল গেট নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। বহু ঘটনা দুর্ঘটনার সাক্ষী এ রেল গেট।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন সরকারী কর্মচারীগণ এখানে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন তখনও এ এলাকা জমজমাট, খাওয়া দাওয়ার কত হোটেল এখানে হয়েছিলো যা অনেক দিন পর্যন্ত ছিলো। তখন হতেই পলাশীর নাম ঢাকা নগরবাসীর কাছে একটি অতি পরিচিত নাম।

পলাশীর নাম নিয়েও ঢাকাবাসীর মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ ধারণা করেন, এখানে বৃটিশ সৈন্যদের ছাউনী ছিলো। বৃটিশ যুগের আগমণ কাল হতে পলাশীর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী সৈন্যগণ যুদ্ধের আগে বা পরে এসব ব্যারাকে অবস্থান করতো। তজ্জন্যই এ ব্যারাকের নাম হয়েছে পলাশী ব্যারাক। ধারণা হয়তো ঠিক নয় ১৯০৩ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠনের পর বৃটিশ সরকার যখন কিছুতেই ঐ অস্ত্রগার লুণ্ঠনে জড়িত সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতে পারছিলো না তখন ১৯৩৩ সালে তাদের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে একদল গোরা সৈন্য ঢাকায় মোতায়েন করে। তাদের জন্য এ স্থানে একটি ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছিলো এবং এ ব্যারাকের নাম দেওয়া হয়েছিলো ইংরেজদের প্রথম বিজয়ের স্মৃতি স্থানের নামকরণে পলাশী ব্যারাক। ১৯৩৪ সালেও ঐ সব সৈন্যদল পলাশী ব্যারাকেই ছিলো। সেই রেজিমেন্টের নাম ছিলো ডরসেট সায়ার রেজিমেন্ট।

পলাশী ব্যারাক অঞ্চলটি পূর্বে খোলা মাঠ ছিলো একে ঢাকাবাসী রিবুল ময়দান নামে অভিহিত করতো। পরে সেখানে উপরোক্ত ব্যারাক তৈরি হয়। এসব ব্যারাকে পরবর্তীতে পাঠান ও পাঞ্জাবী সৈন্য অবস্থান করতো। এই পলাশীতেই চড়ক গাছ ছিলো। যাতে চড়ক পূজার সময় মানুষের পৃষ্ঠ ছেদন করে চড়কগাছে ঘুড়ানো হতো। বৃটিশ সরকার এ অমানবিক সুলভ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন।

বাংলাদেশের প্রধান বিদ্যাপিঠ হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে খ্যাতনামা প্রফেসারদের লোভনীয় বেতন এবং অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আনা হয়েছিলো। এই ক্যাম্পাসের মধ্যে একটি শিখ গুরুদ্বারা রয়েছে যা গুরু নানক দুয়ারী নামে পরিচিত। বৃটিশ আমলে ঢাকায় বেশ কিছু শিখ বসবাস করতো। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ এলাকাই ইংরেজ আগমণ যুগের নীলক্ষেত এলাকার

মধ্যে। নীলক্ষেত নামকরণ হয়, নীলচাষের স্থান হতে। আমাদের দেশে যে সকল জমিতে চাষাবাদ হয় তাকে সাধারণভাবে বলা হয় ক্ষেত। এটা বহু পূর্বকাল হতে। বৃটিশরা এদেশে আসার পর হতে ইউরোপিয়ানরা নীলের চাষ বিভিন্ন স্থানে আরম্ভ করে। ঢাকার নীলক্ষেত এলাকার বিরাট প্রান্তর জুড়ে দীর্ঘকাল ধরে নীলের চাষ করা হতো। আর এখানে প্রচুর নীল উৎপন্নও হতো। নীল উৎপন্ন হতো বলেই পুরো এলাকাটা নীলক্ষেত নামে পরিচিত হয়ে যায়। এলাকার অনেকাংশ আজও নীল ক্ষেত নামই ধারণ করে আছে। অবশ্য নীলকরদের কুঠি ছিলো বুড়িগঙ্গার ধারে। নীল করদের অধিকাংশের কুঠির মালিক ছিলো ইউরোপিয়ানগণ। ১৮৪০ সালে জেমসটেলর লিখেছেন, তখন ঢাকায় ৩৭টি নীলের ফ্যাক্টরী ছিলো। নীলকরদের কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে দীনবন্ধু মিত্রের "নীল দর্পণ" নাটকটি ঢাকা শহরেই ছাপা হয় এবং ঢাকাতেই প্রথম অভিনীত হয়। পরবর্তীতে এই নীলক্ষেত এলাকায় প্রতিষ্ঠা হয়েছে ঢাকা ইউনির্ভাসিটি, বহু ছাত্রাবাস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হল, অধ্যাপকদের বাসস্থান ইত্যাদি। নীলক্ষেত অঞ্চলে পূর্বে কোন বসতি ছিলো না।

এ এলাকার উত্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকার আন্তর্জাতিক ও সবচেয়ে অভিজাত হোটেল "সোনারগাঁও" আর এই হোটেলের নামানুসারেই ঢাকা পৌর করপোরেশন হোটেলের নিকট থেকে পুরাতন রেল সড়কের উপর যেখানে নতুন রাস্তা নির্মিত হয়েছে, যাহা পুরাতন হাতীর পুল, পলাশী রেলগেট, বখশী বাজার হয়ে ঢাকার পুরাতন রেল ষ্টেশন ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত এসেছে, সেই রাস্তাটি "সোনারগাঁও রোড" নামকরণ করেছে ১৯৮৩ সালে। বর্তমানে এ রোডটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোড। রাস্তার ধারে ছিন্নমূল মানুষরা যে বস্তী স্থাপন করেছিলো তা আজ সরিয়ে দিয়ে বিপণী কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। বিরাট দীর্ঘ এ রোডটিকে এক নামে নামকরণ না করে দুতিনটি নামে নামকরণ করা যেতো এদেশের অনেক মনীষী ও অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক অথবা বাংলার মুসলিম রেনেঁসার অগ্রদূতদের নামে।

যা হোক সোনারগাঁও হোটেলটির নামকরণ হয়েছে, বাংলার এক কালের রাজধানী ঐতিহাসিক সোনারগাঁও এর নামানুসারে। সোনারগাঁও এর ইতিহাস এখানে উল্লেখ না করে, শুধু সোনারগাঁও-এর নামকরণের কথাই বলবো। রাজা আদীশ্বরের আমলে সেখানকার বসবাসকারী বৈশ্যদের সম্মানার্থে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজা আদীশ্বর ঘোষণা দিলেন– "যারা সুবর্ণ ব্যবসায়ের দিকপাল আমি তাদের বণিক আখ্যা দিলাম"। সেই থেকে সে এলাকার নাম হলো "সুবর্ণ গাঁও" বা সুবর্ণ গ্রাম"। পরবর্তীতে সেটাই "সোনারগাঁও" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুবর্ণ গ্রাম

শ্মশানে পরিণত হয় রাজা বল্লাল সেনের আমলে। অথচ বল্লাল সেন ছিলেন সে যুগের রাজাদের মধ্যে অসাধারণ।

ঢাকা সোনারগাঁও রোডের যেখানে এলিফ্যান্ট রোড ও পরিবাগের সংযোগস্থল সেখানে একটি পুল ছিলো বহুকাল যাবৎ। আর পুলটি "হাতীর পুল" নামে পরিচিত ছিলো ঢাকাবাসীর কাছে। এ পুলের নীচ দিয়ে হাতী চলাচল করতো বলে পুলটি খুবই উচু ছিলো এবং হাতীর পুল নামেই পরিচিত ছিলো। তাছাড়া, হাতীর পুলের নামানুসারে হাতীর পুল বাজার এবং রাস্তাটি হাতীরপুল সড়ক বলে পরিচিত।

বাংলা বিভাগের পূর্বে পুলের অতি নিকটতম বাড়ীটায় থাকতেন– তৎকালীন বিশিষ্ট কবি মোহিত লাল মজুমদার আর হাতীরপুল বাজারের নিকটে থাকতেন বিশিষ্ট গায়ক বীরেন মুখার্জী। তিনি একাহারী ছিলেন অর্থাৎ সুর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একবার আহার করতেন।

সোনারগাঁও হোটেল থেকে সামান্য উত্তরে গেলেই ফার্মগেট। সর্বক্ষণ কোলাহল মুখরিত সেই বৃটিশ যুগের মতো কৃষি ও ডায়েরী ফার্ম না থাকলেও সেই ফার্মের প্রধান গেটকে আজও ফার্মগেট বলা হয়ে থাকে। ফার্মগেট এর নিকট পুরাতন এয়ারপোর্ট রোডের সংযোগস্থলে লোক পারাপারের সুবিধার্থে ওভার ব্রীজ তৈরি করা হয়েছে। বৃটিশ আমলে কৃষির উপর যেমন গবেষণা হতো তেমনি গবাদি পশুর সংরক্ষণ ও বহির্দেশের উন্নতমানের গবাদি পশুর সংমিশ্রন দ্বারা দেশীয় গবাদির উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানো হতো। বিরাট এলাকা জুড়ে ছিলো কৃষি ও ডায়েরী ফার্ম, ফলে পুরো এলাকাটি ঢাকাবাসীর নিকট ফার্ম এলাকা বলে পরিচিত ছিলো। বর্তমানে এই এলাকার অধিকাংশ শেরে বাংলা নগর ও সংসদ ভবনের অন্তর্ভুক্ত। সরকারীভাবে ডায়েরী ফার্ম সাভারে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই ফার্ম সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়নি। শহীদ জিয়ার মাজারের সন্নিকটে এখনও উন্নতমানের গবাদিপশু প্রতিপালন করতে দেখা যায়। ফার্মগেট থেকে সংসদ এভিনিউ ও মানিক মিয়া এভিনিউ-এর সংযোগস্থল পর্যন্ত রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে "কৃষি খামার সড়ক" এখানকার কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও অন্যান্য কৃষি সংক্রান্ত অফিসগুলো সেই পুরনো দিনের ফার্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় পথচারীকে। এ ফার্মের দুগ্ধ খাঁটি বলে ঢাকাবাসী একবাক্যে স্বীকার করতো, শহরের বিভিন্ন এলাকায় দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থাপনা ফার্ম কর্তৃপক্ষই করতো।

বর্তমান কৃষি খামার সড়কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল" প্রতিদিন শত শত চক্ষুরোগী এখান থেকে চিকিৎসা পাচ্ছে। হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা

করেছেন ইস্পাহানী গোত্র। ইস্পাহানী গোত্রের কতক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসে বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করেন। বেশ প্রভাব প্রতিপত্তির মধ্য দিয়েই তাদের সামাজিক ও বাণিজ্যিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। তারা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও অংশ নেন। যার ফলশ্রুতি এই হাসপাতাল।

কৃষি খামার সড়কের দক্ষিণ দিকে রয়েছে ইন্দিরা রোড। এ এলাকায় বেশ সংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তির বসবাস রয়েছে। মণিপুর মুরগী ফার্মের কর্তা ছিলেন দ্বিজদাস বাবু। তার বিরাট বাড়ী ছিলো বর্তমান ইন্দিরা রোডে। তার বড় মেয়ে ইন্দিরার অকাল মৃত্যু হলে বাড়ীতেই তার সমাধি নির্মাণ করা হয়। ফলে, এই ইন্দিরার নামানুসারে এলাকাটি ইন্দিরা রোড নামে পরিচিতি লাভ করে।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সাবেক চেয়ারম্যান কাজী বশির (মরহুম) এর বাড়ীখানা রোজগার্ডেন (গোলাপবাগ) নামে পরিচিত ছিলো। সম্প্রতি বাড়িটি সরকার পুরাকীর্তির আওতাধীনে আনার আদেশ দিয়েছেন। তাই তার বাড়ীর পেছনের অংশে বসতি গড়ে উঠলে সেটা গোলাপবাগ নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। রোজগার্ডেনে আজ পূর্বের মতো গোলাপের বাগান না থাকলেও বসতিটি গোলাপবাগ নামে আজও পরিচিত।

মানিকনগর এলাকাটি পূর্বে ছনটেক নামে অভিহিত হতো। এ এলাকায় বিরাট বিরাট বাঁধাকপি উৎপাদন হতো প্রচুর। কথিত হয়ে আসছে, এ ছনটেক এলাকার অধিবাসী তথা চাষাবাদিগণ অতি বড় বড় বাঁধাকপি বিক্রি করে অঢেল টাকা পয়সা উপার্জন করতো যার ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা তাদেরকে "মানিক" পেয়েছে বলে বলতো। এ থেকেই নাকি এলাকাটি মানিকনগর নামে পরিচিত হয়ে পড়ে।

মুগদার উত্তরের দিকটা পূর্বে ঠাকুরপাড়া বলে পরিচিত ছিলো। এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ঠাকুর পরিবারের বসবাস ছিলো বলেই সে নাম হয়েছিলো। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো সরকারী কর্মচারী। তারা এ এলাকায় অতি বড় বড় পুকুর খনন করেছিলো। এ এলাকায় একটি বাগিচা ছিলো যা রাধাশ্যামের বাগিচা বলে অভিহিত হতো। বাগিচাটি আয়তনে ৪০ বিঘা ছিলো। মুগদা নামটি কিভাবে হয়েছিলো তা এখনো হদিশ করতে পারিনি।

ডেমরা এলাকায় পাঠানটুলি নামে একটি গ্রাম রয়েছে। যেখানে পাঠান বংশধরগণ বসবাস করতেন। এসব পাঠানরা পূর্বেকার শাসকবর্গ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সনদের বলে অত্র এলাকায় ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

পাক আমলে জাতীয় সংসদ ভবন স্থাপিত হলেও সংসদের অধিবেশন এখানে অনুষ্ঠিত হয়নি, তবে সামরিক আইন জারীর প্রাক্কালে পাক সামরিক অফিসারগণ সংসদ ভবনের ও হোষ্টেলের বিভিন্ন কক্ষ অধিকার করে সেখানে নানা অপরাধে বা অপরাধের অভিযোগে অনেককে এখানে এনে বন্দী করে রাখতেন। তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ বা স্বীকারোক্তির জন্য নিপীড়ন, নির্যাতন করতেন। এই নিপীড়িতদের আর্তনাদ ঢাকাবাসী শুনতে পেতো না। পেতো শুধু পাশে অবস্থানকারী অন্যান্য অভিযোগে আটককৃত ব্যক্তি, পাক সেনা এবং আল্লাহ্ আলিমুল গায়েব। সেই আহাজারীর করুণ সুর এখনও এই সংসদ ভবনের প্রকোষ্ঠগুলোতে গুমরিয়ে মরছে।

বর্তমানে সংসদ ভবনটি সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বাংলাদেশে একটি আকর্ষণীয় স্থান। শত শত ব্যক্তি প্রতিদিন এর শোভা উপভোগ ও প্রাতঃকালে শরীর ও মনকে সুস্থ্য ও উৎফুল্ল রাখার জন্যে এখানে আসেন। ভবনের দক্ষিণ ও উত্তর প্লাজাও বেশ সুন্দর। পাশের নহরটি এ ভবনের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সংসদ ভবনের উত্তর পাশে রয়েছে নবম পদাতিক বাহিনীর প্রধান দফতর। এবং একটি কৃত্রিম ঝিল। এরই নিকটে রয়েছে সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়ার সমাধি সৌধ। এ সংসদ ভবনের নামানুসারে এলাকাটি সংসদ এভিনিউ নামকরণ হয়েছে।

নতুন ঢাকার সোবহানবাগ এলাকাটি বৃটিশ যুগে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত ছিলো। ঢাকায় ইসলামিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা সাবেক ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের ডেপুটি প্রশাসক জনাব জাহাঙ্গীর মোঃ আদেলের দাদা মৌলানা আবদুস সোবহান এ এলাকাটি খরিদ করে সেখানে একটি বাগান বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৯৮ সালে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় আগমণ করে আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং কুমারটুলিতে একটি মাদ্রাসা চালু করে সেখানেই একটি বাসগৃহ নির্মাণ করেন। শিক্ষকতার সাথে সাথে তিনি পুস্তক রচনাও আরম্ভ করেন। তাঁর রচিত "বাংলা দীনিয়াত শিক্ষা" বইটি তৎকালে সমগ্র বাংলা ও আসামে স্কুল-পাঠ্য হিসেবে প্রচলিত হয়। তাঁর পুস্তক বিক্রয়ের প্রথম লাইব্রেরীটি ছিল বর্তমান বংশীবাজার মসজিদের বিপরীত দিকস্থ একটি ভবনে। বর্তমানে অবশ্য সে ভবনে কাপড়ের মার্কেট হয়েছে। তৎকালে এ ইসলামিয়া লাইব্রেরীই ছিলো ঢাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান।

আজকের মস্ত বড় ও চমৎকার স্থাপত্যকর্ম সমৃদ্ধ সোবহানবাগ মসজিদটি একটি ছোট্ট মসজিদ আকারে মৌলানা আবদুস সোবহান সাহেবই নিজ অর্থে নির্মাণ

করেছিলেন। এর পাশেই একটি পুকুরও খনন করিয়েছিলেন। তখনকার সময়ে ঢাকা শহরে হাতে গোনা মাত্র কটি প্রাইভেট কার ছিলো। তন্মধ্যে সোবহান সাহেবের একটি লাল রং-এর কার ছিলো। তখন ঢাকাবাসী এসব কারকে হাওয়া গাড়ি বলতো। এই হাওয়া গাড়িতে চড়ে সোবহান সাহেব মাঝে মাঝে আসতেন ও তদারক করতেন। পরিবারের লোকজনও আসতো। মাছ ধরতো পুকুর থেকে। মাঝে মধ্যে বনভোজনও চলতো। পরবর্তীতে সরকার সোবহানবাগ এলাকার অধিকাংশ জমি হুকুম দখল করে নেন। তৎপর সোবহান সাহেবের বংশধর ও সরকারী বরাদ্দপ্রাপ্ত জমির মালিকগণ ধীরে ধীরে সেখানে দরদালান নির্মাণ করতে থাকেন। এদিকে সৌদি আরবের আর্থিক সাহায্যে কয়েক বছর আগে উপরোক্ত মসজিদটি নতুন আঙ্গীকে নির্মিত হয়। যেহেতু এলাকাটি বহুযুগ থেকে সোবহানবাগ হিসেবে পরিচিত সেহেতু অদ্যাবধি উক্ত অঞ্চলটি সোবহানবাগ নামই ধারণ করে আছে। মৌলানা আবদুস সোবহান সাহেব ১৯৪০ সালে পরলোকগমন করেন। মসজিদের উত্তর পাশে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে তিনি সমাহিত রয়েছেন।

ঢাকা পৌরকমিশনার মুনসী মুনীর হোসেন তথা মুনীর হোসেন বেপারীর নামে ১৯২২ সালে নারিন্দার উত্তর পার্শ্ব এলাকাটি মুনীর হোসেন লেন নামকরণ হয়। মুনীর হোসেন সাহেবের পুত্র মোজাফ্ফর হোসেন ওরফে চাঁনমিয়াও ঢাকা পৌর কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঢাকাবাসীর নিকট তিনি চাঁনমিয়া নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। কারণ তিনি ঢাকায় রেসকোর্স অর্থাৎ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার পূর্বভাস সম্বলিত একটি সাপ্তাহিক পুস্তিকা প্রকাশ করতেন বৃটিশ আমলের শেষ যুগ থেকেই। এ থেকে তার প্রচুর অর্থাগম হতো। বিভিন্ন হকাররা চাঁনমিয়া সাহেবের রেসটিপ বলে সারা ঢাকা শহর তোলপাড় করে বেড়াতো। সাপ্তাহিক শনিবারের পূর্ব পর্যন্ত। প্রতি শনিবার ঘোড়দৌড় হতো রমনা রেসকোর্স ময়দানে। এক কথায় চাঁনমিয়া সাহেব তার রেসটিপ পুস্তিকার জন্যই ঢাকার সকল সম্প্রদায়ের কাছে সবিশেষ পরিচিত লাভ করেছিলেন। এ পুস্তিকায় কোন্ প্রতিযোগিতায় কোন্ কোন্ ঘোড়া অর্থাৎ কার ঘোড়া অংশ নেবে, কোন্ জোকি বা ঘোড়াচালক কোন্ ঘোড়ায় বসবে, এসব কিছুরই বিস্তারিত বিবরণ থাকতো। তাছাড়া কোন বাজিতে কোন্ ঘোড়া জয়ী হতে পারে তারও কারণসহ পূর্বাভাস থাকতো। তখন ঢাকার গরীব মধ্যবিত্ত আর বিত্তশালীদের অধিকাংশই রেসের প্রতি আকৃষ্ট ছিলো। শনিবার দিনের আগমনটা ছিলো তাদের কাছে ঈদ সদৃশ।

মদন মোহন বসাক রোড এর মাঝামাঝি এলাকায় ধোলাই পাড়ে রাস্তার দুপাশে

পাশাপাশি দুটি পুল ছিলো। তজ্জন্য লোকে ওটাকে জোর পুল বলতো। আর এই পুলের নামানুসারে পার্শ্ববর্তী বসতিটি জোর পুল মহল্লা নামে ঢাকায় পরিচিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে লালমোহন সাহা ঢাকা পৌরসভায় সামান্য দানের বিনিময়ে রাস্তাটিকে "লালমোহন সাহা স্ট্রীট" নামকরণ করে নেয়।

সন্নিকটেই রয়েছে পাঁচভাই ঘাট লেন। মহল্লার লোকজনকে সামাজিক কথায় পাঁচজন বলা হয়ে থাকে। সেই মহল্লাবাসীর চাঁদায় একটি ঘাট তৈরি হয়েছিলো বিধায় সে ঘাটটিকে পাঁচভাই ঘাট লেন বলা হতো। আর সে ঘাটের নামানুসারে নিকটস্থ পথটি পাঁচভাই ঘাট নামে নামকরণ হয়। অন্য মতে মহল্লার এক পরিবারে পাঁচ ভাই ছিলেন। তাদের দানে ঘাটটি নির্মিত হওয়ায় ঘাটটির নাম পাঁচভাই ঘাট নামে অভিহিত হয়। আর সে নামে ঘাট সংলগ্ন বসতিটি পাঁচভাই ঘাট লেন নামে পৌরসভায় রেকর্ডভুক্ত হয়।

এর কিছু দূরেই রয়েছে গৌড়িয় মঠ। গৌড়িয় ধর্মের মূলমন্ত্র-অহিংসা পরম ধর্ম। শ্রী শ্রী চৈতন্যের অপর নাম গৌর। যেহেতু তার গাত্র গৌরবর্ণ ছিলো। সেই গৌর এর নামানুসারে ১৯৩৫ সালের ৮ই এপ্রিল গৌড়িয় মঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন শ্রী চৈতন্যদেবের ধর্মের বার্তা প্রচারক– শ্রীমদ গৌড়িয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বরস্বতী গোস্বামী প্রভুপদ। মঠ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ১৩৪৩ সালে উড়িষ্যার আলে'র ভক্তিমতি রাণী শ্রীযুক্তা স্বর্ণমঞ্জুরী দেবীর অর্থে মঠের অভ্যন্তরে প্রসাদ সেবন সদন নির্মিত হয়।

মঠের নিকটেই রয়েছে ঢাকার বিখ্যাত বলদা গার্ডেন। বলদা গার্ডেনের মালিক ছিলেন জমিদার নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে এনে নানারকম ফুল, উদ্ভিদ ও গাছ-গাছরা রোপণ করেছেন এ গার্ডেনে। গার্ডেনটি প্রকৃতপক্ষে ফুল ও উদ্ভিদের একটি মিউজিয়াম। সত্যিকারের মিউজিয়ামও একটি ছিলো এখানে। তাতে কয়েকটি ধাতব মূর্তিও ছিলো। তাছাড়া দেশ-বিদেশের গাছ-গাছড়া যেমন রয়েছে তেমনি দেশ-বিদেশের বহু নামী-দামী ব্যক্তি এটি পরিবর্দশনে আসতেন এবং এখনো আসেন। এ গার্ডেনের বহু বিদেশী ফুলের নাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এটি পরিদর্শনকালে বাংলা নামকরণ করেছিলেন। এ গার্ডেনে নরেন চৌধুরীর পুত্র নৃপেন চৌধুরীর সমাধি রয়েছে। সে এক লোমহর্ষক কাহিনী। নৃপেন চৌধুরী সুন্দর চেহারা ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। এক অজ্ঞাত কারণে তার সৎ মা একদা রাত্রে তাকে খুন করিয়েছিলো। প্রতিদিনের মতো নৃপেন চৌধুরী নিশ্চিন্তে গুমুচ্ছেন। বাড়িতে গোটা কয়েক এলসেসিয়ান কুকুর কর্তব্য কাজে রত।

কিন্তু কোনরূপ চেচামেচি নেই। হয়নি কুকুরের কোন আওয়াজ। অথচ, নৃপেন চৌধুরীর মাথাটি বিছানায় ধড় থেকে আলাদ হয়ে আছে। পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে আসে। তদন্ত চালায় পুরোদমে। স্বাক্ষী সাবুদ শুনে পুলিশের সন্দেহ হয়, এটা চেনা মানুষের কাজ। সেই সূত্র ধরেই প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে দোষীদের গ্রেফতার করতে পুলিশ সমর্থ হয়েছিলে।

বলদা গার্ডেনের কিছুদূরেই বনগাঁও। ঢাকার কয়েকটি এলাকা খুবই জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিলো নানা কারণে। ১৮৮৩ সালের দিকেও এসব অঞ্চল বনাকীর্ণ ছিলো। তন্মধ্যে বনগাঁও একটি। এখানে পরবর্তীতে বসতি স্থাপিত হলেও এলাকাটি বনগাঁও রোড নামেই আজো পরিচিত।

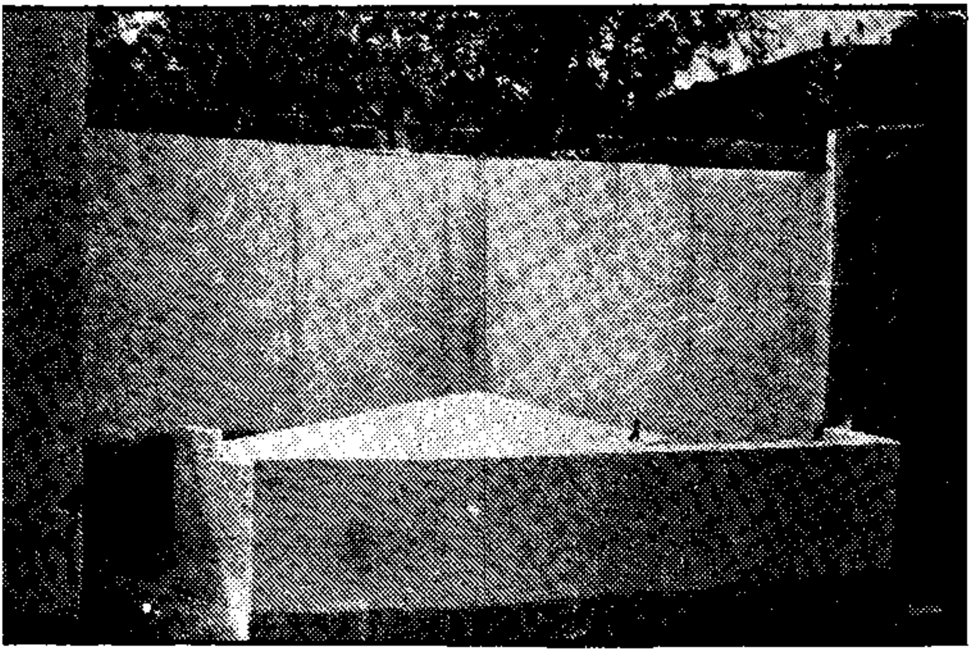
লালবাগ কেল্লার উত্তর পশ্চিমে বিষ্ণুচরণ দাস ষ্ট্রীট। এ এলাকাটি প্রকৃত পক্ষে লালবাগ, আজিমপুর ও আতসখানার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। সাধারণতঃ এ এলাকাটি গোড়ে-শহীদ নামে পরিচিত ছিলো। পৌর সভার রেকর্ড পত্রেও এ নাম ব্যবহৃত হতো। গোড়ে-শহীদ-নামটি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে উৎপত্তি। ১৮৫৭ সালে সারা ভারত বর্ষে যখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে ওঠে তখন ঢাকার বাতাস উত্তপ্ত হলেও বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। এক দল হিন্দু সরকারী কর্মচারীদের উস্কানী, গুজব, বানোয়াট কাহিনী দ্বারা ঢাকার মানুষকে বিদ্রোহের মন্ত্র থেকে দ্বিধা বিভক্ত করে সিপাহীদের বিরুদ্ধে ঢাকার লোকজনকে বিষিয়ে তুলেছিলো। এসব কাজে বড় বড় রইশ, জমিদার বিশেষ করে ঢাকার নবাব আব্দুল গণী ও বাবুরূপলাল দাস ইংরেজদের সর্বতোভাবে বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করেছিলেন। তবুও স্বল্প সংখ্যক ইংরেজ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কলকাতা হতে নৌ সেনা আনয়ন করে সেই সঙ্গে ঢাকায় ইংরেজ সৈন্য ও স্বেচ্ছা সেবকগণ যৌথভাবে আকস্মিক আক্রমণ চালায় অতিপ্রত্যূষে লালবাগ দুর্গে, লালবাগ দূর্গের কালা তথা দেশী সিপাহীরা এই দুর্যোগ মুহূর্তে সাহসের সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করেও নেতৃত্বের অভাব, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, অস্ত্রের অভাব এবং শহরের সকল শ্রেণীর অধিকাংশ জনগণ এর সহযোগিতা আর সমর্থনের অভাবে পরাজয় বরণ করে।

ঢাকাবাসীর কথায় কালা-ধলার এই সংক্ষিপ্ত অথচ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বেশ কিছু দেশী সিপাহী শাহাদত বরণ করে। পর দিবস হতে ধৃত সিপাহী ও তাদের সমর্থকদের আণ্টাঘড় ময়দানের বৃক্ষরাজিতে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে তাদের লাশ বহুদিন পর্যন্ত গাছের ডালেই ঝুলিয়ে রেখেছিলো, সে লাশ পচে গলে কাক চিল শকুনে খেয়েই শেষ করেছিলো। তাদরে কোথাও কবর দেওয়া হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া

যায়নি। তবে কেল্লার অভ্যন্তরে যারা শহীদ হয়েছিলো তাদের অনেকের লাশ কেল্লার ভিতরের পুকুরে ফেলা হয়েছিলো এবং কতক লাশ কেল্লায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো।

পুকুরের লাশগুলো সম্পর্কে জানা যায় গোকুলচর নিবাসী সোনা মিয়া পাঁচটি নৌকা দ্বারা লাশ সেখান হতে উঠিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলো, অন্যান্য লাশগুলো সমাহিত করা হয়েছিলো বর্তমান গোড়ে শহীদ এলাকায়। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদ সিপাহীদের এখানে দাফন তথা কবর দেওয়া হয়েছিলো বলেই এলাকাটি গোড়ে-শহীদ নাম ধারণ করে রয়েছিলো বহু বছর। এ ঘটনার কিছুকাল পর থেকেই সিপাহী শহীদদের স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্র এ নামের বিকৃতি করে ঘোড়া শহীদ বলে প্রচার করতে থাকে সরলমতি মুসলমানগণও পরবর্তীকালে এ এলাকাকে ঘোড়াশহীদ নামে ডাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। এই সিপাহীদের মধ্যে অনেক আল্লাওয়ালা অর্থাৎ বুজুর্গ ব্যক্তিও ছিলো।

গোড়ে-শহীদ তথা সলিমউল্লা মুসলিম এতিমখানার দক্ষিণ পূর্বে যে কটা কবর বা মাজার দেখা যায় তার সবই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের শহীদ সিপাহীগণের। রাস্তার মাঝে যে কবরটি পথের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো সেখানে লোকজন অজান্তে অমর্যাদাকর কাজ করলে ক্ষতি সাধন হতো। অনেক যান বাহনও দুর্ঘটনা কবলিত হতো। এরূপ অনেক দিন প্রত্যক্ষ করার পর তৎকালীন পি, ডবলিউ, ডি আজিমপুর কলোনী অঞ্চলটির দায়িত্ব ভার নিলে এর কর্মকর্তা মিঃ লেং কিন কবরটির নিকট কাজ বন্ধ করে দেন এবং যায়গাটা চিহ্নিত করে দেন। তখন হতে সব শ্রেণীর মানুষ কবরটিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতো। কবরটিকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ করতে করতে আজ একটা সুন্দর মাজারে পরিণত করা হয়েছে। এখানে ভক্তরা যথাযথভাবে মিলাদ, ওয়াজ ও নানা প্রকার শিন্নি সালাত করে থাকে। এ মাজারটির একটু পশ্চিমে রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে আরেকটি পাকা কবর রয়েছে। এ কবরটি বহুযুগ থেকে সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা এবং ভয় দুটোই করে আসছে। পূর্বে অনেকেই পা ভেঙ্গে শত্রুর শত্রুতা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অথবা শত্রুর ক্ষতি করার মানসে মাটির তৈরী ঘোড়ার একটি পা ভেংগে কবরের উপরে রেখে দিতো। তারা বিশ্বাস করতো ঘোড়ার একটি পা ভেংগে গেলে যেমন আর সে দৌড়াতে পারিবে না, তেমনি শত্রুও আর তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তাই মাঝে মধ্যে মাটির ঠ্যাং ভাংগা ঘোড়া রাখার দৃশ্য চোখে পড়ে। ৩/৪ যুগ পূর্বে এ ধরনের মানতকারীর সংখ্যা ঢাকাবাসীর মধ্যে অনেক ছিলো। এখানে আরো কয়েকটি কবর ছিলো যা আজ বিলীন হয়ে গেছে।



গোড়ে-শহীদ মাজার অভ্যন্তরে নীচে একটি ছোট্ট
মাটির পা ভাঙ্গা ঘোড়া পড়ে আছে

প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ হতে জানা যায় গোড়ে শহীদ এর উত্তর পার্শ্ব সংলগ্ন সলিমউল্লাহ মুসলিম এতিমখানার মেয়েদের থাকার ঘরও বাউণ্ডারী দেওয়াল নির্মাণকালে মাটি খনন করার সময় পোড়া মাটির অনেক ছোট ছোট ঘোড়া, হাতী, ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয় এক সময় এখানে কুমারদের বসবাস ছিলো। হয়তো কুমারদের তৈরী পা ভাংগা ঘোড়া কেহ কবরটিতে রেখে দিয়েছিলো তাতেই মানুষ উপরোক্ত ধারণা পোষণ করে শত্রু বশের জন্য এরূপ কাজ করে আসছে। গোড়ে-শহীদ ও আজিমপুর রোডের সঙ্গম স্থলে বর্তমান হাজী গণী কমিউনিটি সেণ্টার যেখানে অবস্থিত সেখানে মুঘল আমলের পাকা শান বাধানো পুকুর ঘাট ছিলো। পুকুরটির অস্তিত্ব বহু পূর্বেই বিলীন হয়ে গেছে।

বৃটিশ যুগে এ মহল্লায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বসবাস করতো। তাদের

মধ্যে বিষ্ণুচরণের পিতা খুব প্রভাবশালী ছিলেন। এ মহল্লায় এক হিন্দু বাবুর ছান্দাবন ছিলো। এবং অত্র এলাকার প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি হরমোহন শীল বাবুর বাগান থাকায় কিছু মুসলিম মালী পরিবারও এ মহল্লায় এসে বসবাস করতে থাকে। এ মহল্লায় রহমতগঞ্জ বাসীদের একটি কবরস্থান ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কবরস্থান এখনো আছে। এটি সোয়ারী ঘাট এর বাকরখানি রুটি দোকানের মালিক মনু রুটিওয়ালা নিজ অর্থে যায়গাটি কিনে ছিলেন। এ কবরস্থানের নিকটেই মহল্লার বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি সর্দার সমতুল্য জনাব গোলাম কিবরিয়া ১৯৬৫ সালে মহল্লাবাসীর সহযোগিতায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি গোড়ে-শহীদ মসজিদ নামেই পরিচিত। মসজিদের স্থানটিতে হাজী সপন শাহ্‌র মাজার ছিলো। কবরটির উপরিভাগ চীনা বাসনের টুকরো বসানো ছিলো। এখানে পূর্বে সপন শাহ্‌র এবাদত গাহ্ ছিলো। তাঁকে এক সময় ঢাকার নবাব আব্দুল গণী তার তোষাখানার কর্মকর্তা করে ছিলেন। নবাব সাহেব তাকে পরীক্ষা করার জন্য একটা আলমারীতে অনেক টাকা রেখে তাঁকে বলেছিলেন আলমারী খুলে টাকা রাখার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বললেন এতে শাপ আছে অর্থাৎ ধনদৌলত আছে। মৌলানা মুফতি দীন মহম্মদ সাহেবের ফতোয়া নিয়ে এ মাজার ভাঙ্গা হয়। মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর ও প্রথম নামাজ পরিয়েছিলেন মৌলানা মুফতি দীন মহম্মদ সাহেব। মাজার খোড়ার সময় অস্থি সম্পূর্ণ সঠিক অবস্থায় ছিলো। সেই হাড়গুলো পাশে অনত্র দাফন করা হয়।

গোড়ে-শহীদ মহল্লাটির নাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪২-৪৩ সালে বিষ্ণুচরণ দাস ষ্ট্রীট নামকরণ হয় ঢাকা পৌরসভার মাধ্যমে। বিষ্ণুচরণ দাস অত্র এলাকার ওয়েষ্ট এণ্ড হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এবং এ মহল্লার আদি বাসিন্দা। তার পিতা ছিলেন সদর ঘাটস্থিত ঢাকা সদর পোষ্ট অফিসের জেনারেল পোষ্ট মাষ্টার। গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভের পর ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হন বিষ্ণুচরণ বাবু। তার দু'বৎসরের বেতন খরচ না করে জমিয়ে রেখেছিলেন কোন কল্যাণকর কাজের জন্য। হঠাৎ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে সে বুঝতে পারে তার দিন শেষ হয়ে আসছে। তাই তিনি পিতার নিকট অনুরোধ রাখেন তার জমাকৃত অর্থ দিয়ে যেন এ মহল্লায় বৈদ্যুতিক বাতি ও রাস্তার উন্নয়ন ব্যবস্থা পৌরসভার মাধ্যমে করা হয়। বাবু বিষ্ণুচরণের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা পৌরসভায় উক্ত অর্থ দান করেন এবং গোড়ে-শহীদ মহল্লাটি এবং আতসখানার কিছু অংশ বিষ্ণুচরণ দাসের নামানুসারে বিষ্ণুচরণ দাস ষ্ট্রীট নামকরণ করেন। আর সে অর্থ দিয়ে এ মহল্লার পথে আঠারটি

কাঠের বৈদ্যুতিক পোল বসিয়ে রাস্তাটিকে বিদ্যুতায়ন এবং কাঁচা রাস্তাটিকে ইট দ্বারা সোলিং করা হয়। বিষ্ণুচরণ দাস ষ্ট্রীট নামকরণ হলেও প্রবীণ ব্যক্তিরা আজও গোড়ে-শহীদ মহল্লা বলেই সম্বোধন করে থাকেন।

ঢাকা মহানগরীর উত্তর উপকণ্ঠে রয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা শ্যামলী – যা কিছুদিন হলো ঢাকা পৌর করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্যামলী অঞ্চলটি পূর্বে টিলা-টক্কর ও ছনক্ষেতে পরিপূর্ণ ছিলো। এলাকাটি বারাবো মৌজার অন্তর্ভুক্ত ছিলো বিধায় স্থানটিকে আগে বারাবো বলেই অভিহিত করা হতো।

এখানে মনুষ্য বসতি আরম্ভ হয়-পাকিস্তান আমলে ১৯৫৭ সালের দিকে। প্রথম বসতি স্থাপন করেন ঢাকা শহরের বেচারাম দেউড়ীর বিশিষ্ট সমাজকর্মী জনাব আবদুল গণী হায়দার। তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আনসারের একজন প্রভাবশালী প্লাটুন কমাণ্ডার ছিলেন। তারপর আসেন ডঃ জুবেরী, এ, কিউ, এম, আজমিরী এবং আরো অনেকে।

বসতি স্থাপন হওয়ার পর তাঁরা একদিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব হাফিজ উদ্দিনকে নিয়ে আলোচনায় বসেন স্থানটির নাম কি রাখা যায়। যেহেতু স্থানটিতে সুন্দর, শ্যামল ও সবুজের প্রধান্য রয়েছে তাই তাঁরা এলাকাটিকে শ্যামলী নাম দেন। এভাবেই মানুষের কাছে শ্যামলী এলাকাটি পরিচিত হতে থাকে। পরবর্তীতে যখন পৌর কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত হয় – তখন এ শ্যামলী নামটিই পৌর রেকর্ডভুক্ত হয়।

যাত্রাবাড়ী এলাকাটি ব্রাহ্মণচিরণ মৌজার অন্তর্ভুক্ত বিধায় এ বিরাট এলাকাটি এক সময় ব্রাহ্মণচিরণ নামেই পরিচিত ছিলো। এলাকাটির অধিকাংশ ভূমিই এককালে পানির নীচে থাকতো অর্থাৎ জলাভূমি ছিলো। এরই মধ্যে একটি চিলতের মতো (লম্বা ও সরু) উচু চরা ভূমিখণ্ড ছিলো। তাতে গুটিকতক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতো। পরবর্তীতে এখানে ময়মনসিংহের কিছু লোক এসে বসবাস করতে শুরু করে। ময়মনসিংহবাসীরা চিলতাকে চিরল বলে থাকে। সেই ব্রাহ্মণচিরলই পরবর্তীতে অপভ্রংশ হয়ে "ব্রাহ্মণচিরণ" ধারণ করে, যা বৃটিশ শাসনামলে সেটেলমেন্ট জরীপের সময় এই বিরাট এলাকাটি ব্রাহ্মণচিরণ মৌজা নামকরণ হয়। এই মৌজার যে অংশটি আজ যাত্রাবাড়ী নামে পরিচিত, সে এলাকায় একটি যাত্রামণ্ডপ ছিলো। প্রায়ই সেখানে যাত্রা অভিনীত হতো। আজকের মতো সে যুগে সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্যে সিনেমা-থিয়েটার-টিভি বা জমকালো সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিলোনা। একমাত্র যাত্রাই ছিলো চিত্তবিনোদনের বাহন।

লোকে যাত্রামণ্ডপটিকে যাত্রাবাড়ী বলে আখ্যায়িত করতো। সেই থেকে ঐ পাড়াটিই "যাত্রাবাড়ী" বলে পরিচিত হয়ে পড়ে। শহরের একেবারে উপকণ্ঠ এলাকা হলেও সম্পূর্ণ গ্রামের মতো পরিবেশ ছিলো এখানে। কিছুকাল পূর্বেও এস্থানে ফুলকপি, বাঁধাকপি ও অন্যান্য তরি-তরকারী জন্মাতো প্রচুর। পাক আমলে মমিন মোটর কোম্পানী ঢাকা থেকে বাবুরহাট বাস-সার্ভিস চালু করলে সে বাস দয়াগঞ্জ সাঁকোর ওপার থেকেই চলাচল আরম্ভ করে। যাত্রাবাড়ীর সে চিত্র আজ আর নেই। যাত্রাবাড়ী এলাকাটি এখন উত্তর ও দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী নামে দুভাগে পরিচিত হয়ে থাকে। যাত্রাবাড়ী খালটি লক্ষা নদী হতে সাদী গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ ছিলো। ঐ গ্রামের বৈদ্য বংশীয় কৃষ্ণদেব বকসী কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খালটি খনন করা হয়ে ছিলো।

মগবাজার নয়াটোলা এলাকাটির নিকট দিয়ে এক সময় কাপাসিয়া নদী প্রবাহিত ছিলো। সেই নদীপাড়ে প্রথমে নাইয়াদের বসবাস আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে সেই নাইয়া বসতিটি নয়াটোলা নামে আখ্যায়িত হয়ে আসছে। আজ আর এখানে নাইয়াদের বসতি নেই। এখানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ধরনের পেশাভুক্ত লোক এসে বসতি করছে এই নয়াটোলায়। এর নিকটেই রয়েছে মধুবাগ। পূর্বে এ এলাকাটি জঙ্গলে পূর্ণ ছিলো। এ জঙ্গলে মধুমক্ষিরা চাক তৈরি করে মধু প্রস্রবন করতো। তাই এলাকাটি মধুবাগ বলে পরিচিত হয়। এখন সে এলাকাটি মীরের বাগ নামে স্থানীয়ভাবে নামকরণ হয়।

আউটার সার্কুলার রোডে রাজার বাগের নিকট প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী আবদুল মোমেন (মরহুম) যে এলাকায় একটি বাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে স্থানটি এখন মোমেনবাগ এবং শহীদ মেম্বার (আইয়ুব আমলের বি, ডি, মেম্বার) নামে বিত্তশালী ব্যক্তির বেশ কিছু জমিজমা ছিলো– সেগুলো খরিদ করে যারা বসতি গড়েছে, তাদের বসতিটি শহীদবাগ নামেই আখ্যায়িত হয়ে আসছে।

গেণ্ডারিয়া এলাকায় খুব ঢালু একটা জায়গায় এক মহল্লা রয়েছে। ঢালুর জন্যেই সেটা ঢালকা নগর বলে উল্লেখ ছিলো। নামটি উর্দু ভাষায় রাখা হয়। বর্তমানেও পৌরসভা এটিকে ঢালকানগর নামেই আখ্যায়িত করছে। অন্যদের মতে এককালে এখানে বর্ম ও তলোয়ারের আঘাত প্রতিরোধক ঢাল তৈরি হতো। এজন্যেই নাকি "ঢাল-কা-নগর" নামকরণ হয়। এই ঢালকা নগরে একটি মন্দির রয়েছে। বিভাগ পূর্বকালে এ মন্দির সংলগ্ন একটি আশ্রম ও পুষ্করিনী ছিলো। আশ্রমে হিন্দু বিধবা নারীগণ থাকতেন। ঐ পুকুরটিতে মৎস্য পালন করা হতো। মাছগুলো তারা খেতো

না বলে বেশ বড় বড় হতো। মাছগুলো যখন মরে ভেসে উঠতো তখন ঘটা করে সেগুলোকে আশ্রম ও মন্দিরের পাশে কবর দেয়া হতো।

গেণ্ডারিয়া রেলষ্টেশনের সন্নিকটে ডিষ্টিলারী রোডে কদম রসুল নামে একটি জায়গা ছিলো। এখানে একটি পাথরে পায়ের ছাপছিলো যাকে মুসলমানদের অনেকেই হজরত রসুলে করিম (সঃ) এর পায়ের ছাপ বলে ধারণা করার ফলে সে স্থানটি কদম রসুল নাম ধারণ করেছে। এ স্থলেও একটি মসজিদ রয়েছে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত ছিলো যে রেলগাড়ী দ্রুত চালিয়ে আসলেও এখানে এসে থেমে যেতো। কারণ স্বরূপ বলা হতো লম্বা জুব্বাধারী পাগড়ী পড়া কে জানি একজন এসে রেল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকতো। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ড্রাইভারগণ কদম রসুলের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে গাড়ীর গতি স্তিমিত করে দিতো।

ঢাকার এস্থান ব্যতিত আজিমপুর দায়রা শরীফ এ-ও কদম রসুল অর্থাৎ রাসুল (সঃ)-এর কদম মোবারকের ছাপ ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) রাত্রে ধর্মপ্রাণ মুসুল্লীদের দেখানো হতো। উপস্থিত ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাভরে সেটাকে চুম্বন করতো। তবে নারায়ণগঞ্জ স্থিত নবীগঞ্জ এলাকার কদম রসুল বাংলাখ্যাত হয়ে আছে। কথিত আছে ঈশা খাঁর বংশধর মনোয়ার খাঁ নাওয়ারা মহালের রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় সুলতান সুজা কর্তৃক ঢাকায় আহুত হয়েছিলেন। মনোয়ার খাঁ সঙ্গীসহ নৌকাযোগে খিজিরপুর হতে ঢাকাভিমুখে রওনা দেন। রাত্রি সমাগত হওয়ায় নবীগঞ্জের কাছে নৌকা নোঙ্গর করে। জনৈক মাঝি অগ্নির অন্বেষণে তীরভূমিতে গমন করে দেখতে পান কতিপয় লোক একখণ্ড শিলা সন্মুখে রেখে অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করছে। তাদের কথোপকথন শুনে মাঝি বুঝতে পারলো, পূর্বরাত্রে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তারা এখানে এসে শিলাখণ্ড প্রাপ্ত হয়েছে আর তাতে হজরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পদচিহ্ন রয়েছে। মাঝি নৌকায় প্রত্যাবর্তন করে সমুদয় ঘটনা মনোয়ার খাঁর কর্ণগোচর করায়, মনোয়ার খাঁ স্বয়ং উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়ে উহা যে নবীজীর পদচিহ্ন সমবেত লোকদের নিকট তার প্রমাণ চাইলেন। তারা তাকে বললো – আপনি কোন মানত করুন, মানত পূর্ণ হলেই তবে বিশ্বাস করবেন। সে মতে মনোয়ার খাঁ মানত করলেন – তিনি যেন ঢাকা হতে সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। সেই সঙ্গে একটি খাগের কলম প্রদর্শন পূর্বক বললেন– যদি এই শুষ্ক খাগটিতে পাতা অংকুরিত হয়, তবেই আমি বিশ্বাস করবো। সত্যিই তিনি ঢাকা আগমন করলে পূর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান লাভ করেন। তারপর তিনি নবিপুরে ফিরে দেখতে পান যে, সেই শুষ্ক

খাগ হতে পাতা অংকুরিত হয়েছে। এসব অলৌকিক ঘটনা সন্দর্শনে মনোয়ার খাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে উহা সত্যিই নবীজীর পদচিহ্ন। খিজিরপুর প্রত্যাবর্তন করে তিনি নবীগঞ্জে একটি মসজিদ নির্মাণে হাত দেন। এবং সেখানে কদমরসুল প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদ ও কদম রসুলের ব্যয় নির্বাহের জন্যে কতকপরিমাণ ভূমি ওয়াকফ করে দেন। ভিন্নমতে, জালাল উদ্দিন আবুল মোজাফ্‌ফর ফতেহ্ শাহের আমলে "বাবা সালেহ" নামে একজন ধর্মভীরু ব্যক্তি এ স্থানে কদম রসুল স্থাপন করেন। তিনি মক্কা ও মদিনা জেয়ারতকালে এ পদচিহ্ন নিয়ে এসেছিলেন।

কলতাবাজার ঢাকার একটি প্রাচীন মহল্লা। মহল্লাটির নাম কলতাবাজার কেন রাখা হয়েছিলো তা সঠিক করে কেউ বলতে পারেনা। এখানে ঢাকায় সর্ব প্রথম বরফকল প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। অনেকেই বৃটিশ আমল পর্যন্ত বরফকল নামে এলাকার কিছু অংশকে পরিচয় দিতো। পরবর্তীতে ঢাকায় অনেক স্থানে বরফ কল স্থাপন হলেও বরফকল এলাকা বলতে কলতাবাজারের একটি অংশকেই বুঝাতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই বরফ কল নামটি অপভ্রংশ হয়ে বরফ শব্দ উঠে গিয়ে শুধু কল থেকে কলতা বাজার নামের উৎপত্তি। এই কলতাবাজারে বেশ কিছু খ্যাতনামা ব্যক্তির বাসস্থান ছিলো, এদের অনেকেই ইতিহাসের পাতায় তাদের নামটি সন্নিবেশিত করতে পেরেছেন। এখানে নামকরা কয়েকটি ডনখানা তথা কুস্তির আখড়া ছিলো। কলতাবাজারের আঃ করিম ঢাকা শহরে একজন সেরা কুস্তিগীর ছিলেন। কলতাবাজারের কুস্তিগীররা প্রায় বিকেলেই আণ্টাঘড় ময়দানে কুস্তি প্রতিযোগিতা করতেন বিভিন্ন এলাকার কুস্তিগীরদের সঙ্গে।

একদা লালবাগ দুর্গের সিপাহীদের সুবেদার হাবিব খাঁ ও কফুর খাঁ ও তার কতিপয় সাথী কেনাকাটা করার জন্য পাটুয়াটুলিতে এসেছিলো। এদের মধ্যে কফুর খাঁ শক্তিশালী কুস্তিগীর ছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে পাঠান। তৎসময়ে কলতাবাজারে বেশ কিছু পাঠান বসবাস করতেন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকাল পর্যন্ত। তাদের কেনাকাটা করার প্রক্কালে জমিদার খাজা গনি মিয়ার হাতি যাচ্ছিলো পথ দিয়ে। তখনও গনী মিয়া নবাব উপাধি পাননি। কফুর খানের সাথী সুবেদার হাবিব খাঁ হাস্যচ্ছলে কফুর খাঁনকে বলেছিলো এতদিনতো রোগা পটকা বাঙ্গালী কুস্তিগীরদের হারালে – এবার এই হাতির সঙ্গে লড়না দেখি। এ কথায় কফুর খাঁন রাজী হলে বাজী ধরা হলো পাঁচ টাকা। আর এই টাকাটা কলতাবাজারের লোকজনেই চাঁদা তুলে দিয়েছিলো। শহরে ঢেড়া পিটিয়ে দেওয়া হলো আণ্টাঘর ময়দানে কফুর খাঁ হাতির সঙ্গে লড়াই করবে। লড়াই এর দিন ময়দান লোকেলোকারণ্য। হাতি ও কফুর

খাঁনের শক্তি পরীক্ষা, শেষ পর্যন্ত কফুর খান হাতির কাছে পরাভূত হয়নি। লোকে কফুর খানের জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেলো নিজ নিজ গন্তব্য স্থলে।

কলতাবাজারের আদি বাসিন্দা মজু ওস্তাগার ওরফে হাজী আঃ মজিদ, গনি ওস্তাগার, রহমান ওস্তাগার এই তিন ভাই তখন নির্মাণ শিল্পে এক রত্ন ছিলেন। তাদের নির্মাণ কাজের স্মৃতিচিহ্ন আজও মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঢাকা মহানগরীতে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভবনগুলো হচ্ছে পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা জেলা কালেকটরীয়েট ভবন (নীচতলা) ইত্যাদি। এসব ভবন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তৈরি করেছিলেন তারা। পরবর্তীতে বড় ভাই হাজী আঃ মজিদ (মজু ওস্তাগার) ঢাকা পৌর সভার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার ছেলে আব্দুল মোন্নাফ সর্দারও ঢাকার পৌর সভার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি রোলস্ রয়েস গাড়ী ব্যবহার করতেন। তখন ঢাকায় ৫টি রোলস রয়েস গাড়ী ছিলো। তন্মধ্যে ২টি ঢাকার নবাবের, একটি জয়দেবপুরের রাজার অপরটি নবাব ইউসুফ জানের। কোটিপতি মোন্নাফ সর্দারের বাস ভবন ছিলো রোকনপুর ১ম লেনে। তিনি তৎকালীন লেঃ গভর্ণরকে তার বাড়ীতে লাল গালিচা সংবর্দ্ধনা দিয়েছিলেন। বৃটিশ খাবার তৈরীর জন্য কলকাতা থেকে বাবুর্চি আনা হয়েছিলো। সিটি ফাদার হিসেবে তার মান রেখে গিয়েছেন। আঃ মজিদ সরদারের নামানুসারে ঢাকা পৌরসভা রোকনপুরের ২য় লেনের নামকরণ করেন আঃ মজিদ সর্দার লেন। তৎছেলে আঃ মোন্নাফ সর্দারের শ্বশুরের নামানুসারে অত্র এলাকায় একটি অংশের নাম হয় নাসিরুদ্দিন সরদার লেন।

কলতাবাজারের একাংশের নাম ১৯২১ সালে স্থানীয় জনগনের আবেদনক্রমে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি রোকনপুর নিবাসী কাজী মৌলাভি আঃ রৌফের নামানুসারে কাজী আঃ রৌফ রোড নামকরণ করেছেন। কাজী সাহেব ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের লোক ছিলেন। জনগণ তার পূর্ব পুরুষদের পীর মুর্শিদ হিসেবে সম্মান করতো। তিনি উনত্রিশ বছর ধরে মহল্লার সর্দার, নিকাহ রেজিষ্টার ও শহর কাজী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার বাড়ীটি ঢাকার সর্ব মহলে কাজী বাড়ী নামে খ্যাত। খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ বিশেষ করে ঢাকার জিমনাষ্টিক খেলার উজ্জ্বল নক্ষত্র আব্দুল আলীম সাহেবের দাদা হতেন কাজী আঃ রৌফ।

রোকনপুর এলাকাটি পূর্বে অনেক বড় ছিলো। আজকের ধোলাই খাল রোডের পাঁচভাই ঘাট লেন, কুঞ্জ বাবু লেন, যাহা জগন্নাথ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ কুঞ্জ লাল বাবুর নামানুসারে নামকরণ হয়েছে তা সহ কাজী আঃ রৌফ রোডের পুরো অঞ্চলটি

রোকনপুর নামে পরিচিত ছিলো। রোকনপুর নামটি সুলতানি তথা পাঠান আমলে রোকন উদ্দিন চিশতি নামে একজন পরহেজগার সেখানে বসবাস করতেন তারই নামানুসারে হয়েছিলো। তাঁর মাজারও ঐ এলাকায় ছিলো। মাজারে কালো পাথরে যে ফলকটি ছিলো তাতে ফার্সী ভাষায় তার জন্ম মৃত্যু ও পরিচয় উল্লেখ ছিলো। সে এলাকার ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত (মরহুম) মুন্সী সুরত আলী সেটিকে ঢাকা যাদু ঘরে দেবেন বলে নিয়েছিলেন। তাঁর ওখানে ইতিহাসবেত্তা হেকিম হাবিবুর রহমান ও এস, এম, তাইফুর সাহেবের যাতায়াত ছিলো। মুন্সী সুরত আলীর সহায়তায় ১৯৫২ সালে বেগম আমেনা খাতুন রোকনপুর গালর্স হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৮৬ সালে এণ্ট্রাস পাশ (বর্তমান এস, এস, সি) করেন। এখানে উল্লেখ থাকতে প্যারে ঢাকায় ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় ১৮৩৫ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। সে সময় সমগ্র বাংলা ও আসামে মাত্র সর্বমোট তিনটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। তন্মধ্যে একটি ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল, অপর দুটি কলকাতা ও রাজশাহীতে, লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক এর আমলে। সে বৎসর সমগ্র বাংলায় মাত্র পাঁচজন এণ্ট্রাস পাশ করেছিলেন। তন্মধ্যে একমাত্র মুসলিম তিনিই ছিলেন। ১৮৮৮ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এফ, এ (বর্তমান আই, এ) পাশ করে পগোজ স্কুলের ফার্সী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত হন। তৎকালে ইসলামপুরস্থ আওলাদ হোসেন লেনের কাজী বাড়ীর কাজী জহুরুল হক ১৮৮৯ সালে এণ্ট্রাস পাশ করেছিলেন। তিনি ১৯৯৩ সালে ঢাকা মুসলিম হাই স্কুলের প্রথম হেড মাষ্টার পদে আসীন হয়েছিলেন। তিনি আমাদের কবি শামসুর রাহমানের দাদা শ্বশুর হন। সে সময় এ দু'জনকে ঢাকার মুসলিম শিক্ষিত সমাজে পাইওনীয়ার অফ ইংলিশ এডুকেশনের অগ্রদূত বলা হতো। রোকনপুরে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা মুন্সী রহমান আলী তায়েশ বাড়ী কিনে বসবাস করে গেছেন। তাছাড়া স্যার ওবায়েদ উল্লা সোহরাওয়ার্দীও এখানেই বসবাস করতেন। ঢাকার মুসলিম সমাজে তৎকালে রোকনপুরেই শিক্ষিতের হার বেশী ছিলো।

রোকনপুরে কাজী আঃ রৌফ রোড ও পাঁচ ভাই ঘাট লেনের সংযোগ স্থলে মেথিবান্দি নামে সুলতানি আমলের একখানা পুল ছিলো। মেথিবান্দি কে ছিলেন তার হদিশ খুজে পাওয়া যায়নি।

ঐতিহাসিক ইসলামপুরের নিকটে রয়েছে "জিন্দাবায়োর কা গলি" পরবর্তীকালে এ নামটিই অপভ্রংশ হয়ে "জিন্দাবাহার" নামে পরিচিত হয়ে গেছে। ইসলামপুরের মধ্যবর্তী অংশে জিন্দাবাহারের দক্ষিণ প্রান্তের অতি নিকটে একটা মোকবারা রয়েছে

যাতে দেখা যায় "জিন্দাপীর শাহ্ বাবার মাজার" শিরোনামের একটি সাইনবোর্ড।

এখানে এককালে হিন্দুস্থানের পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত এক মস্তান আস্তানা নিয়েছিলেন। এই মস্তানের একটা প্রিয় কুকুর ছিলো। তিনি কুকুরটিকে "বায়োর" বলে ডাকতেন। মস্তান এদিক সেদিক ঘুরে-ফিরে আস্তানায় এসে তার জোব্বার পকেট থেকে আহার্যদ্রব্য বের করে অতি আদরের সঙ্গে কুকুরটিকে খাওয়াতেন। কোন সময় কুকুরটি সেখানে উপস্থিত না থাকলে "বায়োর" "বায়োর" ডাক দিলে যেখানেই থাকুকনা কেন কুকুরটি মস্তানের নিকট এসে হাজির হয়ে যেতো।

ভক্তরা সব সময় তাকে ঘিরে থাকতো। একদিন লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি বললেন তোমাদের জ্বালাতনে আর পারছিনে। একথা বলার পর পরই তিনি "ইল্লাল্লাহ্" বলে উচ্চঃস্বরে একটা হাঁক দিয়ে সবার সামনেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন আস্তানা হতে। কিছুক্ষণ পর কুকুরটিও আস্তানায় এসে মনিবের মতোই উধাও হয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত ভক্তগণ হতবাক হয়ে গেলেন। এ ঘটনার পর থেকে মস্তান ও কুকুরটিকে আর কোনদিন দেখা যায়নি। জীবন্ত অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে যাবার পর থেকে সবাই মস্তানকে "জিন্দাপীর" বলে মনে করতে লাগলেন। আর পীরের মোকবারার পেছনের গলি পথটি "জিন্দাবায়োর কা গলি" নামে আখ্যায়িত হয়ে গেলো ঢাকাময়।

অন্য একটি কাহিনীতে জানা যায়, উক্ত মস্তান শিষ্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় অন্তর্ধানের কিছু পূর্বেই তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেয়ার নির্দেশ দিলে তাকে জীবন্তই কবর দেয়া হয়। এবং এ কারণেই তাঁকে "জিন্দাপীর" বলা হয়ে থাকে।

অবিভক্ত বাংলার জিন্দাবাহার গলির জন্মগত বাসিন্দা বাবু পরিতোষ সেন, যিনি বর্তমানে কলকাতার লেখক মহলের একজন। তিনি কলকাতা থেকে "জিন্দাবাহার" নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন। তাতে লেখক পরিতোষ বাবু বলেছেন– উর্দু "জিন্দেগী" (জীবন) শব্দ থেকে জিন্দা, আর তার সঙ্গে বাহার (বসন্ত) শব্দ জুড়ে একটি অসাধারণ নামের সৃষ্টি। কোন রসিক ব্যক্তি হয়তো এ নামটি রেখেছিলেন বলে তার ধারণা। কেননা, এই গলিতে শহরের গরীব, আমীর অনেক ধরনের বাসিন্দাই তাদের জীবনকে আনন্দময় রাখার উদ্দেশ্যে এই জিন্দাবাহার লেনে আনাগোনা করতেন এখানকার বারবণিতাদের আবাসস্থলে। পরিতোষ বাবু একজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীও বটে, তাঁর বাড়ী ছিলো জিন্দাবাহার লেনের শুরুতেই।

এখানকার বারবণিতাদের বেশ প্রভাব ছিলো শহরবাসী আমোদপ্রিয় লোকদের উপর। আমিও শৈশবে এদের কথা ঐসব আমোদপ্রিয় লোকদের মুখে শুনেছি।

তবে, পরিতোষ বাবুর জিন্দাবাহার নামকরণের যুক্তিটা মেনে নিতে পারছিনা। যাক সে কথা, এখানে যে শুধু নামকরা বারাঙ্গনারাই থাকতো তা নয়, এ মহল্লায় শ্রীনগরের জমিদার বাড়ী, খ্যাতনামা সাধক পরমানন্দ স্বরস্বতীর বাড়ী উল্লেখযোগ্য।

এ গলির জন্মগত বাসিন্দা চিত্রশিল্পী ও কথাশিল্পী পরিতোষ সেন যখন বুঝলেন এই অবহেলিত ঢাকা শহরে তার বিদ্যুৎ গর্ভের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যাবেনা, তখন তিনি তার কয়েকটি চিত্র ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলেন মাদ্রাজের আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরীর কাছে। দেবী প্রসাদ ছিলেন মহৎ শিল্পী। গুণের কদর জানতেন। দুজনের মধ্যে পত্রসংযোগ হবার পর চলে গেলেন পরিতোষ বাবু মাদ্রাজে। তারপর কয়েক বছর তিনি প্যারিসেও কাটিয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পিকাসোর কাছ থেকে তার চিত্রের সমাদরও লাভ করেছিলেন। সেটা তাঁর পরবর্তী জীবনে নিরর্থক হয়নি। পরিতোষ বাবু তার তারুণ্যকাল জিন্দাবাহারে কাটিয়েছেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঢাকার মুসলিম সমাজে জিন্দা বাহারের ডাঃ গোলাম আজম সাহেব বেশ পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য হিন্দুরোগীও তাঁর ছিলো। নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ীতে করে তিনি ঢাকাময় রোগী দেখে বেড়াতেন। বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি ছোট অথচ সুন্দর কামরাঙ্গারমত গম্বুজ করে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তিনি। যা কামরাঙ্গা মসজিদ নামে আজও পরিচিত। তার ফি ছিলো মাত্র তিন টাকা, ডাক্তার ফি দু'টাকা আর গাড়ী ফি এক টাকা, মোট তিন টাকা। বাসায় রোগী দেখার সময় তিনি গরীব রোগীদের ফি নিতেন না। রোগী দেখতে যখন বের হতেন তখন সাহেবী পোষাক পরে বের হতেন। কিন্তু তিনি খুবই অমায়িক ও ধর্মভীরু ছিলেন।

ঐ বাড়ীর তার এক চাচাত ভাই গোলাম কাদের চৌধুরী ঢাকা পৌরসভার কমিশনার হয়েছিলেন বৃটিশ শাসনামলেই। ঢাকা শহরে তার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো। তিনি ছিলেন কট্টর কংগ্রেস পন্থী। গান্ধীটুপী খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবী পরে থাকতেন। বৃটিশযুগে ঢাকা শহরে রাস্তার চৌমাথা বা চওড়া রাস্তার মাঝে অনেক বটবৃক্ষ ছিলো। সেগুলোর চতুর্দিকে পাকা শান বাঁধানো থাকতো পৌরসভার মাধ্যমে – লোকজনের বিশ্রাম ও বসার জন্যে। প্রায় অনেক স্থানেই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা দেবীমূর্তি রেখে দিতো। আবার অনেকে বটবৃক্ষতলেই দেবী বসিয়ে পূজা-অর্চনা করতো। ফলে যানবাহন ও লোক চলাচলে যেমন অসুবিধে হতো তেমনি মুসলমানদের বটবৃক্ষ তলে বসারও খুব অসুবিধে হতো। এ ব্যাপারে মুসলমানদের তরফ থেকে বারবার হিন্দু নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন লাভ না হওয়ায় অবশেষে ঢাকার প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা চৌধুরী গোলাম কাদেরের স্মরণাপন্ন

হলেন ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলের বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিরা। তিনি নবাবগঞ্জস্থিত হাতীর ঘাট সংলগ্ন ও অন্যান্য এলাকা পরিদর্শন করে হিন্দুদের মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তার আবেদনে কর্ণপাত না করায় তিনি অতি সাহসিকতার সাথে নিজে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন স্থানের বটবৃক্ষতল থেকে মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলেছিলেন। সেই বটবৃক্ষগুলোর মধ্যে নবাবগঞ্জের বটবৃক্ষ এখনও আছে। তিনি আজীবন কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী ও তাতে অটল ছিলেন। তাঁর এক চাচা গোলাম জিলানী চৌধুরীও কংগ্রেস নেতা ছিলেন। ইনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় মৃত্যুবরণ করেন। এ পরিবারটি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার জয়পুরের জমিদার ছিলেন। এবং সেখান থেকেই এসে ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

ঢাকার অধিবাসী ক্যাপ্টেন শাহজাহানও এ জিন্দাবাহার মহল্লার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ২য় মহাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি যে বাড়ীটি ক্রয় করে বসবাস করতেন সেটা ছিলো শ্রীপুরের জমিদার চুনিবাবুর বাড়ী। তৎকালীন ঢাকা শহরের বর্ণাঢ্য এলাকাগুলোর মধ্যে জিন্দাবাহার গলিও একটি। যেমনি ছিলো বিচিত্র এখানকার বাসিন্দারা তেমনি বিচিত্র এ গলির নাম। এ গলিতে নিরক্ষর অথচ দক্ষ বিশেষজ্ঞও বলা যেতে পারে এমন এক দর্জি ছিলো নাম হাফিজ মিয়া। ঢাকার খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে ঢাকার নবাববাড়ীর মিয়া ও সাহেবজাদাগণ হাফিজ মিয়ার কাছ থেকে তাদের পোষাকাদি তৈরি করিয়ে নিতেন। হাফিজ মিয়া খুব রোগা পাতলা ছিলেন। স্বাস্থ্যগত কারণে কিংবা পায়রাপোষা সংক্রান্ত কোন ঘটনার দরুন অনেক সময় তার মন খারাপ থাকতো। এমনি একদিন এক নবাবজাদা ফোর্ড গাড়ী নিয়ে তার দোকানের সামনে নামলেন। কাপড় নিয়ে দর্জি হাফিজ মিয়াকে বললেন এদিয়ে আমার কোট বানিয়ে দেবেন। কিন্তু হাফিজ মিয়া তেমন কোন আগ্রহ না দেখিয়ে তাকে কাপড় রেখে যেতে এবং তিনদিন পর এসে ট্রায়াল দিয়ে যেতে বললেন। একথা শুনে নবাবজাদা বেশ গোস্বাই হলেন। ব্যাটা গায়ের মাপ নিলো না আবার বলে ট্রায়াল দিয়ে যাবেন। আর সেই যে কাত হয়ে শুয়ে আছে সে থেকে একটু নড়লোও না। অগত্যা রাগতঃভাবেই ফেলে গেলেন তিনি কাপড় খণ্ডটি। ঠিক তিনদিন পর গাড়ী এসে থামলো দোকানের সন্মুখে। মনে সংশয় নিয়ে দোকানে ঢুকলেন নবাবজাদা। হাফিজ মিয়া কোন ভঙ্গিমা না করে কোটখানা তাকে পরিয়ে দেখতে লাগলেন ঠিক আছে কিনা। পেছনে একটা ভাঁজের মতো পড়ায় নীল চক দিয়ে দাগ কেটে কারিগরকে কি করতে হবে বলে দিলেন এবং পরদিন এসে কোট নিয়ে যেতে বললেন। নবাবাজাদাতো বিস্ময়ে অভিভূত। লোকটি পরিমাপ না নিয়ে নিখুঁতভাবে

কেমন করে একটি সাহেবী কোর্ট তৈরি করে ফেললো। তাই গাড়ীতে চড়ার সময় ওস্তাদ দর্জির দিকে চেয়ে হেসে বললেন– গজব কার দিয়া, কামাল কার দিয়া ওস্তাদজী। সত্যি কামাল করতে জানতো হাফিজ মিয়া, যা আজকের শিক্ষিত ও আধুনিক পরিমাপ যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করেও সহজে কোন টেইলার মাষ্টার করতে পারে না। হাফিজ মিয়া দর্জি বিদ্যায় অসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন তেমনি পায়রা ধরার ব্যাপারেও তার জুড়ি ছিলো খুব কম। তৎকালে পায়রা উড়ান প্রতিযোগিতা হতো বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায়। অনেক প্রতিযোগিতার পায়রা উড়ানোর স্থান ছিলো নারায়ণগঞ্জ। সেখান হতে পায়রা ছেড়ে তা ঢাকার নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হতো। এরমধ্যে যাদের পায়রা বেশী দলছাড়া হতো তাদেরই হার হতো। হাফিজ মিয়া এসব প্রতিযোগিতার কথা শুনে খুব সক্রিয় হয়ে উঠতেন। তার সাগরেদদের বিভিন্ন স্থানে পাহারায় রেখে পায়রা ছেড়ে দেয়া হতো। অতি প্রত্যুষে প্রতিযোগিতার পায়রাগুলো যখন ঢাকার আকাশে আসতে আরম্ভ করতো। সে কি উত্তেজনা, সে কি উৎফুল্লতা – সেই ক্ষীণকায় লোকটির মধ্যে। প্রায়ই তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পায়রাগুলো অন্যের পোষা পায়রাগুলোকে গার্ড দিয়ে ধরে নিয়ে হাফিজ মিয়ার ছাদে বসাতো। পায়রা প্রতিযোগিতা সাধারণতঃ মুসলমানদের মধ্যেই বেশী হতো। ঢাকার অনেক পরিবার পায়রা পুষতে গিয়ে অথবা প্রতিযোগিতায় নিজেকে নিয়োজিত করে শেষ পর্যন্ত নিজের পরিবারকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন।

জিন্দাবাহারে আরো ছিলেন খ্যাতনামা বৈদ্যরাজ শ্রী কালিকুমার সেন মহাশয়ের প্রথম পুত্র কবিরাজ শ্রী প্রসন্ন কুমার সেন। প্রসন্ন বাবুরও বেশ যশ ছিলো। এটা উনিশশো পঁচিশ-ছাব্বিশের কথা। পৈত্রিক বাড়ী ছিলো ঢাকা জেলার বেলতলী গ্রামে। প্রায় জমিদারের মতোই ছিলো তাদের চালচলন। জিন্দাবাহারের একটি বাড়ীতে বসবাসসূত্রে তারা ঢাকা শহরের বাসিন্দা হন। কবিরাজ মহাশয়ের প্রায় দেড় ডজনের মতো সন্তান-সন্ততী ছিলো। তারমধ্যে সতরতম সন্তান ছিলেন খ্যাতনামা চিত্রকর ও কথাশিল্পী পরিতোষ সেন। এ সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা অনেককাল পূর্বে কাশীধাম থেকে পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন। কবিরাজ প্রসন্না কুমার ছয়ফুট লম্বা ছিলেন। বিরাট ছিলো তার মুখমণ্ডল – লাল মুলোর মতো রাঙ্গা। আর, এমন পুরুষ্ট শরীর হবেই না বা কেন। তখনও ঢাকায় শীতকালে একটাকায় ২০ সের দুধ, সরু সেদ্ধ চালের মন তিন টাকা, দু-আড়াই সেরী ইলিশ মাছ চার আনায়, এককুড়ি ডিম মাত্র দুই আনায় বিক্রি হতো। আর স্বর্ণের মূল্য ছিলো প্রতি তোলা মাত্র ষোল টাকা। প্রসন্ন বাবুর একাডেমিক শিক্ষা খুব বেশী ছিলো না। আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্র ছিলো তার কণ্ঠস্থ। কঠিন

রোগে পীড়িত অনেক রোগী এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় বিফল হয়ে তাঁর চিকিৎসায় ভাল হয়েছেন – এমন অনেক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি নিজেও ঘোড়ার গাড়ী করে রোগী দেখতে শহরের বিভিন্ন স্থানে যেতেন। ঢাকার নবাব-পরিবারেও তার গমনাগমন ছিলো।

সেকালের জিন্দাবাহার আর আজকে নেই। নেই হরিমতি বাইজির ঘর। যেখান থেকে প্রতিদিন ভেসে আসতো ঠুংরি ঠাটের আর ভৈরবী রাগের "রসিয়া তোরি আঁখিয়ারে জিয়া লালচায়" গানের সুর। যে সুরের মাধুর্যে জিন্দাবাহারের অলিগলি নেচে উঠতো গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে। আর হরিদাসীর কথা নাই বা বল্লাম। এই হরিদাসীর দাস হয়েছে কতো জমিদার পুত্র, বিশ্ববিখ্যাত সাতারু, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অবদান রয়েছে এমন লেখক, কবি, যা পরিতোষ সেন বাবুও স্বীকার করেছেন তার গ্রন্থে। এমনভাবে মন-মেজাজ জিন্দা ও বাহারে পরিপূর্ণ করে রাখতো যারা তারা আজ জিন্দাবাহারে নেই। অনেকে চলে গেছে। এতদসত্ত্বেও এখানে সেকালের অনেক পুরনো বাড়ী এখনো আছে। গভীর রাতে তন্ময় হয়ে কান পেতে থাকলে এখানকার অনেক কুঠুরী থেকেই শোনা যাবে নুপুরের রিণিঝিনি ঝংকার, আনন্দ আর বিরহের গানের রেশ। অনেক বাড়ীর দেয়াল ও কড়িকাঠগুলো এখনো সাক্ষী হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে– কতো খুন-যখম আর অসহায় তরুণী-যুবতীদের ধরে এনে এসব ঘরে বাধ্য করা হয়েছে– তাদের যৌবন অসংখ্য জনের মাঝে বিলিয়ে দেবার জন্যে। এখনও অনেক বয়স্ক ঢাকাবাসী বা ঢাকা-ভ্রমণকারী এগলিপথের দিকে চেয়ে তাদের যৌবনকালের অনেক স্মৃতি রোমন্থন করে থাকেন আর মুচকী হাসেন নিজের মনেই। আরো মন্থন করেন সেই দৃশ্যটির কথা, যখন এ পাড়ার বারবণিতারা প্রতিদিন সকালে বুড়িগঙ্গা হতে স্নান করে ভেজা কাপড়ে ফিরতো। ভেজা কাপড় লেপ্টে থাকার ফলে মনে হতো শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেন একটি ফুলের বিভিন্ন পাঁপড়ির মতো আলাদা সত্ত্বা নিয়ে সরল বৃন্তটির উপর দাড়িয়ে আছে। এক একটি পাঁপড়িকে তখন এক একটি ফুল বলে মনে হতো। কাঁখে থাকতো বুড়িগঙ্গার পানিতে ভরা পেতলের কলসী। কলসী আর নিতম্ব দুই-ই মিলেমিশে একাকার, দুই-ই টলমল। এমন সুন্দর, সাবলীল ও বেপরোয়া চলার ভঙ্গি দেখলে মনে হতো যেন নিঃসঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে পা ফেলে চলেছে। আর এভাবে ছন্দময় গতিতে পা ফেলার ফলে দুটি সোনার বাটির মতো তাদের বক্ষস্থলগুলি যেনো নেচে নেচে উঠতো। এইবুঝি করতালের মতো বেজে উঠবে। কারো কারো ঠোঁট দুটি যেন মনে হতো রসালো দুটি কমলা লেবুর কোয়া। আর জিন্দাবাহারের গলিতে

ঢোকার সময় যখন তারা কালীমন্দিরে মাথানুয়ে শ্রদ্ধা জানাতো তখন নিতম্বজোড়া ঝুলে পড়তো। দেখনেওয়ালারা অপলকদৃষ্টিতে দুনয়ন ভরে সেদৃশ্য উপভোগ করতো। সিক্তবসনা নারীদের এই হৃদয়-উদ্ভাসিক রূপ পৃথিবীর প্রায় সকল পুরুষের সূর্যকিরণকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও সজীব করে তোলে। ভুলে যায় পাপ-পূণ্যের কথা। তারা তখন ভাবতে থাকে একই অঙ্গে একই সঙ্গে এতরূপ দেখার জন্যে বিধাতা দুটিমাত্র চোখ দিয়ে পুরুষদের প্রতি কেন অবিচার করেছেন। একদিক দেখতে গিয়ে আরেকদিক বাদ পড়ে যায়। এদের কথা কোন্ সে অনাদিকাল হতে মানুষ শুনতে আরম্ভ করেছে, এদের রূপ-লাবণ্য কবে থেকে মানুষ এমনভাবে দেখতে শুরু করেছে, জানিনা, তবে যতদিন এ পৃথিবী আছে, মানুষ আছে, পাপ-পূণ্য আছে, ততদিন এই চির নতুন দৃশ্যগুলো জিন্দাবাহারে না হোক অন্যত্র থাকবেই থাকবে।

ভারত উপমহাদেশের খ্যাতনামা হাইড মার্চেন্ট থেজারস সাহেব, বিশ্বখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান র‍্যালী ব্রাদার্স ও বিশিষ্ট ইংরেজ মহিলা মিসেস মারিয়াম আব্রাহাম গংদের ১৯৪২ সালে লালবাগ চর এলাকার এক দলিলের বর্ণনায় জিন্দাবাহারের পূর্বনাম মতি নগর ছিলো বলে উল্লেখ রয়েছে। এ দলিলটিতে তৎকালীন বড় বড় জমিদার ও ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দান করেছেন।

আতসখানা লেন। আতসখানা এলাকাটি ঐতিহাসিক লালবাগ দূর্গের নিকট। পূর্বে আতসখানা এলাকাটি বেশ বড় ছিল। এর সীমানা বর্তমান বিষ্ণুচরণ দাস ষ্ট্রীটের কিছু অংশসহ লালবাগ রোডের ঐতিহাসিক খাঁন মুহম্মদ মৃধা মসজিদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। বর্তমানে শুধু একটি গলি পথ আতসখানা লেন নাম ধারণ করে আছে।

মোঘল আমলে আতসখানা এলাকাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। সে আমলে গোলন্দাজ বাহিনীর ঘাটি ছিলো এখানে। তাছাড়া অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী তথা বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র তোপ-গোলাবারুদ ইত্যাদি তৈরি হতো। অগ্নিকে ফারসী ভাষায় আতস বলা হয়ে থাকে। যেহেতু এখানে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা বারুদ তৈরি ও নির্মাণ হতো সেহেতু এ এলাকাটি আতসখানা বলে পরিচিত হয়ে আসছে। যা আজও ঢাকা পৌর করপোরেশনের রেকর্ডে আতসখানা লেন নামে অভিহিত।

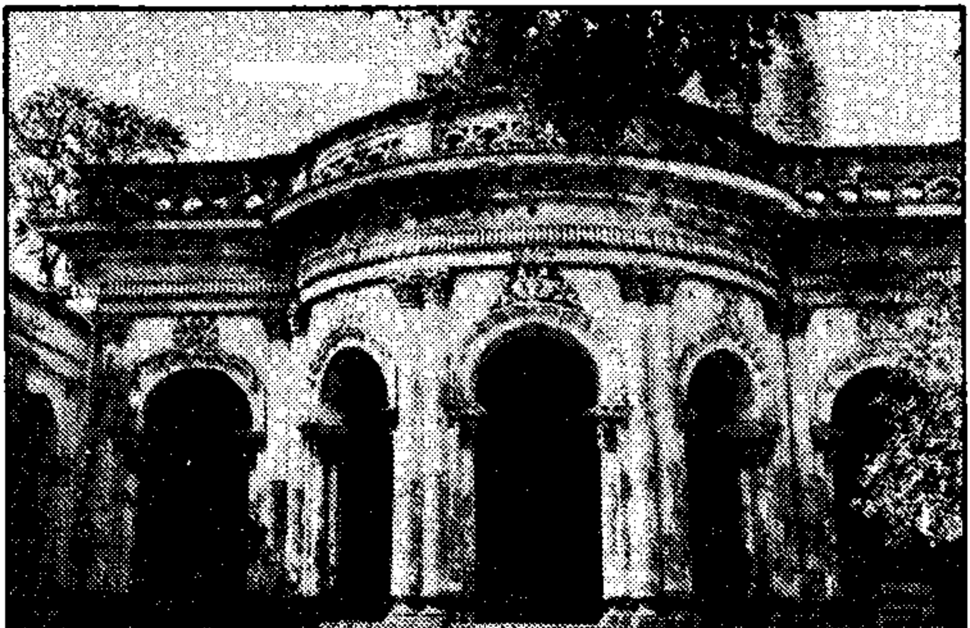
কোন কোন ঐতিহাসিক এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাদের মতে এ এলাকায় পারসিকদের বাসস্থান ছিলো। এখানে পারসিকদের অগ্নিপূজা করার জন্য একটি উপাসনালয়ও ছিলো। আর এই উপাসনালয়ের জন্যেই এ স্থানটি আতসখানা নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৯২৭ সালে এ এলাকায় একটি স্থান খনন কালে পারসিকদের অগ্নি উপাসনালয়ের কিছু নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছিলো। উনবিংশ শতাব্দীতেও ঢাকায় কিছু সংখ্যক পারসিকের বসবাস ছিলো। ইতিহাস বেত্তা হেকিম হাবিবুর রহমান আখুনজাদা রচিত "আসুদ গানে ঢাকা" নামক গ্রন্থে ও পারসিকদের অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর বাড়ীর নিকটস্থ ১৩নং হেকিম হাবিবুর রহমান রোডে প্রায় ১৮৮০ সাল পর্যন্ত কোন এক পারসিকের সমাধি ছিলো। এতেই প্রমাণিত হয় ঢাকায় কয়েকটি অঞ্চলে অন্যান্য জাতির ন্যায় পারসিকদের আবাসস্থলও ছিলো।

আতসখানার নিকটে রয়েছে শেখ সাহেব বাজার। বৃটিশ যুগে এ এলাকাটিও হিন্দু প্রধান অঞ্চল হয়ে পড়ে। মুসলমানদের কোন বসতি ছিলোনা বলে বৃটিশ শাসনামলে কতিপয় শিখ এখানে বসবাস করেছিলো সেই সুবাদে স্বার্থবাদী মহল শেখ সাহেব বাজারের নাম বিকৃত করে শিখ সাহেব বাজার নামে অভিহিত করার প্রচেষ্টা চালায়, শেখ সাহেব বাজার নামের সঙ্গে যে কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে, তাতে বোঝা যায়, মুসলিম শাসনামলে কোন প্রখ্যাত শেখ এখানে বাস করতেন। এবং তিনি একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করায় এলাকাটি শেখ সাহেব বাজার নামে পরিচিতি হয়ে পড়ে যা পৌরসভার নথিতেও বিদ্যমান। শেখের পূর্ণ পরিচয় এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায় নওয়াব নুসরত জংগ ও নওয়াব হাসমত জংগ-এর গৃহ শিক্ষক হাপিজ জয়নুদ্দিন এর বাস ভবন ছিলো শেখ সাহেব বাজারে। তখন এ অঞ্চলটি আজিমপুর ও আতসখানার অংশ ছিলো। হাপিজ জয়নুদ্দিন একজন বড় আলেম ও কোরআনে হাফেজ ছিলেন। নবাব জেসারত খানের দরবারে তাঁর খুব সম্মান ছিলো। তার কোন পুত্র না থাকায় ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে আজিমাবাদের মাওলানা আব্দুল মা'আলীর বংশধর মুন্সি ওয়ারেশ আলী অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ঢাকায় আগমণ করলে তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেন এবং জামাতাকে নিজ বাড়ীতেই রাখেন। তাঁর ঔরসে এ বাড়ীতেই মুন্সি সুবহান আলীর জন্ম হয়। পরিণত বয়স হলে ঢাকায় সঙ্গত টোলায় বসবাসরত কুমিল্লার টুরা পরগণার বনেদী জমিদার শেখ মুহম্মদ আরিফের কন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শেখ সাহেব বলে ঢাকাবাসীর নিকট খ্যাত জমিদার শেখ মঃ আরিফ জামাতা তার জন্মস্থান লালবাগ কেল্লার অনতিদূরে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন তখন হতে এলাকাটি শেখ সাহেব বাজার নামে পরিচিত হতে থাকে। ঢাকা পৌরসভা এ নামটিই তাদের নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করেন যা আজও বহাল রয়েছে। এ মহল্লার ডাক্তার শুধাংশু এল, এম, এফ হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ করে শল্য চিকিৎসায় সুনাম রেখে গেছেন।

আজও তার কথা অনেকে স্মরণ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও তিনি মুসলিম বসতিতে রোগী দেখতে যেতেন।

বৃটিশ যুগে ঢাকা শহরে সাধারণ পাঠাগার ও লাইব্রেরী খুব কমই দেখা যেতো। এ মহল্লার হিন্দু যুবকরা একটি সুন্দর পাঠাগার ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে বহু বৎসর সুচারূপে পরিচালনা করে গেছেন। যার নাম ছিলো হরিদাস পাঠাগার। পরবর্তীতে এটি নবারুণ পাঠাগার নামেও পরিচালিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশ ত্যাগ করার প্রক্কালে এলাকার কিছু সমাজ দরদী ও সংস্কৃত মনা সরকারী কর্মচারীর হাতে এ লাইব্রেরীটির দায়িত্বভার অর্পন করে যান। এখানকার লক্ষীনারায়ণ জির মন্দির ভবনে এখনও বেশ কতক হিন্দু পরিবার বসবাস করছেন। এবং পূজা পার্বনাদি যথাযথভাবে উদযাপন করে আসছেন, মন্দিরটি আজ হতে প্রায় পৌণে দুশো বছর পূর্বে বিজয় পালের পিতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। তজন্য বিজয় পালের মন্দির বলেই এলাকাবাসীর নিকট পরিচিত। মন্দিরটির প্রধান ফটকের উপর নহবতখানা ছিলো। বিভিন্ন পূজা পার্বন বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অষ্টমীর সময় এই নহবতখানা হতে নহবত বাজতো। নহবতখানাটি আজও ছাদ বিহীন অবস্থায় প্রধান ফটকের উপর দাড়িয়ে পূর্ব দিনের কতা স্মরণ করিয়ে দেয়।



শেখ সাহেব বাজারস্থিত লক্ষ্মী নারায়ণজির মন্দির

শেখ সাহেব বাজার ও লালবাগ রোডের সংগমস্থলে তথা আতসখানার সাবেক পশ্চিম সীমানায় মোগল স্থাপত্য আঙ্গিকে তৈরি একটি পুরোনো মসজিদ রয়েছে।

মসজিদটি খাঁন মাহমুদ মৃধা মসজিদ নামে খ্যাত। মসজিদের ফলকের বর্ণনা অনুযায়ী মুর্শিদ কুলিখাঁর সুবেদারী আমলে আইন বিভাগের রক্ষক প্রধান কাজী ইবাদুল্লাহ্‌র নির্দেশে এটি তৈরি হয়েছিলো। সে সময় ফররুখ শিয়র ঢাকার নায়েব নাজিম ছিলেন (১৭০৪-১৭০৬) সম্ভবতঃ খাঁন মাহ্‌মুদ মৃধা এই মসজিদ নির্মাণ কাজের প্রধান রাজ মিস্ত্রী ছিলেন। আর সে জন্যই মসজিদটির নাম খাঁন মাহ্‌মুদ মসজিদ নামকরণ হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে মসজিদটি অত্যন্ত করুণ অবস্থায় ছিলো। সরকারী অবহেলার ফলে এক সময় মসজিদের বহু কক্ষ বিশিষ্ট নীচ তলাটি ঢাকা পৌরসভার বলদ ও গরুর আস্তাবল রূপে ব্যবহৃত হতো। এ আস্তাবলের ভাড়া থেকে মুয়াজ্জিনের বেতন ও মসজিদের অন্যান্য খরচ নির্বাহ করা হতো। বৃটিশ সরকার এটাকে পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাছে এর রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব তুলে দেন পরবর্তীতে আস্তাবল সরিয়ে নিলে কয়েকজন হিন্দু বিভিন্ন দ্রব্যাদির দোকান, কামারশালা ইত্যাদি পরিচালনা করে আসছিলো। বর্তমানে কোন দোকান-পাট নাই।

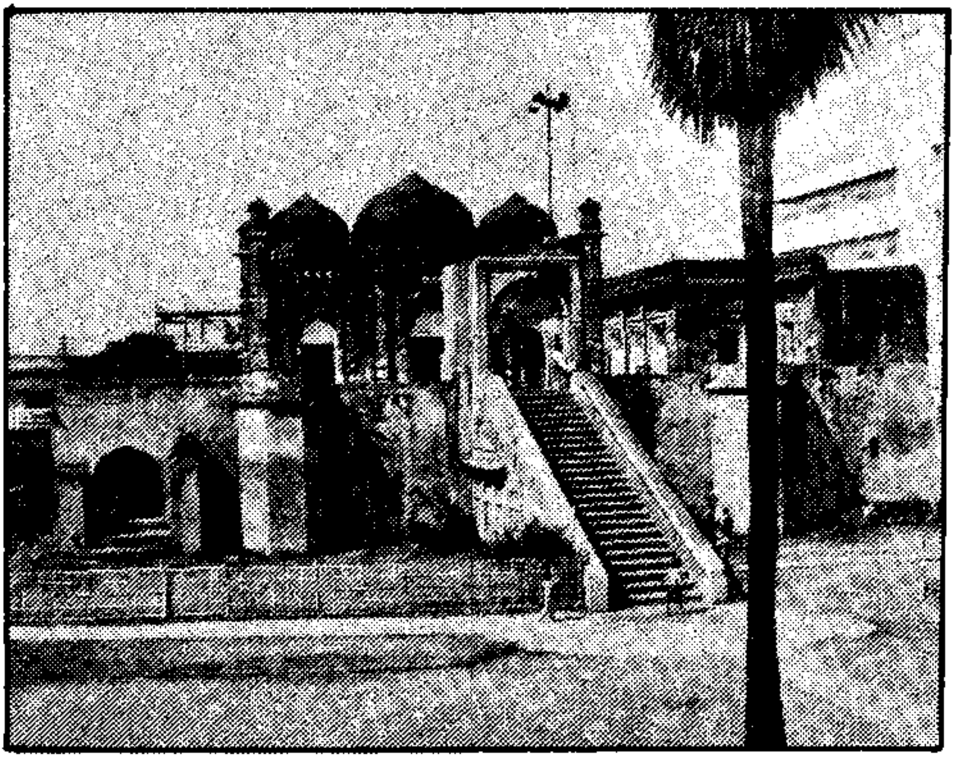
মসজিদটি অতি প্রাচীন হলেও এর গাঁথুনী এখনও বেশ মজবুত রয়েছে। মসজিদটির পূর্বদিকে বিরাট খালি জায়গা মোগল আঙ্গিকে দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো। মনে হয় এ চত্বরটি অত্র এলাকার ঈদগাহ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এখানে দু'একটি সমাধিও রয়েছে। পূর্বে স্থানীয় লোকজন এখানে মান্নত করতো এবং চেরাগ বাতি জ্বালাতো। সমাধিটি নাকি কোন বুজুর্গ ব্যক্তির ছিলো।

ভূতপূর্ব মুতওয়াল্লি এই খালি চত্বরের বেশ কিছু অংশ বিক্রয় বা বন্দোবস্ত দেওয়ায় সেখানে বাড়ীঘর নির্মাণ হয়ে গেছে। ফলে চত্বরটি সংকুচিত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে প্রত্নতত্ব বিভাগ সচেষ্ট হলে মসজিদটির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার হতে পারে। অবশ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মসজিদটির নীচ তলাসহ সংস্কার সাধনে মনোনিবেস করেছেন।

ফলে হারানো সৌন্দর্য্য অনেকটা ফিরে এসেছে। মসজিদটি তাঁর পূর্ব গৌরবের স্বীকৃতি না পেলেও নিজ মহিমায় এ এলাকার গৌরব বহন করে চলেছে।

চৌধুরী বাজার এলাকাটি ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এ মহল্লার বেনজির সরদার সদর রাস্তার ধারে একটি মোকবারা তৈরি করেছিলেন। সেখানে মহররমের সময় লোক ইমাম হোসেনের নামে মানত করে সুতার নারা দিয়ে হাত বাঁধাতো। মোকবারাটি আজও ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া রহিম খলিফা নামে লাঠি খেলার এক নাম করা ওস্তাদ ছিলেন। তার একটি আখড়া অর্থাৎ দল ছিলো, মহররম মাসের প্রথম দিকে বিভিন্ন মহল্লায় লাঠি, তরবারি ও অগ্নি খেলা পরিদর্শন

করতো। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে অন্যান্য মহল্লার ন্যায় এখানেও একটা ডনখানা বা কুস্তির আখড়া ছিলো এতে পাঠান বংশের জমসের খাঁ পালোয়ান নামে এক কুস্তিগীর ছিলেন। তৎকালীন সময়ে ঢাকায় তাঁর মত শক্তিধর পাহ্লওয়ান ছিলো না। এখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আজিমপুর দায়রা শরীফের ভক্ত ছিলেন।



লালবাগ রোডে অবস্থিত ঐতিহাসিক
খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ

চৌধুরীবাজার নামের সঙ্গে মুসলিম শাসনামলের কিছুটা যোগসূত্র রয়েছে। এখানে শহর চৌধুরী অবস্থান করতেন। তাঁর পদটি ছিলো কলকাতা ও বোম্বাইর শেরিফের সমতুল্য। এই চৌধুরীর প্রধান কাজ ছিলো দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, এবং কোতয়ালীর চৌবুতরা (প্লাট ফরম) থেকে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য ঘোষণা করা, বাজারগুলিতে বিবাদ বিসম্বাদ দেখা দিলে তা মিটমাট করে দেয়া। তাছাড়া নতুন গর্ভণর হয়ে আসলে প্রথমে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হতো। এই শহর চৌধুরীর অবস্থান এখানে থাকার জন্যেই এলাকাটি চৌধুরীবাজার নাম ধারণ করে। সে সময় নগর বেলতলী ও বর্তমান জগন্নাথ সাহা রোডের পশ্চিমাংশের কিছু অংশ নিয়ে মহল্লাটি গঠিত ছিলো। ১৮৫৯ সালের মানচিত্রে এ নামের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৃটিশ শাসনামলে চৌধুরীবাজারের পশ্চিমাংশে বহুকাল পর্যন্ত খৈ বিক্রয়ের একটি

কেন্দ্র ছিলো। সে কারণে ঐ অংশটুকু সাধারণভাবে খৈ পট্টি বলে পরিচিত ছিলো। এই খৈ পট্টির একটা বড় চালা ঘরে বিহার প্রদেশের বিভিন্ন জিলা হতে আগত ব্যক্তিরা বসবাস করতো। তারা ঢাকায় কেহ নাপিত তথা ক্ষৌর কাজ, কেহ ঢুলি বা পালকি বাহকের কেহ বা কুলি মজুরের কাজ করতো। সে সময় বাঙ্গালী কুলী মজুর ক্ষৌরকার ঢাকা শহরে খুব কমই ছিলো। এ ঘরের ক্ষৌরকারদের মধ্যে জিতু নাপিতেরই সুনাম ছিলো। তৎসময় ক্ষৌর কাজ তথা চুল কাটানো ঝামেলা এবং কষ্ট ছিলো। আজকের মতো তখন চেয়ারে বসে সাধারণ লোকদের ক্ষৌর কাজ হতো না। আর বর্তমানের মতো সেলুনও ছিলো না। ১৯৪৫-৪৬ সালের দিকে পাঞ্জাব থেকে কয়েকজন মুসলিম ক্ষৌরকার ঢাকায় এসেছিলেন। তারাই প্রথমে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ক্ষৌরকাজ করতো চেয়ারে বসিয়ে। এরাই সোয়ারী ঘাটে চুলকাটার জন্যে সেলুন খোলে। পরবর্তীতে তাদেরই অনুকরণে ঢাকার বিভিন্ন মহল্লাসহ অন্যান্য অঞ্চলেও সেলুনের প্রচলন হয়।

ক্ষৌরকারদের যে ঘরের কথা বলেছি সে ঘরের অস্তিত্ব আর নেই। ঢুলি প্রথা ও পালকী বাহকদের প্রয়োজনও ঢাকা শহর থেকে অনেক পূর্বেই বিদায় নিয়েছে। তাদের এ ধরনের বাসস্থান ঢাকায় বিভিন্ন মহল্লায় ছিলো। এ সব বাসস্থান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু কালের মধ্যেই উঠে গেছে।

১৯৩৯ সালে ঢাকা কো-অপারেটিভ বিষাণ শিল্প সমিতি নামে যে সমবায় প্রতিষ্ঠানটির গোড়া পত্তন হয়েছিলো আমলীগোলায় আমারই বাড়ীতে তা ১৯৫২ সালে এ মহল্লায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে এখানেই স্থায়ী দফতর নির্মাণ করে ১৯৫৮ সালে অফিসটির উদ্বোধন করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খাঁন। সমিতিটি প্রথম দিকে বুতাম, চিরুনী প্রস্তুত কারকদের সহায়ক ছিলো এবং দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জণ করতে সক্ষম হয়েছিলো।

এ চৌধুরীবাজারে বেশ কিছুকাল পূর্বে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহল্লাবাসীগণ। এর উদ্যোক্তা ছিলেন যতদুর মনে হয় আঃ রহিম মাষ্টার নামে এক ব্যক্তি। মহল্লাবাসীর মুষ্টি চাউল দিয়ে মক্তবটি পরিচালনা হতো। এমনিভাবে অন্যান্য মহল্লায়ও এমনতর মক্তব বৃটিশ যুগে প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। পরবর্তীতে কিছু বিত্তশালী ব্যক্তিও মাসিক কিছু চাঁদা দিতেন। ঢাকার নবাব বাড়ী হতেও মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য পাওয়া যেত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর মহল্লাবাসীর চেষ্টায় আজিমপুর এলাকায় এক খণ্ড জমি কিনে টিনসেড নির্মাণ করতঃ স্কুলটি সেখানে স্থানান্তর করা হয় এবং তার নামকরণ হয় চৌধুরীবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়।

(পরবর্তীতে লেখকের প্রচেষ্টায় দালানে পরিণত হয়)।

১৯৩৯ সালে অত্র এলাকার পরোপকারী শিক্ষাব্রতী ডাঃ সুবল দাস ঢাকা পৌর সভার কমিশনার নির্বাচিত হয়ে ঐতিহাসিক লালবাগ রোডের পশ্চিমাংশে (বর্তমান সুবলদাস রোড ও লালবাগ রোডের সংযোগ স্থল হতে ললিতমোহন দাস রোড পর্যন্ত) তার নামে নামকরণ করার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু জনসাধারণের বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতিবাদের ফলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেননা লালবাগ একটি ঐতিহাসিক নাম এ নামের সঙ্গে মোগল শাসনামলের অনেক কীর্তি বিজড়িত রয়েছে। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েও নিবৃত্ত হননি পুণরায় তিনি চেষ্টা করেন। শেষে সফল না হয়ে কিছু দিন পরই চৌধুরীবাজার রোডটিকে তার নামানুসারে সুবল দাস রোড করতে সক্ষম হন। তিনি স্থানীয় কংগ্রেস দলের নেতা ছিলেন। ঢাকা পৌরসভার রেকর্ড পত্রে সুবলদাস রোড লিপিবদ্ধ থাকলেও সাধারণ লোক আজও চৌধুরীবাজার নামেই অবহিত করেন। এর পাশেই রয়েছে কাশ্মীরিটোলা। কাশ্মীরিটোলায় কয়েক যুগ পূর্বেও কিছু সংখ্যক কাশ্মীরিদের বাস ছিলো। তাদের অনেকেই ঢাকার সামাজিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঢাকার উন্নয়নে কাশ্মীরিদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এ এলাকায় এক কালে কাশ্মীরিদের বাসস্থান ছিলো বলেই এলাকাটি আজও কাশ্মীরিটোলা নামে পরিচিত ও পৌরসভার রেকর্ড পত্রে লিপিবদ্ধ।

এখানে বসবাসকারী কাশ্মীরিদের মধ্যে কাজি নাজিবুল্লা নামে এক বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তিনি ঢাকার নবাববাড়ীতে আরবী অর্থাৎ দ্বীনি তালিমে নিয়োজিত ছিলেন। তার এক বোনকে ঢাকার নবাব আঃ গনি বিবাহ করেছিলেন। এই কাজি পরিবারের বংশধর আজও এখানে বসবাস করছেন।

এ মহল্লায় কিছুকাল পূর্বে হাজী আবুল ওহাব বেপারী নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বসবাস করতেন। তিনি একবার ঢাকা পৌরসভার কমিশনার পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি যেমন ধনী ছিলেন অন্যদিকে খুব বিনয়ীও ছিলেন। তার এক মেয়ের বিবাহে সপ্তাহব্যাপী এলাকাবাসীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়েছিলো। প্রবীণ ব্যক্তিরা আজও তার সেই খানাপিনার কথা গর্ভভরে স্মরণ করেন। এলাকাটি কাশ্মীরিটোলা নাম বহুদিন যাবৎ পরিচিত হলেও ১৮৫৯ সালের মানচিত্রে কাসিম নগর বলে উল্লেখিত রয়েছে। তৎকালে এখানে বাদশাহদের অধীনস্থ চাকুরীজীবিগণ বাসবাস করতেন।

নগর বেলতলী মহল্লাটি মোগল আমলে চৌধুরীবাজার অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বৃটিশ শাসনামলের মধ্যবর্তী সময়ে নগর বেলতলী নামটি লোক মুখে প্রচলিত হয়।

এ নামের উৎপত্তির কারণ হলো, এ এলাকায় প্রচুর বেল গাছ ছিলো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন কদমতলী, জামতলী, ফুলতলী, আমতলী ইত্যাদি নামে জায়গার পরিচিতি রয়েছে। তেমনি এ এলাকাটিও বেলতলী নামে পরিচিত হয়। তাছাড়া নগরবাসী নামে এক ঋষির বাসস্থান ছিলো এ এলাকায় তার বাড়ীতে বেল যেমন বড় হতো তেমনি সংখ্যায় অধিক হতো সেই জন্য নগরবাসীর নগর শব্দটিও সেই নামের সঙ্গে যোগ হয়ে নগর বেলতলী নাম ধারণ করে। এ নামের পেছনে কোন ঐতিহাসিক কারণ বা ঘটনাবলী নেই, তবু প্রচলিত নামের উপর ভিত্তি করে আজও এ নামেই এলাকাটি পরিচিত। ঢাকা পৌরসভার রেকর্ডপত্রেও এ নামটি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

এ মহল্লার একাংশে বহুকাল হতে মুসলমানের বাস অন্য আরেক অংশে তফসিলী ঋষি সম্প্রদায়ের বাস। তৎকালীন ঢাকা শহরে রাগপ্রধান সঙ্গীতের ওস্তাদ ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন ও তৎপুত্র ওস্তাদ মুনির হোসেন এদের বাসভবন এ মহল্লাতেই ছিলো। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ে তার অনেক সাগরেদ ছিলো। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলো মরহুম ওয়াহেদুর রহমান ওরফে ছোট্‌কু মিয়া। তিনি এ এলাকার খাকসার নেতা ছিলেন। অন্য দিকে হিন্দু ঋৃষি সম্প্রদায় জুতা, স্যাণ্ডেল ইত্যাদি তৈরি করে জীবনযাপন করে আসছে। আজও এ পেশাতে নিয়োজিত। এপাড়ার স্বর্গীয় হরিমোহন ঋষি, সুধারাম ঋষি ও রূপলাল ঋষি প্রভাবশালী ছিলেন। আরো ছিলেন ভালগীত রচনাকারী আনন্দ মোহন সরকার। এপাড়ার লোকেরা বৃটিশ যুগের মধ্যভাগে তীর-ধনুক-বর্শা দিয়ে নিকটস্থ জঙ্গলে (তখন ঢাকা শহরের উত্তরাংশে অনেক জঙ্গল ছিলো) হরিন, বাঘ ইত্যাদি শিকার করতো। কচ্ছপ শিকারেও তারা সিদ্বহস্ত ছিলো। নিকটস্থ বুড়িগঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলোতে ছোট ছোট নৌকা দিয়ে কচ্ছপ মেরে আনতো। তন্মধ্যে রামেশ্বর, জগৎদাস ও শিকারী সর্বঋষি এবং আরো অনেকে এসব শিকার করেই জীবিকা নির্বাহ করতো। একদা শ্যামলাল ঋষি কচ্ছপ মনে করে আট ফুট লম্বা এক কুমীর মেরে নিয়ে এসে সকলের প্রশংসা ও ঢাকার নওয়াবদের নিকট হতে পুরস্কার অর্জন করেছিলেন। এ কুমীরটি বুড়িগঙ্গা নদীর সংলগ্ন কুয়াত বিল নামক স্থান হতে শিকার করা হয়েছিলো।

এ মহল্লায় সম্রাট আকবরের আমলে একটি কালি মন্দির মহল্লাবাসীগণ প্রতিষ্ঠা করে। অদ্যাবধি মন্দিরে কালি পূজা, দূর্গাপূজাসহ অন্যান্য পূজা-পার্বণ ধূমধামের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। মন্দিরটি তৎকালীন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস পরিদর্শন করেছিলেন। তাছাড়া আরো বিভিন্ন নেতা সময়ে সময়ে

পরিদর্শন করেছেন। তন্মধ্যে (লেখকের প্রচেষ্টায়) মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পরিদর্শনকালে মন্দিরটি উন্নয়নের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করে ছিলেন। এ মহল্লায় অগ্রহায়ণ মাসে দু'দিনব্যাপী মহোৎসব চলে। এ উৎসবে ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে ঋষি সম্প্রদায় ব্যতীতও অন্যান্য তফসিলী সম্প্রদায়ের অসংখ্য নারী-পুরুষ এখানে আগমন করে। এ উপলক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী পঞ্চায়েতের পক্ষ হতে সবার জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা হয়। এ সময় পাড়ায় ছোট-খাটো মেলাও বসে। তখন পাড়াময় আনন্দ উল্লাসে ছোট বড় নর-নারী সকলেই মেতে থাকে। এখনও এ প্রথা চলে আসছে। কিছুদিন পূর্বেও এ মহোৎসব উপলক্ষে যাত্রা, কবিগান, উমুক্ত মঞ্চে নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি চলতো। কয়েক বৎসর যাবৎ দুষ্ট ছেলেদের উপদ্রবে এ ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। তবে মহোৎসবের পূর্বে একমাস ব্যাপী অষ্টপ্রহর কীর্তণ আজও চলছে। এলাকায় ঋষি সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা সাধারণতঃ নিরীহ ও গরীব। কিছুকাল পূর্বেও এরা অন্য কোন এলাকার আত্মীয় স্বজনের বাড়ী গেলে জীর্ণ-শীর্ণ কাপড় পরে জুতোজোড়া কাগজ কিংবা ন্যাকরা দিয়ে পেচিয়ে আত্মীয় পাড়ার নিকটে গিয়ে ওসব পরে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে উঠতো। অন্য পাড়ার তফসিলীরাও অনুরূপ করতো। এদের পূর্ব পুরুষেরা অনেকেই নেংটি পরে থাকতো। এখন অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। নিজেদের বাড়ীতে কুপ বা পানির কল না থাকায় নারী-পুরুষ দল বেধে বুড়ীগঙ্গা নদীর শাখায় একটি নির্ধারিত জায়গায় স্নানাদি করতো। অবশ্য বর্ণ হিন্দু এবং মুসলমান পুরুষ ছেলে যুবারাও সে স্থানে গোসল করতো। সে জায়গার নাম বড় গাঙ বলে এলাকায় পরিচিত ছিলো। আজ আর সে জায়গার চিহ্ন নেই। মলমূত্র ত্যাগও তারা বাড়ীতে গর্ত করে করতো। ফলে বসন্ত কলেরা ও অন্যান্য রোগ লেগেই থাকতো। এ অবস্থা দেখে ১৯৬২ সালের দিকে পৌরসভার মাধ্যমে একটি পাবলিক লেট্রিন তৈরি করিয়ে দেই। তখন পাবলিক টয়লেট আজকের মত ঢাকায় ছিলো না।

নগর বেলতলীর মুস্লিম এলাকাটিতে প্রায় দু'শো বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি ওয়াকফ এষ্টেটের আওতাভুক্ত করা হয়। প্রথম মুতওয়াল্লি হন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি মোঃ আবদুল তুফানী ওরফে আদুর রহমান। তৎপর বংশানুক্রমে মুতওয়াল্লিগণ মসজিদটির দেখাশুনা করে আসছেন। মসজিদটি নগর বেলতলী ও জগন্নাথ সাহা রোড-এর সংযোগস্থলে অবস্থিত। মসজিদের সংগে রয়েছে রাম সাহার আখড়া। বৃটিশ যুগে মসজিদের নিকট বাদ্য বাজান নিয়ে হিন্দু-মুসলিম দাংগা-হাংগামা অনেক হয়েছে। বৃটিশ সরকার আইন করে দিয়েছিলেন

মসজিদের পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ই বাদ্য বাজিয়ে যেতে পারবে না। ১৯৪৫ সালে রিভোনিউসনারী পার্টির (বিপ্লবী সংস্থা) নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসের কারা মুক্তি উপলক্ষ্যে উগ্র হিন্দুগণ এক মিছিলের আয়োজন করে। আমি তখনও তারুণ্য অতিক্রম করিনি। নিলাম্বর সাহা রোডে অনুষ্ঠিত মিছিল আয়োজন সভায় হাফপ্যান্ট পরে যোগ দিয়েছিলাম। ঐ পোষাকে দেখতে হিন্দু ছেলেদের মতোই দেখাতো। তাদের কর্মসূচী শুনে বুকের স্পন্দন বেড়ে যেতে লাগলো, যখন তারা বিভিন্ন মহল্লার মসজিদ গুলোর মধ্যে কোনটিতে বাদ্য বাজাবে আর কোনটিতে বাজাবে না। যখন আমাদের আমলীগোলা মহল্লার মসজিদের নিকট বাদ্য বাজাবে কিনা এ নিয়ে আলোচনা চলছিলো তখন আমার হাত পা কাঁপা আরম্ভ হয়েছিলো শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলো বাদ্য বাজাবে। আর বসে থাকতে পারলাম না। এক প্রকার দৌড়ে এসে আমাদের আজাদ মুসলিম ক্লাবের তৎকালীন কর্মকর্তা ও আমার সাথীদের সংবাদটা দিলাম। দলবদ্ধ হয়ে যেসব মহল্লার মসজিদের নিকট দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে যাবে সে সব মহল্লার পরিচিত যুবকদের ও মুসুল্লিদের অবহিত করা হলো। সেই সঙ্গে রুখে দাড়াবার জন্যও অনুরোধ জানানো হলো। সংবাদটা দিয়ে যখন নিজ মহল্লার মুরুব্বী প্রধানদের অবহিত করা হলো তখন কথাটি তারা মোটেই বিশ্বাস করলেন না। শেষ পর্যন্ত আজাদ মুসলিম ক্লাবের তরুণ যুবা ও কিশোরগণ সিদ্ধান্ত নিলো নিজেরাই প্রতিরোধ করবে। নির্ধারিত দিন বিকাল বেলা মসজিদে সমবেত হলো অধিকাংশই। মিছিল বের হয়েছে জানতে পেরে যে সকল মসজিদের নিকট দিয়ে বাদ্য বাজাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সব মসজিদে ক্লাবের একজন করে সদস্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো খবর নেওয়ার জন্য, খবর আসতে লাগলো। আমলীগোলা মহল্লার অতি নিকটস্থ ঐতিহাসিক খান মাহমুদ মসজিদের নিকট দিয়ে তারা বাদ্য বাজিয়ে গেছে। একটু পরে আরও খবর আসলো আমাদের জগন্নাথ সাহা রোডের দলতি বাজার মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাজিয়ে এদিক আসছে। সবার বুক দুরু দুরু করতে লাগলো, কার মৃত্যু হবে কে আহত হবে। শেষ পরিণতি বা কি হবে। চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে ক্লাব সদস্য ও মহল্লাবাসী যুবকদের মধ্যে। মসজিদ থেকে দেখা গেলো মিছিল এগিয়ে আসছে। আইন অমান্য করে তারা এগিয়ে আসছে, এবার তারা মসজিদের অতি নিকটবর্তী এসে গেছে, মাত্র পনর বিশ গজের ব্যবধানে, দপাদপ করে কয়েক জন যুবক লাঠি ও বর্শা হাতে লাফিয়ে পড়লো মসজিদ থেকে সড়কে। রুখে দাঁড়ালো মিছিলকে। অনেকেই ইট পাথর মারার জন্য তৈরি হয়ে আছে। অবস্থা বেগতিক দেখে রিকশা আরোহিত বিপ্লবী নেতা পূর্ণ চন্দ্র দাস বারণ করলেন বাদক দলকে।

সামান্য হাতাহাতি হলো, পরে নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল চলে গেলো আমলীগোলা মহল্লার মুসলিম এলাকা হতে। মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে এলো। উত্তেজিত আর আল্লাহর ঘরের পবিত্রতা রক্ষার মানষে উৎসর্গীত যুবকবৃন্দ নামাজে যোগ দিলেন। নামাজ শেষেই লোকের ছুটাছুটি দেখে কিছুটা আন্দাজ হয়ে গেলো সামনের নগর বেলতলী মসজিদে নিশ্চয়ই গোলমাল হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ পর সঠিক খবর এলো। মাগরিবের নামাজ আদায়ে আগত মুসল্লিরা বাদ্য থামাতে বলায় হাঙ্গামা বেঁধে যায়, যার ফলে মিছিলকারীরা মসজিদ এবং পার্শ্ববর্তী দু'তিনটি বাড়ীতে লুট ও অগ্নিসংযোগ করেছে। কয়েকজন হতাহতও হয়েছে। সে দিনের সেই হাঙ্গামা ঢাকার বুকে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত করেছিলো।

ডুরি আংগুল ঢাকা মহানগরীর একটি প্রাচীন মহল্লা। এককালে মহল্লাটি বেশ বড় ছিলো। মোগল আমলে এবং বৃটিশ যুগের মধ্যভাগেরও বেশীকাল পর্যন্ত এখানে কাপড় ও চাদরে হাতের সূক্ষ্ম ফুল ও জরির কাজ করা হতো। তা ছাড়া সুতার অন্যান্য কাজও হতো। এ এলাকার নাম ডুরি আংগুল কেন হলো, তার বিশদ তথ্য জানা না গেলেও ডুরিয়া আংগুল নামটি মোগল আমল থেকেই চলে আসছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার মানচিত্রে ডুরিয়া আংগুল বলেই এলাকাটি চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ মোগল আমলে যেমন ঢাকাই মসলিন পৃথিবীর বুকে খ্যাতি অর্জণ করে ছিলো, তেমনি তুরস্কের সৈন্যদের জন্য রফতানীকৃত ঢাকা বুটিদার কাশিদা বস্ত্র, ডুরিয়া কাপড়ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। সেই ডুরিয়া কাপড় হয়তো এখানেই তৈরি হতো। ডুরি হচ্ছে সুতার অপর নাম। মোগল আমলের রাজকীয় ভাষায় ডুরিয়া-বাংলা ভাষায় ডুরি দিয়ে হাতের আংগুল দ্বারা কাপড়ের উপর নানা রূপ কারুকার্য অথবা ডুরিয়া কাপড় আংগুল দিয়ে বয়ন করা হতো বলেই এলাকাটি ডুরিয়া আংগুল নাম ধারণ করেছিলো। কেননা তখনকার দিনে পেশা ভিত্তিক এলাকার নাম হতো। যেমন তাঁতীবাজার, শাঁখারীবাজার, গোয়ালটুলী, মালীবাগ, কাজগীটোলা, জামদানীনগর, সিক্কাটুলী, গোয়ালনগর ইত্যাদি। ডুরিয়া আংগুলই কালক্রমে বাংলা ভাষায় ডুরি আংগুলে পরিণত হয়েছে। এই ডুরি আংগুল লেনের অধিবাসী ছিলেন জুম্মন মিয়া নামে এক বিশিষ্ট সমাজ হিতৈষী ও রাজনৈতিক কর্মী।

জুম্মন মিয়া একজন সংগ্রামী তেজস্বী পুরুষ এবং প্রকৃত সমাজ সেবক ছিলেন। পরবর্তীতে রাজা মিয়া নামে ঢাকাবাসীর নিকট পরিচিত হন। এই রাজা মিয়া নাম ধারণ এক অস্বাভাবিক ঘটনা। জুম্মন মিয়া এ মহল্লার অন্যান্যদের ন্যায় মহিষের শিং-এর চিরুণী প্রস্তুতের কাজ করতেন। ব্যবহারিক জীবনে তিনি ছিলেন নিরক্ষর।

নিরক্ষর হলেও তিনি এলাকার মুসলমান ছেলেরা যাতে লেখা পড়ায় মনোযোগ দেয় তজ্জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। সে সময় মুসলমান ছেলে মেয়েরা লেখা-পড়ায় আগ্রহী ছিলনা। পিতা-মাতারাও ছিলো পরান্মুখ। তারা লেখা পড়ার চেয়ে হাতের কাজ শিখে সংসারে সাহায্য করবে এটাই চাইতেন। লেখা-পড়া শিখে চাকুরী করতে হবে - এর থেকে পান বিড়ি চায়ের দোকান কিংবা ঘোড়ার গাড়ী চালনাকেও নিজের স্বাধীন ব্যবসা হিসেবে মনে করতেন। সেই সময়ই জুম্মন মিয়া নিজে নিরক্ষর হয়েও অপরে যেন নিরক্ষরতার অভিশাপে না জ্বলে তজ্জন্য সে এলাকায় নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৎকালে যে কজন মুসলমান ছেলে মেয়ে পড়াশুনা করতো তার অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেই ক্ষান্ত দিত। খুব কম পিতা মাতারাই তাদের ছেলে মেয়েকে মাধ্যমিক স্কুলে প্রেরণ করতো, আবার তাদের অনেকেই স্কুল হতে পলায়ন করে খেলা ধূলা বা গর্হিত কাজ করে যথা সময়ে ঘরে ফিরতো। এই জুম্মন মিয়া সেই সব ছেলেদের ধরে অকৃত্রিম ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে নিয়ে স্কুলে দিয়ে আসতো। ঐ এলাকায় পরবর্তীকালে যারা নেতৃত্বদান করে গেছেন তাদের অনেককেই জুম্মন মিয়া ধরে নিয়ে স্কুলে বসিয়ে এসেছেন। তাদের মধ্যে সাবেক পৌর কমিশনার আলহাজ্ব শুকুর মহম্মদ (মরহুম) কালের স্বাক্ষী হিসেবে কতকদিন পূর্বেও ছিলেন। তিনি শুধু শিক্ষা বিস্তারেই উৎসাহী ছিলেন না এলাকার তরুণ যুবকদের শরীর গঠনে, খেলার প্রসারেও যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। তিনি ভুরি আংগুল স্পোটিং ক্লাব নামে একটি ক্রীড়া সংস্থা গঠন করে ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ও অন্যান্য শরীর গঠনমূলক খেলা ধূলার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন তৎকালীন ঢাকার নবাব আতিক উল্লাহ সাহেব আর সহ-সভাপতি ছিলেন জুম্মন মিয়া। এতেই অনুমান করা যায় যে, ক্লাবটির গুরুত্ব কত ছিল তৎকালীন মুসলমানদের কাছে।

এই অক্ষর জ্ঞানহীন সংগ্রামী পুরুষ দেশের আজাদী হাসিলের সংগ্রামে যেমন বিপুল অবদান এবং রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে উচ্চ মহলে স্বীকৃতি লাভ করে গেছেন। তেমনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কর্ম ও কর্তব্য পরায়ণতার জন্য “বীর বালক রাজা” উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সে এক কাহিনী। জুম্মন মিয়া সাধারণ সেচ্ছাসেবক হিসেবে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে কর্ম দক্ষতা ও সৎ সাহসের জন্য সাধারণ কর্মী থেকে ঢাকা জেলার সহকারী ক্যাপটেন পদে আসীন হয়েছিলেন। বিলেতি বস্ত্র বর্জন আন্দোলন সফল করার ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিলো অটল অনড়। বড় বড় ব্যবসায়ীকে পাকড়াও করতে

পিছপা হতেন না। অনেক কর্মী আবার পূর্বে আমদানী করা মাল বলে গোপনে অর্থের বিনিময়ে দলীয় ছাপ মেরে দিতেন, যাতে বিনে বাধায় বিক্রি করতে পারে। এ সকল কর্মীদেরও তিনি পাকড়াও করতেন। ব্যবসায়ী মহল ও তার কিছু কিছু সহকর্মী প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়েও তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। কর্তব্য কর্মে তিনি নির্ভীক সৈনিক এর ভূমিকা পালন করে গেছেন। স্বার্থপর কাজ করার জন্য বহু কর্মীকে তিনি দল থেকে বহিস্কার করে দিয়েছেন।

দলীয় নেতাদের প্রতি তার ছিলো অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। একবার তিনি দলীয় নেতাদের পরামর্শে বহু বিলেতি কাপড় উদ্ধার করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এই অপরাধে তার বিচার চললো, দলীয় নেতাদের কারো নাম না বলে সকল দায়দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নিলেন। বিলেতি পণ্য বেচাকেনা বন্ধের দাবীতে তিনি বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহে দিনের পর দিন পিকেটিং চালাতেন। এ জন্য তাকে সাতবার জেল খাটতে হয়েছে। কারাগার থেকে ফিরে এসে পুনরায় দুর্বার গতিতে আন্দোলন শুরু করে দিতেন। তার এই সততা, সাহস, নিষ্ঠা ও নির্ভিকতার জন্যে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস, খেলাফত ও স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষ হতে ঢাকা সদরঘাট স্থিত তৎকালীন করনেশন পার্কে এক বিরাট জনসভায় এই দৃঢ় চেতা নির্ভীক সত্যশ্রয়ী তরুণ কর্মী জুম্মন মিয়াকে "বীর বালক রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন স্বয়ং দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সেই সঙ্গে একটি রূপোর প্লেটে সার্টিফিকেট এবং রূপোর এক ছড়া হার প্রদান করেছিলেন। সে দিন থেকে জুম্মন মিয়া সকলের কাছে, দেশবাসীর কাছে "বীর বালক রাজা জুম্মন মিয়া" নামে পরিচিত হন। পরবর্তীতে তার জুম্মন মিয়া নামটি রাজা উপাধির আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। এলাকাবাসী শুধু রাজা বলেই তাকে সম্বোধন করতো। খেলাফত ও স্বদেশী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে এই রাজা নামের জন্য তারই এলাকাবাসী হতে অনেক ঠাট্টা মসকরা ও বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছিলো। লোকে বলতো কাজে ফাঁকি দানের জন্যই বার বার আন্দোলন করে জেলে যেতো। মুফতে খাবার জন্যে।

১৯৭০ সালের দিকে জুম্মন মিয়ার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেদিনও এই বৃদ্ধের অমিত তেজ ও দৃঢ় মনোবল দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারিনি। তখনও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এতটুকু ম্লান হয়নি। এই সাহসী তেজস্বী পুরুষ বৃদ্ধ বয়সে দারিদ্রের করাল গ্রাসে বহুদুঃখ কষ্ট ভোগ করে গেছেন। তাকে বাড়ীতে খুঁজতে গিয়ে কিছু কথা কর্ণগোচর হলো। "চেয়ারম্যান সাব কারে বিছরান, সুইস্‌তা (অলস) রাজারে, সে ফাট্টা খেতায় হুইয়া হাচ্চারি রাজা অইবার চায়" কথাগুলো শুনে প্রতিবাদ না করে পারিনি, পারিনি

একজন সাচ্চা দেশ প্রেমিক ও স্বেচ্ছাসেবীকে পরিহাস করতে দেখে। কিন্তু কার কথা কে শুনে, সকলেরই ধারণা কাজে ফাঁকি দেবার জন্যেই সে এসব করতো। এলাকাবাসী নিজেরা পুনঃ উপাধি দিয়েছে সুইসতা রাজা (অলসরাজা)।

তার সংসার ছিলো খুবই ছোট। এক মাত্র স্ত্রী ও পালক কন্যা। স্ত্রী ও অনেক দিন হলো মৃত্যুবরণ করেছে। দারিদ্র ও অসহায়তা ছিল তার নিত্য সঙ্গী। এমতাবস্থায় দৃষ্টিহীন হয়ে টিমটিমে কুপির মত কোন প্রকারে জ্বলছিলো। প্রায় বছর ছ' হলো দপ করে নিভে গেছে।

মরহুম জুম্মন মিয়া সমাজের জন্যে দেশের আজাদীর জন্যে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে বিনিময়ে সমাজের কাছ হতে পেয়েছেন অবহেলা, ঠাট্টা আর বিদ্রুপ। দেশের স্বাধীনতার জন্য তার মত এক জন নগণ্য গরীব লোক যে পরিশ্রম করে গেছেন, তার নজীর বিরল, দেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান হলো। পাকিস্তান ভাগ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলো, অনেক নেতা কর্মী দেশ বরেণ্য হয়েছেন। অনেক কপর্দকহীন আংগুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে। কিন্তু জুম্মন মিয়া সমাজ ও দেশ থেকে কি পেয়েছেন? এমনকি তাকে কেউ সহানুভূতিও দেখায়নি। সুসাহিত্যক সত্যেন সেনের "অভিযাত্রী" পুস্তকে এবং আমার "কিংবদন্তী ঢাকা" গ্রন্থের পূর্বের সংস্করণে তার সম্পর্কে ছাপা হওয়ার পর স্থানীয় কিছু তরুণ-যুবা কিছুটা সহায়তা করেছিলো জীবনের শেষ প্রান্তে কিন্তু তাও ছিলো অকিঞ্চিতকর।

তার এই শেষ বয়সের কষ্ট দেখে বারবার মনে হয় এই ধরনের সমাজ দরদী যারা দেশ ও সমাজের জন্যে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করতে করতে এমনিভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় অথবা দেশ ও দশের জন্যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে বুকের রক্ত জাতির জন্যে বিলিয়ে দেবে, তাদের জন্য রাষ্ট্র, দেশ জাতি বা সমাজের কি কিছুই করণীয় নেই? এদের জন্যে চিন্তা করার এতটুকু অবকাশ কি কারোর নেই?

দেশ ও সমাজের উন্নয়নে সবাই সোচ্চার, কিন্তু আশ্চর্য লাগে এ ধরনের সমাজ হিতৈষীদের বা তাদের এতিম ছেলে মেয়েদের পুনর্বাসন এর পরিকল্পনার কথা কেউ বলেন না। অবশ্য প্রকৃত সমাজ সেবীরা এসব ব্যাপরে কোন রূপ মাথা ঘামায় না। সমাজ সেবা প্রকৃতি প্রদত্ত আল্লাহর দান। ধনেজনে মানে সম্মানে অনেক উচ্চাসনে সমাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের মধ্যেই সামান্য উপকার করার মনোবৃত্তি দেখা যায় না। আবার দেখা যায় অতি দীনহীন ব্যক্তিও অকাতরে সমাজ সেবার মহানব্রতে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। একারণেই বলতে হয় আল্লাহ যাকে মানব সেবার তৌফিক দেন তিনিই সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। সে ব্যক্তি ধনী আর

নির্ধন যেই হোন না কেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়ার (শহীদ) কাছে প্রকৃত সমাজ কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। অনুরোধে ছিলো প্রকৃত সমাজ সেবীদের সমাজের সর্বস্তরে যথাযোগ্য মর্যাদা দান, নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছা সেবীদের শেষ বয়সে যাতে পরিবার পরিজন নিয়ে আর্থিক বিপর্যয়ের শিকার হতে না হয় এবং ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দশের উপকারার্থে যদি কোন স্বেচ্ছাসেবী আহত বা নিহত হন, তা হলে যাতে তার পরিবার পরিজন অর্থাভাবে দ্বারে দ্বারে হাত না পাতেন তজ্জন্য "স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণ ট্রাষ্ট" গঠন করে তার মাধ্যমে সে সব পরিবারের পুনঃর্বাসনের ব্যবস্থা করা। সম্ভব হলে সামান্য প্রিমিয়ামের বিনিময়ে জীবন বীমার ব্যবস্থা করা। তিনি কোন উপযুক্ত প্লাট ফর্ম হতে প্রস্তাবাকারে তার নিকট পাঠাবার জন্য বলেছিলেন, সে মতে আমি ১৯৭৯ সালের ১৫ই জুন জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদের বার্ষিক সভায় এবং পরে ঢাকা পৌর করপোরেশনের সভায় উপরোক্ত প্রস্তাব পেশ করি এবং তা যথারীতি গৃহিতও হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এর প্রতিফলন দেখতে পাইনি।

আমার পূর্বের প্রস্তাবটি নিঃস্বার্থ কর্মীদের স্বার্থে বর্তমান সরকারকে বিবেচনা করতে হবে, বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি এরূপ ব্যবস্থা নিলে নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাসেবীদের সামাজিক নিরাপত্তার অনেকটা সমাধান হবে। সমাজ কর্মীদের মনোবল বাড়বে। উৎসাহিত হবে তারা এবং তাদের অভিভাবকরা। অনুপ্রেরণা পাবে কাজ করতে ও করাতে। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে অংশ নিতে বারণ করবে না অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সমাজ সেবার তৌফিক দিন। শান্তি দিন জুম্মন মিয়ার অশান্ত আত্মাকে। যার বক্ষ পিঞ্জরে শত দুঃখ যাতনা, লাঞ্চনা-গঞ্জনা, বিদ্রুপ কটু কথার তীক্ষ্ম সরের প্রচুর আঘাত নিয়ে গেছেন।

১৮২৪ সালের দিকে ঢাকার মেজিষ্ট্রেট ছিলেন মিঃ এলিয়ট, ঢাকার আইন শৃঙ্খলা ও চৌর্য্যবৃত্তি হ্রাসের উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা শহরে চৌকিদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তখন ঢাকায় গৃহ সংখ্যা ছিলো একুশ হাজার। গৃহ প্রতি দুই আনা কর ধার্য্য করে চৌকিদারী ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করেন। ফলে শহরে চুরি ডাকাতি অনেকাংশে হ্রাস পায়।

এই সব চৌকিদারগণ সাধারণতঃ শহরের পশ্চিমাঞ্চলে পীলখানার পশ্চিমে আবাসস্থল গড়ে তোলে, ফলে এলাকাটি চৌকিদারের স্থলে চোকদারটুলী পরে আরো অপভ্রংশ হয়ে চৌদারটুলি বলে আখ্যায়িত হয়।

এ মহল্লার পাশে রয়েছে গণকটুলী। ভাগ্য গণনাকারীগণ এখানে বাস করতো বলেই এলাকাটি গণকটুলী নামে সবার কাছে পরিচিত হয়ে আসছে। এক সময় ঢাকায় হিন্দু জ্যোতিষীদের দৌরাত্ম খুব বেড়ে গিয়েছিলো। ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা এমনকি অধিকাংশ মুসলমান পরিবারের লোকজনও তাদের শরনাপন্ন হতো। জ্যোতিষীরাও সুযোগ বুঝে সরল মতি গৃহকর্ত্রীদের কাছে উপস্থিত হয়ে নানা ভূত-ভবিষ্যতের কথা বলে, কখনও ভয় কখনও আশার বাণী শুনিয়ে যতটুকু পারতো দক্ষিণা আদায় করে নিতো। টাকা পয়সা না থাকলে চাল ডাল আলু ইত্যাদি গ্রহণ করতো। এদের মধ্যে কেউ কেউ কুষ্ঠী প্রণয়ন করতো এবং কার কি রাশি তা সঠিক ভাবেই বের করতে পারতো। চুরির ব্যাপারে চাল পড়ার প্রচলন এই গণনা কারীরাই করে, এ ব্যাপারে এদের দক্ষতাও ছিল প্রচুর।

বর্তমানে এ ধরনের জ্যোতিষী আর বড় বেশী দেখা যায় না। তবে ঢাকার প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক এলাকায় প্রফেসর নামধারী ভাগ্য গণনাকারী জ্যোতিষী এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা সেই সঙ্গে বিভিন্ন জনকে তাদের ভূত-ভবিষ্যত, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, চাকুরী-বাকরী, সম্মান যশ ইত্যাদির জন্য পাথর নির্দ্ধারিত করে দেন, অবশ্য পাথর পরিধানের রেওয়াজ বহু পূর্বকাল থেকে চলে আসছে। আমাদের রাসুলে করিম (দঃ)ও পাথর পরিধান করতেন বলে জানা যায়। পাথর ও মুক্তা যে মানুষের কল্যাণের জন্যই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন তা পবিত্র কোরানের একটি আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে। যাক সে কথা, ঢাকায় কোন খুপরির মত স্থানে অথবা ফুটপাতেও এক শ্রেণীর বিড়াল তাপসী জ্যোতিষী দেখা যায় তারাও সুযোগ বুঝে নিরীহ পথচারীদের হাত দেখে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। তবে এ জ্যোতিষী ব্যবসা আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। বর্তমানে এদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাও গড়ে ওঠেছে। অবশ্য পূর্ব ও মধ্য যুগের ইতিহাস দেখলেও এদের প্রভাব রাজা-বাদশাদের উপরেরও যে ছিলো তার প্রমাণ পবিত্র গ্রন্থসমূহেও পাওয়া যায়।

বর্তমানে ভারতের কোন কোন হাসপাতালে ডাক্তারদের সঙ্গে একজন জ্যোতিষীবিদ্যার প্রফেসর তথা এ্যাস্ট্রোলোজার নিয়োজিত আছেন। সরকার তথা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। এরা রোগের ডাক্তারী চিকিৎসার সাথে পাথর ব্যবহার করার এবং চালচলন সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এমনি একটি ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত হয়ে পড়ি এবং পাথর পরিধানে সম্মত হই।

১৯৭০ সালে আমি প্রথম হৃদরোগে আক্রান্ত হই। অবশ্য পূর্ব হতেই ব্লাড প্রেসার ছিলো। তৎকালীন ঢাকার ও করাচীর খ্যাতনামা ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন হই।

স্বাধীনতার পরও বার বার হৃদের এনজেনা ব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে কয়েক বারই দেশ বিদেশের হাসপাতালে ভর্তি হই। ১৯৮৫ সালে ভারতের একটা ম্যাগাজিনে এক প্রবন্ধে দেখতে পেলাম বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ কায়া চিকিৎস্যা ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সাইন্স এণ্ড এস, এস, হাসপাতালের ফ্যাকালটি অফ আয়ুর্বেদ কর্তৃক এনজেনা ব্যাথায় পূর্ণ আরোগ্যের এক ঔষধ আবিষ্কার করেছেন যার নাম "পুসকর বাহমী গুগগুলু"। বর্তমান এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় এনজেনা ব্যাথার পূর্ণ আরোগ্যের কোন ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয়নি। যা আছে তা সাময়িক উপশমের জন্যে। আমি প্রবন্ধটির কথা আমার ডাক্তারদের শুনালে তারা কোন গুরুত্ব দিতেন না বরং হেসে উড়িয়ে দিতেন। ১৯৮৬ সালে একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পুনরায় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নীত হই। এবার ডাক্তারগণ প্রমাদ গুণলেন। তবুও আল্লাহর অশেষ রহমতে বাসায় ফিরে আসি। হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার একদিন বল্লেন আপনার যেখানে মন চায় যেতে পারেন। যে চিকিৎসাই করাতে চান করাতে পারেন। তার কথায় আমি উৎসাহিত হয়ে বানারস হাসপাতালের কায়া চিকিৎসার ডীন ডঃ এস, এন, ত্রিপাঠীর নিকট আমার রোগ বৃত্তান্ত দিয়ে পত্র পাঠালাম, তিনি পত্রের জবাবে বললেন বানারসে আসতে হবে। দেখে চিকিৎসা করলে ভাল হবে। সে মতে পুত্রকে সাথে নিয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করে রওয়ানা দিলাম– সাক্ষাৎ হলো ডীন ত্রিপাঠী বাবুর সঙ্গে বানারস ইউনিভার্সিটির পি, এইচ, ডি অধ্যায়নরত কবীর চৌধুরী নামে এক বাঙ্গালী ছাত্রের মাধ্যমে। ডঃ ত্রিপাঠী পরবর্তী দিবসে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই পুসকর গুগগুলু বড়ি-সঙ্গে আরো কিছু ঔষধ পত্র দিলেন এবং ঔষধ নিয়মিতভাবে ৪/৫ মাস পর্যন্ত খাওয়ার কথা বললেন। সেখানে যে কদিন ছিলাম একজন অতিথির মতই ব্যবহার করছেন। সে ঔষধ নির্দ্ধারিত মাস সেবনের পর ব্যাথার প্রকোপ ও তীব্রতা অনেকাংশে কমলো। কিন্তু কয়েক মাস পরই আবার ব্যাথা বার বার হতে লাগলো, ডঃ ত্রিপাঠীকে পত্র দ্বারা অবগত করলে তিনি পুনরায় এসে চেক করিয়ে ঔষধ নিয়ে যেতে অনুরোধ জানালেন।

১৯৮৭ সালে এপ্রিল মাসে স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিয়ে পুনরায় হাসপাতালে যাই। সেদিন ট্রেন দেরীতে পৌঁছুলে সন্ধ্যায় ডীন ডঃ ত্রিপাঠীর বাসায় সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে যাই। তিনি সাধারণভাবে পরীক্ষা করে বললেন ঠিকই আছে, তবে সকালে হাসপাতালে যেয়ে রক্ত ও অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে তার রুমে যেতে বল্লেন। ভোর রাত্রে হোটেল বয়ের তাগিদে ঘুম থেকে উঠে দেখি হাত-পা ঠিকমত ফেলতে পারছিনা, মুখহাত ধুতে পারছিনা, বাথরুমের বাতি জ্বালাতে পারছিনা। ভয় পেয়ে

গেলাম। কিছুই বুঝতে না পেরে প্রতুষ্যে পুত্রের ও হোটেল কর্মচারীদের সাহায্যে বেবী ট্যাক্সী করে হাসপাতালে পৌঁছুলাম। পূর্ব থেকে কবীর ডঃ ত্রিপাঠীর কক্ষের নিকট বসে ছিলো। তখনও প্রফেসর আসেননি। যখন আসলেন দূর থেকে আমাকে দেখেই বলে উঠলেন আপনার এ অবস্থা কেন? দুজন ডাক্তারকে বল্লেন তার কক্ষের টেবিলে শুইয়ে দিতে এবং রক্তসহ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে।

এই ধরা ধরির মধ্যে আমার পকেটের নেম কার্ডগুলো পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর একজন এসে আমাকে আমার পূর্ব পুরুষের পরিচয় এবং আমার জন্ম বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন আমি কোন রূপে কিছু কিছু জবাব দিলাম, কিন্তু উপস্থিত ডাক্তারদ্বয় তাকে বাধা দিয়ে বললেন ডীন বারণ করে গেছেন। লোকটি যেটুকু শুনলেন তা টেবিলে বসে কি যেন লিখছে বা আঁকছে। পরে আবার আসলে আমি রাগত স্বরে বললাম কেন উত্ত্যক্ত করছেন। সে বললো আপনি ঢাকা মহানগরী রেড ক্রসের ভাইস চেয়ারম্যান। আর আমি বানারসের রেড ক্রসের সেক্রেটারী এবং এ হাসপাতালের এ্যাসট্রোলোজিষ্ট। অতএব আপনার মঙ্গল কামনা আমার লক্ষ্য। ডাক্তারদ্বয় আবার বাধা দিয়ে এবার বল্লেন তার ব্রেনস্ট্রোক হয়ে প্যারালাইসিস হয়েছে এখনও রোগের প্রতিক্রিয়া চলছে। অতএব তাকে প্রশ্ন করবেন না। এবার আমি বুঝতে পারলাম আমার বাঁদিকটা পুরোপুরি প্যারালাইজ। ভয় হলো সঙ্গী-পুত্র কন্যাদের জন্য। ওদিকে ডাক্তারের কথামত কবীর চৌধুরী বিভিন্ন স্থানে দৌড়াচ্ছে ঔষধপত্র যোগাড় করতে। ডাক্তারদ্বয় আমার রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য বাইরে গেছেন। এ ফাঁকে জ্যোতিষ ভদ্রলোক এসে প্রশ্ন শুরু করলেন আমিও সুযোগ বুঝে বিরক্তি সহকারে জ্যোতিষ ডঃ মুরলীধর পাণ্ডেকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম কি জন্যে এরূপ করছেন। সে বললো আপনার ঔষধের সঙ্গে আমি কয়েকটা রত্ন–পাথর ব্যবহার করতে দেবো, আপনার পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনে। বললাম আমি জ্যোতিষ বিদ্যা ও পাথরে বিশ্বাস করিনা। সে বললো ঔষধে বিশ্বাস করেন এবং ঔষধ কি কি দ্রব্য দিয়ে তৈরি হয়? আমি যতদূর জানি বললাম তন্মধ্যে মিনারেল, ক্যামিক্যাল, খনিজ পদার্থের কথাও বলেছিলাম। সে বললো এই রত্নগুলোও তো মিনারেল ও খনিজ দ্রব্য। আপনি মুসলমান নিশ্চয়ই কোরানে সুরা রহমানে "লুলু আল মারজানের" কথা বর্ণিত আছে এবং এগুলো মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন। অতএব ঔষধের সঙ্গে ষ্টোন ব্যবহার করুন দেখবেন অনেকটা উপকার পাবেন। যদি আপনার বিবরণ সঠিক হয়।

আরো অনেক যুক্তি তর্ক হলো শেষে বললাম ষ্টোন কি আপনার কাছ হতে ক্রয় করতে হবে? ডঃ পাণ্ডে বল্লেন না। রোগীর নিকট পাথর বিক্রয় কর্তৃপক্ষের নিষেধ

রয়েছে। আমরা সরকার হতে অন্যান্য ডাক্তার-প্রফেসরদের ন্যায় বেতন পাই। আপনি কলকাতা বা ঢাকা থেকেও ক্রয় করতে পারেন। তার এসব কথায় অনেকটা বিশ্বাস করলাম এবং প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্রেসক্রিপশন নিলাম। তিনি আরো বল্লেন ঢাকায় গিয়ে পরিবার পরিজনের বিবরণ জানালে তাদের জন্যও প্রেসক্রিপসন ও রাশিফল বের করে দেবেন তজ্জন্য কোন ফি লাগবে না। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুয়ে পড়লাম। ডঃ ত্রিপাঠী এসে ঔষধ পত্রাদি দিলেন এবং হৃদের এনজেনা বিষয়ে জানালেন যেহেতু আমার অনেক বছর ধরে এ রোগ তাই আরো ৪/৫ মাস ঔষধ সেবন করতে হবে। সেবন শেষে যতদূর ভাল হয় তার বেশী আর ভাল হবে না। নতুন অবস্থায় এক বছরের মধ্যে আসলে একেবারে সেরে যায়। তার কথামত ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্রাদি নিয়ে বহু কষ্টে হোটেলে এসে হোটেল মালিকের সহায়তায় প্যারালাইসিস এর জন্য সেখানকার বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে পর দিবস ট্রেনযোগে কলকাতা রওয়ানা দেই – কবীর চৌধুরীর ও বেনারসের এক মুসলিম উকিল পরিবারের সাহায্যে।

ঢাকায় এসেও অনেক ধরনের চিকিৎসা করে প্যারালাইসিস থেকে অনেকটা নিরাময় হলেও সম্পূর্ণ সুস্থ্য এখনও হইনি। যাক এনজেনা ব্যাথার ঔষধ পুনঃ সেবনে অনেকটা উপশম হয়েছে। বেশ কিছুকাল ধরে স্বাভাবিক কাজ কর্ম চালিয়ে যেতে পারি। ডঃ পাণ্ডে ভারতীয় পাথর থেকে সিংহলের পাথর আমার জন্য বেশী কার্যকর হবে বলেছিলেন। ঢাকা এসে কয়েকদিন পরই একটা বানোয়াট পত্র জ্যোতিষ ডঃ মুরলীধর পাণ্ডেকে লিখি যে আপনার বর্ণিত পাথর পরিধান করার পর আমি নানাভাবে খারাপ উপসর্গ দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় এগুলো আমার জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না। সে পত্রের উত্তরে তিনি আমার দেওয়া জীবন বৃত্তান্তের ছক কেটে নানা কথাবার্তা লিখে একটা পত্র পাঠালেন। তাতে বললেন আপনার বর্ণনা সঠিক থাকলে আমার ব্যবস্থাপত্র সঠিক। হয় মিথ্যে বলছেন নতুবা খারাপ চিন্তা ভাবনা করছেন তজ্জন্য এরূপ হচ্ছে। আমার গণনা ভুল হয়নি। তজ্জন্য পূর্ণ গণনার কাগজাদি পাঠালাম আপনাদের দেশের যে কোন খ্যাতনামা পণ্ডিত জ্যোতিষকে দেখাতে প্যারেন। আমার বিশ্বাস আপনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবেন।

আমার মনে পড়লো মহাজাতকের কথা। তার সঙ্গে বাংলা একাডেমীর বই মেলায় পরিচিত হই উভয়ে উভয়ের বই উপহারের মাধ্যমে। তার নিকট একদিন গেলাম ডঃ পাণ্ডের কাগজখানা নিয়ে। বন্ধু মহাজাতক আমার নেম কার্ড পেয়ে ঠিকই চিনলেন এবং অত্যন্ত সমাদর করে তার কক্ষে নিয়ে গেলেন। পূর্বাপর সকল কথা

বললাম তিনিও হাতের ছাপ রেখে কদিন পর যেতে বললেন। সময় মত গেলাম। তিনি বল্লেন ঠিকই আছে তবে রক্ত প্রবাল স্টোনটি ব্যবহার না করে কনক পোখরাজ পরতে বল্লেন। রক্ত প্রবাল নাকি আমার ব্লাড প্রেসার আরও বাড়িয়ে দেবে। মহাজাতকের মন্তব্য লিখে পুনঃ ডঃ পাণ্ডের নিকট পত্র লিখলাম। সে বললো পোখরাজ পরতে পারেন তবে রক্ত প্রবাল বাদ দেবেননা আপনার ব্যাপারে ব্লাড প্রেসার বরং নিয়ন্ত্রণ করবে। দ্বিধায় পড়ে চিন্তা করলাম জ্যোতিষীর পাল্লায় যখন পড়েছি তখন ঢাকার আরও দু'এক জনের সঙ্গে আলাপ করে নেইনা কেন? একদিন এক এষ্ট্রোলোজারের সঙ্গে এক সরকারী অফিসে আলাপ পরিচয় হলো। তিনি আমার বাসায় এসে দেখে শুনে ঐগুলোর সঙ্গে একটা ক্যাট্স্ আই পরতে বল্লেন, এতে নাকি যশ মান, প্রভাব প্রতিপত্তি সর্ব ক্ষেত্রেই বাড়ে। আরো একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম তিনি আবার পোখর্যাজের পরিবর্তে নীলা পরতে বল্লেন। এসব কথা শুনে আরেক দিন মহাজাতকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বল্লাম জীবন বৃত্তান্ততো একই রকম দিচ্ছি কিন্তু আপনারা এক এক জন এক এক রকম ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন কারটা ব্যবহার করবো? তিনি হেসে বল্লেন ডাক্তার প্রফেসারগণ যেমন একই রোগের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্র দেন তেমনি আমাদের ব্যবস্থাপত্রেও হবে। শেষ পর্যন্ত ডঃ পাণ্ডের দেওয়া ব্যবস্থা পত্রানুসারে পাথর ব্যবহার করছি। সেই সঙ্গে অবশ্য ঔষধপত্রও নিয়মিত ভাবে খাচ্ছি। আল্লা চাহে তো সে সময় থেকে অনেকটা ভালো। তবে কিসের জন্য ! ঔষধ না অন্য কারণে তা আল্লাহ আলেমুল গায়েবই জানেন। রত্ন বা পাথরে যে প্রতিক্রিয়া বা এ্যাকশন আছে আমার মনে সে বিশ্বাস কিছুটা জন্মেছে। তজ্জন্য যে, আল্লাহ বলেছেন পৃথিবীর মাটির নীচে সমুদ্রের তলে যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা মানুষের মঙ্গলের জন্যে করেছি। এ বিশ্বাস নিয়ে চলছি ভবিষ্যতের পানে। তবে একথাও সত্যি মাঝে মধ্যেই শরীর খারাপ হয়ে পরে।

ধোলাই খালের পারে পাঁচ ভাই ঘাটের নিকট গোয়াল ঘাট নামে একটি ঘাট ছিলো। এ ঘাটে গোয়ালারা গ্রামগঞ্জ থেকে দুধ নিয়ে আসতো। তজ্জন্য ঐ ঘাটের নাম হয়েছিলো গোয়াল ঘাট। আর ঘাটের নামানুসারে আশেপাশের বসতিটিও গোয়ালঘাট নামে পরিচিত হয়। এ ঘাটের অতি নিকটে নবাবপুর রথখোলার মোড়ে ছিলো দুধের আড়ৎ। ধোলাই খাল ভরাট হয়ে ঘাটের চিহ্নটুকু বিলীন হয়ে গেলেও গোয়াল ঘাট নাম এবং দুধের আড়ৎ বিদ্যমান রয়েছে।

১৮৪৯ সালের সার্ভে ম্যাপ বা মানচিত্রে দেখা যায় শহরের পশ্চিমে নবাবগঞ্জ ও পীলখানার সীমা বরাবর ছিলো এনায়েতগঞ্জ এলাকা। এই এলাকাকে শহরের অংশ

থেকে বাদ দেয়া হয়েছিলো। সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুরের মতে সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে শুল্ক বিভাগের প্রধান খাজা এনায়েত উল্লাহর সদর দফতর যেখানে অবস্থিত ছিলো সেই এলাকাটি এনায়েতগঞ্জ নামে অভিহিত হয়েছে। অপর দিকে ঐতিহাসিক রহমান আলী তায়িসের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জালালপুর পরগণার জমিদার শেখ এনায়েত উল্লা এখানে একটি বাজার গড়ে তুলেছিলেন। এই জন্যে এ এলাকাটিকে এনায়েতগঞ্জ বলা হয়। জালালপুর পরগণার একটি অংশ নবাবগঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ছিলো। এই এলাকাটি পূর্বে বেশ বড় ছিলো। ১৯৩২ সালে নীলাম্বর সাহার ছেলে মাত্র ২২৫০ টাকার বিনিময়ে পৌরসভার মাধ্যমে তাঁর পিতার নামানুসারে নীলাম্বর সাহা রোড নামকরণ করেছেন। বেশ কিছু কাল আগেও এই রোডটি ভাগলপুর এলাকা নামে পরিচিত ছিলো। এর দক্ষিণ অংশটিতে জেলেরা বসবাস করে বিধায় জেলে-পাড়া নামে সকলের কাছে পরিচিত। এ পাড়ায় আড়াইশত বছরের একটা প্রাচীন দুর্গামন্দির রয়েছে। এই রোডের পশ্চিমাংশে রয়েছে কুল্লুর মহল। এ ডাক নাম ছিলো কুলাল মহল। তার পাশে রয়েছে মনেশ্বর মহল্লা। পর্তুগীজ ধর্ম যাজক সেবাস্তিয়ান মনেশ্বরকে মানেশ্বর বলে উল্লেখ করেছেন মনেশ্বরের নিকট মুন্সী মুহম্মদ আকবর ওরফে তিনো মুন্সীর বাড়ির সংলগ্ন মসজিদের পূর্বদিকে রয়েছে শাহ্ আসাদ উল্লাহ ও শাহ্ গরীব উল্লাহর মাজার। শাহ্ আসাদ উল্লাহ ছিলেন ঢাকার অধিবাসী ও বিশিষ্ট আলেম। শাহ্ গরীব উল্লাহ ছিলেন তাঁর শিষ্য। তাছাড়া এ মহল্লার নিকটে কৃপণ শাহের মাজার রয়েছে। এ মাজার সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা ছিলো মাজার থেকে একটি ইট নিয়ে চুরি যাওয়া বাড়িতে রাখলে চুরির মাল ফেরত পাওয়া যায়। তারপর রয়েছে কাজীরবাগ এবং হাজারিবাগ। মোঘল শাসনামলে এ এলাকাটিতে বাগ বা বাগান ছিলো। হয়ত এ বাগানটি হাজারি পদবীধারী কোন ব্যক্তির উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিলো। এজন্যে এটিকে হাজারিবাগ বলা হয়ে থাকে। হাজারিবাগ এলাকায় একটি উঁচু টিলার উপর দুটি কবর রয়েছে। গম্বুজের ভিতর বাহাদুর শাহের মাজার এবং বাইরে সাঈদ শাহের মাজার অবস্থিত। এই মাজারটি বট গাছওয়ালা মাজার নামে সবার কাছে পরিচিত। অপর দিকে অনুরূপভাবে যে বাগটি কোন কাজী সাহেব স্থাপন করেছিলেন, সেই অঞ্চলটিকে কাজীরবাগ বলা হয়ে থাকে। কুলাল মহল নামটিও অনুরূপভাবেই সকলের কাছে পরিচিত হয়ে আছে বলে অনেকেরই ধারণা। কুল্লু নামে কোন জমিদারের অধীনে এই অঞ্চলটি ছিলো বলে এ এলাকাটি কুল্লুর মহল বা কুলাল মহল নামে অভিহিত হয়ে আসছে। তাছাড়া অনেকেই অনুমান করেন যে এ অঞ্চলে কুলু সম্প্রদায়ের

লোকেরা তাদের ঘানি চালিয়ে আসতো বলেই এ অঞ্চলটির নাম কুলুর মহল বা কুলাল মহল হয়েছে। কিছুকাল পূর্বেও কুলুরা ঘানি ঘুরিয়ে সরিষা থেকে তেল বের করতো। তখনকার দিনে আপামর সকলেই ঘানির তেল ব্যবহার করতো। হয়ত এ অঞ্চলে বহু সংখ্যক ঘানি ছিলো অথবা বহু লোকে ঘানি ঘুরিয়ে তেল উৎপাদন করতো।

হাজারিবাগের পশ্চিমে রয়েছে গজমহাল। গজ শব্দের অর্থ হাতি। এ এলাকায় হাতি বিচরণ করতো, তাই অঞ্চলটির নাম গজমহাল হয়েছিলো। এ অঞ্চলে যে হাতি বিচরণ করতো তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা এ অঞ্চলের পূর্ব দিকেই রয়েছে পীলখানা। সে সময়ে এই পীলখানা এলাকায় অসংখ্য হাতি পোষা হতো। গজমহালের সেদিনের বর্বরোচিত ঘটনাবলী আজও মনে হলে শরীর শিউরে ওঠে। পাকিস্তান হাসিলের পূর্বে অর্থাৎ বৃটিশ শাসনামলে পীলখানায় অবস্থানরত গুর্খা সৈন্যদের ছেলেপুলেরা গজমহালে গিয়ে গরীব, শান্ত, নিরীহ ও সরলপ্রাণ গ্রামবাসীদের ফলমূলের গাছপালা কারণে অকারণে তছনছ করে বেড়াতো। শান্তভাবে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করেও কোন ফল হতো না। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কতিপয় লোক একদিন তাদের খুবই গালমন্দ করলো এবং কয়েক জনকে ধরে গাছের সঙ্গে বেঁধেও রাখলো কিছুক্ষণ। তারপর তাদের ছেড়ে দিলো। এরই প্রতিশোধ নিলো নির্মমভাবে বৃটিশ শাসকদের হুকুম-বরদার সেনাবাহিনী। পীলখানায় অবস্থানরত গুর্খা সৈন্যদলের অনেকেই গভীর রাতে বেয়নেট ভুজালি ইত্যাদি নিয়ে গজমহাল এলাকাটি অতর্কিতে আক্রমণ করলো। অন্ধকার রাত্রিতে মহল্লার সকলের ঘরে একই সঙ্গে ঢুকে যাকে যে অবস্থায় পেলো নির্মমভাবে তাদের উপর বেয়নেট চার্জ করলো এবং ভুজালির আঘাতে তাদের শরীরের বহু অংশ ক্ষতবিক্ষত করে দিলো। শোনা যায়, বহু নারীর স্তন কর্তন করতেও তারা দ্বিধা করেনি। সেনাবাহিনীর এই অতর্কিত আক্রমণে গ্রামবাসীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। যারা এই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেলো তারা নালানর্দমা খানাডোবায় আত্মগোপন করে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করলো। অনেকে আবার গ্রাম ছেড়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করলো। আহত নরনারী শিশুদের আর্তনাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। আশ-পাশের বস্তিবাসীরা গজমহালের যে দিকেই কর্ণপাত করে সেদিক থেকেই এই আর্তনাদ শুনতে পেলো। গগনবিদারী এই আর্তনাদ শুনে সবাই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো।

এই ভয়াবহ ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সেদিনের রজনী কাটলো গজমহাল

এলাকায়। কিন্তু দিনের আলোকেও এর কোন প্রতিবাদ হলো না, এমন কি প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাও হলো না। বহু দিন যাবৎ সেই ভায়ার্ত রাত্রির কথা স্মরণ করে গজমহাল বাসীদের কতো যে নিদ্রাহীন রজনী অতিবাহিত করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে ২৫ শে মার্চের ভয়াল রাত্রি হতে ঢাকা তথা সমগ্র পূর্ববঙ্গে এ ধরনের নিষ্ঠুর হত্যালীলা ও অত্যাচারের বন্যা বয়ে যায়। সে সময়েও দেশবাসীর মনে ছিলো ভয়ভীতি ও সন্ত্রাস। অবশ্যি দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে মানুষের সে আতঙ্ক দূরীভূত হয়েছে।

গজমহালে মস্তান আগি মিয়ার মাজার রয়েছে। তাঁর ছিলো আজব খেয়াল। তিনি প্রায়ই লালবাগ কেল্লার দক্ষিণের চর এলাকায় গাছের ডাল ধরে দোল খেতেন। কথায় কথায় 'আগি মিয়া' শব্দ উচ্চারণ করতেন বলেই সকলের কাছে তিনি আগি মিয়া শাহ্ নামে পরিচিত হয়ে পড়েন।

এনায়েতগঞ্জ এলাকার পশ্চিমে যেসকল এলাকা স্থানীয় নামে পরিচিত, সেগুলোর মধ্যে সরকারী দলিলে বীরবন কাসুরা বলে একটি এলাকা উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্যি ছোট্ট একটি অংশ আজও বীরবন কাসুরা নাম ধারণ করে কোন প্রকারে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। পূর্বে বীরবন কাসুরা একটি বিরাট এলাকা জুড়ে ছিলো।

ললিত মোহন দাস লেনে ডাঃ ললিত মোহন দাস নামে একজন প্রভাবশালী লোক ছিলেন। এক সময় তিনি ঢাকা পৌরসভার কমিশনার পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। নবাবগঞ্জ এলাকার একটি অংশ তাঁরই নামানুসারে ললিত মোহন দাস লেন নামকরণ হয়েছে। ইতিপূর্বে এই এলাকাটি স্থানীয়ভাবে বলদাটুলি ও সরকারী মানচিত্রেও বলিয়াটুলি নামে পরিচিত ছিলো। এই এলাকায় মালবাহী বলদ থাকতো ও তাদের মালিকরা বাস করতো বলেই হয়ত এর নাম বলদাটুলি হয়েছিলো। এই নাম বহুদিন পর্যন্ত বলবৎ ছিলো। তাছাড়া পীলখানা গেট থেকে নবাবগঞ্জ রোড বরাবর সোজা রাস্তাটি গোয়ালটুলি নামে পরিচিত ছিলো। এই নামের নিদর্শন ১৮৫৯ সালের মানচিত্রেও অংকিত রয়েছে। এখানে বহু হিন্দু গোয়ালা বাস করতো। মনে হয় তাদেরই জন্যে এ জায়গাটির নাম গোয়ালটুলি হয়েছে।

কিছুদিন আগেও মনোহর চন্দ্র রায় লেনটি সোনারটুলি নামে পরিচিত ছিলো। সম্ভবত এখানে স্বর্ণকাররা বসবাস করতো বলেই এ এলাকার নাম সোনারটুলি হয়েছিলো। এ অঞ্চল ছাড়াও ঢাকার পটুয়াটুলি এলাকার স্বর্ণকারদের আর একটি ব্যবসা কেন্দ্র অনেক দিন থেকেই চালু আছে। পটুয়াটুলি ও তাঁতীবাজার এলাকায় আজও বহু স্বর্ণকার বসবাস করছে এবং অপ্রতিহতভাবে তাদের জাত ব্যবসা চালিয়ে

যাচ্ছে। ঢাকা এককালে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিভিন্ন অলংকারে কারুকার্যের জন্যে বিশেষভাবে স্বর্ণের অলঙ্কার তৈরীতে ভারত উপমহাদেশে বিখ্যাত ছিলো এবং এই উপমহাদেশে একমাত্র ঢাকাতেই কিছু সংখ্যক মুসলমান স্বর্ণকার ছিলো। ১৯২১ সালে মনোহর চন্দ্র রায়ের ছেলে মাখন লাল রায় অত্র এলাকার উন্নয়ন কল্পে তিন শত টাকা দান করায় ঢাকা পৌরসভা তাঁর পিতার নামে সোনারটুলি এলাকাটির নাম মনোহর চন্দ্র রায় লেন রাখেন।

পীলখানা ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে এক বিরাট এলাকা নিয়ে অবস্থিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে এই পীলখানা এলাকাটি নির্মিত হয়। সে সময়ে এখানে সরকারী হাতি রাখা হতো। তাছাড়া বহু জমিদার ভাড়া দিয়ে এখানে তাঁদের হাতি রাখতেন। মোঘল আমলে ঢাকা শহরের উত্তরাংশে এর থেকেও বড় একটি পীলখানা ছিলো। এখানের শাসনকর্তা পীলখানায় অবস্থানরত হাতিগুলোর গোসলের জন্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবাবগঞ্জ এলাকায় একটি ঘাট তৈরী করান। অদ্যাবধি উক্তঘাটিকে জনসাধারণ হাতির ঘাট বলেই আখ্যায়িত করে আসছে। পীলখানায় নতুন হাতি পোষ মানাবার ব্যবস্থাও করা হতো। ১৮৯৫ সালে বাংলার লেঃ গভর্নর চার্লস এলিয়টের উপস্থিতির সময়ও একবার হাতি খেদা প্রদর্শনী হয়েছিলো। এই বিভাগটি সরাসরি ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন ছিলো বলে এর তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন ইউরোপীয়কে নিয়োগ করা হতো। যেহেতু তিনি ইউরোপীয় সেই জন্যে তিনি প্রাদেশিক সরকারের কোন তোয়াক্কাই করতেন না। বৃটিশ শাসনামলেই এই পীলখানায় একটি সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তান আমলে ই.পি.আর বর্তমানে এখানে আধা সামরিক বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনীর হেড কোয়াটার অবস্থিত। এই পীলখানার নামানুসারেই আজিমপুর কবরস্থানের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে সেটি পীলখানা রোড নমে পরিচিত।

ঢাকার যে অঞ্চলটি আজ নবাবগঞ্জ নামে পরিচিত। মাত্র দু'যুগ পূর্বেও নবাব বাগিচা নামে বেশী পরিচিত ছিলো। মোঘল আমলে এ অঞ্চলটিতে নবাব পরিবার, আমীর ওমরা, পদস্থ রাজ কর্মচারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের বসবাস ছিলো। সে সময়ে নবাব রশিদ খাঁ একটি বাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে ঐ এলাকাটি রশিদ খাঁ-কা-বাগিচা নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। মোঘল পরবর্তীকালে লোকেরা রশিদ শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু নবাব বাগিচা নামেই আখ্যায়িত করতো। কেননা তৎকালে সাধারণ মানুষ সচরাচর লম্বা চওড়া নাম উচ্চারণ করতে পছন্দ করতো না। তাছাড়া ইংরেজ শাসকবর্গও সুকৌশলে মোঘলদের নাম নিশানা মুছে ফেলায় সচেষ্ট ছিলো।

১৮৫৯ সালের মানচিত্রে এলাকাটি বাগে হোসেন উদ্দিন খাঁ নামে চিহ্নিত হয়। যা আজ হোসেন উদ্দিন খাঁন ১ম ও ২য় লেন নামে পরিচিত এবং পৌরসভায় রেকর্ডকৃত। বাগে হোসেন উদ্দিন তথা হোসেন উদ্দিন খাঁর বাগিচার প্রতিষ্ঠাতা হোসেন উদ্দিন খাঁও নবাব ছিলেন। তিনি ছিলেন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার চাচা। তার বাড়ীর আশে পাশেও বাগ বাগিচা ছিলো। এটি বাগে হোসেন উদ্দিন নামে পরিচিত হলেও সাধারণ মানুষের নিকট পুরো এলাকাটিই নবাব বাগিচা নামেই পরিচিতি লাভ করে। শাহী মসজিদ সংলগ্ন নবাব বাগিচা নামক মক্তব যাহা বর্তমানে নবাব বাগিচা প্রাথমিক স্কুল নামে পরিচিত সেই মক্তবের নাম থেকেও নবাব বাগিচা নামের প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়।

নবাবী আমলেই এ এলাকায় সদর রাস্তার ধার হতে নদীতীর পর্যন্ত একটি অংশে বাজার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বাজারটি "নবাবগঞ্জ" নামে পরিচিতি লাভ করে। গঞ্জ শব্দের অর্থ বাজার। নবাবগঞ্জ বাজারটি আজও টিকে আছে। বাজারটির নামানুসারে পরবর্তী কালে এলাকার সদর রাস্তাটির নামকরণ করা হয় নবাবগঞ্জ রোড। নবাবগঞ্জ রোডের দক্ষিণ পশ্চিম দিকের একটি ছোট অংশ তেলিপাড়া নামে পরিচিতি লাভ করেছিলো। এখানে ৩/৪ যুগ পূর্বেও কুলু সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতো। তারা ঘানি ঘুরিয়ে সরিষার তেল উৎপাদন করতো। এখনও প্রৌঢ় ব্যক্তিরা ঐ অঞ্চলটিকে তেলিপাড়া নামেই আখ্যায়িত করে। অত্র এলাকার তেলিপাড়া মসজিদের অতিনিকটে ফরাজী মুন্সী নামে এক কামেল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বাস করতেন। তার সময়ই মসজিদটি নির্মিত হয়। তজ্জন্য এলাকাবাসী মসজিদটিকে ফরাজী মুন্সীর মসজিদ বলতো। পরে এলাকার নামানুসারে পরিচিতি লাভ করে।

নবাবগঞ্জ তথা নবাব বাগিচা এবং তার উত্তর পশ্চিম মহল্লার অধিবাসীরা তিন যুগ পূর্বেও কাউকে সম্বোধন করতে হলে "বা" শব্দ ব্যবহার করতো, যেমন "কি বা কেমুন আছ" "কি বা কই যাও" কি বা বালা আছ" "আরে বা তোমাগো বাড়িতে কবে যামু" ইত্যাদি। এই বা শব্দ যে কোন আত্মীয়ার বেলায় ব্যবহার করতো। এ শব্দ নবাবগঞ্জ ব্যতিত আর কোন এলাকায় ব্যবহার হতো না।

কোম্পানী আমলে ঢাকার নামেমাত্র নায়েব নাজিম নবাব জেসারত খাঁ দীর্ঘ ২২ বৎসর নায়েব নাজিম থাকার পর ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করলে, তাঁকে নবাবগঞ্জ বাজারের সন্নিকটে দাফন করা হয়। ঢাকার উত্থান-পতনের ইতিহাসে নবাব জেসারত খাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িত। জেসারত খাঁ পারস্য হতে কপর্দকহীন অবস্থায় বাংলাদেশে আগমন করেন। নবাব আলীবর্দি খাঁ তখন বর্গীদের দমনে খুবই

ব্যস্ত। তিনি প্রায়ই সৈন্য সামন্ত নিয়ে বর্গীদের পিছু ধাওয়া করে বেড়াতেন। এই সময় একদিন নবাব আলীবর্দি পথি পার্শ্বে মৃত প্রায় অবস্থায় সুদর্শন যুবক জেসারত খাঁকে দেখতে পেলেন। বিদেশী আগন্তুকের প্রতি নবাবের দয়া হলো। তিনি তাকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলেন। রাজকীয় সেবায় জেসারত খাঁ শীঘ্রই সুস্থ্য হয়ে উঠলেন। নবাব আলীবর্দি খাঁ তাকে উৎসাহ ব্যঞ্জক অনেক উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে মানুষ অনেক উন্নতি করতে পারে। নবাব তাঁর প্রথম জীবনের কষ্টকর কাহিনী এবং কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে পরবর্তী জীবনে কিভাবে বাংলা-বিহারের নবাব হতে পেরেছিলেন সে কাহিনীও শোনালেন। জেসারত খাঁ নবাবের কথামত মুর্শিদাবাদ দরবারে মনযোগ সহকারে রাজ কার্যের তালিম গ্রহণ করতে লাগলেন। অচিরেই নবাব সাহেব জেসারত খাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেলেন। কিছুকাল পরেই জেসারত খাঁ একদিন নওয়াজিস মুহম্মদের সঙ্গে ঢাকা আগমন করলেন। উদ্যমী ও পরিশ্রমী লোকদের জন্যে ঢাকায় সব সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত ছিলো। জেসারত খাঁ স্বীয় বুদ্ধিবলে সহজেই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের সখ্যতা বেশ ঘনিষ্ট হয়ে উঠলো। তাছাড়া নবাব আলীবর্দি খাঁর লোক হিসেবে ঢাকার নবাব দরবারে তাঁর একটি সন্মানিত স্থান ছিলো। ইংরেজদের সঙ্গে সখ্যতা, ঢাকার নবাব দরবারে সন্মান এবং স্বীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দরুন তিনি অল্পদিনের মধ্যেই এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে গেলেন। নওয়াজিস মুহম্মদের ইন্তেকালের পর তিনি ঢাকার নায়েব নাজিম পদে মনোনিত হন। কোম্পানী আমল এবং মুসলিম শাসনামলের শেষ পর্ব মীর জাফরের পুত্র মীরনের সময়েও তিনি নায়েব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে গেছেন। ন্যায়নীতির প্রতি তাঁর ছিলো অবিচল আস্থা। তিনি মগবাজারস্থ খানকার শাহ নূরীর (রাঃ) খুব ভক্ত ছিলেন। মীর মীরন পাটনা রক্ষার জন্যে সেখানে যাত্রার পূর্বে নবাব জেসারত খাঁর নিকট এক পত্রে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার মাতা, খালা, বিধবা পত্নী ও কন্যাকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছিলেন। এরা সবাই তখন জিঞ্জিরা প্রাসাদে বন্দী জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে জেসারত খাঁ প্রশংসনীয় সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি এই নিষ্ঠুর আদেশ পালন করতে সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন এই অস্বীকৃতির সংবাদ পেয়ে মীরন এত ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর চোখে অন্যান্য দোষী ব্যক্তিদের সাথে তাঁর নোট বইএ জেসারত খাঁর নামটিও টুকে নিয়েছিলেন। যাদের নাম এই নোট বইএ লিপিবদ্ধ ছিলো, ঢাকা ফিরে

এসে তিনি তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু রাখে আল্লা মারে কে মীরনের সে সিদ্ধান্তের পূর্বেই আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে তাঁকে পাটনা থেকে আর ফিরে আসতে হয়নি।

যাই হোক বিদেশী সরকার রাজ্য শাসন করতে এসে জেসারত খাঁর কার্যাবলীতে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছিলো। ফলে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে নায়েব নাজিমের তখতে সমাসীন থাকতে পেরেছিলেন। নবাবের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় জীবিত কালেই নাতি নবাব হাসমত জংকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। তিনিও সাত বৎসরকাল নায়েব নাজিমপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁকেও নবাবগঞ্জে নবাব জেসারত খাঁর কবরের পাশেই সমাহিত করা হয়। নবাব পরিবারের আরো কয়েকজনের কবর এখানে রয়েছে। নবাবগঞ্জের এই সব কবর সেই বিগত নবাবী আমলের স্মৃতিকেই বহন করে চলেছে।

নবাবগঞ্জের মোঘল আমলের প্রায় তিনশত বছরের পূর্বের নির্মিত নবাব বাগিচা বড় মসজিদের উত্তর দিকের চত্বরে শাহ ফয়জুল্লাহর মাজার রয়েছে। তিনি সৈয়দ শাহ মুহম্মদ দায়েমের খলিফা ছিলেন। ১২১৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

প্রায় তিন যুগ পূর্বে পাটনার তাকিয়া শরীফের এক বিখ্যাত পীর ও বুজুর্গ এখানে আগমন করেন। তার শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঢাকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবী হাফেজ মুহম্মদ মুসা পীর সাহেব হজরত খাজা সৈয়দ শাহ আমজাদ হোসেন কাদশি ১৯৫৮ সালে ইন্তেকাল করলে হাফেজ মুসা সাহেবের বাস ভবনেই তাঁকে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে হাফেজ মুসা সাহেবকে তাঁর পাশেই সমাহিত করা হয়।

নবাব বাগিচা বড় মসজিদের সন্নিকটে হাজী হাফেজ মাহবুব বখস নামে কানপুরের এক বিখ্যাত আলেম বৃটিশ শাসনামলের শেষ দিকে বসবাস করতেন। হাফেজ মাহবুব বখ্স এর কোরান তেলায়াৎ শোনার জন্য বিশেষ করে রমজান মাসে তারাবীহ নামাজ তার ইমামতিতে আদায় করার জন্য দূর দূরান্ত থেকে মুসল্লিগণ আগমন করতেন। রুগ্ন ব্যক্তিগণ রোগ নিরাময়ের আশায়ও তাঁর নিকট আসতেন অত্র এলাকার সর্ব শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ঢাকার নবাব বাড়ীতেও তার যথেষ্ট সম্মান ছিলো। তাঁর কবর আজিমপুর দায়রা শরীফে রয়েছে।

বৃটিশ শাসনামলের শেষ দিকে নবাব বাগিচা বড় মসজিদের দক্ষিণ দিকে মির্জা মুহম্মদ আখতার নামে এক শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বাস করতেন। তিনি স্থানীয়

সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুসলিম জনগণের প্রথম কাতারে থাকতেন এবং স্থানীয় মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করতেন। পেশাগত দিকদিয়ে তিনি সলিমুল্লা এতিম খানার ড্রিল মাষ্টার ছিলেন। ঢাকার নবাব তাকে যথেষ্ঠ সম্মান করতো। এতেই বুঝা যায় এ এলাকায় শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত নবাব পরিবারের লোকজন এখানে অবস্থান করতেন। উল্লেখ থাকে যে, মুর্শিদাবাদের নবাবগণ শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন।

বৃটিশ যুগের শেষ দিকে বানারস হতে আঃ হামিদ খাঁ ও আব্দুল রশিদ খাঁ নামে দুই সহোদর ঢাকায় এসে এখানে বসবাস করতেন। রাজনৈতিক ডামাডোল আর সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে স্থানীয় মুসলমানগণ যখন অতিষ্ট ও উৎপীড়িত তখন এ দুই ভাই যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তারা ছোট খাঁ সাহেব ও বড় খাঁ সাহেব নামে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছোট খাঁ সাহেব আঃ রশিদ খাঁ বানারসী বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন সাহসী ব্যক্তি ছিলেন।

নবাবগঞ্জ বাজারের সন্নিকটে একটি মাজার রয়েছে, যা মাদার ঝাণ্ডা নামে খ্যাত। এখানে বংশিবাজার এলাকার মাদার ঝাণ্ডার বুজুর্গকে সমাহিত করা হয়নি। অন্য কোন বুজুর্গ বা মাস্তানকে সমাহিত করা হয়েছে। সে মাদারী খেলা দেখাতো সেই সঙ্গে সাধু বা শাহ সাহেব গিরিও করতো সে গড়িয়ে হাজারী বাগ পর্যন্ত যেতো আবার সেখান হতে গড়িয়ে নবাবগঞ্জ আসতো। লোকে তাকে মাদারী বলে উল্লেখ করতো তাই তার মাজার মাদার ঝাণ্ডা নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

নবাবী আমলের পর নবাবের বাগ বাগিচার অস্তিত্ব মুছে গেলে, সে স্থলে এক মুসলিম জন বসতি গড়ে উঠে। বসতির লোকেরা সাধারণত মহিষের শিং দ্বারা চিরুণী ও বোতাম তৈরীর পেশা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত চিরুণীর সঙ্গে বোতাম তৈরীর পেশা খুবই জমজমাট হয়ে উঠেছিলো। হোসেনী দালানের নিকটেও একটি ছোট্ট অংশকে মোঘল যুগের নবাবদের নামানুসারে নবাব বাগিচা তথা নবাব গার্ডেন নামে অবহিত করা হয়ে থাকে। অপর এক সূত্রে বলা হয়েছে পীলখানার নিকটে মোঘল আমলে যে বাগটি নবাব রশিদ খাঁ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে বাগে সপ্তম শতাব্দীর গুপ্ত আমলের কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। ঢাকা শহর যে অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এই মুদ্রা তারই স্বাক্ষর বহন করছে। পরবর্তীকালে এই বাগানটিই নবাব বাগিচা নামে অভিহিত হয়েছিলো কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা, এই বাগিচাটি পীলখানার পশ্চিমে ছিলো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্যি এ বাগিচার চিহ্নটুকু এক শতাব্দীর বহুকাল পূর্বেই বিলীন হয়ে গেছে।

হোসেন উদ্দীন খাঁন লেন মহল্লাটি ঢাকার নবাবগঞ্জ এলাকারই অংশ বিশেষ। পূর্বে ইহা বাগে হোসেন উদ্দীন নামে পরিচিত ছিলো। যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দোলার চাচা ঢাকার ডেপুটি নায়েব নাজিম নবাব হোসেন উদ্দীন খানের নামানুসারেই ঢাকা পৌরসভা নামকরণ করেছিলেন, আজও এ নামেই পরিচিত।

স্বাধীন বঙ্গের শেষ অধ্যায়ে চক্রান্তের বিষবাষ্প যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ষড়যন্ত্রের দাবাগ্নিতে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দোলার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখা দেন নবাব আলীবর্দিখাঁর জামাতা নাওয়ারিশ মহম্মদ। নওয়ারিশ কুলি খাঁর ভ্রাতুস্পুত্র নওয়াব হোসেন উদ্দীন খাঁকে ঢাকায় তাঁর ডেপুটি নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। নবাব হোসেন উদ্দীন খাঁন ঢাকার ডেপুটি নায়েব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বর্তমান হোসেন উদ্দীন খাঁন ১ম লেন এলাকায় নদী তীরবর্তীতে এক বাসভবন নির্মাণ করেন। এবং সে ভবনেই বাস করে ঢাকার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি ন্যায় নীতির অনুসারী এবং যোগ্য শাসক হিসেবে দীর্ঘ বার বৎসর কাল ঢাকা শাসন করেছেন। তার বাসভবনের আশে পাশে যে বাগিচা ছিলো সেটিই বাগে হোসেন উদ্দীন নামে অভিহিত হতো। অনেকে নবাব হোসেন উদ্দীন খাঁ-কা বাগিচা বলেও আখ্যায়িত করতো।

নবাব হোসেন উদ্দীন খাঁন নবাব সিরাজউদ্দৌলার চাচা হলেও কি এক অজ্ঞাত কারণে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। নবাব সিরাজের এজেন্ট আগা সাদেকের সাথে এরই ফলশ্রুতিতে হোসেন উদ্দীনের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করেই আগা সাদেক হোসেন উদ্দীন খাঁকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

একদিন গভীর নিঝুম রাত, ঢাকাবাসী নিদ্রামগ্ন, ঢাকার রাস্তা, লালবাগের কেল্লা, বড় ও ছোট কাটরা, সবই নিস্তব্দ, পথ ঘাটে কোন লোক জন নেই আগাসাদেক-পিতা আগা বাকের আরো বারোজন সশস্ত্র অনুচর নিয়ে রওয়ানা দিলেন নবাবগঞ্জস্থিত নবাব হোসেন উদ্দীন খাঁনের বাস ভবনের দিকে। নদীর দিক দিয়ে গোপনে তারা হোসেন উদ্দীন খাঁনের প্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলেন। রক্ষীরা ঘুমে ঢুলু ঢুলু। নবাব হোসেন উদ্দীন খাঁন তখন গভীর নিদ্রায় অচেতন। গৃহ রক্ষীদের অনেককেই ধরাশায়ী ও পরাস্ত করে হোসেন উদ্দীন খাঁনের কক্ষে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই এক আঘাতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হলো। অনেকের মতে প্রাসাদের বাইরের কোলাহল শুনে নিদ্রাভঙ্গ হলে পালাবার পথ পেলেন না সে অবস্থাতেই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিলো।

অপর দিকে সুলেখক যোতিন্দ্র নাথ সেন বলে গেছেন, তিনি ঢাকা নিবাসী সৈয়দ আহমদ রেজার নিকট থেকে শুনেছেন পাক কোরান পাঠবস্থায় তাঁকে দিখণ্ডিত করা হয়েছে। একথার সমর্থনে তিনি পরবর্তী নবাব নসরত জঙ্গ বাহাদুরের পুস্তকালয়ে একটি কোরান শরীফ ছিলো। সেই কোরান শরীফের এক পৃষ্ঠা রক্তে রাঙ্গানো ছিলো। সে পৃষ্ঠাই নাকি নবাব হোসেন উদ্দীন খান তখন পাঠ করছিলেন। তারই রক্তে ঐ পৃষ্ঠা রঞ্জিত। তবে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিলো বলে অনেকের মত। তখন ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র চরম পর্যায়ে। মসনদ ও ক্ষমতার দাবী দাওয়া নিয়ে নবাব হেরেম থেকে রাজ পথ আর সমস্ত নগর গুলোতেই হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছিলো পদস্থ রাজ কর্মচারীদের মধ্যে। এর প্রতিক্রিয়া সিপাহী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিলো। ঢাকাবাসী সাধারণ মুসলমানদের উত্তেজিত করার জন্যেই কোরান পাঠ অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল বলে প্রচার করাটা আগা সাদেকের বিপক্ষীয় দলের একটা বিরাট হাতিয়ার ছিলো। কোরান পাঠরত থাকলে আক্রমনের আঁচ পেয়ে নিশ্চয়ই উঠে যেতেন নবাব সাহেব অবশ্যই।

নবাব হোসেন উদ্দিনের হত্যার খবর সকাল বেলা নানা রং এ ছড়িয়ে পড়লে ঢাকাবাসী খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠে। কেননা আগা সাদেক ও তার পিতা ঢাকার শাসন কর্তৃত্ব দখল করার যে অভিসন্ধি করে আসছিলেন, ঢাকাবাসী সেটা পূর্ব হতেই অনেকটা অবহিত ছিলেন। ঢাকাবাসীর ক্ষোভ ও উত্তেজনার সুযোগে রাজ বল্লভ, তৎপুত্র রামদাস ও কৃষ্ণদাস এবং হোসেন উদ্দীন খাঁনের আত্মীয় ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি আলী নকির এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। তাদের সৈন্যবাহিনী ও ঢাকাবাসী যারা হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছিলো তাদের সহায়তায় আগা সাদেকের প্রাসাদ ঘেড়াও করে। সমবেত জনতা আগা সাদেকের কাছে তার নায়েব নাজিম পদে নিযুক্তির সনদ দাবি করে। জবাবে আগা সাদেক নবাব হোসেন উদ্দীনের রক্তে রঞ্জিত ঝুলন্ত তরবারীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তাঁর এরূপ আচরণে বিপুল জনতা ও সিপাহীগণ প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ে। জনতা ও সিপাহীরা মার মুখী হয়ে তর তর করে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো। তারা নাগালের মধ্যে আগা সাদেকের বৃদ্ধ পিতা আগামুহম্মদ বাকের কে পেয়ে তাকে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে ফেললো। আগা সাদেক পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থা অবলোকন করে প্রাণ পনে যুদ্ধ করতে করতে শত্রু ব্যূহ ভেদ করে পেছন দরজা দিয়ে পলায়ন করে জীবন রক্ষা করেন।

নবাব হোসেন উদ্দীন খাঁর খণ্ডিত দেহ নবাব বাগিচাতেই সমাহিত করা হয়। তাঁর কবরটি বড় মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। স্থানীয় লোকজন এ কবরটি গলাকাটা সৈয়দের মাজার বলে অভিহিত করে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে দৈবক্রমে এই কবরটি আপনা থেকেই খুলে যায়। কবরের ভিতর লাশটিকে অক্ষত অবস্থায় দেখে স্থানীয় লোকজন হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। লাশ দেখে নাকি মনে হয়েছিলো এই মুহূর্তেই যেন লাশটিকে দাফন করা হয়েছে। এমন কি গোরের উপর যে হোগলা চাটাই দেয়া হয়েছিলো তাও অক্ষত অবস্থায় ছিলো। লাশ-ঢাকা চাদরটিতে কোন রকম দাগ লাগেনি বা সেটি মলিন হয়ে যায়নি। এ দৃশ্য দেখার জন্যে বহু লোক সমাগম হয়েছিলো এবং সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। যাই হোক, কবরটি পুনরায় ঢেকে দেয়া হয়। তাঁরই স্মৃতি বহন করে চলেছে হোসেন উদ্দীন খাঁন ১ম ও ২য় লেন।

নবাবগঞ্জ এলাকায় নবাব হোসেন উদ্দিন খাঁনের বাসভবনটি আজও বিলিন হয়ে যায়নি। বাড়ীটি সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ করতে গিয়ে আমার পূর্ব ধারণা বদলে গেছে এক ঐতিহাসিক দলিলের সন্ধান পেয়ে। নবাবের বাড়ীটি ১ম লেনের নদী তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এক খলিপা (দর্জি) নবাবের বাসায় কাপড় চোপড় সেলাই করতো। নবাবের হত্যাকাণ্ডের 'পর তার এক ওয়ারিশ বাড়ীটি ঐ খলিপাকে দান করেন। তাদের বংশধরগণ আজও সে বাড়ীতে বসবাস করছেন। আমার পূর্ব ধারণা ছিলো আরেকটি বাড়ীর প্রতি। সে বাড়ীটিরও কিংবদন্তি এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী রয়েছে, বাড়ীটি হোসেন উদ্দীন খাঁন লেন হতে সামান্য পশ্চিমে বর্তমান নওয়াবগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির নিকট হাতিরঘাট সংলগ্ন নদীতীরে অবস্থিত। বেশ কিছু কাল পূর্বে প্রৌঢ় ব্যক্তিদের মুখে শুনেছি তারা তাদের পিতা বা পিতামহের নিকট হতে শুনেছেন। এই বাড়ীতে নাকি শহরের নামজাদা ব্যক্তিগণ আগমন করতেন। বৈঠকে বসতেন, শাহী হুক্কা ব্যবহার করতেন, নানারূপ খেলা করতেন ইত্যাদি। তাছাড়া বাড়ীটিও নদীতীরে এবং নবাবী আমলের স্থাপত্য আঙ্গিকে তৈরী। বাড়ীর চতুর্দিকস্থ প্রাচীর উচু নয় বিধায় নদী পার দিয়ে সহজেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করা যায়। বৃটিশ শাসনামল হতে এ পর্যন্ত পীলখানার সামরিক আধা সামরিক পদস্থ অফিসারগণ বসবাস করে আসছেন। পাকিস্তান আমলে ১৯৬৬ সালে বাড়ীর একটি স্থান খননকালে নবাবী আমলের ১টি ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা ছোট কামান পাওয়া গিয়েছিল। তখন বাড়ীটিতে ই,পি,আর এর মেজর চিশতী বাস করতেন। পরবর্তীতে তিনি মেজর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বাড়ীটি নবাব হোসেন উদ্দীন খাঁনের না

হলেও একটি ঐতিহাসিক কোন বাড়ী এতে কোন সন্দেহ নেই।

এই হোসেন উদ্দীন খাঁন লেনস্থিত মহল্লার শেষ সর্দার চানমাল সরদার প্রভাবশালী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। মহররম মাসে বিভিন্ন মহল্লা থেকে লাঠি, তরবারী ও অগ্নিকুণ্ডের খেলায় যে আখড়া বের হতো তিনিও একটি আখড়া স্বয়ং পরিচালনা করতেন। এই সব আখড়া পরিচালকদের খলিফা বলা হতো। শফি ডাক্তার নামে এক হোমিও ডাক্তার ছিলেন তিনি জ্বীন-ভূত-প্রেত তাড়াতে পারতেন। অবিশ্বাস্য হলেও অনেক ক্ষেত্রে যে জ্বীন-ভূতের আসর হয় তা সত্য।

বর্তমানে নিউমার্কেট ও ঢাকা কলেজ এলাকাকে পূর্বে নয়া বস্তি বলা হতো। এ বস্তির অধিকাংশ জমি ছিলো হোসেন উদ্দীন খাঁন ১ম লেনের জালাল বেপারীর। লোকে তাকে জমিদারের মতই সমীহ করতেন। তিনি প্রজাদের উপর খুব অত্যাচার করতেন। কথিত আছে সে নাকি অনেক অবাধ্য প্রজাকে দাওয়াত দিয়ে বাড়ীতে এনে হত্যা করে সেই মৃত দেহ পুনরায় সে এলাকায় রেখে এসে অন্যান্য অবাধ্য প্রজাদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে জব্দ করতেন। জুলুম আল্লাহ সহ্য করেন না। তাই সে বাড়ী বিরান হয়ে গেছে বহু পূর্বেই। তার বংশেরও বিলুপ্ত ঘটেছে। যারা আছে তারা খুবই অসহায় দুঃখ দৈন্যের মধ্যে কাটাচ্ছে। নবাবগঞ্জ লেনের নদীতীরে তৎকালীন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শুকুর মহম্মদ পুকুর ভরাট করতঃ একটি পার্ক নির্মাণ করেন। এই পার্কটির সন্নিকটে বৃটিশযুগে চাউলের হাট বসতো। এ হাটকে নবাবগঞ্জের হাট বলা হতো। আমি এ হাট থেকে পৌণে তিন টাকা মূল্যে প্রতিমন চাউল খরিদ করেছি বলে আজও মনে আছে। জনাব শুকুর মহম্মদের ইউনিয়ন কমিটির অফিস ছিল নবাবগঞ্জ রোডে। এই বাড়ীতেই প্রথমে নবাবগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

এ মহল্লাবাসী আবহমান কাল হতে ফাতেহা দোয়াজ দাহাম তথা বারো বাফাতে নবাবগঞ্জ বড় মসজিদে বিরাট খানা-পিনার ব্যবস্থা করতো। মহল্লার ছোট-বড় সকলেই এই খানায় উৎসাহের সঙ্গে শরীক হতো। ঢাকার প্রায় মহল্লাতেই ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখের এই দিবসে পেট পুরে খানা-পিনার ব্যবস্থা প্রধান মসজিদ বা পঞ্চায়েতি বাংলায় করতো। নানা কারণে বিশেষ করে বহিরাগতদের সংখ্যাধিক্যের ফলে এ খানার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায় বেশ কয়েক বছর পূর্বে। সব শেষে বন্ধ হয় নবাবগঞ্জ মহল্লায়।

ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণ-পশ্চিমে বুড়িগঙ্গার মূল নদীর ওপারে রয়েছে কামরাঙ্গীর চর। মুঘল আমলে নদীর ওপারে একটি অংশ বাঁকে চাঁদ খাঁ নামে পরিচিত ছিলো।

চরটি অর্দ্ধ চন্দ্রের মত অর্থাৎ হাসুলীর মত বাঁকা ছিলো। তখন বুড়িগঙ্গা লালবাগ দূর্গের পাশ দিয়ে বয়ে যেতো। তারই দক্ষিণে এ চরটি অবস্থিত ছিলো। সে সময় এটি "চাঁদ খাঁ কা হাসলী" নামে সরকারী দলিল দস্তাবেজে উল্লেখ ছিলো। পরবর্তীতে কামরাঙ্গীর চরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। তৎকালে চাঁদ খাঁ ঢাকার একজন বিশিষ্ট ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। নিমতলির নিকট "চাঁদ খাঁর পুল" নামে এলাকাটি আজও পরিচিত। চাঁদ খাঁ পুলটি নির্মাণ করে ছিলেন বিধায় পুলটিসহ পুলের আশে পাশের বসতিটিও চাঁন খাঁর পুল নামে পরিচিতি লাভ করে। এই চাঁন খাঁ আর চরের নামের চাঁদ খাঁ একই ব্যক্তি ছিলেন।

কামরাঙ্গীর চর এলাকাটি যেমন দীর্ঘ তেমনি প্রশস্ত। চরটি বেশ উচুঁ পাকিস্তান আমলে প্রথম বন্যায় চরের সামান্য কিছু অঞ্চলে পানিতে ডুবে ছিলো। চরের বাসিন্দারা পূর্বে প্রায় সবাই কৃষি কাজ করতো। বর্তমানে এ চরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত লোকেরা নিম্নাঞ্চল গুলোতে ঘরবাড়ী তৈরী করে এবং অনেকে ভাড়ায় বসবাস করে স্থানীয় বাসিন্দাসহ নানা পেশায় নিয়োজিত হয়েছে এলাকার লোকেরা।

কথিত আছে বহুকাল পূর্বে এ চরের এক পরিবারের উদ্ভিন্ন যৌবনা ও অনিন্দ সুন্দরী কামরাঙ্গী নামে এক মেয়ে ছিলো। একদিন এক নৌকা ডুবিতে তার সলিল সমাধি ঘটে। এ সংবাদ শুনে তাঁর প্রেমিক "কামরাঙ্গী" "কামরাঙ্গী" বলে গগন বিদারী চিৎকার করতে করতে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। সে সময় থেকে এ চরটি কামরাঙ্গীর চর নামে সকলের নিকট পরিচিত হয়ে আসছে।

অপর আরেকটি সূত্রে জানা যায়। নদীর এপারে বর্তমান রাজনারায়ণ ধর রোড সংলগ্ন শ্বশ্মান ঘাট এলাকাটি একটি চর বা দ্বীপের মত ছিলো। এখানে কামরাঙ্গা ফলের মত মরিচ চাষ হতো। যাকে আমরা এখনও কামরাঙ্গা মরিচ বলে থাকি। বৃটিশ যুগে প্রথম সার্ভের সময় যখন জরীপ কর্মচারীগণ এসে এ এলাকাটি মাপ ঝোপ করেন তখন কামরাঙ্গার মত মরিচের ক্ষেত দেখে এ মৌজাটির নাম রাখেন কামরাঙ্গীর চর। পরবর্তীতে ঢাকা পৌরসভা এখানে শ্বশ্মান ঘাট নির্মাণ করলে শ্বশ্মান ঘাটটি কামরাঙ্গীচর শ্বশ্মান ঘাট নামেই নামকরণ হয়। আজও পৌরসভার রেকর্ডপত্রে কামরাঙ্গীর চর শ্বশ্মানঘাট নামই রয়েছে। শ্বশ্মানঘাট সংলগ্ন দক্ষিণের আশে পাশের জমিও পথগুলো ঢাকা পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত ছিলোনা। এসব জমিও রাস্তা নদীর ওপারের ডিস্ট্রিক বোর্ডের ছিলো। কিছু কাল পূর্ব পর্যন্ত। কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় শ্বশ্মানঘাট এলাকাটি ঢাকা শহর অঞ্চলের মৌজা ভুক্ত

ছিলনা। কামরাঙ্গীর চর মৌজা ভুক্ত ছিলো। এ সূত্রটিও কামরাঙ্গীচর নামকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

কামরাঙ্গীর চরে যে কজন প্রভাবশালী ব্যক্তি গুজরিয়ে গেছেন। তন্মধ্যে ফয়জুদ্দিন হাজী উল্লেখযোগ্য। ফয়জুদ্দিন হাজী জমিদার শ্রেণীর লোক ছিলেন। কামরাঙ্গীর চর গুদারাঘাট সংলগ্ন যে মসজিদটি রয়েছে। ঢাকার অধিবাসীরা মসজিদটিকে ছাতা ওয়ালা মসজিদ বলে থাকে। বিশিষ্ট চামড়া ব্যবসায়ী হাজী ফয়জুদ্দিনের সঙ্গে ইউরোপীয়ান চামড়া ব্যবসায়ী মিঃ লেজারের সঙ্গে চরে কতক যায়গার সত্ব নিয়ে বিবাদ ও মামলা বাঁধলে হাজী ফয়জুদ্দিন সহস্রাধিক লোক নিয়োগ করে এক রাত্রির মধ্যে উপরোক্ত মসজিদটির গোড়া পত্তন করেছিলেন। এবং মসজিদটির অনতি দূরে দুই সহস্রাধিক লোক কর্মরত থেকে একটি পুকুরও খনন করে দখল সত্ব মজবুত করেছিলেন। ফলে হাজী ফয়জুদ্দিনের সঙ্গে লেজার সাহেবের মধ্যে আদালতে যে মামলা চলছিলো শেষ পর্যন্ত লেজার সাহেব হেরে যান।

কামরাঙ্গী চরটি স্থানীয় নামে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন পুরানা কামরাঙ্গীচর, যে স্থানে হাফেজ্জী হুজুরের মাদ্রাসা হয়েছে সেটি দক্ষিণ কামরাঙ্গী চর, যে এলাকাটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো সে এলাকাটি বর্তমানে জঙ্গলবাড়ী, টেকের মত যে অঞ্চলটি ছিলো সেটা টেকের হাটি, হাফিজুদ্দিন মুন্সি নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি যে এলাকায় বাড়ী তৈরী করছেন সে এলাকাটি মুন্সি হাটি, হিন্দু মৎস্য জীবিরা যেখানে বসবাস করতো সেটি জাউলা হাটি (প্রকাশ থাকে গ্রামকে অনেক স্থানে হাটি বলে থাকে) হাসলীর মত স্থানটির নামানুসারে হাসলাই, সাবেক নবাবদের যে এলাকাটি ছিলো সেটিকে নবাব চর এখানে দিল্লির বাদশাহ শাহজাহানের সময়কার একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদটির কালো পাথরের শিলালিপি থেকে সম্রাট শাহজাহানের সময়কাল পাওয়া যায়। যে এলাকাটিতে ঝাউ গাছ ছিলো সে এলাকাটি ঝাউচর বলা হয়ে থাকে। একটি অংশ বাঁকে চাঁদ খাঁ অর্থাৎ পূর্ব নামেই অভিহিত হয়ে আসছে। সম্পূর্ণ কামরাঙ্গী চরটিই এককালে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভরপুর ছিলো বর্তমানে সে সৌন্দর্য্য তথা প্রাকৃতিক শোভা না থাকলেও কিছু এলাকায় আজও প্রাকৃতিক শোভা বিরাজ করছে।

এ চরে বৃটিশ যুগে স্থানীয় অধিবাসীদের কথায় লাল গুদাম নামে রং এর কারখানা ছিলো এবং কারখানা এলাকায় লাল ফুলের চাষ হতো। সেই ফুল দ্বারা রং তৈরী হতো। এই গুদামটি পরবর্তীতে খরিদ করে নিয়েছিলেন জজ মুজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব। তিনি এখানে বাড়ী তৈরী করে বেশ কিছু কাল বসবাস করে গেছেন।

সুলতানগঞ্জ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান হাজী আউয়াল একটি রাস্তা নির্মাণ

করার সময় কামরাঙ্গীর চর নতুন স্কুলের নিকট হতে মাটি খনন কালে একটি বিরাট নৌকার বৈঠা পেয়েছিলেন। বৈঠাটির পাতাটি ছিলো প্রায় ৫০ ফুট চওড়া আর ডাণ্ডার গোলাই ছিলো ৪ ফুট ব্যাস লম্বাও ছিলো বেশ। তিনি হজ্বে যাওয়ার প্রাক্কালে বৈঠাটি যাদু ঘরে দেবার জন্য তার এক মেম্বারকে বলে গিয়েছিলেন কিন্তু দূর্ভাগ্য মেম্বার সাহেব সেটি কেটে কুটে নিজের ঘরের কাজে লাগিয়ে দেন।

দক্ষিণ কামরাঙ্গীর চরে মৌলানা মহম্মদ উল্লা হাফেজ্জী হুজুর মাদ্রাসা নূরিয়া নামে একটি বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ধর্ম ভীরু মুসলমানদের দানে। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর এলাকাটির নাম তারা আশ্রাফাবাদ রাখেন। হাফেজ্জী হুজুরের পীর ও ওস্তাদ ছিলেন ভারতের দেওবন্দের মৌলানা আশ্রাফ আলী থানভী। বাংলাদেশে মৌলানা থানভী সাহেব প্রথম যে চার জন আলেমকে খেলাফত দান তথা খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন তন্মধ্যে মৌলানা আতাহার আলী ও মৌলানা মহম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর অন্যতম। হাফেজ্জী হুজুর পীর বা ওস্তাদের নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কামরাঙ্গীর চরটি নামকরণ করেন আশ্রাফাবাদ কিন্তু সাধারণ লোকজন এখনও কামরাঙ্গী চরই বলে থাকে।

লালবাগ দূর্গের দক্ষিণের বসতিটির নাম রাজনারায়ণ ধর রোড। মুঘল যুগে বুড়ি গঙ্গা লালবাগ দূর্গের দক্ষিণ পাশ দিয়ে বয়ে যেতো। ১৭৮২ সালের রেনেলের মানচিত্রে এবং পরে ১৮৫৯ সালের মানচিত্রেও নদীটিকে লালবাগ দূর্গের পাশেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এর কিছুদিন পর হতেই নদীর গতি পরিবর্তন হয়ে আরও দক্ষিণে সরে যায়। যার ফলে দূর্গের পাশে চর পড়ে যা লালবাগ চর নামে পরিচিত হয়। এ চরে ঢাকার আশ পাশ হতে ধীরে ধীরে লোকজন এসে বসতি গড়ে এবং সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত নীচু চরে কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। এই কৃষি এলাকাটি আজ শহীদ নগর বলে পরিচিত। তখন লালবাগ চরের লোকেরা মাটির নান্দা চালিয়ে দূর্গের পার্শ্বস্থিত রাস্তায় অবতরণ করতো। এরূপভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর, চরের দক্ষিণ প্রান্তসীমায় একটি দ্বীপের মত স্থানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ঢাকা পৌরসভা শবদাহ করার জন্যে শ্বশ্মান ঘাট ও কবরগাহ নির্মাণ করেন। শব নিয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্যে দূর্গের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হতে একটি রাস্তা নির্মাণ করে দেন। রাস্তাটি নিচু থাকায় বর্ষাকালে রাস্তায় পানি উঠে যেতো তাছাড়া শ্বশ্মানটি দ্বীপের মত জলবেষ্টিত থাকার ফলে শুষ্ক মৌসুমেও নৌকা করে শব নিয়ে যাওয়া হতো। পৌরসভা রাস্তাটির নামকরণ করেন বার্নিং ঘাট রোড।

এখানকার লোকজন প্রায় সকলেই মুসলমান ছিলো। তবে শ্বশ্মান ঘাট ও হিন্দু

কবরস্থান নির্মিত হওয়ায় কিছু পশ্চিমা হিন্দু ডোম-সুইপারদের এ রাস্তার ধারে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। কথিত আছে বাবু রাধা গোবিন্দ সাহা নাকি শ্বশ্মানের জন্য জমি দান করেছিলেন। শ্বশ্মানঘাট সংলগ্ন কবর স্থানটিতে হিন্দু শিশু ও এক শ্রেণীর পশ্চিমা খোট্টা জাতীয় হিন্দুদের কবর দেওয়া হয় এই উভয় প্রথানুসারে আজও শবদাহ ও কবর হয়ে থাকে। পাক আমলে শ্বশ্মান ঘাট, বিশ্রামগার, কবরস্থান, দাহ করার বেদীসমূহ একে বারে জরাজীর্ণ হয়ে গেলে আমার প্রচেষ্টায় ঢাকা পৌরসভার মাধ্যমে বিগত ষাটদশকে পুনঃ নির্মাণ করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে রাস্তার ধার হতে ডোম ও সুইপারদের সরিয়ে শ্বশ্মানের নিকট একটি সেমি পাকা দালানও করে দেওয়া হয়।

১৯২৭ সালে চুরিহাট্টা নিবাসী বাবু রাজ নারায়ণ ধর এ রাস্তায় বিজলী বাতি স্থাপনের জন্যে পৌরসভাকে ষোলশত টাকা দান করলে ঢাকা পৌরসভা বার্নিং ঘাট রোডটির নাম পরিবর্তন করে রাজনারায়ণ ধর রোড রাখেন পরে রাজনারায়ণ ধরের এক ভাই সদর রাস্তাটির সম্প্রসারণ ও শ্বশ্মানের নিকটে খাবার পানির ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন হতেই এ রাস্তাটির নতুন নামানুসারে পৌরসভা লালবাগ চর বসতিটি রাজনারায়ণ ধর রোডের অঙ্গীভূত করে নেন। সে সময় হতে বসতি ও রাস্তাটিকে রাজনারায়ণ ধর রোড বলা হয়ে থাকে। তবে প্রবীণ ব্যক্তিগণ আজও লালবাগ চর নামেই অবহিত করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের বছরখানেক পূর্বে যে চরটি চাঁদ খা কা হাসুলী নামে পরিচিত ছিলো প্রত্যেহ সেখানে গোড়া সৈন্যরা উলঙ্গ হয়ে দলবেধে গোসল করতো। তাদের এই অশালিন ব্যবহারে দিনের বেলা লালবাগ চরের গৃহবধূদের নদী হতে পানি নেওয়া বন্ধ হয়ে যেতো। একদিন কোন কারণে কতিপয় গোড়া সৈন্য উলঙ্গ অবস্থায় এক ছেলেকে তাড়িয়ে নিয়ে একটি বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এতে গৃহকর্তা এবং পাশের কিছু লোক ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের মারধর করে এবং একজনকে আটক করে রাখে। সঙ্গের সৈন্যরা কোন প্রকারে ছাড়া পেয়ে গোসলরত সৈন্যদের এ সংবাদ জানায়। এতে তারা অসম্ভভ রকম ক্ষেপে গিয়ে হাতের কাছে যে যা পায় তাই নিয়ে ধাওয়া করে। তারা বর্তমান খ্রিষ্টার বহুমূখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত বাজারের স্থানটিতে উপস্থিত হয়। সে সময় সেখানে র‍্যালী ব্রাদার্সের পাট ও চামড়া গুদাম ছিলো। সৈন্যরা হাজির হয়ে সেই গুদামের লোকজনকে মারধর করার হুমকি প্রদান করতে থাকে। র‍্যালী ব্রাদার্স ইংরেজ কোম্পানী, তখন সারা ভারতে তাদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি। তাই গুদামের মুন্সি দারোয়ানদের গুলি করার হুকুম দেন। কিন্তু তারা গুলি ছোড়া থেকে বিরত থাকে। ইত্যবসরে গুদামের প্রধান মুন্সি ইউসুফ থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের

করেন। থানা কর্তৃপক্ষ উপায়ন্তর না দেখে টেলিফোনযোগে সৈন্য বাহিনীর অফিসারদের এ খবর জানালে তারা তৎক্ষণাৎ থানায় এসে হাজির হন। বস্তিবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ধৃত গোড়া সৈন্যটিকে নিয়ে থানায় হাজির হয়। অবশেষে তিন পক্ষে একটি আপোষ হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে গোড়া সৈন্যরা আর ওখানে যাবেনা। যদি যায় গ্রামবাসীরা তাদের ধরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পন করবে। তখন কর্তৃপক্ষ তাদের উপযুক্ত বিচার করবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে এরপর থেকে গোড়া সৈন্যগণ গোসল করার জন্যে সেখানে যায়নি।

কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে একদিন এক গোড়া মিলিটারী পুলিশ (এম,পি) সৈন্যদের খোঁজে আসলে গ্রামবাসীরা তাকে ঘেরাও করে বসে। এমপি এর অবস্থা তখন শোচনীয়. সে উপায়ন্তর না দেখে বার বার তার হাতের ব্যাজটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু গ্রামবাসীদের কেউ ইংরেজী না জানায় তার কথা বুঝতে পারে না, সবাই তাকে মারার জন্যে হাম্বি তাম্বি করতে থাকে। সে আর কোন উপায় না দেখে সবার হাত পা ধরে ক্ষমা চেয়ে কোন প্রকারে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায় এর পর থেকে আর কোনদিন গোড়া সৈন্যরা এদিকে আসেনি।

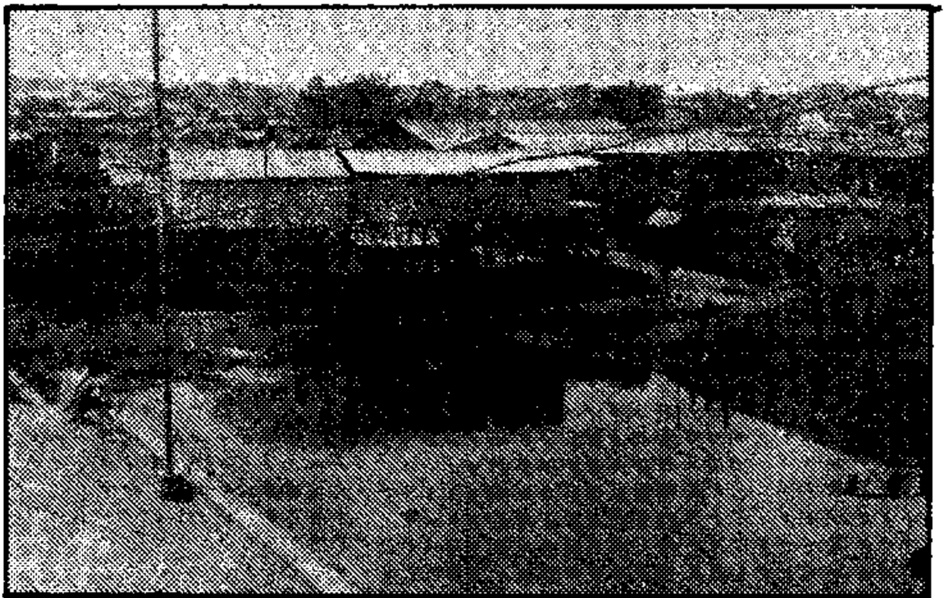
উপরে বর্ণিত র‍্যালী ব্রাদার্সের গুদামের মত সে এলাকায় আরো অনেক বিত্তশালীদের পাটকল ও গুদাম ছিলো এবং কাষ্ঠ ব্যবসায়ী কাঠের থল তথা কাঠ বিক্রয়ের ডিপো ছিলো। ছোট বেলায় আমরাও দেখেছি বিত্তশালী হিন্দুদের কাঠ বিক্রয়ের থল। তন্মধ্যে গৌর বাবুর কাঠের থল সর্বশেষে বন্ধ হয়েছে। ১৯৬৩ সালে আমার উদ্দ্যোগে ঢাকা পৌর সভার মাধ্যমে এলাকার দক্ষিণ পূর্বে এক গভীর ড্রেন তৈরীর জন্য খনন কালে বহু কাল পূর্বের বিরাট আকারের একটি কাষ্ঠখণ্ড পাওয়া যায়। এখানে যে কাঠের বড় ধরনের ব্যবসা ছিলো, এ কাষ্ঠ খণ্ড প্রাপ্তি থেকেই তার নিদর্শন পাওয়া যায়। মুনতাসির মামুন রচিত হৃদয় নাথের ঢাকা বইতে উনিশ শতকের মধ্যভাগে হৃদয় নাথ যে চরটিকে নবাবগঞ্জ চর বলে উল্লেখ করেছেন, আসলে তা লালবাগ চর। কিছু লোক অবশ্য নবাবগঞ্জ চর বলতো যেহেতু তখন ঢাকার পশ্চিম এলাকায় নবাবগঞ্জ নামটি মসহুর ছিলো।

পাক আমলের শেষ দিকে এ রাস্তায় যত্রতত্র কাঁচাবাজার বসার ফলে লোকজন ও যান বাহনের খুবই অসুবিধা হওয়ায় তা দূরকরণার্থে আমার প্রচেষ্টায় একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সিরকো সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজের সাবেক ফ্যাক্টরীটি খরিদ করে ১৯৬৮ সালে কেল্লাবাজার নামে একটি কাঁচাবাজার ও শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করতে সমর্থ হই। সরকারের কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা ও ঋণ

ব্যতিত খ্রীষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ এ আর্থ সামাজিক পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারায় ১৯৮৩ ও ১৯৮৭ সালে সরকার ঢাকা জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার দান করেন। এবং ১৯৮৫ সালে এরূপ উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য আমাকে ঢাকা মহনগরী এবং ১৯৯৩ সালে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ১৯৯১ সালের জাতীয় শ্রেষ্ঠ সমবায়ী (বিপণন) হিসাবে স্বর্ণপদক ও সনদ দান করেন। এ মহল্লায় আব্দুল জব্বার নামে এক বৃদ্ধ ছিলো তিনি যৌবনকালে ভাল লাঠি খেলা দেখাতেন। তিনি যখন স্থানীয় খাকসার নেতা ছিলেন তখন আমরা আমলীগোলার তরুণ যুবকগণ অনেকেই তার নিকট লাঠি ও তরবারী খেলা শিখেছি। সে সময় আমলীগোলাতে তার একটি মুদি দোকান ছিলো। এ মুদি দোকানটি এলাকার খাকসার আন্দোলনের আড্ডা ছিলো। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তার মুদি দোকানটি লুট হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি খাকসারের আদর্শ হতে সরে যান।

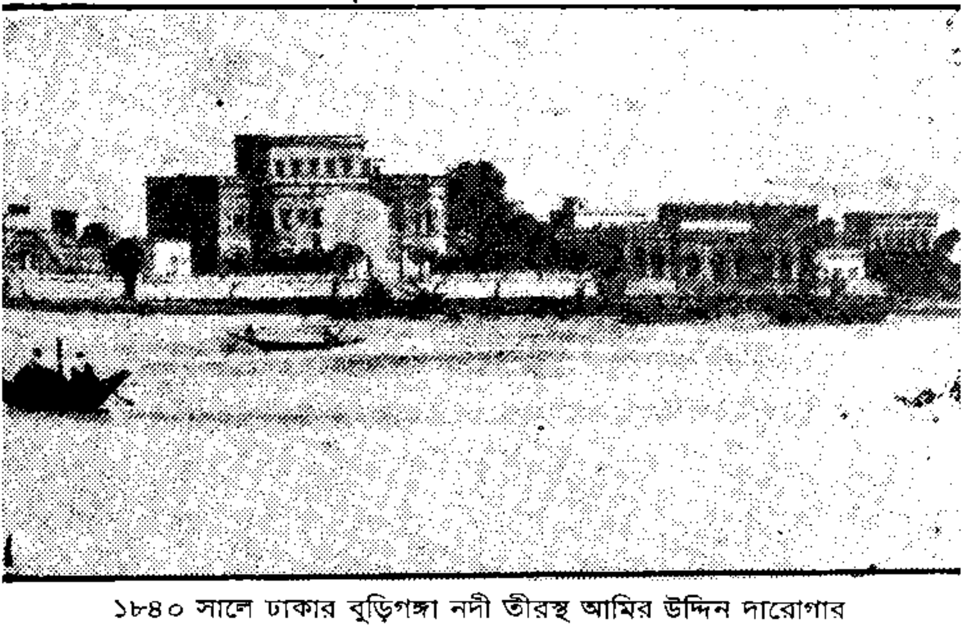
এ বস্তির পশ্চিমে লালবাগ চর নামে একটি বিরাট চর ভূমি ছিলো। এ চরে বর্ষার আগে কৃষিকাজ চলতো। শুষ্ক মৌসুমে এতদঞ্চলের ছেলেপুলের দল ছুটোছুটি, খেলাধুলা ও ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়াতো। এ চরেও ১৮৫৭ সালে আহত সিপাহী ও শহীদদের লাশ ফেলা হয়েছিলো। তাই কিছুকাল পূর্বে দুপুর বেলা ও রাত বিরেতে মায়েরা তাদের ছেলে-পুলেদের এই চরে যেতে বারন করতেন। জনশ্রুতি আছে, 'ভাই' ও 'পানি' বলে নাকি দুপুর বেলা কিসের আওয়াজ বস্তিবাসীরা শুনতে পেতো। এখান থেকে। আমরাও কিশোর বয়সে কখনো একাকী দুপুর বেলা ওই চরে খেলতে যেতাম না। অবশ্যি দলবদ্ধ হয়ে যেতাম। এই চরাঞ্চল এ এলাকার আশীর্বাদ স্বরূপ ছিলো। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মত। আজ সেই মনোরম দৃশ্যের বিলুপ্তি ঘটেছে। স্বাধীনতার পর হতে এখানে বসতি গড়ে উঠতে শুরু করেছে। আজও এ বসতির পরিসর বেড়েই চলেছে। কালে হয়ত এখানে আর ফাকা জায়গা পাওয়া যাবে না। সবই ঘর-বাড়িতে ভরে উঠবে। ঢাকা পৌর করপোরেশন আমার প্রস্তাবক্রমে ১৯৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে এই চর এলাকার নতুন বস্তিটির নামকরণ করেছেন শহীদ নগর।

এই চরের দক্ষিণ পাশ দিয়ে কুলকুল রবে বুড়িগঙ্গা নদী বয়ে চলেছে। একদিন এই নদী ছিলো কর্মমূখর। পৃথিবীর কত জায়গা থেকে আসতো সওদাগর, পরিব্রাজক এই নদী পথে। কেল্লার নিকটবর্তী নদীতে থাকতো শাহী বজরা আর থাকতো সহস্র নাওয়ারা (নৌবহর)। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মুকাররম খাঁর কথা। তিনি স্বল্পকালের জন্যে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হলেও তিনি বিপুল জাঁকজমক ও শান শওকতের সাথে শাসনকার্য চালিয়ে যান।

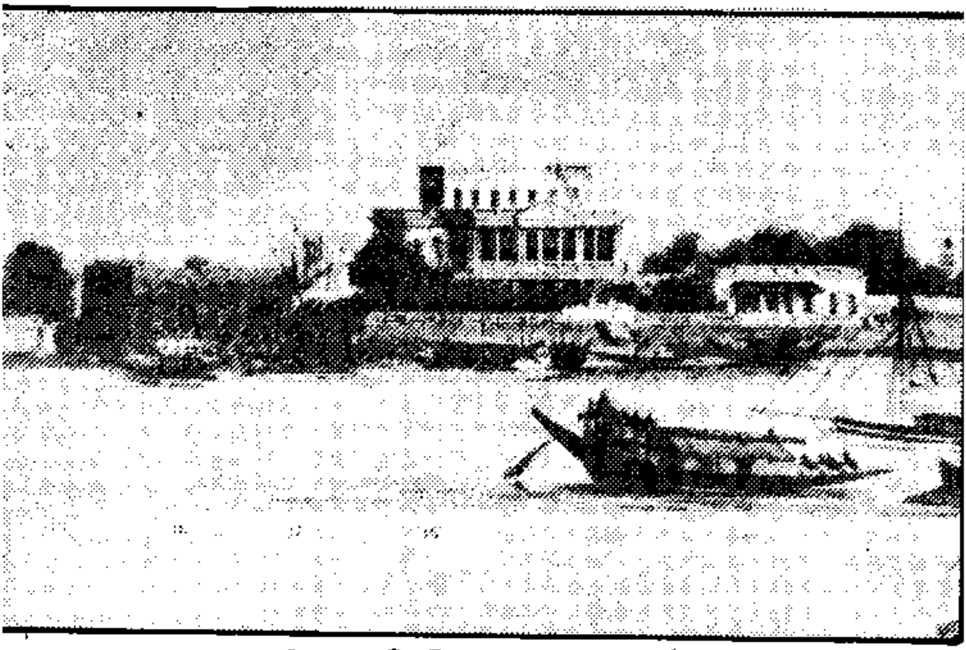


শহীদ নগর বস্তির দৃশ্য

মুকাররম খাঁ এই নদীবক্ষে যেসব নয়নাভিরাম দৃশ্য সমারোহের ব্যবস্থা করেছিলেন তা ছিলো অতুলনীয়। তিনি বিভিন্ন প্রকার জল-ক্রীড়ানুষ্ঠানাদি ভালবাসতেন। শহরের যে সকল অংশ নদীর তীরে অবস্থিত ছিলো, সেখানে প্রতিরাতেই আলোক সজ্জার ব্যবস্থা হতো এবং নদীর বুকে অসংখ্য নৌকাতে জ্বলতো ফানুস বাতি। তাতে নদী তীরবর্তী এলাকায় এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হতো। আর এই সৌন্দর্য বুড়িগঙ্গার সৌন্দর্যকে আরও শতগুণে বাড়িয়ে দিতো।

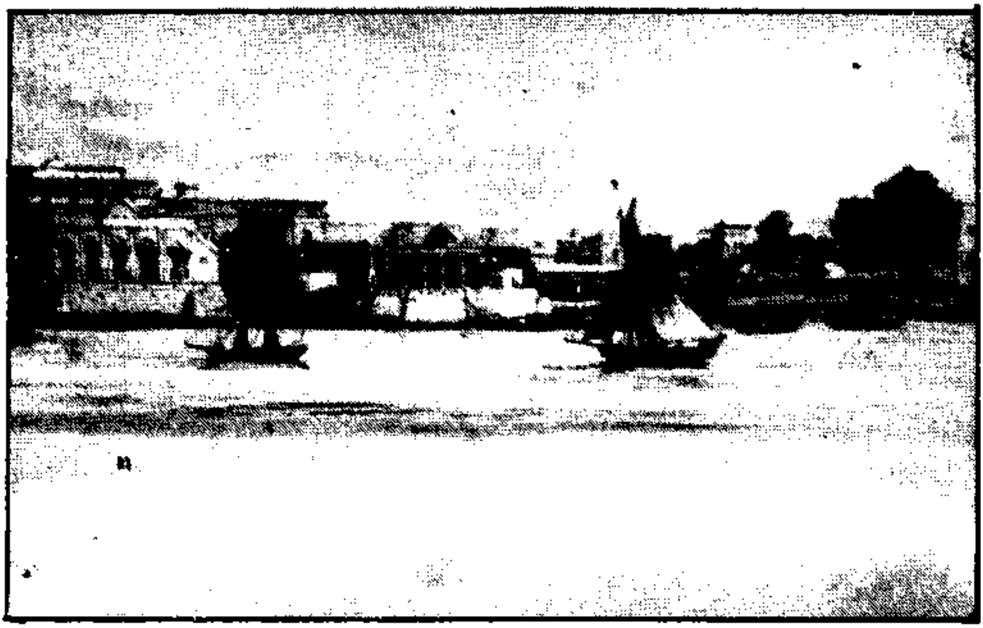


১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী তীরস্থ আমির উদ্দিন দারোগার বাস ভবন ও আর্মেনীয়ান মিঃ মানুকের বাস ভবন



১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী তীরস্থ ঢাকার বিলিয়ার্ড রুমন, রাজস্ব বিভাগের কমিশনার মিঃ জে. ডানবার এবং তার সৌখিন সহকর্মি মিঃ ডব্লিউ. এইচ. জোন্সের গৃহ ও সর্ব বামে ব্যাপ্টিস্ট্ মিশনারী বেভারেন্ড রবিণ সনের বসত বাড়ী।

আগের দিনে পণ্য আনা-নেয়া ও লোক চলাচলের একমাত্র বাহন ছিলো নৌকা। এই নৌকার প্রকারভেদ ছিলো বিচিত্র ধরনের। তাছাড়া বিভিন্ন আকৃতির নৌকাগুলোকে বহু বর্ণে ও সম্ভারে সাজানো হতো। নৌকার গায়ে বিচিত্র বর্ণের কারুকার্য অংকিত সাজানো থাকতো বহু রকমের চিত্র ও মূর্তি। নৌকার সংখ্যাও ছিলো অনেক। রাত-দিন এসব নৌকা চলাচল করতো। বুড়িগঙ্গার বুকে। নদী পথে যাতায়াতের জন্য এক কালে গহেনা নৌকাই ছিলো প্রধান বাহন। এই গহেনা নৌকা সদর ঘাট, লালকুঠি, বাবু বাজার, চাঁদনী ঘাট, সোয়ারী ঘাট, দয়াগঞ্জ, ফরাশগঞ্জ হতে বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিয়ে বিভিন্ন স্থান ও জেলায় নিয়মিত গমণাগমন করতো। আজও নৌকার আধিক্য দেখা যায় বুড়িগঙ্গায়। কিন্তু সে দিনের মত দৃশ্যের অবতারণা আর হয় না। এই যান্ত্রিক যুগে লঞ্চ, স্টিমারে নৌকাগুলোকে কেমন যেন কোণঠাসা করে দিয়েছে। আজ কানে বাজে ছোট-বড় লঞ্চ-স্টিমারের ভেপুর আওয়াজ আর ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় কর্কশ শব্দ। এতদসত্ত্বেও নদীর বুকে নৌকা ভাসিয়ে বহু লোক তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। দিনে রাতে খেয়া পারাপার করে পয়সা রুজি করছে অনেকে। শহরের পার্শ্ববর্তী বুড়িগঙ্গা শান্তশিষ্ট। তার কাজল কালো পানি বর্ষায় স্ফীত হয়ে ওঠে। কাজল পানি পিংগল বর্ণ ধারণ করে। সে তার আর এক শোভা।



১৮৪০ সালে ঢাকার নদী তীরস্থ মিঃ পগোজের বাসগৃহ

আজও দিনশেষে ধীরে ধীরে রোদের উত্তাপ আর জনকোলাহল স্তিমিত হয়ে পড়ে, কোন কোন অংশে নদীর ঘাট জনশূন্য হয়ে যায়, চপল বাতাস থেমে যায়, নৌকার পাল নামানো হয়, একটা মন্থর স্তব্ধতা নেমে আসে চারদিকে – তখনও বয়ে চলে শুধু নদী, অবিরাম অবিশ্রাম গতিতে। ধরার বুকে কালো যামিনী নেমে আসে, অন্ধকারে দুনিয়ার রঙ যায় বদলিয়ে, ঊর্ধ্বে অধোমুখ দেদীপ্যমান অদ্ভুত নক্ষত্র খচিত জ্যোতির্ময় আকাশ – নীচে শুধু অন্ধকার আর নীরব নিস্তব্ধ পৃথিবী। নদীর তখনও বিরাম নেই। দু-একটা ডিঙি নৌকা চলে তখনো মিটমিটে আলো জ্বেলে। লঞ্চ আর স্টিমারের আলোয় কোন সময় হয়ত নদীর বুকে ক্ষণিকের জন্যে একটা বিচ্ছুরণ খেলে যায়। কিন্তু এসব আলোর ঝলকানিতে ফুটে ওঠে রাত্রির রহস্য।

সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও মানুষ জাতি বোধহয় সবচেয়ে বেশি হৃদয়হীন। আবহমান কাল থেকে তাদের মধ্যে চলছে হানাহানি, বিদ্বেষ, বিবাদ-বিসম্বাদ। কেউবা ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে, কেউবা লোভের বশবর্তী হয়ে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিরপরাধ লোকের উপর চালাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার। জল-দস্যুদের আক্রমণে নদীর বুকে নির্মমভাবে চলছে দস্যুবৃত্তি। বর্তমান আর অতীতে যেন কোন পার্থক্য নেই এ ব্যাপারে। অতীতে দুর্ধর্ষ বর্গী, মগ, আরাকানী ও পর্তুগীজরা এই বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিয়ে এসে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ঢাকার উপর চালাতো অকথ্য অত্যাচার। তারা কত মায়ের কোল শূন্য করে তাদের শিশু পুত্র কন্যাকে হত্যা করেছে নির্মমভাবে। কত

স্নেহময় মাতাপিতাকে হত্যা করে কত শিশুকে করেছে এতিম, কত নারীকে করেছে বিধবা। এসব জল-দস্যুদের মধ্যে পর্তুগীজরাই ছিলো সব চাইতে বেশি দুর্ধর্ষ।

তৎকালীন বঙ্গে প্রথম যে পর্তুগীজদের আগমন ঘটে তারা ছিলো অদ্ভুত প্রকৃতির। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক ফ্যাঙ্কইচ বানিয়ারের কথায় ঃ 'তারা মঠ বা গির্জায় যাওয়া একেবারে বর্জন করেছিলো। তাদের প্রত্যেকেই একাধিক বিয়ে করতো। তারা ছিলো দুর্ধর্ষ খুনী। ফাঁসির দণ্ড পাওয়ার মত অপরাধীরা ছিলো তাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের স্বভাব ছিলো বন্য ও বর্বর। তাদের জীবন ছিলো জঘন্য ধরনের এবং তারা ছিলো খ্রীস্ট ধর্মের কলঙ্কস্বরূপ। তারা একে-অন্যকে নির্মমভাবে হত্যা করতো, অথবা দেহে বিষ প্রয়োগ করে বধ করতো। এমন কি তারা নিজেদের পাদ্রীদের পর্যন্ত মেরে ফেলতো। স্থল ও জলপথে চুরি-ডাকাতি করাই ছিলো তাদের প্রধানতম পেশা। কয়েকটি ক্ষুদ্র অথচ দ্রুতগামী নৌকায় সমুদ্রোপকূল কিংবা নদীবক্ষে এসব দুর্বৃত্ত লুটতরাজ করে বেড়াতো। কখনো কখনো তারা নদী পাড়ি দিয়ে দেশের পঞ্চাশ-ষাট মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অতর্কিতে শহর, বন্দর, লোকালয়, বাজার, সভা-সমিতি, বিবাহ মজলিশ ও উৎসবাদির উপর আক্রমণ চালাতো এবং নৃশংসভাবে হত্যা ও লুটতরাজ করতো। ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে বেঁধে তাদের উপর চালাতো ভয়াবহ অত্যাচার। অনেক সময় লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সাথে এইসব নর-নারীকেও নিয়ে যেত তাদের সাথে ক্রীতদাস রূপে। লুণ্ঠনপর্ব শেষ হলে ঐসব শহর, বন্দর এবং লোকালয়ে অগ্নিসংযোগ করে সেগুলোকে মহা শ্বশ্মানে পরিণত করে দিতো। তাদের লুণ্ঠন বৃত্তির কবল থেকে বৃদ্ধরাও রেহাই পেত না। বৃদ্ধদের কোন কাজকর্ম করাতে পারবে না ভেবে অন্যের কাছে তাদের বিক্রি করে দিতো। তারা এত বেপরোয়া ও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিলো যে, যেখান থেকে এইসব বৃদ্ধদের ধরে নিয়ে যেত সেখানেই তাদের আবার বিক্রি করার জন্যে নিয়ে আসতো। অনেককে আবার মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মা-বাবা অথবা আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরিয়ে দিতো। মোঘলদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করাই ছিলো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলাম খাঁ যখন বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন, তার আগের বছরে পর্তুগীজরা মোঘলদেরকে পরাভূত করে দিয়েছিলো। ফলে তাদের দম্ভ ও মোঘলদের বিতাড়নের উচ্চাশা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছিলো। একবার তারা গনজালেশ নামে এক নাবিককে নেতৃপদে নির্বাচিত করে এক বিরাট নৌসেনা গঠন করে সন্দ্বীপ অধিকার করে নিয়েছিলো। তাদের বাসনা ছিলো বাংলায় উপনিবেশ স্থাপন করা। গনজালেশের অসম সাহসিকতাপূর্ণ কাহিনী মধ্যযুগের

উপন্যাসের মতই চমকপ্রদ। এক সহস্র মুসলমানকে সন্দ্বীপে হত্যা করে এবং ভীতসন্ত্রস্ত হিন্দুদের গোলামে পর্যবসিত করে সন্দ্বীপে সে জেঁকে বসেছিলো। তার দস্যুবৃত্তি ও লুটতরাজের লোমহর্ষক কাহিনী দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তার এই দুঃসাহসিক কাহিনী শুনে নানা ধরনের দুর্বৃত্ত এসে তার দলে যোগদান করতো। তার দলে পর্তুগীজদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার, ভারতীয় নাবিক দুহাজার এবং অশ্বারোহী সৈন্য দুশ। তার নৌবহরে কামান সংযুক্ত একটি নৌকাও ছিলো।

ইসলাম খাঁ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার পর যখন উড়িষ্যায় আফগানদের সঙ্গে শেষ মোকাবিলায় ব্যস্ত ঠিক সেই সময় আরাকান রাজ নয়া রাজধানী ঢাকাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার সংকল্প নিয়ে পর্তুগীজদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। সন্ধির শর্ত হলো যুদ্ধে জয় লাভের পর তারা বঙ্গদেশকে দুভাগে ভাগ করে নেবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো আরাকানীরা স্থলপথে ও পর্তুগীজরা জলপথে অগ্রসর হয়ে ঢাকার ভাটিতে কোন এক স্থানে মিলিত হয়ে একযোগে রাজধানী আক্রমণ করবে। কিন্তু ইসলাম খাঁর মহাপরাক্রমের কথা হয়ত তাদের জানা ছিলো না। তাদের এই অভিসন্ধির কথা ইসলাম খাঁর অজানা ছিলো না। আরাকানীরা পর্তুগীজদের সাথে মিলিত হবার পূর্বেই মোঘল অশ্বারোহী সৈন্যরা প্রবলভাবে তাদের আক্রমণ করলো। এবং অতি সহজেই তাদের বিধ্বস্ত করে ফেললো। এই আক্রমণে বহু আরাকানী নিহত হলো। এদিকে গনজালেশ আরাকানীদের এই পরাভবের কথা শুনে তার সৈন্য-সামন্তদের নিয়ে মোঘলদের সম্মুখীন হতে সাহসী হলো না। বিনা বাক্য ব্যয়ে সে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সন্দ্বীপে ফিরে গেলো। অতঃপর আরাকানী মগরা পর্তুগীজদের আর পর্তুগীজরা আরাকানী মগদের দোষারোপ করতে লাগলো। এর ফলে পূর্ববঙ্গে কিছুদিনের জন্যে মগ ও পর্তুগীজদের আক্রমণ বন্ধ থাকে। সেই সাথে পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে আবার শান্তি ফিরে আসে।

কালের প্রহরী বুড়িগঙ্গা পর্তুগীজ ও আরাকানী দস্যুদের নৃশংসতায় হয়েছে আক্রোশে স্ফীত হয়েছে বারবার। তার রুদ্ররোষ ফেটে পড়েছে মানুষের বিরুদ্ধে। সে স্ফীত হয়েছে বন্যার তাণ্ডব নিয়ে। গ্রাস করেছে জনপদ, নগর, বন্দর। কত অমূল্য প্রাণ ধন-সম্পদ যে এর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই! কত প্রতাপশালীর প্রতাপ যে বিলীন হয়েছে, কত অহংকারীর অহংকার যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে তার হদিস নেই। এভাবেই একদিন এ নদী রেহাই দেয়নি বাংলার হতভাগ্য সুবেদার মুকাররম খাঁকে। সুবেদার নিযুক্ত হবার ছমাস যেতে না যেতেই দিল্লীর সম্রাট এক ফরমানে তাঁকে নতুন খেতাবে ভূষিত করেন। এই ফরমান নিয়ে একদল রাজকর্মচারী ঢাকার

পথে অনেক দূর এগিয়ে আসে। সম্রাটের এই ফরমান ও অনুগ্রহ যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করার জন্যে তিনি এক প্রকাণ্ড নৌবহরের আয়োজন করেন। নানা বর্ণে সুশোভিত হয়ে সুবেদারের শাহী বজরা বিপুল উৎসাহে নদীর উজানে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রতিটি নৌকায় সাদা পাল উড়ছে পতপত করে। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো নদীর বুকে। বাদশাহী ফরমান নিয়ে যে দলটি আসছিলো, পথে তাদের উপস্থিতি বিলম্বিত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে মাগরিবের নামাজের সময় হলো। নদীর স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো আজান। নামাজ আদায়ের জন্যে বজরা তীরে ভেড়াবার হুকুম হলো। সুবেদার নিজের জন্যে যে নৌকাটি বেছে নিয়েছিলেন সেটি ছিলো সরু, লম্বা এবং দ্রুতগামী। এ ধরনের নৌকা সাধারণত দাঁড়ে চলে। কিন্তু গতিবেগ বাড়াবার জন্যে এতে পাল তোলা হয়েছিলো। নদীতে তখন প্রবল স্রোত। নৌকা তীরে ভেড়াবার সময় অকস্মাৎ এক প্রচণ্ড ঝাপটায় নৌকাটি নদীর অতলে তলিয়ে গেলো। সুবেদার এবং যে সমস্ত অমাত্য নৌকার প্রকোষ্ঠে ছিলেন তাঁরা আর সে প্রকোষ্ঠ থেকে বের হতে পারলেন না। এতোগুলো নাবিক এবং বিরাট নৌবহরের সামনেই এমন শোচনীয়ভাবে তাঁদের মৃত্যু হলো। কেউ তাঁদের মৃত্যুকে রোধ করতে পারলো না।

এমনিভাবে কালে কালে এই অশান্ত বুড়িগঙ্গা যে কত মানুষের প্রাণ সংহার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিছুকাল আগেও দেখেছি, নদীর আক্রোশ মেটাবার জন্যে লোকে লবণ চিনি প্রদান করেছে নদীর পানিতে। খোয়াজ খিজিরের দোহাই দিয়ে মানত করেছে ভেলা ভাসিয়ে। এই সব ভেলায় দিয়েছে কত রকম সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য, পয়সা-কড়ি ও চেরাগ-বাতি। আবার এই নদীর বুকেই মানুষ তার তেজারতির নৌকা ভাসিয়েছে, ধীবররা নৌকায় বসে নদীর বুকে জাল ফেলে মহাউল্লাসে মাছ ধরেছে।

বুড়িগঙ্গার উৎপত্তি সম্পর্কে হিন্দু পুরাণে কথিত আছে, মহামুণি জমদাগ্নির আদেশে পুত্র পরশুরাম মাতৃহত্যা করে মারাত্মক পাপ করেছিলেন। যে কুঠার দ্বারা তিনি মাতা রেনুকাকে বধ করেছিলেন সেই কুঠার তাঁর হাতে আটকে গিয়েছিলো। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে কুঠার তাঁর হাত থেকে ছাড়ানো যায়নি। অবশেষে তিনি গভীর দুঃখ ও অনুশোচনায় নিমজ্জিত হলেন এবং ধ্যান ও তপস্যায় দিন কাটাবার জন্যে পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি ব্রহ্মপুত্রের মহাত্মের কথা শুনতে পেয়ে আশায় বুক বেঁধে তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। ব্রহ্মপুত্র তখন একটি হ্রদরূপে হিমালয় পর্বতে আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি বহু বছর ধরে হিমালয়ের জনহীন দুর্গম পথে নিষ্ফল ঘুরতে থাকায় তাঁর চোখের সামনে থেকে এক

১৮৯২-৯৩ সালে পৌরসভা রাহাট রোডটির নাম পরিবর্তন করে কাজী রিয়াজউদ্দিন রোড রাখেন।



১৮৪০ সালে ঢাকার নদী তীরবর্তী লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ-পূর্বাংশ ও কেল্লার পাদদেশে কাজী রিয়াজ উদ্দিন রোড মহল্লার তৎকালীন দৃশ্য

ঐতিহাসিক লালবাগ দূর্গের দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রান্তভাগের রাস্তার মোড়টিকে ঢাকাবাসীরা রাহাটের মোড় বলে অভিহিত করতো। যা আজ সকলের নিকট কেল্লার মোড় বলে পরিচিত।



রাহাটের মোড় তথা কেল্লার মোড়ে লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দেখা যাচ্ছে। ১৯৮৮ সালে বন্যার পানি বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে এ সড়ক পর্যন্ত এসেছিল

প্রবীণ ব্যক্তিরা আজও রাহাটের মোড়ই বলে থাকে। এই রায়টের মোড়ের সঙ্গে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ মঙ্গলপাণ্ডে নামে এক ভারতীয় সৈনিক ব্যারাকপুরে জনৈক ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলো। সেই সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তীতে প্রবল ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো, মে মাসে ভারতের মিরাট ও জুনমাসে উত্তর ভারতে, তৎপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। ঢাকা নগরী তখনো শান্ত। এ বিপ্লবের সাথে ঢাকা তখনো জড়িত হয়নি। তবে সাধারণ মানুষের আশংকা ছিলো বিদ্রোহ অত্যাসন্ন। এ বিদ্রোহকে সামনে রেখে ঢাকার অধিবাসীরা দু'ভাগে বিভক্ত ছিলো। একটি সংখ্যা লঘিষ্ঠ দল সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থনে, আরেকটি বৃহৎ দল তারা বিপক্ষীয় ইংরেজ সরকারের গোড়া সৈন্যদের উৎসাহ ও নানারূপ মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করে দিতো। এতে নব্য প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যাই ছিলো অধিক এদের মধ্যে সরকার অস্ত্রও বিতরণ করেছিলো। ঢাকাবাসীদের আরেকটি বড় অংশ বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলো। এতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই ছিলো।

লালবাগ কেল্লায় তখন ৫৩ তম ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর দুটি দল ছিলো। গোলন্দাজ সৈন্যসহ দেশী সিপাহীদের সংখ্যা ছিলো ২৬০ জন। এদের মধ্যে অধিকাংশ পাঠাণ ও কিছু শিখ সৈন্যও ছিলো। এরা কালা সিপাহী নামে ঢাকাবাসীর কাছে পরিচিত। এদিকে সারা ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে বিপ্লবের অগ্নিশিখা বাতাসের সঙ্গে এসে পড়লো চট্টগ্রামে ও ঢাকা নগরীতে। অন্য দিকে পলাশী যুদ্ধের শত বার্ষিকীর কথাও ঢাকাবাসীর স্মৃতির দুয়ারে এসে হানা দিলো। শহরে চাঞ্চল্য দেখা দিলো, নিত্য নতুন সত্য মিথ্যা বহু খবর আসতে লাগলো বিভিন্ন স্থান হতে। তখন রেডিও, টিভির ব্যবস্থা ছিলোনা বলে লোক মুখে যে সব খবর আসতো সেটাকে ভিত্তি করে সাধারণ মানুষ নিজেদের কর্তব্য নির্ণয় করতো। কেল্লার দেশী সিপাহীরা ইংরেজ সরকারের সুনজরে ছিলোনা বলে তাদের নিকট কোন্ খবর সত্য কোনটা মিথ্যা যাচাই করার পথ ছিলোনা। তাই তারাও আশপাশের আজাদী প্রিয় মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। তবে তাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষ্যণ তখনো দেখা যায়নি। কিন্তু তবুও ঢাকার নব্য সহযোগী হিন্দুদের একটা বিরাট অংশ শহরে নানা গুজব, বানোয়াট কাহিনী, সিপাহী ও শহরবাসীদের মধ্যে যাতে মনোমালিন্য ঘটে বা সন্দেহ জাগে, সেরূপ খবরাদি সূক্ষ্মভাবে প্রচারে সক্রিয় ছিলো। কোথাও ছোট-খাটো

কোন ঘটনা দেশী সিপাহী ও শহরবাসীদের মধ্যে ঘটলে তা অতিরঞ্জিত করে ঢাকায় ছড়িয়ে দিতো। তৎকালিন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী হৃদয়নাথের উক্তি থেকেই এ কথাগুলো প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন, "কালা সিপাহীরা ছিলেন শক্ত সমর্থ, অমায়িক এবং এই জন্য শহরে মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন তারা খুবই জনপ্রিয়"।

পূবেই বলা হয়েছে ইংরেজ সমর্থক লোকেরা বিভিন্ন ধরনের গুজব ও কাল্পনিক ঘটনাবলী শহরের শান্তিপ্রিয় লোকদের মধ্যে চাতুর্য্যের সঙ্গে দ্রুত প্রচার করতঃ হৈহুল্লোর করে অফিস আদালত, স্কুল কলেজ জন শূন্য করে দিতো। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যেতো। যুদ্ধের প্রক্কালে ২৫শে মার্চ ভয়াল রাত্রির পাক সেনাদের বর্বরোচিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর শহরবাসী যেমন পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য সদরঘাট এবং ঢাকার অন্যান্য নদীর ঘাট দিয়ে নৌকাযোগে বিভিন্ন স্থানে চলে গিয়েছিলো। তেমনি সে সময়ও লোকেরা বিশেষ করে বিত্তশালী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মূল্যবান ধন সম্পদ কুয়োতে ফেলে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সদরঘাট ও অন্যান্য ঘাট দিয়ে নৌকার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে চলে গিয়েছিলো। ভীতু সাধারণ ব্যক্তিরাও শহরময় দৌড়াদৌড়ি করে যেখানে পেরেছে আশ্রয় অবলম্বন করেছে। অথচ তৎকালীন গুণ্ডা বদমাশ বলে যারা চিহ্নিত ছিলো তারা সামান্যতম কোন উৎপাতও করেনি। তবুও লোক জন রাস্তা ও গলি ঘুচিতে ছুটোছুটি ও শহর ত্যাগ করেছেন অকল্পনীয়ভাবে। ইংরেজ শাসকের এক দল শুভাকাংক্ষী মিথ্যা ও অতিরিঞ্জিত কথা বলে ইউরোপীয়ান ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়ে আতকিংত করে ফেলতো। ফলে তাঁরা বৈঠক করে তাঁদের অবস্থানকে শক্তিশালী করবার পদক্ষেপ নিতেন। দলবদ্ধভাবে টহল দিতে লাগলেন তাদের গুরুত্বপূর্ণ অফিস ও স্থান গুলোতে।

এমনিভাবে ভয়ভীতি, আতংক, গুজব চলতে থাকায় নগরবাসীরা সম্ভবমত নিত্য প্রয়োজনীয় বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রী কিনে মওজুত করার ফলে ঐ সব দ্রব্যের মূল্য হুহু করে বেড়ে যায়। ফলে এক সময় খাদ্য দ্রব্য শহর থেকে নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হলো। ইতিমধ্যে ইউরোপীয়ানরা কমিটি অব সেফটি গঠন করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে শহরবাসীদের জানিয়ে দিলেন যে, "শহরবাসী ভদ্রলোকেরা কোন গুজবে কান দিবেন না। এবং কোন গুজব শুনলে ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিটি সদস্যাদের যেন জানান।" অন্যদিকে ইংরেজ বেসামরিক ব্যক্তিরা বিপদের সময় যেন নিজেদের পরস্পরকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন। এরূপ আহ্বান সকল ইংরেজদের প্রতি জানানো হলো, জরুরী আপদকালে আশ্রয়ের জন্য কমিশনার এর বাসভবনটি ঠিক

করা হয়েছিলো। আগষ্ট মাসের এক সময় ভীত সন্ত্রস্ত ঢাকার ইউরোপীয় সম্প্রদায় কলকাতার সাহায্য প্রার্থনা করায় লেফটেন্যান্ট লুইসের অধীনে শতাধিক নৌসেনা দুটি জলযান দিয়ে সদরঘাটে অবতরণ করে ঢাকা শহরের ইউরোপীয়দের রক্ষার্থে। প্রথমে ব্যাপটিস্ট চার্চের উল্টোদিকের বাড়ীতে, পরবর্তীতে মিল ব্যারাকে সৈন্যদের নিয়ে আস্তানা গেড়ে ছিলেন। তজ্জন্য মিল এলাকাটি মিলব্যারাক নামে নামধারণ করে। লেঃ লুইস তাঁর সেনা দল নিয়ে প্রায়ই র‍্যাকেট কোর্ট, ঢাকা কলেজ, ও কালেক্টরীর সামনে মহড়া দিতেন, সিপাহী ও শহরবাসীদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্যে। এসব দেখে পাহাড়ারত দেশী সিপাহীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ব্যঙ্গ করে বলতো, "ইয়ে সাব কিয়া ডর দেখাতো হ্যায়"। এরই মধ্যে ঢাকায় বসবাসরত ইউরোপীয়রা একটি স্বেচ্ছাসেবক সশস্ত্র বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এবং সে মতে তাঁদের প্রশিক্ষণও চলতে থাকে। মেজর পদাতিক ও মিঃ হিচিন্স ঘোড় সওয়ার বাহিনীর অধিনায়ক হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে বিশেষ করে মুসলমান উৎসব দিনগুলোতে তারা রাস্তায় টহল দানে রত থাকতো। এহেন পরিস্থিতিতে আরমেনীয়ান বণিকগণ ঢাকা ত্যাগ করে চলে গেলেন অন্য শহরে। শহরে উত্তেজনা বাড়তে থাকলে তার প্রতিক্রিয়া দেশী সিপাহীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ঢাকার ইংরেজী সংবাদপত্র "ঢাকা নিউজ" ইংরেজ সৈন্যদের গুণগান গেয়ে অন্যদিকে অতিরঞ্জিত খবর ছেপে শাসকদের পক্ষে জনগণের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করতে থাকে। তার দু'একটি উদাহরণ পাঠকের উপলব্ধির জন্য দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

এসব গুজবের মধ্যে একটি হলো যে, সিপাহীরা স্ত্রী শিক্ষা পছন্দ করে না, অতএব যেকোন সময় সিপাহীরা কোন কিছু করতে পারে। যার ফলে গার্লস স্কুল বিশেষ করে বাংলাবাজার গার্লস স্কুল একেবারে ছাত্রীশূন্য হয়ে পড়েছিলো। আরেকটি গুজব প্রচার হয়েছিলো যে দু'কোম্পানী দেশী সৈন্য জলপাইগুড়ির পথে রওয়ানা হয়েছিলো পথে ব্যারাকপুরের বিতাড়িত সিপাহীদের সঙ্গে মিলে একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ করে ঢাকায় ফিরে এসেছে, এসেই তারা লালবাগ দূর্গের সিপাহীদের সঙ্গে মিলে পার্শ্ববর্তী বাজার লুট করেছে এবং জেলখানার বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছে। এ গুজব ঢাকায় চাঞ্চল্য এবং আতংক সৃষ্টি করতে পেরেছিলো যথেষ্ট। অনেক ইউরোপীয়ান পরিবার-পরিজন নিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন নদীতে। কালেক্টরীর এজলাস বন্ধ হয়ে গেলো, মাটি খুঁড়ে ধন সম্পদ পুতেঁ রাখলেন অনেকে। সিপাহীগণ অকারণে মারপিট করে চলেছে শহরের মান্যগণ্য বাসিন্দাদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঢাকার এক তরফা উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পেতে একদিন তার বিস্ফোরণ ঘটলো

২১ শে নভেম্বর। গোয়েন্দা সূত্রে খবর পৌছলো চাঁটগার সিপাহীরা বিদ্রোহ করছে। সঙ্গে সঙ্গে লেঃ লুইস গোপনে বৈঠকে মিলিত হলেন ইংরেজ সামরিক ও বেসামরিক লোকদের নিয়ে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলেন ঢাকার দেশী সিপাহীদের নিরস্ত্র করতে হবে। সেদিন রাতেই কলকাতা থেকে আদেশও পেয়ে গেলেন। ঢাকায় যাতে বাইরের সৈন্য আসতে না প্যারে তজ্জন্য মিরজুমলা নির্মিত টঙ্গীর পুলটি ভেঙ্গে দেয়া হলো। (অবশ্যি ১৮১৪ সালের D.OWLY ছবিতে পুলটিকে ভগ্নবস্থায় দেখা যায়।) দেশী সিপাহীরা ঘুনাক্ষরেও জানলোনা তাদের ভাগ্যে কি ঘনিয়ে আসছে।

সিপাহীদের পক্ষ হতে কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লবের পূর্বেই ২২শে নভেম্বর রবিবার। সেদিন ছিলো ১০ই মহরম আশুরার দিন, ইংরেজ সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ ভোর হবার পূর্বেই সমবেত হলো আণ্টাঘড় ময়দানে। সেখান হতে তড়িত গতিতে প্রথমে বর্তমান জেলখানায় তৎকালীন ট্রেজারী অফিসে নিয়োজিত দেশী সিপাহীদের অনায়াসে নিরস্ত্র করে দ্রুত বেগে ধাবিত হলো লালবাগ দূর্গের দিকে। তখন সবে মাত্র মুয়াজ্জিনের সুললিত কণ্ঠে আজান ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। অনেকেই আশুরার রোজা পালনের জন্যে সেহরী খেয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। কেহ বা ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য তৈরী হচ্ছে। এমনি সময়ে অতর্কিতে দূর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ভাঙ্গা প্রচীরের কাছ দিয়ে ইংরেজ সেনাগণ আক্রমণ চালালো। মাত্র গুটি কতক সৈন্য রাত্রি জাগা ঢুলুঢুলু চোখে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে উচ্চকিত হয়ে উঠলেও অন্য সিপাহীগণ অতর্কিত আক্রমণের প্রচণ্ডতায় দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো। ইংরেজ সেনাগণ পরিস্কার দেখতে পেলো সিপাহীরা নেতৃত্বের অভাবে বিশৃংখল অবস্থায় ছুটোছুটি করছে। কেহ বা পালাবার চেষ্টা করছে। পালাতে গিয়ে অনেকেই পঞ্চাশ ফুট কেল্লার প্রাচীর থেকে পড়ে গিয়ে ভীষণভাবে আহত হয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে। তারা অতি সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে কেল্লার কামানটিকে ঘুরিয়ে দিলো সিপাহীদের দিকে, বিভ্রান্ত সিপাহীদেরকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের বাসস্থানের মধ্যে। তবুও কিছু সংখ্যক বীর সিপাহী বিপুল বিক্রমে তাদের বাধা দিয়ে যাচ্ছে।

কতক সিপাহী প্রাচীরের বুরুজে আশ্রয় নিয়ে প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগলো। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ইংরেজ সেনা ঘায়েল হয়ে পড়েছে। ইংরেজ সেনারা লক্ষ্য করলো, একটা দিক থেকে গুলি এসে তাদের বেশী ক্ষতি করছে। তারা সেদিকে সচকিত হলো। এবার পরিস্কার বুঝতে পারলো যে, পরি বিবির সমাধি সৌধের ভিতর থেকে কে যেন নির্ভিক চিত্তে অবিরাম গুলি চালাচ্ছে। এবার ইংরেজ সেনারা

সতর্কভাবে সেদিকে অগ্রসর হলো। চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললো সমাধি সৌধটিকে। এবার তারা পরিস্কার দেখতে পেলো এক বীর রমনী তাদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হতে পারেননি, সফলকাম হতে পারেননি কেল্লার অবস্থিত সিপাহীরা। ইংরেজগণ অপ্রস্তুত সিপাহীদের উপর আক্রমন চালিয়ে সহজেই তাদের পরাস্ত করতে পেরেছিলো ; গুলির স্বল্পতা, অস্ত্র ও নেতৃত্বের অভাব, শত্রুর আক্রমনের প্রতি উদাসীনতা, অর্থনৈতিক ও গণ সমর্থনের অভাব, শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অধিকাংশ অনীহা, তৎকালীন বাংলার বিশেষ করে ঢাকার মুসলমানদের নেতা খাজা আব্দুল গনি হিন্দুদের বিশিষ্ট ব্যক্তি রূপলাল দাস বৃটিশ রাজকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দান এর অন্যতম কারণ। তবে তারা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারতো ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমনের কথা, তাহলে হয়তো অধিক সময় ইংরেজ সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখতে পারতো। নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করতোনা। জয় অবশ্যি হতোনা, কেননা, সে সময় সারা ভারতের বিপ্লবের আগুন নিভে আসছে। যোগ্য নেতৃত্ব, সুষ্ঠু পরিচালনা আর স্বার্থবাদীদের বিশ্বাস ঘাতকতায় দেশব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলো। সুযোগ সন্ধানীদের সহযোগিতায় ইংরেজ শাসক তখন সর্বত্র শাসন ব্যবস্থা জোরদার করে ফেলেছিলো। ঢাকার শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়নে সরকার ঢাকার কালেক্টর তথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে ১৯৫৭ সালেই দুজন পর পর নিয়োগ করেছিলেন যা ইংরেজ শাসনকালে আর কোন বছর এরূপ হয়নি। বছরের প্রথমে আসেন মিঃ T.B. MACTIER পরে মিঃ C.F. CARNAC।

তাই লালবাগ দূর্গের স্বল্প সংখ্যক সিপাহীদের মধ্যে কেহ কেহ পুত্র-কন্যা, পরিবার-পরিজন নিয়ে তখনকার মত প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালিয়ে আশপাশের বস্তিগুলোতে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু সিপাহীকে স্বার্থান্ধ ব্যক্তি দ্বারা প্রতারিত ও জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছিলো। কিছু লোক তাদের ধনরত্ন'র লোভ সামলাতে না পেরে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সিপাহীদের উপস্থিতি জানিয়ে দিয়েছিলো। অন্যদিকে আশ্রয়দানের অভিযোগে অনেককে পলায়নপর ধৃত সৈন্যদের সঙ্গে আণ্টাঘড় ময়দানে বৃক্ষ সারিতে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিলো। কিছুদিনের মধ্যেই সিপাহীদের উৎসাহ, সাহায্য সহযোগিতা ও আশ্রয়দানের অভিযোগে নিরীহ মহল্লাবাসীকে গ্রেফতার করে, বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডও দেওয়া হলো। গ্রেফতারের নামে যে নির্যাতন এলাকায় চলেছিলো তজ্জন্য সামান্যতম মর্যাদাসীন ব্যক্তিও এলাকায় অবস্থান করতে পারেনি। সিপাহীদের এই সংঘর্ষটিকে ঢাকাবাসী লাল পল্টন ও কালা পল্টন তথা সোজা কথায়

কালা-ধলার লড়াই বলে জেনে আসছে। আমরা ছোট বেলায় আব্বা মরহুম ও প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ হতে ঢাকার সিপাহীদের বিদ্রোহের পূর্বাপর অনেক ঘটনাই শুনেছি। আমার আব্বা তখন তরুণ। তাঁকেও গ্রেফতার ও নির্যাতনের ভয়ে পালাতে হয়েছিলো। অনেক দিন পরে ঘরে ফিরেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ শাসনের ভয় তার মনে প্রবলভাবে বদ্ধমূল হয়েছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের সরকারী ও জাতীয় দিবস গুলোতে বাড়ীর ছাদে বিরাট ইউনিয়নজ্যাক পতাকা উত্তোলন করতেন। এতবড় পতাকা এলাকার হিন্দু বাবুরাও উড়াতোনা। পতাকাটি একটি ট্রাংকের মধ্যে তালা মেরে রাখতেন। অনেকদিন পতাকা উড়াবার কালে জিজ্ঞেস করতাম কেন এই পতাকা আমাদের বাড়ীতে উড়ানো হয়। তিনি অনেক সময় ধমকের সুরে বলতেন "তোরা বুঝবি না"। আবার অনেক সময় সেই সিপাহী বিদ্রোহ কালের ঘটনাবলী ও নির্যাতনের মর্মস্পর্শী বিবরণ দিতেন। সে সব শুনতে শুনতে সেই ছোট বেলাতেই বৃটিশ বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ি। ১৯৪২ সালের দূর্ভিক্ষকালে যখন একটা ছোটদের সমিতি গঠন করি তখনই আব্বার অগোচরে একদিন ইউনিয়নজ্যাক পতাকাটি পুড়িয়ে ফেলি। সে সময়ে হিন্দুগণ যখন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তথা জ্বালাও পোড়াও বিক্ষোভ আমাদের এলাকায় চালাতো চুপে চুপে তাদের দলভুক্ত হয়ে পড়তাম।

আবার ফিরে যাই সিপাহীদের কথায়। লালবাগ দূর্গের সিপাহীরা কোন ইংরেজ কিংবা রাজকর্মচারীকে আক্রমন না করেও এবং নিজেরা ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও বিদ্রোহী বা দাগী হয়ে ফাঁসীতে ঝুললেন, দণ্ডপ্রাপ্ত হলেন। সেই সঙ্গে তাদের সহযোগিতার নামে বেশ কিছু ঢাকাবাসী ফাঁসী এবং দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত হন। তাছাড়া লাঞ্ছিত ও অত্যাচারীত হয়েছিলেন অনেকেই।

লালবাগ দূর্গ অভিযানে ইংরেজ সৈন্যদের যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তন্মধ্যে লেঃ লুইস, লেঃ ইটিবিয়াস, লেঃ ডডওয়েল, লেঃ উইলিয়াম ম্যাকফারসন উল্লেখযোগ্য হলেও সাহসিকাতাপূর্ণ কাজের জন্য নৌসেনা আর্থার মেয়ো ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পদক পেয়েছিলেন। বর্তমান জেলখানায় তৎকালীন ট্রেজারীর সিপাহীদের নিরস্ত্র করার কাজে ছিলেন লেঃ রীড, ফরবেশ হ্যারিস ব্যতিত কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক, অবশ্য ট্রেজারীর সিপাহীরা বিনা বাধায় অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন। অস্ত্র সমর্পণ করেও তারা অত্যাচার আর অবিচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তোপখানার প্রহরারত সিপাহীদের অনেকেই তখন ঘুমাচ্ছিলেন। তাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে নিরস্ত্র করেছিলো ইংরেজ স্বেচ্ছাসেবকরা। হঠাৎ সে সময় লালবাগ দূর্গে গোলাগুলির শব্দে

স্বেচ্ছাসেবীরা কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লে সে সুযোগে বেশ কিছু সিপাহী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

যে বীর রমনীর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি হয়তো তা মুনতাসির মামুনের 'হৃদয় নাথের ঢাকায়' বর্ণিত সুবেদার স্ত্রী হতে পারে। কেননা তার সম্পর্কে যে সব কথা আমার 'কিংবদন্তির ঢাকা' বইতে বলা হয়েছে তার সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে। তাছাড়া সিপাহীদের সঙ্গে একজন মাত্র মহিলারই ফাঁসী হয়েছিলো আণ্টাঘড় ময়দানে। সিপাহীদের ফাঁসী দেওয়ার প্রাক্কালে সে দৃশ্য দেখাবার জন্য বিদ্রোহী বলে কথিত সিপাহীদের আহত সঙ্গী এবং বিশ্বস্ত সিপাহীদের উপস্থিত করেছিলেন ইংরেজরা। যাতে সিপাহী ও জনতার মধ্যে এ উদাহরণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ে চল্লিশ জনের বেশী সিপাহী শহীদ হয়েছিলেন। পালাতে গিয়ে নদীতে ডুবেও পরে কয়েকজন মারা যায়। আহতের সংখ্যা অনেক বেশী। শহীদ সিপাহীদের অনেকেই প্রথমে কেল্লার অভ্যন্তরস্থ পুকুরে পতিত হয়েছিলো। সেখান হতে বর্তমান আজিমপুর ওয়ার্ড চেয়ারম্যান অফিস সংলগ্ন স্থানে কবরস্থ করা হয়। যার ফলে এলাকাটি গোরে-শহীদ মহল্লা নামে দেশবাসীর নিকট পরিচিতি লাভ করে। আহতদের ফেলা হয়েছিলো লালবাগ চর তথা বর্তমান শহীদ নগরে।

লালবাগ দূর্গের কালা-ধলা এই যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ হলেও এজন্য ইরেজ শাসকদের সাহায্য সহযোগিতা শুধু এদেশীয় নব্য সরকারী কর্মচারীবৃন্দ আর ঢাকার বিশিষ্ট জমিদার (নবাব) গণি মিয়াই করেছিলেন তা নয়। ঢাকা বিভাগের বহু দেশীয় জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও করেছিলেন। তাদের নাম পাওয়া যায় মুনতাসির মামুনের 'হৃদয় নাথের ঢাকা' বইতে। তারা হলেন কালেক্টরেটের নাজির জগবন্ধু নাজির, শিব নাথ মোক্তার, মাহমুদ গাজী, তওজী মোহরার, বাজকুমার রায়, শিবজয় উজির, নাসির উদ্দিন, মনোহর, রাজবিযেন রায়, বিবি আসানিশা, আসাদ আলী মৌলভী এবং যশোধর কুমার পাইন। সে বইতে আরো বলা আছে ঢাকার মধ্য শ্রেণীর লোকদের একাংশ সমর্থন করেছিলো ইংরেজদের। সিপাহীদের নিপাতের খবর শুনে ঢাকার ভদ্রলোকেরা বেশ উল্লাসিত হয়েছিলেন। ভদ্রলোক বুঝাতে তখন কাদের বুঝাতেন পাঠকগণ সহজেই অনুমান করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু ইতিহাসে কলংকিত হয়েছেন শুধুমাত্র ঢাকার (নবাব) গণী মিয়া, কেননা তিনি যা কিছু করেছেন প্রকাশ্য ভাবেই। আম মজলিসেই তিনি বলেছিলেন, "এই সংকটময় মুহূর্তে আমার সহায়তা সরকারকে যোগাবে সাহস। আমার অনুপস্থিতি বিস্তার করবে আতংক যা রোধে আমরা এখন শংকিত।" কিছু কিছু ঐতিহাসিক ব্যতিত অনেকেই বলে থাকেন

"সিপাহী বিপ্লব কালে খাজা আব্দুল গণী এদেশের বিশেষ করে ঢাকার মুসলমানদের নেতা ছিলেন বিধায় বিপ্লবীরা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তাই বিপ্লবের দিনটি খাজা সাহেবের জানা ছিলো এবং তা তিনি বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে ছিলেন। কেননা ঢাকায় বিপ্লব দমনের পর ইংরেজ অফিসারদের গৃহে আনন্দ-উল্লাস এর যে জোয়ার এসেছিলো, খাজা আব্দুল গণী সাহেবের বাস ভবনে ও রূপলাল হাউসে সেই উপলক্ষ্যে বল নাচের আয়োজন হয়েছিলো। আবার "হৃদয় নাথের ঢাকা শহর" বইতে যে কথা বলা হয়েছে তার মূল বক্তব্য হলো সিপাহীদের সুবেদার থাকতেন পোস্তায় (বর্তমান শায়েস্তা খাঁন কল্যাণ কেন্দ্রের পিছনে) তার পরিবার পরিজন নিয়ে। ২১শে নভেম্বর সুবেদার যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা নিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে যে আলাপ করেছিলেন তাতে সুবেদারের স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। আর তার বাড়ী সংলগ্ন থাকতেন খাঁজা গণী সাহেবের এক আত্মীয়। সেই আত্মীয়টি সুবেদারের স্ত্রীকে বিষণ্ণ দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি আশংকার কথা বলেছিলেন। আর সেই আত্মীয়টি তৎক্ষণাৎ অতিরঞ্জিত করে খবরটা দিয়েছিলেন গণী মিয়াকে। গণী মিয়া জানিয়ে ছিলেন কমিশনারকে আর কমিশনার সাহেব জানিয়ে ছিলেন ইংরেজ সেনাধ্যক্ষকে। তাই তারা আচানক দূর্গ আক্রমনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গণী মিয়া সর্ম্পকে নানা জনে নানা ধরনের কথা বলেছেন। আমরা 'হৃদয় নাথের ঢাকা' বই এবং বাংলার ইংরেজ শাসক (হ্যালিডের রিপোর্ট, ৭৫) যদি দেখি তাহলে দেখা যায় ২১শে নভেম্বর গোয়েন্দা সূত্রে চাঁটগার সিপাহীদের বিদ্রোহের খবর ঢাকা পৌঁছলে লেঃ লুইস সার্মরিক ও বেসামরিক লোকদের নিয়ে এক বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ঢাকায় দেশী সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হবে, সে রাতেই কলকাতার আদেশও প্রাপ্ত হয় সেমতে ২২শে নভেম্বর অতি প্রত্যুষে আক্রমণ পরিচালিত হয়।

হিন্দু মালিকানায় প্রকাশিত "ঢাকা প্রকাশ" সে সময় লিখেছিলো ঃ খাজা আব্দুল গণী ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় উন্মত্ত সিপাহীরা আব্দুল গণীকে বাংলার রাজত্ব প্রদাণের প্রলোভন দিয়েছিলেন। এবং তাহাদের সাহায্য না করলে ভয়েরও সম্ভাবনা জানিয়েছিলো। এটুকু কথাই প্রমাণিত করে যে শত্রু ভাবা লোককে গোপন কথা বলা হয় না, অতএব বিপ্লবের তারিখ গণী মিয়ার জানা ছিলো না অবশ্য তিনি সিপাহীদের প্রলোভনে না পড়ে কিংবা ভয়ে ভীত না হয়ে প্রকাশ্য ভাবেই ইংরেজদের অন্তিম সময়ে পরম আনুগত্যের সাথে তার সকল শক্তি ও সম্পদ ইংরেজ সরকার এর সাহায্যে নিয়োগ করেছিলেন। এ কথা সর্বজন বিদিত।

খাজা আব্দুল গণী মাত্র আঠার বৎসর বয়সে বাংলাদেশের বিরাট জমিদারী কর্তৃত্ব হাতে পেয়েছিলেন। সুষ্ঠুভাবে জমিদারী পরিচালনা আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কিছুকালের মধ্যেই পূর্ববাংলার সবচেয়ে ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী জমিদার হয়েছিলেন। ঢাকা তথা পূর্ববাংলার মুসলমানদের অবিসংবাদী নেতা রূপে গণ্য হয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহকালে তিনি মাত্র সাতাস বছরের যুবক। তিনি ছিলেন উদার হৃদয় ও সংস্কৃতমনা। দীন দুঃখীদের দুর্দশা মোচনে এবং সৎকার্যে দানের ব্যাপারে তার ধন ভাণ্ডার প্রথম থেকেই উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাই তার বেশী বেগ পেতে হয়নি এই বিপ্লবে ঢাকার অধিকাংশ হিন্দু মুসলমানকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবিদের অভিমত যাই হোক না কেন, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, খাজা আঃ গণী মুসলমানদের নেতা রূপে যদি এ বিপ্লবের পক্ষে থাকতেন এবং যদি ঢাকার সকল অধিবাসী মিলিতভাবে বিপ্লবী সৈন্যদের পক্ষে যোগদান করতেন তাহলেও ঢাকার বিপ্লব সাফল্য লাভ করতে পারতো না। তার কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি মত্তার অধিকারী দূরদর্শী খাজা গণী হয়তো সে সব ঘটনাবলী হৃদয়ংগম করেই নিজের এবং এদেশের বিজেতা মুসলমানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি ইংরেজ সরকারকে সমর্থন দিয়েছিলেন। এটা আমি এখন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। নবাব আঃ গণী সম্পর্কে পরবর্তীতে আরো আলোকপাত করার ইচ্ছা রয়েছে বলে এখানে তার কথা আর বলছি না। তৎকালে ঢাকা পৌরসভা তার রেকর্ডপত্রে এই বিকৃত নাম "রাহাট রোড" কেন রেখেছিলেন আজ চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারি। রায়ট রোড নাম রাখলে দেশ বিদেশে নিজেদের মান হানি হতো। অথবা রায়টের নামে নানা জনে নানা রকম ভাবতো, তাই রায়টের পরিবর্তে রাহাট নামটি গ্রহণ করেছিলেন।

রাহাটের মোড়টি বৃটিশ আমলের শেষ দিকেও জন শূন্য ছিলো। কোন দোকান পাট কিংবা বাতি ছিলোনা। সামান্য দূরে কয়েকটি ঘরে মাত্র কয়েকজন বসবাস করতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মোড়ের নিকট বেশ কিছু জমি হুকুম দখল করে সেখান হতে মাটি খনন করে রাজনারায়ণ ধর রোডটি নির্মাণ করার ফলে বড় বড় ডিচ ও নালার সৃষ্টি হয় যার কিছু আজও ডোবা হিসেবে রয়েছে। এসব নালা ডোবা ভরাটের ব্যবস্থা করে ছিলেন তৎকালীন ৭নং ওয়ার্ডের কমিশনার মরহুম আব্দুল আজিজ মাষ্টার পৌরসভার আবর্জনা দ্বারা। এ আবর্জনা ও মৃত জীব জন্তু ফেলার ফলে রাহাটের মোড়টি নারকীয় অবস্থায় পরিণত হয়। দুর্গন্ধ আর বিচিত্র ধরনের বিরাটকায় শকুন শকুনীদের চেচামেচী-দাপাদাপিতে রাস্তায় কুকুর ও অন্যান্য জীব

এবং কেল্লার সুউচ্চ দেওয়ালে অসংখ্য শকুন শকুনী বসে থাকতো। এদৃশ্য দেখে ছেলেপেলের দল কী বড়রা ও পথে চলতে ভয় পেতো। বিশেষ করে রাত্রি বেলায়তো একেবারে শুনশান হয়ে যেতো। আমাদের অঞ্চলের লোকেরা বিশেষ করে মুসলমানেরা চকবাজার থেকে দোকানদারী বা কাজ কর্ম সেরে এ রাস্তা ধরেই আসতো। আমরা যারা কিশোর বা তরুণ ছিলাম তারা কাজী রিয়াজ উদ্দিন রোডে অপেক্ষা করতাম সঙ্গী পাবার আশায়। সঙ্গী পেলেও দুরুদুরু বক্ষে দোয়া দরূদ পড়তে পড়তে এক প্রকার চোখ বুজেই মোড়টি পার হতাম ভূতপ্রেত আর কুকুরের ভয়ে।

এক দিনের ঘটনার কথা না বলে পারছিনা। ঘটনাটি পাঠকের জন্য হাস্যকর আর আমার জন্য হয়েছিলো বিষাদময়। এক দিন চকবাজার দোকান হতে কাজ সেরে আসতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিলো। কাজী রিয়াজ উদ্দিন রোডের মাথায় লালবাগ মক্তবের নিকট অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন আমাদের এলাকার কোন লোক বা সঙ্গী পেলাম না তখন আব্বা আম্মা ঘাবড়াবেন ভেবে ঘণ্টাখানি দেখে আল্লার নাম স্মরণ করতে করতে পথ চলতে শুরু করলাম। কাজী রিয়াজ উদ্দিন রোডের মাঝখান হতেই সন্ধ্যার পর নিরালা হয়ে যায়, সেদিন আবার ওখানটাতে আলো ছিলোনা। অন্ধকারে ভয়ে গা শির শির করে উঠলো। ফেরৎও যাওয়া যায়না, একেবারে মোড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি। দোয়া দরূদ পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে সাহস করে চোখ এক রকম বুজেই রাস্তার অপর দিকে আবর্জনার কারণে নানা জীব জন্তু থাকে বিধায় কেল্লার দেয়ালের সাইড ধরে এগিয়ে চলেছি, কেল্লা মোড়ের পাদ দেশে সামান্য চওড়া পাকা যায়গা ছিলো, সেখানে সেদিন এক পশ্চিমা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মৃত দেহ শ্মশানে পোড়াবার জন্য রেখে পৌরসভার জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রারী অফিসে গিয়েছিলো শব যাত্রীরা রেকর্ড করার জন্য। বাকীরা মৃতদেহ রেখে মদ্য পান করে নেশায় বুদ হয়ে পড়েছিলো। কোন খেয়ালই নেই, তাঁর উপর নিকষ অন্ধকার। আমি চোখ বুজে কেল্লার দেওয়াল ঘেষে যেমনি ঘুরেছি মৃতের উপর পা পড়ায় তারা সমস্বরে বলে উঠলো 'রাম রাম সাথ হ্যায়' আর আমি ভয়ে আর্তনাদ করে দে দৌড়, আমার চিৎকারে জগন্নাথ সাহা রোডের বেশ কতক হিন্দু ব্যক্তি বের হয়ে এসে আমাকে শান্তনা দিতে লাগলো, আমার ভয় দূর করার জন্যে ২/৩ জন আমাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌছে দিয়ে গেলো। সে দিন রাত্রেই ভীষণ জ্বর উঠলো। কতো ডাক্তার কতো ঔষধ কোনই কাজ হলোনা। দীর্ঘ প্রায় তিন মাস জ্বরে ভুগেছি আর প্রতি রাত্রেই চিৎকার করে আবোল-তাবোল বকছি। যাক সে কথা কেল্লার মোড়ে প্রায় হিন্দুরা বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণীরা মৃতদেহ রেখেই নাম রেজিস্ট্রি করতে শ্মশানের মোহরার নিকট যেতো।

দেশের আনাচে কানাচে ঢাকা শহরের রাস্তা গলি ঘুচিতে কত স্মৃতি স্তম্ভ তৈরী হয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। আজকাল অন্যায় ও কলংকময় কাজ করতে গিয়ে, নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে গিয়ে নিহত হলে তার সংগীরা তাঁকে শহীদ বানিয়ে একটা স্মৃতিও দাড় করিয়ে দেয়। অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের বর্তমান সরকার ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র সাহেবের নিকট অত্র এলাকাবাসীর পক্ষ হতে আবেদন, যে আজাদী আন্দোলন এর প্রথম শহীদ স্মরণে এই কেল্লার মোড়ে একটি ফোয়ারা স্থাপন করে তার নাম শহীদ সিপাহী ফোয়ারা অথবা এই মোড়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি শহীদ সিপাহী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামকরণ করে অথবা মোড়ের নিকটস্থ মসজিদটিতে একটি সুন্দর সুউচ্চ মিনার তৈরী করে তার নাম দেওয়া যেতে পারে শহীদ সিপাহী মিনার।



কেল্লার মোড় তথা রাহাটের মোড়ের দৃশ্য। সামনে লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ এবং সড়কের বাঁ পাশে লেখক প্রতিষ্ঠিত লালবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২ এর ভবন দেখা যাচ্ছে

লালবাগ দূর্গের পশ্চিম পার্শ্বের রাস্তাটির নাম পুস্পরাজ সাহা লেন। এই মহল্লাটি ইতিপূর্বে গোয়ালটুলি নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর এই এলাকার মুসলমানদের উপর ইংরেজ সরকারের বর্বোরচিত অত্যাচারের ফলে মুসলমানরা অন্যত্র চলে যাওয়ায় এখানে হিন্দু গোয়ালারা এসে বসতি স্থাপন করে। এদের পদবী ছিলো গোপ। তখন হতেই এটি গোয়ালটুলি নামে অভিহিত হয়।

মোঘল আমল থেকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কাল পর্যন্ত এস্থানটি দলতি বাজারেরই একটা অংশ বলে গণ্য হতো।

উপরোক্ত গোয়ালটুলির রাস্তাটির নাম ১৯২৭ সালে আমলীগোলা এলাকার অন্যতম ব্যবসায়ী প্রভাবশালী ব্যক্তি বাবু পুস্পরাজ সাহা উক্ত রাস্তায় বিজলী বাতি সম্প্রসারণের জন্য ঢাকা পৌরসভাকে মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা প্রদান করে, গোয়ালটুলি তথা দলতি বাজারের এই অংশটিকে তার নিজ নামানুসারে ঢাকা পৌরসভা হতে পুস্পরাজ সাহা লেন নামে নামকরণ করিয়ে নেন। দলতি বাজারের বাকী প্রধান অংশটুকু তার পিতা জগন্নাথ সাহার নামানুসারে জগন্নাথ সাহা রোডের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়।

দলতি বাজার এলাকায় মুসলিম মৎস্য ব্যবসায়ী তথা মাহিফরাসদের বসবাস রয়েছে। মাহিফরাস ফার্সি শব্দ। মাহি অর্থ মাছ আর ফরুস অর্থ ক্রেতা বিক্রেতা। মাহি ফরুস হতে মাহিফরাস যা ঢাকাবাসী মাইফরাস সম্প্রদায় বলে অবহিত করে আসছে। মাহিফরাসগণ মুগল আমলে হতেই শহরে মাছ বিক্রয়ের ব্যবসা একচেটিয়াভাবে করে আসছে। আজও এ ব্যবসা এই মাহিফরাস শ্রেণীর দ্বারা প্রধানতঃ পরিচালিত হচ্ছে। মুগল আমলে মাহিফরাসদের প্রধান সর্দার শুল্ক নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং সব রকম বিবাদের ফয়সালা করতেন।



ঢাকার মুসলিম মৎসজীবি মাইফরাস সম্প্রদায়ের প্রধানগণ

দলতি বাজার নামের পিছনে দুইটি কাহিনী প্রচলিত আছে। মোগল আমলে এ এলাকায় একই পরিবারের কয়েক ভাই কুস্তিগীর ছিলেন। কুস্তিতে তাদের খ্যাতিও ছিলো। একবার মোগল রাজধানী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য তাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে ফিরে ছিলেন। এই বিজয়ে খুশী হয়ে তৎকালীন বাংলার সুবেদার তাদের দলতি বাজার এলাকাটি বন্দোবস্ত দেন। দৌলত খলিফা নামক এক ভাই এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করায়, এলাকাটি দৌলত বাজার নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। পরবর্তী কালে দৌলত বাজার নামটিই বিকৃত হয়ে দলতি বাজার নাম ধারণ করে।

অপর পক্ষে কুস্তিগীরদের এক ভাই এর নাম দখ্খ্ল খলিফা ছিলো বলে পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তার নিকটতম বংশধর এক বৃদ্ধার নিকট হতে ছোট বেলায় শুনেছি, তিনি পাঁচ সের চাউলের পিঠা একাই খেয়ে ফেলতেন। এও সম্ভব যে দৌলত ও দখ্খ্ল খলিফা একই ব্যক্তি ছিলেন। এরা মাহিফরাস বা মৎস্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তৎকালে খলিফা বলা হত ওস্তাদদের যারা নানারূপ খেলাধূলা বা কলা কৌশল দেখাতে পারদর্শী ও অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে পারতেন। দলতি বাজারে মুসলিম মৎস্য ব্যবসায়ীগণ সংঘবদ্ধভাবে বাস করতেন।

আরেক কাহিনীতে বলা হয় দৌলতী নাম্নী এক নামজাদা নর্তকী ছিলো। সে সুবেদার ও আমীর ওমরাহদের মজলিসে নৃত্য পরিবেশন করতো। সে সময় আমলীগোলার নাম ছিলো গোলা আমীরগঞ্জ। অর্থাৎ আমীরদের বসতি। নর্তকী দৌলতির নৃত্যকলা অবলোকন ও উপভোগ করে সুবেদার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে এই এলাকাটি তাকে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। সেখানে সে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করলে, তখন থেকেই নাকি ঐ এলাকাটি দৌলতি বাজার নাম ধারণ করেছে। পরবর্তীকালে চলতি কথায় দৌলতির স্থলে দলতি বাজার নামেই আখ্যায়িত হয়ে আসছে।

তবে প্রথম কাহিনীটিই সঠিক বলে প্রমাণিত হয় একটি ঐতিহাসিক দলিলে। দখ্খ্ল খলিফা দলতি বাজারে শায়েস্তা খাঁর স্থাপত্য রীতি অনুসারে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। যা দলতি বাজার মসজিদ নামে পরিচিত। এই মসজিদ সংলগ্ন একখণ্ড জমি তার ভ্রাতুস্পুত্র এলাহী বখ্স দখ্খ্ল খলিফার ওয়ারিশ হিসেবে কুমিল্লার তেজখালীর তৎকালীন হক্কানী পীর হজরত আব্দুস সাঈদকে একখানা দলিল মূলে প্রদান করেছিলেন। দলিলে শর্ত ছিলো পীর সাহেব এবাদত ও হেকিমি দাওয়াখানা পরিচালনা করবেন। তবে মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলে এই জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। এই হেকিমি দাওয়াখানার নাম ছিলো "খিজরী ঔষধালয়"। এর

সুনাম বর্হিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার বেশ কিছুকাল পর মুসল্লী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মসজিদটির সম্প্রসারণ অতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন পীর ও হেকিম সাহেবের বংশধরদের জমি ছেড়ে দেবার কথা উঠলে আমার উপস্থিতিতেই এর সালিষীর ব্যবস্থা হয় আর তখনই ঐ দলিলখানা পেশ করা হয়। দলিলের বিভিন্ন বিবরণ প্রমাণ করে যে, বাংলার সুবেদার দখখ্‌ল খলিফাদেরই জমি বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। যার ফলে হেকিম সাহেবদের কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে হেকিমখানার জমি মসজিদ কমিটি বুঝে নেয়। অন্যদিকে দখখ্‌ল খলিফাদের একমাত্র বংশধর হাজী লুৎফর রহমানের বাড়ীর কিছু অংশ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য প্রদান করায় ১৯৭৭ সালে পুরাতন শায়েস্তা খাঁনি রীতিতে তৈরী ঐতিহাসিক দলতি বাজার মসজিদটিকে ভেঙ্গে এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় নুতন আঙ্গিকে পুনঃ নির্মাণ করা হয়।

মসজিদের পশ্চিম দিকের বাড়ীটি ও দখখ্‌ল খলিফাদের পরিবারের ছিলো। এই প্রাচীন ভবনটি আজও ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। বৃটিশ শাসনামলে বাড়ীটির দখল সরকার নিয়ে এই বাড়ীতেই লালবাগ থানা প্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে থানা ভবন তৈরী করে সেখানে স্থানান্তরিত করা হলেও এই প্রাচীন ভবনটি লালবাগ পুলিশ ফাঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিলো। বৃটিশ শাসনামলের শেষ দিকে যখন গাড়োয়ালী আর্ম পুলিশগণ লালবাগ দূর্গে আগমন করে, তখন তাদের অফিসারের বসবাসের জন্য একটা বাড়ীর প্রয়োজন পড়ে। তখন উপরোক্ত ভবন থেকে লালবাগ পুলিশ ফাঁড়ি লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে থানা সংলগ্ন স্থানে সরিয়ে আনা হয়। আর আর্ম পুলিশের অফিসার জঙ্গী সিংকে বসবাসের জন্য দখখ্‌ল খলিফাদের প্রাচীন বাড়ীটিই দেওয়া হয়।

জঙ্গী সিং খুবই মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন। বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ থেকে যখন আজান ধ্বনি উচ্চারিত হতো। তিনি বাসায় থাকলে আজানের সঙ্গে ব্যাঙ্গ করে চিৎকার শুরু করে দিত। তখন মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ, তাই প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে কেহই সাহস পায়নি। আমরা ছোট বেলায় নিজেরাও এ দৃশ্য অবলোকন করেছি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালে সে মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুদের উৎসাহ ও নেতৃত্ব দিতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে সে এ বাড়ী ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে যায়। বাড়ীটি পাক সরকার নিলামে দিলে পোস্তার এক ব্যক্তি তা খরিদ করে নেন।

মাহিফরাসদের মধ্যে আরেকটি নিয়ম ছিলো যে তাদের মেয়েদের অন্য গোষ্ঠীর

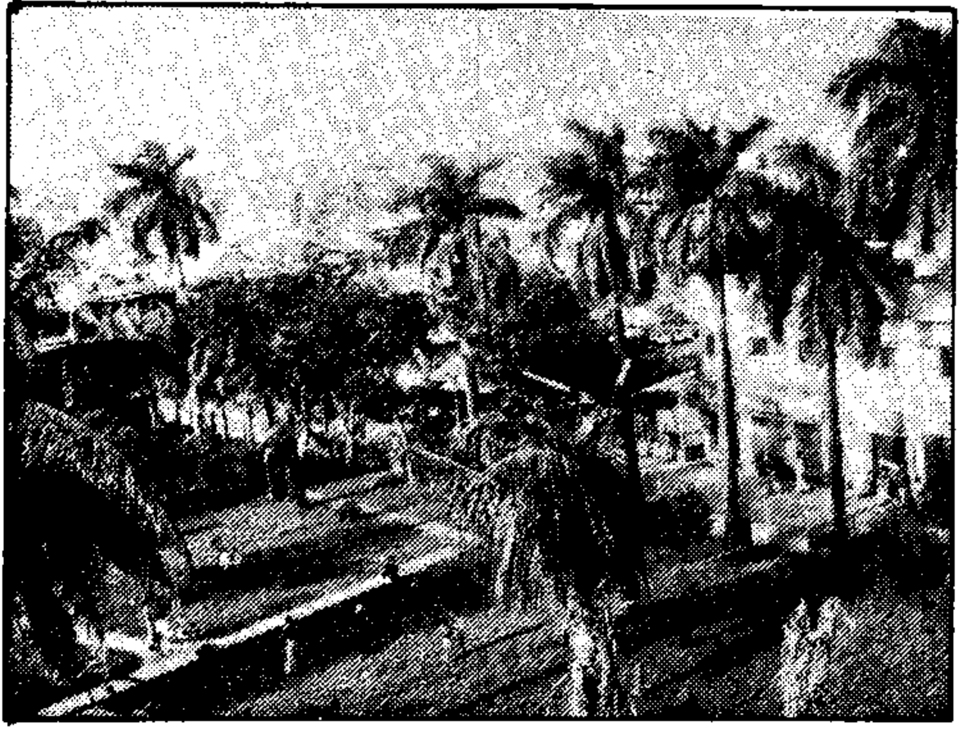
ছেলেদের সঙ্গে বিবাহ হলে কোন বাধ্যবাধকতা ছিলোনা। কিন্তু ছেলেদের বিবাহ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে করাতে হবে। অন্যথা করলে তাকে বিবাহনুষ্ঠানের খানাপিনা বাদেও শহরের সকল এলাকার গোষ্ঠীর লোকদের জরিমানা স্বরূপ খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হতো। এবং সম পরিমাণ খানা সঙ্গে দিয়ে দিতে হতো। এই জরিমানা প্রথাকে ছান্দা বলা হতো। এ প্রথা আর তাদের মধ্যে নেই। এ প্রথা এজন্যই করা হয়েছিলো যেন নিজ গোষ্ঠীর মেয়ের অভিভাবকগণ কন্যাদের ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্থ না হন। এ ধরনের প্রথা ভারত উপ-মহাদেশের অনেক গোত্রের মধ্যে প্রচলিত ছিলো এবং আজও অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে।

ঢাকার মুসলিম মৎস্য জীবিদের মধ্যে আরেকটি প্রথা বিদ্যমান ছিলো তা হলো প্রত্যেক বাজার হতে প্রত্যেকদিন সামান্য হারে পয়সা চাঁদা আদায় করে তা দিয়ে বাংলা বছরের বৈশাখ মাসে আজিমপুরস্থ তাদের নিজস্ব মাঠে বিরাটভাবে খানাপিনার (শিন্নী) আয়োজন করা হতো। এতে ২০/২৫ মন চাউলের খানা পাক করে গোষ্ঠীর লোকসহ কয়েক হাজার লোককে খাওয়ানা হতো। সমস্ত দিন এ খাওয়া চলতো আর পার্শ্ববর্তী মাঠে মেলা বসতো। এ শিন্নী প্রথাও অনেক বছর হলো বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের জমিও পৌর সভা হুকুমদখল করে নতুন কবরস্থান বানিয়ে রিজার্ভ কবরদানের ব্যবস্থা করেছে।

দলতি বাজারের নিম্নাঞ্চলে বহু যুগ ধরে বাংলা স্যালের শেষ দিন চৈত্র মেলা হতো। মুসলমানরা একে চৈতপরাব বলে থাকে। বহু দূর দূরান্ত থেকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসতো মেলা দেখতে। দলতি বাজারের মুসলমানরা সেদিন ঈদের খুশীর মত আনন্দ করতো, কেননা মেলা দেখার জন্য তাদের আত্মীয়স্বজন গোষ্ঠীর লোকজনের প্রত্যেক বাড়ীতে সমাগম হতো। মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলো সন্ধ্যা বেলায় বিভিন্ন হিন্দু মহল্লা হতে আগত সঙ। এসব সঙ এর দলে তরুণ, যুবা, বৃদ্ধরা অংশ নিতো বিভিন্ন রং বেরং-এর পোষাক পরে। কেউ পরী, কেউ রাক্ষসী, কেউ দেব দেবী নানারূপে সেজে বিভিন্ন দল বিভিন্ন ধরনের নৃত্য ও গান পরিবেশন করতো, মেলায় নৃত্য গান পরিবেশন করে তারা বিভিন্ন এলাকায় বিত্তশালীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সঙ দেখাতো। মেল্যর স্থানটিতে দালান নির্মাণ হওয়ায় আমলীগোলার আশে-পাশে মেলা বসে তবে পূর্বের আকর্ষণ আর নেই।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লার নামানুসারে ঢাকায় একটি পার্ক রয়েছে। পার্কটি নতুন বাজার, আর্মানীটোলা ময়দান, জিন্দাবাহার, তাঁতিবাজার, ফ্রেঞ্চরোড, ইংলিশ রোড এসব মহল্লার মাঝখানে। পার্কটি খুব বড় নয় এবং শিশু

কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা কিংবা বড়দের পায়চারী করার মত উপযোগী নয়। তবুও একটা পার্ক যা এক সময় ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিলো। পার্কটির মাঝখানে একটা বক্তৃতা মঞ্চ ছিলো। যা থেকে মাঝে মধ্যে রাজনৈতিক বিংবা ধর্মীয় নেতারা বক্তব্য রাখতেন পৌরসভা এর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির মানসে অনেকবার এর অঙ্গের পরিবর্তন পরিবর্ধনের চেষ্টা করেছেন। কখনও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির বদলে আরও বার্ধক্যের রূপ নিয়েছে। অবশেষে ঢাকা পৌরকর্পোরেশন বর্তমান রূপে এনেছে যা মোটামুটি।



নবাব সিরাজ উদ্দৌলার স্মরণে নামকরণকৃত সিরাজউদৌল্লা পার্কের বর্তমান দৃশ্য

এক কথায় পথচারীকে তেমন কোন আকর্ষণ করে না। আজ বক্তৃতা মঞ্চ নেই। নেই জন সমাগমের ব্যবস্থা। ঢাকার লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটি সভা সমিতি করার অধিকার হারিয়ে ফেলছে। এই স্বাধীনতা প্রিয় লোকটির নামানুসারে যেহেতু পার্কটির নাম এবং তার স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয় সেহেতু সরকারের বিশেষ করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উচিত এটাকে তাঁর নামের মর্যাদানুসারে যেন পুনঃ নির্মিত করা হয়। যাতে পথচারী তা দেখে নবাব সিরাজ উদদৌল্লার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

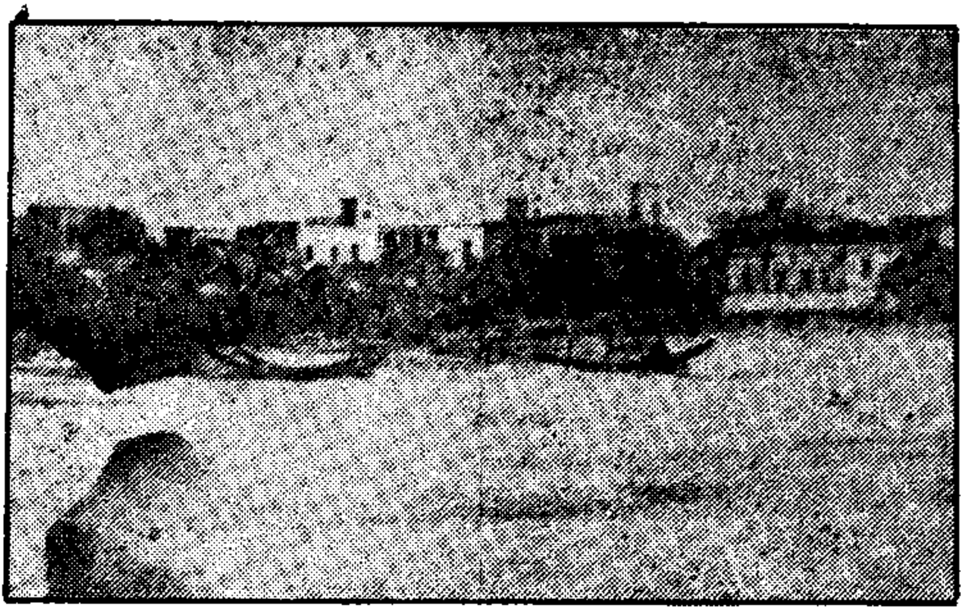
বৃটিশ যুগে প্রায় প্রতি মহল্লায় বিশেষ করে হিন্দু প্রধান মহল্লাগুলোতে প্রায়ই নাটক মঞ্চস্থ হতো। তখনকার দিনে আজকের মত সিনেমা হল ছিলোনা, টি, ভি বা ভিসি

আরও ছিলো না। নাটক আর যাত্রাই ছিলো চিত্তবিনোদনের প্রধান সম্বল। আর এই সব নাটক অধিকাংশই মঞ্চস্থ হতো নবাব সিরাজ উদদৌল্লাকে কেন্দ্র করে। তা দেখে মনে হতো আমরা তাঁকে কত ভালবাসি, কত শ্রদ্ধা করি। যারা এই নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য আর্থিক সাহায্য করতেন, যুবকদের উৎসাহিত করতেন তাদের অনেকেই ঢাকা পৌরসভায় চেয়ারম্যান বা কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে যে, অনেকেই সামান্য টাকার বিনিময়ে রাস্তার নামকরণ নিজের কিংবা নিজের পিতৃপুরুষদের নামে করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু বাংলাকে স্বাধীন রাখার জন্য যিনি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে গেছেন তার নামানুসারে ঢাকার কোন রাস্তার নামকরণ করেনি বা করবার জন্য পৌরসভায় কোন প্রস্তাবও উত্থাপন করেননি। তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা শুধু নাটক মঞ্চায়নের মধ্যেই রেখে গেছেন। এব্যাপারে চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ পৌরসভাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। এ জন্য যে, তাদের শহরে একটি রাস্তা তাঁর নামে নামকরণ করেছেন।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন অধিপতি নবাব মুনসুর উল-মূলক সিরাজ উদদৌল্লা শাহকুলি খাঁ মীর্জা মোহাম্মদ হায়বত জঙ্গ বাহাদুর। প্রজাবৎসল, শান্ত স্বভাব, ন্যায়বান কল্যাণকামী এবং বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন। তিনি ইংরেজ বিদ্বেষী হলেও কখনও অহেতুক ইংরেজদের উপর জুলুম করেনি। বার বার ইংরেজরা চরম উদ্ধত্য প্রকাশ করলেও নবাব সব সময় তাদের প্রতি সহনশীলতা দেখিয়েছেন। কিন্তু যে ইংরেজের প্রতি নবাব সিরাজ উদদৌল্লা এত সহনশীল, যাদের ঔদ্বত্যে বার বার ক্রুদ্ধ হয়েও নবাব আবার ক্ষমাশীল, যে হল ওয়েলের প্রতি নবাব এতখানি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন, সেই ইংরেজ এবং সেই হল ওয়েলের কুটিলতাই সিরাজকে সকলের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করেছে। শেষ স্বাধীন নবাব কুচক্রীদের নিয়োজিত মুহম্মদি বেগ কর্তৃক খড়গাঘাতে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নিহত হলেও তার লাশকে পর্যন্ত রেহাই দেওয়া হয়নি। তার লাশ হাতীর পিঠে করে নগর প্রদক্ষিণ করানো হয়। এ সময় তার মাতা হায় হায় মাতমের ক্রন্দন রোল করে যখন পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়েন তখন লাশসহ হাতিও হতভম্ব হয়ে বসে পড়েছিলো। স্নেহময়ী জননী সন্তানের লাশ বুকে ধরে মুর্ছা গেলে মীর জাফরের অনুচররা জোর করে মাতার বুক থেকে নবাবের লাশ ছিনিয়ে নিলো এবং বন্দী করলো নবাব মাতাকে।

নবাব সিরাজ উদদৌল্লার আমলে, ইতিহাসে কলঙ্ক লেপনকারী এক প্রভাবশালী ও ধনকুবের ছিলেন ফতে চাঁদ। সম্রাট ফররুখ শিয়ার তাঁকে জগৎ শেঠ উপাধী দান করেছিলেন। সত্যি তিনি সে সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ ধনকুবদের মধ্যে অন্যতম

ছিলেন। তাঁর ধনসম্পদ, অর্থ ছিলো প্রচুর। শুধু মুর্শিদাবাদের ধন ভাণ্ডার রক্ষায় দুশো অশ্বারোহী সৈন্য দিবা-রাত্র পাহারায় রত থাকতেন। নবাব সিরাজ উদদৌল্লার পতনে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে এই শঠ চূড়ামনির যে অসামান্য ভূমিকা ছিলো তা সর্বজনবিদিত। তাঁর এই কলঙ্কময় জীবনালেখ্য বাংলার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে।



১৮৪০ সালে ঢাকার নদী তীরবর্তী আমলীগোলা (দলতি বাজার) এলাকায় অবস্থিত মুর্শিদাবাদের ধনী ব্যবসায়ী জগৎ শেঠের ব্যাংক ভবনের দৃশ্য

এই কলংকিত স্বাধীনতার শত্রু ধনকুবের জগৎ শেঠ একটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলো ঢাকার বুকে আমলীগোলা এলাকায় নদী তীরে। তখনকার দিনে আজকের মত এত ব্যাংকের সমারোহ ছিলো না। কদাচিৎ শহরের বিশিষ্ট অঞ্চলে গুটিকয়েক ব্যাংক ছিলো। তাঁর ব্যাংকটি তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট ব্যাংক ছিলো। ব্যাংকটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ছিলো। ১৮৪০ সালে এক বিখ্যাত জার্মান শিল্পীর চিত্রেও এই ব্যাংকের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এই চিত্র লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এখনও রক্ষিত আছে। আমলীগোলাস্থ আজাদ মুসলিম পাবলিক লাইব্রেরী কক্ষেও ফটো কপি ছিলো। যা হোক– আমার "কিংবদন্তীর ঢাকা" নামক পুস্তকে ছবিটি মুদ্রিত হয়েছে যে ভবনে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত ছিলো তার আজ অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না, তবে উক্ত ভবনের পূর্ব প্রান্তে মঠ ও পুকুর ঘাটটির অস্তিত্ব এখনও ভগ্নাবস্থায় রয়েছে।

ব্যাংকের মালিক জগৎ শেঠের নামানুসারে আমলীগোলার নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটি শেঠের ঘাট নামে পরিচিত হয়ে পড়ে বাংলা ও বর্হিদেশে। আমাদের ছোট বেলায়ও প্রৌঢ়দের দেখেছি ঐ এলাকাটিকে শেঠের ঘাট নামে অবহিত করতে। অবশ্য ঢাকা পৌরসভা এ নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেনি। পরবর্তীকালে মোল্লা আবদুল নামে একজন প্রধান ও রসিক ব্যক্তি ঐ এলাকায় বাস করতেন। তৎকালে ঐ এল্যাকার অধিবাসীরা উগ্র স্বভাবের ছিলো বিধায় সব সময়ই তারা পরস্পরের মধ্যে এমনকি নিজের পরিবারের মধ্যেও ঝগড়া বিবাদে মেতে থাকতো। মোল্লা আবদুল অনেক হিতোপদেশ দেওয়া সত্বেও তাদের স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি বলে মোল্লা আবদুল রসিকতা করে ঐ অংশটুকুর নাম দিলেন "বদ্ধু পাড়া" অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লোক মুখে এই নাম প্রচারিত হয়ে পড়লো সারা দেশে। চিঠি-পত্রাদিও ঐ নামে আসা শুরু হলো। বদ্ধুপাড়া নামটি দেওয়া হয় আরবের বদ্ধুদের নামানুসারে।

সে সময়ে আরবের বদ্ধুরাও পরস্পরের মধ্যে ঝগরা ফ্যাসাদে লিপ্ত ছিলো। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐ রসিক ব্যক্তির দেওয়া নামটিও মানুষের স্মৃতির পাতা থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। আজ আর কেহই ঐ অঞ্চলটিকে শেঠের ঘাট বলে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে কোম্পানী আমলের রেকর্ড পত্রে দেখা যায় ঢাকার অধিবাসীগণ অত্যন্ত কলহ প্রিয় ছিলো ও মামলাবাজ ছিলো বলে বদনাম আছে। তবে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই এ ধরনের ঝগড়া বিবাদ বিদ্যমান ছিলো। তৎকারণে ১৭৬৯ খৃঃ ছয়টি কোর্ট অব জাষ্টিস স্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৮ সালে শুধুমাত্র একজন মুন্সেফের কোর্টে বিভিন্ন ধরনের ১৮১৫টি দেওয়ানী মামলা দায়ের করা হয়। তন্মধ্যে আদালতে নিঃস্পত্তি হয় ৯১৫টি। প্রত্যাখাত হয় ১৫৯টি, খারিজ হয় ৩৩৮টি এবং আপোষে নিষ্পত্তি হয় ৪০৩টি। তাছাড়া শুধু ১৮৩৬ সালে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ফৌজদারী মামলা রুজু হয় ১৩০৭টি।

রাজা শ্রীনাথ স্ট্রীটের সর্ব দক্ষিণে ভাগ্যকুলের জমিদার ব্রিটিশ কর্তৃক রাজা উপাধীপ্রাপ্ত বাংলার ধনকুবের রাজা শ্রীনাথ রায়ের এক বিরাট অট্টালিকা ছিলো। এতে বহু কক্ষ বিশিষ্ট দর দালান, নাচ ঘর ও জুরি ঘোড়া গাড়ীর আস্তাবল ছিলো। দক্ষিণ দিকে একটি বাগানও ছিলো। এ রাজার নামানুসারে আমলীগোলার এ অংশটুকুর নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ঢাকা পৌরসভা "রাজা শ্রী নাথ স্ট্রীট" নামকরণ করেন। ভাগ্যকুলের জমিদার বংশের যেমন ছিলো প্রতাপ প্রতিপত্তি তেমনি ছিলো বেশুমার

ধন সম্পদ। এদের বংশ পদবী ছিলো কুন্ড। এরা পূর্বে খুবই গরীব ছিলেন। বলতে গেলে হঠাৎ তাঁরা অগাধ ধন সম্পত্তির মালিক হয়ে যান। তাঁদের ধনৈশ্চর্য প্রাপ্তি সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে, এই কুণ্ড বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ দেবী লক্ষ্মীকে আটকে রেখে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান অর্থাৎ বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হন, ধনৈশ্চর্য প্রাপ্তির পর তারা পদ্মাপাড়ে সুদৃশ্য বাড়ি ঘর নির্মাণ করেন। তখন হতেই পদ্মা পাড়ের এই এলাকাটি ভাগ্যের কুল অর্থাৎ ভাগ্যকুল নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। এই জমিদার পরিবারটি প্রথমে রায় এবং বৃটিশ সরকার হতে রাজা উপাধী প্রাপ্ত হন। জনশ্রুতি আছে, জমিদার পরিবারটির ভাগ্য পরিবর্তনের পর দেবী লক্ষ্মীর আদেশে তাঁরা খুব দান দক্ষিণা করে যেতেন। একদিন অশীতিপর বৃদ্ধ ভিক্ষুক বহু কাকুতি মিনতি করেও জমিদার বাড়ী থেকে কোন ভিক্ষা না পেয়ে বিফল মনোরথ হয়ে বিষণ্ন বদনে পথ চলছিলেন। বৃদ্ধের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে দেবী লক্ষ্মী তাঁকে দর্শন দান করলেন। এবং বিষণ্ন বদনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বৃদ্ধ সবিস্তারে প্রকাশ করলে দেবী তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না, দেবী লক্ষ্মী তখন ভিক্ষুক বেশে জমিদার বাড়ী গিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করায় প্রচুর সাহায্য লাভ করেন। তখন তিনি বৃদ্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন– জমিদার তো আমার অনেক খাতির যত্ন করে যথেষ্ট দান দক্ষিণা করেছেন। এ কথা শুনে বৃদ্ধ ভিক্ষুক জোর দিয়ে বললেন, সত্যি তাঁরা আমাকে কোন ভিক্ষা দান করেনি। দেবী লক্ষ্মী তখন তদন্ত করে জানতে পারলেন যে সত্যিই ভিক্ষুককে কোন ভিক্ষা দেয়া হয়নি। জমিদারদের এহেন আচরণে মনে মনে রুষ্ট হয়ে তিনি অভিশাপ দিলেন। এর পরই নাকি প্রমত্ত পদ্মা জমিদার বাড়ীর অর্ধাংশ গ্রাস করে নেয়। অদ্যাবধি এই জমিদার বাড়ীর বাকি অর্ধাংশ এবং লক্ষ্মীঘর নামে পরিচিত গৃহটি কালের স্বাক্ষী হয়ে পদ্মা তীরে দণ্ডায়মান রয়েছে। উন্মত্ত পদ্মা আগের মতই রাজবাড়ীর কোল ঘেষে আপন গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু রাজবাড়ীর সে জৌলুস আর নেই। কালেরকপোল তলে সব যেন বিলীন হয়ে যেতে বসেছে। ভাগ্য দেবীর সুপ্রসন্ন দৃষ্টি না থাকলেও ভাগ্যকুলের নাম আজও অটুট রয়েছে।

আমাদের ঢাকা শহরের রাজা শ্রীনাথ রায় ষ্ট্রীট স্থিত রাজ ভবনটি কিছুদিন পূর্বেও জরাজীর্ণ অবস্থায় টিকে ছিলো। অল্পদিন হলো জনস্বার্থের খাতিরে ভবনটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ভবন সংলগ্ন জুড়ি ঘোড়ার আস্তাবলটির নিদর্শন বৃটিশ যুগের শেষ ভাগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে ছিলো। ভাগ্যকুলের জমিদারদের শেষ জমিদার রাজা উপাধী প্রাপ্ত শ্রীনাথ রায় দান দক্ষিণায় পূর্ব পুরুষদের মতই ছিলেন। মিটফোর্ড

হাসপাতালের পশ্চিম দিগস্থ প্রধান ফটক সংলগ্ন আজকের লাল দালানটি চক্ষু রোগীদের জন্য ১৮৯০ সালে তার মাতা রাণী শুভদ্রা মনি চৌধুরীর স্মরণে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করে হাসপাতালের চক্ষু ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করেন। মুঘল আমলের মানচিত্রে এ এলাকাটি একটি ব্যগ হিসেবে চিহ্নিত আছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার প্রথম জেলা মেজিস্ট্রেট এস, এম, রহমত উল্লাহর সহায়তায় অত্র এলাকায় উর্দু ভাষীগণ রাজা শ্রীনাথ রায়ের পরিত্যক্ত ভবনটি হুকুম দখল করে একটি উর্দু মাধ্যম হাই স্কুল স্থাপন করেন। এবং জেলা মেজিস্ট্রেটের নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ করেন "রহমত উল্লাহ মডেল হাই স্কুল"। কিছু দিন পর স্কুলটি লালবাগ রোডের একটি ভাল দালানে স্থানান্তরিত করায় ভবনটি অসামাজিক ব্যক্তিদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। এই ভবনে আমার আব্বার স্মৃতি হিসেবে "রহীম বখ্স মেমোরিয়াল হাই স্কুল" নামে একটি বাংলা মাধ্যম জুনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠাতার অবর্তমানে অর্থের অভাবে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ থাকতে পারে তখন স্থানীয় আওয়ামী কর্মিদের দ্বারা সরকার স্কুল কমিটি গঠন করেছিলেন।

বিভাগ পূর্বকালে এখানে রথ যাত্রা উপলক্ষে বেশ জমকালো মেলা বসতো। ঢাকা শহরের অন্যান্য অঞ্চলের রথগুলো অপেক্ষা এখানকার রথটি বেশ বড় ও উচু ছিলো। শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের এই রথ যাত্রা উৎসবে বহু এলাকার নারী পুরুষ এই রাজা শ্রী নাথ স্ট্রীটে সমবেত হতো। এ পথটিতে রথ যাত্রা হোত বলে রাস্তা এবং মহল্লাটি ঢাকাবাসীর নিকট রথখোলা নামে পরিচিত ছিলো। এই রথখোলায় বৈরাগী নামে এক খ্যাতনামা কাবাডি খেলোয়াড় ছিলো। সাধারণতঃ ঢাকা শহরের হিন্দুগণ কাবাডি খেলতোনা। এ যুবকটি আমলীগোলার মুসলমান খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে চমৎকার ক্রীড়া নৈপূণ্য প্রদর্শন করতো। আজও কাবাডি খোলোয়াড়গণ তার কথা স্মরণ করে। বিভাগের পর হিন্দুরা এখান থেকে ভারতে চলে যাওয়ায় এখানে আর রথ যাত্রা উৎসব উদযাপিত হয় না। কাঠের তৈরী রথটিও বহু বৎসর পড়ে থাকতে থাকতে রাজা শ্রীনাথ রায়ের ভবনটির মতই বিলীন হয়ে গেছে।

আমলীগোলার একটি অংশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শেখ সাহেব বাজার তথা লালবাগ রোড নিবাসী প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা অনারারী মেজিস্ট্রেট বাবু অনুকুল চন্দ্রশীল তাঁর পিতার নামানুসারে ঢাকা পৌরসভার মাধ্যমে হরমোহন শীল স্ট্রীট নামকরণ করেন। সে সময় আমলীগোলার মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও

অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিলো। আমলীগোলার মুসলিম অধ্যুষিত মহল্লার বেশ কিছু অংশ হরমোহন শীল স্ট্রীটের অন্তর্ভুক্ত হলেও কেউ প্রতিবাদ বা বাধাদানে এগিয়ে আসেনি।

হরমোহন শীল স্ট্রীটের প্রধান সড়কটি বৃটিশ শাসনামলেই হিন্দু প্রধান হয়ে পড়ে। তারা যেমন বিত্তশালী ছিলেন তেমনি নামকরা ব্যবসায়ীও ছিলেন। কাগজের ব্যবসাই তাদের প্রধান ব্যবসা ছিলো। আমলীগোলা মহল্লার শেষ সর্দার মরহুম আব্দুর রহিমের বাসস্থান এ স্ট্রীটেই ছিলো। এ অংশে চাঁদ সদাগর ওরফে সদা মিয়া নামে এক নিরক্ষর ব্যক্তি চিরুনীকারখানার মালিক ছিলেন। তাঁর সাহস ছিলো অদম্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আত্মরক্ষা কল্পে তার বুদ্ধি ছিলো যথেষ্ট। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দলবদ্ধ আক্রমন মাত্র গুটিকতক লোক নিয়েই সদা মিয়া তার বুদ্ধি ও সাহসের বলে অতি সহজে প্রতিহত করতেন কখনও একাকিই। এলাকার হিন্দুগণ বিত্তশালী ও শিক্ষিত থাকায় প্রায়ই তারা মিথ্যা মামলা থানায় দায়ের করে মুসলিম অধিবাসীদের পুলিশ দ্বারা হয়রানী করতো। একদিন সদা মিয়া অতিষ্ট হয়ে তার কারখানার কারিগরদের বললো এরা আমাদের পুলিশ দিয়ে এতো হয়রানী করছে আমরা কি কিছু করতে পারিনা? তোমাদের কেউ আমার মাথায় আঘাত করে ফাটিয়ে দাও, আমি থানায় গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ডায়েরী করে দেব। কেউ সাহস পেলোনা ওস্তাদের মাথায় আঘাত করতে। সকলের বিবেক বাঁধলো। কিন্তু সদা মিয়া নাছোড়বান্দা আঘাত করাবেই। শেষ পর্যন্ত একজন আঘাত করলো সে আঘাত তেমন হলো না। ধমক দিলো জোরে আঘাত করতে। বেচারা কারিগর চিরুনী প্রস্তুতের ভারী যন্ত্র দিয়ে বেশ জোরে আঘাত করায় মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে রঞ্জিত হয়ে গেলো কাপড়সহ সারা শরীর। এমতাবস্থায় সে থানায় গিয়ে হিন্দুদের নামকরা কয়েক ব্যক্তিদের নামে মামলা দায়ের করলো। তার অবস্থা দেখে এবার পুলিশ ওদের ধরার জন্য হানা দিলো পাড়াময়। সদামিয়া আজ আর নেই, তবে মহল্লাবাসী আজও তার সাহসের কথা স্মরণ করে।

হরমোহন শীল স্ট্রীটের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে দূর্গা পূজোর সময় প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে দুর্গোৎসব পালন করা হতো। বাড়ীটিতে প্রতিমা স্থাপন করার মানসে বিশেষ রূপে তৈরী করা হয়েছিলো। তজ্জন্য এলাকাবাসী বিশেষ করে মুসলমানরা এ বাড়ীটিকে দেবী ওয়ালা বাড়ী বলে আখ্যায়িত করতো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ থাকলে মুসলমান ছেলে মেয়েরাও দলবেধে দুর্গাপূজা ও প্রতিমা দেখতে যেত নানা স্থানে। ঢাকা শহরের হিন্দু মহল্লার মন্দির আখড়া ব্যতিত ও বহু বিত্তশালী ব্যক্তিদের বাড়ীতে এরূপ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে দুর্গোৎসব পালন করতো।

শারদীয় পূজার কয়েকদিন হিন্দু মহল্লাগুলো আনন্দ উৎসবে মুখরিত থাকতো। দশমী বা পূজার শেষ দিবসে প্রতিমা বিসর্জনকালে বহু লোকের কাঁধে পরবর্তীতে ট্রাকে করে তরুণ যুবকগণ নানারং তামাসা ঢাকঢোল করতাল বাজিয়ে ধূপধুনা জ্বালিয়ে নৃত্য করতে করতে নিয়ে যাওয়া হতো সদরঘাটে। অধিকাংশ প্রতিমা বিসর্জনকারী দল সদর ঘাট হতে নৌকায় মিছিল করে তৎপর নদীতে বিসর্জন দিতো। আবার কোন কোন মহল্লার নিকটস্থ নদীতে কিংবা পুকুরে প্রতিমা বিসর্জন করা হতো। ঢাকার ২/৩টি প্রতিমা বিসর্জন করা হতো না। এগুলো নাকি স্বপ্নে নির্দ্দেশিত হয়েছে বিসর্জন না করার জন্যে। এমন একটি আমাদের লালবাগ রিশি পাড়ায় আছে। দূর্গাপূজার সময় অনেক হিন্দু, মুসলমান প্রতিবেশী বা ব্যবসায়ী সম্বন্ধ যাদের সঙ্গে থাকতো তাদের বাড়ীতে লাড্ডু (মিষ্টি) পাঠিয়ে দিতো। ঢাকার মুসলমানরা দশমীকে দশহরা বলতো। আজও অনেক মন্দির ও মহল্লায় দুর্গোৎসব ধুমধামের সঙ্গেই প্রতিপালন হয়ে থাকে।

অনুকুল চন্দ্র শীল একজন রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী স্থানীয় নেতা ছিলেন। তিনি হিন্দু মহাসভাপন্থী ছিলেন বিধায় ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ঢাকায় আগমন করলে এখানে আসতেন। বাবু অনুকুলের বাড়ীতে ডঃ মুখার্জী ব্যতিত দেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এমনকি ঢাকার নবাববাড়ীর তৎকালীন নেতৃবর্গও আগমন করতেন।

বৃটিশযুগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ বিশেষ করে বিভিন্ন মহল্লায় শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার মানসে সরকারের উদ্যোগে সিভিল গার্ড বাহিনী নামে একটি বেসামরিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। লালবাগ এলাকায় অনুকুল বাবুই ছিলেন এর নেতা। আরও কিছু হিন্দু মুসলমান এ বাহিনীর উপনেতা বা কর্মকর্তা ছিলেন। তাদের কয়েকজনের নাম এখনও মনে পড়ে। এদের মধ্যে হরমোহন শীল স্ট্রীটের বেনী সিংহ ব্যতিত লালবাগ, হাজারীবাগ, নবাবগঞ্জ ও জগন্নাথ সাহা রোডের সর্ব জনাব সৈয়দ কে, বখ্‌স, হাজী আব্দুল গনী, শোনামিয়া, নিকুঞ্জ লাল সাহা, আবুল হোসেন, উদয় চন্দ্রপাল, উমেশ মোক্তার ও মঃ ফেরাদুন।

সিভিলগার্ড বাহিনীতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় থেকে উৎসাহিত রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীদের গ্রহণ করা হয়েছিলো। সিভিল গার্ডরা মিলিশিয়া কাপড়ের পোষাক পরে লাঠি হাতে বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়া দিয়ে বেড়াতো। সিভিল গার্ডদের প্রধান কর্তব্য ছিলো পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা করা। অনেকটা আজকের আনসার বাহিনীর ন্যায়। ডিউটিরত অবস্থায় সিভিল গার্ডরা দৈনিক ছয় আনা করে জলপানী খরচ পেতো। সিভিল গার্ড বাহিনী গঠন করেও বৃটিশ সরকার ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ

করতে পারেননি।

হরমোহন শীলের বাড়ী সংলগ্ন আখড়াটিকে এলাকাবাসী হরমোহন শীলের আখড়া নামেই আখ্যায়িত করতো। আখড়াটি একটি নাট্যশালার ন্যায় তৈরী করা হয়েছিলো। একটি বিরাট মঞ্চ, মঞ্চে বিভিন্ন সময়ে পূজাপার্বন হতো। তার তিন দিকেই উপরে গ্যালারী ছিলো, যাতে গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মহিলারা আরামে বসে গান, কীর্তন, নাটক যাত্রা উপভোগ করতে পারেন। সাধারণতঃ রাজনৈতিক ও সাধারণের জন্য উপভোগ্য এমন ধরনের নাটক অবশ্য আখড়া সংলগ্ন খোলা যায়গায় অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে মঞ্চস্থ হতো। এলাকার আশপাশের লোকেরা হরমোহন শীল স্ট্রীট বসতিটিকে তামলী পাড়া বলতো। আজও প্রৌঢ় ব্যক্তিরা অনেকেই বলে থাকেন। পূর্বে এ নামই মশহুর ছিলো। তামলীপাড়া নামটি কেন হয়েছিলো বা কেমন করে হলো তার হদিশ এখনও খুজে পাওয়া যায় না। তবে এখানে একটি বিরাট আমলী (তেতুল) গাছ ছিলো, গাছের তেঁতুল খুবই মিষ্টি ছিলো। তখনকার সময়ে ঢাকা শহরে এতবড় আমলী গাছ অন্যত্র ছিলোনা বলে প্রৌঢ়দের মুখে শুনেছি। এই আমলী শব্দই বিকৃত হয়ে তামলী নামের উৎপত্তি হয়েছিলো বলে মনে হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন থেকে এখানকার হিন্দু অধিবাসীসহ সমগ্র পাকিস্তান থেকে যেমন হিন্দুদের দেশ ত্যাগের হিড়িক পড়েছিলো। তেমনি সারা ভারত থেকেও মুসলমানদের দেশত্যাগের হিড়িক পড়েছিলো। ভারতীয় মোহাজেরদের মধ্যে বিহারের অগণিত মুসলিম নরনারী ঢাকার ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে এসে ভীড় জমাতে লাগলো। তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে অন্যান্যদের ন্যায় আজাদ মুসলিম ক্লাবের সদস্যারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলো। তাই তাদের সেবায় আত্ম নিয়োগ করেছিলো। সর্ব প্রথমে স্টেশন থেকে তাদের ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্তর মাথায় করে বয়ে নিয়ে এসেছিলো আমলী গোলায়। তারপর আশেপাশের মহল্লাগুলোর পরিত্যাক্ত বাড়ীঘরে পূণর্বাসিত করেছিলো সেই সব মোহাজেরদের। মোহাজেরদের এ এলাকায় পূনর্বাসিত করায় এ এলাকাটি বিহারী মুসলিম প্রধান হয়ে ওঠে। এরা কিছুদিন পরই খুবই আত্মম্ভরিতা হয়ে উঠলো। তাদের অনেকেই স্থানীয়দের ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলো। তাদের এই মনোভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ এমনকি ছোট খাটো সংঘর্ষও হয়ে যেতো। এ বিবাদ প্রবল আকার ধারণ করায় শান্তি স্থাপনের জন্য তৎকালীন ঢাকার প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, রহমত উল্লাহ ও ঢাকার সর্বজন প্রিয় শ্রদ্ধেয় প্রভাবশালী ব্যক্তি মৌলানা দীন মহম্মদ সাহেবকে আমলীগোলা মহল্লায় আসতে হয়েছিলো। তাদের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তায় সেদিন আপোষ

হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু মনের ব্যবধান বাড়তে লাগলো তখন হতেই– এখানকার মত ঢাকার অন্যান্য মহল্লায়ও। মোহাজেরদের মধ্যে কেহ কেহ বাংগালীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিবেশী মনোভাব নিয়ে বসবাস করে আসছেন আজঅবধি।

আজিমপুর এলাকাটি আয়তনে অনেক বড়। পূর্বাংশের বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে আজিমপুর কলোনী। ঢাকা নগরী বৃটিশ শাসনের পর পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশ হয়ে ইস্টবেংগল গভর্নমেন্টের (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের) রাজধানী হওয়ায় সরকারী কর্মচারীদের থাকার জন্যে সরকারের তরফ থেকে যেমন কলোনী নির্মাণ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি মুগল শাসনামলে সম্রাট আওরংজেবের পুত্র বাংলার সুবেদার শাহজাদা মোহাম্মদ আজম এর আমলেও (১৬৭৭-৭৯) এখানে সরকারী আমলাদের জন্য আবাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছিলো। তজ্জন্য তাঁরই নামানুসারে এ এলাকাটির নাম আজিমপুর রাখা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক সম্রাট আওরাংগজেবের পৌত্র সুবেদার আজিম-উশ-শানের (১৬৯৭-১৭০৩) আমলে এখানে আমলাদের জন্য গৃহাদি প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো বলেই এলাকাটির নাম আজিমপুর রাখা হয় বলে মনে করেন। পুরা শব্দের আভিধানিক অর্থও হচ্ছে লোকালয়। দীর্ঘ তিন শতাব্দীর পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পুনরায় এখানে সরকারী কর্মচারীদের জন্য বাসগৃহ তথা আবাসিক কোয়াটার নির্মিত হলে তা আজিমপুর কলোনী নামে পরিচিত লাভ করে।

বৃটিশ শাসনামলে এ এলাকায় দায়রা শরীফ, রামবাগ আখড়া তৎসংলগ্ন ছোট্ট একটা বসতি, ওয়েষ্ট এণ্ড হাইস্কুল, স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা এবং বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকালে দু'তিনটি মাত্র ঘর ছিলো – হাতীর মাহুত ও হাতীর খাদ্য মওজুদ এর জন্য। এগুলো ব্যতিত আর কোন দর-দালান বা গৃহাদি এখানে ছিলো না। পূর্বাংশের পুরো এলাকাটি জুড়ে ছিলো বেশ সংখ্যক আমগাছ। এরই ফাঁকে ফাঁকে খোলা মাঠ। তজ্জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসী স্থানটিকে আমলাপাড়া বলে আখ্যায়িত করতো। এলাকাটি দেখতে ছায়াবীথিপূর্ণ আম্রকুঞ্জের মতোই মনে হতো। এসব মাঠে কাবাডি খেলার বেশ আয়োজন হতো। তৎকালে ঢাকায় কাবাডিখেলা বেশ জমজমাট ছিলো। এ খেলাকে পৌরুষজনিত খেলা বলে সবাই মনে করতো। শারিরীক শক্তি ও কলা কৌশলের প্রদর্শনী হতো এ খেলায়। আমি নিজেও একজন কাবাডি খেলোয়াড় ছিলাম এবং এ খেলাকে অন্য সব খেলা থেকে শ্রেষ্ঠ তথা গৌরবজনক খেলা বলে মনে করতাম। অবশ্য এ খেলায়ও মাঝে মধ্যেই বর্তমান ফুটবল খেলার ন্যায়

মারামারি যে হতো না তা নয়। তবে আজকের মতো অরাজকতা ছিল না। কাবাডি খেলার মারামারি অনেক সময় খেলার মাঠকে অতিক্রম করে মহল্লায়ও ছড়িয়ে যেতো। তবে তা মুরুব্বী প্রধানদের হস্তক্ষেপে মীমাংসা হয়ে যেতো। ঢাকা শহরে এ খেলা সাধারণতঃ মুসলমানরা খেলতো। তবে কদাচিৎ হিন্দু খেলোয়ারও থাকতো। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই কাবাডি খেলার প্রচলন ছিলো-আজও সেভাবেই প্রচলিত আছে।

এ আমলা পাড়ায় তখন গরু ছাগল চরাতো রাখালেরা। দিন দুপুরে খাঁ খাঁ করতো সমগ্র এলাকাটি। অনেকে ভয় পেতো একা যেতে। মোহাররমের আশুরা দিবসের সময় আমলাপাড়ায় লোকজনের বেশ ভীড় দেখা যেতো। এ ভীড়ে এ এলাকার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই পরিলক্ষিত হতো। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা আমলাপাড়া হতেই মোহাররমের মিছিল প্রত্যক্ষ করতো। শীতের শেষে সেই সব আমগাছে মইল দেখা দিলে ছেলেপেলের দল হল্লা বেধে মইল ভেঙ্গে নিয়ে আসতো। আর আম ধরলে, কাঁচা আম কুড়ানোর জন্যে পার্শ্ববর্তী মহল্লার কিশোর কিশোরীরা বস্তা নিয়ে আমের কুড়ি কুড়াতে যেতো। বিশেষ করে ঝড় বৃষ্টির পরে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কলোনী নির্মাণকালে অধিকাংশ আমগাছ কর্তন করে ফেলা হয়। আজিমপুর কলোনী এলাকায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো সদস্য ভবন যাকে বলা হতো পার্টি হাউস। পূর্ব-পাকিস্তান আমলে এখানে আইন পরিষদের সদস্যগণের অনেকেই অবস্থান করতেন। পরবর্তীতে অনেকেই এটাকে দস্যু ভবন বলে বিদ্রুপ করতো। কলোনীর মাঝখানের সদর রাস্তার ধারে বেবী আইসক্রীম নামে একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছিলো। আজ সেটির অস্তিত্ব না থাকলেও লোকে ঐ স্থানটিকে বেবী আইসক্রীমের মোড় বলেই পরিচয় দেয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আজিমপুর কবরস্থানের পূর্ব বাউণ্ডারীর বাইরে মাটির টিলার মতো একটি স্থান ছিলো। সহসাই একদিন দেখা গেলো সেখানে কোন এক ব্যক্তি লালঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে সেটা মাজারে পরিণত হয়। মাজারটি নাকি বাবা ইব্রাহীম বলখ এর। বলখ নগরীর বাদশাহ্ ইব্রাহীম বলখী তাঁর সিংহাসন পরিত্যাগ করে আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়েছিলেন। সে কথা ইতিহাসে জানা যায়। কিন্তু তিনি যে ঢাকায় এসে মৃত্যুবরণ করে এই আজিমপুর কলোনী এলাকায় চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন এ সম্পর্কে ইতিহাসের পাতায় কোন প্রমাণ রয়েছে বলে এ পর্যন্ত জানা যায়নি। তাছাড়া কলোনীর মাঝে পীলখানা রোডের পূর্বপ্রান্তে রয়েছে করিম শাহ্দাতার মাজার (যিনি হিন্দুস্তানের শাহ্ সাহেব নামে পরিচিত।) কিন্তু

বৃটিশযুগে এর কোন পরিচয় ছিলো বলে দেখা যায়নি।

আজিমপুর কলোনীর পূর্ব পার্শ্ববর্তী রাস্তার অপর পাড়ের জায়গা বৃটিশ শাসনামলে ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য শাহ্জাদা মিয়ার মালিকানাধীন ছিলো। তাই লোকে এটিকে শাহজাদা মিয়ার বাগিচা বলে অভিহিত করতো। এই বিরাট এলাকাটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিলো। ঢাকার লোকজন তখন এখানে বনভোজন করতে আসতো। সদর রাস্তার অপর পাড়ে রয়েছে -ইডেন গার্লস কলেজ ও হোস্টেল। হোম ইকনমিক্স কলেজ, আজিমপুর গালর্স স্কুল। এর মাঝখানে বহুকাল পূর্বে ছিলো চড়ক ঘাটা। এসব চড়ক গাছে অবাঙ্গালী মেথরগণ মদের নেশা করে কবুতর উড়িয়ে, কবুতর ও অন্যান্য পশু পক্ষীর কাঁচামাংস খেয়ে বুঁদ হয়ে চড়ক পূজা করতো। সেই চড়কে জ্যান্ত মানুষের পৃষ্ঠ ছেদন করে চড়ক গাছে ঘুরানো হতো। এই অমানবিক উৎসবকে বৃটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দেন। এরপর থেকে ঢাকায় আর কখনো চড়ক পূজা হয়েছে বলে জানা যায় না।

আজিমপুর কলোনী এলাকায় এবং দায়রা চত্বরে পাক আমল হতে আজ পর্যন্ত কতো খ্যাতনামা ও নামীদামী ব্যক্তিবর্গ বসবাস করে গেছেন। তাঁদের কথা বলতে গেলে একটি বই হয়ে যাবে। তাই তো বলা যায়, এ কলোনী যেন হীরা-পান্না, মণি-মানিক্য, স্বর্ণ-রৌপ্য তাম্র তথা সকল মূল্যবান ধাতব দ্রব্যাদির একটি মূল্যবান খনি।

বিধাতা তাদের অনেককে জীবনের পরপারে নিয়ে গেলেও এদের যেন শেষ নেই। আছে, আরও আসবে ভবিষ্যতের আশার প্রদীপ হয়ে। কিন্তু বড় দুঃখ বড় বেদনা যে, এরা শুধু কলোনীর বেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যেই তাদের উজ্জল আলো সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাদের প্রতিভা অবসর সময়ে প্রাচীরের বাইরে আলো বিকিরণ করেননি। কলোনীর বাহিরে যে বিরাট জনবসতি ও অসংখ্য মহল্লা রয়েছে তাতে তাদের বিভিন্ন মুখী মেধাগুলো মানব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে কিছুটা ব্যয়িত হলে ঢাকার পশ্চিম অঞ্চলের পুরোটাই মহামূল্যবান মানবখনি হয়ে যেত। অবশ্য কথা আছে যে, নিজের ঘরে অনেকেই জ্ঞানের বিকাশ প্রতিফলিত করতে পারে না। অনেকে গ্রহণও করে না। স্বীকৃতিও দেয় না। তবুও তাদের প্রাচীরের বাইরে এসে খানিকটা দক্ষিণ ও পশ্চিমের বসতিগুলোর সার্বিক কল্যাণে যে কোন দিকে নজর দিলে উপকৃত হত অসংখ্য মানুষ। স্মরণ করে রাখতো তাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে। আজিমপুর কলোনীবাসী বিভিন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়টি একটু ভেবে দেখবেন। এলাকাবাসীর এটাই প্রত্যাশা।

আজিমপুরের হায়াতবাগ তথা মির্জা আব্দুল কাদের সর্দারের পারিবারিক গোরস্থানের পূর্ব দিকের বাড়িটা ছিলো কালীদয়াল ঘোষ বাবুর। সে বাড়িটি পাকিস্তান হওয়ার পর রিকুইজিশন করে ডেপুটি মঈন উদ্দিন সাহেবকে দেওয়া হয়। ডেপুটি মঈন উদ্দিন বিহারের আরা জেলার সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন।

এ বাড়ির পরই আরেকটি বাড়ী রয়েছে – যা ১৯৫৬ সালে খরিদ করে বসবাস করছিলেন পাটনার নওয়াব উপাধিপ্রাপ্ত এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশীয় ব্যক্তি – খান বাহাদুর শেখ মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব। যদিও ইয়াসিন সাহেব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু পূর্বেই তথা ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্ব বাংলায় এসে ঢাকার নওয়াবগঞ্জ থানা এলাকার এক গ্রামে তার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাসায় উঠেছিলেন। তারপরই ১৯৪৭ সালের ৯ই জুন বৃটিশ সরকার কর্তৃক দেওয়া "থার্ড জুন প্লান" মুসলিম লীগ কর্তৃক দিল্লীতে আহুত কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের জন্য পুনরায় ভারতে গমন করেছিলেন– কলকাতা থেকে মৌলানা মোঃ আকরাম খাঁ সাহেবের সঙ্গে একই ট্রেনে সে কনফারেন্স হতে এসে তিনি আর ভারতে যাননি। দিল্লী থেকে এসে ঢাকার চকবাজারের মুকিম কাটারায় বসবাস করতে থাকেন। তিনি পাটনায় অবস্থানকালে বেলী হাই ইংলিশ স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। স্কুলটি তার পিতামহ খান বাহাদুর শেখ বাহাদুর খান প্রতিষ্ঠা করে তৎকালীন বাংলা বিহার উড়িষ্যার গভর্ণর স্যার বেলী'র নামানুসারে নামকরণ করেছিলেন।

জনাব ইয়াসিন খান অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলার এবং বিহার প্রাদেশিক নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর পিতা খান বাহাদুর আলহাজ শেখ মোঃ ইউসুফ পাটনা ও অন্যান্য এলাকার জমিদার এবং অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দাদা খান বাহাদুর শেখ বাহাদুর আলী খানও জমিদার ছিলেন। বৃটিশ সরকার তাকে নবাব উপাধী দান করেছিলেন। বাহাদুর আলী খানের পিতা ইমাম আলী খান তৎকলীন মুগল সম্রাট শাহ আলম হতে বেশ কিছু জমিদারী, সেই সঙ্গে একশত ঘোড়া ও এক হাজার সিপাহী রাখার অনুমতি পেয়েছিলেন। আর বংশানুক্রমে খান উপাধীও। ইয়াসিন খানও বৃটিশ সরকার হতে ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী খান বাহাদুর উপাধীপ্রাপ্ত হন। তৎকালীন ভারতের ভাইস-রয় গভর্নর জেনারেল দিল্লীর দরবারে এক আড়ম্বড়পূর্ণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের সঙ্গে তাকেও উপাধী ও সনদ প্রদান করেন। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনকালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে বৃটিশ প্রদত্ত উপাধী বর্জনের আহ্বান জানান হলে তাতে সাড়া দিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও তার খান বাহাদুর উপাধী এবং অন্যান্য সনদ পরিত্যাগ

করেন। এসব মূল্যবান পত্র ও সনদ-উপাধীর কাগজপত্র তিনি অতি যত্নের সঙ্গে হেফাজত করে রেখেছেন।

জনাব ইয়াসিন খান বিহারের রাজধানী পাটনা হতে আগমন করলেও অন্যান্য বিহারী নেতৃবৃন্দের ন্যায় চিন্তা করতেন না। তিনি বাংলার মাটির সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। নিজের ছয়পুত্র ও তিনকন্যাকে বাংলাদেশের বনেদী পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বাংলার মাটিকে আরো আপন করে নিয়েছেন তার বিনয়ী ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ দ্বারা।

ইয়াসিন সাহেবের বাড়ীর কিছুটা পূর্বে রয়েছে শাহ্ মোঃ চৈতনকারীর মাজার। শাহ্ চৈতন কোথা থেকে, কবে এখানে এসেছিলেন তা' জানা যায়নি। শাহ্ চৈতনের মাজারের অপর দিকে রয়েছে ছাপড়া মসজিদ। অনেকেই মনে করেন, পাক আমলে আজিমপুর কলোনী নির্মিত হওয়ার ফলে এ মসজিদ স্থাপিত হয়। কিন্তু তা সঠিক নয়। মসজিদটি শাহ্ছুফি মোঃ খলিলুল্লাহ্‌র (কুঃ সিঃ) আমলেই প্রতিষ্ঠা হয়। এ স্থানটি আবাদ হয় শাহ্ছুফি লাকীতুল্লাহ্‌র সময়ে। তখন ইহা কাঁচা ও ছাপড়া ঘরের মতো ছিলো তজ্জন্যই এ মসজিদকে ছাপড়া মসজিদ বলা হতো। তখন মসজিদটি দায়েরা শরীফের চত্বরের আওতাভুক্ত ছিলো। বর্তমানে অবশ্য দায়রা চত্বরের অনেক বাইরে সম্প্রসারিত হয়েছে। ছাপড়া মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর হতে সেখানে জ্বীনের আনাগোনা আরম্ভ হয়। তাদের উৎপাতে মুসল্লীগণ প্রায় রাতেই এশার নামাজ আদায় করতে পারতেন না। মসজিদটিতে প্রায়ই চার ওয়াক্তের আজান ও নামাজ হতো। মসজিদের পেশ ঈমাম সাহেব আজ থেকে ৪২ বছর পূর্বে এ মসজিদে ঈমামতি করতে আসেন। তার পূর্বেকার কোন ঈমাম জ্বীনদের জন্য বেশীদিন টিকতে পারেননি। ১৯৬৭ সালে এপ্রিল মাসে মসজিদটির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন তথা পাকা মসজিদে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আজিমপুর দায়রা শরীফের তৎকালীন গদিনশীন পীর শাহ্ছুফী হজরত ওলিউল্লাহ (রহঃ)। মসজিদটি নির্মাণে এলাকার লোকজনের সহায়তা রয়েছে। ১৯৭৮ সালে কুয়েতী ও স্থানীয় লোকজন এবং সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায় দোতালা মসজিদে পরিণত হয়।

ছাপড়া মসজিদের দক্ষিণ দিকে আজিমপুর সড়ক ধরে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলের গর্ব-খ্যাতিমান বিদ্যাপীঠ "ওয়েষ্ট এণ্ড হাই স্কুল"। ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো প্রথমে জগৎমোহন

প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে। তৎকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো চতুর্থ শ্রেনী পর্যন্ত ছিলো। পঞ্চম শ্রেনী ছিলো হাই স্কুলের আওতাভুক্ত। পরবর্তীতে নবাব বাগিচায় ইসলামিয়া হাইস্কুলের ড্রিল মাষ্টার ও ঢাকার নবাব বাড়ির শিক্ষক জনাব আখতার সাহেবের বাসায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু করা হয়। সেখানে কিছুদিন চলার পর এটি নিস্তেজ হয়ে পড়লে নীলাম্বর সাহা রোডের বিত্তবান ব্যক্তি কৈলাশ বাবুর পুত্র সতীশ চন্দ্র দাস ও সুবোধ চন্দ্র দাস এখানে একটি হাইস্কুল পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ করে জমিদানের প্রস্তাব দেন এই শর্তে যে, স্কুলটি তার পিতার নামানুসারে হবে। এতে এলাকাবাসী সায় প্রদান না করায় তারা পূর্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে যে কোন নামে স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। এবং বর্তমানে ওয়েষ্ট এণ্ড হাইস্কুলটির জন্য জমিদান ও ঘর তৈরী করে দেন। এলাকাবাসী আলোচনা পূর্বক – যেহেতু ঢাকা শহরের পশ্চিম এলাকায় স্কুলটি হচ্ছে, তাই এর নামকরণ করেন ওয়েষ্ট এণ্ড (অর্থাৎ পশ্চিম শেষ প্রান্ত) হাই স্কুল।

সতীশ বাবুদের চকবাজারে ব্যাংক ব্যবসা বা হুণ্ডি ব্যবসা ছিলো। বেশ কিছুকাল স্কুলটির ব্যয়ভার বাবু সতীশ চন্দ্র দাস ও সুবোধ চন্দ্র দাস বহন করেন। তাদের ব্যবসা বাণিজ্য মন্দীভূত হয়ে আসলে তাদের মাসিক বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ায়, ছাত্র বেতন দিয়েই স্কুলটি পরিচালিত হতে থাকে। সে সময় সুবোধ চন্দ্র লালবাগ রোডস্থ ওয়েস্ট এণ্ড হাইস্কুলের দক্ষিণে অবস্থিত বর্তমান রহমত উল্লাহ্ মডেল হাইস্কুলটিতে বসবাস করতেন। এটা তার বসত বাড়ি ছিলো। পরবর্তীতে স্কুলের এক প্রতিভাবান ছাত্র বিষ্ণুচরণ দাসের অকাল মৃত্যু হলে, তার স্মরণে তার পিতা স্কুল ভবনে একটি কক্ষ নির্মাণ করে তা "বিষ্ণুচরণ ভবন" নামকরণ করেন যা আজো ঐ ভবনে উৎকীর্ণ রয়েছে। বিদ্যালয়টি ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে বহু বছর যাবৎ সুনামের অধিকারী। এর সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব শামসুদ্দিন সাহেব সকল স্তরের লোকজনের কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্কুলটির উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তার এ সেবার জন্য পাকিস্তান সরকার তাকে 'তমঘা-ই-খেদমত' উপাধীতে ভূষিত করেন।

আজিমপুর রোড এবং বিষ্ণুচরণ দাস ষ্ট্রীট সংযোগ স্থলে রয়েছে আজিমপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার যা বর্তমানে হাজী গণী কমিউনিটি সেন্টার। এ স্থানটিতে মোঘল আমলে একটি পাকা শান বাঁধানো পুকুর ছিলো। পরবর্তীতে তা মজে গিয়ে একটি অস্বাস্থ্যকর জলায় পরিণত হয়। আশেপাশের বাড়িসমূহের মল ও ময়লা পানি এবং আবর্জনাদি ফেলা হতো। আজিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান (মরহুম) হাজী

আঃ গণী এ দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর জলাটি ভরাট করে এখানে তার অফিস এবং পরবর্তীতে একটি ছোটখাট কমিউনিটি সেণ্টার, একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি তারই নামে 'হাজী গণী পৌর বালিকা বিদ্যালয়' নামকরণ করা হয়। তৎপুত্র ঢাকার প্রথম মেয়র আবুল হাসনাত একটি আধুনিক মডেলের কমিউনিটি সেণ্টার নির্মাণ আরম্ভ করেন যা আজ হাজী গণী কমিউনিটি সেণ্টার নামে পরিচিত।

উক্ত কমিউনিটি সেণ্টারের পাশেই রয়েছে চাঁদ তারা মসজিদ। এ মসজিদটি প্রখ্যাত হোসিয়ারী ব্যবসায়ী হাজী আব্দুল হাকিম নির্মাণ করেন। এ মসজিদ নির্মাণের পেছনেও একটি কাহিনী রয়েছে। সেটা হলো– মসজিদের জায়গাটি পূর্বে উক্ত হাকিম সাহেবদের পারিবারিক গোরস্থান ছিলো। তারা ছিলেন মির্জা মান্না দেউরীর অধিবাসী। সেই সুবাদে মহল্লার লোকদেরও উক্ত কবরস্থানে দাফন করতে দেওয়া হতো। পরবর্তীতে মহল্লা সরদার জনাব লালমিয়া কবরস্থানটিকে মহল্লা পঞ্চায়েতের কবরস্থান বলে ঘোষণা দিয়ে সেটা দাবী করলে একটা বিবাদের সূত্রপাত হয়। ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। আদালতে জনাব হাজী আঃ মালেক গং জয়লাভ করেই ভবিষ্যতে যাতে এনিয়ে মহল্লাবাসী আর দাবী দাওয়া না করে তজ্জন্য তড়িৎ এ মসজিদটি তৎপুত্র হাকিম সাহেব নিজ খরচে নির্মাণ করেন। মসজিদের গায়ে চাঁদ তারার প্রতিকৃতি অংকিত করে ইহার নামকরণ করা হয় "চাঁদ তারা মসজিদ"।

আজিমপুর রোডেই রয়েছে কয়েকযুগের ঐতিহ্যবাহী স্যার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম এতিমখানা। এ এতিমখানাটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ বাহাদুর। ১৯০১ সালে তিনি মুসলিম সমাজের অসহায় পিতৃ-মাতৃহীন এতিম ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালন ও সুশিক্ষাদান করে উৎপাদনশীল কর্মী হিসেবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পর পরই ইসলামপুর এলাকার আহসান উল্লাহ্ রোডে তাদেরই একটি ভবনে সর্বপ্রথম এতিম খানাটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়ায় আবুল খায়রাত রোডের ঐতিহাসিক তারা মসজিদের সংলগ্ন পশ্চিমের একটি বাড়িতে এতিমখানাটি স্থানান্তর করেন। আবার কেউ কেউ বলেন– এই আবুল খায়রাত রোডেই প্রথম এতিমখানাটি স্থাপন করেছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্। তিনি প্রথমে এর নাম দিয়েছিলেন ইসলামিয়া এতিমখানা। এর পরিচালনার ব্যয়ভার তিনিই সম্পূর্ণরূপে বহন করতেন। সেখানে যে এতিমখানাটি কিছু দিন ছিলো তার চাক্ষুস সাক্ষ্য এখানো কয়েকজনের কাছ থেকে পাওয়া যায় তবে তাদের মধ্যে অনেকেই বলেন কিছু

এতিম মেয়েদের এখানে রাখা হয়েছিলো। বাড়িটি আজো এতিমখানার সম্পত্তি হিসেবেই রয়েছে। এখানেও কিছু অসুবিধা দেখা দিলে লালবাগ চৌরাস্তার সামান্য পূর্বে হরনাথ ঘোষ রোড এবং নূর ফাতাহ্ লেন এর সংযোগ স্থলের পশ্চিম পাশের বাড়িটি ভাড়া নিয়ে এতিমখানাটিকে পুনরায় স্থানান্তর করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে এবং ১৯০৬ সালের ঐতিহাসিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন ও মুসলিম লীগ গঠন করতে গিয়ে নবাব সাহেব ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েন। ফলে, এতিমখানার ব্যয় সংকুলানে অসুবিধা দেখা দিলে আজিমপুরস্থ গোড়ে শহিদ মসজিদের নীচ অংশে এতিম ছেলেমেয়েদের রাখার ব্যবস্থা করে সেখানেই স্থায়ীভাবে এতিমখানাটি পুনঃস্থাপন করা হয়। কাহারো মতে এ সময়েই কিছু দিনের জন্য আবুল খয়রাত রোডের বাড়ীতে এতিম মেয়েদের রাখা হয়েছিলো। তৎপরই মসজিদ সংলগ্ন জমিতে ধীরে ধীরে এতিমখানাটি সম্প্রসারিত হয়।

গোড়ে শহীদ মসজিদটি দ্বিতল ও পাকাপোক্ত থাকায় এর নীচে এতিমদের বসবাসের কোন বেগ পেতে হয়নি। মসজিদের শিলালিপি অনুসারে দেখা যায় যে, প্রায় ২৭০ বছর পূর্বে দিল্লীর মোঘল সম্রাটের প্রশাসন থেকে প্রেরিত আনোয়ার শাহ্র তত্ত্বাবধানে মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদের নীচ অংশটি সরাইখানা হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যেই নির্মাণ করা হয়েছিলো। সেকালে এমনিতর বহু মসজিদ ও সরাইখানা মুসলিম বাদশাহগণ তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের কোন কোন স্থানে নির্মাণ করে গেছেন। এখানে উল্লখ করা যেতে পারে যে, ঢাকার মসজিদ সংক্রান্ত যে ঐতিহাসিক পুস্তক রচিত হয়, তাতে এ মসজিদটি নির্মাণ তালিকায় ২৭তম মসজিদ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

মসজিদটি শাহী ফরমানে নির্মিত হলেও পরবর্তীতে ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের শহীদদের কতককে মসজিদের আশেপাশে দাফন করা হলে মসজিদটিকে সে সময় হতে ঢাকাবাসী গোড়ে শহীদ মসজিদ নামে অভিহিত করে আসছে। কিছুকাল পূর্বে এতিমখানার প্রথম সেক্রেটারী খান বাহাদুর ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী (মরহুম) কে এ মসজিদের নিকটে দাফন করা হয়েছে।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ ১৯১৫ সালে ইনতেকাল করলে তৎপুত্র খাজা হাবিব উল্লাহ্ নবাব পদে আসীন হয়ে পিতার স্মৃতি ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার লক্ষ্যে এতিমখানাটি পরিচালনার জন্য এগিয়ে আসেন। ১৯১৬ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত এতিমখানা পরিচালনায় আর্থিক অভাব অনটন প্রকটভাবে দেখা দিলে নবাব সলিমুল্লাহ্র বন্ধু, সহকর্মী ও সমাজ হিতৈষী ঢাকার বলিয়াদীর জমিদার খান বাহাদুর

ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী অসহায় দুঃস্থ এতিমদের পাশে এসে দাঁড়ান। জমিদার খান বাহাদুর ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯২২ সালে নবাব হাবিব উল্লাহ্ বাহাদুরকে সভাপতি এবং তিনি নিজে সেক্রেটারীর দায়িত্ব নিয়ে এতিমখানাটি পরিচালনার জন্যে আরো কতিপয় বিশিষ্ট ও দানশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। ফলে প্রতিষ্ঠানটি আবার তার প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে পায়। মনে হয়, এসময়েই এতিমখানার পূর্ব নাম পরিবর্তন করে স্যার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম এতিমখানা রাখা হয়। অথবা লালবাগের ভাড়া করা বাড়ী থেকে বর্তমান স্থানে ১৯০১ সালে স্থানান্তর হওয়ার পরই এই নামকরণ হয়। যা হোক নবাব হাবিব উল্লাহর আমলেই এতিমখানাটির জন্য পার্শ্ববর্তী জমিসমূহ পর্যায়ক্রমে হুকুম দখল করা হয়। বর্তমানে যে সব দালান কোঠা রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই জনাব সিদ্দিকী সাহেবের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য ঢাকার নবাবদের ছাড়াও ঐসব দালান-কোঠা নির্মাণে এবং এতিমখানা পরিচালনে আরো অনেক বিত্তশালী মুসলমানের দান উল্লেখযোগ্য। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এতিমখানার অভ্যন্তরের বিভিন্ন ভবন ও বিদ্যালয়গুলোর নামকরণের মধ্য দিয়ে। নবাবদের নামের মধ্যে নবাব আলিমউল্লাহ ভবন (১৯২৬), নবাব আঃ গণী ভবন (১৯৩৪), মহিলা ওয়ার্ডে নওয়াব সলিমুল্লাহ্ ভবন এগুলো তাদের পরবর্তী নবাবগণ তাদের পিতৃ পুরুষদের স্মরণীয় করে রাখার জন্য করেছেন। নবাব হাবিব উল্লাহ্ ভবন (১৯৩৪) হাজী রফিক ভবন, এরফান হল, বেগম আসমাতুন নেছা ভবন, ব্রোজে ভবন, গোলাম সাত্তার ভবন (বর্তমান খানা ঘরটি) তাছাড়া, মসজিদটির সম্প্রসারণ ও মহিলা ওয়ার্ডের সম্প্রসারণ কার্য সমাধা করেন জমিদার ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী। তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য নবাব আঃ গণী ভবনে অবস্থিত হাইস্কুলটি তারই স্মরণে নামকরণ করা হয় ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী হাইস্কুল। পূর্বে ইহা মাদ্রাসা ছিলো। অবশ্য এখন মসজিদের নীচতলায় একটি মাদ্রাসা কয়েক বছর ধরে চালু করা হয়েছে। সদর রাস্তার ধারে মহিলা ওয়ার্ডের পূর্বদিকে যে বড় ফটকটি এখন বন্ধ অবস্থায় রয়েছে তা নাজিম উদ্দিন গেট নামকরণ করা হয়েছিলো।

জনাব ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী ১৯২২ হতে ১৯৪৯ সাল তথা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এতিমখানার অবৈতনিক সেক্রেটারী ছিলেন। অপরদিকে এতিমখানার প্রথম সভাপতি নবাব হাবিব উল্লাহ্ ১৯৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করলে তৎপুত্র নবাব খাজা হাসান আসকারী সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে পাকিস্তানে চলে যান। সেক্রেটারী জনাব ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকীর মৃত্যুর পর জমিদার চৌধুরী গোলাম সাত্তার

সাহেব সেক্রেটারী হিসেবে বরিত হন। তিনিও দক্ষতার সঙ্গে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এতিমখানার উন্নতি এবং এতিমদের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তৎপুত্র চৌধুরী গোলাম আহমদ সেক্রেটারীর দায়িত্ব লাভ করেন। চৌধুরী সাহেবগণ আরমানিটোলায় বসবাস করতেন। ১৯৮০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগের এক আদেশে পূর্ববর্তী কমিটি বাতিল করে সমাজ কল্যাণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এক পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। যাতে নওয়াব বেগম সামছুন নাহার আহসান উল্লাহ্‌কে সভানেত্রী, সাবেক এম, পি আলহাজ্ব মোঃ সিরাজ উদ্দিনকে সেক্রেটারী এবং আমাকে ট্রেজারার পদ প্রদান করা হয়। সেক্রেটারী সাহেবের উপর পূর্ব কমিটির পক্ষ হতে ইনজাংশন জারী হওয়ায় তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেননি। সমাজ কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক ট্রেজারার মনোনীত হয়ে এতিমখানা পরিচালনা করতে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম –শুভংকরের ফাঁক দেখা যাচ্ছে। বাধা দিয়ে কুলোতে না পেরে অগত্যা ট্রেজারার পদে পদত্যাগ পেশ করি। পরবর্তীতে আদালত ও এতিমখানার অভ্যন্তরে অনেক ঘটনার পর বর্তমান সরকার নতুন কমিটি পুনরায় গঠন করেছেন।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ঐতিহ্যবাহী সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা হতে যারা কৃতিত্বের সাথে বের হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাদের অনেকেই এতিমখানার পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন। এ ধরনের মন মানসিকতা পরিহার করতে হবে। সমাজে মাথা উচু করে বলতে হবে – এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই আমাদের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। তা হলেই সত্যিকারের মানুষ হিসেবে যেমন তিনি পরিচিত হবেন, তেমনি যারা তাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন তারাও গর্বিত হবেন আনন্দিত হবেন। মানবতার বৃহত্তর সেবায় আরও নিজেদের নিয়োজিত করবেন।

আজিমপুরের আদি বসতির উত্তর পশ্চিম কোণটি বটতলা নামে পরিচিত। এখানে ছোট খাটো রাজনৈতিক সভা-সমিতি হতো। পরবর্তীতে পৌর করপোরেশন শহর সৌন্দর্যায়নের নামে সেখানে একটি ফোয়ারা নির্মাণ করেন। যা বহুদিন যাবৎ অকেজো হয়ে পড়ে থাকার পর আমার প্রচেষ্টায় সেখানে একটি ব্যায়ামাগারসহ সপিং কমপ্লেক্স ঢাকা পৌরকরপোরেশন নির্মাণ করেন। এর উত্তর-দক্ষিণ দিকে ছিলো কারবালা ময়দান।

বর্তমানে যদিও ঐতিহাসিক কারবালা নামটিও বিলুপ্ত হয়েছে, তবুও ঢাকার বহুলোক কারবালা নামেই স্থানটিকে চিহ্নিত করে আসছে। কারবালা নামটি কিভাবে, কবে হয়েছিলো এবং কারাইবা এ নামের জন্ম দিয়েছিলো তা জানা যায় না। তবে

এটা মুঘল আমলের শেষদিকে বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের নবাবদের আমলে যে হয়েছে, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ঠ কারণ রয়েছে। কেননা, সে সময় ঢাকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন ও বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের প্রায় সবাই ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। আর সে সময়েই ঢাকা শহরের অনেক মহল্লার নাম শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের নামে হয়, যেমন আগাসাদেক রোড, আগা মাসিহ লেন, আগা নওয়াব দেউরী, আলী নকি দেউরী ইত্যাদি। যদিও ঢাকার হোসেনী দালান ঈমামবাড়া মোঘল আমলেই নির্মিত হয়েছে। মুসলিম আমলের শেষ দিকে ঢাকা তথা বাংলার অনেকস্থানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শিয়া সম্প্রদায়ের হস্তে থাকায় তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ঢাকার সুন্নী সম্প্রদায়ের উপর প্রতিফলিত হয় এবং সুন্নীগণ শিয়াদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বিশেষ করে মহররমের অনুষ্ঠানের অনুকরণ করে। যা আজো ঢাকাবাসী সুন্নীদের অনেকেই পূর্বেকার প্রথা পালন করেছেন। তবে বহু ব্যক্তি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, একটা আনন্দময় পরিবেশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই নকল কারবালা ময়দানে মহররমের আশুরা দিবসে বহুকাল থেকে একটি মেলা বসতো। মেলায় লাঠি ও তরবারী খেলা থেকে শুরু করে নানারূপ খাদ্যদ্রব্যের দোকান, ব্যবহার্য ও খেলনা সামগ্রীর দোকান, চরক গাছ ইত্যাদির ব্যবস্থা হতো।

ঢাকার মানুষ দলবদ্ধভাবে ঐ মেলায় যেতো, মিছিল দেখতো। আশেপাশের বাড়িগুলোতে অনেক মহিলার আগমণ ঘটতো বিভিন্ন মহল্লা থেকে। পাক আমলের মধ্যভাগে কারবালা ময়দানের পূর্ব পাশের কতিপয় বাড়িতে দেহ-ব্যবসা আরম্ভ হলে সেই সব দেহ পসারিনীদের দেখার জন্যেও বহু তরুণ যুবার সমাগম ঘটতো। অবশ্য মেলায় হাজার হাজার লোকের সমাগম হতো। তবে পাক আমল থেকেই এ মেলার যৌলুশ ও লোক সমাগম হ্রাস পেতে থাকে। কারবালা ময়দানটি মহররমের আশুরার পূর্ব রাত্রি থেকেই উৎসব মুখর হয়ে উঠতো। বছরের বাকী দিনগুলোতে নানারূপ খেলাধূলা ও গোচারণ ভূমি হিসেবে উহা ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে সেস্থানে ইউনিভার্সিটি স্টাফ কোয়ার্টার নির্মিত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী রাস্তায় মেলা বসছে। আর এখন শুধু আশুরার দিনই নয়, পুরো মহররম মাসটাই যেন মেলার দিন হয়ে যায়। যদিও আশুরার দিন তথা মহররম মাসের প্রথম দশ দিন আপাতঃ দৃষ্টিতে মাতমের দিন, মর্সিয়ার দিন, ত্যাগের দিন, আল্লাহর রাহে সত্যের ঝাণ্ডা উচু রাখার শপথের দিন, তবুও পূর্ব প্রথানুসারে মেলা বসার রেওয়াজ চলছে। এ মাসেই নবীজীর দৌহিত্র ঈমাম হোসেন পরিবার পরিজন নিয়ে ইরাকের কারবালা প্রান্তরে এজিদের সৈন্যবাহিনীর হাতে অনেক দুঃখ কষ্ট ও নৃশংস নির্যাতনের মাধ্যমে শহীদ হন।

অবশ্যি ঢাকার ধর্মপ্রাণ সুন্নী মুসলমানরা অধিকাংশ মেলার ফালতু কোলাহল বর্জন করে মহররম মাসের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন এবং উক্ত দিন ও মাসটিকে যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালন করার উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত ও রোজা-নামাজ আদায় করেন।

এই নকল কারবালার ময়দানের দক্ষিণে রয়েছে বিশিষ্ট বুজুর্গ হযরত মোবারক শাহের গদীঘর। সুফি মোবারক শাহ্ ঢাকার আদি বাসিন্দা। খাজে দেওয়ানে তার বাড়ি ছিলো। সেখান থেকে আজিমপুর গোরস্থানের শাহ্মারীর মাজার শরীফের নিকট বাসস্থান নির্মাণ করেন। তখনও পৌরসভার পক্ষ হতে বর্তমান কবরস্থান স্থাপিত হয়নি। পরবর্তীতে কবরস্থানের জন্য তার বাসভবনসহ বিরাট এলাকা পৌর কবরস্থানের জন্য হুকুম দখল হলে মোবারক শাহকে চলে আসতে হয় ছোট দায়রা শরীফের উত্তর দিকে। তার বাসভবনের ইন্দারা (কুপ)টি কবরস্থানে এখনও রয়েছে বলে জানা যায়। ছোট দায়রার কাছে এসে তিনি তার ধর্মকর্ম করতে থাকেন। তার আস্তানায় কাওয়ালী মাহফিল হতো। এতে ছোট দায়রা মসজিদের মুসুল্লীদের এবাদতে বিঘ্ন ঘটতো বলে মুসুল্লীগণ অভিযোগ তোলার ফলে তার এক ভক্ত তৎকালীন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট বাবু খগেন্দ্র লাল বসাক তার একটি মানত পুরো হওয়ায় রামবাগ আখড়া এলাকাভুক্ত একখণ্ড জমি বন্দোবস্ত নিয়ে তার স্বর্গীয় পিতা হরিদয়াল বসাকের স্মৃতি রক্ষায় বাংলা ১৩৩৪ সালে মোবারক শাহের পীরের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এক দরবার কক্ষ তথা কাওয়ালীঘরটি নির্মাণ করে দেন। অতঃপর মোবারক শাহ্ উক্ত স্থান ত্যাগ করে বাবু খগেন্দ্র লাল বসাকের নির্মিত ঘরে আগমন করেন এবং যথানিয়মে তাঁর ধর্মকর্ম দুস্থ ও পীড়িতদের ঝাড় ফুক, তাবিজ ঔষধ ইত্যাদি প্রদানের সঙ্গে কাওয়ালী মাহফিলও চালিয়ে যান এবং স্থায়ীভাবে গদিনসীন হন। তার কাওয়ালী মাহফিল প্রতি শুক্রবারে হতো। এতে ঢাকা শহরের এবং বাহির থেকে আগত খ্যাতনামা কাওয়ালগণ অংশ নিতেন। শাহ্ মোবারক নিজেও দরবারে বসে বাউল গান গাইতেন। তার কাওয়ালী মাহফিলে শ্রোতা হিসেবে ঢাকার ধর্মপ্রাণ ও কাওয়ালী গানে আগ্রহী এমনকি মাঝে মধ্যে ঢাকার তৎকালীন নবাবযাদাগণও আগমন করতেন। প্রতি শুক্রবার দরবারের বাহিরে মেলা বসে যেতো। মোবারক শাহ্ ১৯৩৮ সালে ইনতেকাল করেন। হযরত শাহ্ সূফী মোবারক শাহ্‌র পীর ছিলেন আমলিগোলার কামাল শাহ্ (রহঃ)। উভয়ের মাজার আজিমপুর কবরস্থানে শাহ্ মারীর মাজারের নিকট রয়েছে। এ মহল্লায় তিনজন চীনা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমিজপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে গেছেন। জানা যায় এরা ইংরেজদের সঙ্গে ঢাকায় আগমন করেছিলেন এবং লালবাগ রোডের শেষ মোঘল

কীর্তি খান মোহাম্মদ মসজিদের নিকট বসবাস করতেন। সেখান হতেই আজিমপুরে তাদের আগমন ঘটে। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম আসেন সাচিং নামে এক ব্যক্তি, সে ছোট দায়রার হুজুর শাহ্ আজম উল্লাহ্র নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে স্থানীয় এক মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিজেদের পৈত্রিক ব্যবসা তথা কাগজের বিভিন্ন ধরনের ঘর সাজানোর ফুল, ছোটদের পাখা ইত্যাদি চীনের অনুকরণে তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে গেছেন। পরবর্তীতে আরো দু'জন এসে তারাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এখানেই বিবাহিত জীবন যাপন করেন এবং অনুরূপ দ্রব্যাদি তৈরি করতেন। বর্তমানে উপরোক্ত চীনাদের কেহই জীবিত নেই। তবে তাদের বংশধর রয়েছে।

আজিমপুর রোডে শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক ইরাকের কারবালার নামনুসারে যে জায়গাটির নামকরণ হয়েছিলো কারবালা ময়দান, তার পূর্ব দিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু পরই দৌলতি বিবি পথভ্রষ্ট উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু দেহ পসারিণী সংগ্রহ করে অবৈধভাবে দেহ ব্যবসা আরম্ভ করে। এবং ইহার বিস্তার দিন দিন যেমন বর্দ্ধিত হতে থাকে, তেমনি দৌলতির প্রভাব প্রতিপত্তিও বাড়তে থাকে ক্রমান্বয়ে। এলাকাবাসী সচ্চরিত্র লোকদের জন্য যেমন ইহা ছিলো বিষফোড়া, তেমনি ঐতিহ্যবাহী ছোট দায়েরা শরীফের উত্তর লাগ এদের দেহ ব্যবসা কেন্দ্র থাকায় পবিত্র দায়েরা শরীফের পক্ষেও ছিলো অত্যন্ত অপমানজনক। ফলে এলাকাবাসী এই দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়। দৌলতি ঢাকার প্রভাবশালী সরদার প্রধান, গুণ্ডা-ষণ্ডা, পথভ্রষ্ঠ পুলিশ ও পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের অনেককেই প্রমোদবালাদের বদৌলতে নিজের পক্ষে এনে প্রতিবাদকারীদের জব্দ করতে থাকে। এক সময় পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, ঢাকার কোন ব্যক্তিই দৌলতির ঘৃণিত কার্য্যের প্রতিবাদ করতে সাহস পেতো না। অবশ্য পরে নুতন পল্টন লেইনস্থিত খনকার সাহেবের মসজিদের কতিপয় আলেম ব্যাপারটি নিয়ে ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলের মহল্লাগুলোতে প্রচারাভিযান চালিয়ে উক্ত বস্তিতে অগ্নি সংযোগের পরিকল্পনা করেন। এ দলের মধ্যে আজকের দায়মী কমপ্লেক্সের প্রধান সূফি দায়েমুল্লাহ্ ছিলেন অন্যতম ব্যক্তি। তিনি এ ব্যাপারে এক বিশিষ্ট আইনজীবির পরামর্শ গ্রহণ করতে গেলে আইনজীবি তাদের নিজেদের হাতে আইন তুলে না নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। এবং নিজেদের মধ্যে বৃহৎ ঐক্য সংগঠিত করে আইনের মাধ্যমে দৌলতি ও তার দলবলকে উচ্ছেদ ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা নেওয়ার উপদেশ দেন।

দৌলতির প্রভাব ছিলো তৎকালীন গভর্নর হাউস থেকে বড় বড় জাঁদরেল পুলিশ ও সরকারী কর্মকর্তা অন্যদিকে নামকরা গুণ্ডা বদমায়েশদের মধ্যে। তবে চুনোপুটিদেরও হাতছাড়া করতো না যুবতি ললনা আর অর্থের লোভ দেখিয়ে। ঢাকার বহু নামী দামী সরকারী-বেসরকারী ব্যক্তির গাড়িও আসা যাওয়া করতো সেখানে। সেই সাথে ঘোড়াগাড়ি আর রিকশার ভীড়ও লেগেই থাকতো। সরবরাহ হতো তরুণী-যুবতী, সুন্দরী আধা-সুন্দরীসহ সর্বরকম নারী। গভর্নর হাউসের গাড়ি যখন দরজার নিকট লাগতো তখন অনেক সময় নাকি দৌলতিকে বলতে শুনা গেছে "ঐ ছেরীরা.... গাড়ী আইছে তাড়াতাড়ি ঠিক অ" এতেই বুঝতে পারা যায়, কতো প্রভাব ছিলো দৌলতির সরকারী মহলে। মনে করলে ভুল হবেনা যে সরকারী অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য এখান থেকেই নারী সরবরাহ হতো। এহেন মহিলার মোকাবেলা করা বা তাকে উচ্ছেদ করা কত ঝুকিপূর্ণ ও সাহসের কাজ তা সহজেই অনুমেয়। যদি কেউ করতো কোন না কোন মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া ছিলো তার পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার। তাছাড়া, গুণ্ডা বদমাইশদের হাতে লাঞ্ছিত, অপমাণিত এবং জীবন নাশের ব্যাপারটাও ছিলো অতি সহজ।

এই ক্রান্তিলগ্নে আজকের ছোট দায়রার গদীনসীন পীর সূফি দায়েমুল্লাহ্ আইন জীবির পরামর্শ অনুসারে এগিয়ে গেলেন আইনের দোর গোড়ায়, কড়া নাড়লেন তীব্র আওয়াজে। এ আওয়াজ আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের অনেকেরই মোহ ঘুচলো, সমাজপতিদেরও অনেকের ঘুম ভাংলো। অনেক সরকারী কর্মকর্তা এগিয়ে আসেন সে আওয়াজের দিকে। সূফি দায়েমুল্লাহ্ তাঁর সাথীদের সহযোগিতায় আবেদন পেশ করলেন আইনের রক্ষকদের কাছে। এ কাজে তার সাথীদের মধ্যে হাজী কাসেম (মরহুম) এর নাম উল্লেখযোগ্য। তদন্ত আরম্ভ হলো কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা পরানো যাচ্ছে না। সূফি দায়েমুল্লাহ্ নাছোড়বান্দা। বুঝতে পারলেন এক্ষেত্রে শুধু জেহাদ ঘোষণা করলে চলবে না। কেবল হুংকার ছাড়লেই কাজ উদ্ধার হবে না। এটা বিংশ শতাব্দীর যুগ। এখানে সব রকম যুদ্ধাস্ত্রের সঙ্গে অর্থও লাগে। তাই তিনিও অর্থের সংস্থানে বের হলেন। অনেকেই এগিয়ে আসলেন। দৌলতি যদি তদন্তকারী অফিসারকে দু'হাজার টাকা দেয়, সূফি সাহেব দেন তার দ্বিগুণ। তবুও এ সত্যের লড়াইয়ে জিততে হবে। সমাজের মুখ রাখতে হবে। তদন্ত, পাল্টা তদন্ত বেশ কিছুদিন চলার পর অবশেষে সংগ্রামকারীদের চাপে দৌলতিসহ বহু মেয়েকে গ্রেফতার করলো। তাদের মধ্য থেকে ফুসলিয়ে, নানা প্রলোভন দেখিয়ে, জোর পূর্বক ভয় দেখিয়ে যে সমস্ত মেয়েকে মাত্র কিছুদিন পূর্বে দৌলতির নারী ব্যবসা

কেন্দ্রে আনা হয়েছে, সেগুলোকে বাছাই করে রাজসাক্ষী করার লক্ষ্যে চালান দেওয়া হলো কোর্টে জবানবন্দির জন্যে। পুরনোগুলোকে সাক্ষী করলে উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। বলবে– আমরা ইচ্ছে করেই এখানে এসেছি। এ ধরনের মামলায় আসামীরা সামান্য মাত্র জরিমানা দিয়েই বেরিয়ে আসে। আর এদের জামিন নেওয়ার বা জরিমানা দেওয়ার লোকের অভাব ছিলোনা শহরে।

যে কটি মেয়েকে রাজসাক্ষী করার লক্ষ্যে ধরা হয়েছে, তাদের জবানবন্দি আদালতে লিপিবদ্ধ করা হলো। আসামী পক্ষ হতে তাদের জামিনে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য তদবীর শুরু হলো। এবার সরকার পক্ষ তথা বাদী পক্ষ হুসিয়ার। শুনানীর দিন তুখোর আইনজীবির মারপ্যাচে এসব মেয়েরাই আবার অন্যকথা বলবে বা বলাতে সক্ষম হবে, এ ধরনের আইনজীবির অভাবও আমাদের দেশে নেই। এক্ষেত্রেও প্রখ্যাত মহিলা উকিল (তিনি তৎকালীন এম, পি, এ.) জামিন নেওয়ার জোর প্রচেষ্টা চালালেন। এবার জামিন নিয়ে পুলিশের কর্মকর্তা ও সরকারী কর্মকর্তারা মাথা ঘামালেন। চিন্তা ভাবনা করতে গিয়ে প্রধান সাক্ষী ও সরকারী আইনজীবিদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করলেন। যে ভাবেই হোক দৌলতির সহযোগীদের কাছে, সাক্ষী হবে এমন মেয়েদের যাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য না দেওয়া হয়। তজ্জন্য জোর প্রচেষ্টা চললো। কিন্তু সদ্য সমাজচ্যুত বিপথগামী এসব তরুণী যুবতীদের কেউই একসাথে রাখতে সম্মত হলেন না। অগত্যা, সূফি দায়েমুল্লাহ্ বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ করে যারা এ মামলায় বাদীপক্ষে সাক্ষী অথবা সহযোগিতায় রয়েছেন তাদেরকে একজন করে মেয়েকে জামিনে নিয়ে নিজেদের বাসায় রাখার আহ্বান জানালেন। কিন্তু এতেও কেউই এগিয়ে আসলেন না। সমাজ ও পরিজনের ভয়ে। অগত্যা খনকার সাহেবের মসজিদের যে সব আলেম দৌলতির বস্তিতে আগুণ দিয়ে জেহাদ করতে চেয়েছিলেন, তাদের শরনাপন্ন হলেন এ কয়েকটি মেয়েকে কিছুদিনের জন্য প্রতিপালন ও মামলার তারিখে আদালতে হাজির করার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে। পিছু হটলেন সবাই– আলেম, কামেল, সরদার প্রধান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ওদিকে সরকার পক্ষ বাদীরা চিন্তিত, কারণ, এর উপরই নির্ভর করছে তাদের ভবিষ্যৎ। প্রধান সাক্ষী সূফী দায়েমুল্লাহ্ অগত্যা নিজের বাড়িতে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। সকল ভয়-ভীতি, লজ্জা শরম উপেক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষের বক্তব্য মতে জামিন হলো ঐ সব মেয়েগুলোর। নিয়ে আসলেন তাদেরকে সূফী দায়েমুল্লাহ্ আজিমপুরস্থ তার নিজস্ব বাসভবনে। তখন তাঁর বাড়ির অবস্থাও বর্তমানের ন্যায় পাকা পোক্ত ছিলোনা। এদেরকে নিজ মেয়ে হিসেবে রাখার এবং ভাল ঘরে বিয়ে দিয়ে দেওয়ারও আশ্বাস

দিলেন– পবিত্র কোরান শরীফ স্পর্শ করে। মেয়েরাও কোরআন স্পর্শ করলো পিতার দাবীর উপর। এবার মনে শান্ত্বনা পেলেন সূফী দায়েম সাহেব। বেগম সাহেবাকে নির্দেশ দিলেন এদেরকে নিজ কন্যার মতো দেখতে। মেয়েগুলো খাওয়া ও পরার ব্যাপারে যখন যেটা দাবী করে সেটারই ব্যবস্থা করে দেন সূফী সাহেব। মামলার দিন তারিখে গাড়ি করে নিয়ে যান আদালতে। শুরু হলো ঢাকার আদালতে এ চাঞ্চল্যকর শহর আলোড়নকারী ও দর্শনীয় মোকদ্দমা। ঢাকার সমাজ জীবনে দেহ পসারিণীদের নিয়ে এত বড় মামলা আর কখনো হয়নি। মামলার তারিখে বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন মত ও পথের নানা ধরনের লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো আদালত কক্ষ ও তার বহিরাঙ্গন। মামলাটি তিনবছরকাল চলে। উভয় পক্ষে বিভিন্ন মহল্লা হতে নামীদামীসহ বিভিন্ন ধরনের লোক সাক্ষীর তালিকা ভুক্ত হন। বেশ কিছুসংখ্যক লোক পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষী দিলেন এই কুখ্যাত মামলায়। পুলিশের পক্ষে তখন যারা এগিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে সর্বজনাব আই, জি, হাফিজুদ্দিন সাহেব, এস. পি, এম. এ. হক, সিটি এস, পি, কিবরিয়া, এস, পি, ক্রাইম মোঃ আলী, তদন্তকারী সাব-ইন্সপেক্টর সাহেব আলীর নাম এখনো স্মরণপটে রয়েছে। এঁদের ছাড়াও অনেক পুলিশ অফিসার এই অবৈধ বেশ্যাবৃত্তি বন্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। তাদের কাছেও ঢাকাবাসী কৃতজ্ঞ। তবে কিছু কিছু পুলিশ অফিসার ও পদস্থ কর্মচারী যে আসামী দৌলতির পক্ষে অপ্রকাশ্যে সহায়তা করেছেন, তাও ঢাকাবাসী বিশেষভাবে অনুভব করেছেন, এমন যে তারা করেন তার শিকার আমি নিজেও হয়েছিলাম।

১৯৬০ সালে লালবাগ ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর আমাদের এলাকার এক প্রভাবশালী ঠিকাদার (যিনি পূর্ব হতেই পুলিশ বাহিনী ও পাক আর্মীর খাদ্যদ্রব্য ও বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ করতেন) একদিন নারায়ণগঞ্জ শীতলক্ষা নদীর অপর পাড়ের তিনটি যুবতী মেয়ে কাজ খুজতে এসে তার খপ্পরে পড়ে। মেয়ে তিনটিকে নিজ বাসায় আটকিয়ে রেখে সাথীদের নিয়ে পরপর জোরপূর্বক ধর্ষণ করতে থাকে। এ খবর মহল্লাবাসী টের পেয়ে দলমত নির্বিশেষে তার বাড়ি থেকে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করে আমার অফিসে নিয়ে আসে। তখন তাদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ বিবস্ত্র। আমার শত্রু-মিত্র সবাইকে এই অন্যায়ের প্রতিকারে এগিয়ে আসতে দেখে উৎসাহিত হলাম। সেই প্রভাবশালী, বিত্তবান ও মন্ত্রীদের বন্ধু ঠিকাদারের এহেন নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে। মহল্লার কিছু মহিলাকে ডেকে এনে তাদের. উপস্থিতিতে ওদেরকে প্রশ্ন করে সঠিক তথ্য অবগত হলাম। এবং বার বার জোরপূর্বক ধর্ষণ করার ফলে তাদের পরিধেয় বস্ত্র যে ছিড়ে গেছে তাও দেখলাম।

যেহেতু জোরপূর্বক ধর্ষিতা হয়েছে, তাই সে বিচারের ক্ষমতা ইউনিয়ন কমিটির স্যালিশীর এখতিয়ার বহির্ভুত বিধায় তাদের জবানবন্দি অনুসারে অভিযোগ লিখে দিয়ে থানায় পাঠানো হলো মেয়ে তিনটিকে। সঙ্গে বহু লোক গেলো। লালবাগ থানা তখন দূর্গের অভ্যন্তরে। থানার বহিপ্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। আশা করছিলাম, জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আসামীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নেবেন থানা কর্তৃপক্ষ। ইত্যবসরে প্রধান আসামী থানার সঙ্গে আঁতাত করে ফেলেছেন (যা পরে জানতে পারি)। তাই মেয়েগুলোকে তারা থানায় বসিয়ে রাখলেন। তাদের অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ না করে বরং উল্টো তাদেরকে মারধোর করলেন, উপস্থিত জনতাকে লাঠি-চার্জের ধমক দিয়ে সরে যেতে বলা হলো। এ খবর আমার গোচরীভূত হলে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উপস্থিত হলাম থানায়। সত্যি তাদেরকে মারধোর করা হয়েছে জেনে অফিসার ইনচার্জকে এর কারণ জানাতে বললাম। তিনি বললেন, এরা মিথ্যে বলছে, অর্থ আদায়ের জন্য এরূপ বলছে। তার কথায় বুঝতে পারলাম এদের অভিযোগ গ্রহণ না করে বরং উল্টো অভিযোগ এনে এদের আটক করা হবে।

তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম তৎকালীন ঢাকা পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান খাজা খয়ের উদ্দিনের নিকট, তিনি আমার কথা শুনে এস, পি, সাহেবকে ফোন করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বললেন। এস, পি, সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘটনা অবহিত করলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ থানায় যোগাযোগ করলেন। থানা অফিসারের কথা শুনে তিনি রাগতঃ স্বরে অভিযোগ গ্রহণ করতে এবং করণীয় কার্য সমাধা করতে বললেন। তা মিথ্যা প্রমাণিত হলে পরে সকলের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানালেন। সেমতে তাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হলো। জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হলো। তাতেও তাদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে তা অকপটে বলেছে। এলাকার লোকজন স্বতঃস্ফুর্তভাবে এদের সঙ্গে কোর্টে গিয়েছিলেন। সেখান হতে আসার পর মামলা পরিচালনা করতে এদের নিরাপদ স্থানে রাখা প্রয়োজন মনে করে আমাদের মহল্লার বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব আজিমুদ্দিন কারীর (মরহুম) বাসায় রাখা হলো। তাদেরকে নতুন কাপড় চোপড় আমি প্রদান করলাম, খাওয়া খরচের ব্যবস্থাও মহল্লাবাসী করলো।

তদন্ত আরম্ভ হলো, তদন্তের ভার পড়লো দারোগা --- শীল বাবুর উপর। তিনি এসে আমাকেই অভিযুক্ত করতে লাগলেন। কেন আমি তাদের জবানবন্দি নিয়েছি। কেন আমি তাদের সহায়তা করলাম, সবই নাকি বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তর্ক বিতর্ক যুক্তি মহল্লাবাসীর সাক্ষ্য সাবুদ সবই প্রদান করা হলো। আমাদের দৃঢ়তা দেখে

ভয় দেখিয়ে কোন কাজ হবে না ভেবে থানা কর্তৃপক্ষ অন্যপথ ধরলেন। তারা আসামীদের সহযোগিতায় মেয়েদেরকে তাদের হেফাজতে নেওয়ার কৌশল গ্রহণ করলেন। মোহাররমের পূর্ব রাত্রিতে মহল্লায় লাঠি ও অগ্নিখেলা চলছে কারী মিয়ার বাড়ির নিকটেও একদল খেলা দেখাচ্ছে। এই অসতর্ক মুহূর্তে মেয়েগুলোকে বের করে নিয়ে গেলো তারা। আসামীদের বাড়ি এ বাড়ির অতি নিকটে। আশুরার পর দিবসই মেয়েগুলোকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে ও পুনরায় গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে এস. ডি. ও, কোর্টে আমার বিরুদ্ধে তিনটি মেয়েকে দিয়ে পৃথক পৃথক অভিযোগ দায়ের করা হলো। মামলার বিষয়বস্তু ছিলো– আমি নাকি তাদেরকে ভয় ও অর্থের লোভ দেখিয়ে থানায় মামলা করতে বাধ্য করেছি। কেস করার সাথে সাথে তার নকল নিয়ে মূল মামলা থেকে জামিন নিয়ে পরবর্তীতে প্রচুর অর্থ খরচ ও প্রভাব বিস্তার করে অভিযোগ থেকে আসামীগণ অব্যাহতি লাভ করে। এটা আমার জানা ছিলো না। শুধু জানি আশুরার পূর্বরাত্রে মেয়েগুলো পালিয়ে গেছে।

ওদিকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে থানার অফিসার ইনচার্জ রিপোর্ট দিলেন। আমি নাকি অত্র এলাকার ভয়ংকর প্রভাবশালী ব্যক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি আমার বিরুদ্ধে থানা কর্তৃপক্ষ কোন রিপোর্ট দান করেন তাহলে থানা লুঠ বা আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনজন মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এবং কোর্টেই সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা চলে। এমতাবস্থায় রহমতগঞ্জ ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান ওয়াজেদ আলী মোক্তার (মরহুম) চকবাজারে দেখা হলে আমার বিরুদ্ধে এসব কেসের কথা জানালেন। তার কথানুসারে এ মামলায় আমি দোষী সাব্যস্ত হলে আট বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। কথা শুনে আমি থ বনে গেলাম। তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে কোর্টে গেলাম। পেশকারকে কিছু সালামী দিয়ে ফাইলগুলো দেখলাম। ফাইল দেখে সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। তবুও মনোবল হারালাম না। তখন আরো জানলাম– এ মামলার নথিপত্র দেখে আমাদের দায়েরকৃত মামলা হতে আসামীরা ইতিমধ্যে অব্যাহতি পেয়ে গেছে। তিনজন বিচারকের মধ্যে সবাই মূল আসামীর নিকটতম বন্ধু। এদের মধ্যে পাক-গণপরিষদের সদস্য ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট সর্বজনাব এন, এ, লস্কর, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর অরুণ প্রসাদ রায় চৌধুরী এবং অপর একজনের নাম এখন আর স্মরণে আসছে না। প্রকৃত ঘটনা মেয়েদের গ্রামের চেয়ারম্যান, মেম্বারগণ অবহিত হলে তারাও দুঃখ প্রকাশ করে মেয়েগুলির কর্মের জন্য তাদের তিরস্কার করে। কিন্তু তারাও সাক্ষী

তালিকাভুক্ত বিধায় তারা শুনানীর দিন কোর্টে হাজির হতেন। শুনানীর দিনে কোর্টে যেতাম, কারা কারা সাক্ষ্য দেয় দেখতে। এমনি একদিন কোর্ট বারান্দা দিয়ে চলার সময় হঠাৎ করে কালো বোরকা পরিহিত সেই মেয়েদের মধ্যেকার একজন আমার পা জড়িয়ে ধরে। আমি গ্রেফতারের ভয়ে কোন রকমে পা ছাড়িয়ে দৌড় দিলাম রাস্তার দিকে। মেয়েটি বোরকার নেকাব উঠিয়ে আমাকে নাম ধরে ডাকতে লাগলো এবং ক্ষমা চাইতে লাগলো। পেছনে পেছনে তাদের এলাকার চেয়ারম্যান মেম্বাররাও ছুটে এসেছে। সাহস সঞ্চার করে থমকে দাঁড়ালাম। তারা এ অন্যায় আচরণ ও মিথ্যে মামলার জন্য অনুশোচনা জানালো। ইতিমধ্যে তাদের আইনজীবিও উপস্থিত হলো। তারা আমাকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে মামলার পরিসমাপ্তি ঘটালো। হয়তো পূর্বথেকেই কেসের মূল আসামীদের এ ধরনের ইঙ্গিত ছিলো। যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, আর আমার কিছু হলে তাদের পক্ষে মহল্লায় থাকাও সম্ভব হবে না, এটাও তারা জানতো, কেননা এলাকার প্রায় সকল জনগণই আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

যাক সে কথা, থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার দেখতে যেমন সুন্দর ছিলেন, তার কথাবার্তাও ছিলো তেমনি অমায়িক। কিন্তু অন্তরটা ছিলো কলুষিত। অর্থলোভে আমার প্রতি তার এহেন ষড়যন্ত্রের জন্য সে সময় আল্লার কাছে তার শাস্তি দাবী করেছিলাম। দীর্ঘদিনে তিনি কয়েকধাপ প্রমোশন পেয়ে স্বাধীনতার পর এস, এস, আই, এর পদস্থ অফিসার হয়েছিলেন। বিগত সামরিক শাসনামলে নারী ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে সে চাকরীচ্যুত ও কারাদণ্ড ভোগ করে। একটা প্রবাদ বাক্য আছে, "আল্লাহ্র মাইর দুনিয়ার বাইর"। একদিন সে আমাকে নারী সংক্রান্ত মিথ্যা মামলায় জড়িত করেছিলো, আর সে অনেক উচ্চাসনে উঠে নিজেই নারী সংক্রান্ত মোকদ্দমায় দণ্ডভোগ করলো, আল্লাহ্ এভাবেই মিথ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন।

পাঠকবৃন্দ হয়তো আমার দীর্ঘ কাহিনী শুনে ধৈর্যহারা হয়েছেন। তাই এ ব্যাপারে আরো অনেক কথা থাকলেও আবার ফিরে যাই নারী ব্যবসায়ী দৌলতির কাহিনীতে। আদিযুগ থেকেই নারী দেহ নিয়ে খেলা করার ও নারীদেহ সম্ভোগের সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে পুরুষ জাতির মধ্যে। এটা স্রষ্টা বা প্রকৃতিরই চিরন্তন বিধান। তাই সব ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যেই দেখা যায় চরিত্রবান ধর্মীয় নেতা, পীর, শাহ্ সাহেব, সাধু, সন্যাসী, জাতীয় নেতা, সমাজপতি পুরুষদের কেউ কেহ ধর্মে বর্ণিত শাস্তি, সমাজ নিন্দা ও পারিবারিক অশান্তির কথা জেনে শুনেও সহসাই নারীদেহের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে লিপ্ত হয়ে যায় ঘৃণিত কাজে। সাধারণ মানুষ ভাবতেও পারেনা যে এ বিশেষ লোকটি

এসব কাজ করতে পারে। খবরের কাগজের পাতায় মাঝে মাঝেই দেখতে পাই ও শহর-গ্রামগঞ্জে শুনতে পাই এমনিতর ঘটনার কথা।

এবারে আসা যাক, সূফী দায়েমুল্লাহর অন্দর মহলে। রক্ষিতা প্রমোদবালাদের দেখাশুনার দায়িত্ব ছিলো, সূফী বেগমের উপর। দিন দিন তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হতে লাগলো। কারণ, আদালত কক্ষে যাওয়ার সময় অনেক রাতের সঙ্গী ও নতুন নতুন তরুণ যুবাদের হাতছানী মনকে পাগল করে তুলতো। তারা রঙ্গীন স্বপ্ন দেখতে লাগলো। ঢাকায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে, "কয়লার রং যায়না ধুইলে, আর খাসলাত যায়না মরলে" এদের বেলায়ও প্রবাদ বাক্যের কিছুটা বাস্তবতা দেখা গেলো। তারা সাজগোজ করার জন্য বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রীর সরবরাহ বৃদ্ধির দাবী জানালো। সূফী সাহেব তার নিয়মিত ব্যবস্থা করলেন। মামলার তারিখের পূর্বদিনে ওরা দাবী তুললো, তাদের ফুলের গহনা মালা দিতে হবে, তারা সাজগোজ করবে। বেচারা সূফী সাহেব তাদের দাবী পূরণ করলেন। সূফী সাহেব ঘরে না থাকলে তারা বেগম সাহেবাকে শুনিয়ে বলাবলি করতো, আমরা এখান থেকে চলে যাবো, নিজেদের ইচ্ছে মতো বিয়ে বসবো। এখানে নাচতে পারিনা, গাইতে পারিনা, বেড়াতে পারি না, সিনেমা দেখতে পারি না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুদিন পর সূফী সাহেবের নিকটও এসব কথার অবতারণা করলো। এবার সূফী সাহেব প্রমাদ গুণলেন। মামলার রায়ের পূর্বে যদি এরা চলে যায়, তবে তো সবই বৃথা। টাকা পয়সাও তো কম খরচ হচ্ছে না। দেন দরবারও কম করতে হচ্ছে না। এখন কি করা যায়। তাদের এসব আবদার রক্ষা করাতো সূফী সাহেবের বাড়িতে রেখে সম্ভব হতে পারে না। মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন তিনি, পরামর্শ করলেন সাথী সরকারী ও পুলিশের আমলাদের সঙ্গে। সকলেরই এক কথা। আর কিছু দিন অর্থাৎ অন্ততঃ মামলার শুনানী শেষ না হওয়া পর্যন্ত এদের যে কোন উপায়েই হোক, রাখতে হবে। আবারো সূফী সাহেব পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে আবেদন রাখলেন, এদের এক এক জনকে এককে জায়গায় রাখার জন্যে। এক স্থানে বলেই এরা বুদ্ধি পাকায়, জোট বাঁধে। বিপক্ষ দলের ভদ্রবেশী ভিতুর লোকেরা আকারে ইঙ্গিতে এদের প্রলোভন দেখায়। সূফী সাহেব এসব বুঝেন, তাই, প্রমোদ বালাদেরকে পুনরায় কোরআন স্পর্শ করে বলেন পূর্বের অঙ্গীকারের কথা। তিনি আরো বললেন, তোরা যাদের কাছে বিয়ে বসতে চাস্, তারা তো ভালো লোক নয়। এরা কিছুদিন রেখেই তোদের পরিত্যাগ করবে। এদের অনেকের স্ত্রী পুত্রও আছে। সূফী দায়েমুল্লাহ্ সাহেবের এসব আকুতি মিনতি উপেক্ষা করে তারা চলে যেতে চায়। মহা ফ্যাসাদে পড়লেন সূফী সাহেব। এবার ওদেরকে তিনি ভয় দেখালেন জ্বীন

ও দেও এর। ললনারা এখানে আসার পর সুফি সাহেবের পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে এ সবের কিছু কিছু কাহিনীও কিংবদন্তি শুনেছে। তাতে তাৎক্ষণিক কিছুটা ভয় পেলেও কিছুদিন পর আবার যেমন সেই তেমন। একদিন সূফী সাহেব বাইরে গেছেন, সুযোগ পেয়ে ললনারা জোট বাঁধলো, আজ তারা চলে যাবেই। যার যার পোটলা পুঁটলি বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেছে। বেগম সাহেবা তাদেরকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। শেষ পর্যন্ত কোরআন শরীফ স্পর্শ করার কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং তার ভয় দেখিয়ে শুধু এই টুকু আবদার রাখলেন যে, চলে যখন যাবেই, তবে এতোদিন যে তোদেরকে নিজ মেয়ের মতো স্নেহ দিয়ে লালন পালন করেছে তার সঙ্গে দেখা করে অনুমতি নিয়ে যা। নতুবা কোরানের গজব তোদের উপর পড়বে। এবার তারা শুনলো তার কথা। সূফী সাহেব বাড়ি এসে দেখলেন, বাড়িটি যেন নিঝুম, কোন সাড়া নেই, নেই ললনাদের হৈ চৈ কোলাহল। বেগম সাহেবাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি করেছো, কি বলেছো এদের, তারা কাচুমাচু করে আস্তে করে বললো, আমরা এখই চলে যাবো, শুধু আপনার শেষ সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছি।

সূফী সাহেবের স্বপ্ন ভেস্তে চলেছে। পাপাচারিণী দৌলতিরই জয় হতে যাচ্ছে। বহু কাকুতি-মিনতি করলেন মেয়েদের কাছে আরো কিছুদিন থাকার জন্যে। আরো আরাম আয়েশে রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। না, কোন কথাই যেন তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে না। তাদের এক কথা, আজ তারা চলে যাবেই। শেষ পর্যন্ত কিছু সময় অপেক্ষা করার এবং যাবার প্রাক্কালে পথ খরচা কিছু নিয়ে যাবার আশ্বাস দিয়ে তিনি তার হুজুরের দরগাহ্ সংলগ্ন মসজিদে গিয়ে সেজদায় রত হয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট তার দীর্ঘদিনের সামাজিক সংগ্রাম, হৃদয়ের ফরিয়াদ জানাতে লাগলেন। মনের সকল আকুতি-মিনতি দিয়ে প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে গেলেন সমাজের ইজ্জত রক্ষার জন্যে। সময় অনেক গড়িয়ে গেলো। সেজদা থেকে মাথা উঠাচ্ছেন না তিনি। ওদিকে সূফী সাহেবের বাড়িতে প্রবল ইস্টক বর্ষণ হচ্ছে। কোথা থেকে কারা মারছে, কেউ বুঝতে পারছেনা। ললনারা প্রথমে মনে করেছিলো, এ বাড়ি থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে তাদের প্রেমিকগণ এরূপ করছে যাতে সূফী সাহেবের পরিবারবর্গ তাদের উদ্ধারে বাধাদান না করে। তাই তারা জটলা বেঁধে চুপি চুপি ঘরের বারান্দায় এসে এদিক সেদিক তাকাতাকি করতে গিয়ে তাদের ক'জন দেখলো এক দৈত্যের মতো বিশাল দেহী এক পা বাড়ির গাছে আর এক পা মসজিদের দিকে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখেই তারা হৈ চৈ ও আর্ত চিৎকার

করতে শুরু করলো – বাঁচাও, বাঁচাও বলে। তাদের এই ভীষণ চীৎকারে সূফী দায়েমুল্লাহ্ সেজদা থেকে উঠে তড়িৎ বেগে বাসার ভেতর ঢুকলেন। তাকে দেখে মেয়েরা চীৎকার করে বলতে লাগলো – ব্বাবা, আগে দেওকে তাড়ান, আমরা এখানেই থাকবো, যাবো না কোথাও, কসম করে বলছি। যতদিন যেভাবে আপনি রাখবেন সে ভাবেই থাকবো। সূফী বাইরে এসে দেখলেন, কোথায়, কিছুই তো নেই। কি দেখলো তারা। পরক্ষণেই মনে পড়লো, সেজদায় গিয়ে এদের জন্যেই তো মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন, সমাজের মান ইজ্জত আর পাপাচারের বিরুদ্ধে জেহাদে কামিয়াবীর জন্য। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তার করুণ আবেদন গ্রহণ করেছেন। তাই, ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছেন কুপথে চলা মেয়েগুলোকে। তিনি খোদার কাছে অশেষ শুকরিয়া জানালেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। যখন দেখলেন যে, মেয়েগুলো শুধু চিৎকার করছে, জ্বীন তাড়াবার জন্যে, আর ওয়াদা করছে তার কথামতো চলতে, থাকতে, তখন তাদের আশ্বাস দিলেন জ্বীন চলে গেছে – এসে দেখো, তারা তখন কম্পিত বদনে এসে দেখলো, সত্যিই সে বিশাল দেহী দৈত্যের মতো জ্বীনটা আর নেই। তখন তারা তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো। আল্লাহ পাক এভাবেই মাঝে মাঝে তাঁর পথে চলমান ব্যক্তিদের সহায়তা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান।

এরপরও কিছুদিন মামলার শুনানী চললো। আসামী পক্ষও চুপ করে বসে নাই। দৌলতির যাতে কোন সাজা না হয়। দেন দরবার উচু মহলের সবস্থানেই চললো। অগত্যা, তিন বছর পর একদিন রায় বের হলো। কিন্তু দৌলতির কারাদণ্ডের বদলে মোটা অর্থ জরিমানা, অনাদায়ে জেল হলো। বাকী আসামীদেরও জেল জরিমানা কিছু কিছু হলো। দৌলতির পক্ষে জরিমানার টাকা প্রদানের লোকের অভাব ছিলো না। জরিমানা আদায় করে সে আসলো বাড়িতে। অন্যদিকে মামলার বাদী, প্রধান প্রধান সরকারী সাক্ষীগণও দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবার তার অবসান হওয়ায় আর তাদের ইপ্সিত কামিয়াবী হাসিল সর্বোপরি আজিমপুর হতে অবৈধ দেহ ব্যবসা কেন্দ্রটি সমূলে বন্ধ হওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে মসজিদে এসে শুকরিয়া নামাজ আদায় করলেন। এই কুখ্যাত মামলার অবসানের পর প্রধান আসামী দৌলতির মনের ভাবান্তর ঘটলো। একদিন সে ছোট দায়রায় এসে বহু বিশিষ্ট লোকের উপস্থিতিতে তওবা করে সূফী সৈয়দ দায়েমুল্লাহ্‌র নিকট মুরিদ হলো। তারপর সে তার বাকি জীবন সাদাসিধে ভাবেই কাটালো। ঐ ঘৃণ্য পথে সে আর কোনদিন যায়নি। অন্যদিকে সূফী সাহেবও কতিপয় মেয়ের বিবাহ দিলেন। এভাবেই

সত্য ও ন্যায়ের জয় হলো। যবনিকা ঘটলো ঢাকার আজিমপুর অঞ্চলের এক কলংকময় অধ্যায়ের।

এ মামলার প্রতিক্রিয়া বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত আদালতগুলোকে প্রভাবিত করে রেখেছিলো। দৌলতির পক্ষের সাক্ষ্য প্রদানকারীদের সমাজের ভালো লোকেরা যেমন ঘৃণার চক্ষে দেখতো, তেমনি আদালতগুলোও এদের সাক্ষী সত্য বলে গ্রহণ করতেন না। এমনি একটি ঘটনা ঘটলো ১৯৫৯ সালে আমাদের সঙ্গে। আমার এক বিত্তশালী আত্মীয় আমাদের আজকের আজাদ মুসলিম মহিলা কেন্দ্রের জমিটির দখল নিয়ে আমাদের আজাদ মুসলিম ক্লাবের আটজন সক্রিয় কর্মীকে মিথ্যে চুরি ও জবরদখলি মামলায় জড়িয়ে দিলেন। আমি হলাম এ মামলার প্রধান আসামী। মামলায় বলা হলো, তার দখলীয় বাড়ি আমরা জোরপূর্বক দখল ও ১৮০ টাকা মূল্যের মহিষের শিং-এর গুরো চুরি করে নিয়ে গেছি। পুলিশ তদন্ত করলো। তদন্তে আমরা আশান্বিত হলাম যে, সত্য ঘটনা পুলিশ অনুধাবন করতে পেরেছে। আমাদের সঙ্গে পুলিশ সে ভূমিকাও করে গেছেন। কিন্তু সেই যে কথায় বলে, "অর্থই যতো অনর্থের মূল"। সেটারই জয় হলো। আমাদের সবার বিরুদ্ধেই পুলিশ চার্জশীট দিলো। হাজির হতে হলো আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়। স্থানীয়ভাবে এ মামলার নিষ্পত্তির শত চেষ্টা করেও কোন ফল হলো না। মামলা এক কোর্ট থেকে অন্য কোর্টে বদলী হতে লাগলো। আমরাও নাছোড়বান্দা। মামলা চালিয়ে যেতে লাগলাম। মামলার ঘটনার দিনে আসামীদের সবাই যেমন ছিলো না, তেমনি সাক্ষীদেরও কেহই ছিলো না। সব সাক্ষীকেই তৈরী করে নেওয়া হয়েছে। যাদের সঙ্গে আমাদের ক্লাব ও রাজনৈতিক বিরোধ ছিলো তারাই এর সাক্ষী। সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ নির্ধারিত হলো। আমরা দুশ্চিন্তায় ভুগছি। সহসাই আমার মনে পড়লো, সাক্ষীদের প্রধান দু'জন দৌলতির পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলো। কাউকে কিছু না জানিয়ে ঐ দু'জনের সাক্ষ্যদানের নকল সংগ্রহ করলাম কোর্ট থেকে। সাক্ষ্য দিবসে সাক্ষ্য দেওয়া আরম্ভ হলো। প্রথম সাক্ষী কাঠগড়ায় দাড়িয়ে হলফ করার পরই আমাদের উকিল সাহেবকে কাছে ডেকে বললাম, তাকে প্রশ্ন করার জন্যে যে কুখ্যাত দৌলতির পক্ষে সাক্ষ্যদান করেছিলো কিনা? প্রশ্নের উত্তরে সে অস্বীকার করলে, উত্তোলিত নকলখানা উকিল সাহেবের হাতে দিলাম মাননীয় বিচারকের হাতে দিবার জন্যে। বিচারক নকলটি দেখেই তাকে কাঠগড়া থেকে নেমে যেতে বললেন। ২য় সাক্ষীকে ডাকা হলো। তাকেও একই প্রশ্ন করা হলে সেও তা' অস্বীকার করলো। তার সাক্ষ্যের নকলখানাও আদালতে হাজির করা হলে তাকেও

নেমে যেতে বলা হলো সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে। এ অবস্থা দেখে তাদের প্রখ্যাত উকিল, আজকের প্রথম কাতারের রাজনীতিবিদ সুকৌশলে মামলার শুনানী স্থগিতের ব্যবস্থা করলেন। শুনানী মুলতবী হলে, সাক্ষীরা ও আমাদের সকলেই অবাক হলো, এসব কাগজপত্র কেমন করে সংগ্রহ করলাম। জবাব দিলাম, "ঠেকলেই মানুষ শেখে", পরিস্থিতিই সময়ে বুদ্ধি যুগিয়ে দেয়।

সমাজে ও আদালতে দৌলতির পক্ষের সাক্ষীদের মিথ্যেবাদী ও চরিত্রহীন বলে মনে করা হতো সে সময়ে। চতুর ও ঘৃণিত পাপাচারীরা এখানে না হয় অন্যত্র তাদের পাপকর্ম চালাবেই। ওরা আল্লাহকে ভয় করেনা। করে না সমাজ ও দেশের আইনকে। এ প্রসংঙ্গে এক প্রবীণ রাজনীতিবিদের বলা একটা কেচ্ছা মনে পড়লো। এক চতুর দুশ্চরিত্র সমাজবিরোধী সারাজীবন সমাজকে ধোকা দিয়েছে। মৃত্যুকালে সে তার পুত্রদের অসিয়ত করলো – মৃত্যুর পর যেন তাকে পুরনো কবরে, পুরনো কাপড়ের কাফন পরিয়ে, পুরনো বাঁশ চাঁটাই দিয়ে সমাহিত করা হয়। পুত্ররা এর কারণ কি জানতে চাইলে সে বললো, সারাজীবন সমাজকে, আইনকে, রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদেরকে ধোকা দিয়েছি, বোকা বানিয়েছি। তো, পরলোকে গিয়ে কি কিছুই করতে পারবো না? তাই, যা' বলছি, তাই করবে। এর অন্যথা যেন না হয়। মৃত্যুর পর তাকে তার কথামতোই দাফন করা হলো। এবার মুনকির নাকির ফেরেস্তাগণের সওয়াল জওয়াবের পালা। তারা কবরে ঢুকেই সওয়াল আরম্ভ করতেই মূর্দা বলে উঠলো, আমার সওয়াল জওয়াব হয়ে গেছে। ফেরেস্তারা তার কথা শুনে অবাক। তাঁরা বললেন, তোমার তো মৃত্যুই হয়েছে আজকে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে তোমাকে দাফন করা হয়েছে। মূর্দা আবার বলে উঠলো তোমরা ভুল করছো, আমার মৃত্যু বহু পূর্বেই হয়েছে। দেখছোনা এটা পুরনো কবর? কাফন, বাঁশ-চাটাই সব কিছুই পুরনো। যাও নতুন কবর তালাশ কর। ফেরেস্তারা দেখলেন, সত্যিই তো সব কিছুই যে পুরনো। কিন্তু নামতো ঠিক আছে। মূর্দা যুক্তি দেখালো, এক নামে কি আরো বহু লোকের নাম হয় না? এবার সত্যিই ফেরেস্তারা ভাবনায় পড়ে গেলেন। তাদের একজন বললেন, চলো, আজরাঈলের কাছে জিজ্ঞেস করে আসা যাক, আসলে এ লোক কিনা! মূর্দা কিছুক্ষণের জন্যে রেহাই পেলো। পুনরায় ফেরেস্তারা এসে সাওয়াল করার সাথে সাথে মূর্দা বললো কবরস্থ হবার পর একবারই সাওয়াল জবাবের বিধান রয়েছে। তোমরা সওয়াল করে জবাব শুনে গেছো। এবার অন্যত্র যাও। ফেরেস্তাগণ অবাক বিস্ময়ে স্থির। থাক এ কথা এবার অন্য ঘটনায় যাচ্ছি।

আজিমপুর রোডে একটি ঐতিহাসিক আখড়া রয়েছে বহু যুগ-যুগান্তর থেকে,

কথিত আছে যে, ইহা দিল্লী-সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকে এখানে রয়েছে যা "রামবাগের আখড়া" নামে পরিচিত। মোঘল ও বৃটিশ যুগ থেকে পাক আমল পর্যন্ত ভারত বর্ষের বহুনেতা, উপনেতা, ধর্মনেতা ও সাধু-সন্নাসী ইঁহা পরিদর্শন করে গেছেন। আজিমপুর দায়েরা শরীফ প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরই এ আখড়ার গোড়া পত্তন হয়। এরও এক বিরাট কাহিনী রয়েছে। রয়েছে অনেক কিংবদন্তী। এখানে রাম নামের উপাসনা হয় বলেই এর নাম হয়েছে রামবাগ।

রামবাগ এলাকাটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিলো। মানব বসতি ছিলোই না। গুদ্ধার দাস বাবাজী নামে এক সিদ্ধ পুরুষ এই জঙ্গলে এসে তপস্যায় মগ্ন হলেন। আখড়ার পূর্বদিকে অবস্থিত দায়েরা শরীফ থেকে যখন আজান ধ্বনী উচ্চারিত হতো বিশেষ করে আছর ও মাগরিবের কালে, তখন জঙ্গল হতে আগত শংখ ধ্বনীর আওয়াজ তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতো। এ আওয়াজ কে বা কারা করে এবং কোন্ স্থান হতে উচ্চারিত হয়, তা দেখার জন্যে জঙ্গলের অনেক স্থান পরিস্কার করে ফেলা হলো। তবুও আওয়াজকারীর সন্ধান মিললো না। অগত্যা বিষয়টি সুবে বাংলার শাহী প্রতিনিধির কর্ণগোচর করলেন দায়েরা শরীফে আগত মুসলমানরা। শাহী প্রতিনিধি হাতীর উপর সওয়ার হয়ে আগমন করলেন রামবাগ এলাকায়। খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হলো। একদিন দেখা গেলো, এক সাধু পুরুষ গায়ে ভস্ম মেখে তপস্যায় নিমগ্ন। মুখে কোন কথা নেই। এক মনে এক ধ্যানে রামনামের উপাসনা চলছে। শাহী প্রতিনিধি এদিন চলে গেলেন। পুনরায় একদিন এসে ভীষণ শীতের জন্যে সাধুর গায়ে একটি মূল্যবান পশমী চাদর জড়িয়ে দিলেন। সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেলা। দেখলেন, মহা মূল্যবান পোষাকাদি পরিহিত শাহী প্রতিনিধি ও অমাত্যবর্গ তাঁর নিকটে দাড়িয়ে এবং তাঁর নিজের গায়েও একটি মূল্যবান সুন্দর শাল। তিনি চুটা (চিমটা) দিয়ে নিজ গায়ের শালটি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। মূল্যবান চাদরটি আগুণে পুড়িয়ে ফেলার ফলে রাজ প্রতিনিধি মনোকষ্ট নিয়ে ফিরে গেলেন। আবার একদিন এসে তিনি সাধু বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি তার দেওয়া শালটি আগুণে পুড়িয়ে ফেললেন। সাধুজী তার চুটা দিয়ে অগ্নিকুণ্ড হতে বিভিন্ন রং এর কতক শাল বের করে রাজ প্রতিনিধিকে বললেন দেখুন, এখানে কোনটা আপনার শাল, তা নিয়ে যান। তপস্যাকারীদের শাল তো এই অগ্নিকুণ্ডের ভস্ম। এই অলৌকিক ঘটনা বাংলার সুবেদারের কর্ণগোচর হলো। শাহী প্রতিনিধি পুনঃ এসে জানালেন – আপনার শংখ ধ্বনী দ্বারা পার্শ্ববর্তী মসজিদের এবাদতকারীদের এবাদত বন্দেগীতে অসুবিধা হয়। আপনি শংখ আওয়াজ ঐ সময়ে বন্ধ রাখুন অথবা নিম্নস্বরে আওয়াজ করুন। তাছাড়া

আপনি কি করলে এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেন তা জানিয়ে দিলে আমরা বাধিত হবো। সাধু তাকে জঙ্গলের একটি অংশ প্রদানের জন্য বললে – রাজ প্রতিনিধি তাতে সম্মতি জানিয়ে স্থানটি দেখিয়ে দেবার অনুরোধ জানান। সাধু তার হাতের ইশারায় এলাকাটি দেখালে সঙ্গে সঙ্গে এলাকার চারিদিকে একটি প্রাচীর তৈরী হয়ে যায়। এর সীমানা ছিলো উত্তরে বর্তমান পীলখানা রোড, পশ্চিমে ভাট মসজিদ মহল্লা, দক্ষিণে বর্তমান লালবাগ রোডের পশ্চিমাঞ্চলের গলিপথ, পূর্বে দায়রা শরীফের পশ্চিম সীমানা। সাধুর ইঙ্গিতে যেদিন প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত হলো সেদিন থেকে আর প্রাচীরের বাইরে শংখধ্বনী শোনা যেতো না। শাহী প্রতিনিধি একদিন সুপেয় খাদ্যদ্রব্য পাঠালেন সাধুর নিকট। সাধুর ইঙ্গিতে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা নামানো হলে দেখা গেলো অনেক ফল-ফুল, তা থেকে সাধু একটি ফল নিলেন। বাকীগুলো ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদেরকেই খেতে বললেন।

এরপর অন্যান্য ঘটনার মধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটে। একদিন সাধু বাঘের উপর সওয়ার হয়ে দায়েরা শরীফের নিকট ভ্রমণ করছিলেন, সে সময় দায়েরা শরীফের শাহ্ সূফী হজরত দায়েম প্রাচীরের উপর বসে দাতে মেশওয়াক করছিলেন, তিনি এ দৃশ্য দেখে প্রাচীরকে এগুতে বললেন, প্রাচীর এগুতে লাগলো উভয়ে নিকটবর্তী হলে আলাপের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। এদিন থেকে উভয়ে উভয়ের নিকট খাদ্যদ্রব্য পাঠাতেন বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ। সেগুলো যথাস্থানে পৌছুলে ফল-ফুলে পরিণত হয়ে যেতো অবশ্য এ কাহিনী সম্পর্কে দায়েরা শরীফের বক্তব্য কিছুটা ভিন্নতর। যাহোক, এভাবেই দায়েরা শরীফের সূফী দায়েম ও রামবাগের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মোহন্ত গুদ্ধার দাস বাবাজীর মধ্যে পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো। আর তা বহুকাল পর্যন্ত অটুট ছিলো। মোহন্ত বাবাজীর ও সূফী দায়েমের এসব অলৌকিক ঘটনার কথা ঢাকাবাসী হিন্দু মুসলমানের নিকট প্রচার হতে লাগলো। ফলে হিন্দু মুসলিমের আগমন ঘটতে লাগলো রামবাগ আখড়া ও দায়েরা শরীফে। অনেকে তাদের শিষ্যত্ব বরণ করলো। দীক্ষিত হলো তাদের ধর্মকর্মে। অন্যদিকে ঢাকাবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ প্রসারিত হলো রামবাগ ও দায়েরা শরীফের প্রতি।

বাবাজী গুদ্ধার দাস ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। তবে কোন্ প্রদেশ থেকে এসেছিলেন তা জানা যায় নি। তিনি রামবাগে শুধু তপস্যা করেছেন একটি নির্দিষ্ট স্থানে। কোন মন্দির বা বিগ্রহ তিনি প্রতিষ্ঠা করেননি সেখানে। তার তপস্যার স্থানটি মনে হয় গর্তের মধ্যে ছিলো। কেননা, পরবর্তীতে যে পাকা দালান

সেখানে তৈরী হয়েছে, সেস্থানটি সমতল ভূমি থেকে অনেক নীচু।

রামবাগের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একজন দরবেশও আস্তানা গেড়েছিলেন। তিনি ভূগর্ভে গর্ত করে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হতেন। বর্তমানে সেস্থানটি পাকা করে রাখা হয়েছে। কথিত হয়, এ দরবেশও মোহন্তের সঙ্গে মাটির নীচ দিয়েই যোগাযোগ করতেন। মোহন্ত গুদ্ধার দাস বাবাজী স্বর্গবাসী হলে তার চিতাভস্মের উপর রামবাগেই সমাধি মন্দির নির্মিত হয়। প্রথম মোহন্তের পর ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত সাধু নারায়ণ দাস ২য় মোহন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায়। হিমালয়ের বদরি মন্দিরে যাত্রাকালে পথে যে সব ঘটনা ঘটে তা পরবর্তীতে শহরময় প্রচারিত হয়। তার সমাধিমন্দির ভারতের মধ্য প্রদেশে রয়েছে।

অতঃপর তৃতীয় মোহন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাবাজী পরশুরাম দাস। তিনিও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায়। অর্থাৎ তিনি যাকে যে কথা বলতেন সে কথা ফলপ্রসু হতো। মোহন্ত পরশুরামের সময় রামবাগে অষ্ট ধাতুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপূর্বে এখানে কোন মূর্তি বা বিগ্রহ ছিলোনা। এবং মূর্তি বা বিগ্রহের পূজাও হতো না। হতো শুধু রামের উপাসনা। আর মহাবীরের উপাসনা। এমন রীতি আছে যে, যেখানে রামের উপাসনা হবে সেখানে মহাবীরেরও উপাসনা হবে। এ আখড়ায় যারাই মোহন্তের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন, তারা সকলেই রামানন্দী সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু বা মোহন্তগণ অন্য শ্রেণীভুক্ত মন্দির যেখানে কালী বা দূর্গা পূজা হয়, সে মন্দিরের প্রসাদ ভক্ষণ করেন না।

মোহন্ত পরশুরামের ইহধাম ত্যাগের পর প্রয়াগ দাস চতুর্থ মোহন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পর দেবাদাস ৫ম মোহন্ত মনোনীত হন। দেবাদাস মহাবীরের উপাসনায় মগ্ন থাকতেন বলে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। শহরের অনেক সন্তানহীন, বিত্তবান ব্যক্তি তাঁর শরণাপন্ন হতেন। তাদের মধ্যে যাকে তিনি সন্তানের আশ্বাস দিতেন তাদের ঠিকই সন্তান হতো। কথিত আছে, ঢাকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্তান না হওয়ায় তাঁর দ্বারস্থ হলে তিনি তাদের কথা দিয়েছিলেন যে সন্তান হবে। তন্মধ্যে আমাদের অঞ্চলের বাবু নীলাম্বর সাহা যার নামে নীলাম্বর সাহা রোড এবং নবাবগঞ্জ পানি ট্যাংকির নিকট বিত্তশালী গোপাল সাহা অন্যতম। তবে গোপাল সাহা বাবাজীর নিকট যে মানত করেছিলেন তা পূর্ণ না করায় তার সন্তানটির মৃত্যু ঘটে।

বর্তমানে মোহন্তের চতুর্ভূজ দাসের বয়স ৮০ বছর। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে

মার্চ মাসে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তিনি আখড়া ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন এক চক্রান্তের কারণে। চলে যাবার পরই মন্দিরের অষ্টধাতুর মূর্তিগুলো অপহৃত হয়। সেই সঙ্গে মূল্যবান সামগ্রীগুলোও। তিনি আরো জানান, এখনো বেশ কয়েকজন মোহন্তের সমাধি অটুট রয়েছে। তপস্যার স্থানও সংরক্ষিত আছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, রামবাগের পূর্ব-দক্ষিণে এক দরবেশ আস্তানা গেড়েছিলেন পূর্বেই। তার পরিচয় পাওয়া যায় শাহ্ দরবার নামে। তাঁর পূর্ণ পরিচয় কেউ বলতে পারে না। তবে এটুকু জানা যায়, তিনি ময়মনসিংহের নাসিরাবাদের অধিবাসী ছিলেন। এখানে হয়তো তিনি ভক্তদের নিয়ে দরবার বসাতেন, তজ্জন্যই দরবার শাহ্ নামে তিনি সকলের নিকট পরিচিত। গম্বুজের ভেতরে শাহ্ দরবার ও বাইরে রয়েছে শাহ্ কামালের মাজার। এ মাজার ও এবাদতগাহ্খানা দায়েরা শরীফ প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই রয়েছে। শাহ্ দরবারের মাজারের পেছনে ছোট বড় বেশ কয়েকটি কবর আছে। আরো রয়েছে ভূগর্ভস্থ এবাদতগাহ্ যা পরবর্তীতে খননকালে আবিস্কৃত হয়। বর্তমানে সে স্থানটি আরো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। কিছুকাল পূর্বেও মাজারটি জরাজীর্ণ ও বাঁশঝাড়ে ও লতাগুল্মে পরিপূর্ণ ছিলো। আমাদের আজাদ মুসলিম ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্য জুম্মন মিয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাজার ও তৎসংলগ্ন মসজিদটি নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। জুম্মন মিয়াই মাজারের খাদেম ছিলেন। মাজার ও মসজিদটি নতুন আঙ্গিকে নির্মাণ করালেও মাজারের পেছনে বাঁশ গাছের একটা ঝাঁড় এখনো রয়েছে।

এই ঐতিহাসিক আজিমপুরে রয়েছে প্রখ্যাত সূফী বুজুর্গানে দ্বীন হজরত দায়েমের খানকাহ্। যা সবার নিকট দায়রা শরীফ নামে পরিচিত। দায়রা অর্থাৎ সীমারেখা। এ দায়রা শরীফে সূফী ও সাধকগণ বংশানুক্রমে বসবাস করে আসছেন। যাঁরা খানকায় অধিষ্ঠিত হন, তাঁরা একমাত্র হজব্রত পালন এবং জিয়ারত ব্যতীত খানকাহ্ তথা দায়রা চত্বরের বাইরে পদার্পন করেন না। এই খানকাহ্র প্রতিষ্ঠাতা সূফী মুহাম্মদ দায়েম চট্টগ্রাম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন খাদেমসহ ঢাকায় এসে প্রথমে মিয়া সাহেব ময়দানস্থিত পীর হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করতঃ আমলিগোলা অঞ্চলে পূর্ব বাংলায় মুঘলদের শেষকীর্তি খান মোহাম্মদ মসজিদে আস্তানা গাড়েন। তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবাল বৃদ্ধ বণিতারা এসে হাজির হলো তাঁর আস্তানায়। কেহ রোগ শোক থেকে মুক্তি পাবার আশায়, কেউবা ধর্মতত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্যে। এখানে অত্যাধিক ভীড় হতে থাকায় তিনি খান মোহাম্মদ মসজিদ হতে আজিমপুরে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে

থাকেন। সে সময় আজিমপুরের এ অঞ্চলটি ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো। সেখানেও লোকজনের আগমন ঘটতে লাগলো দিনের পর দিন।

১৭৬৯ সালে তিনি এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। যা পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে আজ অবধি রয়েছে। এ মসজিদ সংলগ্ন একটি রওজা রয়েছ। এ রওজা অভ্যন্তরে এ বংশের সূফীগণ সমাহিত হয়ে আছেন। এর বহিঃপ্রাঙ্গনে বাংলার বহু বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে রওজার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমার মরহুম পিতা রহিম বখ্স ও উত্তর-পশ্চিমে আমার নানা মরহুম হাজী হাফেজ মাহবুব বখ্স চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। নানা হাফেজ মাহবুব বখ্স এ দায়রা শরীফ মসজিদে বহুদিন ঈমামতি করেছেন। এ সকল ব্যক্তির মনে এই বিশ্বাস ছিলো যে, এখানে তাঁদেরকে কবর দেওয়া হলে পরকালে মুক্তির পথ সুগম হবে।

দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা ও পরবর্তী সূফীদের সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এর পশ্চিম পাশে রয়েছে রামবাগের আখড়া। তখনকার দিনে এখানে বহু সন্ন্যাসী ও সিদ্ধপুরুষ থাকতেন। এঁদের নিয়েই অধিকাংশ কাহিনী গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্যে যে ক'জন বুজুর্গানে দ্বীন ও দরবেশ আগমন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হজরত বখতিয়ার মাহী সাওয়ার (রহঃ) বোগদাদী অন্যতম। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাধক পুরুষ ছিলেন তিনি। কথিত আছে যে আওলাদে রাসুল তাপস কূল শিরোমণি পীরানে পীর দস্তগীর বড়পীর হজরত গাওসুল আজম সৈয়দ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর সুযোগ্য বংশধর হযরত সৈয়দ বখতিয়ার (রহঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে পূর্ববঙ্গে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের জন্য বোগদাদের ঐতিহাসিক ফোরাত নদী থেকে মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে পারশ্য সাগর, আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি অতিক্রম করে চট্টগ্রামের কর্ণফূলী নদীতে প্রবেশ করলে হঠাৎ গায়েব থেকে এক আওয়াজ ধ্বনীত হয় হা-উলায়ে, অর্থাৎ ইহাই গন্তব্যস্থল। সাধক বখতিয়ার (রহঃ) গায়েবী আওয়াজ শুনে আকাশ পানে চাইলেন। আবার গায়েবী আওয়াজ ধ্বনিত হলো– উনজুর এয়া বখতিয়ার, হা-উলায়ে। এ আওয়াজ শোনার পর সোয়ারী মাছ স্বেচ্ছায় হযরত বখতিয়ারকে কর্ণফুলী নদীর তীরে নামিয়ে দিলো। সে সময়ে নদী তীরে কর্মরত কিছু লোকও এ আওয়াজ শুনেছিলো। তারা পরবর্তীতে হা-উলায়ের উচ্চারণ বিকৃত করে কর্ণফুলীর সে অংশটির নামকরণ করে হাওলদা, যা আজ হাওলদা নদী নামে পরিচিত। যে মাছ মহান সাধক বখতিয়ারকে পিঠে বহন করে এনেছিলো সে মাছের বংশধর এখনো সে নদীতে আছে। মহান সাধককে বহন

করায় সে মাছের মধ্যেও অলৌকিক বিশেষত্বের উদ্ভব হয়। সাধারণতঃ এ জাতীয় মাছ সরাসরি পোনা দিয়ে থাকে। এদের সরাসরি ডিম দেওয়ার নজির কোথাও নেই। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এ মাছের বংশধরেরা হাওলদা নদীতে সারিবদ্ধভাবে একটানা ডিম প্রসব করে। আল্লাহর এ মহিমা দেখার জন্যে সে অঞ্চলে দেশী-বিদেশী প্রচুর লোক সমাগম হয়। এ মাছের ডিম বিক্রয় করে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারও লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে থাকেন। মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে সাধক বখতিয়ার (রহঃ) বাংলায় এসেছিলেন বলে তাঁর নামের সাথে মাহী সওয়ার বিশেষণ সংযুক্ত হয়। সংক্ষিপ্তভাবে হযরত সৈয়দ বখতিয়ার মাহী নামেই সুপরিচিত। এই মহান সাধক মাছের পিঠ হতে যেস্থানে প্রথম অবতরণ করে চরণদ্বয় রেখেছিলেন, সে স্থানটি চরণদ্বীপ নামে অভিহিত এবং নদী তীরের বালুচর অতিক্রম করে বসবাস উপযোগী যে স্থানে প্রথম খড়ম পায়ে পরিধান করেছিলেন, সে স্থানটি খড়মদ্বীপ নামে পরিচিত।

ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করে অমুসলিম অঞ্চলকে ইসলামের আলোকে আলোকোজ্জ্বল করে তিনি হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কামোয়াজ্জেমায় গমণকালে তার বংশধর সৈয়দ জাহান ও সৈয়দ জিয়াকে রেখে যান। সৈয়দ জাহান মালয়েশিয়া গমণ করে সেথায় ইসলাম প্রচার করেন। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধান মন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান তাঁরই বংশধর। অপরদিকে সৈয়দ জিয়া ও তার বংশধরগণ চট্টগ্রামের বোয়ালখালি উপজেলায় যে অঞ্চলে বাসবাস করতেন সে অঞ্চলটি সৈয়দপুর নামে পরিচিত হয়। তার বংশধরদের পবিত্র মাজার সে গাঁয়েই রয়েছে। সৈয়দ জিয়া হজব্রত পালন করতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। তাঁর বংশধরগণ চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে ইসলাম প্রচার করে অবশেষে ফেনী নদীর মোহনায় খাইয়ারা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হন। সেই বংশধরের হযরত সৈয়দ আমিন (রাঃ) এর কণিষ্ঠপুত্র সূফী দায়েমকে মাতৃগর্ভে রেখেই হজব্রত পালন কল্পে মক্কায় গিয়ে আর ফিরে আসেননি। হজরত দায়েম ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই তার মহিয়ষী মাতা স্বামীর নির্দেশ মতো তার নাম রাখেন মুঃ দায়েম। তারপর মায়ের তত্বাবধানেই স্থানীয় মাদ্রাসায় তার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। অতঃপর চট্টগ্রাম নগরীর লালদীঘির পূর্বপাড়ের জঙ্গলে অবস্থানরত তৎকালীন বিখ্যাত দরবেশ সুলতানুল আউলিয়া হজরত শাহ্ আমানত উল্লাহ্ (রঃ) এর নিকট মায়ের অনুমতিক্রমে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। সে সময় শাহ্ আমানত (রহঃ) এর সুখ্যাতি সর্বত্র প্রসারলাভ করেছিলো। তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েই

সূফী দায়েমের চট্টগ্রামে আগমন। সুদীর্ঘ একযুগ তিনি তার খেদমতে অবস্থান করে এলমে তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের জ্ঞান লাভ করেন।

একদা শীতের প্রত্যুষে ফজরের নামাজ আদায় করে হজরত আমানত শাহ্ (রহঃ) তাঁর মুরিদানকে নিয়ে খানকায় বসে ছিলেন। এমন সময় তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিবলে দেখতে পেলেন প্রায় দু'ক্রোশ দূরে এক বৃদ্ধা গাছ থেকে একটি লাউ কেটে নিয়ে যাচ্ছেন। এ দেখে তার প্রধান শিষ্য সূফী দায়েমকে তিনি আদেশ দিলেন, "দেখো তো, এই বুড়ি এতো সকালে সন্তানকে তার মায়ের কাছ থেকে আলাদা করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?" একথা শুনে তিনি সেখান থেকে আওয়াজ দিলেন, "বুড়ি লাউটা আমাকে দিয়ে যাও।" সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কুদরতে তাদের উভয়ের মধ্যেকার দূরত্ব কমে গেলো। বুড়ি এসে হাজির হলো তার সামনে। অমনি বুড়ির কাছ থেকে লাউ নিয়ে বললেন, "লাউ তুমি যে স্থানে ছিলে সে স্থানেই চলে যাও।" অমনি লাউ গাছের যথাস্থানে সংযুক্ত হয়ে গেলো। এ দৃশ্য অবলোকন করে হজরত আমানত শাহ্ (রহঃ) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। এবং সূফী দায়েমের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাকে এ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করলেন। তজ্জন্য সূফী দায়েম গভীর দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হজরত আমানত শাহ্ কিছুতেই তাকে ক্ষমা করলেন না। ফলে, দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দেওয়ানা হয়ে তিনি হিন্দুস্থানের পশ্চিমবঙ্গের দিকে রওয়ানা হন। পথে তিনি অনেক আওলিয়া দরবেশের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাদের নিকট থেকে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা সকলেই বাবা আমানতের খেয়ানত করতে রাজী হলেন না। অর্থাৎ আমানত শাহ্ যে শক্তি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন, তা তারা ফেরৎ দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। অবশেষে তিনি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

সে সময় পাটনায় হজরত শাহ্ মোহাম্মদ মোনেমে পাক তথা সৈয়দ মোনায়েম খসরু (রহঃ) নামক এক জবরদস্ত আউলিয়া আওলাদে রাসূল অবস্থান করতেন। তার আধ্যাত্মিক শক্তি ছিলো অসাধারণ। আগে থেকেই তিনি সূফী দায়েমের আগমন বার্তা জানতে পেরে সাগরেদদের ডেকে বললেন, "বাংলাদেশ থেকে এক সিংহ পুরুষ আসছেন, আমার সঞ্চিত সম্পদ নিয়ে যাবার জন্যে। এর মাত্র দু'দিন পরই দেওয়ানা বেশে সূফী দায়েম উপস্থিত হলেন শাহ্ মোনেমে পাকের দরবারে। হজরত মোনেম তাকে শান্তনা দিলেন ও আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তিনদিন পর তোমাকে তোমার সব নেয়ামতই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।" সেই ওয়াদা মোতাবেক তৃতীয় দিবস শেষরাতে সূফী দায়েমকে তিনি বল্লেন, "তুমি যদি আমার চারটি শর্ত পালন কর, তাহলে

তোমার যা কিছু চলে গেছে, তা সবই তোমাকে ফেরৎ দেয়া হবে। প্রথম, তোমাকে ঢাকায় দায়েরা বদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। দ্বিতীয়, তোমাকে সেখানে বিয়ে করতে হবে। তৃতীয়, আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। চতুর্থ, নিয়মিতভাবে একটি লঙ্গরখানা পরিচালনা করতে হবে।" সূফী দায়েম শর্তগুলো মেনে নিলেন। এবং তার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে যাত্রা করলেন চট্টগ্রামের পথে। এ পথেও তিনি অনেক অলি দরবেশের সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাদের কাছ থেকেও কিছু কিছু দীক্ষা নিয়ে চট্টগ্রামে হজরত শাহ্ আমানতের (রহঃ) খানকায় উপস্থিত হলেন। শাহ্ আমানত তখন তাঁর সন্তান সন্ততীদের নিয়ে আম কাঁঠাল খাচ্ছিলেন। সূফী দায়েম নিশ্চিত মনে আম কাঁঠালের পাত্রে হাত দিয়ে চারদিক থেকে খেতে আরম্ভ করলেন। তা দেখে শাহ্ আমানত বললেন, তোমার ভাইদের জন্যে কিছু নেয়ামত রাখো। সূফী দায়েম জবাবে বললেন, আপনার সন্তানদের দ্বারা আপনার নাম রওশান হবে না। এই বান্দার দ্বারাই আপনার নাম রওশান হবে, আর সেটাই আল্লাহ্‌র দরবারে মঞ্জুর হবে।

চট্টগ্রামে কিছুদিন অবস্থানের পর সূফী দায়েম শাহ্ আমানত উল্লাহ্‌র ওফাত হলে তাঁরই পূর্ব নির্দেশে তার পীর তৎকালীন বাংলার প্রখ্যাত সাধক হযরত আবদুর রহিম শহিদ (রহঃ) এর ঢাকার লক্ষ্মীবাজারস্থিত মিয়া সাহেব ময়দানে আগমন করেন। এখানে এসে জানতে পারেন যে, শাহ্ আমানতের পীর শাহ্ আবদুর রমিহ শাহাদত বরণ করেছেন। খানকার ২য় গদিনশীন পীর মিয়া সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ নাজিমুদ্দিনের নির্দেশে ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত খান মোহাম্মদ মসজিদে আস্তানা গাড়েন। এখানে লোকজনের ভীড় হতে আরম্ভ হলে নিকটস্থ আজিমপুরের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। আর এটাই দায়রা শরীফ নামে পরিচিত হয়।

সূফী দায়েমের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বহু অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায়। সেসব কাহিনীর দু'চারটা এখানে বিবৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হযরত সূফী দায়েম খাইয়ারা গ্রামের যে যায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে স্থানে বৃটিশ যুগে একটি টেলিগ্রাফের খুঁটি পোতার দরকার হয়। কিন্তু খুটি পোতার জন্যে যে শ্রমিকই কাজে হাত দেয় তারই রক্তবমি শুরু হয়ে যায়। এ সংবাদ পেয়ে তাদের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার সস্ত্রীক সেখানে হাজির হন। এবং পুরো ব্যাপারটিকে কুসংস্কার ভেবে হেসে উড়িয়ে দিয়ে নিজের হাতে শাবল তুলে খুঁটি পোতার জন্যে গর্ত খোড়ার কাজ শুরু করে দেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, আচমকা তারও রক্তবমি শুরু হয়ে যায়। এ দূর্ঘটনায় সকলেই স্তম্ভিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে। তখন সবারই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সে

জায়গাটিতে খুঁটি পোতা বন্ধ রেখে জায়গাটির চারিদিকে ঘেরাও করে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

কথিত আছে যে, সে সময়ে আজিমপুর দায়েরা শরীফের পশ্চিমে রামবাগ আখড়ায় রামদাস নামে এক মোহন্ত (সাধু) থাকতেন। তিনিও অসাধারণ সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি নাকি প্রতিদিন একমন পরিমাণ কয়লা পুড়িয়ে অগ্নিকুণ্ড করে তার পা উপড়ে ও মাথা নীচে ঝুলিয়ে দৈনিক পাঁচ ঘন্টা করে একটানা সুদীর্ঘ বার বছর কঠোর সাধনার মাধ্যমে সন্মোহনী ক্ষমতা অর্জন করে বন্য জীব জন্তুর ভাষা বুঝতে ও তাদের বশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সূফী দায়েম এখানে আগমন করায় তিনি সুকৌশলে তাঁকে তাড়াবার জন্যে এক বিরাট বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে, একটি অজগর সাপকে হাতে জড়িয়ে নিয়ে দায়েরা শরীফের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তখন শাহ্ সূফী দায়েম তাঁর মুরিদানদের সাথে নিয়ে আসরের নামাজ আদায় কল্পে হুজরা থেকে মসজিদে গমন করছিলেন। সাধুর দৃশ্য অবলোকন করে শিষ্যগণ সূফী সাহেবকে বললেন, "একজন বিধর্মী আপনার সম্মুখে এভাবে সওয়ার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনি তাকে বাধা দিন।' তিনি সেদিকে কর্ণপাত না করে নামাজ আদায় করতে গেলেন। নামাজ শেষেও অনুরূপ দৃশ্য দেখে শিষ্যগণ পুণরায় বললেন, "হুজুর, এ দেখে আমাদের লজ্জা হচ্ছে।" হজরত দায়েম তখন নিকটস্থ প্রাচীরের উপর উপবেশন করে বলে উঠলেন, "সাধুতো বনের পশুর উপর সন্মোহনী ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে, তোমরাও তো আল্লাহ্র সৃষ্টি, তোমরাও আল্লাহ্র হুকুমে অগ্রসর হও।" আদেশ শুনে প্রাচীর এগিয়ে যেতে লাগলো। এ দেখে বাঘ সাধুকে মাটিতে ফেলে রেখে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো। সেই সঙ্গে সাপটিও একই পথ ধরলো। সূফী সাহেব সাধুর নিকটস্থ হলে সাধু লজ্জিত ও বিণয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সূফী সাহেব তাকে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমা করলেন, তন্মধ্যে, নামাজের সময়ে তারা কোন শংখ বা ঘণ্টাধ্বনী করবেনা। তখন থেকেই উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে পরস্পর পরস্পরকে নেয়াজ ও প্রসাদ পাঠাতেন। অবশ্য, এসব উপঢৌকন গন্তব্যস্থলে পৌছে গিয়ে ফুল ও ফলের রূপ ধারণ করতো। এ কাহিনীটিকে রামবাগ ও দায়েরা শরীফের পরবর্তী শিষ্য বা অনুসারীরা বিভিন্নভাবে রূপ দিয়েছেন যা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মনে হয়। তবে তাদের মধ্যে যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো, এবং পরস্পরের মধ্যে শিরণী ও প্রসাদ বিনিময় হতো তা উভয় সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ বলে গেছেন সাধুর নাম নিয়েও মতভেদ রয়েছে।

এ সময়ের আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তৎকালে ঢাকার বর্তমান নিউমার্কেটের নিকট বাবুপুরা মহল্লায় হযরত বাগু দেওয়ান (রাঃ)-এর খানকায় তাঁরই আওলাদ বিখ্যাত দরবেশ সূফী নূরী (রঃ) বসবাস করতেন।

আজিমপুর অঞ্চলে আগত সূফী দায়েম ও সাধুর মধ্যকার ঘটনা অবগত হয়ে শাহ্ নূরী একটি পাত্রে পানি ভর্তি করে তার এক বিশ্বস্থ খাদেমকে দিয়ে সূফী দায়েমের নিকট পাঠালেন। বিচক্ষণ আল্লাহ্‌র অলি সূফী দায়েম বিষয়টি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ পানিভর্তি পাত্রটিতে একটি ফুল দিয়ে শাহ্ নূরীকে বড় ভাই বলে সম্বোধন করেন এবং পাত্রটি ফেরৎ পাঠান। পানিপাত্র ও ফুলের মর্মকথা হলো, অত্র অঞ্চলটি ছিলো সূফী নূরীর (রহঃ)-এর বেলায়েতের সীমার অন্তর্ভুক্ত। হঠাৎ বহিরাগত দরবেশের আগমনে আগত দরবেশকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তার বেলায়েতের এলাকাটি একটি মহাসমুদ্রের মতো বিশাল। অনুমতিহীন কোন দরবেশ এখানে প্রবেশ করলে ডুবে যেতে পারে। বিষয়টি উপলব্ধি করে সূফী দায়েম বিনয়ের সাথে ফুল দ্বারা আধ্যাত্মিক পত্রের জবাব দিয়ে জানালেন যে, মহাসমুদ্রের মধ্যে কাষ্ঠখণ্ডের মতো ভেসে থাকতে চাই, সাগরকে গ্রাস করতে চাইনে। হযরত নূরী (রহঃ) বিষয়টি উপলব্ধি করে বিনয়ী দরবেশের প্রতি ছোটভাই সুলভ স্নেহ দেখিয়ে নিজে ঢাকা শহরের উত্তর পূর্ব প্রান্তে মগবাজার এলাকায় তার খানকা স্থানান্তর করলেন।

আজিমপুর জঙ্গল মহান তাপস সূফী দায়েম (রহঃ) সঙ্গী দরবেশগণসহ দীনহীন সাধারণ বেশে কষ্টের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগীতে ও ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর প্রধান খাদেম ছিলেন তরিকতের উচ্চ দীক্ষাপ্রাপ্ত সিদ্ধ পুরুষ শাহ্ মারী (রহঃ)। তাঁর মাজার আজিমপুর পুরাতন কবরস্থানে রয়েছে।

নবগঠিত দায়রা শরীফে সূফী দায়েমের জীবন সংগ্রাম ও তপস্যা আরম্ভ হয়। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক রমনীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পাটনার পীর মোনেমে পাকের আরেকটি শর্ত পূরণ করলেন। তাঁর ঔরষে দুই পুত্র ও এককন্যা আল্লাহ্ দান করেন। তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্কে একদা তিনি তার শিষ্যগণকে বলেছিলেন, আমার বংশধরগণ সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত একনামে পরিচিত হবে। তারপর তারা বিশ্বে অন্যভাবে পরিচয় লাভ করবে।

সূফী দায়েমের কারামত সম্পর্কেও কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তবুও অনেক কথাই থেকে গেছে। তন্মধ্যে আরেকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। কারণ, সে ঘটনার মধ্য দিয়েই ছোট দায়রার প্রতিষ্ঠা লাভ।

সূফী দায়েম অনেক গায়েবী কথা আগে থেকেই জানতে পারতেন। তাঁর একমাত্র কন্যাটি যৌবনে পদার্পণ করলেন, স্বভাবতঃই কন্যার বিবাহের চিন্তা তার অন্তরে জাগ্রত হলো। একদিন তিনি ঘোষণা করলেন 'অল্প দিনের মধ্যেই মেয়ের জামাই এসে যাচ্ছে।' এ কথার তাৎপর্য হয়তো সেদিন কেউ সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি।

তৎকালীন দিল্লীর বাদশাহের উজিরে আযম রওশন আলী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। তিনি একদিন স্বপ্নাদিষ্ট হলেন যে, ঢাকার আজিমপুর দায়েরা শরীফের কেবলা সূফী মুহাম্মদ দায়েম (কুঃ সিঃ) সাহেবের হুজরায় গেলে এ রোগ হতে আরোগ্যলাভ করা যাবে। তিনি চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে ঢাকা আসার বাসনা প্রকাশ করলেন বাদশার কাছে। প্রধান উজিরের কথায় বাদশাহ্ প্রথমে ইতস্ততঃ করলেও শেষাবধি অনুমতি দিলেন। উজির রওশন আলী বাদশার কাছ থেকে মূল্যবান পোষাকাদি নজরানা গ্রহণ করে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ঢাকায় এসে দায়রা শরীফে পৌছুলেন। সূফী দায়েম বিস্তারিত বৃত্তান্ত শ্রবণের পর রওশন আলী সাহেবকে হুজরায় অবস্থানের অনুমতি দিলেন।

দায়েরা শরীফের প্রচলিত বিধান অনুসারে মেহমানের অবস্থা অনুযায়ী খানাপিনা সরবরাহ করা হতো। রওশন আলী সাহেবকেও সে মোতাবেক আমিরীখানা পরিবেশন করা হলো। তিনি সে খানা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। এবং একজন সাধারণ ব্যক্তিকে যে খানা দেওয়া হয়, তাই দিতে অনুরোধ করলেন। সেমতে তাকে লঙ্গরখানা থেকে খানা এনে দেওয়া হলো। এভাবে দায়েরা শরীফে তিনি দিন যাপন করতে লাগলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর একদিন রওশন আলী সাহেব হুজুর সকাশে তার রোগ আরোগ্যের পন্থার কথা পেশ করলেন। উত্তরে হুজুর তাকে এমন একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বললেন যে স্থানে হুজরা থেকে বেরিয়ে ফজরের নামাজের পরই যেন তার সাক্ষাৎ মেলে। রওশন সাহেব হুজুরের কথানুযায়ী কাজ করে যেতে লাগলেন। মাত্র তিনরাত্রি অতিক্রম হওয়ার পরই রওশন আলী বলেছিলেন, "হুজুর যখন হুজরা থেকে বের হয়ে ফজরের নামাজ আদায় করে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতেন, তখন মনে হতো আমার সর্বাঙ্গে যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এ তিন রাত্রি দৃষ্টিনিক্ষেপের ফলে তিনি দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভ করেছিলেন। কিন্তু তখনো কুষ্ঠের দাগ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। হুজুরের নিকট পুণরায় কুষ্ঠের দাগের কথা জানালে তিনি পূর্ববৎ আরো

তিনরাত্রি ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বললেন। এ তিন সুবেহ সাদেকেও আগের মতোই তাকে নিরীক্ষণ করেন। এবার তার কুষ্ঠের দাগ মুছে গিয়ে পূর্বের মতো সৌম কান্তির সুপুরুষ হয়ে উঠলেন। এটা আল্লাহ্ তায়ালারই এক অবর্ণনীয় কুদরত। এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি দায়রা শরীফের খাদেম হিসেবে কাটিয়েছিলেন।

দায়েরা শরীফের মালপত্র, খানাপিনা, ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণ এবং লঙ্গরখানার তত্ত্বাবধানে চারজন শিষ্যকে মোহাফেজ নিয়োগ করা হয়। তন্মধ্যে রওশন আলী ছিলেন একজন বিশিষ্ট মোহাফেজ। প্রত্যেকের উপর একদিন করে এসব তত্ত্বাবধানের ভার ছিলো। একদিন এশার নামাজের পর হযরত দায়েম মসজিদে যাতায়াতের পথিপার্শ্বস্থ পায়খানাটি মেথর ডেকে পরিস্কার করার কথা বললেন। সেদিন তত্ত্বাবধানের পালা ছিলো শিষ্য রওশন আলীর। তিনি শেষ রাত্রিকালে উঠে মাটির কলস, লোটা, ঝাড়ু ইত্যাদি নিয়ে পায়খানার সব ময়লা নিজহাতে পরিস্কার করে পায়খানাটিকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিলেন। তারপর গোসল করে নিজে পাকসাফ হলেন এবং স্থানটিতে শাহী আতর ছিটিয়ে, সুগন্ধময় করে রাখলেন। সবকিছু সমাধার পর তিনি এককোণে সবার অলক্ষ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। রাত্রিশেষে হুজুর এপথ অতিক্রমকালে স্থানটিকে এমন পাক সাফ ও সুগন্ধময় দেখে তৎক্ষণাৎ কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। হযরতের এ মহানুভবতায় রওশন আলী দৌড়ে গিয়ে হযরতের কদম মোবারকে লুটিয়ে পড়লেন। হযরত তাকে দু'হাতে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে সব বাতেনী নেয়ামত দান করলেন। ফজরের নামাজ শেষে গদীতে বসে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ থেকে রওশন আলীকে আর কেউ রওশনিয়া বলে ডাকতে পারবে না। চাকরের মতোই সকল কাজ করতো বলে তার সাথীরা দিল্লীর সুলতানের এককালের উজির রওশন আলীকেও রওশনিয়া বলে সম্বোধন করতো। তারপর তিনি শাহ্ রওশন আলীর সঙ্গে তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহের কথা ঘোষণা করলেন। সবাই হুজুরের এ ঘোষণায় হতবাক হয়ে গেলো। হযরত শাহ্ সূফী মুহাম্মদ দায়েম (কুঃ সিঃ) ১২১৪ হিজরীর ১লা শাবান তাঁর অগণিত ভক্ত, শিষ্য ও পরিজনদের শোক সাগরের ভাসিয়ে জান্নাতবাসী হন। তাঁর মাজার দায়রা শরীফের গম্বুজওয়ালা রওজার অভ্যন্তরে রয়েছে।

শাহ্ রওশন আলী সম্পর্কেও আরো অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিম রয়েছে। তন্মধ্যে তিনি নাকি তার স্ত্রীর সঙ্গে কোনদিন মেলামেশা করেননি। তার বিবি সাহেবা চেহারায় অবিকল তার পীর মুরশিদ কেবলার মতোই ছিলেন। বিবি সাহেবাকে

দেখেই তার চোখে পীর মুরশিদের মোবারক চেহারা ফুঠে উঠতো। তাই তিনি বিবি সাহেবার সাথে স্বামী স্ত্রীর ফরজ কাজটিও আদায় করতে পারতেন না। তার এই শরীয়ত বিরোধী কাজের কথা শুনে অনেকেই তাকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতো। তিনি শরীয়তের বিধানকে কোনদিনই অস্বীকার করতেন না। কিন্তু আসমান জমিনের পার্থক্য সম্পর্কে নানারূপ তত্ত্বহুল উপদেশ দ্বারা সেসব প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়ে সকলকেই বুঝিয়ে দিতেন।

তিনিই দায়রা শরীফ সংলগ্ন ছোট দায়রা শরীফের বুনিয়াদ স্থাপন করেন। যেখানে আজ দায়েমী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছোট দায়রার বুনিয়াদ শাহ্ রওশন তার পীর সূফী দায়েমের নির্দেশেই করেছিলেন। কেননা, তাকে যখন আধ্যাত্মিক ও তরিকতী জ্ঞান দান করেছিলেন সূফী দায়েম তখন তাকে আলাদা খানকাহ্ করার অনুমতিও দিয়েছিলেন, ১২২৪ হিজরীতে ছোট দায়রা মসজিদ নির্মাণ হয়। সেমতেই তিনি এ ছোট দায়রার বুনিয়াদ করেন। এবং যেহেতু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তার শ্যালক শাহ্ আহমদ উল্লাহ্কে খানকার খলিফা নিয়োগ করেছিলেন।

তিনি দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ্ সূফী দায়েমের জামাতা হিসেবেই আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক মুক্তির অধিকারী হননি। তার কঠোর সাধনা, আল্লাহ্র উপর ঈমান আর একনিষ্ঠ সেবার মাধ্যমেই পীর মুর্শিদের মন জয় করায় তাকে তরিকতের সুকঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। সে দায়িত্ব তিনি বিশ্বস্থতার সাথে পালন করে গেছেন। তার দুই আপন শ্যালককে তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলেন। বিশেষ করে শাহ্ সূফী মৌলানা লাকীতুল্লাহ্ শাহ্ রওশন আলী হতেই আধ্যাত্মিক নেয়ামত গ্রহণ করেছিলেন। ছোট দায়রার বর্তমান গীদনশীন পীর হযরত সৈয়দ দায়েমুল্লাহ্র বর্ণনা মতে, শাহ্ রওশন আলী হযরত দায়েমের ইন্তেকালের পর তার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে ছোটজনকে বড় দায়রার ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ছোট দায়রার খলিফা মনোনীত করেন। কিন্তু বড় দায়রার কুষ্টিমতে হযরত সূফী দায়েমের ওফাতের পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ্ সূফী আহমদ উল্লাহ্ হিজরী ১২১৫ সালে বড় দায়রা শরীফের গদিনশীন পীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা শাহ সৈয়দ লাকীতুল্লাহ্ সাহেব গদিনশীন হন। শাহ্ রওশন আলীর খলিফাগণের মধ্যে নোয়াখালীর শাহ্ জাকি ছিলেন ভক্তজনের অন্যতম। তার মাজারও বড় দায়রার গম্বুজ ওয়ালা রওজাতেই রয়েছে।

কুতুবুল আফতাব হযরত শাহ্ সৈয়দ দায়েমের ওফাতের পর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ্ সূফী আহমদ উল্লাহ্ হিজরী ১২২৫ সনে গদিনশীন হয়ে সর্ববিষয়েই পিতার পদাংক

অনুকরণ করে চলতেন তিনি ছিলেন মনে প্রাণে বাবার অনুসারী। দ্বীন-দুনিয়া ও সমাজের কল্যাণ সাধনাই ছিলো তার জীবনের মূলমন্ত্র। তজ্জন্য তার ভক্তজনের অভাব ছিলো না। তিনি সর্বগুণে গুনান্বিত ছিলেন। তার সান্নিধ্যে এসে অনেকেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে হয়েছেন সঠিক পথের অধিকারী। তিনি সারাজীবন হযরত রাসুলে করিম (সঃ)-এর বাণী "সন্তান স্বীয় পিতার রহস্যের বিকাশস্থল" কথাটির তা ৎপর্য অনুধাবন করে সেমতে জীবন ব্যবস্থা পরিচালনায় সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। কিন্তু এই সাধক পুরুষ অতি অল্পকাল মধ্যেই অর্থাৎ ১২৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমান। তার অকাল মৃত্যুতে ভক্তজনেরা দারুণভাবে শোকাভিভুত হয়ে পড়েছিলেন। তারও মাজার গম্বুজওয়ালা রওজাতেই রয়েছে।

শাহ্ সূফী আহমদ উল্লাহ্র পরলোকগমণের পর তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা সূফী সৈয়দ লাকীতুল্লাহ্ গদিনশীন হন। তিনিও পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসারী ছিলেন। তিনি সাধক পুরুষ ছিলেন। মানব সেবা ও সমাজের কল্যাণ কামনায় তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি। ভক্তজনের সবাইকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে তিনি কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের মঙ্গল কামনা করে গেছেন।

জনশ্রুতি আছে, হযরত শাহ্ লাকীতুল্লাহ্ গদীনশীন থাকাকালে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি কিছু টাকা দেন দালান তৈরির জন্যে। সে অর্থ ধীরে ধীরে লঙ্গরখানা পরিচালনায় ব্যয় হয়ে যায়। তা জানতে পেরে বিত্তশালী ব্যক্তিটি একদিন এসে হযরত লাকীতুল্লাহ্কে বললেন, 'হুজুর, ঘর যে এখানো তৈরি হলো না। জবাবে তিনি বললেন, 'ঘর জান্নাতে তৈরী হবে।' হুজুরের একথা শুনে ব্যক্তিটি পুণরায় নিজ খরচে দালান তৈরী করে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন এবং হুজুরের অনুমতি নিয়ে নিজেই ঘর তৈরীর সরঞ্জামাদি খরিদ করে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। ঘর তৈরীর কাজ শেষ হয়ে এলে ছাদের কড়িকাঠ (সাতির) লাগাতে গিয়ে দেখা গেলো, সেগুলো ঘরের মাপ থেকে ছোট হয়ে গেছে। বিষয়টি শাহ্ সাহেবের কর্ণগোচর করা হলো। তিনি মিস্ত্রিদের বললেন, 'এখন দুপুর হয়ে গেছে, রৌদ্রের প্রখরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তোমরা চলে যাও, খেয়ে দেয়ে বিকেলের দিকে এসো,।' কথা শুনে মিস্ত্রীরা চলে গেলো। তারপর শাহ্ সাহেব খোলা মাথায় খালি পায়ে কড়ি কাঠের নিকট দাঁড়ালেন। এবং সেগুলোর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, 'কাষ্ঠখণ্ড তোমাদের জঙ্গলে খোদা রয়েছে, এখানে কি নেই? তাঁর হুকুমে তোমরা জঙ্গলে বড় হতে পার! এখানে কি সেভাবে তোমরা বড় হতে পারো না? খোদার হুকুমে তোমরা বেড়ে যাও। ফকিরের কাজে

ক্ষতি হচ্ছে। চড়া গলায় কয়েকবার একথা বলে তিনি হুজরা অভিমুখে চলে গেলেন।

মিস্ত্রীরা যথাসময়ে এসে হুজুরকে জিজ্ঞেস করলেন, কাঠগুলো সম্পর্কে এখন কি করা যায়? তিনি কোন কথা না বলে সেগুলো ছাদের যথাস্থানে লাগাবার হুকুম দিলেন। তাঁর নির্দেশে মিস্ত্রীরা কাঠগুলো ছাদে উঠিয়ে দেখলেন, আল্লাহ্‌র কুদরতে সবগুলো কাঠই প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ঠ বেড়ে গেছে। হুজুরের আদেশে পুনরায় সেগুলোকে পরিমাণ মতো কেটে ছাদের কাজে লাগানো হলো।

দায়রা শরীফের দস্তুর ছিলো, সপ্তাহে দু'দিন সকলে একত্রিত হয়ে জঙ্গল হতে লাকড়ি কুড়িয়ে আনা হতো লঙ্গরখানার জন্যে। এমনিভাবে লাকড়ি কুড়াতে গিয়ে একদিন একব্যক্তিকে বাঘ মেরে ফেললো। সকলে এসে হুজুরের নিকট ঘটনাটি আদ্যোপান্ত প্রকাশ করলো। হুজুর এক শিষ্যকে আদেশ দিলেন, 'মাস্তে শাহ্‌কে ছালাম দিয়ে বলো যে, বাঘে একজনকে মেরে ফেলেছে। তোমার উপর হুজুরের আদেশ – সেই মৃতদেহ ও বাঘ উভয়কে হুজুরের দরবারে হাজির করতে হবে। একথা শুনে মাস্তে শাহ্ তৎক্ষণাৎ জঙ্গলে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঘ ও মৃতদেহটি নিয়ে হাজির হলেন হুজুরের খানকা শরীফে। হুজুর তখন বাঘকে আদেশের সুরে বললেন, বাঘ তুমি কেন আমার লোককে হত্যা করলে? ভবিষ্যতে আবার যদি অনুরূপ কাজ করো, তাহলে তোমার বাচ্চা কাচ্চাসহ মিসমার করে দেবো। এরূপ খবরদারী করে তিনি বাঘকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু প্রতিদিন রাত্রির শেষ প্রহরে সে বাঘটি হুজুরের হুজরার নিকট আসতে লাগলো। এমনকি হুজুরের ছেলে শাহ্ খলিলুল্লাহ্‌র গদিনশীন থাকা পর্যন্ত বাঘটি পূর্বের মতোই শেষ রাতে হুজরার কাছে আসতো। পরিবর্তীকালে জঙ্গল সাফ হয়ে বস্তি গড়ে উঠলে বাঘকে আর দেখা যায়নি।

এমনি একদিন হযরত লাকীতুল্লাহ্ চৌকিতে বসে হাজামত করাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি ক্ষৌরকারের কাজে বাধা দিয়ে চৌকির নীচে হাত রাখলেন। হাজাম পরিস্কার দেখতে পেলো, হুজুরের হাত দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। এ সম্পর্কে হাজাম বিনীত সুরে হুজুরকে প্রশ্ন করলে হুজুর বললেন, চুপ থাকো, পরে জানতে পারবে, পানি পড়ার ঘটনাটি ছিলো বিপদ সংকুল আর অলৌকিক। ঘটনাটি হলো, সমুদ্রে এক জাহাজের তলদেশ ছিদ্র হয়ে যায়। ছিদ্র বন্ধ করার সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন জাহাজটি সমুদ্রের অতলে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকে। সে জাহাজের সারেং ছিলো দায়রা শরীফের এক ভক্ত। তিনি জাহাজের সকল আরোহীদেরকে

উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা সবাই বলুন, হে লাকীতুল্লাহ্ শাহ্ আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন যেন এ বিপদ থেকে আমরা সকলেই রক্ষা পাই। তার কথামতো সকলেই মোনাজাত করলেন। দেখা গেলো কে জানি একজন জাহাজের ছিদ্র বন্ধ করে দিচ্ছে। কিছুক্ষণের চেষ্টাতেই জাহাজের ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেলো। ব্যাপারটি দেখে আরোহীদের সবাই তো অবাক। জাহাজটি ডুবে যাবার আর কোন আশংকা না থাকায় এযাত্রা সবাই প্রাণে বেঁচে গেলো।

বেশ কিছুদিন পরের কথা, হুজুরের হাত দিয়ে কেন পানি পড়েছিলো, সেকথা আর হাজামের মনে নেই। এবারও সে এসেছে হুজুরের হাজামত বানাবার জন্যে। এমন সময় সে দেখতে পেলো, কতিপয় লোক আপোষে বলাবলি করছেন, এ লোকটিকেই তো আমরা সেদিন জাহাজের ছিদ্র বন্ধ করতে দেখেছিলাম। শেষে তারা হুজুরের কদমবুসি করে হাদিয়া তোহফা দিলো এবং সেদিনের ঘটনাটি তাঁর নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করলো। বর্ণনা শুনে হাজামের সেদিনের কথা মনে পড়ে গেলো। ঘটনাটি সম্পর্কে সেও সাক্ষ্য প্রদান করলেন। হুজুরের বুজুর্গানীর কথা এভাবে ছড়িয়ে পড়লো নানাদিকে।

সৈয়দ লাকীতুল্লাহর ওফাতের পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র সূফী সৈয়দ মাজহারুল হক অলিউল্লাহ্ ১২৩০ হিজরীতে গদিনশীন হন। পূর্ব পুরুষদের মতোই তিনিও আধ্যাত্মবাদী ছিলেন। তার আধ্যাত্মবাদে ভক্তজনেরা প্রভুত কল্যাণলাভে ধন্য হয়েছিলেন। একবার জনৈক গ্রামবাসী পাঁচসের লবণ কিনে তার সাথে দেখা করতে আসেন। লবণভর্তী পাত্রটি গদীর সামনে রেখে হুজুরের সাথে হাত মেলালেন। এ সময় হুজুর পাত্রে কি আছে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বললো, শহরে সস্তাদরে লবণ পাওয়া যায়, তাই কিছুটা কিনে নিয়ে এলাম। হুজুর স্মিত হেসে বললেন, আরে মিয়া লবণ কোথায়? পাত্রে তো রয়েছে চিনি। প্রত্যুত্তরে লোকটি বললো, হুজুর এইমাত্র লবণই তো কিনে নিয়ে এলাম। হুজুর আগের মতোই চিনির কথা ব্যক্ত করলেন। লোকটি পাত্রের মুখ খুলে পরীক্ষা করে দেখে অবাক হয়ে গেলো। হুজুরের এরূপ অলৌকিক বহু ধরনের ঘটনার কথা বহুজনের কাছ থেকে শোনা গেছে। শাহ্ অলিউল্লাহ্ ১৩০১ হিজরীতে পবিত্র রমজান মাসে জান্নাতবাসী হন। তাঁর কবরও রওজা মোবারকের অভ্যন্তরে রয়েছে।

পরবর্তী শওয়াল মাসেই তৎপুত্র শাহ্ খলিলুল্লাহ্ গদীনশীন হন। বাল্যকাল থেকেই তিনি মেধাবী, ধর্মপরায়ণ ও অনন্য সাধারণ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া, তার মনে সর্বাঙ্গীন সিদ্ধি লাভের একটা প্রবল বাসনা জাগরুক থাকায় চট্টগ্রামের

সাতকানিয়ার জবরদস্ত কামেল শাহ্ পীরের মাজার জেয়ারত করতে গিয়ে সেখানে চিল্লা করেন এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রামে শাহ্ আমানত শাহ্ মুজাদ্দেদীর মাজারেও কিছুকাল অবস্থান করেন। ফলে, তার সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মানুরাগে মুগ্ধ হয়ে দিনে দিনে তার ভক্তের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। মানুষের নৈকট্য তার জীবনের আকাংখাকে আরো মহিমান্বিত করে তুলে। সেখান হতে আবার তিনি ফিরে আসেন ঢাকায়।

শাহ্ খলিলুল্লাহ্ গদীনশীন হবার পর থেকে দায়রা শরীফের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। তিনি প্রথমেই খানকাহ্ শরীফ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনতলা শাহী দরজা, মসজিদের প্রথম বারান্দা, বসত বাড়ির চারদিকের সীমানা প্রাচীর, অযুর জন্যে হাউজ, গোসলখানা নির্মাণ করেন। এছাড়া একটি বাগান তৈরী ও পুকুর খনন করান। প্রথম হজব্রত পালনকালে এক অজ্ঞাত কারণে তিনি মদীনা যেতে পারেননি। পরবর্তীতে মদিনা শরীফ জেয়ারতের উদ্যোগ নিলে ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ্ আটশত টাকা প্রদান করেন। তা থেকে তিনি নিজে তিনশত রেখে অবশিষ্ঠ টাকা দান করে দেন। মদিনা শরীফে হযরত রাসুলে করীমের (সঃ) রওজা মোবারকে প্রায় একমাস অবস্থান করে পুনরায় ঢাকা ফিরে আসেন।

কাজী নজিবুল্লাহ্ নামে ঢাকার তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তি দায়রা শরীফের পুকুরে বড়শী দিয়ে মাছ ধরার সময় তার খুব পিপাসা পায়। তিনি মনে মনে ইয়াদ করতে লাগলেন এ সময় যদি কেউ এখানে আসতো, তাহলে তাকে দিয়ে পানি আনাতো। ঠিক সে সময় হুজুর পুকুরের দিকে এগিয়ে গিয়ে কাজী সাহেবকে দু'টি ক্ষীরা দিয়ে বললেন, এটা খেয়ে নিন, পানির পিপাসা দূর হয়ে যাবে। কাজী সাহেব আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আমার মনের কথা আপনি কেমন করে জানলেন হুজুর? হুজুরের মুখে এক ঝলক হাসি খেলে গেলো। আর, তাতেই কাজী সাহেবের কাছে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি প্রতিভাত হয়ে উঠলো। তিনি ১৩৩৯ হিজরীর ১৪ই জমাদিউল আউয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কাছেই আমার আব্বা মরহুম রহিম বখ্স বয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

শাহ্ খলিলুল্লাহর অপর এক ভাই-এর নাম শাহ্ সূফী সৈয়দ হাফিজুল্লাহ্। বাল্যকালেই তিনি দেশত্যাগ করে বহু দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করার পর ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তজ্জন্য তিনি 'রেঙ্গুনী হুজুর' নামে পরিচিত ছিলেন।

একবার তার নিকট রেঙ্গুনের গভর্ণর এসেছিলেন। তিনি আগে থেকেই তার

অলৌকিক ঘটনার কাহিনী অবগত ছিলেন। তিনি সেটার প্রমান যাচাই করার জন্যে শাহ্ সাহেবের একটা হাত ফুটন্ত আলকাতরার মধ্যে ডুবিয়ে ধরলেন। কিন্তু খোদার মহিমায় রেঙ্গুনী সাহেবের হাত অক্ষত রয়ে গেলো।

শাহ্ সৈয়দ খলিলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর শাহ্ সুফী মাজহারুল হক লাকীতুল্লাহ্ ওরফে ফজলে হক (রঃ) দায়রা শরীফে গদীনশীন হন। তিনিও জবরদস্ত কামেল ব্যক্তি ছিলেন। তার জীবদ্দশায় দায়রা শরীফ খুবই জমজমাট ছিলো। ভক্তজনের সমাগম হতো প্রচুর। এ সময় আমার পিতার সঙ্গে আমিও নিয়মিত যেতাম সেখানে। তার ইন্তেকালের পর হতেই দায়রা শরীফের জৌলুস ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে। দায়রা শরীফের সীমানা একসময় অনেক বড় ছিলো। পাকিস্তান আমলে দায়রা শরীফের বৃহৎ অংশ শাহ্ ফজলে হকের ওয়ারিশানগণ ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি, আইনজীবি ও চাকুরীজীবিদের নিকট শত বর্ষের জন্য লীজ প্রদান করলে সেখানে বহুজনের দালান ও কারখানা নির্মিত হয়েছে। এ সবের মধ্যে চায়না বিল্ডিং ভবনটি ঢাকাবাসীর নিকট অতি পরিচিত নাম। তাছাড়া, এখানে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মুহম্মদ সায়েম সাহেবও বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। এসব দর-দালান কল-কারখানার জন্যে দায়রা চত্বর যেমন সংকুচিত হয়ে গেছে তেমনি দায়রা শরীফের বাইরের কবরস্থানটিরও গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে। ঢাকার মুসলমানরা এ দায়রা চত্বরে পরিজনের কাউকে কবর দিতে পারলে গর্ব অনুভব করতো। এখন সে অবস্থা নেই। নেই তেমন ভক্ত জনের আগমন। তবে মসজিদ, শাহী ফটক, রওজা মোবারক এবং তৎসংলগ্ন কবরগাহ, যথা অবস্থায় রয়েছে। লোকজন এখনো এখানে এসে থাকেন শ্রদ্ধা জানাতে। মুসলিম পর্ব গুলোতে এখানে যথাযথ ভীড় এখনো পরিলক্ষিত হয়।

ছোট দায়রার খলীফা সুফী আহমদ উল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর তৎপুত্র সুফী নুরুল্লাহ (রহঃ) ছোট দায়রা শরীফের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তিকে এক ওয়াক্‌ফ দলিলমূলে "সুফী নুরুল্লাহ্ ওয়াক্‌ফ এস্টেট" প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পবিত্র হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে পদব্রজে মক্কা মোয়াজ্জমা যাত্রা পথে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের গড়পাড়া নামক স্থানের এক পরাক্রমশালী ও অত্যাচারী অমুসলিম জমিদারকে কঠোর হস্তে দমন করে তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার পর তার কন্যার সঙ্গে স্বীয় পুত্র আবু মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহর বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন। সুফী নূরুল্লাহ্ তিন পুত্র সন্তান রেখে ইন্তেকাল করলে তাকে আজিমপুর ফয়জুল্লাহ্ শাহী মসজিদ তথা খনকার সাহেবের মসজিদের নিকট দাফন করা হয়। অতঃপর তৎপুত্র সুফী আজমত উল্লাহ ছোট দায়রার কেবলা হুজুরের দায়িত্ব নেন। সুফী আজমত উল্লাহ্ সাধক পুরুষ

ছিলেন। ১২৭ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করলে তাঁকে ছোট দায়রার শাহী মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। সুফী আজমত উল্লাহরও ছিলেন তিন পুত্র। তন্মধ্যে হযরত শাহ্ সূফী সৈয়দ আবু মুসা কলিমুল্লাহ্ ছিলেন সাধক পুরুষ। তাঁরই সুযোগ্য সন্তান ঐতিহাসিক আজিমপুরের ছোট দায়রা শরীফের বর্তমান ৬ষ্ঠ গদীনশীন পীর বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দানশীল, সমাজকল্যাণে আত্মনিবেদিত সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব হযরত শাহ্ সুফী দায়েমুল্লাহ্। তিনি ইউনানী ও আয়ুর্বেদী শাস্ত্রের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসাবিদও বটেন।

ঢাকা শহরের খাজে দেওয়ান মহল্লায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর পরই তার পিতামহের সহোদর হযরত সৈয়দ ওবায়দুল্লাহ্ (রহঃ) তার নাম রাখেন সৈয়দ দায়েমুল্লাহ্। এ নামকরণের জন্যে পরিবারের অনেকেই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা ওলিয়ে কামেলের নামে শিশুকে ডাকা হলে তা বেয়াদবীর শামিল হবে। কিন্তু সুফী ওবায়দুল্লাহ্ স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থেকে এ শিশুকে পীর সাহেব বলে ডাকার জন্যে সবাইকে বলেন। এতে পরিবারের সবাই একমত হন।

শিশু দায়েম জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই মাতৃহারা হন। ঘরে আসেন বিমাতা। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হয়, শিশু দায়েমের বেলাও তাই ঘটলো। কিছুকাল পর সুফী আবু মুসা চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে বর্তমান আমিরাবাদ এলাকায় ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারে গমন করেন। এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তিনি সেখানে ইন্তেকাল করলে তাকে সেখানেই মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়।

একদিন বালক দায়েম পিতামহের দরবারের নিকট দিয়ে বড় দায়রা শরীফের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় জনৈক অপরিচিত এক দরবেশ নিজেকে শহর কুতুব ও তার পিতার দোস্ত বলে পরিচয় দিয়ে বালক দায়েমকে আদেশের সুরে উপদেশ দিলেন যে, তোমার পিতা এক অবাঞ্ছিত ঘটনার শিকার হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। আমি তোমার পিতার নিকট ওয়াদা বদ্ধ হয়েছিলাম যে, তোমাকে শিক্ষা-দীক্ষা দেবো। কিন্তু তা'হলোনা। তোমার দ্বারা ভবিষ্যতে দ্বীনে ইসলাম ও মানব সমাজের অনেক কল্যাণ সাধিত হবে। আর সেটা নির্ভর করে তোমার দাদা হুজুরের দোয়ার বরকতের উপর। তুমি আমার কথামতো, তোমার দাদা হুজুরের স্মরণাপন্ন হও। আল্লাহ্ তোমার জন্য এতেই মঙ্গল নিহিত রেখেছেন।

বালক দায়েম উল্লাহ সেই অপরিচিত দরবেশের উপদেশ অনুযায়ী দাদা হুজুরের খেদমতে হাজির হলেন। দাদা অতি আগ্রহে তার সংগ্রামী ও কষ্ট সহিষ্ণু নাতিকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। এবং এলেম দ্বীন শরিয়ত, তরিকত

ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে লাগলেন।

সূফী সৈয়দ আজমত উল্লাহ্ (রহঃ) এঁর ওফাতের পূর্বক্ষণে নাতি দায়েম উল্লাহ্কে ডেকে বললেন তুমি ব্যবসা বানিজ্য ছেড়ে আল্লাহ্র রাহে মানুষকে হেদায়েত আর চিকিৎসার মাধ্যমে মানব সেবার চেষ্টা চালিয়ে যাও। তাই, তিনি দাদা ও পীর কেবলার আদেশকে শিরোধার্য করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্ম পরিত্যাগ করে লাহোরের তিব্বিয়া হাবিবিয়া ইউনানী কলেজে হেকিমী শাস্ত্র সনদ লাভ করতঃ ঢাকায় ফিরে এসে দোয়ার সাথে সাথে দাওয়ার সমন্বয় ঘটিয়ে দায়েমী দাওয়াখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

দাদা হুজুরের ইন্তেকালের পর তিনি ছোট দায়রার বিষয় সম্পত্তি যা নুরুল্লাহ্ এস্টেট নামে পরিচিত তার মোতাওয়াল্লী বিষয় নিয়ে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। চাচার এমন আচরণ নীরবে সহ্য করে ব্যথিত চিত্তে মাত্র একটি কম্বল গায়ে গৃহত্যাগ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর (রহঃ) দরবারে হাজির হন। তিনি মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন যে, জীবনে আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পীর আউলিয়াদের রওজা মোবারকসমূহ জিয়ারত করতে করতে পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জেমায় যাবেন এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। আজমীর শরীফের তৎকালীন খাদেম সৈয়দ হুসাইন বকা (রহঃ) সৈয়দ দায়েম উল্লাহ্কে বলেন যে, তিনি যেন ফিরে গিয়ে শরিয়ত মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যথারীতি দ্বীনের খেদমতের কাজ করেন। এ কথায় তিনি মক্কা গমন পরিকল্পনা বাতিল করে চট্টগ্রামে ফিরে এসে পিতার মাজার জেয়ারত করে ঢাকা ফিরে আসেন। এবং তার দাদার এক ঘনিষ্ঠ মুরিদের কন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ওদিকে বড় চাচার সম্পত্তির মোতাওয়াল্লীর দাবীদার নিয়ে যে মামলা দায়ের করেছিলেন তা খারিজ হয়ে যায় এবং শাহ্ সৈয়দ দায়েম উল্লাহ্‌ই 'সূফী নূরুল্লাহ্ এস্টেট' এর মোতাওয়াল্লী পদে বহাল হন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম সাহেব আজিমপুরে বাড়ী খরিদ করে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এখানেই কাসেম সাহেব তাঁর কতিপয় মুসলিম সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি বন্ধু নিয়ে "তমুদ্দুন মজলিশ" নামে একটি সংস্থার অফিস স্থাপন করেন। এঁদের সঙ্গে পরবর্তীতে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ (মরহুম) আবুল হাশিম সাহেবের বেশ হৃদ্যতা ছিলো। তারা "খেলাফতে রাব্বানী পার্টি" নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে

তুলেন। আমাদের বাংলা প্রেস থেকে পূর্ব দিকে এগুলেই রাস্তার ধারে কৈলাশ শাহ্‌র মাজার দেখা যায়। সঙ্গেই রয়েছে "হায়াত বাগ" নামে এক পারিবারিক কবরস্থান। যাতে সমাহিত হয়ে আছেন ঢাকার সরদারদের সরদার, ঢাকার মুসলিম নাট্য আন্দোলনের অগ্রদূত ও রাজনীতিবিদ মির্জা আঃ কাদের, তার পিতা প্রথম মুসলিম সেটেলমেন্ট অফিসার মির্জা আবুল হায়াত এবং ভ্রাতা কবি মির্জা ফকির আহমদ এবং তাদের পরিবার পরিজনগণ।

পীলখানা রোডের মাঝামাঝি উত্তর পার্শ্বে রয়েছে ঢাকা পৌরসভার প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত আজিমপুর কবরস্থান। এ অঞ্চলটি শতাব্দীকাল পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেও কবরস্থানটি শহরের কোলাহল ও কর্মচাঞ্চল্য থেকে বেশ দূরেই ছিলো। পরবর্তীতে ঢাকা শহরের পরিধি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ায় কবরস্থানটির চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত মনুষ্য বসতি, আধুনিক বহুতল বিশিষ্ট বাজার অফিস নানারূপ আধুনিক ভবন ও হোটেল নির্মিত হওয়ায় এলাকাটি একটি জনবহুল জনপদে পরিণত হয়েছে।

পৌরসভা কবরস্থানটিকে সাদাসিধেভাবে তৈরী করে। প্রাচীন কবরগুলো বৃক্ষলতা গুল্ম ও তৃণাচ্ছাদিত ছিলো। বর্তমানে অনেকটা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। সম্মুখভাগে বেশকতক সারি অর্থের বিনিময়ে স্থায়ীভাবে কবরদানের জন্য জমি বিক্রয়ের প্রথা বহুদিন থেকে চালু থাকায় বহু কবরে সমাধি সৌধ, কোনটা মোজাইক, কোনটা ফেন্সী টালী, আবার কোনটা সাধারণভাবে পাকা করে রাখা হয়েছে এবং অনুরূপ হচ্ছে। অবশ্য জমির মূল্যের পরিমাণ কয়েক মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে পঁয়ত্রিশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান আমলেই পৌরসভা আজিমপুর কবরস্থানে স্থায়ী কবরদান তথা রিজার্ভেশন প্রথা রহিত করে এ কবরস্থানের সামান্য পশ্চিমে পীলখানা রোডের দক্ষিণ ধারেই যে ময়দানটি মুসলমান মাইফরাস তথা মৎস্যজীবিদের বাৎসারিক সিন্নী ও মেলার জায়গা ছিলো, সেটি হুকুম দখল করতঃ সেখানে নুতন কবরস্থান স্থাপন করে সেখানে শুধু স্থায়ী তথা রিজার্ভেশন কবরের ব্যবস্থা করা হয়।

আজিমপুর কবরস্থান ঢাকার এবং ঢাকার বাহিরের বহু খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি, খোদাভীরু আল্লাহ্‌র অলিয়ে কামেল, দরবেশ, ফকিরসহ অসংখ্য, অগণিত সাধারণ লোককে সর্বশেষ শয্যায় শায়িত করা হয়েছে। এবং আজও হচ্ছে, আগামীতেও চলবে তা যুগ যুগ বা শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে। কবরস্থানটির বেশ কিছু এলাকা নীচু থাকার ফলে বর্ষার সময় কবর খুঁড়লে কবরে পানি উঠে যেতো। তাই পানির মধ্যেই মরদেহের দাফন কার্য সমাধা করতে হতো। এ অবস্থার উন্নয়নকল্পে আইয়ুব

আমলে ঢাকা পৌর সভার চেয়ারম্যান মরহুম মঈনুদ্দিন চৌধুরী কবরস্থানের নীচু অংশে মাটি ভরাট, সরু পথগুলোকে পাকা করার এবং আরো বেশী করে বিদ্যুৎবাতি সংযোজনের ব্যবস্থা করেন। তাঁর কবরও এখানে রয়েছে। এ কবরস্থানে করিম শাহ্ ওরফে দাতা খাকা-র মাজার রয়েছে। মাজারটির পরিবেশ বর্তমানে বেশ সুন্দর করা হয়েছে। করিম শাহ্ গোরখপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বহুকাহিনী কিংবদন্তি রয়েছে। তিনি নাকি অসময়ের ফল, গরম মিষ্টি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য আচমকা এনে দিতে পারতেন। এখানে কামেল ব্যক্তিদের মধ্যে কামাল শাহ্ ও মোবারক শাহ্‌র কবরগাহ এখনও ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। শাহ্ মারীর কবরও উল্লেখযোগ্য।

কবরস্থানের সারিবদ্ধ কবরগুলোর মধ্যে দিয়ে যে শান্ত নির্জন পথ রয়েছে, সে পথ দিয়ে হাঁটার সময় পথচারীদের মনে পড়ে যায় আখেরাতের কথা। সাময়িকভাবে হলেও মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে নীরবে। কোন আপন জন বা আত্মীয়-স্বজনকে দাফন করতে গিয়ে কবরস্থানে ঢুকে পরস্পরের সাথে শুধু পরজীবনের কথাই আলোচনা হয়। আপনা থেকেই এই শেষ আশ্রয় ও আখেরাতের কথা স্মরণ পটে উদিত হয়। কিন্তু দুনিয়া এমনই কুহকিনী মায়াময় স্থান যে কবর স্থানের বাইরে আসার সাথে সাথে পার্থিব আকর্ষণে সবাই আবার যার যার পূর্বেকার জীবন-নাট্যে মশগুল হয়ে যায়। ভুলে যায় আখেরাতের সব কথা, সব ভয়-ভীতি। আপনাপন স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কিছুই যেন তারা চিন্তাও করতে পারেনা। এই নীরব গোরস্থানে কতো যে আশা-আকাংখার অকাল সমাধি ঘটেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। এখানে সমাহিত হয়ে আছে কতো শোক বিহ্বল জনক-জননীর নয়নের মণি পুত্র কন্যা, কতো পিতা-মাতারা এসেছেন কচি কচি শিশু সন্তানকে এতিম বানিয়ে, এসেছেন দরবেশ, ফকির, ধনী-দরিদ্র পাপী-তাপী মানুষ, কতো প্রভাবশালী ব্যক্তি। আছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয়া আম্মা মরহুমা, পিতামহ, নিজ প্রথমা পত্নি রাবিয়া খাতুন ও দুটি কন্যা-সন্তান। এখানে যারাই আসেন তাদের সব ভেদাভেদ আর হানাহানির হয় চির অবসান।

ঢাকার গোরস্থান প্রতিষ্ঠার পেছনে একটা ছোটখাট ইতিহাস রয়েছে। বহু শতাব্দী আগে থেকে মৃত ব্যক্তিকে পাহাড়ের গর্তে পুঁতে রাখা বা সমাহিত করার একটা সনাতন রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, বধ্যভূমিতেও পুঁতে রাখার প্রথা ছিলো। ঢাকা শহরের লোকেরা বাড়ীর আশে পাশে রাস্তার ধারে অথবা আত্মীয়-স্বজনের জমিতে কিম্বা কোন জলা ভূমির তীরে বা কোন খালের পাড়ে মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করতো। বিশেষ করে আরমানিটোলার একটি জল্লা (লেক) এবং দোলাইখালের

বিভিন্ন অংশে ছিলো মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করার একটি সাধারণ স্থান। সব সময় উপরোক্ত জল্লার পানি স্বচ্ছ ও শীতল থাকতো। পানি শুকিয়ে যাবার অব্যবহিত পর থেকেই সেখানে মৃত দেহ পুঁতে রাখা হতো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঁতি বাজার ও বংশালের নতুন রাস্তার ধারে কবর দেওয়া আরম্ভ হলে তাৎকালীন ঢাকার পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ' ঢাকার মুসলমানদের ইতর বলে আখ্যায়িত করে ১৮৬৪ সালের ২১শে এপ্রিল সংখ্যায় সরকারের বরাবরে জোর প্রতিবাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে।

যার ফলে ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ১৮৬৫ সালেই ঢাকা পৌর এলাকার মুসলিম বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের ও আত্মীয়-স্বজনদের লাশ দাফনের জন্যে পারিবারিক গোরস্থান স্থাপন করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব গোরস্থান অবশ্য শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ১৮৬৮ সালে ঢাকা পৌরসভা পৌর এলাকাধীন গোরস্থানগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। সে তালিকায় ১২টি গোরস্থানের নাম উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে চাম্পাতলী, বেগম বাজার, বেচারাম দেউরী, বংশাল, আগামসিহ্ লেন, আগাসাদেক ময়দান ইত্যাদি পারিবারিক গোরস্থানগুলোর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ব্যক্তিগত ছোটখাটো কবরস্থান আরো বহুস্থানে ছিলো।

১৮৬৯ সালে ব্যক্তিগত গোরস্থানের জন্য শহরের পরিবেশ দুষণের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে ডাঃ ওয়াইজ, খাজা আহ্সান উল্লাহ্ এবং ডাঃ গ্রাহমের মধ্যে একচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিমোতাবেক ব্যক্তিগত পারিবারিক গোরস্থানগুলির বিলোপ সাধন করে একটি সার্বজনীন গোরস্থান স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। এদিকে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সিদ্দিক বাজার এবং পুরানা ক্যান্টনমেন্ট তথা বর্তমান পুরানা পল্টনে দুটি নতুন গোরস্থান চালু করা হয়। ১৮৮২ সালে পুরানা নিকাশের গোরস্থানটি ঢাকা পৌরসভার অনুমোদন লাভ করে। এ ব্যবস্থা তথা চুক্তির ফলে ঢাকা শহরে অবশ্য কিছু সংখ্যক পারিবারিক গোরস্থানের বিলুপ্তি ঘটে। তবে, পরবর্তীতে মহল্লা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কয়েকটি পঞ্চায়েতী গোরস্থান বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এ ধরনের কবরস্থান ঢাকায় আজো বহু মহল্লায়, মসজিদ সংলগ্ন স্থানে রয়েছে। ১৮৮৯ সালে ঢাকা পৌরসভা গেণ্ডারিয়া এলাকায় অনুরূপ দুটি গোরস্থানের অনুমোদন দেন। কিন্তু টাকার অভাবে সার্বজনীন গোরস্থান স্থাপনের উদ্যোগ স্তিমিত হয়ে যায়। তখন ঢাকার পুলিশ ইন্সপেক্টর দীন নাথসেন সে এলাকায় গোরস্থান নির্মাণের সমস্ত ব্যয় বহনে স্বীকৃত হলে গোরস্থান নির্মাণের কাজ সমাধা করা হয়। আর সেই সালে

দীন নাথ সেন এর উদ্যোগে ও অনুরোধে ঐ এলাকার পারিবারিক গোরস্থানগুলির বিলোপ সাধন করা হয়। পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকায় অন্যান্য স্থানের পারিবারিক কবরস্থানগুলো একে একে বিলীন হয়ে যায়।

পারিবারিক গোরস্থান বিলোপ করা হলো সত্যি, কিন্তু পৌর কর্তৃত্বাধীন গোরস্থানে লোক অভাবে কবর খোঁড়া হতো না। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন নিজেরা কবর খুঁড়তে যেতো, তাদের নাস্তা পানির জন্য আত্মীয়গণ শুকনো রুটি তথা বাকরখানি বা নিমশুকা রুটি ও জিলেপি মিষ্টি প্রদান করতো। এ প্রথা পরবর্তীতে ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে শবযাত্রীগণ দাফন পর্ব সমাধা করে মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে আসলে তাদেরকে রুটি মিষ্টি খেতে দেওয়া হতো। যা আজো বহু পরিবারে অব্যাহত রয়েছে। এর আরো কারণ রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে সেদিন রান্না করে খাওয়া সম্ভব নয়, সবাই শোকে বিহ্বল থাকে তজ্জন্য এই হালকা নাস্তা বা খাদ্যের ব্যবস্থা হয়। তবে এই রুটি মিষ্টিই যে খেতে হবে, এমন কোন ধর্মীয় নির্দেশ না থাকলেও ঢাকাবাসী একে একটা নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। অন্যান্য শহর গ্রামের মধ্যেও এরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়।

কবর খোঁড়ার এ অসুবিধা দূরীকরণে পৌর কর্তৃপক্ষ ১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম কবরখোঁড়ার জন্যে টেণ্ডার আহ্বান করেন। সেমতে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের কবর খোঁড়ার জন্যে দশ আনা, কিশোরের স্যাত আনা, ও শিশুর জন্যে পাঁচ আনা ফি দিতে হতো। বর্তমানেও পৌর কবর স্থানগুলোতে এ ব্যবস্থা চালু আছে। তবে ফি-এর মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ।

ঢাকা পৌর করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে দুটি গোরস্থান বহুপূর্ব হতে চালু রয়েছে। তন্মধ্যে একটি আজিমপুরে ও একটি জুড়াইনে অবস্থিত। কালের প্রবাহে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ঢাকা নগরীতে গোরস্থানের সংখ্যাও বাড়াতে হয়েছে। বনানী গোরস্থানকে জাতীয় গোরস্থান ঘোষণা ব্যতিত মিরপুরে, মোহাম্মদপুরে এবং ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টে পৌর করপোরেশন কবরস্থানের ব্যবস্থা করেছে। আরো দুই তিনটি কবরস্থানের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা পৌর করপোরেশনের বিবেচনাধীন রয়েছে। লোক সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কবরস্থান না থাকার ফলে, যথাসত্বর সাধারণ কবরগুলোকে চালা দেওয়া হয় নতুন কবর দেওয়ার জন্যে। এরফলে, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের হাড়-গোড় সাথেই খুলি মাটিতে গুলিয়ে যায় না। তজ্জন্য পরিস্থিতি যাতে আয়ত্বের বাইরে চলে না যায়, সেজন্য ঢাকা সিটি করপোরেশনকে সময় থাকতেই এ বিষয়ে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পুরাতন ঢাকার অনেকেই বিশেষ করে আজিমপুরে যাদের জমি হুকুম দখল করে পৌরসভা কবরস্থানের জন্য নিয়েছে, তারা বলে থাকেন আজিমপুর কবরস্থানের দক্ষিণে সদর রাস্তার উপর যে খালী জমিটি ছিলো, সেখানে ইতিপূর্বে বাঁশ চাটাই রাখা হতো, সেই জমিতে সম্প্রতি মার্কেট স্থাপন না করে জমিটুকু কবরস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করে রিজার্ভ কবরের ব্যবস্থা করা যেতো। এতে পৌর করপোরেশনের কোন আর্থিক ক্ষতি হতো না। কেননা, জমিটুকু কবরস্থান সম্প্রসারণের জন্যেই হুকুম দখল করা হয়েছিলো। দ্বিতল মার্কেট স্থাপনে কবরগাহের নীরবতা যেমন ভঙ্গ হয়েছে, তেমনি হুকুম দখলের মূল লক্ষ্য ও আইনকে ভঙ্গ করা হয়েছে।

ধানমণ্ডির নিকটে কলাবাগান এলাকায় এক সময় কলাগাছের সমারোহ বা বাগান ছিলো বলে উক্ত এলাকাটি কলাবাগান নামে পরিচিতি লাভ করে। যা আজও ঐ নামেই আখ্যায়িত হয়। এই কলাবাগান এলাকাতেই একটি গলি পথের নাম ভুতের গলি। এই ভুতের গলিতে ভুত নাথ নামে এক ব্যক্তি বাস করতেন। তখন ঢাকায় ভুতের নাম গল্প গুজবে খুব প্রচলিত ছিল আর সেই সূত্রেই ভুত নাথের বদলে ভুতের গলি নামকরণ হয়েছে বলে জানা যায়। ভুতের গলি নামে ঢাকার পূর্বাঞ্চলের মৈশুন্দি এলাকায়ও একটি গলি পথ রয়েছে। আবার এও হতে পারে এই গলি পথসমূহে লোকজনকে ভুতে ধরতো বিধায় ভুতের গলি নামকরণ হয়েছে।

গ্রীন রোড এলাকাটি পূর্বে কুলি রোড বলে পরিচিত ছিল। ধারণা করা হয় এখানে কুলিদের বাসস্থান ছিলো। তৎ কারণেই কুলিরোডের নামকরণ হয়েছিলো।

লালবাগ, আতসখানা, আমলীগোলা, চৌধুরী বাজার, সোনার টুলী, শেখ সাহেব বাজার ও ভাট মসজিদ মহল্লার কোনটি পূর্ণ কোনটির অংশ নিয়ে ঢাকা পৌরসভা ঐতিহাসিক লালবাগ দূর্গের নামানুসারে নামকরণ করে ছিলেন লালবাগ রোড। লালবাগ দূর্গ এলাকা ও তৎসংলগ্নস্থ উত্তরের লালবাগ মহল্লাটিতে হয়তো এক সময় লালবর্ণের ফুলের সমারোহ ছিলো। সেজন্যই মহল্লা বা এলাকাটি লালবাগ নাম ধারণ করেছিলো, কারণ পূর্ব যুগে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ফুলের বাগ বাগিচা ছিলো বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে।

এই ঐতিহাসিক লালবাগ রোডের নাম পরিবর্তনের জন্যে ১৯৩৯ সালে যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তাতে স্বার্থবাদী মহল যে যুক্তি প্রদর্শন করে ছিলো, তাতে বলা হয়েছিলো, মোঘল দূর্গটির নাম লালবাগ দূর্গ নয়, এর নাম কেল্লা আওরঙ্গবাদ। অতএব লালবাগ নামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ঢাকার জনগণ এই দূর্গকে সাধারণভাবে লালবাগ দূর্গ বলেই অভিহিত করে আসছেন। এবং যুগ যুগ ধরে

এ নাম দেশ-বিদেশে পরিচিত হয়ে গেছে।

বর্তমান লালবাগ রোডে অবস্থিত খান মহম্মদ মৃধার মসজিদটির জমি ওয়াকফ্ হলেও বৃটিশ শাসনামলেই মসজিদটি পুরাতন কীর্তি সংরক্ষণ আইনের অধীনে সরকারের হেফাজতে নেওয়া হয়। নবাবী আমলে এ মসজিদের পর আর কোন অট্টালিকা স্থাপিত হয়নি। সুতরাং এটাই ঢাকার মোঘল স্থাপত্যের শেষ নিদর্শন। বৃটিশ শাসনামলে মসজিদটি এক করুণ অবস্থায় পতিত হয়। এবং ধ্বংশপ্রাপ্ত হতে থাকে। সরকারী অবহেলার ফলে এক সময় মসজিদের নীচ তলাটি ঢাকা পৌরসভার আবর্জনা পরিস্কারের ও পানি সরবরাহ গাড়ীর বলদের আস্তাবল রূপে ব্যবহৃত হতো। এই আস্তাবলের ভাড়া থেকে মুয়াজ্জিনের বেতন ও মসজিদের প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহ হতো। পৌরসভায় মুসলিম কমিশনারগণ মসজিদের নীচে বলদের আস্তাবল করার সিদ্ধান্ত কিভাবে মেনে নিয়েছিলেন জানিনা। তবে এতেই প্রমাণিত হয় ঢাকায় মুসলমানদের প্রভাব কত দূর নিম্নস্তরে চলে গিয়েছিলো।

দূর্গের অপর দিকে সদর রাস্তার ধারে কানাবাবুর বড় বাড়ীটি পাক আমলে বেশ সুন্দর করা হয়। ফুলের সমারোহের ব্যবস্থাও করেন ভারত থেকে আগত ডাঃ শামীম। তিনি খুবই অমায়িক ও মার্জিত ব্যক্তি ছিলেন, এ বাড়ীটিতে নবাবী আমলে আন্নুবাঈ, গান্নুবাঈ ও নওয়াবিন বাঈ নামে তিন ভগ্নি ছিলো। এরা চকবাজার–বেগম বাজার সড়কের সংযোগস্থলে যে বাড়ীটি পাক আমলে ডঃ শহীদ উল্লাহ্ সাহেব খরিদ করেছিলেন সে বাড়ী ও তৎসলগ্ন বাড়ীতে নৃত্য গীতের আসর বসাতো। তারা নবাব ও জমিদারদের আমন্ত্রণে তাদের মহল ও অনুষ্ঠানে অংশ নিতো। লালবাগ দূর্গের উত্তর পার্শ্বের যে সব জমি ছিলো তার মালিক ছিলো হিন্দু মহাজনরা। তারা সেখানে মুসলমানদের রায়ত হিসেবে বসিয়ে ছিলেন অনেককে। বাংলা ১৩২৬ সালে যে তুফান হয় তাতে বাড়ী ঘড়-ভূমিসাৎ হয়ে গেলে তাদেরকে আর ঘর তুলতে দেওয়া হয়নি। সেস্থানে জমির মালিকগণই বাড়ী ঘর তুলেন। শুধু একটি মাত্র বাড়ী মীরপুরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ছিলো তাদের পূর্ব পুরুষদের কবর ছিলো সে বাড়ীর সদর রাস্তার ধারে। পরবর্তীতে লোকে মনে করতো কোন বুজুর্গ ব্যক্তির কবর। স্বাধীনতার পর তাদের বংশধরগণ ঐ কবর সংলগ্ন জায়গাটি বিক্রয় করে দেন লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরস্থ মসজিদ পরিচালনা কমিটির নিকট।

লালবাগ রোডের মধ্য অংশে অনেক গোয়ালা ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের বসবাস ছিলো। এদ্দেরই এক জনের নিকট হতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সমাজসেবী ও সমবায়ী গোপীবাবু খরিদ করে একটি সুন্দর বাড়ী নির্মাণ করেন। বাড়ীর ফটকের উপর একটি

সিংহ তৈরী করেন, যা এখনো রয়েছে। এলাকাবাসী ঐ বাড়ীটিকে আজও বাঘওয়ালা বাড়ী আখ্যায়িত করে। কৃপানাথ সাঁহার যে সুন্দর কারুকার্য করা বাড়ীটি আজও রয়েছে, সেখানে পূর্বে ঠাকুর জির স্কুল ছিলো। স্কুলটি বখসি বাজারে স্থানান্তরিত করে কৃপানাথ সাহা বসবাসের জন্য সুন্দর সুউচ্চ বাড়ীটি নির্মাণ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর চকবাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আঃ লতীফ সাহেবের পুত্রগণ এবাড়ী খরিদ করে নেন। বাড়ীটি পূর্বাবস্থায়ই রয়েছে। এ ধরনের বাড়ী ঘর ঢাকায় আজ খুব কমই দেখা যায়-এর ছবি ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তারই অপর দিকের বাড়ীটি ছিলো বিত্তবান গোবিন্দ বাবুর। এ বাড়ীতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভিসা অফিস ছিলো। সে সময় ভারত থেকে আগত ব্যক্তিগণকে এখানে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হতো। এর সামান্য পশ্চিমে জমিদার কৈলাশ বাবুর বাগান বাড়ী। এ বাড়ীটিতে পাক আমলে রহমত উল্লা মডেল হাই স্কুল রাজা শ্রীনাথ স্ট্রীট হতে স্থানান্তর করে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটি পূর্বে উর্দু মাধ্যম ছিলো। স্বাধীনতার পর বাংলা মাধ্যম করা হয়েছে।

লালবাগ রোড ও পুষ্পরাজ সাহা লেনের সংযোগ স্থলে একটি ঘর তথা বাংলা ছিলো। সেখানে হিন্দু অধিবাসীদের হোলীরগান, চৈত্রসঙ এবং অন্যান্য বিভিন্ন পূজা পার্বন ও উৎসবের গান বাজনার রিহার্সাল হতো। আজ সে বাংলা নেই। রাজা শ্রী নাথ স্ট্রীট ও লালবাগ রোডের সংযোগ স্থলে যে মাজারটি দেখা যায় তা মোঘল সুবাদারী আমলের। লোকে কোন বুজুর্গ ব্যক্তির মাজার বলে জেনে আসছে তাই হিন্দুগণ এ মাজারের অস্তিত্ব মুছে ফেলেননি। আরো একটু পশ্চিমে গেলে সরকারী লালবাগ বালিকা বিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বৃটিশ যুগে যখন বালিকাদের জন্য ঢাকায় টেন টাউন গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি তারই একটি। আজ সে নামও নেই, সেই লাল রং এর দালানও নেই। পাক আমলে ঢাকা পৌরসভার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান থাকাকালে এর পুনঃ নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করি। যা আজও সে ভাবেই রয়েছে। এরই সংলগ্ন রয়েছে জামিলা খাতুন লালবাগ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে লালবাগ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামে। বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের জন্য জমির মূল্য প্রদাণ করলে বিদ্যালয়টি নুতন নামকরণ হয় আমাদের মাতার নামানুসারে জামিলা খাতুন লালবাগ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। জামিলা খাতুন ৬০/৭০ বছর যাবৎ আরবী, ফার্সি, উর্দ্দু, বাংলা শিক্ষা স্থানীয় বালক-বালিকাদের প্রদাণ করে গেছেন শতবর্ষে পদার্পণ করেও তার শিক্ষা প্রদাণ বন্ধ থাকেনি। অত্র এলাকায় তার সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। তিনি ১৯৮৬ সালে ২৫শে ডিসেম্বর জান্নাতবাসী হন।

এ বিদ্যালয়ের পশ্চিমেই রয়েছে লালবাগ ঋষি পাড়া ও রাধা মাধব মন্দির। তারও পশ্চিমে সাবেক পৌর কমিশনার বাবু হরমোহন শীলের বাড়ী ও আখড়া। একে নাট্য মন্দিরও বলা যেতে পারে। মন্দিরে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ বিশেষ করে ঝুলন পর্ব উদযাপনকালে এ মন্দিরে নাচ-গান ও নানারূপ আনন্দ উৎসব করা হতো। সে সব উপভোগ করার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলাদের জন্য বেলকনিসহ মন্দিরের সংলগ্ন মিলনায়তন নির্মাণ করেছিলেন হরমোহন শীল বাবু। মিলনায়তনের বাইরেও মাঝে মধ্যে নাটক মঞ্চস্থ হতো, রাজনৈতিক সভা সমিতিও হতো। বাবু হরমোহন শীল পৌরকমিশনার থাকা কালে হিন্দু শবদাহ করার কাঠ খরির মূল্য ও পৌর ফি তিন টাকা ছিলো। তার আপ্রাণ চেষ্টায় দুই টাকা বার আনা অর্থাৎ চার আনা কমাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তজ্জন্য হিন্দু গরীব সমাজের নিকট প্রশংসা লাভ করতে পেরেছিলেন। তৎপুত্র অনুকুল শীল প্রথম জীবনে বৃটিশ সেনা বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। পরে চাকুরী থেকে পদত্যাগ করে স্থানীয় হিন্দুদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তার সঙ্গে হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর খুবই হৃদ্যতা ছিলো।

লালবাগ রোডের ঋষি পাড়ার তফসিলি হিন্দুগণ স্যাণ্ডেল ও জুতো তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতো। গরীব হলেও তারা বিভিন্ন পূজা-পার্বণে উৎসবে আনন্দ করতে কোন অংশে কম ছিলো না। চৈত্রের সঙ, যাত্রা গান, কীর্তণ ইত্যাদিতে মশগুল থাকতো। এখানে আদু ঋষি নামে এক ঢোলক ছিলো সে নবাব বাড়ীর বিবিগণের গানের আসরে ঢোল বাজিয়ে বেশ বকসিস প্রাপ্ত হতো। ফলে ঋষি পাড়ার মধ্যে প্রথম তার বাড়ীটিই পাকা হয়েছিলো। এ পাড়ায় ১৯০২ সালে রাধা মাধব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গিরিশ ঋষি। তিনিও প্রভাব শালী ব্যক্তি ছিলেন তাদের সমাজে। এ মন্দিরটি অতি জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ১৯৭৭ সালে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনোয়ার হোসেন পরধর্মে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ মন্দিরটি পুনঃ নির্মাণ করে দেন। বাংলা ১৩৪৪ সালের দিকে এ পাড়ার ঋষি সম্প্রদায়ের লোকজন মন্দিরের চত্বরে একটি দূর্গা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মহল্লাবাসীগণ মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্তি লাভের কিছু দিনের মধ্যে স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত হন যে দূর্গা প্রতিমা যেন বিসর্জন না দেওয়া হয়, এক বছর পর মূর্তিগুলো ভেঙ্গে সে মাটি দ্বারা পুনঃ প্রতিমা যেন তৈরী করে পূজা দেওয়া হয়। অদ্যাবধি সে স্বপ্নাদেশ অনুসারে এ মন্দিরের দূর্গা প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়না। এক মাস উপবাসের পর এ পাড়ায় প্রতি বছর নাম কীর্তন ও মহোৎসবের

ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, এতে বহু লোক ভোজে আমন্ত্রিত হয়।

লালবাগ রোড ও আজিমপুর সংযোগ স্থলে একটি দোতালা মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি ১১২১ হিজরীতে ফাজেল আফগান নামক এক বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর কবর মসজিদের সিঁড়ির নিকট রয়েছে।

লালবাগ রোডের পূর্ব প্রান্তে যে ঘরটি রয়েছে সেটা খোদাবক্স খলিফার গদী ঘর ছিলো। তিনি এক জন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তীতে এই গদী ঘরটিকে আমীর উদ্দিন সরদার লালবাগ মহল্লাবাসীদের পঞ্চায়েত বাংলা তথা সামাজিক কেন্দ্রে পরিণত করেন। তখন হতেই এটি লালবাগ এলাকার মুসলিম মহল্লাবাসীদের সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এরই মধ্যে বেশ কতক বছর পূর্বে লালবাগ সমাজ উন্নয়ন সমিতি নামে একটি সমিতি ও সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এখন আর তেমনটি নেই।

লালবাগ রোডের পশ্চিমাশের কিয়দংশ ভাট মসজিদ মহল্লা নামে পরিচিত। ভাট পদবীধারী অনেকের মতে ভাট শাহ্ নামে এক ব্যক্তি উক্ত এলাকায় বহুকাল পূর্বে একটি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানেই অবস্থান করতো। মসজিদের আশে পাশে ধীরে ধীরে একটি বস্তি গড়ে ওঠে। কালে মসজিদটি ভাট মসজিদ নামে সকলের নিকট পরিচিত হয়ে যায়। আর সে মসজিদের নামানুসারেই বস্তি তথা মহল্লাটি ঢাকাবাসীর কাছে ভাট মসজিদ নামে পরিচিত হয়ে গেছে। এই মসজিদের মধ্যেই নাকি ভাট শাহ্‌র মাজার ছিলো। বর্তমানে তাঁর কোন নিদর্শন নেই। যদিও বর্তমানে কাগজ পত্রে দলিল দস্তাবেজে এলাকাটি লালবাগ রোডেরই অংশ হিসাবে উল্লেখ রয়েছে তথাপি আশে পাশের এলাকাবাসীরা ভাট মসজিদ মহল্লা বলেই উল্লেখ করে আসছেন।

এ ভাট মসজিদ মহল্লার আরেকটি বড় মসজিদ রয়েছে যা প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে তৈরী হয়েছিলো একটি মাটির ঢিবির উপর। এ মসজিদের নিকটেই শায়িত আছেন বিশিষ্ট বুজুর্গ সৈয়দ শাহ্ বোরহান উল্লাহ কাদরী। তাঁর পিতা বোগদাদ নগরীর গওসুল আজম হজরত বড় পীর মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানীর (রহঃ) মাজার শরীফের গদীনশীন খাদেমানের একজন। নাম ছিল সৈয়দ শাহ মিরান হাসান কাদেরী। তিনি হজরত বড় পীর সাহেবের বিংশতম পুরুষ। সৈয়দ বোরহান উল্লাহ্‌র বাল্যকাল, খলিফা হারুন রশিদের বোগদাদ, আলেফ লায়লার রূপকথার কেন্দ্রস্থল বোগদাদের গদীনশীন পীরের খানকাতেই কাটে। তিনি ১২৩৭ হিজরীতে বোগদাদেই জন্ম গ্রহণ

করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য পিতা তাঁকে ইরানের তৎকালীন বিখ্যাত মাদ্রাসায় প্রেরণ করেন। তিনি ইসলামী বহুবিধ শিক্ষার সঙ্গে সুফিবাদেও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর মায়ের ভাষা আরবী হলেও তিনি ফার্সী ও উদ্দুর্তে কেতাব রচনা করেন। এতেই প্রমাণিত হয় তিনি বিদেশী ভাষাসহ বিদ্যাশিক্ষায় কত পারদর্শী ছিলেন। তারপর তিনি তুরস্কে যান। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের অধীন ক্রিমিয়ায় লড়াই শুরু হলে তুর্কী খলিফা নিকটবর্তী মুসলিম দেশগুলোর জোয়ানদের তুর্কী ফৌজে সামিল হওয়ার আহ্বান জানালে সৈয়দ বোরহান উল্লাহ্ ইরান ও ইরাক থেকে একদল আনসার মোজাহিদ গঠন করে খলিফার দরবারে হাজির হন এবং তিনি নিজেও ফৌজী তালিম গ্রহণ করে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে খলিফা তাঁকে গাজী খেতাবে ভূষিত করেন। কিন্তু যাঁর দীল মন ইসলামের তবলীগের জন্য, সেকি ফৌজী চাকুরীতে থাকতে পারেন? তাই তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণে বের হন। এবং এক সময় ইয়ামেনে এসে তবলীগ ও ন্যনা কাজের জন্য অবস্থান করেন। এ সময় ইয়েমেনের সম্ভ্রান্ত বংশীয় মাওলানা আবুল ফতেহ সাহেব সৈয়দ বোরহান উল্লাহ্র বংশ মর্যাদা ও বিদ্যা বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়ে তদীয় কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দান করেন। পরবর্তীতে সৈয়দ বোরহান উল্লাহ্ পরিবারসহ বোগদাদে পিতার নিকট ফিরে যান। কিন্তু পিতা তার অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় পুত্রবধু ও নাতীকে গ্রহণ না করে ইয়েমেনে পাঠিয়ে দেন। পত্নী ও পুত্র শোকে সৈয়দ বোরহান উল্লাহ অস্থির হয়ে পুনরায় দেশান্তরী হলেন। অনেক দেশ ঘুরে মালেশিয়ার পিনাং দ্বীপে উপস্থিত হন। এবং অনেকের অনুরোধে তবলীগের কাজে মনোনিবেশ করেন। সেখানকার বিখ্যাত আলেম মাওলানা মহম্মদ গাওগুল আরিফ সৈয়দ সাহেবের গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শ্যালিকার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন, তাকে স্থায়ীভাবে পেনাং এ রাখার জন্যে। তখন পেনাং দ্বীপে সৈয়দ সাহেবের নামও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিলো। কয়েক বছর পর তিনি আবার পিতা মাতার সাক্ষাতের জন্য বোগদাদে যান। তখন তার পিতার শেষ জীবন। তাই মাতার অনুরোধে পিতা ক্ষমা করেন এবং স্ত্রী-পুত্রকে গ্রহণ করেন। কিছু দিন পর পিতার মৃত্যু হলে, তিনি হজ্ব সমাপনের উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে মক্কা গমণ করেন এবং সেখান হতে পুনরায় পেনাং চলে যান। গরম কাপড়ের ব্যবসা কল্পে কলকাতায় এসে ঢাকার তাহজিব তমদ্দুন ও সভ্যতার কথা শুনেন এবং আকৃষ্ট হয়ে ১৩০১ বাংলা সনে ঢাকায় এসে প্রথমে বাবু বাজারের জুমরাইল লেনে বসবাস আরম্ভ করেন। সে সময়ই তিনি বাদামতলীর জমিদার বাড়ীর কাজী রেয়াজুদ্দীন, নবাব বাড়ীর খাজা আজম, স্বনামধন্য হেকিম হাবিবুর রহমান এবং

ঢাকার অন্যান্য প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হন। তাদের অনুরোধে তবলীগের কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। কয়েক বছর পর নবাবগঞ্জে এসে বসবাস করতে থাকেন এ সময় ফরাসগঞ্জের বাবু রূপলাল দাস (জমিদার) এক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে অনেক ডাক্তার কবিরাজ হেকিম দেখিয়ে যখন নিরাশ হন তখন কাজী রেয়াজুদ্দীন সাহেবকে অনুরোধ জানান সৈয়দ বোরহান উল্লাহ্ সাহেবের দোয়া তাবিজের জন্য। তিনি সৈয়দ সাহেবকে তার রোগের বর্ণনা দান করলে তিনি এক জোড়া কবুতর আনতে বললেন। কবুতরের গলায় তাবিজ বেঁধে কাজি সাহেবকে বলেন যে, কবুতর রূপ বাবুকে দেখাবেন, কিন্তু ছুতে দেবেন না তারপর ছেড়ে দেবেন যদি কবুতর দুটো উড়ে চলে যায় তবে বুঝবেন তিনি আরোগ্য হবেন। আর যদি উড়ে তার বাসায় বসেন তাহলে মনে করেন এ রোগেই তার মৃত্যু। সেভাবেই করা হলো। কবুতর উড়ে গেল আকাশের দিকে চোখের আড়ালে। ধীরে ধীরে জমিদার রূপ বাবু ভাল হয়ে উঠলেন।

এমন সিদ্ধ পুরুষের জন্য একখানা স্থায়ী বাড়ীর ব্যবস্থার জন্য রূপ বাবু ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তার ইচ্ছানুসারে বর্তমান ভাট মসজিদের বাড়িটি সৈয়দ সাহেবকে দেখানো হলে তিনিও পছন্দ করলেন বিশেষ করে যে স্থানে তাকে দাফন করা হয়েছে সে স্থানের লিচু গাছের তলা থেকে মাটি নিয়ে বলে ছিলেন "যাব্ ঢাকামে আয়া তব ঢাকাই মুঝে ঢাকে গা" পরবর্তীতে এই লিচু গাছ তলায় তার মরদেহ দাফন করা হয়। এই বাড়িটি দু'হাজার টাকায় জমিদার রূপলাল বাবুই খরিদ করে দিয়েছিলেন বাংলা ১৩১৩ সালে এ বাড়ীতেই সৈয়দ সাহেব তার স্থায়ী খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি ঢাকায় এসে এই ভাট মসজিদে স্থায়ীভাবে বসবাস করা প্রাক্কালেও অনেক অনেক অলৌকিক কেরামত দেখতে পেয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর ইন্তেকালের সময়। বাংলা ১৩২১ সালের পৌষ মাসে তিনি হাজার হাজার মুরিদান ও আশেকানদের কাঁদিয়ে জান্নাতবাসী হন। (ইন্নালিল্লাহে ---- রাজেউন) সেদিন বাদ জোহরের সময় আমার নানা তৎকালীন ভাট মসজিদের (বড়) পেশ ইমাম হাজী হাফেজ মাহবুব বখ্স এর ইমামতিতে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলো। আসমানে মৃদু গুরু গুরু আওয়াজ আরম্ভ হতে লাগলো। সকলের মনেই উৎকণ্ঠা দেখা দিল। বৃষ্টির পানি ফোটা ফোটা কফিনের উপর ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। গোলাপের খসবু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কফিনের বাইরে কোন বৃষ্টির পানি পড়তে দেখা গেলোনা। অগণিত মানুষ তন্ময় হয়ে দেখলো এ দৃশ্য। তার

এক আশেকান মৌলভী আঃ বারী সাহেব দু'লাইনের এক আবৃতি করলেন যার মর্ম হলো, বোরহান প্রিয় বিচ্ছেদে আসুজারি করে করে মরে গেলো, গোসল দিল তাঁকে ফেরেস্তাগণ গোলাপ পানিতে।

পরবর্তীতে এ মহল্লায় ক্রিসেন্ট ক্লাব নামে একটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। বিশেষ করে ক্লাবটি মুসলমানদের মধ্যে ক্রীড়া ও নাটক মঞ্চায়নের চেষ্টা করে। অত্র এলাকায় নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা নাটকটি এ ক্লাব প্রথম মঞ্চস্থ করেছিলো। যাতে অভিনয় করেছিলেন আজকের বহু যশ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। তন্মধ্যে সিরাজের ভূমিকায় বিশিষ্ট ডাঃ এ, কে, নুরুল ইসলাম (বর্তমান মেট্রোপলিটন ক্লিনিকের মালিক) আলেয়ার ভূমিকায় অভিনেতা খাঁন আতা, লুৎফার ভূমিকায় পরিচালক বাহাউদ্দিন, জগৎ শেঠের ভূমিকায় অত্র এলাকার সাবেক পৌর কমিশনার নুর আহমেদ প্রমুখ। পরিচালনা করেছিলেন জিতেন বাবু।

দূর্গ ইতিহাসের নীরব সাক্ষী, দূর্গ নিয়ে দেশে-বিদেশে লেখা হয়েছে বহু ইতিহাস, গল্প উপন্যাস আর রহস্যময় কাহিনী। অনেক কল্প কাহিনী আর কিংবদন্তীর সমাহারও ছড়িয়ে আছে দূর্গ নিয়ে। এখনও কি রোজ রাত্রে সেন্ট ফ্রান্সিস দূর্গে ফিরে আসেন ভাস্কো-ডা-গামা? এ রকম অনেক দূর্গের রোমাঞ্চকর কাহিনী লিখে গেছেন অনেক ইতিহাস বেত্তা ও কাহিনীকাররা। পৃথিবীর রহস্যময় দূর্গগুলোতে দুঃসাহসীরা বার বার ছুটে গেছেন রহস্যের সমাধানে কিন্তু তারা প্রায়ই বোকা বনে গেছেন। ঐ সব ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে সংশয় থাকলেও দূর্গের আশে পাশে বা সেই শহর নগরে আজো সে সব কাহিনী শোনা যায় স্থানীয় মানুষের মুখে-কোথাও বা দূর্গের গাইডদের কাছ হতে। আর এভাবেই বাস্তব ও কল্পনা মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে ঐ সব কাহিনীগুলোতে। বাংলাদেশের বহু দূর্গ রহস্যের প্রতীক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আজো আমাদের সামনে। দূর্গের ভগ্নস্তুপ ও প্রাচীরের মধ্যে লুকিয়ে আছে অদ্ভুত সব কাহিনী, এমন সব রহস্য যার কখনই সমাধান হয়নি। ভবিষ্যতে হবে কিনা তাও কেউ বলতে পারেনা এই বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কম্পিউটারের যুগে।

কবে প্রথম তৈরী হয়েছিলো দূর্গ? কেন হঠাৎ মানুষ তৈরী করতে শুরু করে বিরাট বিরাট আবার কোথাও স্বল্প পরিসরের কেল্লা? বলা বাহুল্য আত্মরক্ষার কারণেই দূর্গের সৃষ্টি। দূর্গ আর কিছুই নয়, শত্রু সৈন্যের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে প্রস্তুত একটি সুরক্ষিত অঞ্চল বা এলাকা। দূর্গ মানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় একটি ছোট খাটো সুরক্ষিত শহর। কেল্লাগুলো শত্রুরা অবরোধ করলে যেনো বহুদিন পর্যন্ত কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্যে বিভিন্ন আকারের দূর্গ তৈরী

করা হতো। অবশ্য সু-প্রশস্থ বিরাট প্রাচীর ঘেরা ভবনের মতও রয়েছে অনেক গ্রাম-গঞ্জে গুরুত্বপূর্ণ নদীর মোহনায়, শত্রুরা যাতে রাজধানী সহজে আক্রমণ করতে না পারে তজ্জন্য।

মানুষ দূর্গ তৈরী করার কৌশল আয়ত্ব করেছে বহু কাল আগে। ৭০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে প্যালেষ্টাইনের প্রাচীন নগরী জেরিকোকে রীতিমত দূর্গ নগরীতে রূপান্তরিত করা হয়েছিলো। এটি সম্ভবত দূর্গের প্রাচীনতম নিদর্শন। মহোঞ্জোদরো হরপ্পা ভগ্নাশেষ আবিস্কারের সময়েও বেশ কিছু দূর্গের খোঁজ পাওয়া গেছে। তাই দূর্গের আবিস্কার বলা যায় মানুষের সভ্যতার আদি পর্বেই হয়েছে। তবে উল্লেখ্য যে দূর্গ নির্মাণ কৌশলে ফরাসীরা হলো পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম।

ঢাকায় মোঘল আমলের ঐশ্বর্য আর সমৃদ্ধির পরিচায়ক লালবাগ দূর্গ, যা সম্রাট আওরংগজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা আযম নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং পিতার নামানুসারে এর নামকরণ করেন কেল্লা আওরংগবাদ অর্থাৎ আওরংগবাদ দূর্গ। কিন্তু সাধারণ অধিবাসীরা একে লালবাগ দূর্গ নামেই অভিহিত করে আসছে আজ অবধি। এ দূর্গ বিগত তিন শত বছরের ইতিহাস নীরবে গাম্ভীর্যে বহন করে চলেছে। ধ্বংস, ক্ষয় ও চরম অবহেলার পরও লালবাগ দূর্গের যা অবশিষ্ট ছিলো তার সৌন্দর্য্য আর স্থাপত্য কৌশলে আমাদের গৌরব ও গর্বই ছিলো। বর্তমানে এর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির যে প্রচেষ্টা চলেছে তা পূরণো ঐতিহ্যের অনেক কিছুই ফিরে পাবে বলে এ দেশবাসী আশা করে।

১৬৭৭ সালে সম্রাট আওরংগজেব আলমগীর সুবে বাংলার অতি প্রিয় সুবেদার নবাব শায়েস্তা খাঁনকে দিল্লীতে তলব করেন এবং তদীয় পুত্র শাহজাদা আজম শাহ্‌কে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। শাহজাদা আযম শাহ্ ও ছিলেন উৎসাহী নির্মাতা। বুড়িগংগা নদীর উত্তর তীরে সেনানিবাস ও রাজ প্রসাদ দুই এর সমন্বয়ে একটি জটিল নকশার অনুসরণে লালবাগ প্রাসাদ দূর্গের নির্মাণ কাজ তিনি শুরু করেন, এই বিরাট প্রদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার মানসে। সম্রাট আওরংগজেবের ইচ্ছা ছিলো তাঁর কোন এক পুত্রকে স্থায়ীভাবে ঢাকার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করবেন। এই বাসনা নিয়েই পুত্র শাহজাদা আজমকে এ কেল্লার নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। দূর্গটি মোঘল সাম্রাজ্যের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো। যদি না ১৬৭৯ সালে মেবারের রানা সিংহের বিদ্রোহ দমন অন্যদিকে সম্রাটের চির প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শাহাজাদা আজমের ডাক না পড়তো। আজম শাহ্‌কে রাজপুতনায় ডেকে পাঠালে তিনি দূর্গ নির্মাণের কাজ অসমাপ্ত রেখেই ঢাকা

ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যেই তিনি দূর্গ প্রাসাদের অনেক কাজ সমাপ্ত করেছিলেন তন্মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ তোড়ন, সুউচ্চ প্রাচীর, দূর্গাভ্যন্তরে দরবার হল ও হাম্মামখানা, মসজিদ, সুড়ংগ পথ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর ঢাকা ত্যাগের পর নবাব শায়েস্তা খাঁন দ্বিতীয়বার বাংলার সুবেদার হিসেবে ঢাকা আগমণ করেন। ১৬৮২ সালে উইলিয়াম হেজেস যখন ঢাকা আসেন তখন লালবাগ দূর্গের অভ্যন্তরেই তিনি নবাব শায়েস্তা খাঁনের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তখনও দূর্গের অসমাপ্ত কাজ চললেও শায়েস্তা খাঁর সুনজর আকৃষ্ট করতে পারেনি। কারণ এটি তাঁর কল্পনা প্রসুত ছিলোনা। পূর্বসুরীর পরিকল্পিত কাজকে সমাপ্ত করেছেন মুসলিম শাসক বর্গের এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসবেত্তা মিঃ ব্রাডলে বাটও মন্তব্য করেছেন যে যেহেতু লালবাগ দূর্গ শাহজাদা আজমের কীর্তি, সেহেতু এই দুর্গের কাজ শেষ করতে শায়েস্তা খাঁন উৎসাহী ছিলেন না। লালবাগ কেল্লার প্রতি শায়েস্তা খাঁর বিতৃষ্ণার আরও একটি কারণ ছিলো। শাহজাদা মুহম্মদ আজমের সাথে শায়েস্তা খাঁর অতি আদরের পরমা সুন্দরী কন্যা ইরান দুখ্‌ত্ ওরফে পরী বিবির বিবাহ হয়েছিলো। ১৬৮৪ সালে শায়েস্তা খাঁনের সেই আদরের কন্যা পরী বিবির আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। কন্যার এই আকস্মিক মৃত্যুকে নবাব অমঙ্গল সূচক মনে করে সে বৎসরই দূর্গের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত অবস্থাতেই বন্ধ করে দেন। মিঃ বাটও এ অভিমত তার পুস্তকে উল্লেখ করে গেছেন। তার এই সব অভিমতের সঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকারসহ অনেক ঐতিহাসিকের মতভেদ রয়েছে। তাদের মতে কন্যার মৃত্যু যতই অমঙ্গলসূচক হউক না কেন তজ্জন্য দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট আওরংগজেবের অধীনস্থ কোন সুবেদার তার ইচ্ছামত দূর্গের কাজ বন্ধ করতে পারেন একথা বিশ্বাস করা যায় না। যেহেতু সম্রাটের আদেশেই দূর্গ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিলো স্থগিতও হয়েছে তাঁরই অনুমোদন ক্রমেই। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য নির্মাণ কাজ স্থগিত হওয়ার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশে গোলযোগের তীব্রতা, রাজপুতদের বিদ্রোহ রোধকল্পে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যয় বহনকল্পে সাম্রাজ্যের অন্যান্য সুবার ব্যয় বহুল প্রকল্পগুলো বন্ধ করে দিয়ে যত বেশী সম্ভব রাজস্ব দিল্লীতে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেন। বাংলাদেশ থেকেও অতিরিক্ত অর্থ জোগান দিতে গিয়েই হয়তো সম্রাটের নির্দ্দেশেই শায়েস্তা খাঁন লালবাগ দূর্গের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আমার মতে এ কারণও পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না, কারণ দূর্গের কাজ বন্ধ

করলেও সুবেদার শায়েস্থা খাঁর সৌন্দর্য্য পিপাসু মন স্থাপত্য নির্মাণ থেকে নিবৃত্ত হয়নি। প্রিয় কন্যার মৃত্যুতে শায়েস্তা খাঁন ভীষণভাবে মর্মাহত হয়ে পড়লেও কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থে দূর্গের অভ্যন্তরে তাঁর সমাধির উপর অতি যত্নের সঙ্গে বিপুল অর্থ ব্যয়ে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করেন যা তৎকালে এর চেয়ে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত কোন ইমারত পূর্ব বাংলায় আর অন্যটি ছিলোনা। এটি একটি দূলর্ভ স্থাপত্য নিদর্শন। এর পরেও সুবেদারী পদ থেকে ১৬৮৮ সালে অবসর গ্রহণ অবধি বহু অর্থব্যয় করে বেশ কিছু মসজিদ নির্মাণ করে গেছেন।

পরী বিবি ওরফে ইরান দুখ্‌ত্‌ এর সঙ্গে নবাব শায়েস্তা খাঁনের কি সম্পর্ক ছিলো এ নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে পরিবিবি শায়েস্তা খাঁনের অতি আদরের পরমা সুন্দরী কন্যা এবং শাহাজাদা আজমের বিবাহিত বেগম ছিলেন। কাহারো মতে শায়েস্তা খাঁনের কোন উপপত্নির গর্ভজাত সন্তান। আবার কাহারও মতে অহম রাজ কুমারী রমানী গোবারো অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য পরীর মত সুন্দরী ছিলো বলেই তাঁকে পরী বিবি বলে অভিহিত করতো। তাঁকেও শাহজাদা আজম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। পরী বিবির মাজার নির্মাণের ব্যাপ্যারেও মতানৈক্য রয়েছে। কেহ বলেছেন রমানী গোবারো ওরফে রহমত বানু ওরফে পরী বিবির ইন্তেকাল হলে এই পরী বিবির মাজার শাহজাদা আজমই নিজেই নির্মাণ করে গেছেন। এর সমর্থনে মাজারের নির্মাণে মিশ্র স্থাপত্য রীতির উল্লেখকরা হয়েছে। কেননা শায়েস্তা খাঁনের স্থাপত্য রীতির ধরন তখনকার যুগে ভিন্নতর ছিলো।

এখানে ঢাকার ইতিহাস লেখক সৈয়দ মুহম্মদ তাইফুর এর মত প্রকাশ করা হলো। তিনি এই পরী বিবি ও তৎসংলগ্ন কবর সম্পর্কে তার রচিত 'গ্লিমসেস অব ওল্ড ঢাকা' বইয়ে বলেছেন ঃ 'হতে পারে শাহাজাদা আজম শায়েস্তা খাঁর কোন উপপত্নির কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন ঢাকা আসেন সে সময় তাঁর চারটি বেগম ছিলো। তিনি তরুণ বয়সে দারাশিকোর কন্যা জাহানজেব বানুর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর ১৬৭৭ সালে ঢাকা আগমনের পূর্বে গৌহাটির রাজা জয় ধ্বজ নারায়ণের কন্যা রামানি গোবহারু ওরফে রহমত বানুকে বিবাহ করেন। মীর জুমলার আসাম বিজয় কালে তিনি নয় বৎসর বয়স্কা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অনিন্দ সুন্দরী এই রাজ কন্যা রামানি গোবহারুকে বাদশাহর হেরেমে নিয়ে আসেন। শাহানশাহ আওরংগজেব তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাঁকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে রহমত বানু নাম দেন। শাহজাদা আযমের সঙ্গে এক

লক্ষ আশি হাজার টাকা দেন মোহরের বিনিময়ে নিজে কন্যার অভিভাবক সেজে তাঁর বিয়ে দেন। সে বছরই সুলতান মুরাদের নাতনীকে শাহজাদা আজম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। (স্যার যদুনাথ সরকারের মতে নাতিনীর মেয়ে) শাহজাদা আজম ঢাকা আগমণকালে গৌহাটির রাজ কন্যা রহমত বানুকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। শাহজাদা রহমত বানুকে খুবই ভালবাসতেন। আবশ্যি ঢাকা আগমনের পরও শাহজাদা বিজাপুরের রাজার কন্যাকে মাত্র পাঁচ শত দিরহামের পরিবর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। শাহজাদার প্রিয় পত্নি রহমত বানু কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। এই রহমত বানুর কবরকেই পরী বিবির কবর এবং তাঁর পূর্ব দিকের ঘরের ছোট কবরটিকে রহমত বানুর মেয়ের কবর বলে জনাব তাইফুর অভিহিত করেছেন।

যা হোক উপরোক্ত ধারণা হয়তো অমুলক নাও হতে পারে। আমরা সাধারণতঃ শায়েস্তা খাঁর কন্যা ইরান দুখ্ত্‌কেই পরী বিবি বলে জানি এবং বিশ্বাস্যও করি এজন্য যে শায়েস্তা খাঁনকে শাহজাদা আজম যাবার প্রাক্কালে কেল্লাটির অসমাপ্ত কাজ সমাধা করার জন্য অনুরোধ উপরোধ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু নবাব শায়েস্তা খাঁ শাহজাদার সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে কেল্লার অন্য সব কাজ পরিত্যাগ করে শুধু কন্যার সমাধিটিকে কেন এত সুন্দর দর্শনীয়ভাবে তৈরী করেছিলেন?

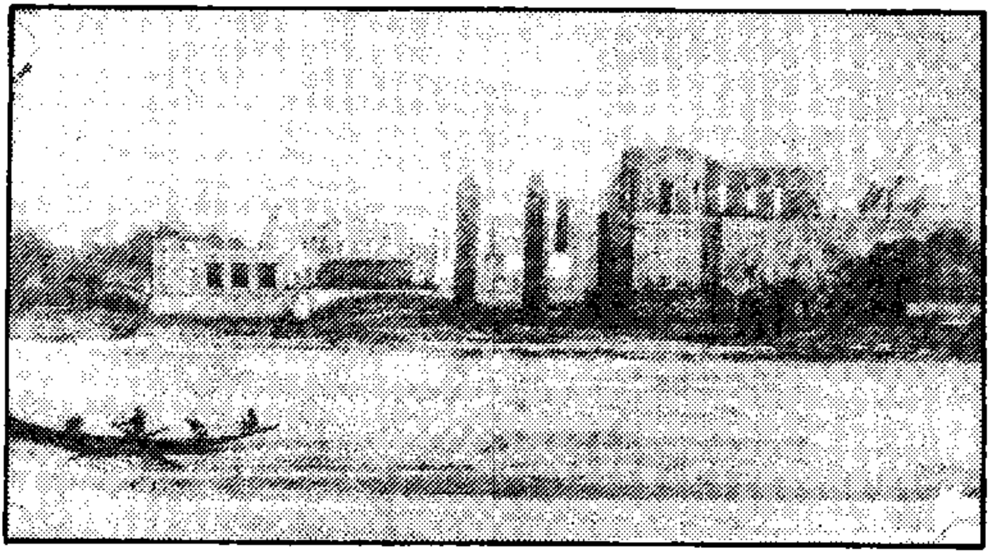
সৌধটি নির্মাণকালে নবাব শায়েস্তা খাঁ বহু দূর-দূরান্তর হতে যথা জয়পুর হতে সাদা মার্বেল, রাজ মহল থেকে কালো পাথর, চুনার থেকে বেলে পাথর, ইত্যাদি দুলর্ভ পাথর আনিয়ে অভ্যন্তর ভাগ অলংকৃত করা হয়েছে। কারুকার্য্য খচিত চন্দন কাঠের দরজা এবং সুদৃশ্য একটি গম্বুজ সৌধের সৌন্দর্য্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এটি নির্মাণে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনের মাজারের অনুকরণ এবং আগ্রার তাজমহলের নক্সার অনুসরণের সঙ্গে হিন্দু-মুসলীম ধর্মীয় স্থাপত্যের এক অপরূপ সংমিশ্রন ঘটানো হয়েছে। গম্বুজটির চূড়ার নিম্ন দেশে রয়েছে সুন্দর একটি পদ্ম ফুল। এক কালে চূড়াটি উজ্জ্বল ধাতব তাম্র পদার্থে মোড়ানো ছিলো। ফলে সূর্য্য কিরণে ঝকমক করতো।

শায়েস্তা খাঁ ঢাকার যে সব ভবন নির্মাণ করেছিলেন তন্মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরতম হচ্ছে তাঁর কন্যার এই পাঁচ গম্বুজ সমাধি সৌধ। বহুদিনের অবহেলার ফলে বহু ক্ষতি হওয়া সত্বেও এই সমাধি আজও অটুট রয়েছে। এ কবরের পূর্ব দিকের ঘরে অপেক্ষাকৃত যে ছোট কবরটি দেখা যায় সেটি নবাব শায়েস্তা খাঁর অপর এক কন্যা সামসাদ বানুর কবর বলে অনুমাণ করা হয়। তাছাড়া সৌধের দক্ষিণ দিকে খোদাবান্দা

ওরফে মির্জা বাংগালীর পৌত্র সারওয়ার ইয়ার খাঁর কবর রয়েছে।

পরবর্তীকালের ঘটনা এই যে, মজহার আলী খাঁন ও আল্লাইয়ার খাঁন (যার নামানুসারে বর্তমান আল্লুর বাজার) নামক দুই ব্যক্তি শায়েস্তা খাঁর প্রকৃত বংশধর বলে দাবী করতেন। ওয়ারিশান সূত্র নিয়ে তাঁদের মাঝে প্রবল বিবাদ বাঁধে। এই বিবাদকালে দু'পক্ষ থেকেই তৎকালীন লোকাল কমিটির সেক্রেটারী ও ঢাকার মেজিস্ট্রেট মিঃ বি, এইচ কুপার সাহেব এর নিকট পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু বিবাদমান দুই পক্ষের লোকেরা এই সমাধি সৌধের মূল্যবান চন্দন কাঠের দরজা, জানালা, মূল্যবান পাথর ও অন্যান্য দূর্লভ দ্রব্যাদি হস্তগত করে নেয়। ফলে সমাধি সৌধের সৌন্দর্য্য বহুগুণে ম্লান হয়ে গেছে। এখনও এই সৌধের অভ্যন্তর ভাগের শ্বেত মর্মরের জালি দেখার মত।

লালবাগ কেল্লার নির্মাণ পরিকল্পনার সবটুকু না হলেও যেটুকু বাস্তবায়িত হয়েছিলো তার তুলনা বিরল। দক্ষিণ দিকে শত্রুর সেনাদের আক্রমন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কামানের গোলা বর্ষনের উপযোগী সুঠাম প্রশস্ত প্রাচীর করা হয়েছিলো। দক্ষিণ তোরণ থেকে পশ্চিম কোণ এবং সেখান হতে উত্তর দিকে ৪৫০ ফুট দূর্গ প্রাকার এখনও ভালভাবে টিকে আছে। দেওয়াল গুলো লাল সুড়কীসহ পাতলা ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়। আজ এই দেওয়ালের বহু স্থান ভেঙ্গে গেছে। দক্ষিণ প্রাকারের আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে কামান বসানোর জন্য নির্মিত অষ্টকোণী পাঁচটি বুরুজ। বুরুজগুলির অভ্যন্তরে প্রতিরোধ প্রাচীরের উচ্চতা পর্যন্ত মাটি দিয়ে ভর্তি। এর সর্ব বৃহৎ বুরুজটি দক্ষিণ তোরণের সন্নিকটে অবস্থিত। এতে বাইরের দিকে বর্দ্ধিত ১৩ ফুট চওড়া কামান সংস্থাপনের জন্য মঞ্চ রয়েছে। বুরুজের পশ্চিম দিকের ভিত্তি মূলে একটি আয়তাকার সুড়ঙ দেওয়ালের অভ্যন্তরে চলে গেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য সুরঙের প্রবেশ পথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। দূর্গের দক্ষিণ পশ্চিমকোণের অষ্ট কোণী ছাদহীন বুরুজটির আট দিকে আটটি উন্মুক্ত দরজা রয়েছে। বহির্মূখী মঞ্চও আছে। এই ছাদহীন বুরুজের অল্প পশ্চিমেই নগরের দক্ষিণ তোরণের ধ্বংসাবশেষ আজও দাড়িয়ে আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এক প্রভাবশালী ব্যক্তি এই তোরণের একটি স্তম্ভকে তার দালানের অভ্যন্তরে নিয়ে নিয়েছে। বহু আবেদন নিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবরে করা হলেও উক্ত তোরণের অংশটি কর্তৃপক্ষ উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি। তদন্ত করেই দায়িত্ব শেষ করে রেখেছেন । তদন্তে তোরণ ও জমি জবর দখল প্রমাণিত হওয়া সত্বেও কি কারণে কর্তৃপক্ষ চুপ তা বুঝতে পারছিনা। তোরণের অংশটি উদ্ধারের দাবী জানাচ্ছি।



১৮৪০ সালে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী তীরবর্তী লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ পশ্চিম কোণের অংশ ও তৎসংলগ্ন নগরীর দক্ষিণ তোরণের দু'টি স্তম্ভ। (যাহার বাঁ দিকের স্তম্ভটি স্থানীয় এক বিত্তশালী ব্যাক্তি নিজ দালানের অভ্যন্তরে নিয়ে নিয়েছে) আরো বাঁ পাশে একটি মঠ দেখা যাচ্ছে যা আজও অক্ষত রয়েছে। তখন বুড়িগঙ্গা নদী এর পাশ দিয়ে বয়ে যেতো।

পশ্চিমকোণের পরবর্তী বুরুজ থেকে শুরু করে পূর্বদিক পঞ্চ বুরুজ পর্যন্ত সমস্ত এলাকায় প্রতিরোধ প্রাচীরের সংলগ্ন দূর্গের অংগনে অনেকগুলো কক্ষ ছিলো। এসব পাকা ইমারতের নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খনন কার্যের ফলে মৃত্তিকা স্তুপের নীচে পাওয়া গেছে। মনে হয় এগুলো সৈন্যদের ব্যারাক ছিলো। সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ কক্ষগুলো ইংরেজ আমলের প্রথম দিকেই মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়। এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

কেল্লার দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব-উত্তর কোণের তোরণ দুটো আজও সেদিনের ঐতিহ্যকে অম্লান করে রেখেছে। এর মধ্যে সব চেয়ে আকর্ষণীয় স্থাপত্য নির্দশন দক্ষিণ তোরণ। এ তোরণের একটি গম্বুজ গালিবকারী নামে পরিচিত। এ তোরণটির উপর তলার নির্মাণ কাজ এবং এর পশ্চিমে প্রায় এক শত ফুট দীর্ঘ একটি ছাদহীন কক্ষ রয়েছে। এসব কক্ষের নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিলো। এর নিকটেই পাক আমলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অফিসকক্ষ নির্মিত হয়েছিলো। যা আজ দূর্গের উত্তর পশ্চিম কোণে প্রাচীরের বাহিরে নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। এছাড়া উত্তর-পূর্বের প্রধান তোরণটির আকৃতিও নির্মাণ কৌশল দক্ষিণ তোরণের অনুরূপ।

এই তোরণের ৭৫০ ফুট পশ্চিমে আরেকটি ছোট ফটক অসমাপ্তভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিলো। যা দিয়ে আজ কেল্লা পরিদর্শনে যায়। কিছু কাল পূর্বে বর্তমান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রধান ফটকে পরিণত করেছে, কেল্লার বর্তমান কার্য্যের অংগ হিসেবে। বহু বছর পূর্বে ছাদহীন এ ফটকটি দুটি আলাদা স্তম্ভের মত ভগ্ন প্রায় অবস্থায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলো। আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর পূর্বে বৃটিশ সরকার দূর্গের এই উত্তর দিকের ভগ্ন প্রায় ফটকটি বিনা কারণে দণ্ডায়মান রয়েছে ভেবে নিলামে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন।

তোরণের বিরাট স্তম্ভ দুটি মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে আমার এক আত্মীয় মংগু ওস্তাগার নিলামে খরিদ করে নেন। স্তম্ভ ভেঙ্গে ইট ও সুরকী অনত্র নিয়ে যাবেন ভেবে তিনি কয়েকজন রাজ মিস্ত্রি নিয়ে সমস্ত দিন কাজ করার পর একটি ইটও আস্ত খসাতে না পেরে বিফল মনোরথ হয়ে ছেড়ে ছুড়ে চলে আসতে বাধ্য হন। এতে তাঁর সংগীগণ বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে নানারূপ বিদ্রুপ করতো। এর কিছুকাল পরই ১৯১০ সালে দূর্গটিকে সংরক্ষিত কীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কেল্লার উত্তর দিকে লালবাগ রোডের পাশ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটি পুরু প্রাচীর তুলে দিয়ে কেল্লাটিকে ঘিরে দিয়েছেন। ফলে খোশবান্দে খাঁ ও হক বান্দে খাঁর কবরটি দূর্গের অভ্যন্তরে চলে গেছে। এরা কামেল ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। এজন্য এদের মাজারে প্রায়ই কাওয়ালীর আসর বসতো। মাত্র কিছু দিন হলো উপরোক্ত ফটকের কিছু পশ্চিম দিকে একটা ফটক খুলে দেওয়া হয়েছে কেল্লার মসজিদে মুসল্লিদের যাতায়াতের জন্যে। এ দরজা দিয়ে ঢুকে যাতে কেল্লার বিভিন্ন অংশে লোকজন যেতে না পারে সে জন্য গ্রিল দিয়ে দুপাশ আটকে দেওয়া হয়েছে মসজিদ পর্যন্ত। কেল্লার অভ্যন্তরে পরী বিবির সমাধি সৌধের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে হাম্মাম নামক দ্বিতল অট্টালিকাটি। এর অভ্যন্তরে নীচ তলায় অবস্থিত ছিলো হাম্মাম তথা গোসলখানা। ইহা দরবার হল নামেও পরিচিত। দরবার হলের নীচ তলায় ঠিক মাঝ খানে ছিলো চৌবাচ্চা এর মাঝে ঝর্ণা বসানো ছিলো। চৌবাচ্চা বরাবর পশ্চিম দেওয়ালের মাঝ খানে রয়েছে হাম্মামখানার প্রবেশ পথ। এ হাম্মামখানায় চৌবাচ্চা ব্যাতিত শৌচাগার ও প্রসাধন কক্ষ ইত্যাদি ছিলো। বহু পূর্বেই হাম্মামখানাটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অভ্যন্তর ভাগের গোসলখানার জন্যেই গোটা ইমারতটির নাম হাম্মামখানা হয়েছিলো। ইমারতের উপরতলা তথা দরবার হলেই শাহজাদা আজম সকলকে দর্শন দান ও তাদের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করতেন। ইংরেজ সরকার দেওয়ানে আম প্রকোষ্ঠকে মল-মূত্র ত্যাগের স্থান নির্দিষ্ট

করেছিলেন। শাহজাদার দেওয়ানে আমের এ অবস্থা ঘটবে তা কেহ কল্পনায়ও আনতে পারেনি। বৃটিশ সরকার পরবর্তীতে এ ভবনটিকে আধুনিকী করণের ফলে এটি একটি অদ্ভুত ও বেখাপ্পা ধারণ করেছিলো। বর্তমান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এর পূর্বরূপ অনেকটা ফিরিয়ে এনে, এতে একটি যাদুঘর স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন। এখানে মুসলিম শাসনামলে বিশেষ করে মোঘল আমলের অস্ত্র-শস্ত্র, শিল্পদ্রব্য, শিল্পকর্ম, হস্তচিত্র, দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি, হস্তলিপি, মুদ্রা, মৃৎশিল্প, কার্পেট ও রাজকীয় ফরমান ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের মসজিদের শিলালিপি ও লেখা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। যাদু ঘরের সীমিতাকার আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ানুক্রমিক ভাবে প্রত্ন বস্তুর প্রদর্শন সম্ভব হয়নি। এ কথা অবশ্যই সকলকে স্বীকার করতে হবে। বর্তমান প্রদর্শিত দ্রব্যাদির মধ্যে মাত্র দুটি জিনিষ লালবাগ দূর্গের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এর একটি হচ্ছে পরী বিবির মাজারে আলগা অবস্থায় প্রাপ্ত কালো পাথরে উৎকীর্ণ লিপি ও আজম শাহের একটি প্রতিকৃতি। বাকী জিনিষগুলো লালবাগ দূর্গের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হলেও মোঘল আমলের দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। তবে বেশীরভাগ জিনিষই মোঘল আমলের শেষ যুগের।

লালবাগ প্রাসাদ দূর্গ মোঘল আমলের স্থাপত্য মহিমায় স্বয়ং সম্পূর্ণ, এবং বাংলাদেশে মোঘল আমলের এক মাত্র প্রাসাদ দূর্গের নিদর্শন। এই স্থাপত্য নিদর্শনের পাশাপাশি মোঘল আমলের জীবনধারা সম্বন্ধে আরো কিছু আলোকপাত করার অভিপ্রায়ে 'লালবাগ দূর্গ যাদুঘর' পরিকল্পনা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কতক বছর আগেই তথা ষাট দশকে হাতে নয়। শাহজাদা আযম কর্তৃক নির্মিত দ্বিতল দরবার হলের স্বল্প পরিসরের মধ্যেই অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এ যাদুঘরের দ্বারোদঘাটন করা সম্ভব হয়। তজ্জন্য তারা দেশবাসীর কাছ হতে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। দরবার হলের দ্বিতলের ছাদের গঠন বিশেষ বৈশিষ্ট্যময়। কেন্দ্রীয় কক্ষের ছাদ অনেকটা দোচালা খড়ের ঘরের মতো। বাংলার আসল স্থাপত্য ও মোঘল স্থাপত্যের সংমিশ্রণে তৈরী এই ছাদ, নির্মাণ কৌশল ও কমনীয়তায় উল্লেখযেগ্য।

পরী বিবির সমাধি সৌধের সামান্য পশ্চিমে রয়েছে শাহজাদা আযমের নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। মধ্যবর্তী গম্বুজ অপেক্ষাকৃত অপর দুই গম্বুজ হতে বড়। মসজিদের চারটি অষ্টাকোণী মিনার ছোট গম্বুজ দ্বারা শোভিত। মসজিদের সম্মুখে বিরাট একটা খোলা বারান্দা রয়েছে। বৃটিশ শাসনামলের অধিককাল এ পবিত্র গৃহ হতে কোন আজান শোনা যেতোনা। বারান্দায় স্বাধীনভাবে গরু ছাগল ঘোরাফেরা

করে বেড়াতো। এই মসজিদটি সম্পর্কে পূর্বে স্থানীয় লোকদের অনেকেরই একটি অন্ধ বিশ্বাস ছিলো ঃ যাদের শিশু সন্তান মারা যায়, তারা মসজিদটির চতুর্দিকে সুতো দিয়ে পরিমাপ করে, সেই সুতোয় তাগা বানিয়ে নব জাতকের গলায় পরিয়ে দিতো। যাতে শিশুর অকাল মৃত্যু না হয়। অনেকেই নাকি এর থেকে উপকার পেয়েছে। এখন অবশ্য কাউকে এ ধরনের কাণ্ডকারখানা করতে দেখা যায় না।

সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান একবার কেল্লায় এক জনসভা করতে এসে মসজিদটির সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের জন্য দু'লক্ষ টাকা দান করার কথা ঘোষণা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করছিলাম আমি নিজেই। দানের টাকা পাওয়ার পর মসজিদ সংলগ্ন খালি যায়গায় মুয়াজ্জিনের ঘর, প্রসাবখানা ইত্যাদি নির্মাণে মসজিদ কমিটি অগ্রসর হলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বাধা দেয়। তারা পুরাতন ঐতিহ্য ও স্থাপত্যের সঙ্গে বিশেষ করে তাদের মূল নক্সার বাইরে কোন কিছু নির্মাণ করতে দেবে না। অগ্যতা বাধ্য হয়ে কেল্লার উত্তর পার্শ্বে একটি যায়গা খরিদ করে সেখানে দালান তৈরী করতঃ দোকান ঘর ও লাইব্রেরী করা হয়। সেই ভাড়ার অর্থ দিয়ে বর্তমানে মসজিদের আবশ্যকীয় খরচ সমাধা করা হচ্ছে। অবশ্য মসজিদের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করার জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ইতিমধ্যেই কিছু উন্নয়নমূলক কাজ মোঘল রীতির সঙ্গে মিল রেখে করেছে। ফলে মসজিদটির সৌন্দর্য্য পূর্বের চেয়ে বেড়ে গেছে।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট দুশো বছরের ইংরেজদের গোলামীর নাগপাশ ছিন্ন করে আজাদ হচ্ছি। বিজয়ানন্দে ঢাকার মুসলমানদের হৃদয় মন আপ্লুত, সবার মনে ও প্রাণে শিহরণ। ঢাকাবাসী অনেক মুসলমান যে যার মতে ছুটে এসেছে লালবাগ দূর্গের মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে। সবার চোখে মুখে ফুটেছে আনন্দ উল্লাস। আমিও এক প্রকার দৌড়ে গিয়ে দেখলাম মসজিদ সংলগ্ন চত্বর লোকে লোকারণ্য। সবার মনে প্রাণে বিজয় দর্পের স্পষ্ট আভাষ। আজাদীর পতাকা উত্তোলিত হবে কেল্লার মসজিদ সম্মুখস্থ ময়দানে আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাকী। দেখতে দেখতে আনন্দ জোয়ারে মুহূর্ত কটি ভেসে গেল। একজন মাওলানা সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করলেন পবিত্র কোরআনের আয়াত। মন্ত্র মুগ্ধের মত সবাই শুনলেন এই অমর বাণী। আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষ কাঁপিয়ে শুরু হলো আল্লাহু আকবার আর পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি। ধীরে ধীরে উত্তোলিত হলো পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকা লালবাগের

ঐহিহাসিক ভাঙ্গা কেল্লায়। মনে পড়লো বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের অমর কবিতার কটি ছত্র –

বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার
ভাঙ্গা কেল্লায় ওড়ে নিশান।

বর্ষপঞ্জীর পাতা উল্টাতে লাগলো ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, কে জানতো এত অল্পকালের মধ্যেই এ পতাকা বিদায় নেবে এদেশ থেকে এ কেল্লা থেকে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতা আন্দোলনের রক্তস্নাত ইতিহাস রচিত হলো ১৬ই ডিসেম্বর। লালবাগ দূর্গ থেকে পাকিস্তানী পতাকা অপসারিত হলো। কতিপয় স্বাধীনতার সৈনিক তরুণ যুবা অতি সকালেই লালবাগ দূর্গের উত্তর-পূর্ব দিগস্থ ফটকের উপর উত্তোলিত করছে স্বাধীন বাংলাদেশের রক্তিম সূর্য খচিত জাতীয় পতাকা। পতপত করে উড়ছে সেই রাষ্ট্রীয় পতাকা লালবাগ দূর্গের ফটকের উপরে।

হাম্মামখানা তথা বর্তমান যাদুঘরের পূর্ব দিকে একটা চৌকোনা পুকুর রয়েছে। ইহা উত্তর ও দক্ষিণ তোরণের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। পুকুরটির চারদিকের পাড় ইটের দেওয়াল দিয়ে বাঁধানো ছিলো। বহু পূর্বেই এই পাড়গুলি ধ্বসে পড়লেও কোথাও কোথাও ভিত্তি মূলের অবশিষ্ট ছিলো। আর এটাই ছিলো দূর্গাভ্যন্তরে স্বচ্ছ পানি সরবরাহের এক মাত্র উৎস। এই পুকুরের পানিকে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ রাখা এবং বৃষ্টি ও অন্যান্য কারণে যাতে পুকুরের পাড়ের মাটি ভেঙ্গে না পড়ে, সে উদ্দেশ্যে পনর ফুট নীচ থেকে পুকুরের ঠেস দেওয়াল গুলো গেঁথে তোলা হয়েছিলো। পরবর্তীতে অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় নিপতিত হলে ইংরেজ আমলে পুলিশ বিভাগ পুকুরটি পুনঃখনন কার্য্য চালিয়ে ছিলেন এবং পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি পাকা ঘাট নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৭৯-৮০ সালে জিয়া সরকারের আমলে এই ঐতিহাসিক পুকুরটির সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়। সংস্কার কালে দক্ষিণের পাকা ঘাট সম্পূর্ণ অপসারণ করে পুকুরের মূল সিঁড়িগুলো পুনঃ স্থাপন করা হয়েছে। পুকুরের চার কোণায় আটটি ঘাট রয়েছে। সিঁড়িগুলো প্রায় চার ফুট প্রশস্ত করতঃ পার্শ্ব দেওয়ালকে ঠেস দিয়ে তৈরী করার ফলে মূল দেওয়াল আরো মজবুত হয়েছে। সিঁড়ি ও পুকুরের দেওয়াল পুনঃ স্থাপনে মোঘল আমলের ইটের প্রায় অনুরূপ আকারের বিশেষভাবে প্রস্তুত আধুনিক সিরামিক ইট ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে দেওয়ালে ও সিঁড়ির মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে। এত মজবুত করে নির্মাণ করা সত্ত্বেও ১৯৮৫ সালে

কয়েকদিন মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় এক বিপর্য্যয় ঘটে, যার ফলে পুকুরের পূর্ব দিগস্থ সম্পূর্ণ পাড়টি একেবারে আস্ত প্রায় ২০ ফুট পশ্চিমে অবিশ্বাস্যভাবে সরে আসে রাত্রির অন্ধকারে। দেখে মনে হয় কেহ পাড়টিকে উঠিয়ে পুকুরের মাঝে এনে বসিয়ে দিয়েছে। শহরে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে প্রতি দিন হাজার হাজার আবাল বৃদ্ধ বনিতা পরিদর্শন করে অবাক এবং স্তম্ভিত হয়। প্রায় সকলেই এটাকে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় আখ্যা না করে দূর্গে অবস্থানকারী জ্বীনদের দ্বারা এ কাজ সমাধা হয়েছে বলে বিশ্বাস নিয়ে ফিরে গেছে। পুকুরটি আরো একটি কারণে ঐতিহাসিক হয়ে আছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবকালে অনেক শহীদ সিপাহীকে এ পুকুরে ফেলা হয়েছিলো। পরে গকুল চর নিবাসী সোনা মিয়া (মরহুম)কে এই পুকুর থেকে লাশ উঠিয়ে নিয়ে বুড়ি গঙ্গার নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেয়ার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। সে নাকি এ কাজে পাঁচটি নৌকা নিয়োগ করেছিলেন।

মোঘল রাজ পুরুষেরা প্রায় সকলেই সৌন্দর্য্য পিয়াসী ছিলেন। আগ্রার তাজমহল, বিভিন্ন দূর্গ, প্রাসাদ, সমাধি ও ইমারত সমূহের অভ্যন্তরে অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুন্দর নয়নাভিরাম কৃত্রিম ঝর্ণায় সুসজ্জিত উদ্যান স্থাপনেও তাঁরা ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। অখণ্ড ভারতের বিভিন্ন স্থানে উদ্যান ও দূর্গগুলোতে তাদের সৌন্দর্য্য পিয়াসী মনের পরিচয় আজও কালের সাক্ষী হিসাবে দেখা যায়। আজ থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্থাপিত এসব পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এই আধুনিক যুগেও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

লালবাগ দূর্গের অভ্যন্তরেও অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। পরীবিবির মাজারের সরাসরি দক্ষিণে, দক্ষিণ প্রাকারের নিকট স্থাপিত একটি বৃহৎ জলাধারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে অনেকেই মনে করেন এই জলাধারে সম্ভবত বুড়ি গঙ্গা নদী থেকে ঘূর্ণিমান চাকার সাহায্যে পানি উত্তোলন করার পর পোড়ামাটির পাইপের ভিতর দিয়ে দূর্গের সর্বত্র পানি প্রবাহিত করা হতো। প্রকাশ থাকে সে সময় বুড়ি গঙ্গা নদী কেল্লার দক্ষিণ পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। উপরোক্ত জলাধারের নিকট বিভিন্ন স্থাপত্য শিল্পকার্য দেখে অনুমান করা যায় যে, সম্ভবত এখানে মার্বেল পাথরের একটি অলংকৃত ফলক বসানো ছিলো যার উপর সরাসরি উপরের জলাধার থেকে পোড়া মাটির পাইপের ভিতর দিয়ে সজোরে পানি জল প্রপাতের ন্যায় পতিত হয়ে কল ধ্বনি সৃষ্টি করে নীচে গড়িয়ে পড়তো।

পশ্চিমে মসজিদ থেকে পরীবিবির মাজার, দরবার হল, হাম্মামখানাও অন্যান্য স্থানে পানি সরবরাহ ও ফোয়ারা সমূহ পরিচালনার জন্য পোড়া মাটির পাইপ লাইন প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট মাটির নীচ দিয়ে বাসানো হয়েছিলো, পাইপ লাইনগুলো যাতে

কোন চাপ বা আঘাতে ক্ষতি না হয় তজ্জন্য পাইপ লাইনের দু দিকে পাকা দেওয়াল গেথে উপরে কংক্রিট করে দেওয়া হয়েছিলো। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক বর্তমান উন্নয়নমূলক কাজ চলাকালে পোড়া মাটির এই পাইপ লাইনের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। নব নির্মিত কেন্দ্রীয় জলাধারটির চতুর্দিকে ১২ ফুট প্রশস্থ এবং মসজিদ হতে পুকুর অবধি ক্যানেল সমূহের পার্শ্বে আট ফুট প্রশস্থ সিরামিক ইটের রাস্তাও তৈরী করা হয়েছে। লোক চলাচলের সুবিধার জন্য। ক্যানেলগুলোর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এ পর্যন্ত ৬৭টি ফোয়ারা নির্মান করা হয়েছে এবং তিনটি সাব মার্জিবাল পাম্প দ্বারা ফোয়ারাগুলো পরিচালিত হয়। রাত্রির অন্ধকারে এসব ক্যানেল, ফোয়ারা ও উদ্যানকে আরো মোহময় করে তোলার জন্য বহু বৈদ্যুতিক বাতি বসানো হয়েছে। তা ছাড়া দূর্গের বিশাল অংগনকে ২২ টি প্রশস্থ লনে বিভক্ত করে মসৃন তৃণাবৃত করতঃ লনগুলোর ধার দিয়ে ফুলের কেয়ারী বসানো হয়েছে। তৃণাচ্ছাদিত লনের আয়তন প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বর্গফুট।

ফোয়ারা ও সিরামিক পাথওয়ে সম্বলিত এই উদ্যান স্থাপনের ফলে লালবাগ দূর্গ পুনরায় তার পূর্ব গৌরব ফিরে না পেলেও নতুন এক সৌন্দর্য্য লাভে সমর্থ হয়েছে। এবং পুরাতন ঢাকার সব চাইতে আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দূর্ভাগা আমরা আমাদের নৈতিক অবক্ষয়িত এবং দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেদের অহেতুক অত্যাচার, জেদ এবং বিকৃত খেয়ালের জন্য উদ্যানসমূহ মাঝে মাঝে তছনছ হচ্ছে। বৈদ্যুতিক বাল্ব নষ্ট কখনও বা খুলে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হয়ে পড়ে। যার ফলে ভারতের বিভিন্ন দূর্গের ন্যায় সাউণ্ড এণ্ড লাইটিং পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বাদ দিয়েছেন। সারা বাংলাদেশে যেখানে এ ধরনের সুরুচিপূর্ণ চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা নেই সে স্থলে এখানে করার মনস্থ করেছিলেন সরকার। সেই উদ্যোগ এসব ছেলেপিলেদের জন্য পণ্ড হয়ে গেল। আমরা ঢাকা তথা দেশবাসীর পক্ষ হতে আমাদের এবং বিদেশী পর্যটকদের এ দূর্গ প্রাসাদ আরো আকর্ষণীয় করার জন্য সাউণ্ড এণ্ড লাইটিং পরিকল্পনা কার্যকরী করার জোর দাবী জানাচ্ছি। এগুলোও নিরাপদের জন্য দূর্গের বাইরে একটি পুলিশ বক্স স্থাপন করারও জোর সুপারিশ করছি। এ পরিকল্পনা কার্যকরী হলে তার আয় হতেই পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা প্রহরীদের খরচ সংকুলান হয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি।

পরী বিবির মাজারের দক্ষিণ বরাবর মৃত্তিকাভ্যন্তরে রয়েছে জটিল নক্সায় তৈরী একটি কক্ষ। বুরুজের কাছেই একটি অর্দ্ধ গম্বুজের নীচে দিয়ে রয়েছে এর প্রবেশ পথ। এ কক্ষ থেকে বহির্মুখী কয়েকটি গোপন পথ বিভিন্ন দিক বিস্তৃত ছিলো। এটি

বহুকাল ধরে লোকজনের নিকট রহস্য ঘেরা সুড়ংগ পথ। এই সুড়ংগ পথ সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। একটি সুড়ংগ পথ বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পাড় জিঞ্জিরা প্রাসাদ পর্যন্ত নাকি বিস্তৃত ছিলো। অনেকেরই বিশ্বাস রয়েছে যে, অপর একটি সুড়ংগ দশ বারো মাইল দূরে খিজিরপুর অথবা টংগী নদীর পাড় পর্যন্ত চলে গেছে। ইংরেজ শাসনামলে জেলখানার কিছু অপরাধীকে এই সুড়ংগ পথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো এর রহস্য উদঘাটনের জন্যে। তারা কিছু দূর যাবার পরই ভিতরের বিষাক্ত গ্যাসের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তজ্জন্য কর্তৃপক্ষ সুড়ংগ পথটি বন্ধ করে দিয়েছেন। এই সুড়ঙ্গ সহ কেল্লার অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য নির্মিয়মান জিনিষের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কয়েক বছর পূর্বে খনন কাজে হাত দিয়েছিলেন। অনেক দিন কাজ চলার পর জানিনা কি কারণে সুড়ংগ পথসহ আরো কিছু কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। বেশ কিছু দিন হলো মৃত্তিকা স্তুপের উপর বৃটিশ শাসনামলে নির্মিত পুলিশ কোয়ার্টারগুলো, যাহাতে আজাদী পূর্ব কালে গাড়োয়ালী পুলিশগণ থাকতো সেগুলো এবং পুলিশের সুটিং প্রশিক্ষণের জন্য নির্মিত রাইফেল বাটটিও ভেঙ্গে ফেলো হয়েছে। রাইফেল বাটটি ভেঙ্গে ফেলায় স্থানীয় রাইফেল শুটার বিশেষ করে আজাদ মুসলিম রাইফেল ক্লাবের শুটারগণ বেশ অসুবিধায় পড়েছে। পাকিস্তান আমলে বেশ ক'বছর এখানে আই, বি, অফিস ও তাদের বাসস্থান ছিলো। কেল্লার পরিবেশে এসব ভবন বেখাপ্পাই ছিলো।

১৯১০ সাল হতে লালবাগ দূর্গ প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষিত আইনে থাকলেও অনেক চেষ্টার ফলে ১৯৬২ সালে অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আয়ত্ত্বাধীনে আনা সম্ভব হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানা কারণে ১৯৭৯ সালের পূর্বে দূর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত লালবাগ থানা, ফাঁড়ি, পুলিশের আবাসস্থল ও অনুনোমোদিতভাবে গড়ে উঠা ঘর বাড়ী তুলে দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে থানা চকবাজারে আর ফাঁড়ি পোস্তায় স্থানান্তর করে সকল দালান কোঠা ভেঙ্গে ফেলা হয়।

১৬৮৮ সালে সুবেদারী থেকে নবাব শায়েস্তা খাঁন অবসর গ্রহণ করে জীবনের বাকী দিনগুলো আগ্রাতে অতিবাহিত করেন। ঢাকা পরিত্যাগ করলেও ঢাকার মাটির সঙ্গে শায়েস্তা খাঁনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। সম্রাট আওরংগজেব পরবর্তীতে লালবাগ দূর্গসহ ঢাকার ৩৬টি মহল্লা আমির উল উমরা নবাব শায়েস্তা খাঁনকে দান করেন। তাই ঢাকা নগরীর নামের সঙ্গে এই মহান সুবেদারের নাম চিরদিন জড়িত থাকবে।

নবাব শায়েস্তা খাঁনের ঢাকা ত্যাগের মাত্র পচিশ বছর পরেই ঢাকার ভাগ্যাকাশে নেমে আসে অমানিসার অন্ধকার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর উইলিয়াম

হেজেসের রোজ নামচা থেকে জানা যায় ১৬৮১ সালেও লালবাগ দূর্গ সুবেদারের আবাস, সৈন্য শিবির ও কয়েদখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু দূর্গের নিকটস্থ পোস্তার একটি ঘটনা লালবাগদূর্গ ও ঢাকার গৌরবের দিন শেষ করে দেয়। ১৭০৪ সালে দেশের শাসন কেন্দ্র মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ায়, দূর্গ হিসেবে লালবাগের গুরুত্ব কমে যায়। ধীরে ধীরে কেল্লার অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। ১৭৬৫ সালে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে ঢাকার নায়েব নাজিম জেসারত খাঁনকে লালবাগ দূর্গের আবাসত্যাগ করতে বাধ্য করে। ফলে যেটুকু শানওকত অবশিষ্ট ছিলো তাও শেষ হয়ে যায়।

নবাব শায়েস্তা খাঁন লালবাগ প্রাসাদ দূর্গকে সম্পত্তি হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার উত্তরাধিকারদের উপর ন্যাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তার ক্ষয়িষ্ণু বংশধরদের পক্ষে লালবাগ দূর্গের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব ছিলনা। সংস্কারের অভাবে সুরম্য ইমারত ও দূর্গ ধীরে ধীরে বিনষ্ট হতে থাকে তাছাড়া ওয়ারিশানদের কোন্দলের ফলে অনেক মূল্যবান বস্তু অপসারিত হয়। অবস্থার এত অবনতি ঘটে যে ১৮২৪ সালের জুলাই মাসে বিশপ হেবর যখন ঢাকায় সফরে আসেন তখন এই দূর্গকে জংগলাকীর্ণ ধ্বংস স্তুপের আকার দেখতে পান।



বৃটিশ যুগে জঙ্গলাকীর্ণ লালবাগ কেল্লার একাংশ

১৮৪৪ সালে ইংরেজ বাংলা সরকার শায়েস্তা খাঁনের গরীব উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে বার্ষিক মাত্র ষাট টাকা খাজনায় চিরস্থায়ী ইজারা পাট্টা নিয়ে দেশী

সিপাহীদের শিবির স্থাপন করে। ১৮৪৪ সালের ২রা নভেম্বর ইজারার দলিল সম্পাদন করেন ওয়ারিশানদের পক্ষে মাজহার আলী খাঁন ও রওশন আলী খাঁর কন্যা সালেহা খানম। এতে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দান করেন, তৎকালীন ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। তাঁরা হচ্ছেন ঃ (১) মিঃ ওয়াইজ (ইনি সিভিল সার্জন ডাঃ ওয়াইজ নন) ভাওয়াল পরগণার জমিদার এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৮০১ সালে ভাওয়াল এস্টেটটি ভাওয়াল রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কালি নারায়ণ এর নিকট চার লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করে ছিলেন। (২) ক্যাপ্টেন চাহাওয়াট মল (৩) ঢাকার সিভিল সার্জন ডাঃ জেমস টেইলর (৪) ক্যাপ্টেন উইনস্টন (৫) বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ধনী ও ময়মনসিংহের হোসেন পরগণার জমিদার আর্মেনিয়ান মিঃ আরাতুন। পরে অবশ্যি এই জমিদারিটি খাজা আলিমুল্লাহ্ তাঁর নিকট থেকে খরিদ করে নেন। (৬) জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খাজা আলিমুল্লাহ্ (৭) মির্জা গোলাম পীর ইনি মীর আবু সাঈদের পৌত্র ছিলেন। ত্রিপুরা ও বাকরগঞ্জে তাঁর বেশ কিছু জমিদারী ছিলো। (৮) ঢাকা জেলার সাভার থানার রোওয়াইল এর জমিদার ব্রজমোহন রায় (৯) ঢাকার বিশিষ্ট উকিল নন্দ লাল দত্ত ওরফে মুন্সি নন্দ লাল (১০) পাঞ্জাবের অধিবাসী ব্যাংক ব্যবসায়ী লালামৃত্যুঞ্জিৎ সিং। বাকেরগঞ্জ জেলায় তার বেশ কিছু জমিদারী ও ঢাকায় বখশি বাজার এলাকায় বেশ জমাজমি ও দালান কোঠা ছিলো। (১১) লোকাল কমিটির মেম্বার মিঃ কুক। লালবাগ কেল্লা চিরস্থায়ী ইজারা দানের পর বার্ষিক খাজনার অর্থ কিছু কাল পূর্ব পর্যন্তও শায়েস্তা খাঁর বংশধরগণ ভোগ করেছেন।

নবাব শায়েস্তা খাঁর বংশধরদের এক অধঃস্তন পুরুষ মুতওয়াল্লি মির্জা মমতাজ আলী খাঁন (মরহুম) বড় কাটরার নিকটে বসবাস করতেন। বাধ্যর্ক্যের ভারে জর্জরিত হয়ে পড়ছিলেন। শায়েস্তা খাঁর বংশধরের তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি। অবক্ষয় ধ্বংস ও বিনাসের মাঝে তিনি ছিলেন এক করুণ মূর্তি। এক প্রাচুর্যময় যুগ সৌধের মূর্তিমান ভগ্নাবশেষ যেন। কিছু দিন আগেও তিনি যখন দীন হীন বেশে অতি কষ্টে লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়াতেন কিংবা কেল্লার পথ অতিক্রম করতেন, তখন আমির উল উমরা নবাব শায়েস্তা খাঁর প্রাচুর্যের চিত্রই তাঁর মানস নেত্রে ভেসে উঠতো। তখনকার সেই মহিমান্বিত অবস্থা আর আজকের এই চরম দূর্দশার কথা তুলনা করলে মানুষের সকল ঐশ্বর্য মহিমা, দম্ভ, গর্ব, অহংকার, প্রতাপ প্রতিপত্তি সবই মিথ্যে বলে প্রতিভাত হয়। বর্তমানের এই পরিবেশের মধ্যে অতীতের স্মৃতি ভারে পীড়িত শায়েস্তা খাঁর এই হতভাগ্য বংশধরের মৃত্যু হলেও তার করুণ চেহারাটি যেন ঢাকার আনাচে কানাচে ছায়ার মত এখনও ঘুরে বেড়ায়।

জীবিতাবস্থায় তার নিকট কিংবা মহল্লার দালাল ও টাউট ব্যক্তিগণের নিকট কেহ জমি খরিদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় মির্জা সাহেবের জমি জমা রয়েছে বলে এবং সে গুলো অল্প মূল্যে বিক্রির প্রলোভন দেখিয়ে গ্রাহকদের নিকট অনায়াসে বিক্রয় করা হতো। কেননা পূর্ব দলিল দস্তাবেজে শায়েস্তা খাঁর ওয়াকফ সম্পত্তি বলে উল্লেখ ছিলো। এরকমভাবে নেওয়া অনেকে টিকে গেছে আবার অনেকে প্রতিপক্ষের মামলা মোকদ্দমায় পড়ে নাকাল হয়ে জমির দাবী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। পাক কোরানে এরশাদ হয়েছে ঃ ওয়াতুয়েজ্জুমান তাসায়ু ওয়াতুজেল্লুমান তাসায়ু বিয়াদিকাল খায়ের ইন্নাকা আলা কুল্লি সাইয়েন কাদির। আমরা এই আয়াত থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমাণিত করেন, তাঁরই হস্তে রয়েছে সমস্ত কল্যাণ, নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। মোঘল সাম্রাজ্যের এই মহান প্রতাপশালী এবং মহান সম্মানিত সুবেদার আমির উল উমরা শায়েস্তা খাঁনের নিজ পরিবারের মধ্যেও আমরা এ আয়াতের প্রতিফলন দেখতে পাই।

যাহোক ঢাকার বহু সৃষ্টিই লালবাগ কেল্লার সাথে জড়িত হয়ে আছে। লালবাগ দূর্গের নিঃসঙ্গ জীবনের শেষ উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটেছিলো ১৮৫৭ সালে। বিদেশী শাসনের নিগড় ভাঙ্গার প্রথম প্রয়াসকে যদিও ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ নামে আখ্যায়িত করেছে কিন্তু ঢাকার লালবাগ দূর্গের ঘটনাকে তারা তাদের দলিল পত্রে রায়ট বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু আসলে তা ছিলো ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। সংঘবদ্ধ সংগ্রাম যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে আর স্বার্থবাদীদের বিশ্বাস ঘাতকতায় এ প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো। মীরাটে প্রথম এ সংগ্রামের সূচনা হয়, তখন থেকেই ঢাকার সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও ঢাকা তখনও শান্ত। অর্থাৎ বিপ্লবের সাথে ঢাকা নগরী তখনও জড়িত হয়নি। কিন্তু উত্তপ্ত বাতাস এদিক ওদিক থেকে এসে পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক করে তুলছিলো। লালবাগ দূর্গে তখন ৫৩ তম ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর দু'টি দল এখানে ছিলো। দেখতে দেখতে সমগ্র ভারতে এ বিপ্লবের অগ্নি শিখা ছড়িয়ে পড়লো। তবুও ঢাকায় বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো না। অপর দিকে ঢাকার ইংরেজ সম্প্রদায় ও সরকার পরিচালনায় কর্মরত অফিসারগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কলকাতায় সাহায্য প্রার্থনা করে পাঠায়। ভারতীয় নৌ বাহিনীর এক শত নৌ সেনার একটি দল ঢাকা এসে পৌছুলে ইংরেজদের মনে সাহসের সঞ্চার হয়। অন্যদিকে নব্য প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সরকারী কর্মচারী ও ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বড় বড় হিন্দু

জমিদার এবং বিত্তশালীরা গোড়া সৈন্যদের নানাভাবে উৎসাহিত ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করে দিতো। এ সময় খাজা আব্দুল গণী সমগ্র পূর্ব বাংলার মধ্যে সব চেয়ে ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। ইংরেজদের এই অন্তিম সময়ে পরম আনুগত্যের সাথে তাঁর সকল শক্তিও সম্পদ বৃটিশ সরকারের সাহায্যে নিয়োগ করলেন। দীন দুঃখীদের দুঃখ দুর্দশা মোচনে এবং সৎকার্যে দানের ব্যাপারে তাঁর ধন ভান্ডার পূর্ব থেকেই উন্মুক্ত ছিলো। তাই তাঁর পক্ষে বেগ পেতে হয়নি এই বিপ্লবে ঢাকার অধিকাংশ জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রাখতে। অন্যদিকে তিনি দূর দর্শিতা ও রাজনীতি বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের প্রায় সকল স্থানের বিপ্লবের আগুন তখন নিভে গেছে। গুটি কতক শহরে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে এ আগুন ভারতবাসীকে নাড়া দিতে পারবে না। তাই তাঁর ভাগ্যকে ইংরেজদের ভাগ্যের সঙ্গে একাত্ম করে ঢাকার জনসাধারণের মধ্য হতে বিক্ষোভ প্রশমিত করার ব্যাপারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করছিলেন।

বিপ্লবের শেষ অধ্যায়ে হঠাৎ এক সংবাদের উপর ভিত্তি করে বিপ্লব আরম্ভ হবার পূর্বেই শুরু হলো ইতিহাসের নারকীয় তান্ডব। ২২শে নভেম্বর রবিবার। ইংরেজ সেনা ও ঢাকার বেসামরিক ইংরেজ স্বেচ্ছাসেবকগণ ভোর হবার পূর্বেই সমবেত হলো আণ্টাঘর ময়দানে। (বর্তমানে বাহাদুর শাহ্ পার্ক) সেখান হতে তড়িৎ গতিতে ধাবিত হলো লালবাগ দূর্গের দিকে সিপাহীগণ অতর্কিতে আক্রমনের প্রচন্ডতায় দিশেহারা। ম্যাগাজিন ঘরের চাবি না পেয়ে অনেক বীর সিপাহী তাদের নিকট যা কিছু গুলী বারুদ ছিলো তা দিয়েই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেলো। ইংরেজ সেনাগণ দেখতে পেলো পরিস্থিতি তাদের অনুকুলে। তারা সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে কেল্লার কামানটিকে ঘুরিয়ে দিলো সিপাহীদের দিকে। তবুও কিছু সংখ্যক বীর সিপাহী বিপুল বিক্রমে তাদের বাঁধা দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সফলকাম হতে পারেনি কেল্লার অবস্থিত সিপাহীরা। তারা অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে তখনকার মত প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন আশপাশের বস্তিগুলোতে। যদি তারা ঘুনাক্ষরে জানতে পারতো যে ইংরেজ সেনা দল তাদের উপর আক্রমন চালাতে পারে তাহলে পলায়নরত সিপাহীরা প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করতো। এটা অবশ্যই সত্য। এ প্রসঙ্গে রাহাটের মোড় আলোচনাকালে বর্ণনা করা হয়েছে তজ্জন্য বিস্তারিত বলা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

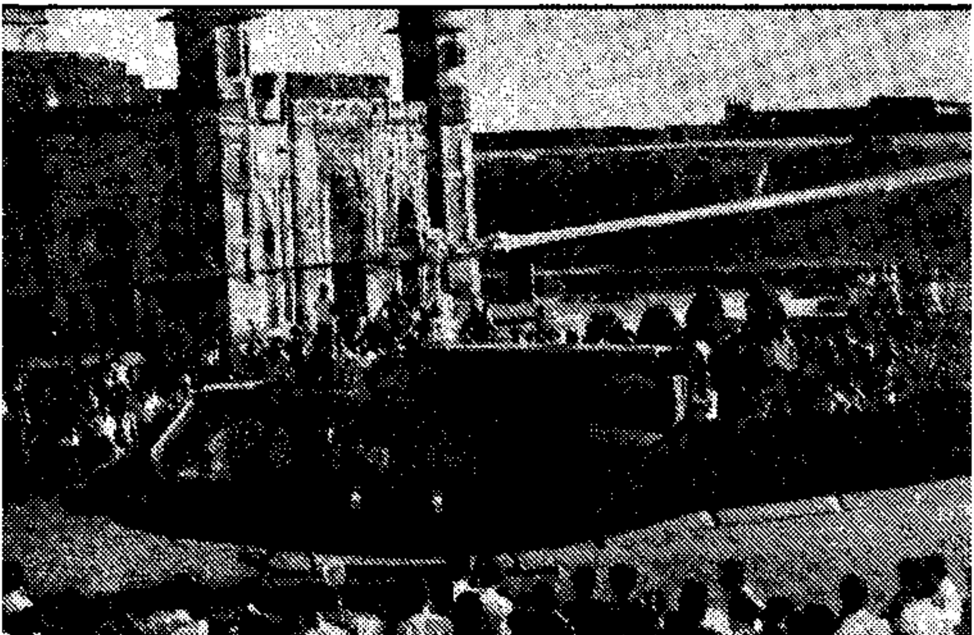
যুদ্ধে নিহত সিপাহী ব্যতিত যারা পালাতে না পেরে বন্দী হয়েছিলো তাদের অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের লাশগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছিলো দরবার

হলের সামনের পুকুরে। এই নারকীয় ঘটনার পর দীর্ঘ দিন পর্যন্ত লালবাগ দূর্গে ভুতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করে। যুদ্ধ শেষ হবার সাথে সাথে সিপাহীদের উৎসাহ, সাহায্য সহযোগীতা ও আশ্রয়দানের অভিযোগে শত শত নিরীহ মহল্লাবাসীকে পলায়ন পর ধৃত বন্দী সিপাহীদের সঙ্গে প্রহসনমূলক বিচার করে আণ্টাঘর ময়দানের বৃক্ষ সারিতে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিলো। আবার অনেককে বিভিন্ন মেয়াদের দন্ড প্রদান করা হয়েছিলো। ফাঁসিতে ঝুলানো লাশগুলো বৃক্ষ হতে নামাতে দেয়নি, যাতে ইংরেজ বিদ্বেষী ও জনগণের মধ্যে ইংরেজ রাজ শক্তি সম্পর্কে ভীতির উদ্রেক করে। গলিত দেহগুলো থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায়, আর শকুন কাক চিলদের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত আণ্টাঘর ময়দানের নিকটস্থ রাস্তা দিয়ে মানুষ যাতায়াত করতে পারেনি।

লালবাগ দূর্গের সিপাহীদের এই সংঘর্ষটিকে ঢাকাবাসী লালপল্টন ও কালা পল্টন এর তথা সোজা কথায় কালা ধলার লড়াই বলে জেনে আসছে। এর পরের ঘটনা আরও দুঃখজনক। ইংরেজ প্রশাসকরা দেশীয় সব কিছুকে অবজ্ঞার বস্তু বলে/মনে করতো। তাছাড়া এদের অনেকেই স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে ছিলো অজ্ঞ এবং চরম উদাসিন। ফলে দূর্গের ভিতরে যত্রতত্র বেখাপ্পা দালানকোঠা গড়ে ওঠায় দূর্গের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়েছিলো।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর লালবাগ দূর্গের অভ্যন্তরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। অবশ্যি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানে খাজা নাজিম উদ্দিন মন্ত্রিসভার আমলে এখানে পুলিশ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশদের সমান বেতনের দাবীতে দূর্গের অবস্থানরত পুলিশগণ ধর্মঘটকালে কেল্লার অস্ত্রাগারটিকে নিজেদের আয়ত্বাধীন রেখেছিলেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি ছিলেন মুহম্মদ আইউব খাঁন (পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট) এই ধর্মঘটের ফলে দূর্গে পুনরায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখন ছিলো পবিত্র রমজান মাস। সারা দিন কর্তৃপক্ষ আপোষ চেষ্টায় রত থাকলেন। অবশেষে সব আপোষ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় সেনাবাহিনী তলব করা হলো। তাঁদের উপস্থিতিতে আবার চললো নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা। দূর্গের উত্তর দিগস্থ রাস্তায় বহু লোকের ভীড়, উদ্বেগাকুল চোখে চেয়ে আছে শেষ পরিণতি দেখার জন্যে। এদিকে ইফতারের সময় ঘনিয়ে এলো। আমিও রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখার চেষ্টায় রত ছিলাম। সৈন্য বাহিনী শেষ সংকেত দান করলেন–লালপতাকা উড়িয়ে। এবার এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে ভেবে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয় বলে (কেননা তখন দূর্গের উত্তর দিকে পাকা দেওয়াল ছিলো না) বাড়ীর দিকে পথ ধরলাম

কিছু দূর আসতে না আসতেই রাইফেলের গর্জন শুনতে পেলাম। মনটা কি এক অব্যক্ত বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো। বাঙ্গালী পুলিশের রক্তে আবার লালবাগ দূর্গের মাঠ সিক্ত হলো। সুমিষ্ট সরবত পানীয়ের পরিবর্তে তপ্তলহু দিয়ে সেদিন পুলিশদের ইফতার পর্ব সমাধা করতে হলো। রাত্রির অন্ধকারে সেই সব রক্তাক্ত দেহগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো। অবশ্যি অল্প দিনের মধ্যেই সেই ধর্মঘটের অবসান হয়েছিলো এক আপোষ মীমাংসায়। এর পর তেমন কোন চাঞ্চল্যকর কোন ঘটনা ঘটেনি। দেশী বিদশে রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান হয়েছে। তবে সাধারণ লোক উল্লাসিত হয়েছিলো বেশ ক'বছর পূর্বে দূর্গের মাঠে হেলিকপ্টার অবতরণ করায় যা ইতিপূর্বে আর কখনও অবতরণ করেনি।



লালবাগ দূর্গে হেলিকপ্টার-এর অবতরণ

ঢাকার আহসান মঞ্জিল, নবাব আঃ গনীর পরিবারের ধন সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের কাহিনী অতীব চমক প্রদ। পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ খাজা আবদুল হাকিম কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দেশের আরো বহু জনের মতো তিনি ভাগ্যান্বেষের জন্যে দিল্লীর বাদশাহী দরবারে উপস্থিত হন। তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। কিন্তু অচিরেই মোঘল শক্তির চূড়ান্ত পতন ঘটে। তিনিও বেশ বেকায়দায় পড়ে যান। এই সময়ে

পূর্ববঙ্গের ধন-সম্পদের কাহিনী শুনে তিনি এই প্রদেশে আগমনে প্রলুব্ধ হন। এখন এদেশের লোক যেমন ভাগ্যান্বেষে মধ্যপ্রাচ্যে গমন করছে, তেমনি আগে ইরান, তুরান, হিন্দুস্থান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের যুবকরা ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে বাংলাদেশে আগমন করতো। এখানে এসে কেউ নিতো চাকরি, কেউ শুরু করতো ব্যবসা আবার কেউ বা অর্জন করতো জমিদারির সনদ।

নবাব আলীবর্দির শাসনামলে কাশ্মীর থেকে পূর্ব বাংলায় আগমন করেন আবদুল হাকিম। তিনি এদেশের বহু স্থান পরিভ্রমণ করে সিলেটে চামড়ার ব্যবসা শুরু করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল তখন আবদুল হাকিমের ভাই আবদুল্লাহও এসে ভাইয়ের ব্যবসায় যোগদান করলেন। ১৭৮০ সালে সিলেটের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে আবদুল্লাহ ঢাকায় চলে আসেন। সে সময় ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো। কারণ তাঁরা ইংরেজ সরকারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন চাকরিতে যোগদান করেছিলেন।

এজন্যে তাঁরা ছিলেন ইংরেজদের প্রিয় পাত্র। তাছাড়া চাকরির পয়সায় তারা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বেশ ধনশালী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে উদ্যোগী হননি বলেই দিনে দিনে তাঁদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে। আবদুল্লাহ এ সুযোগ গ্রহণ না করে কয়েকজন আর্মেনিয়ানের সঙ্গে লবণের ঠিকাদারি ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৭৯৬ সালে আবদুল্লাহর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র হাফিজুল্লাহ কয়েকজন আর্মেনিয়ানের সঙ্গে যৌথ-ব্যবসা আরম্ভ করেন। সে সময় আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীদের উপাধি ছিলো কোজা। কেউ এই কোজাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাইতো না। কিন্তু হাফিজুল্লাহ কোজাদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন বলে সকলের নিকট তিনি কোজা নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। আবার এমনও জনশ্রুতি আছে, তিনি নাকি নিজের নামের পূর্বে কোজা শব্দ ব্যবহার করতেন। অনেকের ধারণা এই কোজা শব্দই পরবর্তীকালে অপভ্রংশ হয়ে খাজা শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

লবণের ব্যবসা উপলক্ষে হাফিজুল্লাহকে প্রায়ই বাকেরগঞ্জ যেতে হতো। একদিন তিনি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাঁর অংশীদার কোজা মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আহার শেষে মাইকেল গল্পচ্ছলে বললেন, 'কোম্পানীর ভ্রান্ত নীতির জন্যে দিনে দিনে ব্যবসায় মন্দাভাব প্রকট হয়ে উঠছে। এরই আলোকে আমি একটা ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করছি, অদূর ভবিষ্যতে এদেশে জমিই হবে একমাত্র ধন ও সম্মানের উৎস।' কথাটা গল্পচ্ছলে হলেও হাফিজুল্লাহর মনে যথেষ্ট দাগ কেটে

গেলো। তাঁর ভাই আলিমুল্লাহও নানা কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তখন তিনি ব্যবসা বাদ দিয়ে জমিদারি ক্রয়ের দিকে মনোযোগ দিলেন। সে সময়ে বাকেরগঞ্জের বড় বড় জমিদারি পানির দরে বিক্রি হচ্ছিলো। কিন্তু তিনি যখন জমিদারি ক্রয়ের উদ্যোগ নিলেন তখন জমিদারি বিক্রি প্রায় শেষ। অবশ্যি খাস মহালের জমির নিলাম তখনও চলছিলো। তিনি একুশ হাজার টাকায় আইলা টিয়াখালি ফুলঝুরি নামে দুটি মহাল নিলামে খরিদ করলেন।

খাজা হাফিজুল্লাহ ঢাকার বেগম বাজারের বাসিন্দা ছিলেন। সেখানে তাঁর একটি সুন্দর বাড়িও ছিলো। পেশায় তিনি ছিলেন লবণের ঠিকাদার। কালের প্রবাহে তিনি একজন সম্মানিত জমিদার হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি ঢাকা কালেকটরকে ২০টি স্বর্ণ মুদ্রা নজরানা দিয়ে সরকারের আনুগত্য লাভ করেন। সে সময় থেকে সরকারই হলেন তাঁর রক্ষক ও মনিব। তাঁর প্রতি সরকারের নেক নজর নিপতিত হওয়ায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জনগণের অকুণ্ঠ সম্মান ও সমর্থন লাভ করেছিলেন।

এদিকে প্রকৃতির অকৃপণ দয়ায় বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়ে গেলো। এই পরিবর্তনে হাফিজুল্লাহর কপালও গেলো খুলে। অনুর্বর বালুকাময় বিরান ভূমি হয়ে উঠলো উর্বর ও শস্যশ্যামল। জেলার উজান থেকে হাজার হাজার রায়ত এসে এই অঞ্চলে শুরু করলো চাষাবাদ। প্রচুর ফসল ফলতে লাগলো সেখানে। ১৮২০ সালে ওই অঞ্চলের আয় দাঁড়ায় প্রায় এক লক্ষ টাকা। এদিকে সরকারী রাজস্ব দিতে হয় মাত্র ৩৭২ টাকা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় সরকার রাজস্ব বাড়াতে পারেননি। জমির আয় দেখে তখন হাফিজুল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে আরও জমিদারি ক্রয়ের মনস্থ করলেন।

হাফিজুল্লাহর কোন সন্তানাদি ছিলো না। এজন্যে তাঁর সম্পত্তির মালিক হলেন তাঁর ভ্রাতা আলিম উল্লাহ। মৃত্যুর পূর্বে হাফিজুল্লাহ তাঁর ভাইকে বহু উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। আলিম উল্লাহ ভাইয়ের উপদেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করায় পূর্ববঙ্গে বহু জমিদারির মালিক হতে পেরেছিলেন। তৎকালে তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম জমিদারির মালিক। তাঁর জমিদারি থেকে বার্ষিক লক্ষ টাকা আয় হতো। বাকেরগঞ্জের অধিবাসীরা তাঁকে মিয়া উপাধিতে ভূষিত করেছিলো। তৎকালে বাকেরগঞ্জে মিয়া ছিলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানীয় উপাধি। তখন থেকেই ঢাকায় খাজা পরিবারের পুরুষরা মিয়া এবং মহিলারা বেগম বলে পরিচিত হয়ে আসছেন।

আলিম উল্লাহ নিজেকে কাশ্মীরের অভিজাত পরিবারের লোক বলে পরিচয়

দিতেন। তিনি ধনৈশ্চর্যে যশস্বী হয়ে উঠলেও সে সময়ে ঢাকায় খানদানি নবাব ও আমীর ওমরাহদের বংশধররা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। ঢাকায় তাঁরাও সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে সবার নিকট পরিচিত ছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ক্ষুণ্ন হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্ব অপ্রতিহতই ছিলো। তৎকালে হীনবল এসব শরীফ পরিবারের লোকদের কাছে সামাজিক ক্ষেত্রে আলিম উল্লাহর তেমন কোন মূল্য ছিলো না। তাছাড়া আলিম উল্লাহ পিতৃ-পুরুষদের কেউই মোঘল বাদশাহদের কর্মচারি ছিলেন না বলে ঢাকার অভিজাত সম্প্রদায় তাঁকে একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করতেন। এত বড় জমিদারির মালিক হয়েও তিনি ঢাকায় অভিজাতদের একজন হতে পারেননি বলে খুবই মর্মপীড়ায় ভুগতেন। সমাজের মাঝে অভিজাত হওয়ার ব্যাপারে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না। আভিজাত্যাভিলাষী আলিম উল্লাহ একদিন ঢাকাবাসীদের মনে তাক লাগিয়ে দিলেন। ১৮৩১ সালের জানুয়ারী মাসের এক হিমেল সন্ধ্যায় লাহোরের বিখ্যাত অশ্বব্যবসায়ী জবরদস্থ খাঁ এক ডজন উন্নত জাতের আরবী ঘোড়া নিয়ে ঢাকায় উপস্থিত হলেন। ঢাকাবাসীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো, এসব দামী ঘোড়া কার জন্যে। অবশ্যি অনেকেই ধারণা করলো, ধনবান আলিম উল্লাহ এসব ঘোড়ার একমাত্র ক্রেতা, অন্য কারো পক্ষে এত দামী ঘোড়া ক্রয় করা মোটেই সম্ভব নয়। তৎকালে যদিও জগৎশেঠের পূর্বাঞ্চলীয় ব্যাঙ্কগুলোর ক্রেতা শ্রেষ্ঠ ধনকুবের গোপাল দাস উপস্থিত ছিলেন ; তিনি কিন্তু মোটেই আভিজাত্যাভিলাষী ছিলেন না, রাশি রাশি টাকা সঞ্চয়ই ছিলো তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। এজন্যে ঘোড়া ক্রয়ের ব্যাপারে গোপাল দাসের নাম কেউই চিন্তা করতে পারেনি। তৎকালে আভিজাত্যের প্রথম সোপান ছিলো দামী দামী ঘোড়া। সে ঘোড়ায় চড়ে আলিম উল্লাহ শুরু করলেন আভিজাত্যের পথযাত্রা। নব্য আভিজাত্যের এই নগ্ন বহিঃপ্রকাশে ঢাকার ঐতিহ্যবান আমীর শেখ কুতুব উদ্দীন তাঁর স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি বিক্রি করে লক্ষ্ণৌ চলে যান।

এরপর খাজা আলিম উল্লাহ ঘোড়া ব্যবসায়ী জবরদস্থ খাঁকে আরও দামী ঘোড়া সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত তিনটি বিলাসবহুল ঘোড়াগাড়ি তৈরিরও ফরমায়েশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন ঢাকায় কেউ যদি কোন পুরাতন শৌখিন ও বিলাস দ্রব্য বিক্রির মনস্থ করেন, তাহলে যেন আলিম উল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কেননা শেখ কুতুব উদ্দীন জেদের বশবর্তী হয়ে বাদশাহ প্রদত্ত রূপার ছড়ি ও মুক্তার মালাটি গোপাল দাসের কাছে মাত্র দুহাজার টাকায় বিক্রি করেছিলেন। সেই ছড়ি ও মালাটি আলিম উল্লাহ গোপাল দাসের কাছ

থেকে তেইশ হাজার টাকায় কিনে নিয়েছিলেন। আলিম উল্লাহ্ এইসব ঘোষণা ও নির্দেশ পুরনো অভিজাত পরিবারের লোকজনদের কাছে দারুণ অহমিকা বলেই প্রতিপন্ন হতো। অবশ্যি ধনৈশ্চর্যের অহমিকা আজও অপ্রতিহত গতিতেই বিরাজিত রয়েছে।

আলি মিয়া শুধু বিরাট জমিদারির মালিক হয়েই যশ অর্জন করেননি, খেলাধূলার প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিলো। তিনি ঢাকায় সর্ব প্রথম ঘোড়দৌড়ের প্রচলন করেন। প্রত্যেক জানুয়ারী মাসে তিনি ঘোড়দৌড়ের বাৎসারিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন। ঐ উৎসবে শহরের সরকারী বেসরকারী আমলা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ জানানোর ব্যবস্থা ছিলো। তাঁদের সম্মানে আয়োজন করা হতো বিরাট ভোজ, নাচ-গানের জলসা ইত্যাদি।

খাজা আলিম উল্লাহ মধ্যযুগের ইউরোপীয় সামন্ত প্রভুদের মত অজস্র অনুচরবর্গ ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যবহারে শিকারে যেতেন। তিনি মণিমাণিক্য ও হীরাজহরত খচিত অলংকার পরতে খুবই পছন্দ করতেন। তিনি বহু হীরকখণ্ড ক্রয় করেছিলেন। তবে দরিয়া-ই-নূর বা আলোর সাগর নামক হীরক খণ্ডটি ক্রয় করে তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন। আলি মিয়া জীবদ্দশায় আভিজাত্যের সব রকম উপকরণই সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু আভিজাত্যের সনদ লাভ করতে সক্ষম হননি।

আলি মিয়ার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন খাজা আবদুল গণী। আলি মিয়া বহু চেষ্টা করেও আভিজাত্যের যে সনদ লাভ করতে পারেননি, খাজা আবদুল গণী তা অর্জন করেছিলেন। রাজকীয় দান-খয়রাত ও দরবার বসিয়ে তিনি পিতা অপেক্ষা সম্মানীয় ও পূজনীয় হয়ে উঠেছিলেন। গণী মিয়া যে দরবার বসাতেন তা নায়েব নাজিমের দরবারকেও হার মানাতো। তাঁর দরবারে অগণিত লোক সমাগম হতো। ঐ দরবারে আরজি ছিলো ন্যায় বিচারের, সাহায্য দানের, ঝগড়া-বিবাদ সমাধানের, নৈতিক মান রক্ষার এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবাদিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার। সরকারী আমলা ও পুলিশের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে গণী মিয়ার অপরিসীম ব্যক্তিত্ব ছিলো। তিনি ছিলেন দূর্লভ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি অতি সহজেই সব অভিযোগের সালিশ-মীমাংসা করে দিতেন। তাঁর বিচারাদেশের বিরুদ্ধে কাকেও কোনদিন প্রতিবাদমুখর হতে শোনা যায়নি। দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রতিরোধে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো অপরিসীম। তাঁরই প্রভাবে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঢাকার অধিকাংশ অধিবাসীরা একেবারে শান্ত ছিলো। তাঁরই যোগ্য নেতৃত্বে ১৮৬৯ সালে শিয়া-সুন্নীর মধ্যে যে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়েছিলো তা অতি সহজেই প্রশমিত হয়েছিলো। পূর্ববর্তী

নবাবগণ ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা শহরে একটি শক্তিশালী শিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিলো। ওহাবী ও ফারায়েজীরা শিয়া নির্মূল অভিযান চালিয়ে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামার নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সরকারের সব বাহিনী যখন ঐ বিভৎস দাঙ্গা দমনে ব্যর্থ হয়ে গেলো তখন এগিয়ে আসেন খাজা আবদুল গণী। মাত্র তিন দিনের মধ্যেই তিনি এই ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি শুধু দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমন করেই ক্ষান্ত হননি, ঐ ধর্মীয় সমস্যা সমাধানে এমন বুৎপত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন যে পরবর্তী ৫০ বছরের মধ্যে ঢাকায় আর কোন ধর্মীয় দাঙ্গা সংঘটিত হয়নি। ধর্মীয় হানাহানির আপোষ মীমাংসায় তাঁকে চারদিন ধরে বিশ হাজার লোককে খাওয়াতে হয়েছিলো। তিনি যে কোন ত্যাগ স্বীকারে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করতেন না বলেই সবার প্রিয়পাত্র ও ধন্যবাদর্হ ছিলেন।

প্রাতঃস্মরণীয় নবাব খাজা আঃ গণী ১৮৬৬ সালের দূর্ভিক্ষের সময় ভূখাদের অন্যদানের জন্য বর্তমান জেলখানার নিকট পূরাব দরওয়াজা মহল্লায় একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেছিলেন। এ লঙ্গরখানায় দূর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোক দূর্ভিক্ষকাল পর্যন্ত নিয়মিত খানাপিনা গ্রহণ করতো।



নবাব খাজা আঃ গনী

খাজা আবদুল গণী বিশ্বাস করতেন, মহল্লা বা গ্রাম্য মাতব্বরদের মধ্যস্থতায় সমাজের সর্ব প্রকার অপরাধের বিচার সম্ভব। এজন্যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বিচারপ্রার্থী আদালতের শরণাপন্ন হয়ে কিভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে সে সম্পর্কে তিনি হাজারো উপমা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারতেন। সালিশী মজলিসে ঐরূপ কোন না কোন গল্প বলে তিনি সালিশীর কাজ আরম্ভ করতেন। তাঁর মধ্যস্থতা করার অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পর্কে বাংলায় তৎকালে বহু গল্প প্রচলিত ছিলো। জমিদারে জমিদারে যুদ্ধ করে আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে এরূপ জটিল সমস্যারও সমাধান করেছেন খাজা আব্দুল গণী। তাঁর জমিদারিতে কড়া নির্দেশ দেয়া ছিলো ঃ সালিশ শেষ না করে কেউ যেন আদালতে শরাণাপন্ন না হয়। তাঁর জমিদারিতে সর্বনিম্ন আদালত ছিলো গ্রাম পঞ্চায়েত আর সর্বোচ্চ আদালত ছিলো আহসান মঞ্জিলের দরবার কক্ষ।



নবাব বড়ীর দরবার হলে যাতায়তের সিঁড়ি পথ

তাঁরই প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে ঢাকা শহরে মহল্লায় মহল্লায় পঞ্চায়েত প্রথার পুনঃ প্রবর্তন হয়েছিলো। প্রত্যেক পঞ্চায়েতে একজন করে সরদার ও একজন করে

নায়েব সরদার নিযুক্ত করে দরবার বসিয়ে মহল্লা সরদারের মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিতেন খাজা আবদুল গণী। খাজা আবদুল গণীর সরকার সহযোগিতামূলক কাজ, জনকল্যাণকর বিরাট দান এবং ব্যক্তিগত প্রভাব ও প্রতিপত্তির জন্যে ১৮৭৫ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে নবাব খেতাবে ভূষিত করেন এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই খেতাব উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বলে ঘোষণা ও সম্মান নিয়ে ১৮৯৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

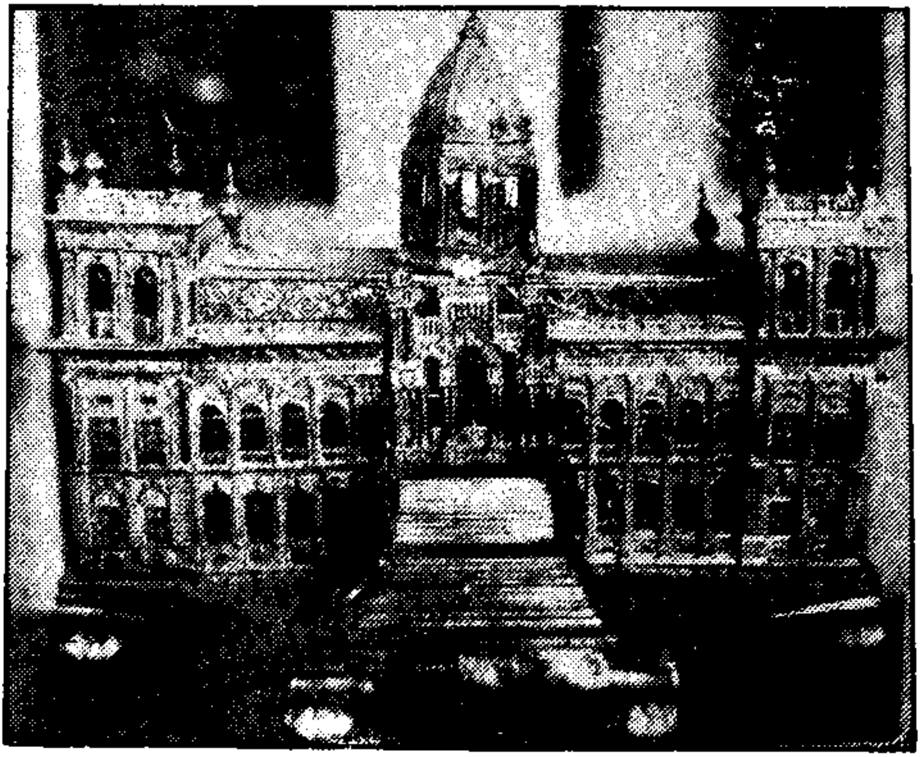
খাজা আবদুল গণীর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র নবাব আহসান উল্লাহ পিতার মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন। পিতার জীবিতকালেই তিনি ১৮৭৫ সালে "নবাব" উপাধীতে ভূষিত হয়েছিলেন। নবাব হওয়ার পর তিনি সি. আই. ই. খেতাব লাভ করেন। অতঃপর স্যার ও কে. সি. আই. ই. উপাধীতে ভূষিত করা হয়। নবাব আহসান উল্লাহ আরবী, ফারসী, উর্দূ প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কাব্য জগতেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিলো। তিনি উর্দূ কাব্যজগতে "শাহীন" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত উর্দূ গজল এখনও ঢাকার মিলাদ মহফিলে পাঠ করা হয়ে থাকে। তিনি পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। দান খয়রাতে তিনি তাঁর পিতার অপেক্ষা অধিকতর উদার হস্ত ছিলেন। তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালের উন্নয়নে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। তৎকালীন ঢাকায় প্রত্যেকটি মসজিদে, মাজারে এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। নবাব আহসান উল্লাহ বৃটিশ রাজ কর্তৃক কে. সি. আই. সি. উপাধি প্রাপ্তিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে ১৯০১ সালে ঢাকায় সর্বপ্রথম বিজলী বাতি প্রবর্তনের জন্যে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা দান করে ঢাকার বুকে এক অমর কীর্তি রেখে গেছেন। আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজটিও (বর্তমানে ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়) তাঁর নামকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

ঢাকা এক সময় বঙ্গদেশ তথা সারাদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পের খ্যাতি ছিলো। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কর্মকারগণ এত সুক্ষ্ম কাজ করিতে পারতো না। নবাব আহসান উল্লার সময়েও সে খ্যাতি অনেকটা ছিলো। সে সময় ইরানের বাদশাহ ঢাকার নবাব আহসান উল্লাহ বাহাদুরের নিকট ঢাকার ঐতিহাসিক ও প্রাচীন হোসেনী দালানের একখানা আলোকচিত্র পাঠাবার অনুরোধ জানান।



নবাব আহসান উল্লাহ বাহাদুর

শুধু একখানা আলোক চিত্র পাঠানো নবাব বাহাদুরের মানমর্যাদায় ভালো মানাবেনা। তাই তিনি ঢাকার তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ স্বর্ণকার আনন্দ হরির হস্তে ঢাকার হোসেনী দালানের একখানা প্রতিকৃতি স্বর্ণ ও রৌপ্য তার দ্বারা তৈরী করার ভার দিলেন। স্বর্ণকারও সুন্দর রূপে তার শিল্প চাতুর্য্য দ্বারা কাজটি সমাধা করে দিলে সেটা ইরানের বাদশাকে উপহার স্বরূপ নবাব সাহেব পাঠিয়ে ছিলেন। পরবর্তীতে উক্ত স্বর্ণকার আহসান মঞ্জিলেরও একটি প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছিলেন। উল্লেখ থাকে ঢাকার রৌপ্য নির্মিত গোলাপবাস ও আতর দান এক সময় সারা ভারতে প্রসিদ্ধ ছিলো।



আহসান মঞ্জিলের প্রতিকৃতি

নবাব আহসান উল্লাহ বড় লাটের পরিষদের একজন গণ্যমান্য সদস্য ও ঢাকা পৌরসভার একজন কমিশনার ছিলেন। নবাব স্যার আহসান উল্লাহ ইংল্যাণ্ডের মহারানী ভারতেশ্বরী উপাধীপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী শাহবাগ উদ্যানে নিজ ব্যয়ে শিল্প ও হস্ত শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। স্বনামধন্য নবাব আহসান উল্লাহ যশ ও খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে ১৯০১ সালে দুই পুত্র খাজা সলিমউল্লাহ ও খাজা আতিকুল্লাহকে রেখে আকস্মাৎ ইন্তেকাল ফরমান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে জমিদার ও নবাবী আমলে ঢাকায় বিনোদনের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিলো না। তৎকালে মদ্যপান, দেহ পসারিণীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, নৃত্য-গীত, গান-বাজনা, জুয়াখেলা প্রভৃতি কার্যকলাপই ছিলো চিত্তবিনোদনের প্রধানত উপকরণ। তবে নবাব ও জমিদার শ্রেণীর অনেকেই এসব থেকে দূরে থাকতেন। তাঁরা নির্মল আনন্দ-উল্লাস যেমন খেলাধূলা, শারীরিক কসরত, নীল আকাশে বেলুন ওড়ানো প্রভৃতি উপভোগ করে বিমল আনন্দ লাভ করতেন।

একবার ঢাকার নবাব আহ্সান উল্লাহ্ দশ হাজার টাকার চুক্তিতে সুদূর ইউরোপ থেকে কয়েকজন বেলুন আরোহীকে এখানে এনেছিলেন। ঐ দলে এক সুদর্শন যুবক, তাঁর বয়স্কা মাতা এবং সুশ্রী সুন্দরী উদ্ভিন্ন যৌবনা ভগ্নীও ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই বেলুনে আরোহণ করার ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বেলুনে আরোহনের পর চমকপ্রদ দৃশ্য উপভোগের জন্যে সমগ্র ঢাকা শহরে ঢোল-সোহরত করা হয়েছিলো। দলে দলে লোক এসে ভীড় জমালো আহসান মঞ্জিলের চারদিকে। নবাব আহ্সান উল্লাহ্ বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যবহারে আহসান মঞ্জিলের ছাদে আসন গ্রহণ করলেন।

যথা সময়ে নবাব সাহেবের সঙ্গে আলোচনার পর সাব্যস্ত হলো বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ তীর থেকে বেলুন ওড়ানো শুরু হবে। নবাব সাহেব সঙ্গী-সাথী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ঐ তরুণীকে বেলুন ওড়াবার আদেশ দিয়েছিলেন। তরুণী বেলুন ওড়াতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু তেমন দক্ষ ছিলেন না। তবু নবাবের ইচ্ছানুযায়ী ঐ তরুণীকেই বেলুনে আরোহণ করতে হলো। সেদিন প্রবল বেগে বাতাস বইছিলো। বেলুনে প্রচুর ধুম্র প্রবিষ্ট করায় বেলুনটি বিরাট আকার ধারণ করলো। বেলুনের নীচে একখণ্ড কাঠ শক্ত করে বেঁধে তার উপর আরোহণ করলো ঐ তরুণী। দেখতে দেখতে বেলুনটি আকাশে উড়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে হাজার হাজার মানুষের করতালিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে গেলো। আহসান মঞ্জিলের মাথার উপর আসার সাথে সাথে দর্শক সাধারণ দেখতে পেলেন বেলুন হতে ধুম্র নির্গত হচ্ছে। এমন সময় তরুণীটি প্রাণ রক্ষার জন্যে ছাতার সাহায্যে বেলুন থেকে লম্ফ দিয়ে পড়লেন। বাতাসের বেগ থাকায় আহসান মঞ্জিলের ছাদে অবতরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। ছাতা হাতে ঝুলতে ঝুলতে তিনি আরো উত্তর দিকে সরে যেতে লাগলেন। তরুণীটির এই শোচনীয় অবস্থা দেখে অনেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো।

বেলুন থেকে অবতরণ করলে বা দৈবাৎ বেলুন আরোহী নিচে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধারের জন্যে বেশ কিছু লোক মোতায়েন রাখা হয়েছিলো। তরুণীকে ছাতা হাতে উড়ে যেতে দেখে উদ্ধারকারী দল তাঁকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে লাগলো। এক পর্যায়ে আহসান মঞ্জিলের দুই মাইল উত্তরে রমনার নবাব বাগিচার এক সুউচ্চ ঝাউ

বৃক্ষের মাথায় ছাতা সমেত তরুণীটি আটকিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে ঝাউ গাছের নিচে গিয়ে হাজির হলেন। তখন সন্ধ্যা অতিক্রম করে চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পুলিশ অফিসার একটা লম্বা বাঁশ আনিয়ে তরুণীকে বাঁশের সাহায্যে অবতরণ করতে বললেন। কিন্তু তরুণী তার মা ও ভাইকে সেখানে হাজির করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু পুলিশ অফিসার সে কথায় কর্ণপাত না করে পুনরায় তরুণীকে বাঁশ বেয়ে অবতরণ করতে বললেন। উপায়ন্তর না দেখে বাঁশ বেয়ে নিচে নামার সময় দৈবক্রমে বাঁশটি ভেঙ্গে গেলো। তখন অনেক উঁচু থেকে ছিটকে পাকা মেঝের উপর পড়ে যাওয়ায় তরুণীটি গুরুতর আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুতে তরুণীর ভাই ও মা বুক-ফাটা কান্নায় ফেটে পড়লেন এবং দর্শকবৃন্দ বিমল আনন্দ উপভোগ করতে এসে অন্তরে ব্যাথার জ্বালা নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে গেলো।

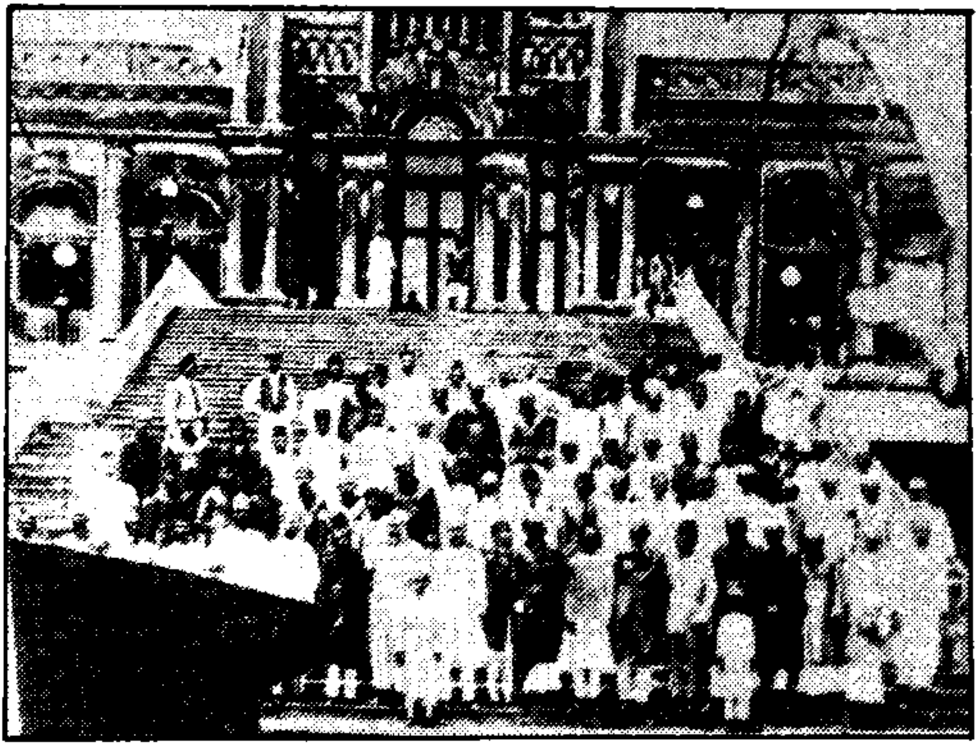
নবাব সলিমুল্লাহ ছোট বেলা থেকেই নবাবী আভিজাত্য পরিহার করে জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। তাঁর পিতা নবাব আহসান উল্লাহ পুত্রের ব্যবহারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেন এবং পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্বদা চিন্তান্বিত থাকতেন। পুত্র যাতে সবার সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ না পান তজ্জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি দিয়ে ময়মনসিংহে সরিয়ে রেখেছিলেন। বস্তুত এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী জীবনেই খাজা সলিমুল্লাহ সাধারণ মানুষকে চেনার ও তাদের সুখ-দুঃখের বিভিন্ন সমস্যাদি বোঝার সুযোগ লাভ করেন। এ কারণে নবাবী মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি সর্বস্তরের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও শুভেচ্ছা লাভ করেছিলেন। সে সময় মুসলমানদের চারদিকে ছিলো ব্যর্থতার ইতিহাস। বৃটিশ সরকার মুসলমানদের সসম্মানে বেঁচে থাকার সকল পথই রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সরকারী দফতর ও সৈন্য বিভাগে মুসলমানদের চাকরি রহিত করা হয়েছিলো। এ পরিস্থিতিতে ১৮৯২ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, তাতে স্যার সৈয়দ আহমদ, স্যার আগা খান, নবাব আহসান উল্লাহ ও সৈয়দ আমীর আলীর মত ভারত-বিখ্যাত ব্যক্তিরাও ভোট যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছিলেন। ঘোর তমসাচ্ছন্ন এই দিনে অনুন্নত, অবহেলিত ও মৃতপ্রায় মুসলিম জাতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের সংকল্প নিয়ে সংগ্রাম পরিচালনায় এগিয়ে আসেন

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।



নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুর

তৎকালীন ভারতে মুসলমান নেতৃবৃন্দের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নে কোন নেতাই তেমন কোন অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ঢাকা নগরীতে নব-দিগন্ত উন্মোচনের এক শুভ সূচনা হয়েছিলো। নবাব সলিমুল্লাহ ভারতীয় মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানালেন। নবাব সলিমুল্লাহর আহ্বানে ১৯০৬ সালে ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ এক জমায়েতে মিলিত হন। প্রথম আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা কনফারেন্স'। দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।



১৯০৫ সালে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র উদ্যোগে ঢাকার শাহাবাগে অনুষ্ঠিত সর্ব ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে উপ-মহাদেশের তৎকালীন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গনে দেখা যাচ্ছে। পরবর্তী সম্মেলনে এসব নেতৃবর্গ আরো সহস্রাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ভারত বিভক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান নামে দুটি পৃথক আবাসস্থল। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান বেশিদিন এক থাকতে পারেনি। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানীরা সব সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ত করে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেত, সেই সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের এক অতুচ্চ প্রাচীর খাড়া হয়ে গিয়েছিলো। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

নবাব সলিমুল্লাহ নবাবী গ্রহণের প্রাক্কালে পূর্বের ন্যায় ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ছিলো না। নবাব পরিবারের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং অকাতরে দান-খয়রাত করার জন্যে সঞ্চিত ধন-সম্পদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। এজন্যে নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সের ব্যয় নির্বাহের জন্যে তাঁর বেগমের মূল্যবান অলংকারাদি এক মাড়েয়াড়ীর নিকট বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্যি এইসব কনফারেন্স অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যায়

হয়েছিলো। নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি একজন সাচ্চা মুসলমানের ন্যায় ইসলামী বিধি-নিষেধ অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে প্রতিপালন করতেন। তিনি নিজ কওমকে যেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, তেমনি কওমের ছিলো তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। কওমের তরক্কির জন্যে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তৎকালে মুসলমানরা ছিলো শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাদপদ। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত ছিলো না। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রত্যেক মহল্লায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো একটি করে নৈশ বিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরে গড়ে উঠেছিলো অসংখ্য মসজিদ ও মাদ্রাসা। এছাড়া নবাব সলিমুল্লাহর অক্ষয় কীর্তি বহন করে চলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম ছাত্রাবাস, ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, মুসলিম এতিমখানা ও বাকল্যাণ্ড বাঁধ।

তিনি প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়াল আমাদের নবী করিম হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জন্ম দিন খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করতেন। এই মহান দিনে শহরের মুসলমান মহল্লার পথ-ঘাট, দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর সুসজ্জিত করা হতো। প্রায় সকল জায়গায় মিলাদ মহফিলের আয়োজন করা হতো এবং সেই সাথে খানাপিনারও ব্যবস্থা থাকতো। এই কওমী উৎসবের তিনিই ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ প্রথা ঢাকায় পাক আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো।

নবাব সলিমুল্লাহ দৃঢ়-চেতা, ন্যায় পরায়ণ ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। মুসলিম কওমের দাবীদাওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তৎকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু নেতাই নবাব সলিমুল্লাহকে খুব ভয় করে চলতেন। নবাব সলিমুল্লাহ একাই কুচক্রী নেতৃবৃন্দের কূটজাল ছিন্ন করে মুসলমানদের অধিকার আদায়ে জীবনপাত করে গেছেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মনোবলের কাছে হিন্দুদের অস্ত্রবল, অর্থের প্রাচুর্য ও বিপুল জনশক্তি পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হতো। এমন কি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁর অকাট্য যুক্তিতে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এবং আসাম ও পূর্ব বাংলাকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতেও বাধ্য হয়েছিলেন। তৎকালে বাংলা ও আসামে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তারা ছিলো হীনবল। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রেই মুলমানদের ঐরূপ দুর্দশা হয়েছিলো। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নবাব সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ঐ নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় স্থাপিত হলে এখানকার মুসলমানরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাদীক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি সাধন করতে পারবে

বলেও তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর স্বপ্ন সফল হলেও হিন্দু নেতৃবৃন্দ এটা মেনে না নিয়ে বঙ্গভঙ্গকে হিন্দু ধর্মের প্রতি প্রবল ষড়যন্ত্র বলে ধুয়া তুলেছিলো। তারা তখন বঙ্গভঙ্গ রহিতের জন্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ঐ আন্দোলনে দেশের বহু সংখ্যক মুসলমান তাদের সাথে হাত মিলিয়েছিলো। স্বার্থান্ধ ও অজ্ঞ মুসলমানদের ঐরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সলিমুল্লাহ বড়ই মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন অনগ্রসর মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি।

নবাব সলিমুল্লাহ অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। হতোদ্যম ও হঠকারী হয়ে সম্মুখ সমর থেকে প্রত্যাবর্তন করা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিলো না। বঙ্গভঙ্গের তাৎপর্য সকলকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে তিনি নবাবী আরাম-আয়েশ ও ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে শহরে বন্দরে গ্রামে-গঞ্জে উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথায় আকৃষ্ট হয়ে বিপথগামী মুসলমানরা তাঁর দলে শামিল হয়েছিলেন। ঐ অভিযানকালে একদিন এক বিরাট সংকটের মোকাবিলা করতে হয়েছিলো তাঁদের। ট্রেন লাইনচ্যুত করে নবাব সলিমুল্লাহ ও তাঁর দলবলকে নিহত করার এক ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করা হয়েছিলো। কিন্তু অপার করুণাময় আল্লাহর তায়ালার মেহেরবাণীতে ট্রেনটি চাঁদপুরের নিকটে হঠাৎ একদিকে কাত হয়ে পড়েছিলো। ড্রাইভারের সুচিন্তিত ইশারায় নবাব ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা দ্রুত ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিলেন। তাঁরা সে যাত্রা দুর্ঘটনার কবল থেকে কোন রকমে রেহাই পান। পরে অবশ্যি ট্রেন লাইনচ্যুত করার সব তথ্যই তাঁদের নিকট উদঘাটিত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, ময়মনসিংহের ধনবাড়ির জমিদার নবাব আলী চৌধুরী, তৎকালীন প্রসিদ্ধ ইংরেজী পত্রিকা মুসলিম ক্রনিকেলের সম্পাদক জনাব আবদুল হামিদ, ফরিদপুরের জমিদার চৌধুরী গোলাম সাত্তার, ঢাকার বলিয়াদির অন্যতম জমিদার খান বাহাদুর ফরিদ উদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী, ঢাকার মীর্জা আবদুল কাদের সরদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর্জা ফকির মুহম্মদ। মীর্জা ফকির মুহম্মদ একজন উর্দু কবি হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। কর্মময় জীবনে তিনি ছিলেন সেটেলমেণ্ট দফতরের একজন নাজির। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে আরো ছিলেন সালারের জনপ্রিয় জমিদার মওলবী আবদুল হক এবং ঢাকার ইতিহাস লেখক ও অন্যান্য পুস্তক রচয়িতা খান সাহেব সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর।

নতুন প্রদেশ গঠনে হিন্দুদের কোন অসুবিধা ছিলো না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হতো না। মুসলমানদের উন্নতির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মানসেই তারা সর্বভারতীয়

আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। ভারতব্যাপী আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে বঙ্গভঙ্গ রদ করে দিলেন। দিল্লীর দরবারে ঐ ঘোষণা ছিলো মুসলমানদের জন্যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত স্বরূপ। কিন্তু নবাব সলিমুল্লাহ দমবার পাত্র ছিলেন না। দিল্লীর দরবারে তিনি সিংহের ন্যায় হুঙ্কার দিয়ে ঐ ঘোষণার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ 'বৃটিশ সরকার আজ নতুন প্রদেশ ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ জারি করে মুসলমানদের প্রতি ঘোরতর অবিচার করলেন। হিন্দুদের খুশি করার জন্যেই মুসলমানদের স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো। এ ঘটনা হতে মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে সুযোগ পেলে মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে কখনও দ্বিধা করবে না।'

হিন্দুরা যে মুসলমানদের উন্নতির ঘোর বিরোধী নবাব সলিমুল্লাহ সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্যে হিন্দুদের রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসে যাতে কোন মুসলমান যোগদান না করে তজ্জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না। তিনি মুসলমানদের জন্যে সর্ব ভারতীয় একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। তাঁর চেষ্টা বিফল হয়নি। হিন্দুদের সব প্রচারণা ও প্রতারণা নস্যাৎ করে দিয়ে মুসলিম লীগ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হয়েছিলো। তৎকালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতির মধ্যে নব জাগরণের শুভ সূচনা হয়েছিলো। কিন্তু কেউ কেউ বলে থাকেন, তৎকালীন ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্যেই নবাব সলিমুল্লাহকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। অথচ নবাব সলিমুল্লাহর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবের জন্যেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নবাব সলিমুল্লাহকে হিন্দু মহাজনদের নিকট থেকে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা ঋণ করতে হয়েছিলো। হিন্দু মহাজনরা এবার এটাকে একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহন করলেন। তাঁরা রাজনৈতিক তৎপরতা স্তব্ধ করে দেবার জন্যে ঋণ আদায়ে প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেন। এমন কি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাঁকে জেলে দেবার ভয়ও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু নবাব সলিমুল্লাহ হিন্দুদের ঐ সব কূট জাল ছিন্ন করে পূর্ববাংলা ও আসামকে নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন এবং মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই বলতে হয়, মুসলিম জাগরণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, কোন কোন মুসলমান লেখক

নবাব সলিমুল্লাহর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে বৃটিশের দালালী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মতে, এটা নাকি ইংরেজের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতেই করা হয়েছিলো। এখন এসব বানোয়াট কথাবার্তা বলে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে খাটো করার অপচেষ্টা চালানো উচিত নয়। তৎকালে মুসলিম জাগরণে তিনি কি অবদান রেখে গেছেন তা ইতিহাসই বলে দেবে।

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর নবাব সলিমুল্লাহ দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বললেন, এটা নবাব সাহেবের ভণিতা মাত্র। এ সময় লোকের মধ্যে যাতে বিতর্কের সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য তিনি কাকেও সাক্ষাতদান করতেন না। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গের জন্যে তিনি জীবনপাত করে গেছেন। মুসলিম লীগ গঠন করে ঋণ-জালে জর্জরিত হয়েছেন। অথচ বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে তাঁর সব স্বপ্ন-সাধকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলো। এটা তিনি কোন মতেই সহ্য করতে পারেননি। ক্ষোভে দুঃখে তিনি সত্যই মানসিক ও শারীরিকভাবে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এই অসুস্থ শরীর নিয়ে যুক্ত বাংলার কাউন্সিল অধিবেশনে যে জ্বালাময়ী ভাষন তিনি দিয়েছিলেন তাতে তাঁর অসুখ আরও বেড়ে গিয়েছিলো। সেই অসুখেই তিনি ১৯১৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

নবাব সলিমুল্লাহর প্রতি যত কটাক্ষই করা হোক না কেন, তিনি ছিলেন মুসলিম জাগরণের অবিসংবাদী নেতা। উপমহাদেশে তাঁর ন্যায় জনদরদী ও সমাজহিতৈষী নেতা খুব কমই জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে মুসলমানদের অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছিলো সত্যি, কিন্তু মুসলমানরা আর হীনবল থাকেনি, তারা জাগ্রত জাতিসত্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। তাদের উন্নয়নের মূলে কারা কুঠারাঘাত করছে সে বোধও তাদের জাগ্রত হয়েছিলো। সব বাধা উপেক্ষা করে একটা আত্মসচেতন জাতি সত্তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা অবহেলা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো।

নবাব সলিমুল্লাহর আরেক ভ্রাতার নাম নবাব আতিকউল্লাহ। তিনি জনদরদী ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উদারতার বহু কাহিনী লোকমুখে ছড়িয়ে রয়েছে। একবার নবাব আতিকউল্লাহ ১০ হাজার টাকা ঋণ করেছিলেন। ঐ ঋণে সুদ হয়েছিলো ২০ হাজার টাকা। নবাব আতিকউল্লাহ এই টাকা পরিশোধ করতে পারছিলেন না। মহাজন তাঁর বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করে সুদে-আসলে মোট ১৫ হাজার টাকা ডিক্রি পান। ঐ রায়ে ১৫ হাজার টাকা কমে যাওয়ায় মহাজন উপায়ান্তর না দেখে নবাব বাহদুরের পায়ে গড়িয়ে পড়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিলো।

তার কান্নার কারণ জানতে পেরে উদার হৃদয় নব্যব ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোন করে ৩০ হাজার টাকা আদায়ের রায় দিতে বলেন। ম্যাজিস্ট্রেট নবাবের কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে ঘটনাটির ব্যাখ্যা দিতে গেলে নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন ঃ 'আমাদের টাকা আমরা দিতে যখন কুণ্ঠিত নই, তখন রায় প্রদানে আপনার কোনো বাধা থাকা উচিত নয়।' অগত্যা ম্যাজিস্ট্রেট ৩০ হাজার টাকার ডিক্রি দিয়েছিলেন। মহাজন তখন নবাবকে কুর্নিশ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাসিমুখে বিদায় নিয়েছিলো। এ এক বিরল ঘটনা। নবাব আতিকুল্লাহর খেলাধূলার প্রতি খুবই আগ্রহ ছিলো। তিনি খেলাধূলার উন্নয়নের জন্যে বহু অর্থ ব্যয় করে গেছেন।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র হাবীব উল্লাহ ঢাকার নবাব হন। তিনি পূর্ব পুরুষদের মত বিচক্ষণ ও সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁর আমল থেকেই আহসান মঞ্জিল দরবার কক্ষের শানশওকতে ভাটা পড়তে শুরু করে। ঢাকাবাসী তথা পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ তাঁর নেতৃত্বের প্রতি দারুণ সন্দিহান হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে মোটেই আশাবাদী ছিলো না। একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁকে বিরূপ সংবর্ধনা জানিয়ে কালো পতাকা প্রদর্শন করেছিলেন। অবশ্যি পুরনো ঢাকার মুরুব্বি ধরনের অধিবাসীরা কালো পতাকাধারীদের বহুদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর তারা নবাবকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর প্রতি যথোচিত সম্মানও প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের অনেকেই তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর প্রতি বিরূপ অভ্যর্থনা জানাবার প্রধান কারণ, তৎকালীন মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করে শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। সে সময় ভারতব্যাপী মুসলিম লীগের জয়-জয়কার। মুসলমানরা মনপ্রাণ দিয়ে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। অবশ্যি বাংলায় এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন জনপ্রিয় নেতা। এজন্যে মুসলিম লীগের বিরোধীতা করেও বঙ্গীয় পরিষদের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির টিকেটে একমাত্র ফজলুল হকই জয়লাভ করেছিলেন। তাঁর পার্টির অন্যান্য সকলকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিলো। নবাব হাবীব উল্লাহ ও তাঁর পুত্র হাসান আশকারী প্রজা সাধারণের নিকট থেকেও কোন ভোট পাননি। এজন্যে তাঁদের নির্বাচনে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিলো।

নবাব হাবীব উল্লাহ তেমন প্রভাবশালী নবাব ছিলেন না। এছাড়া তিনি একাধিক

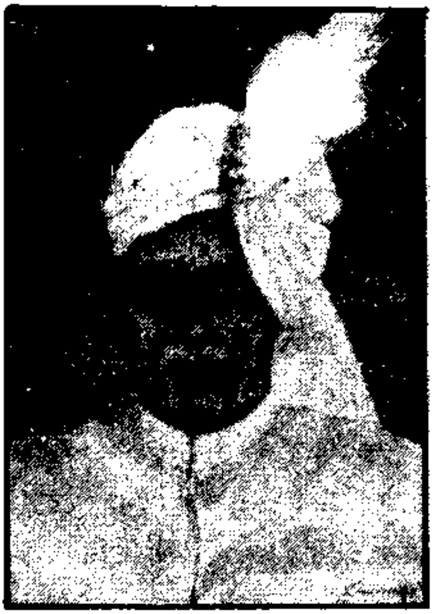
মহিলার পানি গ্রহণ করে অনেকের বিরাগভাজন হন। তাঁর বেগমদের মধ্যে তৃতীয় বেগম দারুণ স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে ওঠেন। তাঁর এই বেগম উদয়পুরের রাজকুমারী সুন্দরী (বিবাহ উত্তর নাম আয়েশা বেগম) অন্দরের সব ঐহিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্লাবে ক্লাবে ঘুরে বেড়াতেন। আমোদ-প্রমোদ ও মদ্যপানই ছিলো তাঁর জীবনের প্রধান অঙ্গ। জনশ্রুতি আছে, তিনি নাকি নবাবের কথায় মোটেই কর্ণপাত করতেন না। নিজ বেগমের এরূপ ঔদ্ধত্যে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়েই নবাব হাবীব উল্লাহ হয়ত একাধিক মহিলার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। পারিবারিক বা সামাজিক যে কারণই থাক, নবাবের এরূপ আচরণে মুসলমানদের মনে অসন্তোষ ও ঘৃণার উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক।

আয়েশা বেগম কিছু দিন হলো ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি লাহোরে বসবাস করছিলেন। বেগম আয়েশার জীবনালোচনায় শুধু নিন্দনীয় দিকটাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয় – তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী। তিনি নবাবী হেরেমে আবদ্ধ থাকতে চাননি। নবাব বংশের সব বেড়া ডিঙিয়ে যেভাবে মুক্ত বিহঙ্গের মত পরিভ্রমণ করতেন, তাতে সুযোগ সুবিধা পেলে তিনি অনেক মহৎ কাজ করে যশস্বী হতে পারতেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক মহিলা। এজন্যে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লেডিজ ফোর্সে যোগদান করে একজন দক্ষ সৈনিক হতে পেরেছিলেন।

নবাব হাবীব উল্লাহ প্রায় দুডজন মহিলার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। এরা অবশ্যি নবাবের চিরসঙ্গিনী থাকতে পারেননি। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে একে একে ঝরা পাতার মত ঝরে পড়েছিলেন। অবশ্যি স্থায়ী বেগম করেও তাদের নবাব হেরেমে আনা হয়নি। নবাবের পছন্দের কাছে বাঁদী আর বেগম, গরীব আর ধনী এসবের কোন বাছ-বিচার ছিলো না। পছন্দ হওয়ার সাথে সাথে তিনি কোন না কোন উপায়ে তাকে বেগম করে ঘরে তুলে আনতেন। কিছু দিনের মধ্যে মোহরানার সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে দিয়ে তাকে চিরতরে বিদায়ও করে দিতেন। নবাব পরিবারের আর কারো মধ্যে এমন ঘটনা ঘটতে দেখা যায়নি।

নবাব হাবীব উল্লাহ ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। বৃটিশদের কাছে নির্ভীক সৈনিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিলো। যুদ্ধ শেষে তিনি ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। বেশ কয়েকবার তিনি বঙ্গীয় পরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বেশ খেয়ালী প্রকৃতির লোক ছিলেন। বন্দুক দিয়ে শিকার করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। একবার তিনি প্রধান মন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে বিশেষ ট্রেনযোগে সফরে গিয়েছিলেন।

পথিমধ্যে কি কারণে ট্রেন থামাতে হলো। সেখান থেকে ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে জানতে পেরে নবাব হাবীব উল্লাহ শিকারে বের হলেন। কিছু সময় পর তাঁকে জব্দ করার জন্যে প্রধানমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক ও খাজা নাজিমুদ্দীনের ইঙ্গিতে ট্রেন ছেড়ে দিলো। নবাব হাবীব উল্লাহ ফিরে এসে ট্রেন দেখতে না পেয়ে স্টেশন মাস্টারকে গুলি করার ভয় দেখিয়ে ছিলেন। স্টেশন মাস্টার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে টেলিফোন করে ট্রেন ব্যাক করিয়ে এনেছিলেন। নবাব হাবীব উল্লাহর রাগ তখনও প্রশমিত হয়নি। তিনি জনাব এ. কে. ফজলুল হক ও খাজা নাজিমুদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপানারা শুধু মন্ত্রী। কিন্তু আমি মন্ত্রী, সেই সাথে ঢাকার নব্যব। তাই আমাকে ফেলে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তাঁর কথায় জনাব ফজলুল হক ও খাজা নাজিমুদ্দীন মৌখিকভাবে অনুতপ্ত হয়েছিলেন।



নবাব হাবিব উল্লাহ্ বাহাদুর

ব্যক্তিগত জীবনে নবাব হাবীব উল্লাহ খুব অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। কিন্তু রাগ হলে সিংহের মত গর্জন করে উঠতেন। একারণে সরকারী বেসরকারী অফিসারদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে ভয় পেতেন। তিনি মুসলমানদের মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান তুচ্ছ নয়। তিনি কাইমার চরে নিজের নামানুসারে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খেলাধূলা প্রসারেও তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না।

তৎকালে ঢাকায় প্রায়ই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হতো।

দাঙ্গা দমনে শুধু গুর্খা ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী সৈন্যরাই মোতায়েন থাকতো। যেহেতু তারা হিন্দু সেহেতু নিজ কওমের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন বিচিত্র কিছু ছিলো না। তারা প্রায়ই বিনা কারণে মুসলমানদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। অবশ্যি এসবে ইন্ধন যোগাতো হিন্দু সম্প্রদায়ের উগ্রবাদীরা। সৈন্যরা যাতে পক্ষপাতিত্ব দেখাতে না পারে তজ্জন্য নবাব হাবীব উল্লাহ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট মোতায়েনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্যবস্থায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় মুসলমানরা অযথা হয়রানির কবল থেকে মুক্ত থাকতো।

নবাব হাবীব উল্লাহ ঢাকার পঞ্চায়েতসমূহের প্রধান ছিলেন। বিচার কার্যে তাঁর কোন পক্ষপাতিত্ব ছিলো না। দরবারে তিনি যোগ্য বিচারকের ভূমিকাই পালন করতেন। তিনি মহল্লা সরদারদের যেমন ভালবাসতেন তেমনি তাঁদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিলো। তবে তাঁর সব চেয়ে প্রিয় সরদার ছিলেন মীর্জা আবদুল কাদের সরদার। তিনি ছিলেন নবাব হাবীব উল্লাহর বন্ধু, উপদেষ্টা ও সহকর্মী।

নবাব হাবীব উল্লাহ আহসান মঞ্জিল ছেড়ে শাহবাগে বসবাস করতে থাকেন। তিনি যেখানে বসবাস করতেন তার সম্মুখস্থ রাস্তাটি নবাব হাবীব উল্লাহ রোড নামে পরিচিত। তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান আশকারী সৈন্য বিভাগের মেজর পদে ইস্তফা দিয়ে ঢাকা ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর পিতার আমল থেকেই আহসান মঞ্জিলের সব জৌলুশ স্তিমিত হয়ে এসেছিলো। নবাব হাসান আশকারী শত চেষ্টা করেও আহসান মঞ্জিল দরবার কক্ষের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হননি। উপায়ন্তর না দেখে তিনি শাহবাগে টুইন হাউস নামে একটি বাড়ি নির্মাণ করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। আইয়ুব আমলে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। পরে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। নবাব আশকারী সহজ-সরল চরিত্রের অধিকারী। তিনি জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই তাঁর রাজনীতিও ছিলো সাদাসিধে। চক্রান্ত করে ক্ষমতা লোভীদের তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন।

নবাব আশকারী ছিলেন মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী। এজন্যে গত গণ-অভ্যুত্থানের সময় তাঁর বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো। জনগণের রায়ের বিরুদ্ধে তিনি কোন অভিযোগ করেননি। তিনি খুব শান্তশিষ্ট, অমায়িক, বন্ধুবৎসল ও সদালাপী। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার তাঁর জুট মিলটি জাতীয়করণ করে নিয়েছেন। এ বিষয়েও কোন অভিযোগ উত্থাপন না করে তিনি সসম্মানে পাকিস্তানে হিজরত করেন। তিনি করাচী নগরীতে বসবাস করছিলেন। কিছুদিন হলো

তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর দেশ ত্যাগের পর পরই ঢাকার নবাব বাড়ির চিরকালীন পতন ঘটে গেছে।

তাঁর আচার ব্যবহার সম্পর্কে একটি ঘটনাই প্রমাণ করে তিনি কত মহৎ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। পাক আমলে তিনি যখন পাক গণ পরিষদের সদস্য পদে কনভেনশন মুসলিম লীগের পক্ষ হতে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হন খাজা খয়ের উদ্দিন। আমি কাউন্সিল মুসলিমলীগ পন্থী খাজা খয়ের উদ্দিনের সমর্থক। একদিন গভীর রাত্রে সিভিল ডিফেন্সের ডেপুটি কালেক্টর জনাব রহমান সাহেব জীপ গাড়ী নিয়ে এসে একটা জরুরী কাজ আছে বলে উঠিয়ে নেন। তখন আমি সিভিল ডিফেন্সের হেড ওয়ার্ডেন, গাড়ী গিয়ে থামলো শাহবাগস্থিত টুইন হাউসের দরজায়। আমি রহমান সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি এখানে কেন আসলেন এটা ঠিক হলো না আমি ভিতরে যাবো না। তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করে এক প্রকার জোর করেই ড্রইং রুমে নিয়ে বসালেন। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন নবাব সাহেব একটা গেঞ্জি গায়ে হাতে তসবিহ নিয়ে ড্রইং রুমে প্রবেশ করলেন। আমি লজ্জায় মাথা নত করে আছি। তিনিই কথা উঠালেন তাঁর নির্বাচনে সহায়তা করার জন্যে। আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম তাঁর পক্ষে কাজ করা আমার সম্ভব নয় আমি খাজা খয়ের উদ্দিনকে সমর্থন দিয়ে আসছি রাজনৈতিক নীতিগত প্রশ্নে। তবুও রহমান সাহেব ও নবাব সাহেব অনেক কথার অবতারণা করলেন। আমি অটল অনড়। কথা না দিয়েই শেষ পর্যন্ত চলে এলাম। নির্বাচনে খাজা খয়ের উদ্দিন বিজয়ী হলেন। আমি মনে মনে ভেবে ছিলাম নবাব সাহেবের আমার উপর খুব ক্ষোভ রয়েছে। বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। নবাব সাহেবের মনে আল্লাহ ভীতি আরো প্রবল হয়েছে। মনে পরিবর্তন এসেছে। হঠাৎ একদিন আহসান মঞ্জিল গোল তালাব পাড়ে আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে খাজা পরিবারের এক মেয়ের বিবাহ। বিবাহ মজলিসে বসে আছি। সম্মুখে নবাব খাজা হাসান আশকারী কিন্তু আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তাঁর দাড়ি ও পরিচ্ছদ দেখে। তিনি কিন্তু আমাকে চিনতে ভুল করেন নি। অনেক্ষণ গত হলো আমি তার সঙ্গে কোন কথা বলছিনে দেখে তিনি উঠে এসে আমাকে ঝাপটে ধরে জিজ্ঞেস করলেন নাজির ভাই আপ হামারে উপর গোস্বা হ্যায়। হামসে কোই বাত্তাক নাহি কারতে। কোয়ি গালতি হুয়া তো মাফ কিজিয়েগা। তার গলার স্বর শুনে ও তার মুখখানা দেখে চমকিয়ে উঠে বললাম, নাহি নওয়াব সাহেব আপকো হ্যাম পাহচানা নাহি মুজে মাফ কিজিয়ে গা, মায় আপসে সারমিন্দা হ্যায়। তবুও নবাব সাহেব বেশ কিছুক্ষণ আমার গলা লেপটিয়ে ধরে নানা

কথা বললেন, নির্বাচনের কথা ভুলে যেতে বললেন। তিনি যতই বলছেন আমি ততই অপরাধীর মত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছিলাম। কিভাবে তাঁকে সান্তনা দেবো বা কিভাবে আমি তাঁকে সত্যিকারভাবে বুঝাবো যে সত্যি আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তাঁকে সেদিন একজন সূফী দরবেশের মত লাগছিলো। মুখে চাপদাড়ী, পড়নে পায়জামা কূর্তা উপরে চটের অসকোট, তাঁর আন্তরিকতা ও মাধুর্য্য পূর্ণ ব্যবহারে আমার দুচোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো। তিনি কি এবং আমি কি! সত্যি তাঁর অন্তঃকরণের পরিচয় সেদিন পেলাম যা কোন দিন ভুলবোনা ভুলতে পারবোনা।

ঢাকার নবাবরা এদেশের মুসলিম জাগরণের যে গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন তা চিরকাল অমর অক্ষয় হয়ে থাকবে। ঢাকার দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত আহসান মঞ্জিল নুতন রূপ নিয়ে আজো মাথা তুলে রয়েছে। আজ আর আগের মত মানুষের পদভারে ঐ নবাব বাড়ি গমগম করে না – লোকে আর নবাবদের বিজয় ঘোষণা করে না। তবুও আহসান মঞ্জিল ঢাকার নবাবদের উত্থান-পতনের সব চিত্রই কালের সাক্ষী হয়ে বিরাজ করছে। এর প্রতিটি ইট ও বালুকণায় নবাব পরিবারের কীর্তি-কলাপ গ্রথিত হয়ে রয়েছে। এ কারণেই আহসান মঞ্জিলকে সংরক্ষণ করা দরকার ছিলো সরকারীভাবে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা রেখে এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে দাবী রেখেছিলাম।

সরকার শেষ পর্যন্ত এটাকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছেন একটা যাদুঘর হিসেবে। এনিয়ে যদিও নবাব পরিবারের মধ্যে মতবিরোধ ছিলো সরকারের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত যাদুঘর বর্তমান সরকার উদ্বোধন করতে পেরেছেন। এটা করে ঢাকাবাসীর একটা দাবী পূরণ হয়েছে বলেই আমরা মনে করি।

দোষে-গুণে মানুষ। নির্দোষ মানুষের সংখ্যা দুনিয়াতে খুবই কম। মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে কেউ নিষ্পাপ -কোরকের মত প্রস্ফুটিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। ঢাকার নবাবরাও যে নিষ্পাপ ছিলেন, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। দোষগুণের সমাহারেই তাঁদের জীবন প্রবাহ বয়ে যেত। তবু ঢাকার নবাবরা জনসাধারণ – বিশেষ করে মুসলমানদের তরক্কির জন্যে যে সকল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। কেবল মাত্র নবাব বাহাদুরগণই যে দেশদরদী, মানবহিতৈষী ছিলেন তাই নয়; তাঁদের ভ্রাতা ভগ্নী ও পুত্র কন্যাদের অনেকেই ছিলেন মুসলিম তরক্কি ও জাগরণের অগ্র-পথিক।

তৎকালে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও খেলাধূলার প্রসারে ঢাকার নবাব পরিবারের অনেকেই জীবনপাত করে গেছেন। সে

সময় মুসলমান সমাজ ছিলো অধঃপতিত। শিক্ষাদীক্ষায়ও তারা ছিলো পশ্চাদপদ। এই হীনবল সমাজকে অন্ধকার গুহা থেকে টেনে তুলে আনতে নবাব পরিবারের খান বাহাদুর মোহাম্মদ আজম, খাজা নাজিমুদ্দীন, খাজা শাহাবুদ্দীন, খাজা আলিম উল্লাহ, খানবাহাদুর খাজা মোহাম্মদ ইসমাইল, সৈয়দ আবদুস সলিম, হাফিজ মিয়া, সৈয়দ সাহেবে আলম, খাজা নূর উদ্দীন, খাজা খয়ের উদ্দীন, খাজা কায়সার, খাজা সুলেমান প্রমুখ নেতা মুসলিম জাগরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। ইতিহাস ঐ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনেকেরই অবদানের কথা কোন দিনই বিস্মৃত হতে পারে না।

নবাব আতিক উল্লাহ ছিলেন দরাজ দিলের অধিকারী। তিনি অকৃপণ হস্তে দান-খয়রাত করতেন বলে বহুবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। দুঃখীর দুঃখ দেখে তিনি কখনও স্থির থাকতে পারতেন না। তিনি মানুষকে আপন ভাই বলেই মনে করতেন। তাঁর দরাজ দিলের বহু কাহিনী আজো মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে। খান বাহাদুর মোহাম্মদ আজম মুসলমান সমাজের প্রভূত উপকার করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি কিছু কালের জন্যে ঢাকার বাইশ পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ছিলেন। তিনি নবাব আহসান উল্লাহর কন্যার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। সদালাপী মিষ্টভাষী মোহাম্মদ আজমের খেলাধূলার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিলো। খান বাহাদুর খাজা মুহাম্মদ ইসমাইল সবার নিকট ইসমাইল মিয়া নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ক্রীড়ানুরাগ এত প্রবল ছিলো যে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি পল্টন খেলার মাঠে রেফারি থাকতেন। তিনি রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। তিনি নবাব আহসান উল্লাহর কন্যাকে বিবাহ করেন। খাজা ইসমাইল একজন উর্দূ কবি হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। খাজা সুলেমান কাদেরের খেলাধূলার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিলো। তিনি সমাজসেবা ও রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সমাজে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। সৈয়দ আবদুস সলিম সকলের নিকট সলিম মিয়া নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। সৈয়দ সাহেবে আলম সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি কয়েক বারই ঢাকা পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন। খাজা নূরউদ্দীন ছিলেন কর্মঠ ব্যক্তি। তিনি অধুনালুপ্ত মর্নিং নিউজ পত্রিকার মালিক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কলকাতা থেকে এক সময় স্টার অব

ইণ্ডিয়া নামে একটি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো। খেলাধূলার প্রতি তাঁর খুবই অনুরাগ ছিলো। ভারত বিভাগের পূর্বে তিনি কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। খাজা কায়সার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। এজন্যে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিলো। তিনি ছিলেন একজন নামকরা খেলোয়াড়। ক্রীড়ামোদীদের নিকট খাজা কায়সার ছিলেন একটি সুপ্রসিদ্ধ নাম। তিনি পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ঢাকার নবাব পরিবারে লোকদের জীবন কাহিনী বড় বিচিত্র। ধনৈশ্বর্য ও জ্ঞান গরিমায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হয়েও তাদের হৃদয় ছিলো করুণায় ভরা। নবাব পরিবারের কেউ কোন দিন কারো উপর অত্যাচার অনাচার বা উৎপীড়ন করেছেন বলে জানা যায় না। বরং অনেকেই মানবকল্যাণের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। মুসলিম কওমরে প্রতি তাঁদের দরদী মনের তুলনা হয় না। অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েও নবাবদের কেউই বিলাসব্যাসনে মদমত্ত থাকতেন না। তাঁদের অন্তরে ছিলো ইসলামী জোস। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় – তাঁদের জীবনালেখ্য ভালোভাবে বিশ্লেষণ না করেই কোন কোন মুসলমান লেখক নবাব পরিবারের লোকদের সম্পর্কে অযৌক্তিক ও অসংলগ্ন কটাক্ষ করে থাকেন। আমার ধারণা বিদ্বেষ প্রসূত হয়েই কেউ কেউ লিখেছেন – নবাবরা ছিলেন বৃটিশ রাজশক্তির দালাল। কেউবা তাঁদের কাগজী নবাব বলে বিদ্রূপ করেছেন। আবার কেউবা তাঁদেরকে 'টুটা-ফাটা' নবাব বলে উপহাস করেছেন। এসব কথার কোন সারবত্তা নেই। ঢাকার আহসান মঞ্জিলের সত্যিকার ইতিহাস রচনা করতে গেলে, নবাবদের জ্ঞান-গরিমা, শৌর্যবীর্য, মানবহিতৈষণা প্রভৃতি দিকই সর্বাগ্রে ফুটে উঠবে। কেননা, বিদ্বেষ প্রসূত এবং অবাস্তব কথা কোনদিনই স্থায়ী হতে পারে না।

অবশ্যি তৎকালীন ভারববর্ষের বিভিন্ন রাজা-মহারাজা, নবাব-নিজামদের জীবনালেখ্য পাঠ করলে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। ঐ নিরিখে ঢাকার নবাবদের ঐ সকল নবাব-নাজিমদের তুলনা করা মোটেই সমীচিন হবে না। একবার আমার ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজা-মহারাজা এবং নবাব-নাজিমদের নিয়ে লেখা একখানি আলোচনা মূলক বই পড়ার সুযোগ হয়েছিলো। পুস্তকখানি প্রকাশ করেছেন আগ্রার দীপ পাবলিকেশন্স। লেখক হচ্ছেন দেওয়ান জারমনি দাস। এবং পুস্তকখানির নাম 'মহারাজা'। ঐ মহারাজা পাঠে স্বয়ং শয়তানও তৎকালীন রাজা-মহারাজাদের বিকৃত রুচির জন্যে লজ্জায় মাথা অবনত করতে বাধ্য। বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে,

তৎকালীন সমাজ অধিপতিদের নিপীড়নের শিকার দুঃস্থ ও নিষ্পেষিত নর-নারীদের উদ্দেশে। বাংলায় তর্জমা করেছেন অরুণ কুমার। অনুবাদক কলিকাতার বাসিন্দা। বইটিতে বৃটিশ শাসনামলের শেষ নব্বই বছরে ভারতের রাজা-মহারাজা, নবাব-নিজামদের জীবনালেখ্য আলোচনা করা হয়েছে। ঐ আলোচনায় তাঁদের বিকৃত যৌন আবেদন ও কামনা-বাসনার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য কাহিনী। প্রতিটি আখ্যায়িকার অন্তরালে গুমরে মরছে নিরন্ন প্রজাদের দীর্ঘশ্বাস। কত যে নিষ্পাপ কিশোরী, তরুণী, যুবতী তৎকালীন রাজা-মহারাজাদের কোপানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাঁরা শুধু নারী সম্ভোগ করেই ক্ষান্ত থাকতেন না, বিকৃত যৌন লালসা চরিতার্থের জন্যে নির্মম, নিষ্ঠুর ও বীভৎস হয়ে উঠতেন। তাঁদেরকে লম্পট বা খুনী বলে আখ্যায়িত করলেই সব কথা শেষ হয়ে যায় না, তাঁরা মানবেতিহাসে অত্যাচার-অনাচারের কাল-সাক্ষী রূপেই যুগে যুগে বিরাজ করতে থাকবেন।

পুস্তকখানির লেখক দেওয়ান জারমনি দাস পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিং-এর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। পুস্তকের প্রতিটি ঘটনাই লোমহর্ষক। কাহিনীগুলো পড়ে শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসে। পরবর্তীকালে সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে জনগণ কেন আন্দোলন চালিয়েছিলো ঐ বইখানিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তৎকালীন সামন্ত প্রভুদের যৌন বিকৃতির ঐ সকল ঘটনা সভ্যতার দারুণ অবমাননা। তবে নাভা রাজ্যের হিজ হাইনেস মহারাজা রিপু দামন ও মহ্যরাজা দামন সিং-এর নিষ্ঠুরতা এক হৃদয়বিদারক আলেখ্য। তাঁদের জীবন কাহিনী পড়ে মনে হয় না যে তাঁদের অন্তরে সভ্যতার আলো স্পর্শ করেছে। নিপীড়ন, নিষ্ঠুরতা ও নারী সম্ভোগই ছিলো তাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত। বিকৃত যৌন লালসা চরিতার্থের জন্যে তাঁরা ছলে বলে এমন কি নিপীড়ন চালিয়েও ভদ্র ও সদবংশীয়া সুশ্রী সুন্দরী নারীদের সম্ভোগ করে মহা উল্লাসে মেতে উঠতেন। এটা তাঁদের বিকৃত যৌন লালসারই বহিঃপ্রকাশ।

নির্লজ্জ ও লম্পট ঐসব রাজা-মহারাজার সমতুল্যই ছিলেন আমাদের ভাওয়ালের রাজা। নারী ছিলো তাঁর সম্ভোগের বস্তু। তাঁর নিকট নারীর মর্যাদা বলে কিছু ছিলো না।

ছোটবেলায় শুনেছি ভাওয়াল রাজার কাহিনী অবলম্বনে বহু ছড়া, কবিতা, গান। অনেক ভিক্ষুক একতারা বাজিয়ে ভাওয়াল রাজার কাহিনী অবলম্বনে গান গেয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতো। ভাওয়াল রাজার দুঃখময় জীবন কাহিনী অবলম্বনে ঐ সকল গান শুনে সকলেরই হৃদয়-মন মথিত হয়ে যেত। এমন কি অনেকেরই চোখ

জোড়া অশ্রু সজল হয়ে উঠতো। আমিও ঐ গান শুনে চোখের পানি সংবরণ করতে পারতাম না।

ভাওয়াল রাজার শেষ জীবনের কাহিনী দুঃখময় হলেও রাজাসনে সমাসীন থাকাকালে তিনি নারী সম্ভোগের যে জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা ইতিহাস কোনদিন বিস্মৃত হবে না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একবার আমরা আজাদ মুসলিম ক্লাবের পক্ষ থেকে জয়দেব পুরে বনভোজন করতে গিয়েছিলাম। আমরা ক'জন অন্তরে উচ্চাশা নিয়ে ভাওয়ালের রাজবাড়ি দেখতে গেলাম। গেটে ঢুকতেই দরজার পাল্লায় চক দিয়ে লেখা কবিতার কয়েকটি পংক্তি আমার চোখে পড়লো। কবিতার পংক্তি কয়টি পাঠ করে আমি দ্বিধান্বিত হয়ে গেলাম। ভাওয়াল রাজার জীবন এত জঘন্য তো হতে পারে না। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, তাঁর জীবন কি সত্যই এত কলুষিত ছিলো। তবে কেন লোকে তাঁকে রং মাখিয়ে সং সাজিয়ে এমনি করুন সুরে গান গেয়ে বেড়ায়। কবিতার পংক্তি কটি হচ্ছে ঃ

অত্যাচারী ছিলে রাজন
ছিলে দুরাচারের চির সাথী,
তাই তো আজি তোমারই বংশে
জ্বলে নাকো কোন বাতি।

আমি কাব্যানুরাগী নই। কবিতার মর্মোদঘাটনে আমি অপারগ বলেই হয়ত কবিতা মুখস্থ ও কবিতা আবৃত্তি আমার ধাতে সয় না। কবিতা মুখস্থ করতে পারতাম না বলে স্কুল-জীবনে মাস্টার সাহেবদের অনেক ভর্ৎসনাও সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। অথচ কি আশ্চর্য ভাওয়াল রাজ-গেটের কবিতা ক'লাইন আজও আমার স্মৃতি-পটে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কবিতার পংক্তি কটি সম্পর্কে আজও আমার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সমভাবেই বিরাজমান। মনে মনে বিচার বিশ্লেষণ করি, সত্যই কি রাজা দুশ্চরিত্র ও নিষ্ঠুর ছিলেন। কিন্তু ভাওয়াল রাজার জীবন কাহিনী সম্পর্কিত গান শুনে তো সাধারণ মানুষ ভক্তি শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করে দেয়।

সেদিন আমি আর ভাওয়াল রাজবাড়ি পরিদর্শনে গেট পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পরিনি। সঠিক তথ্য জানার জন্যে একজনের সাহায্যতায় রাজবাড়ির মন্দিরে পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। ঐ পুরোহিত ছিলেন রাজার আমলের লোক। তাঁকে রাজার জীবন কাহিনী সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলাম। আমার প্রশ্নের জবাব তিনি এক কথায় দিয়েছিলেন। কথাটি হলো ঃ 'নিজের খেতে চাষ না

করে ভাওয়াল রাজারা সারা জীবন অন্যের খেতে চাষ করে গেছেন।'

পুরোহিতের হেঁয়ালিপূর্ণ কথায় আমার মনের সন্দেহ দূরীভূত হয়নি বলে আমি বাজারের দিকে চলে গেলাম। সেখানে এক দোকানে পক্ক কেশধারী এক বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। তিনি ভাওয়াল রাজার মামলার একজন সাক্ষী ছিলেন। অকটপটে তিনি বিবৃত করলেন যে ভাওয়ালের রাজা ছিলেন অত্যাচারী, লম্পট, মদ্যপ সেই সঙ্গে নারী ছিলো তাঁর সম্ভোগের বস্তু। তাঁর কথা শুনে আমি স্থানুর মত নির্বাক হয়ে গেলাম।

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, 'ভাওয়ালের রাজা ছিলেন অত্যাচার অনাচারের এক মূর্ত প্রতীক। কোন তরুণী বা যুবতীকে পছন্দ হলেই তিনি একরাত্রির জন্যে হলেও তাকে শয্যাশায়িনী করে ছাড়তেন। কোন অভিভাবক স্ত্রী-কন্যাকে রাজার শয্যাশায়িনী হতে বাধা প্রদান করলে তার উপর রাজার নিষ্ঠুরতা চরম আকার ধারণ করতো। স্বেচ্ছায় স্ত্রী বা কন্যাকে উপঢৌকন দিলে কিছু হতো না। কিন্তু বাধা পেলেই গভীর রাত্রিতে হাতির পিঠে সওয়ার অনুচরবর্গ গিয়ে হাজির হতো বাধাদানকারীর বাড়িতে। প্রথমেই হাতির সাহায্যে তার বাড়ি-ঘর ধূলিসাৎ করে দেয়া হতো। তারপর বাধাদানকারীকে হাতির পায়ের চাপায় পিষ্ট করে দেয়া হতো। সব শেষে বিজয় দর্পে রাজার ইঙ্গিত তরুণী বা যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে রাজ-দরবারে ফিরে আসতো ঐ সব শয়তান অনুচরবর্গ। এসব কাজে অনেক সময় একাধিক হাতি ব্যবহার করা হতো।' তৎকালে রাজার মনোরঞ্জেনের জন্যে এ ঘটনা নাকি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপরে পরিণত হয়েছিলো। রাজার লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যে ভাওয়াল পরগনার প্রজাকুল সব সময় তটস্থ থাকতো। তবুও কত হিন্দু মুসলিম নারী যে রাজার যৌন ক্ষুধার শিকার হয়ে অকালে আত্মহত্যা করে কলঙ্কের সব জ্বালা মুছে ফেলেছে তার ইয়ত্তা নেই।

তৎকালে বঙ্গদেশের বহু রাজা এরূপ নিষ্ঠুরতার এক একটি মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তার বহু প্রমাণ আজো লোক-মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সম্ভ্রান্ত প্রভুরা যে অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিলো এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেবল মাত্র ঢাকার নবাবদের দূষণীয় চরিত্রের ছিদ্রান্বেষ না করে ঐ সব রাজন্যবর্গের অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনীগুলো পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হওয়া একান্ত দরকার। এসব ব্যাপারে লেখক সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

নবাব পরিবারের লোকদের জীবনালোচনায় আমি যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে ঢাকার নবাব পরিবার অত্যাচার, অনাচার ও অবিচারের অনেক উর্ধ্বে

রয়েছেন। মানুষের জীবন পাপ-পুন্যে ভরা। তবু ঢাকার নবাবদের জীবন কাহিনী মানুষের কল্যাণে সমৃদ্ধ। তাঁদের জীবনে পাপ স্পর্শ করেনি একথা বলা সমীচীন হবে না। তবে সে পাপ সীমার মধ্যেই লালিত হয়েছে। সীমা লংঘনের মত কোন ঘটনাই এযাবৎ শোনা যায়নি। অবশ্যি মানব কল্যাণের কথাটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শ্রুত হয়ে থাকে। ঢাকার নব্যবদের একদিন যেমন উত্থান ঘটেছিলো, কালের বিবর্তনে সে উত্থান অনন্তকালব্যাপী অটুট থাকেনি সত্য . কিন্তু তাঁদের কীর্তি কলাপ, কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ড, রাজসিক দান-খয়রাত, মানুষের প্রতি মমত্ত্ববোধ প্রভৃতি সদগুণাবলী নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লালবাগ দূর্গের পশ্চিমে অনতি দূরেই রয়েছে আমলী গোলা মহল্লা। এ মহল্লার উপর দিয়েও বারবার ঝটিকা প্রবাহিত হয়েছে। যার ফলে তার নাম হয়েছে জগন্নাথ সাহা রোড। এ রোডটি আমলীগোলা মহল্লার ঠিক মধ্য ভাগ দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে চলে গেছে। জগন্নাথ সাহা রোড লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে আজও বিধস্ত প্রায় দাঁড়িয়ে থাকা ঢাকা নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম তোড়নের (বর্তমানে তোরনের দুটি দণ্ডয়মান স্তম্ভ কোন এক ব্যাক্তি তার দালানের অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়েছেন) কাছ থেকে নবাবগঞ্জ সাবেক পানির ট্যাংক পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য এ রোডের পশ্চিমাংশের কিছু কোম্পানী যুগে চৌধুরী বাজারের এবং পূর্বাংশের কিছু দলতি বাজারে অর্ন্তভূক্ত ছিলো। আর বাকী সব টুকুই আমলীগোলা বলে অভিহিত হতো।

জগন্নাথ সাহা রোডটি পৌর ও সরকারী কাগজ পত্রে রেকর্ড করা থাকলেও আমলীগোলা এত মশহুর ও বহুল প্রচলিত যে আমলীগোলা বললে কারো চিনে নিতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু আমলীগোলা নাম ও এক দিন যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে না, তাই বা কে বলতে পারে! কেননা, এর আদি নাম তথা মুঘল আমলের নাম গোলা আমীরগঞ্জ, লোকে ছোট্ট কথায় আমীর গোলা অথবা আমীরগঞ্জ বলতো, সে নামও তো বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

মুঘল আমলে এখানে রাজ্যের আমীর ওমরাহগণ বাস করতেন। সুবেদারের দূর্গ প্রাসাদ অতি নিকটে অবস্থিত ছিলো তাই এখানে গড়ে উঠেছিলো মহল, বড় বড় ইমারত আর দালান-কোঠা। এ অঞ্চলে যারা বসবাস করতেন তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ধন-দৌলত ছিলো বেশুমার, এক কথায়, সব দিক দিয়ে এ অঞ্চল ছিলো সমৃদ্ধশালী। ঢাকা থেকে রাজধানী মুরশিদাবাদে স্থানান্তরের সাথে সাথেই এর ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিলো। একে একে আমীর ওমরাহ্গণ পাড়ি জমালেন মুরশিদাবাদের দিকে। আর সে সব স্থান পূরণ হতে লাগলো বিভিন্ন

স্থান থেকে আগত হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দ্বারা। মুসলিম শাসনামলের শেষের দিকে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এ ব্যাংকের মালিক ছিলেন বাংলার ইতিহাসে কলঙ্ক লেপনকারী জগৎশেঠ। ব্যাংকটি আমলীগোলার পূর্বাঞ্চলে নদী তীরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মুসলিম শাসনামলের শেষ অধ্যায়ে যে অবক্ষয় বিপুল সাম্রাজ্যকে গ্রাস করেছিলো, তার প্রতিক্রিয়া আমলীগোলাতেও পড়েছিলো। মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে সমৃদ্ধশালী আমলীগোলারও পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। আমীর ওমরাদের এ মহল্লা থেকে একে একে অন্তর্হিত হওয়ার ফলে এখানে এক নতুন সমাজের পত্তন হয় যা পূর্বেই বলেছি। যে সব লোক এখানে থেকে গেলেন, তারা নতুন ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টায় মগ্ন হলেন। কিন্তু সদ্য আগত চতুর ব্যবসায়ীগণ অল্প দিনের মধ্যেই ভালভাবে শিকড় গেড়ে বসলেন এবং তারা সংঘবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কৌশলে এখানকার লোকদের হীনবল করার চেষ্টায় মেতে উঠলেন। পুরনো ঐতিহ্য অনুযায়ী আমোদ প্রমোদে মাতিয়ে রাখা এবং তাদের আরাম আয়েশের সাথে দিন কাটাবার জন্যে উৎসাহ এবং সুদে টাকা ধার প্রদান করতে লাগলো। লেখা-পড়া ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি যাতে অনিহা প্রকাশ পায় তজ্জন্য সুযোগ বুঝে আপ্ত বাক্য ঝাড়তো সুচতুর সদ্য আগত পড়শীরা।

এইভাবেই চললো দীর্ঘ এক শতাব্দী। আমলীগোলার আদি অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে হীনবল হতে লাগলো আর তারই সাথে সাথে তাদের ঐতিহ্যসমূহ বিলীন হতে চললো। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন আরম্ভ হওয়ার পর পরই নতুন পড়শীরা ঐতিহাসিক আমীরগোলা (গোলাহ্ আমীরগঞ্জ) নামটির পরিবর্তন সাধন করে আমলীগোলা রেখে দিলেন। এ নাম পরিবর্তনের জন্যে তারা যুক্তি দেখালো এই মহল্লায় যে একটি প্রাচীন আমলী (তেতুল) গাছ ছিলো তারই নামানুসারে এ মহল্লার নাম হওয়া উচিৎ। আমীর ওমরাহ্গণ যখন এখান থেকে চলেই গেছে তখন ও রকম নামের প্রয়োজন এখন আর নেই। আমলীগোলার সরল অধিবাসীরাও সেদিন মেনে নিয়েছিলো তাদের সেই গালভরা বুলি। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের টিথে কালেকশন রেকর্ডেও এ এলাকার নাম গোলাহ্ আমীরগঞ্জ বলে উল্লেখ রয়েছে। তৎকালে সাধারণ মানুষ এই গোলাহ্ আমীরগঞ্জকে আমীরগোলা বলতো।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি দলিলে সাধারণভাবে পরিচিত এই আমীর গোলার নাম আমলীগোলা বলে উল্লেখ রয়েছে। এ রেকর্ডটিতে ঢাকার হাট

বাজারের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

পরবর্তীকালে আমলীগোলার মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে আবার নতুন করে দূর্যোগের ঘনঘটা নেমে এলো। সারা দেশে যখন বিপ্লবের আগুণ জ্বলে উঠলো, এখানেও এসে পড়লো তার স্ফুলিঙ্গ। বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হলো কিছু কিছু লোক। ইংরেজদের সমর্থনপুষ্ট ও ভাড়াটিয়া লোকেরা ছলেবলে কৌশলে এবং লোভ লালসায় বিভ্রান্ত করতে লাগলো বিপ্লবী জনতাকে। তারা সফলকামও হলো অনেকখানি। তবুও ১৮৫৭ সালের ২২শে নভেম্বর পবিত্র মহররমের আশুরা দিবসের অতি প্রত্যুষে হঠাৎ করে আগুণ জ্বলে উঠলো আমলীগোলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।

অতর্কিতে আক্রমণ চললো লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে সিপাহীদের উপর। কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর অনেকে প্রাণ দিলো অনেকে আহত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলো অনেকে পালিয়ে গিয়ে প্রান বাঁচালো। তাদের উপর এই নির্মম হত্যাকাণ্ড দেখে এ এলাকাবাসী তাদের অনেককেই আশ্রয় দিলো। এরই অপরাধে কিছু দিনের মধ্যেই কোম্পানী সরকার এ এলাকার বহু বিশিষ্ট মুসলমান ও মুসলমান যুবা-পুরুষকে ধরে নিয়ে কাউকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলালো সিপাহীদের সঙ্গে। বাকিদের উপর চললো অকথ্য উৎপীড়ন। অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে অনেকেই নাম মাত্র মূল্যে তাদের সহায়-সম্পদ ইংরেজদের ক্রীড়নক সুচতুর মহাজনদের কাছে বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে গেলো জীবিকার অন্বেষণে। আর যারা কোন প্রকারে প্রাণে বাঁচল তারা আর্থিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ রূপে পংগু হয়ে পড়লো। সহায়-সম্পদ হারিয়ে তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়লো সুদখোর মহাজনদের উপর। ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়েই এখানকার মুষ্টিমেয় মুসলমানদের জীবনতরী বয়ে চললো।

এক শতাব্দীর অধিককাল ধরে এই এলাকাটি আমলীগোলা নামে পরিচিত হয়ে আসছে এবং সরকারী দলিল দস্তাবেজ ও মানুষের মুখে মুখে এই নাম প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু তবুও রেহাই পেলো না আমলীগোলা। ১৯২৭ সালে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পুষ্পরাজ সাহা রাস্তায় সামান্য কটি বিজলী বাতি প্রদান করে পৌরসভার মাধ্যমে আমলীগোলার নাম তার পিতার নামানুসারে জগন্নাথ সাহা রোডে পরিবর্তিত করেন। তাঁদের প্রভাব ছিলো বেশী, তাই কেউই এ নাম পরিবর্তনে প্রতিবাদ জানাবার সাহস পায়নি। এ এলাকার নাম জগন্নাথ সাহা রোড রাখা হলেও সাধারণ লোক আমলীগোলা বলেই এর পরিচয় দিয়ে আসছে। এছাড়া কালের প্রবাহে বৃহত্তর আমলীগোলার কিছু কিছু অংশ কেটে নিয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজেদের নামানুসারে করে নিয়েছে।

জগন্নাথ সাহা রোডের পশ্চিমাঞ্চলের একটি অংশের স্থানীয় নাম কয়লাঘাট। কিছুকাল পূর্বেও জ্বালানি কয়লা নিয়ে এখানে বিরাট বিরাট নৌকা ভিড়তো আর শহরব্যাপী সেগুলো বিক্রি করতো। এখানে কয়লা আমদানি হতো বলেই এ অঞ্চলটি স্থানীয়ভাবে কয়লাঘাট নাম ধারণ করেছিলো। পরবর্তীতে এখানে বালু আমদানী হতো বলে আবার বালুর ঘাট নামে আজও পরিচিত হয়ে আসছে। তবে বৃদ্ধরা কয়লা ঘাটই বলে থাকেন।

জগন্নাথ সাহা রোডের পশ্চিম অংশে প্রায় সবাই সাহা পদবি অর্থাৎ সাউ জাত ভুক্ত। সাহাদের মধ্যে আবার রয়েছে রাঢ়ী সাহা, বারিন্দ সাহা। যারা ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের রাঢ় অঞ্চল থেকে এসেছে তাদের রাঢ়ী আর যারা বারিন্দ্র অঞ্চল হতে এসেছে তাদের বারিন্দ্র সাহা বলা হয়। এদের অনেকেই নামের পাশে দাস লেখেন। তাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক দিক দিয়ে কংগ্রেস পন্থী। হরিপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে মিঃ গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিকে পরাজিত করে সুভাষ চন্দ্র বোস কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ঢাকায় এলে জগন্নাথ সাহা রোডে এক সংর্বদ্ধনা সভার আয়োজন করা হয়।

পুষ্পরাজ সাহার বাড়ীর নিকটস্থ পুকুর পারে এক সুসজ্জিত মঞ্চে বিপুল সংখ্যক লোক সমাগম হয়েছিলো। জগন্নাথ সাহা রোডের রাম সাহা অত্যান্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করেন আজ হতে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে। এ মন্দিরে জুলন পর্বের সময় পাঁচ দিনব্যাপী যাত্রা থিয়েটার, গান বাজনা ইত্যাদি আনন্দ উৎসব চলতো। দূর্গা পূজার পর মন্দিরে বন বিহার হতো। নানা ধরনের মূর্তি নির্মাণ করে প্রদর্শনী করা হতো, বাড়ী সংলগ্ন নিজস্ব পুকুরে রামলীলা সাজিয়ে প্রদর্শনী হতো সবই রাম সাহার নিজস্ব খরচে। মাসব্যাপী নিয়মিতভাবে মহাভারত পাঠের ব্যবস্থ্য হতো। তার বাড়ীতে একটি ব্যায়ামাগারও ছিলো। রাম সাহার মৃত্যু ঘটলে তার বাড়ীর নিকটস্থ নিজস্ব জমিতে তাকে দাহ করে সেখানে একটি সুউচ্চ মঠ নির্মাণ করা হয়। মঠটি আজও (দক্ষিণ দিক হতে) বহু দূর থেকে দেখা যায়।

নামাজের সময় বাদ্য ও ঘণ্টাধ্বনির জন্য মন্দির সংলগ্ন মসজিদের মুসল্লিদের নামাজের সময় ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে মাঝে মাঝে দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যাবার উপক্রম হতো। এর নিরসন কল্পে কিছু নেতৃস্থানীয় মুসলমান তৎকালীন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর দ্বারস্থ হন। তিনি উক্ত এলাকার হিন্দু প্রধান ব্যক্তিদের ডাকিয়ে আনেন আহসান মঞ্জিলে। তাতে ছিলেন রাম সাহার পোষ্য রাধাকান্ত বাবু, হরমোহন শীল

বাবু, ডাঃ সুবল দাস, বাবু মুকুন্দ দাস, ডাক্তার ললিত মোহন, প্রমুখ ব্যক্তি। অন্য দিকে ঢাকার জেলা মেজিস্ট্রেটকেও ডাকিয়ে আনেন, নবাব বাহাদুরের ধমকে সে দিন তাদের ইচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য গলায় চাদর বেধে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে বলে এসেছিলেন, আর কোন দিন এমনতর হবে না। সত্যি সত্যি তারপর অনুরূপ ঘটনা মন্দিরে আর ঘটেনি।

পুষ্পরাজ সাহার বাড়ীতে পাকিস্তান হবার কিছু কাল পর বাড়ীর লোকজন ভারতে চলে গেলে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সরকারের পক্ষ হতে ডিসট্রেজ উইমেন হোম, বেশ কয়েক বছর চলার পর তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ বাড়ীর কিছুটা পূর্বেই রয়েছে অত্র অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান আজাদ মুসলিম ক্লাবের সদর দফতর। ১৯৮৬ সালে নামের পরিবর্তন হয়ে নামকরণ করা হয়েছে আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-বাংলাদেশ। এ প্রতিষ্ঠান বহুবিধ কেন্দ্র জগন্নাথ সাহা রোডের বিভিন্ন স্থানে এবং অন্যান্য মহল্লায় স্থাপন করে সমাজ কল্যাণ ও সমবায় ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে বিরাজ করছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে কয়েক বারই জেলা ও জাতীয় পর্যায় স্বীকৃতি স্বরূপ পদক পেয়েছে। দেশ বিদেশের সরকারী বেসরকারী নেতৃবৃন্দ অহরহ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে ভূয়সী প্রসংশা করছেন। এলাকার ও এলাকা বহির্ভূত অঞ্চলের মানুষ ও বহুমুখী সাহায্য, সহায়তা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছে। এত বড় স্থানীয় বেসরকারীভাবে সামাজিক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে খুব কমই রয়েছে। যে জন্য সরকার প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে মূল্যায়ন করে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি ব্যতিত বিভিন্ন সরকারী কমিটি ও সংস্থার সদস্য হিসাবে মনোনীত করে আসছেন।

আমলীগোলার মধ্য এলাকায় দক্ষিণে ছিলো চাঁদ খানসামার পুকুর। চাঁদ খানসামা নবাবদের খানসামা ছিলো এবং ধীরে ধীরে এ মহল্লায় বেশ কিছু জমি জমার মালিক হয়ে জমিদার বনে যান। তৎপুত্র চুন্নু মিয়া ও আঃ গফুর এক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। চাঁদ খানসামা জীবিত কালেই একটা পুকুর খনন করে পাকা ঘাট করে দেন। ফলে অত্র এলাকার লোকজন গোসলাদি করতো। তৎকালে বাড়ীতে বাড়ীতে পানির কল ছিলো না তখন এ সব পুকুরই ছিলো এলাকার জনগণের গোসল ও কাপড় চোপর ধোবার স্থান। পুকুরটি বড় ছিলো। প্রতি বছর চৈত্র মাসে এলাকার লোক দল বেধে মাছও ধরতো। চাঁদ খানসামা ও তৎপুত্রগণ মারা যাওয়ার পর তাদের প্রভাব একে বারেই ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। সেই সঙ্গে পুকুরটিও মজে যেতে থাকে। পুকুরের উত্তরে ছিলো একটি বিরাট ছাপড়া ঘর। সেখানে বিহার

এলাকা থেকে আগত শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা মেসের মত করে থাকতো। এদের মধ্যে ঢুলি বাহক, কুলি ও গরু গাড়ী চালক ছিলো। এদেরকে এলাকাবাসী মাউড়া বলতো। এরা বিহার প্রদেশের মারওয়া জেলার অধিবাসী বলে এরা খুবই নিরীহ। হিন্দু হলেও মুসলমানদের সঙ্গে খুব সদ্ভাব রাখতো এবং মহররমের সময় ইমাম হোসেনের কাহিনী অবলম্বনে জারী গান করতো। দেশ ভাগ হবার পর এরা চলে যায়। পরবর্তীতে আজাদ মুসলিম ক্লাবের মাধ্যমে মজা পুকুরটি হুকুম দখল করিয়ে একটি খেলার মাঠ প্রতিষ্ঠা এবং তার সম্মুখের বাগিচাটিও হুকুম দখল করে পৌর সভার মাধ্যমে একটি পার্ক স্থাপন করি এবং সঙ্গীয় জমিতে কমিউনিটি সেন্টার ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই আয়ুব আমলে। পুকুরটির পশ্চিমেই ছিলো শ্রী চৈতন্য বিদ্যালয় নামে একটি ছোট স্কুল, সাধারণত হিন্দু ছেলে মেয়েরাই পড়তো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর স্কুলটির পরিচালন ভার আজাদ মুসলিম ক্লাব গ্রহণ করে এর নামকরণ করে আমলীগোলা প্রাইমারী স্কুল। অনেক দিন পর পাশের আরো কিছু যায়গা আজাদ মুসলিম ক্লাব খরিদ করে বিদ্যালয়টি পৌর সভার নিয়ন্ত্রণে প্রদান করিয়ে দোতালা ভবনে রূপান্তরিত করি। আজও স্কুলটি আমলীগোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় নামেই চলছে। বর্তমানে সরকার নুতনভাবে দালান তৈরী করছে। এর নিকটে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে হস্ত শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র, শরীর চর্চা কেন্দ্র ও রিক্সাপুলার হোস্টেল। ১৯৫৯ সালে ঠাকুর বাড়ী বলে কথিত বাড়ীটি আজাদ মুসলিম ক্লাব হুকুম দখল করে উইমেন পাইলট ইণ্ডাঃ এডুকেশন এণ্ড হেলথ সেণ্টার প্রতিষ্ঠা করে। এটা প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে মহল্লার ধনাঢ্য প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরাগ ভাজন হয়ে আমরা ক্লাবের ৮/৯ জন কর্মী মিথ্যা মামলার আসামী হয়ে প্রায় তিন বছর মামলা পরিচালনা করি। মিথ্যা মামলাকারীগণ শত চেষ্টা করেও পরে পরাজয় বরণ করে। বর্তমানে এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়, মেয়েদের স্কুল, নৈশ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, বয়স্ক নারী শিক্ষা কেন্দ্র, সেলাই বুনন ও এমব্রয়ডারী কাজ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একবার মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (মরহুম) আগমন করে ক্লাবের মহিলা উন্নয়ন কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে দ্বিতল ভবনটি তিন তলায় পরিণত করার জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেন। আমরা আরও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে তিনতলায় পরিণত করি। আজ এলাকার মহিলাদের এটা প্রাণ কেন্দ্র। আজাদ মুসলিম ক্লাব তথা আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স ন্যায়ের সংগ্রামে তখনও অটল এখনও অনড়। সমাজ সংগঠনের একটি মজবুত স্তম্ভ।

আমলীগোলার মুসলিম বসতির পূর্ব দিকের রাস্তা খুব ঢালু তজ্জন্য এটাকে

আমলীগোলার ঢাল বলে লোকে অবহিত করে আসছে। ঢালের উপরে একটি পঞ্চায়েতি ঘরে দেশ বিভাগের পর আমরা আনসার ক্লাব ও রাইফেল ক্লাব স্থাপন করি। এ প্রতিষ্ঠান দুটি আজাদ মুসলিম ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পরবর্তীতে রহমত উল্লাহ মডেল হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ উক্ত স্থানটি হুকুম দখল করে স্কুলের সঙ্গে একত্রীভূত করে নেয়। আরো কিছু পূর্বে ছিলো বিশা মাস্টারের স্কুল নামে এক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে লেখা পড়া ভালই হতো কিন্তু বৃটিশ আমলের শেষ দিকেই বিদ্যালয়টি অবলুপ্ত হয়ে যায়। প্রবীণ ব্যাক্তিরা আজও বিশা মাস্টারে কথা স্মরণ করে।

আমলীগোলার হিন্দুরা যেমন বৃটিশ আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অংশ নিয়েছে, তেমনি মুসলমানদের মধ্য হতেও অংশ নিয়েছে। যেমন স্বদেশী আন্দোলন। এই স্বদেশী আন্দোলনে আমার বড় মামা আঃ রৌফ (মরহুম) এর প্রভাবে আমার মরহুমা আম্মাও দীক্ষিত হয়ে চরকায় সূতা কেটেছেন মহল্লার মহিলাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়েছে। পুরুষদের মধ্যে মহল্লা ক্যাপ্টেন মুরাদ বখস্ তার সহকর্মী সাত্তার মহাজন, কোরবান সরদার, এতেয়ারী মাঠাওয়ালা অন্যতম। যার ফলে অনেকেই কংগ্রেসের সান্নিধ্যে এসে যায়, পরবর্তীতে মুসলিম আন্দোলন আরম্ভ হলে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মুসলিম লীগ আন্দোলনে মহল্লার প্রায় সকলেই অংশ নেয়। তবুও কয়েক জন খাকসার আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে আবির্ভূত হয়। এদের স্থানীয় নেতা ছিলেন জব্বার মুদী তার সঙ্গে যোগ দেয় আমাদের মরহুম সাহাদত হোসেনসহ পাড়ার বেশ কয়েক জন, আমি নিজেও এ দলের কনিষ্ঠতম সদস্য ছিলাম।

ডেপুটির বাগিচা আমলীগোলার নদী তীরবর্তীতে, এখানে হারুনুর রশিদ চৌধুরী ঢাকায় এলে বাস করার জন্য ভবন ও বাগিচা করেছিলেন। তিনি বৃটিশ সরকারের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাদের জমিদারী ছিল ডালিমপুরে। ডেপুটি সাহেব জমিটা কিনে ছিলেন বলে মহল্লার লোক এটাকে ডিপটি বাড়ী বা বাগিচা বলতো।

এর পশ্চিমেই দয়াল শেখ করিম শাহ্ ফকিরের বাসভবন রয়েছে। এই বাসভবনে একটা মসজিদ ও ফকিরের মাজার রয়েছে। করিম শাহ্ ফকিরের জন্ম স্থান ময়মনসিংহ জেলায়। তার পীর ছিলেন চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামীর মৌলভী দলিল উদ্দিন। সেখান থেকে ফকির বেশে কাসিমপুর জঙ্গলে এসে ১২ বৎসর কাটাবার পর তার একটা বিষাক্তক্ষত হয়ে যায়। সে জন্যে তিনি দোহার থানার নিকটে গিরি ফকিরের আস্তানায় আরও ১২ বৎসর কাটান। গিরি ফকির এ ধরনের বিষাক্ত ক্ষত

নিরাময় করতে পারতেন। সেখান থেকে ঢাকা আগমন করে প্রথমে বাবুবাজার, পরে লোহার পুল এবং তৎপরে নিজস্ব বাড়ি খরিদ করে আমলীগোলায় বসবাস করতে থাকেন। তিনি ১৩৫৪ হিজরীর ২৭শে জ্বিলকদ তারিখে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে তার কবর নির্মাণ করা হয়েছিলো। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার মুরিদান রয়েছে। তিনি চিশতিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন।

করিম শাহ্ ফকিরের ইন্তেকালের পর তার প্রধান শিষ্য ফকির মৌলভী এরশাদ উল্লাহ এবং তৎপরে ফকির করিম শাহের এক মাত্র কন্যা করিমা খাতুনের স্বামী গোলাম মাওলা গদীনশীন হন। করিম শাহ্ ফকিরের বহু কেরামতির কথা লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে। শোনা যায়। কোন এক বাড়ীতে একটি ছেলে খুব অসুস্থ ছিলো। তার রোগ কোন মতেই সারছিলোনা। অগত্যা অসুস্থ ছেলেটিকে দেখার জন্যে করিম শাহ্ ফকিরকে আনা হয়েছিলো। তিনি এসে বাড়িতে একটা পেয়ারা গাছ দেখতে পান এবং গাছটি তাকে দিয়ে দেবার কথা বলেন। বাড়িওয়ালা ফকিরের কথায় রাজি হলে তিনি বলেছিলেন, এই গাছের ফল তোমরা খাবে না। এরপর ধীরে ধীরে ফলন্ত গাছটা শুকিয়ে মরে যায় আর সেই সাথে ছেলেটির রোগও ভাল হয়ে যায়। একবার ফকির কি এক কাজে জিনজিরা গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটা কামরাঙ্গা গাছের নিচে কিছুক্ষণ বসেছিলেন। গাছের কামরাঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার শিষ্যরা বললেন, গাছের কামরাঙ্গাগুলি খুবই টক, মুখে দেয়া যায় না। ফকির মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, আগামী বছর কামরাঙ্গা মিষ্টি হলে আমাকে একটা চারা দিতে বলবেন। সত্যিই পরের বছর নাকি সে গাছে খুব মিষ্টি কামরাঙ্গা ধরেছিলো। তারপর সেই কামরাঙ্গার একটা চারা নিজ বাড়িতে লাগিয়েছেন। এ ধরনের আরও বহু অলৌকিক কাহিনী ফকিরের শিষ্যদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। তবে স্থানীয় লোকদের মনে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে তিনি নাকি কালিদেবী চালান দিতে পারতেন। যার বিরুদ্ধে এই কালি চালান দেয়া হতো সে বা তার পরিবার পরিজন যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কাছে নতিস্বীকার করতো ততক্ষণ তারা নানা রূপ রোগব্যাধিতে কষ্ট ভোগ করতো। এ জন্যে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে তার তেমন কোন মুরিদান নেই।

এর পশ্চিমেই ছিলো কামাল শাহের আস্তানা তার বেশ সংখ্যক মুরিদান ছিলো তাদের মধ্যে অনেক কামেল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ সব ব্যক্তিদের মধ্যে আজিমপুরের মোবারক শাহ্ অন্যতম। সেই আস্তানা বা বাড়ীর চিহ্ন আজ নেই। এ সবের নিকট রয়েছে এক গম্বুজ বিশিষ্ট আমলীগোলা ছোট মসজিদ যা

১৬৭৬ সালে তৈরী হয়েছিলো।

বর্তমানে গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলে দোতালা করা হয়েছে। এ মসজিদে আমাদের সহযোগীদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মসজিদটির মোতয়াল্লী অনেক দিন পর্যন্ত ওয়াদ আলী সর্দার নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। ফলে কিছু কাল মসজিদটি ওয়াদ আলী সর্দারের মসজিদ নামে পরিচিত ছিলো। আমলীগোলা বড় মসজিদটি মুঘল আমলে নির্মিত হয় এর ফলকটি লালবাগ কেল্লার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। মসজিদটি উঁচু প্লাট ফরমের উপর তৈরী বিধায় এটা দোতালা মসজিদের মতই দেখা যায়। মসজিদের সৌন্দর্য ছিলো বিরাটকায় গম্বুজ সে গম্বুজটি আর মিনার ভেঙ্গে দোতালা করায় মসজিদের সে সৌন্দর্য আর নেই। মসজিদটি মুঘল শাহী আমলে নির্মিত হয়েছিলো বিধায় এটা আমলীগোলা শাহী মসজিদ নামে পরিচিত থাকলেও মহল্লার লোক এটাকে আমলীগোলা বড় মসজিদ নামেই অবহিত করে।

এ মসজিদে বৃটিশ যুগের শেষ থেকে পাক কোরানের তফসিরের ব্যবস্থা হয়ে আসছে। পূর্বে এখানে মাওলানা রফিক সাহেব নামে এক বিশিষ্ট আলেম সুললিত কণ্ঠে তফসীর করতেন। তার সুন্দর কণ্ঠ সুরের জন্যেও অনেকে তফসীর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তবে তিনি রাজনৈতিক দিক দিয়ে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের ভক্ত ছিলেন। অর্থাৎ কংগ্রেস সমর্থক দলে ছিলেন। মুসলিম লীগের আন্দোলন যখন তুঙ্গে ঘরে ঘরে মুসলিম লীগ কর্মী। তখন মসজিদে কতক মুসল্লী তাকে তার দল পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান অন্যথায় তাকে বিদায় নিতে বলেন। তিনি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে আমাদেরকেই পরিত্যাগ করেন।

এ মহল্লার মুসলমান সমাজ বৃটিশ শাসনামল হতে সাধারণতঃ মহিষের শিং-এর চিরুণী ও বুতাম তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতো। কিছু লোক হাতীর দাঁত ও হাড় দ্বারা বিভিন্ন সৌখিন দ্রব্য তৈরী করতো। আমলীগোলায় শিং ও হাতীর দাঁতের দ্রব্যাদি সারা দেশে এমনকি পৃথিবীর অনেক দেশে খ্যাতি ছিলো। এসবের শ্রেষ্ঠ নিপুণ কারিগর ছিলেন হাফেজ মিয়া। কিছু কিছু কারিগর শুধু শিং দ্বারা আজও সৌখিন দ্রব্য তৈরী করছে। তবে পূর্বের মত নয়। এ কর্ম ও ব্যবসার বিশেষ করে বুতামের ব্যবসার প্রসার ঘটে ২য় মহাযুদ্ধের সময়। এলাকার অনেক হিন্দুও এ কর্মে ও ব্যবসায় নিয়োজিত হয়, ফলে ব্যবসার সঠিক কল্যাণার্থে হিন্দু মুসলমানের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল এ মহল্লাতে আমারই বাসভবনে "ঢাকা কো-অপারেটিভ বিষাণ শিল্প সমিতি" সমিতিটি দেশ বিদেশে পরিচিত ছিলো। ১৯৪২ সালের দূর্ভিক্ষের সময় সমিতি মাত্র দু পয়সার বিনিময়ে ৩টি আটার রুটি ও ভাজি প্রদান করতো। তখন

আমিও সেচ্ছা সেবক হিসেবে কাজ করেছি। যুদ্ধের পর শিং এর বুতামের পরিবর্তে প্লাস্টিক ও নাইলনের বুতাম প্রভৃতি বাজারজাত হওয়ায় এর প্রচলন বন্ধ হয়ে পড়ে, ফলে সমিতিটি অনেক দিন বন্ধ থাকার পর সমিতির নিজস্ব ভবন সুবলদাস রোডে স্থানান্তরিত হয়।

দুশো বছর ধরে মহা নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকায় গোলা আমীরগঞ্জ – তথা আমীর গোলা – তথা আমলী গোলা সব দিক দিয়ে নির্জিব হয়ে পড়েছিলো। তার ধমনীতে শিরায় উপ-শিরায় রক্তের চাঞ্চল্য আর দেখা দেয়নি। শোনা যায়নি জীবনের পদধ্বনি, যদিও কোন কোন আন্দোলন ও সংগ্রামে মহল্লার গুটি কতক লোক অংশ নিয়েছে সেটা ছিলো মরুভূমিতে বারি বিন্দুর মত। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কিছু লোক একটি সংগঠনের চেষ্টা করেছিলো কিন্তু সাফল্য লাভ করতে প্যারেনি নিজেদের মধ্যকার কোন্দল আর মতবিরোধের জন্য। মহাযুদ্ধ চলাকালে শিং-এর তৈরী বুতামের কদর খুবই বেড়ে যায়, ঘরে ঘরে এমনকি এলাকার মহিলারা পর্যন্ত বুতাম তৈরী কাজে নিয়োজিত হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্য তখনকার দিনে হাজার হাজার টাকা মাসিক কামাই করেও অনেকেই তাদের জীর্ণ শীর্ণ বাড়ি ঘরগুলো পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারেনি। সব অর্থই চলে গেছে নেশা, বেশ্যা, আর জুয়ার আড্ডায়। ১৯৪২ সালের মহা দূর্ভিক্ষ এদের তেমন কিছু করতে পারেনি এরা বুক ফুলিয়ে বলেছে চাউলের দাম যতই হোক আমরা ভাতই খাবো। খেয়েছেও তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাড়ি ঘর, ঘরের আসবাব পত্রের চেহারার পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। মিষ্টির দোকানে গিয়ে তখনকার দিনে দু'টাকা মূল্যের বৃটিশ বিমান খেতো। অর্থাৎ শিল-পাটার মতো বিরাট মিষ্টি খেয়ে আসতো। শিলের মত বড় মিষ্টির নাম রাখা হয়েছিলো তখন বৃটিশ বিমান। এখানকার মুসলমানরা আরাম প্রিয় আর ফুর্তিবাজ হয়ে পড়লো। বর্তমানই যেন তাদের সব আশা-ভরসা। ভবিষ্যৎ চিন্তার কোন ধার ধারলোনা তারা। যা আয় করে তা অকাতরে অকল্যাণকর কাজে বিলিয়ে দিতো তাদের অর্জিত অর্থ। এটাই তাদের ধর্ম। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তাহ্‌জীব তমদ্দুন তো পূর্ব থেকেই বিনষ্ট হয়ে আসছিলো। বুড়োরাও ভাবতেন তাদের ছেলেরা বড় হয়ে রোজগার করলেই তাদের অভাব অনটন ঘুচে যাবে। তাদেরও যে দায়িত্ব রয়েছে সংসারকে সুন্দর করার জন্য, সমাজকে সুন্দর করার জন্য তা ভুলেই বসেছিলেন তারা।

অবশ্য অতি নগণ্য সংখ্যক লোক বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তাদের কাছ থেকেই প্রেরণা পেয়ে আমরা কয়েকজন তরুণ যুবক মহল্লায় একটি ক্লাব

গঠনের চিন্তা করতে লাগলাম। তখন মহল্লার ছোট মসজিদকেই কেন্দ্র করে একটা সাময়িক আস্তানা গড়ে তুলি। পরবর্তীতে বড় মসজিদ হলো আমাদের বসা ও আলাপের স্থল। মসজিদে বসেই কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হয় বলে আমরা প্রায় সবাই নামাজ পড়া আরম্ভ করলাম। এতে উপকার হলো। ধর্মের দিক থেকে আমাদের মন নিষ্কলুস হলো। আজ নেশার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পৃথিবীব্যাপী আরম্ভ হয়েছে। সেদিন আমরা এর সম্পর্কে সজাগ হয়েছিলাম। এ নেশা আমাদের সমাজ জীবনকে তিলে তিলে শেষ করছে, একদিন শরীরকেও নিঃশেষ করে দেবে। তাই নেশার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হই। আমাদের পাড়ার এক প্রভাব ও বিত্তশালী ব্যক্তি পাড়ার মধ্যে তাড়ি ও নেশা দ্রব্য বিক্রয় করতে আরম্ভ করছিলো। তার প্রভাব প্রতিপত্তিত্বে কেহই সাহস পাচ্ছিলনা বাধা দিতে। আমরা কজন তরুণ একদিন তার গাড়ী ভরা তাড়ির কলস ভেঙ্গে চুরমার করে দিলাম, নেশার আড্ডা জায়গায় হামলা দিলাম। ফলে আমাদের উপর নানা দিক থেকে নানা রূপ চাপ সৃষ্টি হলো, প্রাণের ভয় ও এলো। সালিশীর মাধ্যমে একটা মীমাংসাও হলো। কিন্তু মনে প্রাণে আমরা এ ব্যবসা আর ব্যবহারকে ঘৃণাই করে আসছি আজও করছি।

সমিতির কোন স্থায়ী দফতর না থাকলেও বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ১৯৪২ সালে আমরা একটা সংঘ গঠন করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সাথে সাথে সামাজিক ও ধর্মীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনে বিভিন্ন সময়ে সংঘের নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয় আমলীগোলা যুবক সমিতি, পরে মুসলিম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, মুসলিম ইয়ং ক্লাব, আকরাম খাঁ ক্লাব ইত্যাদি। ক্লাবের নাম আকরাম খাঁ রাখার কারণ, তৎকালে বাংলার মুসলিম জাগরণের এবং মুসলিম সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনে মাওলানা আকরাম খাঁর অবদান ছিলো অপরিসীম। এ নামও স্থায়ী হয়নি সদস্যদের মাঝে মতভেদ দেখা দেওয়ায়। এ নাম বাতিল করে ১৯৪৫ সালে মুসলমানদের সার্বিক আজাদী তথা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় কুসংস্কার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা অর্থাৎ একটি সমাজের জন্য যে সকল আজাদী অপরিহার্য্য তাকে সামনে রেখে ক্লাবের নামকরণ করা হয় "আজাদ মুসলিম ক্লাব"। ১৯২ নং জগন্নাথ সাহা রোডস্থিত ভবনের একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে সেখানে স্থায়ী দফতর প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্থায়ী দফতর করে শিক্ষার প্রসার ও ধর্মীয় সংস্কার আর সামাজিক কাজে হাত দেবার সাথে সাথে মহল্লার কিছু সংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তি আমাদের ক্লাবকে ভালো চোখে দেখতে পারলেন না। তারা এর কদর্থ করলেন।

তাদের মতে এ ক্লাব গঠনের অর্থ হলো নুতন ফেরকার উদ্ভব। ফেরকা কথাটার যথার্থ অর্থ তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেননা। কথাটা শুনেছেন মৌলভী মৌলানাদের কাছ থেকে। তারা আরো শুনছেন, আখেরী জামানায় নাকি মুসলমানদের মধ্যে হাজার ধরনের ফেরকার উদ্ভব হবে। তাই তারা সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আমাদের আজাদ মুসলিম ক্লাবকে একটা নুতন ফেরকা বলে আখ্যায়িত করে বসলেন। আমরা এ কথায় মোটেই কর্ণপাত না করে আমাদের ইপ্সিত মনজিলের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম।

ফলে এটি একটি বহু মুখী জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়। এই ক্লাবের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সমবায়, নারী, শিশু ও যুব কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক বিকাশের কেন্দ্রসমূহ আমলীগোলা ও পার্শ্ববর্তী মহল্লার বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। আজাদ মুসলিম ক্লাব ঢাকা তথা বাংলাদেশের সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত। এর বহু সদস্য দেশ বিদেশের বিভিন্ন সভা সম্মেলন সেমিনারে অংশ গ্রহন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদি পরিদর্শন করে যেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছে তেমনি সে সব প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সেতু বন্ধন রচনা করেছে। বিশ্বের বহু দেশের নেতৃবর্গ এবং দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি থেকে মন্ত্রী পরিষদ এর সদস্য, সচিব এবং বিভিন্ন দফতর পরিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে ভূয়সী প্রশংসা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বহু পূর্বেই অরাজনৈতিক ও অলাভজনক, অসাম্প্রদায়িক, গঠনতান্ত্রিক রূপ দেওয়া হয়েছে। দেশ বিদেশের বহু নেতা ও পদস্থ কর্মকর্তাদের অনুরোধে এবং ক্লাবটির কাজের প্রসারের দিকে লক্ষ্য করে ১৯৮৬ সাল হতে এর নামকরণ হয়েছে আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-বাংলাদেশ। আজ দেশ বিদেশের মানুষের কাছে আমলীগোলার ছোট্ট একটি প্রতিষ্ঠান আজাদ মুসলিম ক্লাব একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত হতে পেরেছে। দেশে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাসহ জাতিসংঘের এন, জি, ও এবং ডি, পি, আই, বিভাগের সদস্য ভুক্ত হতে পেরেছে। তৎকারনে ফিরে পেয়েছে আমলীগোলার লুপ্ত গৌরবের অনেকখানি। তথাপি অতীতের অসংখ্য স্মৃতি আর ভবিষ্যতের অজস্র সম্ভাবনা এই দুই এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনাগত দিনের দিকে তাকিয়ে আছে। আমলীগোলা তথা আমীর গোলা বহু আশা নিয়ে নতুন যুগের তরুণ যুবাদের উপর স্থির বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করছে সেই অনাগত দিনের জন্যে, যেদিন সকল প্রতিশ্রুতি সকল সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নেবে।

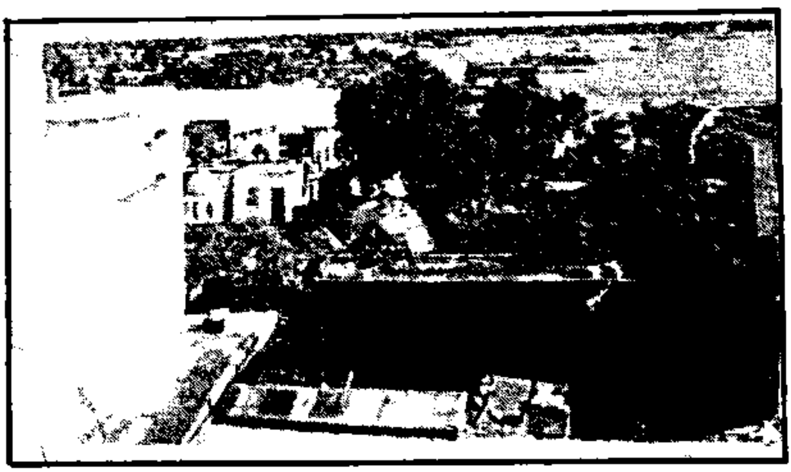
প্রাচীনের ফরিয়াদ

মোঘল শাসনামলে পুরনো ঢাকা শহরই ছিলো সকল আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। সে সময় এখানে বহু ইমারত তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে সেই সব জীর্ণ ভগ্নপ্রায় ইমারতগুলো সংস্কার বা পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে। এখনও বহু পুরনো ইমারত রয়েছে প্রতিটি রাস্তার বুকে। এইসব প্রাচীন ইমারতে প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠ রয়েছে। আর এগুলোতেই লুক্কায়িত রয়েছে অলিখিত অসংখ্য রহস্য কাহিনী। ঢাকায় অসংখ্য মসজিদ, মন্দির, মঠ, গির্জা, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদ, শেওলাধরা দেওয়াল ও প্রাচীর, বিধ্বস্তপ্রায় গম্বুজ, আঁকাবাঁকা পথ, অলিগলি ও ঘিঞ্জি বস্তিগুলোকে ঘিরে রয়েছে কত কাহিনী, কত স্মৃতি। বিংশ শতাব্দীর এই নব প্রভাতের সূচনায় এর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এক বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। এইসব প্রাচীন মসজিদ, মন্দির, প্রাসাদ, দেওয়াল ও প্রাচীর, বিধ্বস্তপ্রায় দুর্গ প্রাকার, আঁকা-বাঁকা পথের সেই পুরনো ঢাকা আজও তেমনি অম্লান রয়েছে। অসংখ্য জানা-অজানা রহস্য সুপ্ত রয়েছে তার অন্তরে, সে সব সুপ্ত রহস্যকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে বহু কাহিনী। হয়ত আজও মহানগরীর বুকে জড়িয়ে থাকা এ সব অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অতীতের গহ্বর থেকে যেটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার সত্যাসত্য আজ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান। কারণ যে সব নিদর্শন ও সূত্র ধরে এই সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব সেসব আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কতসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে এই মহানগরীর বুকে। একমাত্র প্রাচীন ইমারতই জানে তার সঠিক কাহিনী। জানে পুরনো দালানের প্রকোষ্ঠসমূহ, পথঘাট, অলিগলি আর পুরনো ভগ্নাবশেষ। জানে লালবাগ দুর্গের ভাঙ্গা ও বিধ্বস্তপ্রায় ফটক, জানে তার অভ্যন্তরস্থ বিলুপ্তপ্রায় দালানসমূহ আর তার বিরাট প্রাচীরগুলো। আরো জানে বর্তমান জেলখানার প্রাচীন ইমারতগুলো। এরা কালে কালে শুনেছে কত চক্রান্তের কাহিনী, কত ভয়াবহ অপরাধের ষড়যন্ত্রের কথা, শুনেছে কত পার্থিব প্রেমের মদিরালাপ। এসবের নায়ক ছিলো এমন এক জাতি, যে জাতি প্রেম, শাসন ও সমরক্ষেত্রে অম্লান যশ রেখে গেছে। এই প্রাচীন নগরী দেখেছে ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি, ভ্রাতৃরক্তের বন্যা, আর দেখেছে পরাক্রান্ত সুবেদার ও শাহজাদাদের

মর্মান্তিক পরিণাম। কালের সাক্ষী এইসব প্রাচীন মৌন ইমারত দেখেছে বিপুল ঐশ্বর্য, বিলাস ব্যসন, জয়পরাজয়ের লীলা, বিজয়োৎসব আর নির্বাসন, মানুষের স্বার্থের হানাহানি, প্রেম ও আকাঙ্খা, গর্ব ও অহঙ্কার, প্রতাপ ও প্রতিপত্তির চরম পরাকাষ্ঠা।

এই মহানগরীর প্রাচীন দুর্গ, ইমারত, মিনার, মসজিদ, মন্দির, মঠ ও বিভিন্ন স্মৃতি-সৌধের পানে চেয়ে মনে হয় তারা যেন মৌন ভাষায় সে কালের ইতিহাসের শিক্ষা থেকে বর্তমানকে মজবুত করে গড়ে তোলার প্রেরণা দিচ্ছে। তাদের মৌনতার গহ্বর থেকে যেন অবিশ্রান্তভাবে ধ্বনিত হচ্ছে– ক্ষণিকের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে সত্যকে অস্বীকার করো না, আত্মঘাতি ভ্রাতৃকলহে লিপ্ত হয়ো না, তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিদর্শন ও ইতিহাস ভুলে যেয়ো না, মুছে ফেলার চেষ্টা করোনা। কোরআনের মহান বাণীকে বিসর্জন দিয়ে নাস্তিকতার আদর্শকে গ্রহণ করো না। লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে বিভ্রান্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ো না। তাদের অব্যক্ত ভাষায় প্রতি মুহূর্তে যেন অনুরণিত হচ্ছে ঃ তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো; তাঁর নির্দেশিত পথে পরিচালিত হও, ন্যায়নীতির আদর্শকে সমুন্নত করো। সাম্য, মৈত্রী, ভালবাসা ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে সম্মুখ পানে অগ্রসর হও। যাত্রাপথের যে কোন বাঁধাকে নৈতিক বলে পরাভূত করো। যদি তোমাদের দেখার মত চোখ থাকে, বুঝবার মত মন থাকে, শোনার মত ধৈর্য থাকে আর জানবার মত জ্ঞান থাকে, তবে নিশ্চয়ই তা থেকে বঞ্চিত হবে না। যে জাতি তার বিগত দিনের ইতিহাসকে বিকৃত করে ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে নতুন পাতা লাগিয়ে দেয় আর প্রকৃত ইতিহাসকে ভুলে যায় সে জাতি নিশ্চয়ই অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যেতে বাধ্য।



আমলীগোলা মহল্লার বিংশ শতাব্দীর ষাট দশকের চিত্র

ঢাকা পৌরকর্তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

চেয়ারম্যান ঃ

১৮৬৪ সালে ঢাকায় প্রথম পৌরসভা গঠিত হয়। ইতিপূর্বে ঢাকায় কোন পৌরসভা ছিলো না। তবে ১৮২৩ সালে ঢাকার কালেক্টর মিঃ ওয়ালটার ঢাকা শহরের উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারী সহায়তা লাভের জন্যে 'কমিটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই কমিটি পৌরসভার ন্যায় কাজ করে যেতো। সরকারী এক আদেশে এই কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং ১৮৬৪ সালে এই কমিটির পরিবর্তে 'ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৮৪ সালে জারি করা হয় মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট। সে সময় থেকেই চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ার জন্যে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে হয়। ইতিপূর্বে ১৮৬৪ সালে পৌরসভা গঠনের পর থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট জারির পূর্ব পর্যন্ত ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটগণ পদাধিকার বলে পৌরসভার চেয়ারম্যান হতেন এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর মনোনয়ন দিতেন। এই বিশ বছরে যে ক'জন পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান হয়েছেন তাঁদের মধ্যে তিন জনের নামের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁরা হচ্ছেন ঃ মিঃ স্কিনার (Skifnner), ডাঃ লাইএ্যাল (Dr. Lyall), মিঃ জে. ব্রাডবারি (Mr. J. Bradbarry)। এঁরা সবাই ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এঁরা পদাধিকারবলে ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এঁরা ছাড়া আর কেউ চেয়ারম্যান সে সময়ে হয়েছেন কিনা তা আজও আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি।

১৮৮৪ সালে মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট অনুসারে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রথম চেয়ারম্যান হয়েছিলেন বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়। তিনি ১৮৮৫-৮৮ সাল পর্যন্ত

চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবি। এই পরিবারে বহু বিশিষ্ট আইনজীবি জন্ম নিয়েছেন। তাঁর নামানুসারে ঢাকার একটি রাস্তার নামকরণ করা হয় আনন্দ চন্দ্র রায় রোড। একটি স্কুলের নামকরণও করা হয় তাঁর নামে।

তারপর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বাবু ঈশ্বরচন্দ্র দাস। তিনি এই পদে ১৮৮৮-৯১ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ঈশ্বর চন্দ্রের পর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন খাজা মোহাম্মদ আজগর। ইনিই ঢাকা পৌরসভার প্রথম মুসলমান চেয়ারম্যান। তাঁর নামানুসারে একটি গলির নামকরণ করা হয়েছে খাজা আজগর লেন। খাজা মোহাম্মদ আজগর ১৮৯১-৯৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

খাজা সাহেবের পর রায় বাহাদুর ঈশ্বর চন্দ্র শীল ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ১৮৯৪-৯৯ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর নামানুসারে ঢাকার একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে রায় ঈশ্বর চন্দ্র শীল রোড।

এর পর ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন নওয়াব খাজা মোহাম্মদ ইউসুফজান খান বাহাদুর। তিনি ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নওয়াব খাজা ইউসুফ সম্পর্কে এই পুস্তকের অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

নওয়াব ইউসুফ জানের পিতৃপুরুষ খাজা খয়রুল্লাহ কাশ্মীর থেকে প্রথমে পাটনা ও পরে ঢাকায় আগমন করেছিলেন। খাজা ইউসুফের পিতা নওয়াব খাজা আহসান উল্লার বোনকে বিবাহ করেছিলেন। খাজা ইউসুফ ঢাকা জেলা বোর্ডের নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন (১৮৯৭)। তা ছাড়া তিনি দীর্ঘ আটাশ বছর পর্যন্ত অনারারী মেজিস্ট্রেট পদে বহাল ছিলেন। তারই আপ্রাণ চেষ্টায় ডাফরিন মোহামেডান হোস্টেল নির্মিত হয়। ১৯০৪ সালে খান বাহাদুর ও ১৯১০ সালে নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন দক্ষ শিকারী ও শুটার ছিলেন। ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালে একদা লাট সাহেব নদী পথে ঢাকায় এসেছিলেন। সদর ঘাটে অবতরণ করে লাট ভবনে যাবেন এজন্যে সদরঘাট, জনসন রোড এবং অন্যান্য কতিপয় রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ ছিলো। নওয়াব ইউসুফ জান তাঁর নিজস্ব গাড়ি দিয়ে পৌরসভায় যাবেন। কিন্তু বাদ সাধলেন পুলিশ কর্মচারিগণ। তাঁর পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে গাড়িসহ রাস্তা অতিক্রম করতে দেয়নি। তিনি অন্য রাস্তা দিয়ে কোন প্রকারে পৌরসভায় পৌছে রোড কুলি ও ইন্সপেক্টরদের হুকুম দিলেন, ভিক্টোরিয়া

পার্কের নিকটস্থ রাস্তা খনন করার জন্যে। যে কথা সেই কাজ। রাস্তা খনন শুরু হয়ে গেলো। এদিকে লাট সাহেবের আগমন সময় ঘনিয়ে এলো। খনন কার্য দেখে পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারিগণ হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন। কিন্তু নওয়াব ইউসুফ জান নাছোড় বান্দা। প্রয়োজন আছে তাই রাস্তা খনন করতেই হবে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ অফিসারগণ ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে সেদিনের ঘটনার আপোস রফা করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিলো অপরিসীম। তিনি ১৯২৩ সালে প্রচুর সম্মান ও যশ নিয়ে ইন্তেকাল করেন।

এরপর ঢাকার জেলা মেজিস্ট্রেট মিঃ জে. টি. র‍্যাঙ্কিন ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরই নামানুসারে ঢাকার একটি রাস্তার নাম র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীট করা হয়েছে।

মিঃ র‍্যাঙ্কিনের পর পুনরায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন নওয়াব খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ জান খান বাহাদুর। এবার তিনি ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত এপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘদিন চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর আসেন রায় বাহাদুর প্যারিলাল দাস। তিনি একজন আইনজীবি এবং যোগ্য প্রশাসক ছিলেন। তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রথম গ্র্যাজুয়েট। তাঁর নামানুসারে একটা রোডের নাম হয়েছে প্যারীদাস রোড। এরপর জমিদার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কংগ্রেস নেতা সত্যেন্দ্রকুমার দাস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন খাজা নাজিমউদ্দিন। তিনি কয়েক বার পৌরসভার কমিশনারও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে পুস্তকের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৩২ সালে ঢাকা পৌরসভার জন্যে নতুন এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়। এ এ্যাক্ট দেশ বিভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চালু ছিলো। এই সময়ের মধ্যে ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন যথাক্রমে সতীশ চন্দ্র সরকার, দ্বিতীয় বারের মত রায় বাহাদুর সতেন্দ্র কুমার দাস ওরফে সতু বাবু ও বীরেন্দ্র নাথ ঘোস। বীরেন্দ্র বাবু একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নামানুসারে করনেশন পার্কের নামকরণ করা হয়েছিলো; কিন্তু কেউ ঐ নাম উচ্চারণ করতেন না। সব শেষে বিমলা নন্দ দাসগুপ্ত। গুপ্ত বাবু ছিলেন একজন কংগ্রেসী। তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যান থাকা কালেও কংগ্রেসের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। দেশ ও দশের মঙ্গল কামনাই ছিলো তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি ছিলেন বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখার ম্যানেজার। এপদে তিনি যোগ্যতার

পরিচয় দিয়ে গেছেন। ঢাকায় যে ঈদের মিছিল হত তার পুরোভাগে থাকতেন তিনি।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব বঙ্গের নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান অর্জনের সাথে সাথে ঢাকা শহরকে করা হলো পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পাওয়ার পরই ঢাকা শহরের গুরুত্ব বেড়ে যায় অপরিসীম। তাই এ শহর পূনর্বিন্যাসের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে সরকার ঢাকা পৌরসভা বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত পৌরসভায় কোন নির্বাচন হয়নি। এ সময়ে সরকার মনোনীত ব্যক্তিবর্গই ঢাকা পৌরসভার কার্য পরিচালনা করতেন। সরকার ঢাকা পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন দেন জনাব পানাউল্লাহ আহমদকে। তিনি ১৯৪৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জনাব পানাউল্লাহ রংপুর জেলার অধিবাসী এবং তিনি বৃটিশ সরকারের একজন সুদক্ষ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি বৃটিশ আমলে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন মহকুমা সদরে মহকুমা অফিসারের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। পানাউল্লাহ ছিলেন সুশাসক ও সুদক্ষ বিচারক। তাঁর বিচারের ধারা ছিলো অনন্য সাধারণ।

১৯৩০ সালের কথা। জনাব পানাউল্লাহ তখন বরিশালের মহকুমা অফিসার। সে সময়ে শোভনা-মহি মামলার নিষ্পত্তি করে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। বরিশাল শহরে শোভনা নাম্নী এক হিন্দুবালা একই শহরনিবাসী মহিউদ্দীনের প্রেমে পড়ে। কিন্তু তারা দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদের মিলনে আসে পর্বত প্রমাণ বাধা। পরিশেষে কোন উপায়ন্তর না দেখে তারা একত্রে পালিয়ে যায়। এই ঘটনা প্রচারিত হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এমন কি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধার সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই উত্তেজনাময় মুহূর্তে জনাব পানাউল্লার বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যে এই জটিল বিষয়টি অত্যন্ত নিপুণতার সাথে সুসম্পন্ন হয়েছিলো। তাঁরই প্রচেষ্টায় হিন্দুবালা শোভনা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় মহিউদ্দীনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শোভনার এই সিদ্ধান্তে কোর্টে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিলো তারও নিষ্পত্তি হয়ে যায়। জনাব পানাউল্লাহ এক পীরের মুরিদ হন এবং ধর্ম বিষয়ে এক নতুন প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁদের মতে কোরআনের যে সব আয়াতে কুল অর্থাৎ বল শব্দ রয়েছে তা নামাজান্তে বাদ দিয়ে পড়তে হবে। তাছাড়া নামাজে শুধু প্রার্থনা সংক্রান্ত আয়াতগুলিই পড়ার আদেশ দেয়া হতো। এ নিয়ে ঢাকায় খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পাগলা পীর সাহেব

এদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। বিভিন্ন পন্থায় তাঁর সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে ওঠে ঢাকাবাসী। নিজ ও তাঁর পীরের মৃত্যুকাল পর্যন্তও নামাজ সম্পর্কে তাঁদের আদর্শ প্রচলন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যান তিনি। অবশ্যি তাঁদের বেশ কিছু অনুসারীও ছিলেন।

এরপর ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান মনোনীত হন জনাব কাজী গোলাম আহাদ। তিনি কুমিল্লার অধিবাসী। বৃটিশ সরকারের অধীনে বিসিএস হিসেবে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন মহকুমা সদরে মহকুমা প্রশাসকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সবশেষে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন পান জনাব আবুল খয়ের। তিনিও একজন বিসিএস অফিসার ছিলেন। ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে আসীন হওয়ার পূর্বে তিনি কক্সবাজার মহকুমার মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। জনাব খয়ের ঢাকা জেলা প্রশাসকের পদেও বহু দিন আসীন ছিলেন। পরে তিনি ডিআইটির চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন।

জনাব খয়েরের পর আর কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়া হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান হন জনাব কাজী মুহম্মদ বশীর। তিনি ১৯৫৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জনাব বশীর ঢাকায় একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজ সংস্কারক ও সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঢাকার অধিবাসীরা হুমায়ুন সাহেব নামেই ডাকতেন। তাঁর নামানুসারে লালবাগ এলাকার গৌর সুন্দর রায় লেনে কে. এম. বশির প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল রয়েছে।

পরবর্তী নির্বাচনে ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী জনাব এ. এ. সিদ্দিকী ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি মাত্র আগস্ট ১৯৫৯ পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময় ভাইস চেয়ারম্যান পদ নিয়ে দলাদলি ও বিরোধ দেখা দেয়। জনাব ইয়াকুব আলীকে বাদ দিয়ে অবৈধভাবে জনাব শামসুল হুদাকে নির্বাচিত করলে জনাব খাজা খয়ের উদ্দীনের প্রচেষ্টায় তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জনাব ডব্লু. বি. কাদরী ঢাকা পৌরসভা বাতিল ঘোষণা করে দেন। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ পৌরসভা হতে বিদায় নেন। জনাব শামসুল হুদা নির্বাচিত হলেও তিনি সে পদে একদিনও অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি।

পৌরসভা বাতিল ঘোষিত হওয়ার পর জনাব হামিদ হাসান নোমানী পৌর প্রশাসক হিসাবে মনোনীত হন। তিনি একজন বিসিএস অফিসার ছিলেন। বৃটিশ আমল থেকে

দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি একজন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি বৃটিশ আমলে প্রথম মুসলমান জেলা প্রশাসক নিযুক্ত হন। নোমানী সাহেব একজন সুদক্ষ পৌর প্রশাসক হিসেবেও সুনাম অর্জন করেন।

১৯৬০ সালে সরকার মিউনিসিপ্যাল এডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্স বলে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের স্থলে সরকারী পদস্থ কর্মচারীকে মনোনয়ন দানের আদেশ দেয়া হয়। তবে ভাইস চেয়ারম্যান পদটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকেই নির্বাচনের বিধি বলবৎ থাকে। এই অর্ডিন্যান্স বলে প্রথম চেয়ারম্যান মনোনীত হন কর্ণেল জামশেদ খান। তিনি ১৯৬০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৩ সালের জুলাই পর্যন্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একজন দক্ষ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি বার্মায় ও আফ্রিকাতে একজন আর্টিলারী রেজিমেন্টের অধীনে যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের স্যান্ডহার্স্ট হতে কৃতকার্য হয়েছিলেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী এবং জাতিতে মুসলিম রাজপুত। অবসর গ্রহণের পরই তিনি ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে মনোনীত হন। তিনি সদালাপী ও সমাজদরদী ছিলেন। ঢাকার উন্নয়নের জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

কর্ণেল জামশেদ খানের পর ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান হন জনাব তোফাজ্জল হোসেন। তিনি ছিলেন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের অধিবাসী। তিনিও বৃটিশ সরকারের অধীনস্থ একজন দক্ষ বিসিএস অফিসার। তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেয়ার পূর্বে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে পুনরায় ঢাকা পৌরসভার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে আসেন জনাব আবুল খয়ের। তৎপর জনাব মঈন উদ্দীন চৌধুরীকে পৌরসভার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। তিনি বরিশাল জেলার চাখারের অধিবাসী এবং উলানিয়ার জমিদারদের সন্তান। সে অঞ্চলে ভদ্র পরিবার হিসেবে তাদের পরিমাপ করা হতো এক ঘরে এক ঘর। এ প্রথার প্রকৃত মর্যাদা হয়তো আমরা ঢাকাবাসী হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না তবে বরিশাল জেলাবাসী এর মর্যাদা কতখানি তারাই বলতে পারেন। তিনি বৃটিশ সরকারের একজন দক্ষ বিসিএস অফিসার ছিলেন। তিনি খুবই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী ছিলেন। জনাব মঈনউদ্দিন ছিলেন খুবই সদালাপী এবং দক্ষ প্রশাসক, সাহসী ও কল্পনাপ্রবণ। তাঁর সময়ে ঢাকায় অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়। খেলাধূলার প্রতি তাঁর খুবই অনুরাগ ছিলো। স্পোর্টস ফেডারেশনেও তাঁর খুব প্রভাব ছিলো। তিনি ঢাকার বহু ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে খেলাধূলা ও

শরীর চর্চার প্রসার ঘটানোর বিষয়ে সহায়তা দান করেন। তাঁর আমলে ঢাকার উন্নয়ন ক্ষেত্রে যে সব কাজ সমাধা হয়েছে তার তুলনা বিরল। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে স্পোর্টিং ক্লাব, শরীর চর্চা কেন্দ্র, সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র, ছাড়াও বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্ড বা ইউনিয়নে উন্নয়নমূলক কাজ করার মত স্থান বাকী ছিল না। বিশেষ করে ওয়ার্কস্ প্রোগামের মাধ্যমে মসজিদ, মন্দির, পঞ্চায়েত ঘর, সামাজিক সংস্থাসমূহ এলাকাবাসীর আবেদন ক্রমে বহু মাদ্রাসা, স্কুল, পাঠাগার, ব্যায়ামগার, সামাজিক সংস্থা মিলনায়তন স্থাপন কল্পে দালান নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। যা আজও ঢাকাবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তিনি আজিমপুর গোরস্থানেরও বহু উন্নয়ন সাধিত করেন। তিনি ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মরদেহ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয় তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে নর্থব্রুক হল সংলগ্ন একটি মিলনায়তনের নাম রাখা হয়েছে মঈনউদ্দীন চৌধুরী মেমোরিয়াল হল। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ঢাকাবাসীর বিশেষ করে ক্রীড়ামোদী সমাজ ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে। জনাব মঈনউদ্দীন চৌধুরীর আমলে পূর্বপাক সরকারের মৌলিক গণতন্ত্রের ডিরেক্টর জনাব ডবলু, এ, মোয়ারিক কয়েক দিনের জন্য ঢাকা পৌরসভার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

জনাব চৌধুরীর মৃত্যুর পর ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ঢাকা জেলা প্রশাসক জনাব মুহম্মদ খুরশীদ আনোয়ার। তিনি কুমিল্লার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রকৃত সাহসী, কর্মঠ ও স্পষ্টবাদী চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর আমলে ঢাকা পৌরসভার কর আদায়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছিলো। শতকরা ৮০ থেকে ৮৫.ভাগ কর আদায় হয়েছিলো। ইতিপূর্বে কারো আমলেই এত বিপুল পরিমাণ কর আদায় সম্ভব হয়নি। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান কর্মী। জনগণের সেবক হিসেবে তিনি অধিক রাত পর্যন্ত কাজ করে যেতেন। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরাও খুবই নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠে। তাঁর সময় ঢাকার বহু উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়। পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ ত্যাগের পর তৎকালীন সরকারের রোষানলে পতিত হয়ে তিনি পদচ্যূত হন। পরে অবশ্যি তিনি সরকারী কর্মকর্তার আসনে আসীন হন। তিনি ছিলেন সিএসপি অফিসার। বর্তমানে খালেদা জিয়ার সরকারের মন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন।

ঢাকায় যখন আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে, সেই সংকটময় মুহূর্তে ঢাকা

পৌরসভার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন জনাব বদিউল আলম। তিনি ছিলেন ইপিসিএস অফিসার। জনাব আলম বরিশাল জেলার অধিবাসী। তিনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পৌর কার্যাবলী সম্পন্ন করে গেছেন। চেয়ারম্যান হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন ঢাকার মহকুমা প্রশাসক। তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতা জনাব শেখ মুজিবর রহমানের কারাদন্ডাদেশের পক্ষে তিনি রায় দিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি নানা অসুবিধায় পতিত হন।

এরপর ঢাকা পৌরসভার প্রশাসক নিযুক্ত হন অবসরপ্রাপ্ত মেজর এস. এ. খানসুর। তিনি ছিলেন টাঙ্গাইলের অধিবাসী। এ সময় পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। জনাব খানসুর তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। দেশ বিভাগের পর অর্থাৎ পাকিস্তান কায়েমের পর পুরো রেজিমেণ্টসহ তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে হয়। তিনি কাশ্মীর যুদ্ধে কর্ণেল জামশেদের সহযোগী হিসেবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দক্ষ প্রশাসক। তিনি রাজধানীর পৌর কার্যাবলী সুসম্পন্ন করে গেছেন সুনিপুণ ভাবে। জাতির ইতিহাসে এ সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সংঙ্কটময়। তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌরকার্যাবলী অব্যাহত গতিতে সুসম্পন্ন হয়। ঢাকা পৌরসভার প্রশাসক নিযুক্তির পূর্বে তিনি ঢাকা জুটমিলের ম্যানেজার ছিলেন। জনাব খানসুরের আমলেই দেশ স্বাধীন হয়।

তারপর পৌরসভার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন যথাক্রমে জনাব খালেদ শামস ও জনাব মনজুরুল করিম। জনাব খালেদ শামস ১৯৭১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত পৌরসভার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। জনাব মনজুরুল করিম ১৯৭২ সালের ১৬ই জানুয়ারী থেকে ১৯৭২ সালের জুন পর্যন্ত পৌরসভার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা দুজনেই সিএসপি অফিসার ছিলেন।

এঁদের পর পৌরসভার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সিএসপি অফিসার জনাব এইচ এন আশেকুর রহমান। ঢাকা পৌরসভার দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে জনাব আশেকুর রহমান রাজস্ব বিভাগের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ছিলেন। তিনি একজন যোগ্য ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসাবে পৌর কর্মচারীদের প্রশংসার পাত্র ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় পৌর কর্মচারীদের জন্যে যৌথ বীমা তহবিল পদ্ধতির প্রচলন হয়। ঢাকা শহরবাসীর কল্যাণের জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

জনাব আশেকুর রহমানের পর ঢাকা পৌরসভার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্ণেল হেশাম উদ্দীন আহমদ। তিনি একজন যোগ্য পৌর প্রশাসক

হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঢাকা পৌরসভার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। জনাব আহমদ আচার ব্যবহারে অত্যন্ত অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন এবং তাঁদের মঙ্গলের জন্যে সদা সচেষ্ট থাকতেন। নাগরিক জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনার জন্যে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করে গেছেন। তাঁর আমলেই পুরনো ঢাকার উন্নয়নের জন্যে 'পুরনো ঢাকা উন্নয়ন কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই কমিটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং কমিটির কাজ পরিচালনার জন্যে মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দ করেন। এই সংস্থার চেয়ারম্যান পদে জেনারেল মীর শওকত আলী বিইউপিএসসি এবং সেক্রেটারী জেনারেল পদে জনাব হেশাম উদ্দিন আহমদ মনোনীত হন। পুরাতন ঢাকার ২২টি ওয়ার্ডের ওয়েলফেয়ার কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যানগণ এই সংস্থার সদস্য হন। জনাব হেশাম উদ্দিন পরবর্তিতে শুটিং ফেডারেশনের চেয়ারম্যান পদে আসীন হয়েছিলেন। তিনি একজন সরকারী কর্মচারী।

অতঃপর নতুন আইনে ঢাকা নগরীতে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ও সমাজকর্মী ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ফলে ৩১-১০-৭৭ ইং তারিখে চেয়ারম্যান পদে আসীন হন অতঃপর ৯-১০-৭৮ তারিখে সরকার ঢাকা পৌরসভাকে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে পরিণত করেন। ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের প্রথম মেয়র পদে আসীন হওয়ার গৌরবলাভ করেন ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত।

জনাব হাসনাত লণ্ডনে অধ্যয়নকালে ছাত্র নেতা হিসেবে রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। তখন তিনি বিএনপি'র একজন প্রথম কাতারের বিশিষ্ট নেতা। মহামান্য প্রেসিডেন্ট ও বিএনপি প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের তিনি একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তিনি ঢাকার বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সেগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তিনি বৃহত্তর ঢাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্যে আরও চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ঢাকা অনেকখানি তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে। ঢাকার রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী ও গলিঘুচির যথেষ্ঠ উন্নতি হয়েছে। নিয়ন বাতির ফুলঝুরিতে রাতের ঢাকা হয়েছে স্বপ্নময়। ঢাকাকে আধুনিক শহরে পরিণত করার জন্যে তিনি এক মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি

৯-৫-৮২ তারিখ পর্যন্ত মেয়র পদে আসীন ছিলেন। তিনি মন্ত্রী পদেও আসীন হন।

অতঃপর ১০-৫-৮২ তারিখে মেজর জেনারেল (অবঃ) মাহমদুল হাসান প্রশাসক পদে মনোনীত হয়ে ১৩-১-৮৬ পর্যন্ত আসীন ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইলের অধিবাসী। সামরিক বাহিনী থেকেই ঢাকা করপোরেশনে প্রশাসক হিসেবে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তার সময়ে ঢাকা মহানগরীতে বহু মার্কেট নির্মিত হয়। তিনি পৌর করপোরেশনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ তথা ফাইনানসিয়াল ডিসিপ্লিন আনয়নে সক্ষম হয়েছিলেন। তার আমলেও নগরীর বেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সাধিত হয়। তার নিজ জেলায় শিক্ষাসহ অন্যান্য কল্যাণকর কাজের প্রসার ঘটিয়েছেন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য ঢাকা পৌর করপোরেশনে তার আমলেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে যা পরবর্তী কর্ণধারগণ সেটার আরও প্রসার ঘটিয়েছেন। তার আমলের পূর্বে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সর্বোচ্চ কর্ণধার হলেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আলোচনা অন্যত্র করতেন। তিনি মন্ত্রী পদেও আসীন হয়েছিলেন। তিনি ১৪-৯-৮৬ তারিখে প্রশাসকের দায়িত্ব ভার আলহাজ্ব কর্ণেল (অবঃ) মালেক (পি, এস, সি) কে বুঝিয়ে দেন। তিনি এপদে ৯-১০-৮৯ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। জনাব আব্দুল মালেক মানিকগঞ্জের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে অফিসার হিসেবে পাকিস্তান আর্মিতে যোগদান করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দৃঢ়তার সাথে শান্তি ও যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করেন। আর্মি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি বাংলাদেশ থাই এ্যালুমিনিয়াম লিঃ ও ম্যানুফেকচার অব মিনারেল ওয়াটার শিল্প প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত।

১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানিকগঞ্জ সাটুরিয়া এলাকা হতে জাতীয় পার্টির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনর প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালে মন্ত্রীর পদমর্যাদা লাভ করেন। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি মন্ত্রী পদেও আসীন হন। কর্ণেল মালেক বিভিন্ন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গর্ভনিং বডির চেয়ারম্যানও ছিলেন। ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন থেকে ও ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের বহু প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করে গেছেন। যা অন্য কেহ করেননি। কর্ণেল মালেক পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি ঢাকা নগরীর উন্নয়নের জন্যে যথেষ্ট প্রয়াস নেন।

তার সময়ই জাতিসংঘ ঢাকা নগরীকে শান্তির শহর বলে ঘোষণা দেন এবং

ঢাকার মেয়র হিসেবে আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স এর একটি শিশু শান্তি মিছিলের জন্য জাতিসংঘ হতে শান্তি পদক লাভ করেন।

এরপর ৯-১০-৮৯ তারিখে প্রশাসক পদে আসেন ভোলার অধিবাসী বিত্তবান ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ (মরহুম শেখ মনির ভগ্নিপতি) স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী পদে আসীন জনাব মোঃ নাজিউর রহমান। তিনি আসার পরই সরকার ২৬-১০-৮৯ তারিখে প্রশাসক পদটিকে মেয়র পদবী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মেয়র জনাব নাজিউর রহমান করপোরেশনে প্রশাসনিক কাঠামো সুদৃঢ় করার প্রয়াস নেন। অন্যদিকে নির্বাচিত কমিশনারদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরো গভীর করার লক্ষে ধর্মীয় উৎসবাদিতে উপহার দানের মাধ্যমে এ চেষ্টা নেন। একই সঙ্গে মেয়র এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়েরই মন্ত্রী পদে আসীন থাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তড়িৎ নিতে পেরেছেন। তাছাড়া তার জন্মস্থান ভোলা টাউনের যথেষ্ঠ উন্নয়ন সাধন ও নিয়নবাতির আলোকে আলোকজ্জ্বল করেছেন। তিনি ২-১২-৯০ পর্যন্ত মেয়র পদে আসীন ছিলেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ও রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেবের পতন প্রাক্কালে ৩-১২-৯০ তারিখে ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত মেয়র পদে আসীন হন এবং ঐ মাসের ১২-১২-৯০ পর্যন্ত কাগজ কলমে আসীন থাকলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি মাত্র দু'তিন দিন অফিস করতে পেরেছিলেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদের পতন ঘটায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার জনাব ওয়ালিউল ইসলাম এক্স অফিসিও মেয়র পদে ১৩-১২-৯০ তারিখে ক্ষমতাসীন হন। তিনি এপদে ৫-৫-৯১ পর্যন্ত আসীন ছিলেন।

বিগত ১৯-৫-৯১ তারিখে সংসদ সদস্য বি, এন, পির যুবনেতা ঢাকা মহানগরীর সাবেক পৌর কমিশনার জনাব মির্জা আব্বাস সরকারী আদেশে মেয়র পদে ক্ষমতাসীন হন। তখনও সরকার কমিশনার পদ বিলুপ্ত করেননি। ১লা জানুয়ারী ১৯৯২ হতে নির্বাচিত কমিশনার পদ সরকার বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এরশাদ সরকারের পতন ঘটার পরও এক বছর ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত কমিশনারগণ কমিশনার পদে আসীন থাকলেও তাদের নিয়ে কোন সভা, বাজেট পাশ বা কোন রূপ কার্যক্রম এক্স অফিসিও মেয়র এবং মনোনীত মেয়র করেন নি বা করতে দেন নি। সরকারী কোন আদেশের বলে কমিশনারদের নিস্ক্রিয় রাখা হয়েছিলো কিনা? তাও জানা যায়নি। আমার মতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লগ্নেই নির্বাচিত কমিশনারদের পদ বিলুপ্তি ঘোষণা করা সমীচিন ছিলো কারণ পরবর্তী একটি বছর নির্বাচিত কমিশনারদের বহাল রেখে মেয়র মহোদয়গণ একক ভাবে কাজ ও নির্দেশাদি দিয়েছেন এটা গণতান্ত্রিক দৃষ্টি কোন থেকে দেখলে বেমানান বলে মনে

হয়। উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে অনেক সরকার ক্ষমতায় এসে পৌর সভার পূর্বের নির্বাচিত বা মনোনীত প্রতিনিধিদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন।

মেয়র মির্জা আব্বাস সিটি করপোরেশনের দায়িত্ব হাতে নিয়ে দূর্নীতি ও কালো হাতের প্রভাব বন্ধ করার প্রচেষ্টা নেওয়ার কথা নগরবাসীকে অনেকবার বলেছেন অনেকক্ষেত্রে করেছেনও এটাই তার বৈশিষ্ট। ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। ঢাকা মহানগরীকে বিশ্বের আধুনিক শহর গুলোর ন্যায় গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আমার মতে সততার ছাপ রেখেছেন কিন্তু দক্ষতার ছাপ রেখে যেতে প্যারেননি। তার কতক ভুলের জন্যই প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জয়যুক্ত হতে পারেননি।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পূর্বে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের ন্যায় তিনিও পদত্যাগ করেছেন। তদস্থলে অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ বদিউর রহমান। সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার সততা, নিষ্ঠা, কর্ম দক্ষতা বিশেষ করে গ্রামীণ সামাজিক ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তার ভূমিকা সর্বজন বিদিত। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অতীব ধর্মপরায়ন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করলেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা থেকে বিরত থেকেছেন।

এবার ঢাকা নগরীর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন পুরনো ঢাকার অধিবাসী বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, সমাজ কর্মী, মিষ্টভাষী, সুবক্তা, আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব মোহাম্মদ হানিফ। তাঁর নিকট ঢাকাবাসীর অনেক প্রত্যাশা। তিনি নির্বাচন প্রাক্কালে জনগণের নিকট ঢাকার উন্নয়নের জন্য যে সব ওয়াদা করেছেন, নগরকে সন্ত্রাস ও মশক মুক্ত করার অঙ্গীকার করেছেন ঢাকাবাসী আজ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করবেন। আমরা ঢাকাবাসী নগর উন্নয়নে, গণমানুষ তথা শিশু-কিশোর তরুণ, যুবা ও প্রৌঢ়দের সার্বিক কল্যাণে এগিয়ে যাবেন এ আশাই পোষণ করি।

আমরা সর্বক্ষেত্রে তাঁর কামিয়াবি কামনা করি।

ভাইস চেয়ারম্যান ঃ

মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট (১৮৮৪) অনুসারে ১৮৮৫ সালে সর্বপ্রথম খাজা আমিরুল্লাহ ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। তিনি একজন সমাজদরদী ব্যক্তি ছিলেন। এর পূর্বে অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ঘোষণার পূর্বে ১৮৬৪ সালের পরে বাবু কৈলাশ চন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ পি.কে রায় ভাইস চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা উভয়েই সমাজদরদী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম

করে গেছেন। এঁদের পূর্বে ঢাকা কলেজের প্রফেসর মিঃ জর্জ বিলার্ট (Mr. George Billert); পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ রুবি (Mr. Ruby); সিভিল সার্জেন মিঃ আর. এফ. রামপিনি (Mr. R.F. Rampini); বেঙ্গল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট মিঃ ম্যাকবিন (Mr. Miacbeen); মিঃ এলেন (Mr. Allen); মিঃ প্যারজিটন (Mr. Pargiton) মিঃ স্টিভেন্স (Mr. Stevens); খাজা মোহাম্মদ আজগর ; মিঃ এ. সি. টাটে (Mr. A.C. Tate) ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির মনোনীত ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তবে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদ ইউরোপীয়ানদের জন্যে রিজার্ভ ছিলো। তারপর রমাকান্ত নন্দী ১৮৮৫ সালের পরে ভাইস চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ঢাকায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সবার নিকট পরিচিত ছিলেন। ঢাকায় তাঁর নামে একটি রাস্তা আছে। ১৮৮৮ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হন গোপী মোহন বসাক। তিনি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নামানুসারেও একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। ১৮৮৯ স্যালে রায় ঈশ্বর চন্দ্র শীল ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। তিনি যেমন প্রভাবশালী, তেমনি ধনাঢ্য ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তারপর ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন নিঃসন্তান দেবেন্দ্র নাথ দাস। মিঃ দাস পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাড়ি থেকে যত টাকা নিয়েই বের হতেন শেষ পয়সাটি পর্যন্ত অকাতরে দান করে দিতেন। ঘরে ফিরে তিনি গাড়িভাড়া দেয়ার জন্যে প্রায়ই অপরের কাছ থেকে হাওলাত করতেন। গরিব মানুষের পৌরকর তিনি নিজের পকেট থেকে পরিশোধ করে দিতেন। তিনি অদ্ভুত ধরনের খেয়ালী মানুষ ছিলেন। নতুন জামা তিনি কোন দিন পরতেন না। জামা কেনার পর তা ছিঁড়ে সেলাই করে তবে গায়ে চড়াতেন। অতঃপর যথাক্রমে নওয়াব খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ জান (১৯০১-১৯০৫) এবং খান বাহাদুর কাজী আলাউদ্দীন আহমদ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯১৬ সালে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন আরমানীটোলার বিশিষ্ট ধনী ও বনেদী ঘরের সন্তান। ঢাকার নবাব বাহাদুররা তাঁকে যথেষ্ট সমাদার ও সম্মান করতেন। সেজন্যে নবাব বাড়ির সব অনুষ্ঠানেই রায় বাবুকে নিমন্ত্রণ জানানো হতো। তারপর ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মুড়াপাড়ার বিখ্যাত জমিদার এবং ঢাকা কোর্টের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জী। তিনি একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। কেশব বাবু খুব ভাল তবলা সংগত করতে পারতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিলাসী, আমোদপ্রিয় ও সঙ্গীত-পিপাসু ছিলেন।

এরপর ভাইস চেয়ারম্যান হন আরেক জমিদার জনাব আবুল হাসনাত আহমদ। তিনি খুব প্রভাবশালী এবং গম্ভীর ও রগচটা লোক ছিলেন। তিনি কয়েক বারই ঢাকা পৌরসভার কমিশনার পদে নির্বাচিত হন। তারপর নির্বাচিত হন নবাব খাজা হাবিবউল্লার ভ্রাতা নওয়াবজাদা খাজা নসরুল্লাহ। তিনি একজন রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী ছিলেন। অতঃপর খাজা পরিবারের সৈয়দ সাহেবে আলম ওরফে কালু মিয়া ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি কয়েকবারই ঢাকা পৌরসভার নির্বাচিত ও মনোনীত কমিশনার হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজসেবী। সৈয়দ সাহেবের পর ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মী খাজা আহসান উল্লাহ। পাকিস্তান আমলে তিনি ভাসানী ন্যাপে যোগদান করে আজীবন বামপন্থী রাজনীতি করে গেছেন। জনাব আহসান উল্লাহর পর আসেন ইনকামট্যাক্স এডভাইজার, বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজসেবী জনাব মোঃ হাবিবউল্লাহ। এরপর আসেন বিশিষ্ট আইনজীবি ও সমাজকর্মী জনাব ইয়াকুব আলী। তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। জনাব ইয়াকুব আলী আর একবার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হিসেবে ঢাকা পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকা সেণ্ট্রাল ক্লাব্‌স কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। ঐ সময় ঢাকার মুসলমান যুব কর্মীরা তাঁদের সকল ক্লাব, সমিতি, এসোসিয়েশন প্রভৃতি সংস্থাকে সেণ্ট্রাল ক্লাব্‌স কমিটির অন্তর্ভুক্ত করেন। তৎপর বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী ও ব্যবসায়ী জনাব শামসুল হুদা নির্বাচিত হলেও তিনি ভাইস চেয়ারম্যানের আসনে উপবেশন করতে পারেননি। কারণ একদিনের মধ্যে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার জনাব কাদরী পৌরসভা বাতিল ঘোষণা করেন। অনেকেই বলে থাকেন, খাজা খয়েরউদ্দীনের হস্তক্ষেপেই এই ঘোষণা জারি করা হয়েছিলো।

অতঃপর ১৯৬০ সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের পর ঢাকা পৌরসভার নির্বাচনে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী খাজা খয়েরউদ্দীন এম.পি.এ. ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চরিত্রবান ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। এর কিছুদিন পর তাঁর জনসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ পাকিস্তান সরকার তাঁকে সিতারা-ই-খিদমত উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জেল হতে বের হবার কিছুদিন পরই তিনি পাকিস্তান চলে গেছেন। তিনি খুব পরোপকারী ও অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ ছিলেন। তাঁর বাসায় মেহমানদের রাজকীয় খানাপিনায় আপ্যায়ন করে খুবই আনন্দ উপভোগ করতেন। তিনি বিরোধী নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত সমাদর করতেন।

এজন্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথেও তাঁর যথেষ্ট সখ্যতা ছিলো। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পাকিস্তানের শেষ সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পেয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর জীবন সংশয় দেখা দিলে বঙ্গবন্ধুর ইঙ্গিতেই তিনি পাকিস্তান চলে যান। পাকিস্তানে হিজরত করে তিনি বিরোধী দলের কাতারে শামিল হন। এজন্যে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর ইঙ্গিতে তাঁকে অনেক দূরে সিন্ধু প্রদেশের কচ্ছের রানে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিলো। তাঁর সে দুঃখময় ও কষ্টকর কাহিনী তাঁরই মুখে শুনেছি করাচী ভ্রমণকালে। কিন্তু তাঁর উপর আল্লাহতায়ালার এমনি মেহেরবাণী যে তিনি প্রাণে বেঁচে পুনরায় পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিরোধী ভূমিকা পালন করে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তিনি করাচীতে বসবাস করে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। খাজা সাহেব সেখানেও পূর্বের মতই মেহমান নেওয়াজী করতেন। মাত্র কিছু দিন হলো তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

জনাব খাজা খয়েরউদ্দিন ১৯৬৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা পৌর-সভার ভাইস চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তী নির্বাচনেও তিনি ঢাকা পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন। আইয়ুব খানের আমলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষাবলম্বন করে আইয়ুব খানের বিরোধিতা করেন।

অতঃপর বিশিষ্ট সমাজকর্মী জনাব আবদুর রহিম ঢাকা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ ব্যাপারে তৎকালীন প্রাদেশিক গবর্ণর জনাব মোনেম খাঁর সহানুভূতি ও সহযোগিতা অনেকখানি কাজ করেছিলো। তিনি ইতিপূর্বে একবার ঢাকা পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তিতেও ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের তিনি কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এরপর পনর বছর পর্যন্ত ডেপুটি মেয়র বা উপ-প্রশাসক পদে কেহই আসীন হননি। যদিও ১৯৭৭ সালে নির্বাচিত মিউনিসিপ্যাল বোর্ড তথা কমিটি গঠিত হয়েছিলো কিন্তু পৌর চেয়ারম্যান তথা মেয়র জনাব ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত ভাইস চেয়ারম্যান বা ডেপুটি মেয়রের নির্বাচনে আগ্রহ দেখাননি। ফলে দীর্ঘ ক'বছর তিনি এককভাবে চেয়ারম্যান এবং মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অতঃপর ৩০-১০-৮৫ তারিখে উপপ্রশাসক পদে মনোনীত হন জনাব জাহাঙ্গীর মোঃ আদেল এবং এস. এ. খালেক। ১-২-৮৮ তারিখে এক আদেশ বলে জনাব সামসুজ্জামান মিন্টু

উপ-প্রশাসক নিযুক্ত হন। তার নিযুক্তির ফলে উপ-প্রশাসকের পদ দুই থেকে তিন জনে উত্তীর্ণ হয়। অবশেষে ১০-২-৯০ তারিখে নির্বাচিত ডেপুটি মেয়র হিসেবে বরিত হন জনাব জাহাঙ্গীর মোঃ আদেল, জনাব সামসুজ্জামান মিণ্টু ও জনাব আব্দুস সালাম। এরা সবাই ঢাকার রাজনৈতিক অঙ্গনের নেতা। এদের মধ্যে জাহাঙ্গীর মোঃ আদেল দু'বার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। জনাব আদেল একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও পুস্তক প্রকাশনা সমিতির প্রধান। এরা সবাই ১২-১-৯১ পর্যন্ত ডেপুটি মেয়র পদে আসীন ছিলেন। ঢাকা শহরের নবাব, বহু ধনী, শিল্পপতি, সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ ও পন্ডিত ব্যক্তি ঢাকা পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকের নামানুসারে বহু রাস্তা ও স্কুলের নামকরণ হয়েছে। এঁদের অনেকের সম্পর্কে এই পুস্তকে কিছু কিছু আলোচনাও করা হয়েছে। আর যাঁদের নাম স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে এক্ষণে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে না বলে আমি এখানে আলোকপাত করতে অপারগ। তবে যাঁদের কথা আমার মানসপটে উদিত হচ্ছে তাঁদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। অবশ্য কোন সহৃদয় আগ্রহী ব্যক্তি যদি আরো তথ্য ও নাম দিয়ে আমাকে সহায়তা করেন তাহলে পরবর্তী সংস্করণে সংযুক্ত করার ইচ্ছে রইলো।

ঢাকা পৌরসভা পূর্বে সাতটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিলো। পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ সালে আইয়ুব খান সরকার এই পৌরসভাকে ২৫টি ইউনিয়নে বিভক্ত করেন। পরের নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৬৪-৬৫ সালে আবার এই ২৫টি ইউনিয়নকে ৩০টি ইউনিয়নে বিভক্ত করা হয় এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের ঢাকা পৌরসভার সদস্যপদ দান করেন। তাছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিকে মনোনীত কমিশনার বা সদস্য করা হয়েছিলো। এঁদের মধ্যে অনেকেই ঢাকার উন্নয়ন ও জনসেবায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছেন।

কমিশনার/সদস্য ঃ

১৮৭৪-৭৫ সালে ঢাকা পৌরসভার কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ডাঃ জেমস ওয়াইজ, খাজা মুহম্মদ আজগর, খাজা আবদুল গনি, খাজা আহসান উল্লাহ, জে. জি. এন. পগোজ, এন.পি. পগোজ, রূপলাল দাস, কৈলাশ চন্দ্র ঘোষ এবং ডাঃ লিয়াল (Dr. Lyall)।

১৮৮৪ সালে মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট জারি হয়েছিলো। এই এ্যাক্ট মোতাবেক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হয়। ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত কমিশনাররা হলেন

আনন্দ চন্দ্র রায়, খাজা আমির উল্লাহ, রমাকান্ত নন্দী, ডাঃ ক্রমবিল, ডাঃ পি. কে. রায়, গোপী মোহন বসাক, ঈশ্বর চন্দ্র দাস এবং পূর্ণ চন্দ্র ভুঁইয়া।

১৮৯৯ সালে কমিশনার ছিলেন বরদা কান্ত গাঙ্গুলী, প্যারিলাল দাস, নবদ্বীপ চন্দ্র বসাক, রাধিকা মোহন বসাক, সুরেন্দ্র কুমার রায়, কাজি রিয়াজুদ্দীন আহমদ, রায় অক্ষয় কুমার সেন বাহাদুর এবং নবাব খাজা ইউসুফ জান খান বাহাদুর।

১৯১২ সালে কমিশনার ছিলেন এ. ফিয়েলম্যান, আর. কে. দাস, দেবেন্দ্র নাথ দাস, শেখ আবদুল মান্নান, রাখাল চন্দ্র বসাক, মৌলবী আমিরুদ্দীন আহমদ, খাজা আবদুল আজিজ, ললিত মোহন দাস এবং মুন্সী আবদুল আজিজ। এছাড়া পূর্বের কতিপয় কমিশনারকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছিলো।

১৯২৫-২৬ সালে ঢাকা পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন নবাব খাজা মোহাম্মদ আফজাল খান বাহাদুর, লেঃ কর্ণেল এম. ম্যাকেলভী সি. আই. ই. বামাচরণ চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, উমেশ চন্দ্র দত্ত, জনাব আবুল হাসনাত আহমদ, সত্যেন্দ্র কুমার দাস, জনাব আবদুল আজিজ, সতীশ চন্দ্র সরকার, খাজা নাজিমুদ্দীন এবং গকুল চন্দ্র দাস।

ইতিপূর্বে ১৯০৫-৬ সালে মৌলবী সৈয়দ আওলাদ হোসেন এবং ১৯১৮-২১ সালে খাজা নাজিমউদ্দীন ও খাজা শাহাবুদ্দীন ঢাকা পৌরসভার কমিশনার ছিলেন।

এঁদের পরে পাকিস্তানের আইয়ুব আমলে মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত যে সকল ব্যক্তি ঢাকা পৌরসভার কমিশনার হয়েছিলেন তাঁদের সকলের নাম-ধাম সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। তবে যাঁদের কথা মনে পড়ে তাঁরা হচ্ছেন, কলতা বাজার এলাকার আবদুল মান্নান সরদার, বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ভবেশ চন্দ্র নন্দী, রায় সাহেব বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফজলুর রহমান, কাঁসার হাট্টার বিশিষ্ট হিন্দু নেতা জীবন দত্তের পিতা নলিনী দত্ত উকিল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জুলফিকার বেপারী, গেন্ডারিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুরুজ মিয়া, বিশিষ্ট হিন্দু নেতা রায় বাহাদুর কেশব ব্যানার্জী, কংগ্রেস নেতা গকুলচন্দ্র দাস, বখশী বাজারের বিশিষ্ট ঠিকাদার পেয়ারু সরদার, চুড়িহাট্টার সমাজকর্মী ডাঃ নূর উদ্দীন, নবাবপুরের ডেকোরেটার ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইয়াসীন, বিশিষ্ট হিন্দু নেতা হেমেন্দ্র কুমার দাস, বংশাল এলাকার ক্যাপিটাল পাইপ ইন্ডাস্ট্রির মালিক জনাব নবী উল্লাহ, রহমতগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব জামাল উদ্দীন, হাজারীবাগের বিশিষ্ট কাষ্ঠ ব্যবসায়ী জনাব আবদুল হালিম, নবাবগঞ্জের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হাফেজ মুসার পিতা জনাব লাল মিয়া সরদার, নবাবগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী জনাব বেল্লাল সরদার, কংগ্রেস নেতা নয়াবাজারের জনাব গোলাম কাদের

চৌধুরী। ঢাকা শহরে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো।

আমলীগোলার কংগ্রেস নেতা বাবু ত্রৈলক্য নাথ দাস এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজসেবী সালাহ উদ্দীন আহমদ, লালবাগ রোডের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী জনাব নূর আহমদ (ইনি বেশ কয়েক বছর ঢাকা বণিক সমিতি ও ঢাকা ওয়াসার সদস্য ছিলেন)। চুড়ি হাট্টার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী ও দানবীর জনাব মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন (ইনি মধুমিতা সিনেমার মালিক ছিলেন এবং সিরকো সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা)। সূত্রাপুরের জমিদার ও ব্যবসায়ী দাস পরিবারের শেষ বংশধর বসন্ত কুমার দাস রায় চৌধুরী। বসন্ত কুমার দাস ব্যক্তিগতভাবে অমায়িক ও সমাজদরদী ছিলেন। তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালের গভর্নিংবডির সদস্য এবং পাকিস্তান আমলে নিজ এলাকার মাইনরিটি স্টুডেণ্ট হোমের সদস্য ছিলেন। তিনি শ্মশান ঘাট ও কবরস্থানের পরিচর্যা করতে খুব ভালোবাসতেন। বৃটিশ যুগে এই দাস পরিবার খুব দান-খয়রাত করতো। মোঘল আমলের শেষ দিকে এই দাস পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ভারতের মোজাফফরপুর থেকে ঢাকায় আগমন করেছিলেন। (যে সকল দাস পরিবার রাজপুতনার উজ্জয়িনি থেকে এসেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরা উজাইনা সাহা নামে পরিচিত হন)।

চকবাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি জনাব গোলাম নবী বেপারী এবং তৎপুত্র জনাব জুম্মন বেপারী ওরফে আহসান মোহাম্মদ নবী ঢাকা পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। জুম্মন বেপারী ঢাকার বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা ছিলেন। বিচার-আচারে তাঁর খুব দক্ষতা ছিলো।

ঢাকায় কেবল মাত্র মুসলমানরাই ঈদ-মিছিল বের করত না, হিন্দু জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়িগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দু'দিন ব্যাপী এক মিছিলের আয়োজন করতেন। জন্মাষ্টমীর মিছিলও খুব জাঁকজমক সহকারে বের করা হতো। ঐসব মিছিল সাধারণত নবাবপুর ও ইসলামপুর থেকেই বের হতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে জন্মাষ্টমীর মিছিল বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া বেশ কয়েক বছর ঢাকার পশ্চিমাঞ্চল ভাগলপুর হতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিলো। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে সে মিছিল পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায়।

ঈদ মিছিল ও জন্মাষ্টমীর মিছিলে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন ঢাকার নবাব বাহাদুরগণ। তাঁরা অর্থ দিয়ে সাহস দিয়ে ঐসব মিছিল বের করার আয়োজন করতেন। ঢাকাবাসীর কাছে ইসলামপুরের মিছিলের উদ্যোক্তা 'বাপে-পুতে' এবং নবাবপুরের মিছিলটির উদ্যোক্তা 'হাতে-গুতে' বলে পরিচিত ছিলো।

ঢাকা পৌরসভার অনেক কমিশনারের নামানুসারে অনেকগুলি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। এখানে তাঁদের সম্পর্কে পুনরালোচনা না করে দু'জন বিশিষ্ট কমিশনার সম্পর্কে কিছু বলবো। এঁদের সম্পর্কে বহু কাহিনী ঢাকাবাসীর অন্তরে গাঁথা রয়েছে। এঁদের একজন হচ্ছেন নাজিরাবাজার এলাকার মতি সরদার। তাঁর সম্পর্কে বহু কৌতুকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। মতি সরদার লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে গেছেন সর্বত্র। তিনি নিজের নাম সই করতে গিয়ে শুধু 'মতি' শব্দটা লিখে কলমখানা দাবিয়ে নষ্ট করে দিতেন। তারপর যিনি তাঁর দস্তখত নিতে আসতেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'সরদার শব্দটা আপনি লিখে নেবেন।' তাঁর সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে ঃ পৌরসভার কোন প্রস্তাবের সমর্থন আদায়ের জন্যে কাদের সরদার তাঁর হাত ধরে টেনে উঠিয়ে দিতেন। একবার তিনি কাদের সরদারের এই নির্দেশ অমান্য করে বসলেন। সে সময় পৌরসভার কার্যবিবরণী ইংরেজীতে চলতো। সেদিন তিনি দাবি তুললেন, আমিও পৌরসভার একজন কমিশনার। আমাকে এ প্রস্তাবের বাংলা তরজমা করে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে এ প্রস্তাব সম্পর্কে আমার আপত্তি থাকলো।' অগত্যা তাঁকে বাংলা তরজমা করে বুঝিয়ে দেয়া হলো। শোনা যায়, ঐ প্রস্তাবের প্রতি তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেটা সবারই গ্রহণযোগ্য হয়েছিলো। এমনিভাবে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে ঢাকাবাসীর অনেক উপকার করে গেছেন।

অপর জন হচ্ছেন ঢাকার বাইশ পঞ্চায়েতের প্রধান সরদার মির্জা আবদুল কাদের। তাঁর দানশীলতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে বহু কথা আজও প্রচলিত রয়েছে। তিনি দীন-দুঃখীদের অকাতরে দান-খয়রাত করতেন। বিশেষ করে ১৯৪২ সালের দুর্ভিক্ষে এবং পরবর্তী বন্যা ও দুর্ভিক্ষে তিনি বেওয়ারিশ ও গরিব মুসলিম ব্যক্তিদের মৃতদেহের সৎকার সাধনের ব্যবস্থা করে গেছেন। তিনি লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে গরিব ও অসহায় লোকদের অকাতরে দান করে তাদের সম্পত্তি রক্ষা করে গেছেন।

তিনি ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে নাট্য-আন্দোলনের অগ্রপথিক ছিলেন। তিনি খুব জটিল মামলা-মোকদ্দমা ও বিরোধ অতি সহজেই মীমাংসা করতে পারতেন। সমাজের দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা তাঁর নামে ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো। তিনি যে কারণে ঢাকাবাসীর নিকট সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় হয়ে আছেন সেটা হলো ঃ ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি গরীব, অসহায় ও অশিক্ষিত মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন

করে তাদের বিরুদ্ধে থানা ও কোর্টে যেসব ফৌজদারি মামলা হতো সেগুলো খারিজের ব্যাপারে লিগ্যাল এইড এবং গ্রেফতারকৃত গরীব মুসলমানদের জামিনের ব্যবস্থা করতেন।

১৯৬০ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে ৩০ জন ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে পদাধিকার বলে ঢাকা পৌরসভার সদস্য হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ

(১) শরাফতগঞ্জ এলাকার খান বাহাদুর মুজিবর রহমান (মরহুম)। ইনি চা-বাগানের মালিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষাব্রতী। (২) ফরিদাবাদ এলাকার যুবকর্মী মোহাম্মদ ইব্রাহীম। তিনি নিজ এলাকায় একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। (৩) ফরাসগঞ্জ এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী আহমাদ উল্লাহ (মরহুম)। (৪) ওয়ারি এলাকার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও তৎকালীন বণিক সমিতির সভাপতি জনাব সৈয়দ মুহসেন আলী। (৫) দিলখুশা এলাকার ডাঃ কিউ. এম. শামসুল আলা। (৬) নারিন্দা এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আলী হোসন। (৭) গোপীবাগ এলাকার তরুণ কর্মী জনাব আবদুল খালেক। (৮) ইসলামপুর এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আবদুর রাজ্জাক। (৯) সিদ্দিক বাজারের বিশিষ্ট আইনজীবি ও সমাজ কর্মী জনাব ইয়াকুব আলী। (১০) পুরানা মোঘলটুলি এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব গওহর হোসেন। (১১) নবাবপুর এলাকার বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী এবং রিকশা মালিক এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি জনাব তাজউদ্দীন (মরহুম)। (১২) পটুয়াটুলি তথা আহসান মঞ্জিলের বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সমাজসেবক খাজা খয়েরউদ্দীন (ভাইস চেয়ারম্যান)। (১৩) মগবাজার-খিলগাঁও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজকর্মী জনাব ফজলুর রহমান (মরহুম)। (১৪) মিটফোর্ড-মৌলভি বাজার এলাকার বিশিষ্ট ডাক্তার এবং ঢাকার মুসলিম জনগণের এক কালের প্রিয় সার্জন এ. ওয়াই. এম. আবদুল্লাহ (মরহুম)। (১৫) নাজিরা বাজার এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহাবুদ্দীন আহমদ। (১৬) শামসাবাদ এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ব্যবসায়ী জনাব আবদুল মালেক সরদার (মরহুম)। (১৭) ছোট কাটরার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজনৈতিক কর্মী হেকিম ইরতেজাউর রহমান খান আখুনজাদা (মরহুম)। (১৮) রহমতগঞ্জ এলাকার আইনজীবি ওয়াজেদ আলী মোখতার (মরহুম)। (১৯) ধানমন্ডী এলাকার বিশিষ্ট আইনজীবি ও রাজনৈতিক কর্মী জনাব আলী আমজাদ খান (মরহুম)। (২০) বখশিবাজার এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ক্রীড়ামোদী জনাব নান্নু মিয়া (মরহুম)। (২১) চকবাজারের বিশিষ্ট কাপড় ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী জনাব আবদুর রাজ্জাক (মরহুম)। (২২) আজিমপুর এলাকার

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও মহল্লা সরদার হাজী আবদুল গণী (তমঘা-ই-খিদমত) (মরহুম)। (২৩) লালবাগ এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব নাজির হোসেন (তমঘা-ই-খিদমত, লেখক নিজে)। (২৪) নবাবগঞ্জ এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী জনাব শুকুর মোহাম্মদ (মরহুম)। (২৫) হাজারিবাগ এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক জনাব খলিলুর রহমান সরদার (মরহুম)। (২৬) রোকনপুর ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ক্রীড়াবিদ মিঃ শাহজাহান (মরহুম)। (২৭) রমনা ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট আইনজীবি ও রাজনৈতিক নেতা সৈয়দ মঞ্জরুল আহসান (মরহুম)। (২৮) রাজারবাগ ইউনিয়ন হতে আফরুদ্দিন সরদার (মরহুম)। জনাব সরদার একজন বিশিষ্ট ঠিকাদার ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। (২৯) মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইউনুস খান (মরহুম)। (৩০) তেজগাঁও এলাকা হতে প্রথমে প্রাক্তন আই. জি. শামসুদ্দোহা (মরহুম)। তিনি মন্ত্রী পদে আসীন হওয়ায় তদস্থলে মোহাম্মদ ইলিয়াস নির্বাচিত হন। এদের ছাড়াও যে কজন মনোনীত সদস্য ছিলেন তারা হলেন ঃ প্রখ্যাত ডাক্তার শিরিন কাজী, (মরহুম) লেঃ কর্ণেল এম. এন. আমীন (মরহুম), রায় বাহাদুর প্রফুল্ল কুমার ঘোষ, ব্যারিস্টার কাজী আব্দুর রাকিব (মরহুম), ব্যারিস্টার মোহাম্মদ নবী, আবু নাসের আহমদ (মরহুম) এ্যাডভোকেট শহীদুল হক, ও মিসেস আফিফা হক (মরহুম নান্না মিয়ার স্ত্রী)।

পরবর্তী মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে যাঁরা ঢাকা পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন ঃ

শরাফতগঞ্জ ইউনিয়ন থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক জনাব গিয়াসউদ্দীন আহমদ, ফরিদাবাদ ইউনিয়ন থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক জনাব সিরাজুল ইসলাম, যাত্রাবাড়ী ইউনিয়ন হতে জনাব নূরউদ্দীন ভূঁইয়া,কমলাপুর ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও আইনজীবি তৎকালীন বাংলাদেশ রেডক্রসের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈজউদ্দীন (মরহুম), দিলকুশা ইউনিয়ন থেকে বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও ব্যবসায়ী এবং তৎকালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এন. এ. লস্কর (মরহুম), পটুয়াটুলি ইউনিয়ন থেকে মুসলিম লীগ নেতা ও সমাজদরদী জনাব খাজা খয়েরউদ্দীন এম. এন. এ., (মরহুম) নবাবপুর ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বণিক সমিতির সভাপতি জনাব সৈয়দ মুহসেন আলী, ইসলামপুর ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজসেবী ও রাজনৈতিক কর্মী জনাব আবু নাসের আহমদ (মরহুম), মৌলভী বাজার ইউনিয়ন হতে তৎকালীন গভর্ণর মোনেম খাঁর জামাতা বিশিষ্ট প্রেস ব্যবসায়ী জনাব জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল, লালবাগ ইউনিয়ন হতে

বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব নাজির হোসেন (লেখক নিজে), রোকনপুর ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এম. এ. কাদের (মরহুম), তেজগাঁও পূর্ব ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব ফজলুর রহমান (মরহুম), হাজারিবাগ ইউনিয়ন হতে সমাজসেবী খলিলুর রহমান সরদার (মরহুম), ধানমন্ডী ইউনিয়ন হতে জনাব মোহাম্মদ ইউনুস (মরহুম), রমনা ইউনিয়ন হতে জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব (মরহুম), ওয়ারি ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজসেবী জনাব আবদুর রহিম (মরহুম), আজিমপুর ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী হাজী আবদুল গনি (মরহুম) সিদ্দিক বাজার ইউনিয়ন হতে ব্যবসায়ী ও সমাজ কর্মী জনাব আবদুর রউফ (মরহুম), জিন্দাবাহার ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলী মিয়া সরদার, রাজারবাগ ইউনিয়ন হতে জনাব আবদুর রহমান ভুঁইয়া, নারিন্দা ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আলী হোসেন, কাটরা ইউনিয়ন হতে হোটেল ব্যবসায়ী মোহাম্মদ নাসারউল্লাহ (মরহুম), খিলগাঁও হতে ব্যবসায়ী জনাব এমরান আলী ভুঁইয়া, তেজগাঁও পশ্চিম ইউনিয়ন হতে জনাব শামসুল আফতাব, পুরানা মোগলটুলি ইউনিয়ন হতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতা জনাব ফজলুল করিম, ফরাসগঞ্জ ইউনিয়ন হতে সমাজসেবী মাওলা বখশ সরদার (মরহুম), মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন হতে আলহাজ্ব মোহাম্মদ চিনু মিয়া (মরহুম), রায়ের বাজার ইউনিয়ন হতে জনাব আবুল হাশেম খান, চকবাজার ইউনিয়ন হতে হোটেল ব্যবসায়ী জনাব নুরউদ্দীন আহমদ (মরহুম)। এবং দেওয়ান বাজার ইউনিয়ন হতে ফার্নিচার ব্যবসায়ী জনাব আবদুল আজিজ। উপরোক্ত ত্রিশ জন নির্বাচিত সদস্য ব্যতীত আরও ত্রিশজন সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি মনোনীত সদস্য ছিলেন। বেসরকারী মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ডেপুটি এটর্নী জেনারেল অব পাকিস্তান নুরুল হুদা, ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির চেয়ারম্যান আহমাদ হোসেন, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ রেফাতউল্লাহ (মরহুম), সৈয়দ জিয়াউল আহসান, মৌলানা কাজী এস, এম গোফরান বারকাতি (মরহুম) পূর্ব প্রাক আইন পরিষদ সদস্য বেগম খালেদা হাবিব, আইন পরিষদ সদস্য এডভোকেট আজগর হোসেন, ব্যারিস্টার কে. এম. বাকের, এস. এম. রহমত উল্লাহ, এস. ই. কবির, অধ্যাপক এ. কে. শামস, রায় বাহাদুর অরুন প্রসাদ রায় চৌধুরী, প্রাক্তন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শুকুর মোহাম্মদ, আগাখান সুপ্রীম কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ ভাই, গণপরিষদ সদস্য আঃ রউফ খান, (মরহুম) ক্রীড়াবিদ মোঃ আমিন, ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটার আব্দুল আলীম, আইন পরিষদ সদস্যা বেগম এ. জে. খান ও নবাব খাজা হাসান আসকারী (মরহুম) অন্যতম।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেশ কয়েক বছর ঢাকা পৌরসভার নির্বাচন স্থগিত ছিলো। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রশাসক দ্বারা পৌর সভার কাজ কর্ম নির্বাহ করা হতো। ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা মহানগরীকে ৫০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে নির্বাচনের মাধ্যমে ঢাকা পৌরসভা গঠন করা হয়। অবশ্যি পৌর নির্বাচনের পূর্বে পুলিশ বিভাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ঢাকার ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যানদের সমন্বয়ে "পুরাতন ঢাকা উন্নয়ন কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করে পৌরসভার কিছু কিছু কাজ এদের মাধ্যমে করা হয়েছে। পুরাতন ঢাকার উন্নয়ন কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন জনাব হাজী আঃ মাজেদ সরদার (মরহুম), সৈয়দ মোহসেন আলী, হেকিম ইরতেজাউর রহমান আখুনজাদা (মরহুম), হাজী আবদুর রাজ্জাক (মরহুম), আলহাজ্ব নাজির হোসেন (লেখক নিজে), মওলা বখশ সরদার (মরহুম), আলহাজ্ব খলিলুর রহমান সরদার (মরহুম), মোহাম্মদ বেল্লাল সরদার (মরহুম), গোলাম মোর্শেদ, আবদুর রউফ (মরহুম), আলহাজ্ব আব্দুর রহিম (মরহুম), সেরাজুল ইসলাম, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, আঃ কাদের (মরহুম) ও আব্দুল খালেক। এঁরা সকলেই পৌরসভার সদস্য কিংবা কমিশনার পদে ছিলেন বা রয়েছেন। এছাড়া আরো যারা উন্নয়ন কমিটিতে ছিলেন তারা হচ্ছেন, চকবাজার ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার কমিটির ফজলুর রহমান ওরফে ভোলা মোক্তার, মৌলভিবাজার ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার কমিটির মোহাম্মদ ইউসুফ, আজিমপুর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার কমিটির হাজী আবুল কাসেম (মরহুম), রহমতগঞ্জ ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার কমিটির আবদুল ওয়াহাব, জিন্দাবাহার ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার কমিটির তাহাবুদ্দিন, পটুয়াটুলি ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার কমিটির আবদুল হক, ইসলামপুর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার কমিটির এস. এম. আব্দুল্লাহ।

১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে জিয়া সরকার এক অর্ডিন্যান্স বলে ঢাকা পৌরসভাকে ঢাকা পৌর করর্পোরেশনে পরিণত করেন। ঐ অর্ডিন্যান্স বলে ঢাকা পৌর সভার নির্বাচিত কমিশনারগণ ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কমিশনার এবং চেয়ারম্যান ঢাকা পৌর করপোরেশনের মেয়র নামে অভিহিত হন। এই অর্ডিন্যান্স ঢাকা নগরীর অধিবাসীদের বহু দিনের আশা-আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়ণ। ঢাকা পৌর করপোরেশন ৫০ জন নির্বাচিত কমিশনার, ৫ জন মনোনীত মহিলা কমিশনার এবং সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৫ জন মনোনীত কমিশনার ছিলেন। কমিশনারগণ হচ্ছেন ঃ

১ নম্বর ওয়ার্ড তথা শ্যামলী এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক কর্মী জনাব

শাহ আলম, ২ নম্বর ওয়ার্ড তথা মোহাম্মদপুর এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী আলহাজ্ব চিনু মিয়া (মরহুম) (ইনি আইয়ুব আমলেও ঢাকা পৌর সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন)। ৩ নম্বর ওয়ার্ড তথা মোহাম্মদপুর এলাকার যুবকর্মী আহমদ ইকবাল হাসান, ৪ নম্বর ওয়ার্ড তথা জাফরাবাদ এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আবু সাঈদ বেপারী, ৫ নম্বর ওয়ার্ড তথা রায়ের বাজার এলাকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক যুবকর্মী মোহাম্মদ সাদেক খান, ৬ নম্বর ওয়ার্ড তথা হাজারিবাগ টেনারি এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক কর্মী জনাব মনসুর আহমদ, ৭ নম্বর ওয়ার্ড তথা কলাবাগান এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শামসুদ্দীন আহমদ, ৮ নম্বর ওয়ার্ড তথা ধানমন্ডী এলাকার বিশিষ্ট সমাজ সেবী ও রাজনৈতিক কর্মী জনাব মকবুল হোসেন (মরহুম), ৯ নম্বর ওয়ার্ড তথা নিউ এলিফ্যাণ্ট রোড এলাকার বিশিষ্ট আইনজীবি ও রাজনৈতিক কর্মী সৈয়দ মাহবুব আলী (মরহুম), ১০ নম্বর ওয়ার্ড তথা হাজারিবাগ এলাকা বিশিষ্ট সরদার ও সমাজসেবী আলহাজ্ব খলিলুর রহমান সরদার (মরহুম) (ইনি ইতিপূর্বে আরও তিনবার পৌর সভার সদস্য হয়েছিলেন), ১১ নং ওয়ার্ড তথা চৌধুরী বাজার-নবাব গঞ্জ এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ কর্মি জনাব আবদুস্ সামাদ, ১২ নম্বর ওয়ার্ড তথা লালবাগ-আমলীগোলা মহল্লার বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ব্যবসায়ী আলহাজ্ব নাজির হোসেন (ইনি আইয়ুব আমলে আরও দু'বার পৌরসভার সদস্য হয়েছিলেন) তাঁকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তমঘা-ই-খিদমত উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, ১৩ নম্বর ওয়ার্ড তথা আজিমপুর এলাকা থেকে ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত কমিশনার হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকার প্রথম মেয়র এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন নেতা এবং জাতীয় পরিষদের চীফ হুইপ ছিলেন। ১৪ নম্বর ওয়ার্ড তথা নাজিমউদ্দীন রোড এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ক্রীড়ামোদী জনাব গোলাম মোরশেদ, ১৫ নম্বর ওয়ার্ড তথা খাজে দেওয়ান এলাকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন প্রথমে নির্বাচিত হন, পরে নির্বাচনী মামলায় হেরে গেলে উক্ত এলাকা থেকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক কর্মী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সেলিমকে কমিশনার হিসেবে ঘোষণা করা হয়, ১৬ নম্বর ওয়ার্ড তথা রহমতগঞ্জ এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও রাজনীতিক এবং শ্রমিক নেতা মোঃ হারুন অর রশিদ পরবর্তীতে তিনি লালবাগ এলাকা হতে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচিত হন। ১৭ নম্বর ওয়ার্ড তথা ছোট কাটরা এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ক্রীড়াবিদ জনাব মোসলেহ উদ্দীন (বগুভাই) (মরহুম), ১৮ নম্বর ওয়ার্ড তথা মৌলভীবাজার এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক কর্মী জনাব জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল (এম.পি), তিনি আইয়ুব আমলে

একাবার পৌরসভার সদস্য হয়েছিলেন এবং পাক আমলে পূর্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯ নম্বর ওয়ার্ড তথা আর্মানীটোলা এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক কর্মী জনাব অহিউল্লাহ (মরহুম), ২০ নম্বর ওয়ার্ড তথা নাজিরা বাজার এলাকার তথা ঢাকার প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট সরদার, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী আলহাজ্ব আবদুল মাজেদ সরদার (মরহুম), ২১ নম্বর ওয়ার্ড তথা সিদ্দিক বাজার এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক কর্মী জনাব আবদুর রউফ (মরহুম) (ইনি আইয়ুব আমলেও একবার পৌরসভার সদস্য হয়েছিলেন), ২২ নম্বর ওয়ার্ড তথা বংশালের বিশিষ্ট চামড়া ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতা জনাব ফজলুল করিম (ইনি আইয়ুব আমলেও একবার পৌরসভার সদস্য হয়েছিলেন), ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তথা তাঁতিবাজার এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আনোয়ার হোসেন, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড তথা কোতয়ালী এলাকার রাজনৈতিক কর্মী ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ২৫ নম্বর ওয়ার্ড তথা বাংলাবাজার এলাকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও সংস্কৃতিসেবী কাজী ইউনুস আবদুল্লাহ, ২৬ নম্বর ওয়ার্ড তথা কলতাবাজার এলাকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ব্যবসায়ী ও সামজ কর্মী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন (তিনি পাক আমলেও একবার পৌর কমিশনার এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন), ২৭ নম্বর ওয়ার্ড তথা নবাবপুর এলাকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী খোন্দকার হাবিবুর রহমান, ২৮ নম্বর ওয়ার্ড তথা মৈশুন্ডি এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজসেবী ও রাজনৈতিক কর্মী আলহাজ্ব আবদুর রহিম (মরহুম) (ইনি পাক আমলেও একবার কমিশনার ও আইয়ুব আমলে ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছিলেন), ২৯ নম্বর ওয়ার্ড তথা নারিন্দা এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী জনাব আবদুস সোবহান, ৩০ নম্বর ওয়ার্ড তথা গেন্ডারিয়া এলাকার রাজনৈতিক কর্মী ও ক্রীড়ামোদী জনাব লুৎফুর রহমান, ৩১ নম্বর ওয়ার্ড তথা ফরিদাবাদ এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব আবদুল মালেক (ইনি পাক আমলেও একবার কমিশনার হয়েছিলেন), ৩২ নম্বর ওয়ার্ড তথা ওয়ারী এলাকার রাজনৈতিক কর্মী ডাক্তার আবদুর রউফ (এমপি, মরহুম), ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড তথা মীর হাজারিবাগ এলাকার রাজনৈতিক কর্মী ও ব্যবসায়ী কাজী মনিরুল হক, ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড তথা যাত্রাবাড়ী এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক কর্মী জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী, ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড তথা গোপীবাগ এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ও ক্রীড়াবিদ জনাব সাদেক হোসেন খোকা (বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী), ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড তথা মুগদাপাড়া এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ কদম আলী বেপারি, ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড তথা মতিঝিল এলাকার মুক্তিযোদ্ধা জনাব মেসবাহ উদ্দিন সাবু, ৩৮ নম্বর

ওয়ার্ড তথা বাসাবো এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব মুহসেন আলী চৌধুরী, ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড তথা গোরান এলাকার যুবকর্মী জনাব রওশন আলী ভূঁইয়া, ৪০ নম্বর ওয়ার্ড তথা রামপুরা এলাকার যুবকর্মী জনাব ওবায়দুল ইসলাম মিলন, ৪১ নম্বর ওয়ার্ড তথা শাহজাহানপুর এলাকার যুব নেতা জনাব মীর্জা আব্বাস উদ্দীন (প্রাক্তন মেয়র), ৪২ নম্বর ওয়ার্ড তথা গুলবাগ এলাকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী ও ব্যবসায়ী জনাব আবদুল মান্নান খান (মরহুম), ৪৩ নম্বর ওয়্যার্ড তথা ফকিরাপুল এলাকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী জনাব আবদুর রহিম (পরবর্তীতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন), ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড তথা রেলওয়ে কলোনীর শ্রমিক নেতা জনাব আবদুস সাত্তার, ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড তথা সাহেব বাড়ী এলাকার যুবকর্মী জনাব মোহাম্মদ রুস্তম আলী, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড তথা সিদ্ধেশ্বরী এলাকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজি, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড তথা নয়াটোলা এলাকার যুবকর্মী জনাব আবদুল মজিদ মিয়া, ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড তথা তেজগাঁও এলাকার ব্যবসায়ী জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুল হক, ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড তথা মগবাজার এলাকার রাজনৈতিক কর্মী ও ব্যবসায়ী জনাব মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম (মরহুম), ৫০ নম্বর ওয়ার্ড তথা তস্তুরী বাজার এলাকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মী আলহাজ্ব মিয়া মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া। এবং ৬ জন অফিসিয়াল মেম্বার এবং ৫ জন মহিলা মেম্বার মনোনীত হন। তন্মধ্যে ডি.আই.টি'র চেয়ারম্যান, ঢাকা ওয়াসার চেয়ারম্যান, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ার প্রধান প্রকৌশলী, রোড এন্ড হাইওয়ের প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, এবং হেলথ সার্ভিসেস-এর ডিরেক্টর, মিসেস তাহেরা সফিক, মিসেস আনোয়ারা খাতুন, মিসেস খালেদা হাবিব, মিসেস আয়েশা সর্দার ও বেগম তাহমীনা প্রমুখ।

উপরোক্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত বোর্ড সরকার ১৯৮১-৮২ সালে বাতিল করে। ১৯৮২-৮৩ সালে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিদের মনোনীত ওযার্ড চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে ঃ ১নং ওয়ার্ড থেকে জনাব মোঃ গনী হায়দার (শ্যামলী), ২নং ওয়ার্ড থেকে মোজাম্মেল হক (আজিজ মহল্লা), ৩নং ওয়ার্ড থেকে মঃ আলী খাঁন (রেজিয়া সুলতানা রোড, মহম্মদপুর), ৪নং ওয়ার্ড থেকে সাহিদুর রহমান (লালমাটিয়া), ৫নং ওয়ার্ড থেকে বি, আর নিজাম (সাত মসজিদ রোড), ৬নং ওয়ার্ড থেকে লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মতিউর রহমান (ধানমন্ডি), ৭নং ওয়ার্ড থেকে আফাজ উদ্দিন খাঁন (ধানমন্ডি), ৮নং ওয়ার্ড থেকে প্রিন্সিপাল নওয়াব আলী, এডভোকেট (সার্কুলার রোড), ৯নং ওয়ার্ড থেকে সৈয়দ মাহবুব আলী (মরহুম) (নিউ এলিফেন্ট রোড), ১০নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ ফজলুল হক (মনেশ্বর ১ম লেন), ১১নং ওয়ার্ড

থেকে হাজী হাবিব উল্লা (সুবল দাস রোড), ১২নং ওয়ার্ড থেকে মোশারফ হোসেন (জগন্নাথ সাহা রোড), ১৩নং ওয়ার্ড থেকে আফসার উদ্দিন আহম্মদ (আজিমপুর রোড), ১৪নং ওয়ার্ড থেকে মাহবুবুজ্জামান (উমেশ দত্ত রোড), ১৫নং ওয়ার্ড থেকে আলহাজ্ব আবদুল ওয়াহেদ (নন্দকুমার দত্ত রোড), ১৬নং ওয়ার্ড থেকে ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম. সাদেক (হাজী রহিম বক্স লেন), ১৭নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আইউব (বি.কে. রায় লেন), ১৮নং ওয়ার্ড থেকে জাহাঙ্গীর মঃ আদেল (আবুল খয়রাত রোড), ১৯নং ওয়ার্ড থেকে আলহাজ্ব মোঃ সাখী মিয়া (কসাইটুলি), ২০নং ওয়ার্ড থেকে হাজী মোঃ আবদুল মাজেদ সর্দার (আগাসাদেক রোড), ২১নং ওয়ার্ড থেকে হাজী মোঃ ইউনুস (হাজী ওসমান গনী রোড), ২২নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ সোলায়মান (হাজী আবদুল্লা সরকার লেন), ২৩নং ওয়ার্ড থেকে আবু নাসের আহমাদ (মরহুম), (ইসলামপুর) ২৪নং ওয়ার্ড থেকে এম. এ. সাদী (কুমারটুলি), ২৫নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আলিমুল্লাহ (হেমেন্দ্র দাস লেন), ২৬নং ওয়ার্ড থেকে হাজী মঃ সিরাজ উদ্দিন (নিউবেলী রোড), ২৭নং ওয়ার্ড থেকে সৈয়দ মোঃ ইয়াসিন (টিপু সুলতান রোড), ২৮নং ওয়ার্ড থেকে আলহাজ্ব আঃ রহিম (মরহুম) (লালমোহন সাহা স্ট্রীট), ২৯নং ওয়ার্ড থেকে হাফিজুদ্দিন আহমাদ (গুরুদাস সরকার লেন), ৩০নং ওয়ার্ড থেকে ফকির মোঃ আবদুল হামিদ (ডিস্টিনারী রোড), ৩১নং ওয়ার্ড থেকে সিরাজুল ইসলাম (নবীন চান্দ গোস্বামী রোড), ৩২নং ওয়ার্ড থেকে রজ্জব আলী সর্দার (মুরাদপুর), ৩৩নং ওয়ার্ড থেকে আপ্তাব উদ্দিন (মীর হাজারী বাগ), ৩৪নং ওয়ার্ড থেকে আবদুল আজিজ (উত্তর যাত্রাবাড়ী), ৩৫নং ওয়ার্ড থেকে সাদেক হোসেন খোকা (বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী) (গোপীবাগ), ৩৬নং ওয়ার্ড থেকে আবদুল কাদের (আহমেদাবাদ), ৩৭নং ওয়ার্ড থেকে মেসবাহ উদ্দিন সাবু (মতিঝিল কলোনী), ৩৮নং ওয়ার্ড থেকে আলহাজ্ব মোহসিন আলী চৌধুরী (উত্তর বাসাবো), ৩৯নং ওয়ার্ড থেকে এমরান আলী ভূইঞা (দক্ষিণ গোড়ান), ৪০নং ওয়ার্ড থেকে আনওয়ার আলী (খিলগাঁও), ৪১নং ওয়ার্ড থেকে সিকান্দার আলী (শান্তিবাগ), ৪২নং ওয়ার্ড থেকে আব্দুল মান্নান (মরহুম) (মালিবাগ চৌধুরী পাড়া), ৪৩নং ওয়ার্ড থেকে ফিরোজ আহমেদ (ফকিরাপুল), ৪৪নং ওয়ার্ড থেকে এ. সাত্তার (তোপখানা রোড), ৪৫নং ওয়ার্ড থেকে শুকুর মহম্মদ (মরহুম) (ময়মনসিংহ রোড, পরীবাগ), ৪৬নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আবদুল হালিম ভূঁঞা (মালিবাগ পশ্চিম), ৪৭নং ওয়ার্ড থেকে ফজলুর রহমান (মরহুম) (নয়াটোলা), ৪৮নং ওয়ার্ড থেকে আওলাদ হোসেন (নাখাল পাড়া), ৪৯নং ওয়ার্ড থেকে তাজুল ইসলাম (মরহুম) (দিলুরোড), ৫০নং ওয়ার্ড থেকে হাসেম

আলী খাঁন (এয়ারপোর্ট রোড), ৫১নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ রহমত উল্লাহ (গুলশান), ৫২নং ওয়ার্ড থেকে আবদুল আলী (বাড্ডা গুলশান), ৫৩নং ওয়ার্ড থেকে এম. রেজা (গুলশান এ্যাভিন্যু), ৫৪নং ওয়ার্ড থেকে আলহাজ্ব এম. এ. করিম (অবঃ) এ আইজি অব পুলিশ), ৫৫নং ওয়ার্ড থেকে ফকির সাফিরুদ্দিন আহমেদ (মিরপুর ১০ নং সেকশন), ৫৬নং ওয়ার্ড থেকে এম. এ. খালেক (মিরপুর), এদের সঙ্গে আরো দশজন মহিলা চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয় তারা হচ্ছেন– মিসেস তাহেরা শফিক (ডেপুটী ডিরেক্টর সমাজ কল্যাণ), মিসেস আনওয়ারা খাতুন (নারিন্দা), বেগম তাহমীনা (নুরজাহান রোড), মিসেস খালেদা হাবিব (ধানমন্ডি), মোসাম্মত ফাতেমা খাতুন (মিরপুর), মিসেস আয়েশা সর্দার (এলিফ্যান্ট রোড), মিসেস মীনাজাবীন (বনানী), মিসেস সিতারা মুসা (ইকবাল রোড), মিসেস নিলুফার কাদের (রামপুরা), প্রফেসার তৌফিকা করিম (লালমাটিয়া)।

এই কমিটির নাম প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় সরকার ১৯৮৩ সালেই ওয়ার্ড সংখ্যা বর্ধিত করতঃ সর্ব মোট ৭৫টি ওয়ার্ড গঠন করে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের ওয়ার্ড চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন দান করেন। তন্মধ্যে ঃ ১নং ওয়ার্ডে সর্ব জনাব আবদুল খালেক (ভাষানটেক উত্তর), ২নং ওয়ার্ডে অধ্যাপক এন. এম. আতাউর রহমান (মিরপুর), ৩নং ওয়ার্ডে বেলাল আহমেদ (মিরপুর), ৪নং ওয়ার্ডে আবদুল বাকী দেওয়ান (মিরপুর), ৫নং ওয়ার্ডে আহমেদ আলী (মিরপুর), ৬নং ওয়ার্ডে তৈয়বুর রহমান (মিরপুর), ৭নং ওয়ার্ডে এস. এ. খালেক (মিরপুর), ৮নং ওয়ার্ডে হাবিবুর রহমান (হাবুল) (মিরপুর), ৯নং ওয়ার্ডে এইচ. এন. খালেক (মিরপুর), ১০নং ওয়ার্ডে আলী আসগর মাতবর (পশ্চিম কাফরুল), ১১নং ওয়ার্ডে আব্দুল গনী হায়দর (শ্যামলী), ১২নং ওয়ার্ডে আলহাজ্ব চিনু মিয়া (মোহাম্মদপুর), ১৩নং ওয়ার্ডে মীর নুর আলী (মোহাম্মদপুর), ১৪নং ওয়ার্ডে মোঃ আব্দুল রহিম (নূরু) (লালমাটিয়া), ১৫নং ওয়ার্ডে আবু সাঈদ বেপারী (জাফরাবাদ), ১৬নং ওয়ার্ডে আলহাজ্ব মোঃ আবদুল হাসেম খাঁন, ১৭নং ওয়ার্ডে মোঃ মনসুর আহমেদ (হাজারীবাগ), ১৮নং ওয়ার্ডে আতাউল হক জিন্নাহ (ধানমন্ডি), ১৯নং ওয়ার্ডে সামশুদ্দিন আহমেদ ঢালী (কলাবাগান), ২০নং ওয়ার্ডে আমজাদ হোসেন (নিউমার্কেট), ২১নং ওয়ার্ডে হেদায়েত ইসলাম (হাজারীবাগ), ২২নং ওয়ার্ডে সাবেক কমিশনার আবদুস সামাদ (সুবল দাস রোড), ২৩নং ওয়ার্ডে মোশারফ হোসেন (জগন্নাথ সাহা রোড), ২৪নং ওয়ার্ডে সাবেক কমিশনার আলহাজ্ব নাজির হোসেন (জগন্নাথ সাহা রোড), ২৫নং ওয়ার্ডে নূরুল করিম জিন্নাহ্ (আজিমপুর),

২৬নং ওয়ার্ডে গোলাম মোর্শেদ (হোসেনী দালান), ২৭নং ওয়ার্ডে আলহাজ্ব আবদুল ওয়াহেদ (নন্দকুমার দত্ত লেন), ২৮নং ওয়ার্ডে আমিনুর রশিদ আমিন (খাজেদেওয়ান লেন), ২৯নং ওয়ার্ডে নূর মহম্মদ (যাদব নারায়ণ দাস লেন), ৩০নং ওয়ার্ডে সাবেক কমিশনার জাহাঙ্গীর মঃ আদেল (আবুল খয়রাত রোড), ৩১নং ওয়ার্ডে মোঃ আবদুল হাদী (শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোড), ৩২নং ওয়ার্ডে নাজির হোসেন নাজির (আগাসাদেক রোড), ৩৩নং ওয়ার্ডে মোঃ সিরাজ উদ্দিন সিরু (লুৎফর রহমান লেন), ৩৪নং ওয়ার্ডে হাজী মহম্মদ হোসেন (মালিটোলা রোড), ৩৫নং ওয়ার্ডে বাবুল হোসেন (সৈয়দ হাসান আলী লেন), ৩৬নং ওয়ার্ডে মোঃ নাসির আহমেদ (পাটুয়াটুলি), ৩৭নং ওয়ার্ডে এম. এইচ. কে. জাহাঙ্গীর মাহমুদ (ঝুরিয়াটুলি লেন), ৩৮নং ওয়ার্ডে আঃ রহিম (ফকিরাপুল), ৩৯নং ওয়ার্ডে আব্দুস সোবহান (মনির হোসেন লেন), ৪০নং ওয়ার্ডে সাবেক কমিশনার আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ (ডিস্টিনারী রোড), ৪১নং ওয়ার্ডে লিয়াকত আলী (লালমোহন সাহা স্ট্রীট), ৪২নং ওয়ার্ডে হেলাল উদ্দিন হেলাল (নাসির উদ্দিন সরদার লেন), ৪৩নং ওয়ার্ডে ফরিদ উদ্দিন আনোয়ার (অক্ষর দাস লেন), ৪৪নং ওয়ার্ডে ইউনুস আবদুল্লা সেন্টু (ঋষিকেশ দাস রোড), ৪৫নং ওয়ার্ডে ওয়ালী মহম্মদ (আলমগঞ্জ লেন), ৪৬নং ওয়ার্ডে সিরাজুল ইসলাম (লালমোহন পোদ্দার লেন), ৪৭নং ওয়ার্ডে দেওয়ান বোরহান উদ্দিন (হাজী খোরশেদ আলী সরদার লেন), ৪৮নং ওয়ার্ডে আব্দুল লতিফ (করিমুল্লাবাগ), ৪৯নং ওয়ার্ডে মোঃ মোবারক হোসেন (মীর হাজীরবাগ), ৫০নং ওয়ার্ডে মোঃ আমির হোসেন (দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী), ৫১নং ওয়ার্ডে সাবেক কমিশনার রেজাউল করিম চৌধুরী, (উত্তর যাত্রাবাড়ী), ৫২নং ওয়ার্ডে সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা (গোপীবাগ), ৫৩নং ওয়ার্ডে আলহাজ্ব কদম আলী (উত্তর মুগদাপাড়া), ৫৪নং ওয়ার্ডে খন্দকার মুশতাক আহমাদ (মতিঝিল কলোনী), ৫৫নং ওয়ার্ডে মোঃ আলী হোসেন আলী (পূর্ব বাসাবো), ৫৬নং ওয়ার্ডে সাবেক কমিশনার ওবায়দুল ইসলাম মিলন (রামপুরা), ৫৯নং ওয়ার্ডে মনসুর আলী (মালিবাগ চৌধুরী পাড়া), ৬০নং ওয়ার্ডে শেখ সেকান্দার আলী (শান্তিবাগ), ৬১নং ওয়ার্ডে সাবেক কমিশনার আব্দুল মান্নান খাঁন (গুলবাগ), ৬২নং ওয়ার্ডে মোঃ আঃ সালাম (ফকিরাপুর), ৬৩নং ওয়ার্ডে আবদুস সাত্তার (বিজয় নগর), ৬৪নং ওয়ার্ডে ওবায়দুল হক ভূইয়া (তোপখানা রোড), ৬৫নং ওয়ার্ডে কামাল উদ্দিন আহমেদ (ইস্কাটন গার্ডেন), ৬৬নং ওয়ার্ডে সাবেক কমিশনার ফজলুর রহমান (নয়াটোলা), ৬৭নং ওয়ার্ডে খালেদ ইমাম (দিলুরোড), ৬৮নং ওয়ার্ডে আলহাজ্ব হাসেম আলী খাঁন (তেজতুরি বাজার), ৬৯নং ওয়ার্ডে গোলাম সাওয়ার (ইন্দিরা রোড),

৭০নং ওয়ার্ডে মফিজুল ইসলাম (পশ্চিম নাখাল পাড়া), ৭১নং ওয়ার্ডে সাবেক কমিশনার ওবায়দুল হক (নাখাল পাড়া), ৭২নং ওয়ার্ডে মোঃ রহমতউল্লাহ্ (গুলশান), ৭৩নং ওয়ার্ডে সিরাজ উদ্দিন আহমেদ (মহাখালী), ৭৪নং ওয়ার্ডে মোঃ আঃ আলী (বাড্ডা গুলশান), ৭৫নং ওয়ার্ডে মোঃ ওয়াকিল উদ্দিন আহমদ (কালাচানপুর গুলশান) এদের ব্যতিত ১২টি থানায় ১২ জন মহিলা কমিশনার মনোনীত হন। এদের মধ্যে মিসেস সুরাইয়া সিদ্দিকী (ধানমন্ডি), মিসেস মাজেদা মকবুল (লালবাগ), এডভোকেট জাকিয়া আহমেদ (সূত্রাপুর), বেগম তাহমীনা (তেজগাঁও), মিসেস আনোয়ারা খাঁন চৌধুরী (মীরপুর), এডভোকেট জাহানারা বেগম (মহম্মদপুর), মিসেস সুলতানা রাজিয়া সিদ্দিকী জ্যোতি (রমনা), মিসেস সেলিনা আক্তার (মতিঝিল), মিসেস সেলিনা বশির (গুলশান), মিসেস মালিকা খাতুন (কোতয়ালী), এডভোকেট আনোয়ারা ইদ্রিস (ডেমরা) ও মিসেস শিরিন ভুইয়া (ক্যান্টনমেন্ট)। এসব মনোনীত চেয়ারম্যানগণ ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত মনোনীত চেয়ারম্যান হিসেবে নিজ নিজ ওয়ার্ডে নিয়োজিত থাকেন। অতঃপর সরকার করপোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন।

নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত ব্যাক্তিগণ ওয়ার্ড কমিশনার হিসেবে বিজয়ী হয়ে ঢাকা পৌর করপোরেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

জনাব মোসাদ্দেক হোসেন মুরাদ (বাইশটেকী মিরপুর), ওয়ার্ড নং-১, জনাব ইসমাইল হোসেন (সেকসন-১২ মিরপুর), ওয়ার্ড নং-২, জনাব বেলাল আহমেদ (সেকশন-১০ মিরপুর), ওয়ার্ড নং-৩, জনাব আজিজুল হক (মিরপুর), ওয়ার্ড নং-৪, জনাব আহমেদ আলী (মিরপুর), ওয়ার্ড নং-৫, জনাব তৈয়বুর রহমান (মিরপুর), ওয়ার্ড নং-৬, জনাব মফিজুল হক বেবু (গাবতলী, মিরপুর), ওয়ার্ড নং-৭, জনাব সালেমুদ্দিন (পাইকপাড়া, মিরপুর), ওয়ার্ড নং-৮, জনাব এইচ. এম. খালেক (বড়বাগ, মিরপুর), ওয়ার্ড নং-৯, জনাব আবদুল মান্নান (শেওরা পাড়া, মিরপুর), ওয়ার্ড নং-১০, জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ (শ্যামলী), ওয়ার্ড নং-১১, সাবেক কমিশনার জনাব আলহাজ্ব চিনু মিয়া (হুমাউন রোড, মোহাম্মদপুর), ওয়ার্ড নং-১২, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম সেন্টু (শহীদ সলিমুল্লা রোড, মোহাম্মদপুর), ওয়ার্ড নং-১৩, জনাব আগা এমরান চৌধুরী (লালমাটিয়া), ওয়ার্ড নং-১৪, জনাব মোঃ আবু সাঈদ (বছিলা মোহাম্মদপুর), ওয়ার্ড নং-১৫, জনাব মোঃ মিয়া চাঁদ খাঁ (উত্তর সুলতানগঞ্জ), ওয়ার্ড নং-১৬, জনাব আমজাদ হোসেন (মনেশ্বর ঝিকাতলা), ওয়ার্ড নং-১৭, জনাব সামশুজ্জামান মিণ্টু (পরবর্তীতে ডেপুটি মেয়র), ওয়ার্ড নং-১৮, জনাব

নাজেম আলী দেওয়ান (কাঁঠাল বাগান), ওয়ার্ড নং-১৯, জনাব আ. স. ম. ফিরোজ (ধানমন্ডি), ওয়ার্ড নং-২০, জনাব মজিবুর রহমান (মজু) (নিলাম্বর সাহা রোড), ওয়ার্ড নং-২১, জনাব আবদুল আজিজ (আঃ আজিজ লেন), ওয়ার্ড নং-২২, জনাব মোশারফ হোসেন (জগন্নাথ সাহা রোড), ওয়ার্ড নং-২৩, জনাব আলহাজ্ব নাজির হোসেন (জগন্নাথ সাহা রোড) সাবেক কমিশনার (৪র্থ বারের মত নির্বাচিত লেখক নিজে), ওয়ার্ড নং-২৪, জনাব নূরুল করিম জিন্নাহ (ঢাকেশ্বরী রোড), ওয়ার্ড নং-২৫, সাবেক কমিশনার জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ (হোসেনী দালান), ওয়ার্ড নং-২৬, জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন (রহমতগঞ্জ লেন), ওয়ার্ড নং-২৭, জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (রহমতগঞ্জ), ওয়ার্ড নং-২৮, জনাব মোঃ আনিসুর রহমান (সোয়ারী ঘাট), ওয়ার্ড নং-২৯, জাহাঙ্গীর মোঃ আদেল সাবেক সংসদ সদস্য, উপ-প্রশাসক, ডেপুটি মেয়র তৃতীয়বারের মত নির্বাচিত জনাব ওয়ার্ড নং-৩০, জনাব এ.টি.এম. জাহাঙ্গীর দুলাল (জিন্দাবাহার), ওয়ার্ড নং-৩১, জনাব নাজির হোসেন নাজির (আগা সাদেক রোড), ওয়ার্ড নং-৩২, জনাব মোহাম্মদ আলী (হাজী ওসমানগনী রোড), ওয়ার্ড নং-৩৩, জনাব হাজী মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা (মালিটোলা), ওয়ার্ড নং-৩৪. জনাব আহমেদ আওরঙ্গজেব কবির (প্রসন্ন পোদ্দার লেন), ওয়ার্ড নং-৩৫, জনাব আবুল বাসার আবু (বাংলাবাজার), ওয়ার্ড নং-৩৬, জনাব আওলাদ হোসেন দীলিপ (গোপীমোহন বসাক লেন), ওয়ার্ড নং-৩৭, জনাব মঈনুল ইসলাম ময়না (রামকৃষ্ণ মিশন রোড), ওয়ার্ড নং-৩৮, জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন আহমেদ (নারিন্দা), ওয়ার্ড নং-৩৯, জনাব আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, সাবেক কমিশনার তৃতীয় বারের মত নির্বাচিত ওয়ার্ড নং-৪০, জনাব লিয়াকত আলী (লালমোহন সাহা স্ট্রীট), ওয়ার্ড নং-৪১, জনাব আব্দুর রহিম (হাজী আঃ মজিদ লেন), ওয়ার্ড নং-৪২, জনাব মোঃ নাজিম (এস.কে.দাস রোড), ওয়ার্ড নং-৪৩, জনাব ইউনুস আব্দুল্লাহ সেন্টু সাবেক কমিশনার (ঋষি কেশ দাস রোড), ওয়ার্ড নং-৪৪, জনাব ওয়ালী মোহাম্মদ (আলমগঞ্জ), ওয়ার্ড নং-৪৫, জনাব শহীদ হোসেন (ঢালকানগর), ওয়ার্ড নং-৪৬, জনাব দেওয়ান রৌশন (জুরাইন), ওয়ার্ড নং-৪৭, জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ্ (করিমুল্লারবাগ), ওয়ার্ড নং-৪৮, জনাব মোবারক হোসেন (মীর হাজীর বাগ), ওয়ার্ড নং-৪৯, জনাব আমির হোসেন (দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী), ওয়ার্ড নং-৫০, জনাব খালেকুজ্জামান চৌধুরী (ধলপুর), ওয়ার্ড নং-৫১, জনাব মোঃ নাজির হোসেন (আর. কে. মিশন রোড), ওয়ার্ড নং-৫২, জনাব মোঃ এনামুল হক সরদার (উত্তর মুগদাপাড়া), ওয়ার্ড নং-৫৩, জনাব খন্দকার মুশতাক আহমাদ (মতিঝিল কলোনী),

ওয়ার্ড নং-৫৪, জনাব রকিব আলী ভূঁঞা (গোড়ান), ওয়ার্ড নং-৫৬, জনাব পলাশ আনোয়ার মতি (খিলগাঁও), ওয়ার্ড নং-৫৭, জনাব আলহাজ্ব এম. এ. লতিফ (রামপুরা), ওয়ার্ড নং-৫৮, জনাব মোঃ মনসুর আলী (মালিবাগ চৌধুরী পাড়া), ওয়ার্ড নং-৫৯, জনাব শেখ সেকান্দর আলী (শান্তিবাগ), ওয়ার্ড নং-৬০, সাবেক কমিশনার আব্দুল মান্নান খাঁন (মরহুম) (গুলবাগ), ওয়ার্ড নং-৬১, জনাব আঃ সালাম পরবর্তিতে ডেপুটি মেয়র (শান্তিনগর), ওয়ার্ড নং-৬২, জনাব মোঃ হেলাল বাবু (তোপখানা রোড), ওয়ার্ড নং-৬৩, জনাব খাজা হুমাউন কাদির (নবাবহাবিব উল্লা রোড), ওয়ার্ড নং-৬৪, জনাব মাহফুজুর রহমান টুলু (সিদ্ধেশ্বরী), ওয়ার্ড নং-৬৫, জনাব মোঃ ফজলুর রহমান সাবেক কমিশনার তৃতীয় বারের মত নির্বাচিত (নয়াটোলা), ওয়ার্ড নং-৬৬, জনাব খালেদ ইমাম (বড় মগবাজার), ওয়ার্ড নং-৬৭, জনাব আবদুস সাত্তার খাঁন (তেজতুরী বাজার), ওয়ার্ড নং-৬৮, জনাব আবুল কাসেম (লেক সার্কাস কলাবাগান), ওয়ার্ড নং-৬৮, জনাব আফতাব উদ্দিন (নাখালপাড়া), ওয়ার্ড নং-৭০, জনাব মাহমুদুল আলম মণ্টু (তেজগাঁও), ওয়ার্ড নং-৭১, জনাব মোঃ মফিজুর রহমান (বনানী স্টাফ কোয়ার্টার), ওয়ার্ড নং-৭২, জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ্ (মহাখালী), ওয়ার্ড নং-৭৩, জনাব আব্দুল আলী (বাড্ডা গুলশান), ওয়ার্ড নং-৭৪, জনাব মোঃ ওয়াকিল আহমাদ (বাড়িধারা গুলশান), ওয়ার্ড নং-৭৫।

এরা ছাড়া আরো ১৪ জন মহিলা এবং ৫ জন পদস্থ সরকারী কর্মচারী সদস্য / সদস্যা হিসেবে মনোনীত হন। মহিলাদের অনেকেই পূর্বের মনোনীত সদস্যা রয়েছেন তন্মধ্যে নতুন মনোনীত হন মতিঝিল থানা থেকে সৈয়দা ফাতেমা শায়েস্তা সালাম, কোতয়ালী থানা থেকে বেগম খালেদা হাবিব, সবুজবাগ থানা থেকে বেগম রৌশন আরা বেগম, উত্তরা থানা থেকে আলিমা জুলফিয়া নার্গিস। ৫ জন অফিসিয়াল কমিশনার হিসেবে রাজউকের চেয়ারম্যান এস. এম. রহমত উল্লাহ্, ঢাকা ওয়াসার চেয়ারম্যান গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) নূরুল ইসলাম, জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী আনোয়ারুল করিম, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সামশুল ইসলাম এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়।

উপরোক্ত কমিটি ১৯৯১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিলেন। সরকার এঁদের ১লা জানুয়ারী ১৯৯২ সাল হতে বাতিল ঘোষণা করেন। ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ওয়ার্ড সমূহে কোন মনোনীত ওয়ার্ড কমিশনার ছিল না।

সরকার দেশের চারটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিলে নির্বাচন কমিশন ৩০শে জানুয়ারী ১৯৯৪ তারিখে ঢাকাসহ আরো তিনটি সিটি

করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেন। উক্ত তারিখে ঢাকার কয়েকটি নির্বাচন কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলে তা ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পুনঃ ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করেন। এ নির্বাচনে ছিলো সিটি কর্পোরেশন সমূহের মেয়র পদে সরাসরি নির্বাচন তৎসঙ্গে ৯০টি ওয়ার্ডে প্রত্যক্ষ নির্বাচন। ইতিপূর্বে ঢাকায় ৭৫টি ওয়ার্ড ছিলো। সরকার এবারের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রথমে ৭৫টি ওয়ার্ড রেখেছিলো। যদিও ঢাকার পরিধি পূর্ব থেকে বর্ধিত করা হয়। বর্ধিত এলাকা নিয়ে ঢাকা মহানগরীকে ৭৫টি ওয়ার্ডে ভাগ করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন লোক সংখ্যা ও ভোটার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ৭৫টি ওয়ার্ডের সীমানা ঘোষনা দেন– তাতে পুরনো ঢাকার লালবাগ, কোতয়ালী ও সূত্রাপুর থানার ৯টি ওয়ার্ড কমিয়ে নতুন এলাকায় বর্ধিত করা হয়েছিলো। পুরনো ঢাকার পৌর প্রতিনিধি হ্রাস এর বিরুদ্ধে আমিই সর্ব প্রথম প্রতিবাদ জানাই, সংবাদ পত্রে বক্তব্য দান করি, আমাদের আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স প্রচার পত্র বিলি করে জনগণকে সজাগ করে তোলে। অতঃপর ঢাকা সমিতির ব্যানারে এক সাংবাদিক সম্মেলনেও এহেন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাই। যার ফলশ্রুতিতে সরকার নির্বাচন কিছু দিনের জন্য পিছিয়ে দিয়ে পুরনো ঢাকার পূর্ববৎ ওয়ার্ড বহাল রেখে পুনঃনির্বাচন সিডিউল ঘোষণা করেন। অন্যদিকে সরকারী ও বিরোধী দলসমূহ রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রার্থী মনোনয়ন দান করেন। ফলে কোথাও কোথাও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোটারগণ রাজনৈতিক জোয়ারে গা ভাঁসিয়ে দিয়েছিল। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের জন প্রতিনিধিদের দলীয় ভিত্তিক মনোনয়ন এই প্রথম। আমার নির্বাচনী বক্তব্যে এই সিদ্ধান্ত সঠিক নহে বলে মন্তব্য করেছি। কারণ, এলাকার কাজে রাজনীতিকে প্রধান্য দিলে অনেক ক্ষেত্রেই নগরবাসীর অসুবিধে বাড়বে বলে আমি মনে করি। যাহোক নির্বাচনে সহিংস্র ঘটনার বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জোড়ালো বক্তব্য রাখলেও শেষ পর্যন্ত কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োগ হয়নি। ফলে সন্ত্রাস, জালভোট, প্রভাব বিস্তার, অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখা গেছে। যারা শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আশ্বাসে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাদের অনেকেই অবস্থার গতিবেগ দেখে থমকে গিয়েছেন। এ অবস্থা থেকে দেশবাসীকে পরিত্রান দিতে হলে ভোটারদের পরিচয় পত্র দেশের ও গণতন্ত্রের স্বার্থে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। আর ভোটার তালিকায় ভূয়া ভোটারের নাম লিপিবদ্ধ না করা সম্ভব হবে–যদি আদম শুমারীর সময় একই সঙ্গে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যায়। তা হলে এক জনের এক ভোট অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হবে।

যা হোক, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন'৯৪ তে যারা কমিশনার পদে নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন, সর্ব জনাব ১নং ওয়ার্ড থেকে ডাঃ হাফিজুল ইসলাম (কুসুম), ২নং ওয়ার্ড থেকে ইসমাইল হোসেন, ৩নং ওয়ার্ড থেকে এম. আলী হায়দার, ৪নং ওয়ার্ড থেকে জামাল মোস্তফা, ৫নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ মোস্তফা কামাল, ৬নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আহসান উল্লাহ হাসান, ৭নং ওয়ার্ড থেকে হাফিজুর রশিদ, ৮নং ওয়ার্ড থেকে আগা খান মণ্টু, ৯নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ মনোয়ার হোসেন (ডিপু), ১০নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ শাহজাহান দেওয়ান, ১১নং ওয়ার্ড থেকে এ. কে. এম. দেলোয়ার হোসেন, ১২নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ শওকত আলী, ১৩নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আব্দুস সাত্তার, ১৪নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আব্দুল কাদের, ১৫নং ওয়ার্ড থেকে পফি উদ্দিন, ১৬নং ওয়ার্ড থেকে ইউসুফ উল্লাহ, ১৭নং ওয়ার্ড থেকে কাজী হযরত আলী, ১৮নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আনোয়ার হোসেন, ১৯নং ওয়ার্ড থেকে তারিক উল্লাহ সিকদার, ২০নং ওয়ার্ড থেকে হাবিবুর রহমান, ২১নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আঃ কাইউম, ২২নং ওয়ার্ড থেকে লিয়াকত আলী, ২৩নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ মুনসুর আলী, ২৪নং ওয়ার্ড থেকে জহির উদ্দিন বাবলু, ২৫নং ওয়ার্ড থেকে রফিক আলী ভূইয়া, ২৬নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ মাকসুদ হোসেন (মহসীন), ২৭নং ওয়ার্ড থেকে রহমত আলী, ২৮নং ওয়ার্ড থেকে মোশারফ হোসেন মঞ্জু, ২৯নং ওয়ার্ড থেকে সাবেক কমিশনার এনামুল হক সরদার, ৩০নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ এ. ডি. এম. মোস্তফা (বাদশা), ৩১নং ওয়ার্ড থেকে মোসলে উদ্দিন আহম্মদ, ৩২নং ওয়ার্ড থেকে মকবুল আহমেদ আখন, ৩৩নং ওয়ার্ড থেকে শাহনেওয়ার সাহিন, ৩৪নং ওয়ার্ড থেকে মির্জা খোকন, ৩৫নং ওয়ার্ড থেকে সাজ্জাদ জহির, ৩৬নং ওয়ার্ড থেকে কামাল চৌধুরী, ৩৭নং ওয়ার্ড থেকে তালুকদার সারওয়ার হোসেন, ৩৮নং ওয়ার্ড থেকে মজিবর রহমান, ৩৯নং ওয়ার্ড থেকে শামীম হাসান, ৪০নং ওয়ার্ড থেকে আব্দুল গাফফার, ৪১নং ওয়ার্ড থেকে এস. এম. সাহাবুদ্দিন, ৪২নং ওয়ার্ড থেকে নূরুল ইসলাম রতন, ৪৩নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আবুল হোসেন, ৪৪নং ওয়ার্ড থেকে এহসানুল হক সেতু, ৪৫নং ওয়ার্ড থেকে হাবিবুর রহমান, ৪৬নং ওয়ার্ড থেকে শেখ বজলুর রহমান, ৪৭নং ওয়ার্ড থেকে সাবেক কমিশনার মোঃ সাদেক খান, ৪৮নং ওয়ার্ড থেকে এস. এ. সাত্তার ভুইয়া, ৪৯নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আবদুল খায়ের বাবুল, ৫০নং ওয়ার্ড থেকে আলমগীর পাটোয়ারী, ৫১নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আবদুল লতিফ, ৫২নং ওয়ার্ড থেকে আবু নাসের চৌধুরী, ৫৩নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আরিফুল ইসলাম, ৫৪নং ওয়ার্ড থেকে মুখলেসুর রহমান, ৫৫নং ওয়ার্ড থেকে সাবেক

কমিশনার এম. এ. মজিদ, ৫৬নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ চৌধুরী আলম, ৫৭নং ওয়ার্ড থেকে খাজা হাবিব উল্লাহ, ৫৮নং ওয়ার্ড থেকে রমজান আলী, ৫৯নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ হুমায়ুন কবির, ৬০নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ মোশাররফ হোসেন (খোকন), ৬১নং ওয়ার্ড থেকে কাজী মাসুম, ৬২নং ওয়ার্ড থেকে হাজী মোঃ আলীম, ৬৩নং ওয়ার্ড থেকে সাবেক কমিশনার গোলাম মোর্শেদ, ৬৪নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ কামাল উদ্দিন বাবুল, ৬৫নং ওয়ার্ড থেকে হাজী মোঃ সেলিম, ৬৬নং ওয়ার্ড থেকে বেগম হাজী মোঃ সেলিম, ৬৭নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আজিজ উল্লা, ৬৮নং ওয়ার্ড থেকে হাজী জুম্মন, ৬৯নং ওয়ার্ড থেকে সাবেক কমিশনার নাজির হোসেন (নাজির), ৭০নং ওয়ার্ড থেকে সাবেক ওয়ার্ড চেয়ারম্যান মীর সমির, ৭১নং ওয়ার্ড থেকে সাবেক কমিশনার হাজী হোসেন মোল্লা, ৭২নং ওয়ার্ড থেকে আঃ জাব্বার, ৭৩নং ওয়ার্ড থেকে সাবেক কমিশনার মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ৭৪নং ওয়ার্ড থেকে কাজী আবুল বাসার, ৭৫নং ওয়ার্ড থেকে ময়নুল হক, ৭৬নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আলী উল্লাহ, ৭৭নং ওয়ার্ড থেকে সাবেক কমিশনার লিয়াকত আলী, ৭৮নং ওয়ার্ড থেকে সাবেক ওয়ার্ড চেয়ারম্যান আঃ রহিম, ৭৯নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ সাহিদ, ৮০নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ আবদুস সাহেদ সেন্টু, ৮১নং ওয়ার্ড থেকে লিয়াকত আলী, ৮২নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ শহীদুল্লাহ, ৮৩নং ওয়ার্ড থেকে সাইদুর রহমান, ৮৪নং ওয়ার্ড থেকে আতিক উল্লাহ, ৮৫নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ খালেকুজ্জামান চৌধুরী, ৮৬নং ওয়ার্ড থেকে নবী উল্লাহ নবী, ৮৭নং ওয়ার্ড থেকে কাজী মনিরুল ইসলাম, ৮৮নং ওয়ার্ড থেকে শেখ সাহাবুদ্দিন, ৮৯নং ওয়ার্ড থেকে কাজী মুহম্মদ মঈনুদ্দিন মনির, ৯০নং ওয়ার্ড থেকে মোঃ সাহাবুদ্দিন।

ঢাকা পৌর করপোরেশনের সাবেক কমিশনারগণ সমাজে বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছেন। এঁদের অনেকেই রাজনীতির অঙ্গনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন আবার অনেকেই সমাজ সেবার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তাঁরা ঢাকা নগরীকে অত্যাধুনিক ও আদর্শ নগরীরূপে গড়ে তোলার জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বর্তমানেও আগামীতে যারা নির্বাচিত কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ও নেবেন এবং মেয়র থাকবেন তারা এ উন্নয়নের যাত্রাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবেন এটাই জাতির প্রত্যাশা।

সমাপ্ত

"কিংবদন্তির ঢাকার" প্রকাশক–
থ্রী ষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ
পরিচিতি

থ্রী ষ্টার কো-অপ্যারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ ১৯৬৪ সালে ঢাকা নগরীর লালবাগ থানাধীন আমলীগোলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বহু মুখী আর্থ-সামাজিক ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব নাজির হোসেন। নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে-দেশ, জাতি ও মানবতার সেবাই এ সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সোসাইটি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স এর ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এ বই প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছে– ঢাকাবাসীকে নিজেদের গৌরব পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। সোসাইটির কৃতিত্ব ও সংক্ষিপ্ত কার্যক্রমের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো।

সোসাইটির কৃতিত্ব

সোসাইটির ১৯৮৩ সালে ঢাকা জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও ১৯৮৭ সালে ঢাকা বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে সমবায় মন্ত্রণালয় হতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত।

১। সমিতির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব নাজির হোসেন ১৯৮৫ সালে ঢাকা মহা নগরীর শ্রেষ্ট সমবায় পুরস্কার লাভ।

২। সমিতির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব নাজির হোসেন ১৯৯১ সালের জন্য সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী (বিপনন) হিসেবে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী হতে জাতীয় পুরস্কার (স্বর্ণপদক) লাভ।

৩। সোসাইটির প্রতিনিধি হিসেবে সমবায় মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কমিটিতে সমিতির চেয়ারম্যানের সদস্য লাভ।

৪। পশ্চিম বঙ্গ ষ্টেট সমবায় ইউনিয়নের আমন্ত্রণে ১৯৮৮ সালে পশ্চিম বঙ্গের বেশ কতক সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও সমবায় ক্ষেত্রে পারস্পারিক মত বিনিময় (বিস্তারিত বিবরণ সমিতি প্রকাশিত "দেশ-দেশান্তর পুস্তকে লিপিবদ্ধ)।

সোসাইটির চলতি কার্যক্রম

১। কাঁচা বাজার সহ ৮টি সপিং কমপ্লেক্স পরিচালনা।

২। সমবায়, ইতিহাস, সমাজ কল্যাণ, দেশ বিদেশের শিক্ষা সফরের উপর ভ্রমণ কাহিনী ও সামাজিক সমস্যাদির উপর পুস্তক প্রকাশনা। সংবাদ পত্রে নিবন্ধ প্রকাশ ও রেডিওতে "আমার দেশ" প্রোগ্রামে কথিকা প্রচার।

৩। দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা, ডাইরিয়া প্রতিরোধে এবং পরিবার পরিকল্পনায় সহায়তা দান।

৪। কর্মজীবি শিশুদের জন্য ইউসেপের সহযোগিতায় থ্রী ষ্টার কো-অপারেটিভ ইউসেফ স্কুল পরিচালনা। (যাহার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ৬০০ জন)

৫। নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা।

৬। পশু পালন অধিদপ্তরের সহায়তায় পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা।

৭। দুঃস্থ ও নিম্ন বিত্ত মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা।

৮। আজাদ মুসলিম পাবলিক লাইব্রেরী পরিচালনায় সক্রিয় সহযোগিতা দান।

৯। রিক্সা চালকদের জন্য স্বল্প খরচে স্বাস্থ্য সম্মত আবাসিক হোষ্টেল প্রতিষ্ঠা।

১০। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায় সদস্যদের সহযোগিতা দান।

১১। দুঃস্থদের জরুরী প্রয়োজনে যথাঃ মেয়ে বিবাহে, দাফন-কাফনে, ঘর মেরামতে, শিক্ষার জন্য বৃত্তি দানে, বন্যা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য ও সহযোগিতা দান।

১২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন কল্পে সেমিনার, সম্মেলন, সমাবেশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, যেমন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস, বিশ্ব বসতি দিবস, বিশ্ব স্বেচ্ছা সেবক দিবস, বিশ্ব শান্তি দিবস, বিশ্ব নারী দিবস, জাতীয় যুব দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস ইত্যাদি পালন।

১৩। শিল্প উন্নয়ন ও কারখানার দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষন দান।

১৪। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে সপ্তাহ ব্যাপী আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মুক্তবায়ু সেবন শিবিরের মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক, মানসিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, পর্যটন তথা সার্বিক কল্যাণ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া।

১৫। বয়স্ক নারী পুরুষদের জন্য প্রতিবছর দেশ বিদেশে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

১৬। সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে প্রতি বছর বন ভোজনের ব্যবস্থা।

১৭। নিজেদের প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার, সম্মেলন ও আলোচনা সভা করা।

১৮। সোসাইটির কর্মকান্ড পরিদর্শনে আগত দেশী বিদেশী মেহমান ও ডেলিগেটদের সহযোগিতা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা।

১৯। শহর ও জাতীয় ভিত্তিক শিল্প মেলা ও প্রদর্শনীতে ষ্টল নিয়ে সদস্য/সদস্যাদের তৈরী কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প দ্রব্য এবং প্রকাশিত বই পুস্তকের প্রদর্শনী করা।

লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত বই

- ❑ দেশ দেশান্তরে (ভ্রমণ কাহিনী)
- ❑ কথা শুধু বলেই গেলাম (দেশের সমস্যাবলী ও তার প্রতিকারের কিছু কথা)
- ❑ সংগ্রাম সংগঠন ব্যক্তিত্ব (স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক তথ্য পূর্ণ অধ্যায়ের চিত্র)
- ❑ সমবায় সংগ্রাম সাধনা (সমবায় আন্দোলনের এক বিচিত্রময় কাহিনী)
- ❑ পশ্চিম পাকিস্তানে বাইশ দিন (ভ্রমণ কাহিনী)
- ❑ আজাদ মুসলিম ক্লাবের পঁচিশ বছর (স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের এক সমীক্ষা)
- ❑ একটি পাঠাগারের ইতিকথা (পাঠাগার প্রতিষ্ঠার এক সংগ্রামের কাহিনী)
- ❑ ঢাকা পৌর সভা ও প্রাথমিক শিক্ষা (একটি সমীক্ষা)
- ❑ লালবাগ ইউনিয়ন কমিটির গতকাল আজ আর আগামীকাল (জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক)
- ❑ জনকল্যাণে লালবাগ ইউনিয়ন (কল্যাণ মূলক কার্য্যক্রম)
- ❑ দেশী বিদেশীদের দৃষ্টিতে আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স (সমাজ সেবার উপর মন্তব্য)

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে–

- ❑ ঢাকাইয়া গল্প (ছোটমণিদের জন্য)

প্রকাশনায় ঃ থ্রি ষ্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

ও

আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-বাংলাদেশ
৮৮/১ জগন্নাথ সাহা রোড (আমলীগোলা), ঢাকা-১২১১
ফোন ঃ ৫০৮৩৫৯